কগণের নামানুক্রমিক সূচী।

প্রথম খণ্ড।

আর্য্যাবর্ত্ত।

মাসিক পত্র।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্পাদিত।

—০—

প্রথম বর্ষ।

প্রথম খণ্ড।

(বৈশাখ হইতে আশ্বিন।)

১৩১৭।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।

১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

আৰ্য্যাবর্ত্ত।

মাসিক পত্র।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
সম্পাদিত।

—o—

প্রথম বর্ষ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র।)

১৩১৭।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।
১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী

দ্বিতীয় খণ্ড।

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চিত্র সূচী।

চিত্রকর।

১

আমরা চা'র বন্ধু মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলাম। তথায় বহরমপুরে বাল্য-বন্ধুর গৃহে কয়দিন প্রচুর আনন্দে ও আদরে সময় কাটাইয়া আমরা বাঙ্গালায় মুসলমান-শাসনের শ্মশান দেখিয়া বেড়াইলাম। এই মুর্শিদাবাদেই বাঙ্গালায় ইংরাজের প্রথম সমৃদ্ধিসঞ্চয়। তখনও এ দেশে ইংরাজ বণিকমাত্র। তখনও রেশমের কুঠীর দপ্তরখানায় সদ্যপত্নীবিয়োগবিধুর হেষ্টিংসের কল্পনায় বাঙ্গালায় রাজ্য-স্থাপনের কথা উদিত হয় নাই। মুর্শিদাবাদের কুঠীর সম্মুখে সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার পত্নী ও দুহিতা সমাহিতা। তখন মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে সিরাজদ্দৌলার বিলাসস্রোতঃ শতমুখে প্রবাহিত হইতেছে; বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সে কথা প্রবাদের মত প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তখন জগৎশেঠের ঐশ্বর্য্যের কথা সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র। তাহার পর বিষম বিপ্লবে সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মুর্শিদাবাদে মুসলমানের গৌরবরবি অস্তমিত,—বৃটিশ-শাসন সমুদিত।

আমরা কয়দিন সহর দেখিলাম। তাহার পর আরও দুই চার দিন থাকিবার জন্য বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইয়া গৃহাভিমুখগামী হইলাম। বন্ধু বহরমপুর হইতে নবাবের প্রাসাদ পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া প্রাসাদ দেখাইয়া গৃহে ফিরিলেন।

সন্ধ্যার সময় আমরা গঙ্গাতটে আসিয়া উপনীত হইলাম; তাহার পর নদী পার হইয়া পর পারে রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিলাম। তখনও গাড়ী আসিতে বিলম্ব আছে। আমরা চেয়ার লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে বসিলাম।

চন্দ্রোদয় হইল। সম্মুখে বালুকায় গঠিত উচ্চ তটের নিম্নে চৈত্রের মন্দ-গতি গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। বামে নৈশগগনপটে জৈন মন্দিরের চূড়া

চিত্রিতবৎ দেখাইতেছে। অদূরে কোথায় আম্রকুঞ্জে এখন ও মুকুল আছে, বাতাসে গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। আমি বলিলাম, "কি সুন্দর রাত্রি!"

বলিয়াছি, আমরা চা'র বন্ধু মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলাম। আমি ব্যবসাদার, একজন উকীল, একজন চিত্রকর, আর একজন কবি।

কবিবন্ধু দ্বিজেশচন্দ্র চিত্রকর বন্ধুকে বলিলেন, "তুমিই ধন্য। আমরা যাহা অনুভব মাত্র করিতে পারি যাহা জীবনের সুখ-স্বপ্নের মধ্যে পরিণত হইয়া যায়, যাহা ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারি না—তোমরা তাহাকে চিত্রপটে স্থায়িত্ব দান করিতে পার।"

আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, সেই আম্রমুকুলগন্ধামোদিত – জাহ্নবীতরঙ্গসঙ্গশীতল সমীরণ বুঝি এই সব বন্ধুর কবিতারোগের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। তিনি চিত্রকর বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আর তোমরাই প্রকৃত সুখী। তোমরা যে স্থানেই যাও, সেই স্থানেই প্রকৃতির শত সৌন্দর্য্য লইয়া সব ভুলিয়া যাও। তোমাদের রচনা ভাষার কারাগারে বদ্ধ রহে না; সকলেই তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে সমর্থ।—"

বন্ধু বলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু উকীল বন্ধু চুরুট টানিতে টানিতেই বলিলেন,—"কিন্তু চিত্রকরের কি কোন দুঃখই নাই?"

আমি বলিলাম, "দুঃখটা কি?"

"মানস প্রতিমা যখন কিছুতেই চিত্রপটে ফুটিয়া উঠে না? কাব্য ছাড়িয়া আমি একটা সত্য ঘটনা বিবৃত করি। শুনিবে?"

আমরা সাগ্রহে বলিলাম, "শুনিব।"

"আমি ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে আলিপুরে ওকালতী করিতে আরম্ভ করি। কেন আলিপুর ছাড়িয়া হাইকোর্টে আসিয়াছিলাম, তাহাই তোমাদিগকে বলিব।"

২

আমরা শুনিতে লাগিলাম। বন্ধু বলিলেন:—

"আমি ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে নাম লিখাইলাম। কিন্তু প্রথম দিন উকিলদিগের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমার আশা সম্বন্ধে আমার ভ্রম অপনীত হইল। সে ঘর মক্ষিকাপূর্ণ মধুচক্রের মত; তেমনই গুঞ্জন-মুখর, তেমনই পূর্ণ, বরং তাহাতে স্থানাভাব লক্ষিত হইল।

এই অরণ্যে আমি নবাগত, কি উপায়ে আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিব—আপনার স্থান করিয়া লইব? জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা ত্যাগ করিলাম; কিন্তু শ্রান্ত দেহের শেষ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া বাঁচিব কি উপায়ে? হায়—দুর্দ্দশা! হায়—দুর্দ্দিন।

"এমনই দুশ্চিন্তায় কয় মাস কাটিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম, 'একরূপ হইতেছে। নিরাশ হইবার কারণ নাই।' কিন্তু এই মিথ্যায় অপরকে প্রতারিত করিলেও আপনাকে প্রতারিত করিব কেমন করিয়া? অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, উপার্জ্জিত টাকায় গাড়ীভাড়াও কুলাইত না।

"তৃতীয় মাসের শেষে একটি অসাধারণ মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। একজন চিত্রকর চৌর্য্যাপরাধে বিচারার্থ আদালতে আনীত হইল। ঘটনাটি কিছু নূতন ধরণের। চিত্রকর যুবক একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রদর্শনাতে প্রদর্শিত করিয়াছিল। চিত্রখানি মনোরম;—শকুন্তলা আম্রবৃক্ষে ভর দিয়া শ্রান্ত ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। চিত্রখানি বিশেষ প্রশংসিত হয়। একজন সৌখীন ধনী সে চিত্রখানি ক্রয় করেন। তাহার পর সেই ধনীর গৃহে যে কক্ষে সেই চিত্রখানি বিলম্বিত ছিল, নিশীথে সেই কক্ষে চিত্রকর যুবককে পাওয়া যায়।

"গৃহে সকলে যখন নিদ্রালাভের জন্য শয্যায় আশ্রয় লইয়াছে, খানসামা বৈঠকখানায় আলোক নিবাইয়া গিয়াছে, তখন বৈঠকখানায় একটি আলোক প্রজ্বালিত হইল দেখিয়া একজন জাগ্রত ভৃত্য বিস্মিত হয়। তাহার পর সে আর কয়জন ভৃত্যকে জাগাইয়া বৈঠকখানায় যাইয়া দেখে, চিত্রকর যুবক যেন কিসের সন্ধান করিতেছে। সে কেন গোপনে তথায় আসিয়াছিল তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। সরকার যখন চোর বলিয়া তাহাকে পুলিশে দেয় সে তখনও কোন আপত্তি করে নাই। তাহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। সে নতমস্তকে সব অপমান সহিয়াছে; মুখ তুলিতে পারে নাই।

"আমি চিত্র প্রদর্শনীতে সে চিত্রখানি দেখিয়াছিলাম, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু চিত্রখানি অনেক দামে বিকায়, তাই কিনিতে পারি নাই। আমি চিত্রকর যুবককে আনাইয়া আমার পরলোকগত পিতৃদেবের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করাইয়া লইয়াছিলাম। সে চিত্র তোমরা দেখিয়াছ।"

কবি বন্ধু বলিলেন, "সে চিত্র ত অতি সুন্দর।"

বন্ধু বলিলেন, "হাঁ। সে চিত্র সেই চিত্রকরের অঙ্কিত। সেই উপলক্ষে আমার সহিত তাহার পরিচয়। আমি তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সে ভদ্রবংশজাত; স্বয়ং অতি ভদ্র। তাহার চৌর্য্যাপরাধ আমার নিকট একান্ত অসম্ভব বোধ হইল। বিশেষ ঘটনার কথা অবগত হইয়া আমার মনে হইল, ইহার মধ্যে কোন রহস্য নিহিত আছে। আমি সে রহস্য উদ্ঘাটন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। অপরাধীর পক্ষে কোন উকীল ছিল না; আমি তাহার পক্ষ অবলম্বন করিলাম।

৩

"আমি চিত্রকরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমাকে দেখিয়া সে লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিল না। তাহার ভাব দেখিয়া আমি প্রথমে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলাম। তাহার পর আমি বলিলাম, আমি তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোকর্দ্দমা চালাইতে চাহি।

"শুনিয়া চিত্রকর বলিল, তাহা একান্ত অনাবশ্যক; তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন।

"তাহার পর আমি যখন বলিলাম, তাহার চৌর্য্যাপবাদ আমি বিশ্বাস করি না; তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মোকর্দ্দমায় তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে চাহি, তখন কৃতজ্ঞতায় তাহার দুই নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বহুক্ষণ কাঁদিয়া সে প্রকৃতিস্থ হইল। তখন আমি ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট প্রকৃত ঘটনা অবগত হইলাম।

"শকুন্তলার চিত্রখানি অঙ্কনের পূর্ব্বে সে কিছুদিন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। ঐ চিত্রের কল্পনা তাহাকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল। সে কতবার সেই মানস-সুন্দরীকে কত ভাবে কল্পনা করিয়াছে! শেষে সে স্থির করিল, পাণ্ডুপত্রোদরপিনদ্ধ কুসুমের মত বল্কলবসনাবৃতা শকুন্তলার এই চিত্রটি অঙ্কিত করিবে। স্থির করিবার পর সে যেন পাগল হইয়া উঠিল! হৃদয়ে অন্য চিন্তা নাই—নয়নে নিদ্রা নাই।

"তিন রাত্রি অনিদ্রায় কাটিল। মুকুল যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আবরণ আর তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না; সে সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফুটিয়া উঠে। তাহার কল্পনা যখন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল তখন সে যেন বলে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। তৃতীয় রাত্রিতে সে কেবল

দিবালোক-বিকাশের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রি যেন একান্ত দীর্ঘ, কিছুতেই শেষ হয় না।

"শেষে রাত্রি পোহাইল, দিবালোক ফুটিতে না ফুটিতে চিত্রকর বাতায়ন মুক্ত করিয়া দিল—চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইল।

"তখন, কত আশা,—কত আশঙ্কা! সে সৌন্দর্য্য-কল্পনা কি চিত্রে ফুটিবে? সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। সে আহার-নিদ্রাও বিস্মৃত হইত। সংসারে জননী ব্যতীত তাহার আর কেহ ছিলেন না। মা যখন কার্য্যবশতঃ তাহাকে ডাকিতেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিত। সে এমনই তদ্গতচিত্ত।

"তাহার পর যখন তুলিকার রেখাপাতে কল্পনা সফলতা লাভ করিতে লাগিল—তাহার মানস-সুন্দরীর মূর্ত্তি হৃদয়পট হইতে চিত্রপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল, তখন কি আনন্দ! সে আনন্দ প্রকাশের ভাষা নাই। তাহার তুলিকাগ্রে মানস প্রতিমা যেন সজীব হইয়া ফুটিতে লাগিল। অনিন্দ্যসুন্দর রমণী-মূর্ত্তি যেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে; যেন সেই কুসুমকোমল—রক্ত ওষ্ঠাধরে বাক্য স্ফুরিত হইতেছে—সে তাহা শুনিতে পাইবে। তাহার চিত্র সম্পূর্ণ হইল।

৪

"অপরের চিত্তবিনোদনকল্পে আপনার নৈপুণ্য-প্রদর্শনই শিল্প। চিত্রকর যখন চিত্র অঙ্কিত করে—ভাস্কর যখন মূর্ত্তি গঠিত করে তখন সে যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া রচনা করিয়াছে সেই ভাবে সেই রচনা বুঝিবার মত দর্শকের কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই কল্পিত দর্শক-সমাজের প্রশংসা তাহাকে উৎসাহিত করে। সেই দর্শক-সমাজের কল্পনা ব্যতীত শিল্পী কার্য্য করিতে পারে না। চিত্রকর যুবক যখন আপনার রচিত সেই সুন্দরীর চিন্তায় তন্ময়, তখন শিল্পপ্রদর্শনী মুক্ত হইল। চিত্রকর চিত্রখানি প্রদর্শনীতে দিল।

"তখন তাহার চিত্র বিক্রয়ের ইচ্ছা ছিল না। তাহার চিত্র বিশেষ প্রশংসিত হইল। সেই প্রশংসার কিরণে শিল্পীর হৃদয়ে আনন্দশতদল বিকশিত হইয়া উঠিল। তাহার সেই মানস-প্রতিমা—সেই কত সুদীর্ঘ দিন—কত নিদ্রাহীন নিশার কল্পনার ফল—সর্ব্বজনের প্রশংসা লাভ করিয়াছে—তাহার খ্যাতি মুখে মুখে। ইহার অপেক্ষা সুখ আর কি আছে?

"এই সময় একটি ঘটনা ঘটিল; শিল্পীর বিধবা জননী পীড়িতা হইলেন্। তিনি প্রথমে সে দিকে মনোযোগ দিলেন না; ফলে পীড়া দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল। শিল্পীর চিন্তার অবধি রহিল না। সে তাঁহার চিকিৎসায় আপনার ক্ষমতার অধিকও করিতে লাগিল। মানুষ প্রাণের টানে সব করিতে পারে,—সব করিয়া থাকে।

"শকুন্তলার চিত্র অঙ্কন আরম্ভ করিবার প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিল্পী সেই চিত্রের কল্পনাতেই বিভোর ছিল, অন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। ফলে সামান্য সঞ্চয় নিঃশেষিত হইয়াছিল। এখন জননীর চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। সম্বল কেবল সেই চিত্র। এই সময় অভিজ্ঞদিগের নিকট সেই চিত্রের অসাধারণ প্রশংসা শুনিয়া এক জন ধনী তাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি শিল্পের বিশেষ কিছু বুঝিতেন না, কেবল মার্জ্জিতরুচি, শিল্পবিষয়ে বোদ্ধা বলিয়া পরিচিত হইবার প্রলোভনে চিত্রখানি কিনিতে উদ্যত হইলেন। তিনি চিত্রখানির জন্য যে মূল্য দিতে সম্মত হইলেন তাহাতে সে অবস্থার দরিদ্র চিত্রকরের পক্ষে চিত্র বিক্রয় না করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

"সে চিত্রখানি বিক্রয় করিল। তাহার হৃদয়ে যেন তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাত অনুভূত হইল। কিন্তু উপায় নাই। সে চিত্র বিক্রয় করিল,—বিক্রয় করিয়া কাঁদিল। তাহার জননী পুত্রের অবস্থা দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিলেন; কারণ জানিয়া বলিলেন, 'তবে চিত্রখানি বিক্রয় করিলি কেন? বিক্রয় করিয়া কায নাই; চিত্রখানি ফিরাইয়া আন্।' চিত্রকর রোগ-কাতরা জননীকে চিত্রখানি বিক্রয়ের প্রকৃত কারণ বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে উঠিয়া কক্ষান্তরে গেল—কাঁদিয়া মনের গুরু ভার হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ যাতনা কিছু প্রশমিত করিল।

"এই ভাবে কয়মাস কাটিল। লব্ধ অর্থ ফুরাইয়া আসিল। এই সময় সে জননীর চিকিৎসার জন্য অর্থসংগ্রহচেষ্টায় আমার পিতার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিল। সে এত অল্প দিনে সে প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছিল যে, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সেই পারিশ্রমিকে জননীর চিকিৎসা চলিতে লাগিল। চিত্রকর স্বয়ং অক্লান্ত যত্নে জননীর সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; সে জননীকে বাঁচাইতে পারিল না।

৫

"জননীর মৃত্যুতে চিত্রকর জগৎ অন্ধকার দেখিল। সংসারের কার্য্যে সে যেমন অনভিজ্ঞ তেমনই অপারগ। দারুণ শোক ও পদে পদে অসুবিধা ভোগ করিয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িল।

"শোকের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে সে আবার চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিলেই সেই মানস-প্রতিমার কথা মনে পড়িত; চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত; অঙ্গুলি হইতে তুলিকা পড়িয়া যাইত।

"এই অবস্থায় কয় দিন গেল তাহার পর সে সেই চিত্র আবার অঙ্কিত করিতে বসিল। হায় দুরাশা! সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। হৃদয়ে কোন ভাব কোন চিন্তা একবার যেরূপে ফুটিয়া উঠে, আর কখন সেই রূপে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। তাহার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যদি হারাইয়া যায় তবে গ্রন্থকার যত চেষ্টাই করুন না—আর ঠিক সেই গ্রন্থের রচনা করিতে পারেন না। চিত্রকর একখানি অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি অঙ্কনের চেষ্টা করিলে প্রতিলিপিতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক বারের চেষ্টা ভিন্ন ফল প্রসব করে।

"চিত্রকর যে চিত্র অঙ্কিত করিল তাহা সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বের সে চিত্র নহে। আমি সে চিত্র দেখিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতে পাই নাই। মানস-সুন্দরীর যে চিত্র সে একবার চিত্রপটে প্রতিফলিত করিয়াছিল তাহার নিকট এ চিত্র ম্লান বোধ হওয়ায় শিল্পী শেষ চিত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল।

"সে চিত্র নষ্ট করিবার পর চিত্রকর একান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সে আর একবার প্রথম চিত্রখানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এক দিন নিশীথে অনিদ্রাকাতর চিত্রকরের হৃদয়ে সেই ব্যাকুলতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সেই উজ্জ্বল নয়ন, সেই কোমল ওষ্ঠাধর, সেই বিস্রস্ত কুন্তল তাহার সেই মানস-সুন্দরী যেন সত্যসত্যই তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। সে আহ্বানে সে স্থির থাকিতে পারিবে কি?

"শেষে তাহার পক্ষে সে ব্যাকুলতা নিবারণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। সে প্রবল ইচ্ছার গতিরোধ করিতে পারিল না।

"যে ধনী তাহার চিত্রপট ক্রয় করিয়াছিলেন চিত্রকর স্বয়ং যাইয়া তাঁহার কক্ষে কোন্ স্থানে ছবিখানি টাঙ্গাইলে উপযুক্ত আলোকপাতে চিত্র সুন্দর

দেখাইবে তাহা বুঝিয়া ছবি টাঙ্গাইয়া দিয়া আসিয়াছিল। সেই নিশীথে সে আপনার বিজন গৃহ ত্যাগ করিয়া সেই ধনীর গৃহে গেল। তখনও সিংহদ্বার মুক্ত,—দ্বাররক্ষক কার্য্যান্তরে কোথায় গিয়াছে। চিত্রকর গৃহে প্রবেশ করিল। কোন্ কক্ষে চিত্র ছিল চিত্রকর তাহা জানিত—পথও জানিত। সে সেই পথে অগ্রসর হইল। সকলেই সুপ্ত; গৃহে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। চিত্রকর দ্বিতলে গেল। সোপানের উপর বৈঠকখানাঘরের দ্বার ভেজান ছিল। সে কক্ষে প্রবেশ করিল।

"চিত্রকরের সঙ্গে দেশলাই ছিল। একটি কাঠি জ্বালিয়া সে একটি গ্যাসদীপ প্রজ্বালিত করিল। কিন্তু সে দিক হইতে চিত্রপটে যথোপযুক্ত আলোকপাত হয় না দেখিয়া সে কোন্ দীপটি জ্বালিবে তাহাই দেখিতেছিল, এমন সময় ভৃত্যগণ আসিয়া তাহাকে ধৃত করিল।

"চিত্রকর লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। বাসনার যে প্রবল উত্তেজনায় সে এ কার্য্য করিয়াছিল তাহাতে অতর্কিত আঘাত লাগিল। সে কি করিয়াছে! এখন সে কি বলিয়া আপনার কার্য্যের সমর্থন করিবে? সে সত্য কথা বলিলে কে বিশ্বাস করিবে? তাহার সেই চিন্তা—সেই ব্যাকুলতা সে সব অপরে বুঝিবে কি? তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার কার্য্যের সমর্থনে কোন কথাই বলিল না। সে চোর বলিয়া ধৃত হইল। সে বিচারালয়েও আত্মপক্ষসমর্থনের কোন চেষ্টা করে নাই—করিতে ইচ্ছুকও ছিল না।

৬

"আমি চিত্রকরের কথা শুনিলাম; তাহাকে সান্ত্বনা দিলাম—আশা দিলাম, তাহাকে মুক্ত করিব। তখন আমি সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ—আমার যুবক-হৃদয়ে ভাবের প্রাবল্য; আমি তখনও সহানুভূতি সঙ্কুচিত করিতে শিখি নাই। আমি চিত্রকরের দুঃখে একান্ত দুঃখিত হইলাম। বিদ্যালয়ে ইচ্ছাশক্তি কর্ত্তৃক মানবের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবার কথা পাঠ করিয়াছিলাম; তাহার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিলাম।

"যথাকালে মোকর্দ্দমা উঠিল। চিত্রকর কাঠগড়ায়; কয়দিনে কি পরিবর্ত্তন! দেখিয়া আমার ভয় হইল। সে একবারও মুখ তুলিল না। সে যেন কি ভাবিতেছিল—কোন দিকে কিছু লক্ষ্য করিতেছিল না।

"আমি ইচ্ছাশক্তি কর্ত্তৃক চিত্রকরের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবার কথা বলিয়া

তাহার দৃষ্টান্ত দিতে লাগিলাম; সাগ্রহে তাহাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমি যে জয়ী হইব তাহাতে আমার সন্দেহ মাত্র ছিল না। আমার বক্তৃতার মধ্যভাগে অপর পক্ষের বৃদ্ধ উকীল উঠিলেন, হাসিয়া—বিদ্রূপব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, বিচারককে বলিলেন, 'আমার এই বন্ধু অতি অল্পদিন বিদ্যালয় ছাড়িয়াছেন। তিনি যে বিদ্যালয়ে নাই—আদালতে উপস্থিত একথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে। দর্শনশাস্ত্রের কথা বাদ দিয়া আইনের কোন কথা থাকিলে তিনি তাহাই বলুন।'

"তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আমি নূতন ব্রতী। তাঁহার এই আচরণ নিতান্ত নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইল। আমি বক্তৃতার মধ্যভাগে এরূপ বাধাপ্রাপ্তির আশঙ্কা করি নাই; থতমত বোধ করিলাম। সমস্ত আদালতে হাস্যধ্বনি শুনা গেল। আমি লজ্জায়—ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলাম।

"যে বিচারকের নিকট মোকর্দ্দমার বিচার হইতেছিল, তিনি বৃদ্ধ; বয়সের নিয়মে তাঁহার নির্দ্ধারিত কার্য্যকাল শেষ হইয়া গিয়াছিল, সরকারের অনুগ্রহে তিনি তখনও চাকরী করিতেছিলেন। দুষ্ট লোকে বলাবলি করিত, চাকরী আরম্ভকালেও তিনি বয়স কম লিখাইয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল অপরাধীদিগের সহিত ব্যবহারের ফলে আপনার গৃহিণী ব্যতীত অপরের সাধুতায় তাঁহার বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহার উপর আবার তিনি অত্যন্ত শাস্তিদানপ্রিয় ছিলেন। তিনি আমার কোন কথায় কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করিলেন না; চিত্রকরকে এক পক্ষের জন্য কারাগারে পাঠাইলেন। চিত্রকর আর ফিরিয়া আইসে নাই।

* * * * * * * * * * *

"এদিকে সেই মোকর্দ্দমা হইতে আদালতে সকলে আমাকে বিদ্রূপ করিয়া 'অধ্যাপক' বলিতে লাগিল। মক্কেল পণ্ডিত উকীল চাহে না, যে উকীল যে উপায়েই হউক জয়ী হইতে পারেন তাঁহারই সন্ধান করে—তাঁহার অবলম্বিত উপায়ের বিষয় বিচার করে না। কাযেই তাহারা আর 'অধ্যাপককে' মোকর্দ্দমা দিত না। এই ত অবস্থা। তাহার উপর বিদ্রূপ। অগত্যা আমি আলিপুর ত্যাগ করিয়া হাইকোর্টে আসি।"

আমি বলিলাম, "তোমার কপাল খুলিল। তোমার পক্ষে সেই হইতেই সৌভাগ্যের আরম্ভ হইল।"

আমরা সকলেই হাসিলাম।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শিখ ধর্ম্ম।

মিঃ ম্যাকালিফ ইতঃপূর্ব্বে ভারতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সিভিলিয়ান ছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মিঃ ম্যাকালিফ সাহিত্য-চর্চ্চায় নিরত রহিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি শিখরাজন্যবর্গের অর্থসহায়তায় শিখধর্ম্ম নামক একখানি গ্রন্থ প্রণীত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ; উহা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। ইংলণ্ডীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর পরামর্শে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ইহা প্রকাশিত করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সরল, সুন্দর ও ওজস্বিনী; শিখধর্ম্মের অভ্যুদয়, বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে অনেক কথাই এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শিখগুরু-দিগের জীবনকথা ও উপদেশমালা এই গ্রন্থে সযত্নে সঙ্কলিত হইয়াছে। এতদিন শিখধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক তথ্য ইংরেজীভাষাভাষী জনসাধারণের নিকট নিভৃত গুহায় নিহিত ছিল, মিঃ ম্যাকালিফের যত্নের ও অধ্যবসায়ের ফলে আজ তাহা দীপ্ত দিবালোকে নীত হইয়াছে।

পূর্ব্ববতন গ্রন্থকার।

মিঃ ম্যাকালিফের পূর্ব্বে অন্য কোনও য়ুরোপীয় গ্রন্থকারই ইংরেজী ভাষায় শিখধর্ম্মসম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ লিখিয়া যায়েন নাই। মিঃ কানিং-হাম শিখদিগের ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে শিখজাতির ইতিহাসই বিবৃত আছে, শিখ ধর্ম্মের বিবৃতি নাই। শিখজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে আরও কয়েক খানি সুন্দর গ্রন্থ আছে, কিন্তু শিখ ধর্ম্মের বিস্তৃত বিবরণসম্বলিত বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় এই নূতন। ইতঃপূর্ব্বে ডাক্তার ট্রাম্প (Trumpp) নামক জনৈক জর্ম্মণ মিশনরী শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পুস্তক নানারূপ ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ ছিল। অধ্যাপক মোক্ষমূলার বলিয়াছেন, "ডাক্তার ট্রাম্পের অনুবাদ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই।" ডাক্তার ট্রাম্পের অনুবাদসম্বন্ধে যে ঘটনা শুনা যায়, তাহা হইতে এই অনুমান সহজ হইয়া পড়ে। ইনি ইণ্ডিয়া অফিস কর্ত্তৃক 'আদি গ্রন্থ' অনূদিত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন শিখ ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান অমৃতসরে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তথা-

কায় রাজপুরুষগণ তাঁহাকে এই কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতে চাহেন। রাজপুরুষগণেরই চেষ্টায় অনেক শিখ ধর্ম্মযাজক ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। সকলে তাঁহার সমক্ষে সমবেত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলেন, "আমি তোমাদিগের অপেক্ষা সংস্কৃত সাহিত্যে অধিক অভিজ্ঞ; সুতরাং তোমাদিগের অপেক্ষা আমি 'গ্রন্থ সাহেব' অধিক বুঝি।" এই কথা বলিয়া তিনি পকেট হইতে চুরুটের বাক্স টানিয়া বাহির করিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখেই ধূমপান করিতে লাগিলেন। চুরুটের ধূমে তাঁহার সম্মুখে সংস্থাপিত 'গ্রন্থ সাহেব' আবৃত হইয়া গেলেন। শিখগণ 'আদি গ্রন্থ'কে অত্যন্ত সম্মান এবং গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ ধর্ম্ম গ্রন্থকে 'শ্রী আদি গ্রন্থ সাহেব' বলিয়া থাকেন। শিখেরা তাম্রকূটের ধূমকে অত্যন্ত অপবিত্র বলিয়া মনে করেন। শিখ জ্ঞানিগণের সম্মুখে অজ্ঞানান্ধ ডাক্তার ট্রাম্প কর্ত্তৃক 'গ্রন্থ-সাহেব' অপবিত্র ধূমে পরিবৃত হইলেন দেখিয়া তাঁহারা ক্ষোভে ও রোষে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর আর তাঁহারা ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন নাই। অগত্যা ডাক্তার ট্রাম্প শিখ জ্ঞানিগণের সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইয়া 'আদি-গ্রন্থ' খানি লইয়া জর্ম্মনীর মিউনিক সহরে গমন করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আদি-গ্রন্থের' অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সমগ্র 'আদি-গ্রন্থের' অনুবাদ করেন নাই। তাঁহার অনুবাদে সমগ্র 'আদি গ্রন্থের' আট ভাগের এক ভাগ অনূদিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তিনি স্বয়ং আদি-গ্রন্থের অনেকস্থলে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহার উপর ইংরেজী ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল না। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন; সুতরাং অন্য ধর্ম্মবক্তৃগণের উপর তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার সেই স্বাভাবিক বিদ্বেষ পরিস্ফুট হইতে দিয়াছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রণীত শিখধর্ম্মসম্পর্কিত গ্রন্থ যে ভ্রম-প্রমাদে পূর্ণ হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? ডাক্তার ট্রাম্পের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিন্ন শিখধর্ম্ম সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে য়ুরোপীয় ভাষায় অন্য কোনও পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। অতএব মিষ্টার ম্যাকলিফই য়ুরোপীয় ভাষায় শিখ ধর্ম্মের প্রথম বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থকার,—একথা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে।

বিষয় বিন্যাস।

মিঃ ম্যাকালিফ কি ভাবে তাঁহার গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়গুলি বিন্যস্ত করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বপ্রথমে তাহার পরিচয় প্রদান করিলাম। তিনি এই ছয় খণ্ডে বিভক্ত পুস্তকের প্রথম পাঁচ খণ্ডে দশ জন শিখগুরুর জীবন-বৃত্ত ও উপদেশমালা প্রদান করিয়াছেন। সকল শিখ গুরুর উপদেশ লিখিত ও রক্ষিত হয় নাই। সুতরাং যাঁহাদের লিখিত উপদেশ বর্ত্তমান আছে, জীবন-বৃত্তের সহিত কেবল তাঁহাদের উপদেশ এই গ্রন্থে অনুদিত হইয়াছে। যাঁহাদের লিখিত উপদেশ নাই, তাঁহাদের কেবল জীবনকথাই প্রদত্ত হইয়াছে। ষষ্ঠ খণ্ডে "ভাগত" দিগের জীবন কথা ও উপদেশ আছে। ভক্ত এই কথা হইতে "ভগত" বা "ভাগত" এই কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ভক্ত কথা হইতে "ভকত" কথার উৎপত্তি। কালক্রমে স্থানবিশেষে ক স্থানে গ উচ্চারিত হয়। ইহা হইতেই "ভগত" বা "ভাগত" কথা উৎপন্ন হইয়াছে। গুরু নানকের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতে যে সমস্ত একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম-সংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই শিখগণ কর্ত্তৃক "ভাগত" নামে অভিহিত। জয়দেব, নামদেব, রামানন্দ, কবীর ও সেখ ফরিদই ভাগতগণের মধ্যে বিলক্ষণ যশস্বী। অন্যান্য ভাগতের জীবন-কাহিনীর সহিত ইঁহাদের জীবন-কাহিনীও আলোচ্য পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিন্যস্ত হইয়াছে। ইঁহাদের উপদেশমালা আংশিকভাবে গুরু নানক সাহেবের চিন্তাস্রোতঃ একেশ্বরবাদের দিকে প্রধাবিত করিয়া দিয়াছিল একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

প্রথম গুরু।

মিঃ ম্যাকালিফ লিখিয়াছেন যে, পঞ্চনদ প্রদেশের লাহোরের সন্নিহিত তালওয়ান্দী গ্রামে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে শিখ জাতির আদি গুরু মনস্বী ও মহাপ্রাণ নানক সাহেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে একটু মতভেদও দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, তালওয়ান্দী গ্রামে গুরু নানকের পিতৃদেব বাস করিতেন বটে, কিন্তু তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া কনকচ্ছ গ্রামে তাঁহার মাতামহের গৃহই পূত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ন্যায় পঞ্চনদ প্রদেশেও সাধারণতঃ কন্যা প্রথম গর্ভবতী হইলেই পিতৃগৃহে নীতা হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে প্রমাণ অত্যন্ত বিসংবাদী। কিন্তু নানক এই নামই যেন তাঁহার মাতামহগৃহে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রমাণপ্রদান করিতেছে। যে সকল বালক মাতামহগৃহে ভূমিষ্ঠ

হয়, ঐ অঞ্চলে সেই সকল বালকের নাম সাধারণতঃ নানক রাখা হইয়া থাকে। ঐ অঞ্চলে মাতামহ ও মাতামহীকে "নান্‌কে" বলা হয়। তদনুসারে মাতামহগৃহে জাত বালকের নাম সচরাচর নানক ও বালিকার নাম নানকী রাখা হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের মধ্যে এই দুই নাম বিলক্ষণ প্রচলিত। যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা গুরু নানকের জন্মগ্রাম লইয়া বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। সমস্ত পঞ্চনদ ভূমি যাঁহার পদরেণুতে পূত হইয়াছে, সেই মহাত্মার জন্মগ্রাম যে স্থানেই হউক না কেন, তিনি সমগ্র পঞ্চনদেরই তুল্য গৌরবের ধন। মহাত্মজীবনের বাল্যাবস্থার অনেক ঘটনা অলৌকিক, অসামান্য ও অনৈসর্গিক ব্যাপারের সহিত বিজড়িত। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের জীবনেও এমন অনেক লোকাতীত ব্যাপারের বর্ণনা পাওয়া যায়। মিঃ ম্যাকালিফ গুরু নানকের জীবনের অনেক আলৌকিকত্ব-বিজড়িত ঘটনা গ্রন্থে বর্ণিত করিয়াছেন। বাল্যকালেই নানক অসাধারণ প্রজ্ঞালাভ করিয়াছিলেন। আমরা এস্থানে তাঁহার সেই অমানুষী প্রজ্ঞার কথা আলোচনা করিব না। তবে তাঁহার জীবন কথায় যে অলৌকিকত্ব আছে, তাহার দুই একটি পাঠককে উপহার দিব। নানক বাল্যকালে একদা নিদাঘে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে দিনমণি পশ্চিমাকাশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বৃক্ষচ্ছায়া সকল পূর্ব্বদিকে হেলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু যে বৃক্ষচ্ছায়ায় মহাত্মা নানক নিদ্রিত ছিলেন, সে বৃক্ষের ছায়া নিশ্চলভাবে থাকিয়া তাঁহাকে প্রখর দিবাকর-কর হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। আর একদিন নানক একস্থানে অকস্মাৎ নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমে রৌদ্র অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠে। পাছে নিদ্রিত মহাত্মার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই জন্যই এক ফণী ফণা ধরিয়া রৌদ্র হইতে তাঁহার মস্তক রক্ষা করিতে লাগিল। নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক ব্রাহ্মণ নানককে উপনীত করিতে আসিয়াছিলেন। নানক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ভগবানের নামোচ্চারণই যজ্ঞোপবীত, আমি অন্য উপবীত লইতে চাহি না"। নানক সম্বন্ধে এইরূপ নানা কথা মিষ্টার ম্যাকালিফ তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ধর্ম্মমত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে গুরু নানক পঞ্চনদ প্রদেশে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তিনি বেদ, পুরাণ বা কোরাণের প্রামাণিকতা স্বীকার করিতেন

না। তিনি বলিতেন, হিন্দু ও মুসলমানে কোনও পার্থক্যই নাই; ভগবানের উপাসনা করিতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। তিনি জাতিভেদ, প্রতিমাপূজা, তীর্থযাত্রা, সহমরণ, এবং অবরোধ-প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। হিন্দু দেবদেবীর উপর তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। মাংসাহার তাঁহার অনুজ্ঞাত। কিন্তু তিনি কর্ম্মফলে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম্মের ফলে জীব ইহজন্মে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বেশ-ভূষা কতকটা হিন্দুর ও কতকটা মুসলমানের বেশভূষার ন্যায় ছিল। তিনি মস্তকে মুসলানদিগের ন্যায় টুপি পরিধান করিতেন এবং তাহার উপর অস্থির মালা জড়াইয়া রাখিতেন; আবার হিন্দুর মত কপালে সিন্দুরের কোঁটা কাটিতেন। তাঁহার ঐকান্তিকতা, সরলতা, নিরপেক্ষতা, সত্যপ্রিয়তা, সাধুতা ও ভক্তিপ্রবণতায় সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার নিকট রাজার ও ভিখারীর সমান সম্মান ছিল। শুনা যায়, বাবর সৈখাদীপুর নামক একটি নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নানকের পূতচরিত্রকথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ঐ নগরে এমন এক জন ধার্ম্মিক লোক আছেন জানিতে পারিলে আমি কখনই তাহা ধ্বংস করিতাম না।"

অভিব্যক্তি।

পঞ্চনদ প্রদেশে কি প্রকারে এই অভিনব ধর্ম্মমতের অভিব্যক্তি হইল তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। অকস্মাৎ কোথাও কোনও মতেরই বিকাশ হয় না। অল্পে অল্পে আভ্যন্তরীণ ও পরিপার্শ্বিক কারণে সর্ব্বত্রই লোকমতের বিকাশ হইয়া থাকে। যে মনস্বী মহাত্মার মনে সেই লোকমত সর্ব্বাগ্রে প্রতিবিম্বিত হয়—সমুন্নত গিরিশৃঙ্গে ভাস্কর-কিরণের মত যাঁহার মানস পটে প্রথমেই লোকমতের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়—অর্থাৎ যিনি নানাকারণসমুদ্ভূত লোকমতের অগ্রদূতরূপে জন-সমাজে আবির্ভূত হইয়া থাকেন,—সেই সমুন্নতমনা মহাজনই ভগবানের অবতার বলিয়া সম্মানিত ও সম্পূজিত হইয়া থাকেন। নানক শিখ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা। তাঁহারই সমুন্নত মানস-পটে প্রথমে শিখ ধর্ম্মের আলোকরশ্মি

প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে পঞ্চনদ প্রদেশের জনসমাজের মধ্যে এই মত বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত ভাবে ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছিল। তিনি সেই বিক্ষিপ্ত, খণ্ডিত মতকে সংগৃহীত, পূর্ণ, ও পদ্ধতিবদ্ধ করিয়া তাহাকে একটি অখণ্ড, পূর্ণ, ও শৃঙ্খলাযুক্ত ধর্ম্মমতে পরিণত করিয়া জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই ধর্ম্মমত অসম্পূর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন ভাবে পঞ্চনদের জনসমাজে কিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

পঞ্চনদ প্রদেশই ভারতীয় ধর্ম্মমতের আদি স্থান। এই স্থানই অতি প্রাচীন কালে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও কুরুবর্ষ নামে অভিহিত ছিল। এই স্থানেই প্রথমে আর্য্যগণের বেদগানে ও যজ্ঞধূমে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত ও পূত হইয়াছিল। বৈদান্তিক ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই স্থানে আবির্ভূত না হইলেও এই স্থানে অনেক দিন স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। বৈদান্তিক ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মেরই অংশীভূত। বেদান্ত বেদের উপনিষদ্ ভাগের দার্শনিক বিচারমাত্র। সুতরাং পঞ্চনদ প্রদেশ বৈদান্তিক ধর্ম্মের ক্ষেত্র ইহা অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম কীটকদেশে প্রথমে আবির্ভূত হইলেও ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা পঞ্চনদ প্রদেশেই বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পঞ্চনদ প্রদেশে বহুসংখ্যক বৌদ্ধস্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এক সময় তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যখন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন, তখন তাহার তরঙ্গের কল্লোল ও জয়নিনাদকোলাহল সুদূর পঞ্চনদ প্রদেশ পর্য্যন্ত শ্রুত হইয়াছিল। তাহার কিছুদিন পরেই সেই বেগবান্ তরঙ্গ পঞ্চনদতটে প্রবল বেগে অভিঘাত করিতে থাকে। সেই তরঙ্গাভিঘাতে পঞ্চনদের বৌদ্ধধর্ম্ম শিথিলমূল হইয়া পরে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সময় ১০০১ অব্দে গজনীর মামুদ আফগান রাজ্যের মধ্য দিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি কিঞ্চিন্ন্যূন ত্রিংপবর্ষকাল পঞ্চনদ প্রদেশকে উৎপীড়িত ও পর্য্যুদস্ত করিয়া পরিশেষে লাহোরে একজন শাসনকর্ত্তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে পঞ্চনদভূমি মুসলমান রাজ্যে পরিণত হয়। এই সময় ও ইহার অব্যবহিত পরে যে সমস্ত মুসলমান পঞ্চনদ প্রদেশে আসিয়া বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পারসিক

জাতীয় ছিলেন। তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মমতের সহিত সুফি ধর্ম্ম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল। এই সুফি ধর্ম্মের সহিত বৈদান্তিক ধর্ম্মের অনেকটা সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। জেতা মুসলমানদিগের নিকট হইতে পঞ্চনদ প্রদেশবাসীরা অজ্ঞাতে এই সুফি ধর্ম্মমত-বিজড়িত মুসলমান ধর্ম্মের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে বৈদান্তিকদিগের মায়াবাদ, বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণবাদ ও সাম্যবাদ বা তুল্যাধিকারবাদ, হিন্দুদিগের কর্ম্মফলবাদ, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, মুসলমানদিগের একেশ্বরবাদ, সুফি ধর্ম্মের অজ্ঞেয়তাবাদ ও প্রহেলিকাবাদ একে একে পঞ্চনদ প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের মনে গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিল। ইহার পর পঞ্চনদ প্রদেশে যে সমস্ত লোকমত আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতেই ঐ সকল মতের অল্পবিস্তর ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন রামানুজের ও রামানন্দের ধর্ম্মমতও পরে পঞ্চনদ প্রদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের ধর্ম্মমতেও পূর্ব্বগামী ধর্ম্মমতের কিঞ্চিৎ ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। পঞ্চনদ অঞ্চলের ভাগত গোরক্ষনাথের ও কবীরের প্রতিষ্টিত মতে ঐ সকল ধর্ম্মমতের গাঢ় ছায়া পড়িয়াছিল। কবীর রামের উপাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মূর্ত্তি-পূজার প্রতিকূল ও মানস পূজার অনুকূল মত প্রচারিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণবাদ ও সাম্যবাদ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমতে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। বর্ণাশ্রমীরা যেরূপ জাতি ও গুণভেদে অধিকারভেদ নির্দ্দিষ্ট করেন, কবীর তাহা করেন নাই; তাঁহার মতে ঈশ্বরোপাসনায় জাতিভেদ বা অধিকারভেদ নাই। ইনি বেদাদি গ্রন্থের আপ্তবচনত্ব স্বীকার করিতেন না। কোরাণকেও ইনি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই ইঁহার দৃষ্টিতে সমান ছিল; ইনি সকলকেই সমানভাবে উপদেশ দিতেন। ইনি ও ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাগতগণ বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত ভাবে যে মত প্রচারিত করিয়াছিলেন, গুরু নানক তাহাই একত্রিত, প্রস্ফুটিত, মার্জ্জিত ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া,—যাহার অভাব ছিল তাহার গঠন করিয়া,—যাহা অপরিস্ফুট ছিল তাহা পরিস্ফুট করিয়া,- যাহা আপাততঃ দৃষ্টিতে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া মনে হইত তাহার সামঞ্জস্য করিয়া এই অভিনব শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও অমানুষিক কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈশ্বর সর্ব্বঘটে, সর্ব্বক্ষেত্রে বিরাজমান রহিয়াছেন, মানুষের আত্মা

জগদীশ্বরেরই অংশমাত্র, মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে, আমিই সেই জগদীশ্বর (সোঽহং) তখনই সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই শিখধর্ম্মের মূলমন্ত্র। মায়াকর্ত্তৃক উপহত হইলে জীবের পাপসঞ্চার হয়, আত্মজ্ঞান লাভ করিলে মায়ার বন্ধন কাটিয়া যায়,—ইহাই শিখধর্ম্মের প্রধান উপদেশ। এই ধর্ম্ম-মতে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধে ভেদ নাই; সকলেই সমান। সুতরাং শিখ ধর্ম্ম লোকমত ও লোকমর্য্যাদার পোষক। ভগবানের নাম জপ করিলে মানুষ মায়ার বন্ধন কাটাইতে পারে ও আত্মজ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হয়, সেই জন্য সর্ব্বদা ভগবানের নাম জপ করা আবশ্যক। হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, দীনদুঃখীই হউন, আর রাজামহারাজই হউন, সকলেই পরমাত্মার অংশ, সুতরাং সকলেই সমান। কেবল মায়ার বশে মানুষ ভ্রান্ত হইয়া ছোটবড়, উচ্চনীচ প্রভৃতির কল্পনা করিয়া থাকে। শিখধর্ম্মের এই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে গৃহীত। গুরু নানক এই মতকে পরিপুষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলেন।

অন্যান্য গুরু।

১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গুরু নানকের তিরোভাব হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার ভক্ত ভৃত্যকেই শিখদিগের গুরুত্বে নিয়োগ করিয়া যায়েন। ইনি গুরু অঙ্গদ নামে খ্যাত। গুরু অঙ্গদের পর গুরু অমর দাস ও গুরু রামদাস। গুরু রামদাস মসন্দ নিয়োগপ্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। শিখধর্ম্মের প্রচারও ভক্ত শিখদিগের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া গুরুর নিকট প্রেরণ করাই ইঁহাদের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয়। শেষে মসন্দগণ অত্যন্ত অসাধু হইয়া উঠেন, সেই জন্য পরে শিখ-দিগের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। গুরু রামদাসই আকবরের নিকট হইতে ভূমি উপহার পাইয়াছিলেন এবং সেই ভূমির উপর বিখ্যাত অমৃতসর খনিত করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহারই পুত্র ও উত্তরাধিকারী গুরু অর্জ্জুন এই সরোবর-খননকার্য্য শেষ করেন। গুরু অর্জ্জুনই শিখ-গুরুগণের উক্তি ও "ভাগত" গণের উক্তি সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিয়া উহা 'আদিগ্রন্থ' নামে প্রকাশিত করেন। এই 'আদি গ্রন্থই' শিখগণের ধর্ম্মগ্রন্থ। শিখগণ এই গ্রন্থকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকেন। ইহাতে সাত জন গুরুরপ্রণীত গাথা লিপিবদ্ধ আছে। বলা বাহুল্য, গুরু অর্জ্জুনের পরবর্ত্তী গুরুগণের উক্তিও এই গ্রন্থে পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অর্জ্জুনের পর পাঁচ জন গুরু শিখদিগের ধর্ম্মকার্য্যে নেতৃত্ব করিয়া যায়েন।

পরিবর্ত্তন।

ষষ্ঠ হইতে নবম গুরুর সময়ে মুসলমানদিগের সহিত শিখদিগের ঘোর বিরোধ বাধিয়া উঠে। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ সশস্ত্ররক্ষিপরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। যাহা হউক. মুসলমানদিগের সহিত সংঘর্ষে ও মুসলমানদিগের উৎপীড়নে শিখজাতির সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। নবম গুরু টেগ বাহাদুরই আরঙ্গজেবের সময়ে ভারতে য়ুরোপীয়গণের অধিকার-কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যায়েন। এই টেগ বাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখজাতির ইতিহাসে নূতন যুগের প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি শিখদিগকে সামরিক জাতিতে পরিণত করিয়া যায়েন। ইনি শিখদিগের মধ্য হইতে খাল্‌সা (বিশুদ্ধ) নাম দিয়া একদল সেনা গঠিত করেন। ইহার পূর্ব্বে শিখধর্ম্মগ্রহণকালে সকলকে শিখগুরুর পাদোদক পান করিতে হইত ; গুরু গোবিন্দ সিংহ এ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার স্থানে "পহুল" প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। সে প্রথা এইরূপ ; গুরু তাঁহার পাঁচজন ভক্ত ও বিশ্বস্ত অনুচরকে পাশাপাশি উপবেশন করান। তাহার পর কিয়ৎপরিমাণে শোধিত চিনি বা গুড় এক পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করা হয়। ঐ জল একখানি তরবারি দ্বারা আলোড়িত করিয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক উহার কিঞ্চিৎ পান করা হয় এবং কিঞ্চিৎ মস্তকে ও গাত্রে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। এই মন্ত্রপূত জল পান করিলেই শিখধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ হয়। ইনি শিখদিগকে ককারাদি পাঁচটি দ্রব্য সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতে বলিয়া যায়েন। সেই পাঁচটি ককারাদি পদার্থ ;—(১) কেশ ; শিখগণ দীর্ঘ কেশ রাখিয়া থাকেন। (২) কাঙ্গা বা কাঁকুই ; চিরুণী, শিখগণ মস্তকে চিরুণী রাখিয়া থাকেন ; (৩) কৃপাণ ; (৪) কাছ ; এবং (৫) কড়া বা লৌহবলয়। অস্ত্রশিক্ষাই শিখদিগের গুরু-উপদিষ্ট ধর্ম্ম। যে সকল শিখ গুরুগোবিন্দের মতে এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সিংহ নামে অভিহিত। ইঁহাদের আর একটি নাম "খাল্‌সা"। যাঁহারা গুরু-গোবিন্দের সমস্ত আদেশ পালন পূর্ব্বক সামরিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন না, সেই সকল শিখ সহিজদারী নামে অভিহিত।

গুরুগোবিন্দ সিংহ 'দশওয়েন পাদশাহী' নামক আর এক খানি শিখ-ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গুরুগোবিন্দ মৃত্যুকালে বলিয়া যায়েন যে, আর

কোনও ব্যক্তি শিখগণের গুরুরূপে বৃত হইবেন না। 'আদিগ্রন্থ' ও 'দশওয়েন পাদসাহী' গ্রন্থই শিখদিগের গুরুস্থানীয় হইবে। তদবধি শিখগণ 'আদি-গ্রন্থ'কে গুরুর ন্যায় সম্মান করেন।

সহিজদারী শিখগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। ইঁহারা ইদানীং কয়েকটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তামাক, ভাঙ্গ, মদ্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের সেবা শিখধর্ম্মে নিষিদ্ধ। ইহাঁদের জাতকর্ম্ম, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদির সময় 'আদিগ্রন্থ' ও 'দশওয়েন পাদশাহী' হইতে শ্লোক, বচন ও উক্তি পঠিত হয়। ইহা ভিন্ন ইঁহাদের অন্য মন্ত্র নাই। মস্তক অনাবৃত রাখা ইহাঁদের মতে পাপজনক। ইহাঁদের চিতাভস্ম অমৃতসর বা তৎসন্নিহিত যে কোন স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। রাজভক্তি ইঁহাদের ধর্ম্মের দৃঢ় অনুশাসন।

ইদানীং শিখগণ হিন্দুধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। এখন অনেকেই শিখধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

নববর্ষ।

এস এস, নূতন বরষ।
স্নিগ্ধ, শান্ত, অনাবিল, বহে মন্দ উষানিল,
পুষ্পবনে জাগায়ে হরষ;
অন্ধকার যবনিকা অন্তর্হিত, চিত্রে লিখা—
পূর্ব্বাকাশে কনক তপন;
নূতন আলোকে পাখী, কলকণ্ঠে' উঠি' ডাকি',
করিছে তোমার আবাহন।

এস এস নূতন বরষ।
নবীন মুকুল রাজি, হের ফুটিয়াছে আজি,
লভি' তব তরুণ পরশ।
ব্যথিত-তাপিত যা'র, আঁখি ঝরে অনিবার,
তা'রে তুমি দিবে কি সান্ত্বনা।
ব্যর্থ যা'র সর্ব্বসাধ, অদৃষ্টের সনে বাদ,
তুমি তা'র পূরা'বে কামনা?

এস এস, হে বর্ষ নূতন।
অতীত কালিমা মুছি, দাও আজি দিব্য শুচি—
অকলঙ্ক নূতন জীবন।
বিফল সাধনা যত, বুক ভাঙ্গা ব্যথা কত—
কাঁদিব না সে সকল স্মরি';
আজি হ'তে প্রতি দিন, চলিব বিরামহীন,
অনন্ত কর্ত্তব্য পথ ধরি'।

এস এস, হে বর্ষ নূতন।
কোন্ সে অজ্ঞাত দেশে, ছিলে তুমি কোন্ বেশে,
কোন্ ভাবে হেথা আগমন?—
নাইবা জানিনু কভু; হে নব অতিথি, তবু,
করি তোমা সাদরে বন্দন।
যাহা দিবে—সুখ হ'ক, কিম্বা শুধু দুঃখ, শোক,
নতশিরে করিব গ্রহণ।

শ্রীরমণীমোহণ ঘোষ।

বাজী রাও ও মস্তানী।

(বাজি রাওয়ের কলঙ্কমোচন।)

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-রাজমন্ত্রী মহাবীর বাজী রাও, দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি মহম্মদ খাঁন বঙ্গষের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বুন্দেলখণ্ডের বিপন্ন বৃদ্ধ রাজা ছত্রসালকে স্বরাজ্যোদ্ধার-কার্য্যে সহায়তা করেন। বৃদ্ধ রাজা মোগলের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বাজী রাওকে নানা ধনরত্ন দানে পুরস্কৃত ও পরিতুষ্ট করিতে যত্নশীল হয়েন। সেই সময় তিনি মস্তানী নাম্নী একটি সুন্দরী যুবতীকেও বাজী রাওয়ের করে সমর্পন করিয়াছিলেন। এই যুবতী ছত্রসালের মস্তরী নাম্নী কোন মুসলমান রক্ষিতার গর্ভজাত কন্যা। বাজী রাওয়ের রূপ ও গুণের প্রতি কন্যার পক্ষপাত দেখিয়াই হউক, অথবা তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র ভাবিয়া হউক, ছত্রসাল এই কন্যাকে বাজী রাওয়ের হস্তে সমর্পন করেন। বুন্দেলখণ্ডের তওয়ারিখ নামক উর্দ্দূ ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, জিতেন্দ্রিয় বাজী রাও বৃদ্ধ রাজার অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মস্তানীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি এই নৃত্য-গীত-বাদ্য-কুশলা যুবতীর গুণে এরূপ মুগ্ধ হয়েন যে, তজ্জন্য রাজকার্য্যেও তাঁহার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে পারিতেন না। তখন তাঁহার পুত্র বালাজী বাজী রাও ও ভ্রাতা চিমাজী আপ্পা কৌশলে মস্তানীকে বন্দী করিয়া বাজী রাওয়ের নিকট হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মস্তানী পলায়ন-পূর্ব্বক বাজী রাওয়ের সহিত পুনরায় মিলিত হয়। কথিত আছে, এই সকল ঘটনায় মহারাজ শাহু অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ভয় প্রদর্শন করায় ও তাঁহার ভ্রাতা চিমনাজী সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়ায় বাজীরাওয়ের কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইয়াছিল।

এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে মিষ্টার কিংকেড বিগত ১৯০৯ সালের আগষ্ট মাসের 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে An Indian Pampaduor—Mastani ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ঘোর অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেনও বাজী রাওয়ের চরিত্রে অতি গুরুতর মিথ্যা কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে তিনি প্রথমতঃ মস্তানীকে ফ্রান্স দেশের পম্পাদুরের সহিত তুলিত করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ বাজী রাওয়ের পুত্র বালাজী বাজী রাওয়ের প্রতি তাহার অবৈধ প্রণয়ের সন্দেহ করিয়া তাহার চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ মস্তানীর সাহচর্য্যে বাজী রাও সুরাপান করিতে শিখিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং চতুর্থতঃ অনুমান করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত পানদোষই বাজী রাওয়ের অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। (১) শেষোক্ত অনুমান যে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনা-প্রসূত, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার প্রথম সিদ্ধান্তটিও ভিত্তিহীন। কারণ, ফ্রান্সের মাদাম পম্পাদুর যেমন প্রকাশ্য পণ্য বীথিকার রূপজীবিনী ছিল, মস্তানী কখনই সেরূপ ছিল না। সে রূপজীবিনীর কন্যা ছিল কিন্তু তাহার জননী রাজা ছত্রসালের অন্তঃপুরে প্রবেশ-লাভ করায় মস্তানীর পক্ষে জননীর ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বনের সুযোগ বা প্রয়োজন কখনও উপস্থিত হয় নাই। তাহার "জন্মদোষ" থাকিলেও সে কখনও দ্বিচারিণী ছিল না, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। সে বালাজীবাজী রাওয়ের জননীর সপত্নী ছিল ও সকলের নিষেধ অবজ্ঞা করিয়া মধ্যে মধ্যে সুরাপন করিত বলিয়া তরুণ-বয়স্ক বালাজী বাজী রাও তাহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন। পরে তাঁহার গুরুজনেরা মস্তানীকে বন্দী করিয়া বাজী রাওয়ের নিকট হইতে দূরে রাখিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন দেখিয়া ও বিদ্বেষের পরিণাম হিতকর হইবে না ভাবিয়া বালাজী-বাজী রাও মস্তানীর প্রতি কপট স্বভাব প্রকাশ করিতে থাকেন। দুই একখানি প্রাচীন পত্রে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিয়া মিষ্টার কিংকেড বালাজী বাজী রাওয়ের সহিত মস্তানীর অবৈধ প্রণয়ের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন! অনভিজ্ঞ লেখকের হস্তে পড়িয়া এ দেশের ইতিহাসের কতদুর বিকৃতি ঘটিতে পারে, মিষ্টার কিংকেডের বর্ত্তমান প্রবন্ধটি, তাহার একটি উজ্জ্বলদৃষ্টান্ত। তিনি লিখিয়াছেন,—

In her company—as his Chitpawan (কোঁকণস্থ) fellow castemen

(১) মিষ্টার কিংকেড লিখিয়াছেন,—গোদাবরী-তীরবর্ত্তী রাওয়ের নামক গ্রামে বাজী রাও প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু রাওয়ের গ্রাম যে গোদাবরী-তীরে নহে—নর্ম্মদা নদীর তীরে অবস্থিত, ইহা বোম্বাই গেজেটিয়ারের অন্তর্গত খানদেশের বিবরণে (পৃঃ ৪৬৮) দৃষ্টিপাত করিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন। বাজী রাওয়ের মৃত্যু যে নর্ম্মদাতীরে হইয়াছিল, এ কথা গ্রাণ্ড ডফও লিখিয়াছেন।

will, I know, hear with concern—he learnt to regard with favour and to drink with gusto the heady wines of Delhi. * * * And the following extract from a letter (the originals of these letters will be found in the March number of the *Etihas Sangraha*) written by his son Nana Sahib, better known as Balaji II, shows that the fascinations of liquor if not of love had become altogether too much for his distinguished father.

অর্থাৎ "মস্তানীর সহবাসে থাকিয়া বাজীরাও দিল্লীর তীব্র সুরা অতীব প্রীতি সহকারে পান করিতে শিখিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া কোঁকনস্থ ব্রাহ্মণগণ দুঃখিত হইবেন। বাজী রাওয়ের পুত্র নানাসাহেবের বা দ্বিতীয় বালাজীর লিখিত পশ্চাদুদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বাজীরাও একান্ত সুরাসক্ত হইয়া উঠিলেন।" মিষ্টার কিংকেড এস্থলে শুদ্ধ কোঁকণস্থ ব্রহ্মণগণেরই দুঃখিত হইবার কথা লিপিবদ্ধ করায় বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার মতে বাজী রাওয়ের প্রতি হিন্দু মাত্রেই সাহানুভূতি থাকা দূরের কথা, মহারাষ্ট্র দেশের কোঁকণস্থ ভিন্ন অপর কোনও শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরই সহানুভূতি ছিল না।

পূর্ব্বোক্ত ভূমিকার পর মিষ্টার কিংকেড যে পত্রাংশের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই পত্র ও তদ্বিষয়ক অপর তিনখানি পত্র ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের 'ইতিহাস সংগ্রহ' নামক মারাঠী মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয়-বলবন্ত পরসনীস মহাশয় ঐ মাসিক পত্রের সম্পাদন করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, তিনিও ঐ পত্রগুলির মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে গিয়া কয়েক স্থলে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্র দেশের অন্যান্য ঐতিহাসিক লেখকেরা সেই সকল ভ্রম বিশদ প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ পত্রগুলির সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণের মধ্যে বাদানুবাদ আরব্ধ হইবার পর মিষ্টার কিংকেড 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে সমালোচ্য প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি ঐ পত্র-বিষয়ক আলোচনা-পাঠের ক্লেশ স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে বাজী রাওয়ের বিরুদ্ধে সুরাপানের কলঙ্কারোপ করিতে কখনই তাঁহার সাহস হইত না বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি অতীব ব্যগ্রতা-সহকারে বাজী রাওয়ের কলঙ্ক-ঘোষণায় অগ্রসর হইলেন! এই প্রসঙ্গে মূল মারাঠী পত্র সমূহের অনুবাদে তিনি যেরূপ শোচনীয় ভ্রম-সংঘটন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

তিনি প্রবন্ধের মুখবন্ধে যে পত্রাংশের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তৎকৃত অনুবাদ এই ;—

I spoke to *my mother* Saubhagyavati Tai (Bajirao's wife Kashi Bai) *about it (Bajirao's conduct). He then* took an oath in *the most* determined manner that *he* would never touch (liquor) again. *But* every two or *three* days he has had one or two *drinking bouts. Then* I said to him, "what is the value of such an oath ?" *And* I sent by Subharay Jeti, a *most emphatic* message that I should not visit *him* again. At this *he was* very much *ashamed*..............Last night Tai sent for Krishnabhat and told him that when *we* (i. e, *Bajirao and* herself) had gone to the Bhima for the eclipse. Nana and *Mastani* become *very intimate.* To-night at the second watch she came to Nana's *house. And* she *repeated this to him several times. And* people have begun to talk *freely* that Nana and Mastani are great friends. Tai will write this to Swami *(Bajirao),*

অনুবাদের ভ্রমাত্মক অংশগুলি বক্রাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই কয়েক পংক্তির অনুবাদে লেখক কতকগুলি ভ্রম ঘটাইয়াছেন। কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র ঐরূপ কয়েক পংক্তির অনুবাদে এরূপ বহুসংখ্যক ভ্রম-সম্পাদন করিলে, শিক্ষকের হস্তে তাহার কিরূপ লাঞ্ছনা ঘটে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সে যাহা হউক, তিনি এই পত্রকে বাজী রাওয়ের পুত্র নানা সাহেবের লিখিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পত্রখানি কে কাহাকে লিখিতেছে, মূল পত্রে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। যে পদের অনুবাদে তিনি my mother (আমার জননী) লিখিয়াছেন, সেই পদের প্রকৃত অর্থ "মাতৃস্বরূপা"। (My পদটির প্রতিশব্দ মূলে নাই।) এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, বালাজী বাজী রাও (নানা সাহেব) স্বীয় জননীকে পত্র লিখিবার সময় "জননী-স্বরূপা" পদের প্রয়োগ করিবেন, ইহা কি সম্ভবপর হইতে পারে ? তদ্ভিন্ন জনক জননীকে পত্র লিখিবার সময় মহারাষ্ট্র দেশে সাধারণতঃ যেরূপ "পাঠ" লিখিবার প্রথা প্রচলিত আছে ও সেকালেও ছিল, সেরূপ পাঠও এই পত্রে নাই কেন ? ধনশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের কর্ম্মচারীরা প্রভুপত্নীদিগকে পত্র লিখিবার সময় যেরূপ "পাঠের" প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এই পত্রের "পাঠ" সেইরূপ থাকায় বলিতে হয় যে, উহা বালাজী

বাজী রাওয়ের কর্ম্মচারী "বাবু রাও গণেশে"র (যাহাকে মিষ্টার কিংকেড বালাজী-বাজী রাওয়ের confident agent অর্থাৎ বিশ্বস্ত প্রতিনিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার) দ্বারা নানা সাহেবকে লিখিত।

অনুবাদের প্রথম বাক্যের শেষে about it অর্থাৎ "এই বিষয়ে" এই দুইটি পদ লেখক কল্পনা-বলে সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু মূল পত্রে ঐরূপ অর্থবোধক কোনও পদই দৃষ্ট হয় না। কাযেই বন্ধনীর মধ্যগত Baji Rao's conduct এই দুইটি কথাও অনুবাদ হইতে বাদ না দিলে অর্থের বিপর্য্যয় ঘটিবে। প্রকৃত পক্ষে about it এর পরিবর্ত্তে (:—") এইরূপ চিহ্ন প্রদান করিলে পত্রলেখকের মনোভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইত। কারণ, পরবর্ত্তী কয়েক পংক্তিতে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা পত্র-লেখক বাবু রাও গণেশ "তাই" বা বাজী রাওয়ের স্ত্রী কাশী বাঈকে বলিয়াছিলেন—ইহাই তিনি এই পত্রে বালাজী বাজী রাওকে জানাইতেছেন। কিন্তু লেখক কল্পনাবলে অনুবাদে about it এই দুইটি মূল-বহির্ভূত অতিরিক্ত পদের প্রয়োগ করিয়া সমগ্র পত্রের ভাব-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। তাহার পর দ্বিতীয় বাক্যের প্রথমাংশে He then এই দুইটি পদের প্রয়োগে অর্থের সম্পূর্ণ বৈপরিত্য সংঘটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ then পদের অর্থ-দ্যোতক কোনও শব্দের অস্তিত্ব মূল পত্রে নাই। তাহার পর, দ্বিতীয় বাক্যের দুইটি he পদই she হইবে। সেইরূপ চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্যের অন্তর্গত him ও he পদের পরিবর্ত্তে her ও she পদের প্রয়োগ উচিত ছিল।

মারাঠী ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গান্ত ক্রিয়া পদের কর্ত্তৃস্থানীয় সর্ব্বনাম পদ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে—মারাঠী ভাষার এই অতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক সূত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া অথবা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন মিষ্টার কিংকেড্ বাজী রাওকে মদ্য-পানের ও শপথ-ভঙ্গের কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, মস্তানীই আর মদ্য পান করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এবং মস্তানীই সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিল। সুব রাও জেঠের দ্বারা বাবু রাও গণেশ সেই কথা তাহাকে জানাইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি আর মস্তানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। ইহাতে মস্তানী নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছিল। সেই কথা বাবু রাও গণেশ কাশী বাঈকে বলিয়াছেন—এই সকল কথাই তিনি এই পত্রযোগে বালাজী-

বাজী রাওকে জ্ঞাপন করিতেছেন। আলোচ্য পত্রের ইহাই প্রকৃত অর্থ। কিন্তু মিষ্টার কিংকেডের কথায় বাজী রাও ঘোর সুরাসক্তরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন। মূল পত্রের যে বাক্যের অনুবাদে মিষ্টার কিংকেড লিখিয়াছেন—At this he was very much ashamed তাহার প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হওয়া উচিত :—At this she felt very much disgraced। বাজী রাওকে সুরাপায়ী স্থির করিয়াই লেখক নিশ্চিন্ত হয়েন নাই—সেই সুরা যে দিল্লীর বাজার হইতে আনিত হইত, তাহাও তিনি কল্পনা-বলে স্থির করিয়াছেন!

পত্রের এই প্রথমাংশের ন্যায় দ্বিতীয় অংশেও অনুবাদে লেখক অসংখ্য ভ্রমে পতিত হইয়াছে। নিম্নে ঐ অংশের প্রকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইল :—

গত কল্য রজনীযোগে তাই কৃষ্ণং ভট্টকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি যখন গ্রহণোপলক্ষে ভীমা নদীতে স্নানের জন্য গমন করিয়াছিলাম, তখন হইতে নানা ও মস্তানীর মধ্যে খুব সদ্ভাব জন্মিয়াছে। অদ্য রাত্রি দ্বিপ্রহর-কালে সে নানার স্ত্রীর নিকট আসিয়াছিল। এই কথা সব তিনি বিস্তারিতরূপে তাহাকে (কৃষ্ণং ভট্টকে) বলিলেন। লোকেও বলিতেছে যে, নানার ও মস্তানীর মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছে। তাই (কাশী বাঈ) এই সকল কথা প্রভুকে জানাইবেন।"

এই পত্রের শেষ দুই পংক্তির অনুবাদ মিষ্টার কিংকেড প্রদান করেন নাই। সে অংশের অনুবাদ এইরূপ—

"এই কারণে লিখিলাম। পরে যেরূপ আদেশ হইবে, সেইরূপ করিব। মস্তানী এইস্থানে আছে, আমাকে আট দশ দিন পরে মহারাজ শাহুর দরবারে যাইতে হইবে। সে সময়ে মস্তানী গৃহে কিরূপে সংযতভাবে থাকিবেন, তাঁহার জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তাহা লিখিয়া জানাইবেন।"

এই শেষোক্ত পংক্তিকয়টি পাঠ করিলেই মস্তানীর সহিত নানার সদ্ভাব যে কপটতামূলক ছিল, এবং কে কাহাকে এই পত্র লিখিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মিষ্টার কিংকেড বলেন যে, মস্তানীর চরিত্রে বাজী রাওয়ের সন্দেহ উদ্রিক্ত করিবার জন্যই নানা সাহেব তাহার সহিত এই কপট-সখ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফলে মস্তানী তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া উঠিল! অন্ততঃ এই পত্রের শেষার্দ্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছে বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "দ্বিপ্রহর রজনীতে মস্তানী নানার বাড়ীতে গিয়াছিল"—এই বাক্যাংশ পাঠ করিয়াই বোধ হয়, লেখক

নানার সহিত মস্তানীর অবৈধ সম্বন্ধের কথা কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে পত্র-লেখক যে 'কল্য' ও 'অদ্য' পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থের প্রতি মনোযোগ করিলে এবং সে সময়ে বালাজী বাজী রাও পুণায় ছিলেন না ও বাবু রাও গণেশ এই পত্র লিখিয়াছেন, এই কথা মনে রাখিলে তিনি কখনই ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না। প্রকৃতপক্ষে, মস্তানী সে দিন রাত্রিকালে নানার (বালাজী বাজী রাওয়ের) স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সদ্ভাব জানাইতে গিয়াছিল। আর এক কথা, মস্তানীর চরিত্রসম্বন্ধে বাজী রাওয়ের মনে সন্দেহ-সঞ্চার করাই যদি নানার উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং তাহার সহিত অবৈধ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া, সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে অগ্রহসর হইবেন, ইহা কি সম্ভবপর? স্বয়ং সেই কলঙ্ককর ব্যাপারে বিজড়িত হওয়া কি তাঁহার পক্ষে নিরাপদ ছিল? তাঁহার সে সঙ্কল্প থাকিলে, তিনি স্বয়ং মস্তানীর সহিত অবৈধ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি না করিয়াও, অন্য সহস্র উপায়ে তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারিতেন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। কিন্তু মিষ্টার কিংকেড এস্থলে প্রখর কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ফ্রান্সের Diane de Poitiers যেরূপ প্রথমে রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের (Francis I) ও তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় হেনরীর (Henry II) প্রণয়িনীরূপে তাঁহাদিগের উভয়েরই উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, এক্ষণে মস্তানীরও সেইরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 'নানা' তাহার এই চিত্তবিকারের পরিচয়ে ভীত হইয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিত্যাগ করেন—ইহাই তাঁহার অনুমান। এই অনুমানের কারণ-নির্দ্দেশ-স্থলে তিনি বাবু রাও গণেশের শ্রাবণ কৃষ্ণা দ্বাদশীর (১৯শে আগষ্ট ১৭৩৯ খ্রীঃ) পত্র হইতে একাংশের ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে অনুবাদ এইরূপ:—

'On the morning of the Shravan Waidya 9th she (Mustani) sent for me and began to say, '*very heedlessly* I contracted a *close* friendship for Nana Swami (Nana Sahib) and this *close* friendship lasted for four or five months. Then it stopped altogether. *But while it lasted, every one thought ill of me* and I got a bad name with Apppa Sahib (Bajirao's brother Chimnaji). He (Nana) alone knows whether *his intention was to win my love under the guise of friendship.* But for the last three or four months he has not once written to me. Once or twice when I was in

the camp I got a letter as broad as your two fingers. But for the last two months I have got nothing at all.' She was very sad and spoke to me in this way at great length.

এই অনুবাদেও ভুলের ছড়াছড়ি হইয়াছে। মূলে যেস্থানে "অকপট-চিত্তে" আছে, লেখক সেস্থানে অনুবাদে very heedlessly পদের প্রয়োগ করিয়াছেন! মূলে "মিত্রতার" (frindshipএর) কথা আছে—close friendshipএর কথা নাই। মিত্রতা অচল হওয়ায় সর্ব্বত্র আমার "দুর্নাম হইল"—এই বাক্যাংশের অনুবাদে তিনি লিখিয়াছেন, But while it lasted, every one thought ill of me! মূলে আছে—"আমার সহিত মিত্রতা (সদ্ভাব-স্থাপন) করিবার পর তিনি আমার প্রতি মমতা করিতেন কি না, তাহা তিনিই জানেন।" ইহার অনুবাদ কেমন চমৎকার হইয়াছে, দেখুন;—He alone knows whether his intention was to win my love under the guise of friendship! কবি যথার্থই বলিয়াছেন, "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার।" এ ক্ষেত্রে যে নানা সাহেব মস্তানীর প্রণয়পাত্ররূপে চিত্রিত হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে?

আমাদের মনে হয়, মস্তানী যে, এই পত্রে লেখক বাবু রাও গণেশের নিকট নিজের দুর্নামের কথা বলিয়াছে, সে দুর্নাম, নানা সাহেবের সহিত অসদ্ভাব ও মদ্যপানের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-বিষয়ক। এই সকল পত্রের ভাবে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে অনুমিত হয় যে, নানা সাহেবের সহিত সদ্ভাব-স্থাপনের পর মস্তানী আর মদ্য স্পর্শ করিবে না বলিয়া শপথ করিয়াছিল। সে সেই শপথ ভঙ্গ করায় নানা সাহেব রুষ্ট হইয়া তাহার সহিত পত্রালাপ বন্ধ করেন। এ কথা বাজী রাওয়ের সুহৃদ্‌গণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায়, তাঁহারা সকলেই মস্তানীর নিন্দা করিতে লাগিলেন। চিমাজী আপ্পাও সে কথা জানিতে পারিয়া, তাহার উপর বিরূপ হইলেন। নানা সাহেব মস্তানীর সহিত পত্র-ব্যবহার বন্ধ করায় সে বুঝিল যে, তিনি আর তাহার প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন নহেন। হয় ত সে তাঁহাকেই তাহার দুর্নাম রটনার মূল বলিয়া মনে করিয়াছিল, কাযেই সে বাবু রাও গণেশকে ডাকিয়া নানা সাহেবের সম্বন্ধে তাঁহার নিকট অনুযোগ করিতে লাগিল। এই পত্রে বাবু রাও গণেশ সেই অনুযোগের পরিচয় নানা সাহেবকে লিখিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। বাবু রাও লিখিতেছেন,—

মস্তানী আমায় ডাকাইয়া বলিলেন যে, "আমি অপট-চিত্তে নানার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলাম। ঐ সদ্ভাব ৪।৫ মাস পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। পরে উহা অচল হইল। ইহাতে লোক-মধ্যে (সুহৃদ্‌গণের মধ্যে) আমার বদনাম (দুর্নাম) হইল ; চিমণাজী আপ্পার নিকটেও আমার দুর্নাম হইয়াছে। আমার সহিত সদ্ভাব স্থাপনের পর তিনি আমায় প্রকৃত মমতা করিতেন কি না, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু সংপ্রতি দুই চারি মাস হইতে তাঁহার আর পত্রও পাই না। শিবিরে অবস্থান-কালে আমি তাঁহার নিকট হইতে দুই একবার দুই অঙ্গুলি-পরিমিত পত্র পাইয়াছিলাম। তৎপরে বিগত দুই মাসের মধ্যে কিছুই পাই নাই।" এজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন এবং সেই জন্য এইরূপে বিনাইয়া বিনাইয়া আমাকে এ সকল কথা বলিতেছিলেন।

এই পত্রের অপর অংশে বাবু রাও গণেশ যে সকল কথা লিখিয়াছেন তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে মিষ্টার কিংকেড স্বীয় অনুমানের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে পারিতেন। বাবু রাও গণেশ লিখিয়াছেন,—

প্রভু জিজ্ঞাসা করিবেন যে, সহসা মস্তানীর মনে এরূপ দুঃখোদ্রেক হইল কেন ? তাহার উত্তর এই যে, বিগত জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রিকালে এখানে হরি-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। রাত্রি সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন ও কথকতা হইবার পর, স্বয়ং মস্তানী নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে শ্রীমতী বাঈ সেখানে গমন করিয়াছিলে। নৃত্যশেষে তিনি বলিলেন, "আমার নামে নানার পত্র আসিয়াছিল ; তিনি কুশলে আছেন বলিয়া লিখিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া মস্তানীর ভাবান্তর হইল। তিনি বলিলেন "আট দশ দিন অন্তর স্বীয় জননীর নিকট নানা পত্র লিখিয়া থাকেন ; আমিই কি (দোষ) করিয়াছি ? যাহা হউক, নানা সত্য-ভ্রষ্ট হইয়াছেন, হউন ; আমি ত তাঁহার সহিত অকপট ব্যবহারই করিতেছিলাম এবং পরেও করিব। তাঁহার এরূপ ব্যবহার মিত্রতার ক্ষেত্রে সঙ্গত নহে।" এইরূপ অনেক কথা বলিলেন, তাহা পত্রে কত লিখিব ? আপনারও এরূপ করা উচিত নহে। পত্র-যোগে তাঁহাকে সন্তনা করিতে ও তাঁহার সংবাদ লইতে দোষ কি ? আপনি অবশ্য সমস্তই বুঝেন। আমার পক্ষে অধিক লেখা বাহুল্য। ইত্যাদি।

এই পত্রাংশ পাঠে বোধ হয় যে, সপত্নীর মনে ক্লেশ-দানের জন্যই কাশী বাঈ মস্তানীকে নানা সাহেবের পত্রের কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন। সেই কথা শুনিয়া মস্তানী, বাবু রাও গণেশের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "নানা স্বীয় জননীকে আট দশ দিন অন্তর পত্র লিখেন কিন্তু আমায় লেখেন না ; আমিই কি দোষ করিয়াছি ?" এই উক্তি হইতে কি ইহাই বুঝায় না যে, মস্তানী আপনাকে নানা সাহেবের জননী-স্থানীয় বলিয়া মনে করিয়াই ঐরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন ? ফলকথা, আমাদিগের সরল বুদ্ধিতে, মস্তানীর কথায় নানা সাহেবের

প্রতি তাহার অবৈধপ্রীতির কোনও নিদর্শন আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

আলোচ্য পত্রটি বাবু রাও গণেশের দ্বারা ১৯ আগষ্ট (১৭৩৯ খ্রীঃ) তারিখে লিখিত হইয়াছিল। সে সময়ে চিমাজী আপ্পা কোঁকণ প্রদেশে পোর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে লব্ধ প্রদেশের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিবার কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন এবং নানা সাহেব দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত মিরজ অঞ্চলে মহারাষ্ট্র-অধিকার-প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। শ্রীমদ্ ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে লিখিত বালাজী বাজী রাওয়ের মূল পত্র ও পেশওয়ের মুতালিক আম্বাজী ত্র্যম্বক পুরন্দরের স্মরণ-লিপি-পাঠে জানা যায় যে, নানা সাহেব ঐ অব্দের এপ্রিল হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত মিরজ অঞ্চলেই ছিলেন। (২) বাবু রাও গণেশের প্রথম পত্রে যে গ্রহণের উল্লেখ আছে, তাহা পুরন্দরের স্মরণ-লিপি অনুসারে ৯ই জুলাই তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে

(২) পুরন্দরের "স্মরণ-লিপিতে" প্রত্যেক বর্ষের প্রত্যেক মাসের প্রধান প্রধান ঘটনা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্মরণ-লিপির একস্থলে লিখিত আছে, তাঁহাদিগের দপ্তরখানায় "১৫৪০ হইতে ১৫৯৬ শকাব্দ (১৬১৮—১৬৭৪ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত কালের প্রত্যেক বর্ষের প্রধান ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তদ্ভিন্ন সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের দিল্লী হইতে আরঙ্গবাদ পর্য্যন্ত আগমনের বিবরণ ও মহারাজ শাহুর রাজ্যকালের প্রত্যেক বর্ষের ঘটনাবলীও পৃথক্ পৃথক্ লিখিত আছে।" তন্মধ্যে মহারাজ শাহুর রাজ্যকালের ঘটনাবলী তাঁহারই "জোশী" উপাধিধারী জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। ছত্রপতি শিবাজীর সময়ের অর্থাৎ ১৬১৮ হইতে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কালের স্মরণ-লিপিগুলি সামসময়িক লেখকের দ্বারা লিখিত হইয়াছিল, অথবা আম্বাজী ত্র্যম্বক পুরন্দর, পেশওয়ের মুতালিক পদ (১৭১৪ খ্রীঃ) প্রাপ্তির পর রাজ সরকারের প্রাচীন কাগজপত্র হইতে সঙ্কলন করাইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। তাঁহার চেষ্টায় ঐরূপ প্রাচীনকালের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়া থাকিলে তাহা তাহার পক্ষে সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে। আর যদি সামসময়িক লেখকের দ্বারা লিখিত স্মরণ লিপিগুলির তিনি কেবল অনুলিপিগুলির সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, মহাত্মা শিবাজীর জন্মের পূর্ব্ব হইতেও মহারাষ্ট্রদেশে প্রতিবর্ষের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর বিবরণ স্মরণার্থ লিখিয়া রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। মহারাজ শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্র-দেশে যেরূপ উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-চর্চ্চা হইত বলিয়া এখন জানা যাইতেছে, তাহাতে সাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্মরণ-লিপি রচনার প্রথা সেকালে প্রচলিত থাকা কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল রচনার কিয়দংশ বিলুপ্ত ও কিয়দংশ লোক-লোচনের অন্তরালে বিচ্ছিন্ন ও ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় প্রাচীন সর্দ্দার ও রাজপুরুষগণের বংশধরদিগের গৃহে পড়িয়া আছে!

বালাজী বাজী রাও মিরজেই ছিলেন। এই কারণেও ঐ পত্র তাঁহার দ্বারা লিখিত হইতে পারে না। মিষ্টার কিংকেড এই সকল তারিখের প্রতি মনোযোগ না করায় ঐ পত্রকে বালাজী বাজী রাওয়ের লিখিত বলিয়া সিদ্ধান্ত ও পত্রের বিকৃত ভাষান্তর করিয়া বাজী রাওকে সুরাসক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর (কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, রবিবার) তারিখের সন্ধ্যাকালে নানা সাহেব মিরজ হইতে পুণায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তৎপূর্ব্বে ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে চিমণাজী আপ্পা পুণায় আগমন করেন। নানা সাহেবের পুণায় প্রত্যাগমনের পরদিবসেই চিমণাজী আপ্পা ও বাজী রাওয়ের জননী রাধা বাঈ বাজী রাওকে বলেন যে,, "তুমি মস্তানীর মোহজালে পতিত হইয়া ঘোরতর বিলাসী হইয়া উঠিয়াছ; অতএব কিছুদিনের জন্য তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা কর।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা মস্তানীকে একটি "হাবেলীতে" রাখিলেন এবং পাছে সে পলায়নপূর্ব্বক বাজীরাওয়ের নিকট গমন করে, এই ভয়ে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া হাবেলী রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও করিলেন। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হইয়া বাজী রাও গৃহ-ত্যাগ-পূর্ব্বক কুরুকুম্ব নামক স্থানে দেবদর্শনার্থ গমন করিলেন (৬ই নবেম্বর) ও তথা হইতে পাটস নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে মস্তানী বাজীরাওয়ের বিরহে চঞ্চলা হইয়া উঠিল; বাজী রাওয়ের অবস্থাও সেইরূপ হইল। পরিশেষে ২৪শে নবেম্বর তারিখে মস্তানি কৌশলক্রমে হাবেলী হইতে পলায়ন করিয়া বাজী রাওয়ের সহিত গিয়া পাটসে মিলিত হইল! এই ঘটনার বিবরণ আম্বাজী ত্র্যম্বক পুরন্দরের "স্মরণ-লিপিতে" লিখিত আছে। মিষ্টার কিংকেড স্মরণ-লিপির ঐ অংশের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও নানা প্রকার ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে, আমরা এস্থলে আর সে ভ্রমগুলি প্রদর্শনের চেষ্টা করিলাম না।

মস্তানী পুণা হইতে পলায়ন করিলে, বাজী রাওয়ের আত্মীয়গণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন-পূর্ব্বক পাটসে গিয়া উপস্থিত হয়েন এবং মস্তানীকে পুণায় প্রেরণ করিবার জন্য বাজী রাওকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদিগের পীড়াপীড়িতে বাজী রাও মস্তানীকে পুণায় প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়েন। ইহার পর নিজামের পুত্র নাসির জঙ্গের সহিত বাজী রাও যুদ্ধে লিপ্ত হইলে, চিমণাজী আপ্পার আদেশে নানা সাহেব মস্তানীকে বন্দী করিলেন (২৬শে জানু

[illegible] ১৭৩৯ খ্রীঃ)। তাহার পর বাজী রাওয়ের অভিমতানুসারে তাঁহাকে কোথা [illegible] রাখিবার পরামর্শ চলিতেছিল। কিন্তু তাহার পর সে সম্বন্ধে কি হইল, তাহার উল্লেখ কুত্রাপি পাওয়া যায় না। এই ঘটনার অল্পদিন পরে ২৮শে এপ্রিল তারিখে বাজী রাওয়ের মৃত্যু হয়। জনপ্রবাদ এইরূপ যে, মস্তানী বাজী রাওয়ের চিতায় আরোহণ করিয়া দেহ-ত্যাগ করে। কিন্তু তাহার মৃত্যু বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, নাসির জঙ্গের সহিত সন্ধির (২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৭৪০) পর বাজী রাও আর পুণায় প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া ৭ই মার্চ্চ তারিখে উত্তর ভারত অভিমুখে অভিযান করেন। সুতরাং ২৬শে জানুয়ারি হইতে ৭ই মার্চ্চের মধ্যে মস্তানীর সহিত বাজী রাওয়ের সাক্ষাৎকারের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম-পত্নী কাশী বাঈ নিকটে থাকিতে যে মস্তানী চিতারোহণের অধিকার পাইবে, ইহাও সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে মস্তানীর চিতারোহণের জনপ্রবাদ অলীক বলিয়াই পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু মিষ্টার কিংকেড লিখিয়াছেন,—"মস্তানীর চিতারোহণের আখ্যায়িকা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নানা সাহেবই সম্ভবতঃ উৎপীড়ন করিয়া তাহাকে চিতারোহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। কারণ এই ঘটনার দশ বৎসর পরেও তিনি মহারাজ শাহুর মহিষী সকওয়ার (সুকুমার) বাঈকে এইরূপেই চিতারোহণে দেহত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।" এ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোন রমণী যে স্বেচ্ছায় পতির সহিত চিতায় প্রাণত্যাগে প্রবৃত্ত হইতে পারে, একথা যাঁহাদের নিকট কল্পনার অতীত ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হয় সতী-দাহের কথা শুনিলেই তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, ঐ ঘটনার মূলে নিশ্চিতই অবৈধ উৎপীড়ন ও বলপ্রয়োগ বিদ্যমান ছিল।

মস্তানীর গর্ভে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাজী রাও একটি পুত্র লাভ করেন। তাহার নাম সমশের বাহাদুর। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মস্তানীর প্রতি যেরূপ অনুরাগবাহুল্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাতে ব্যঙ্গ-প্রিয় লোকেরাই বোধ হয় রটনা করিয়াছিলেন যে, বাজী রাও সমশের বাহাদুরকে যজ্ঞ-সূত্র দান করিয়া, ব্রাহ্মণ করিয়া লইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাজী রাওয়ের সেরূপ সঙ্কল্পের উল্লেখ কোনও প্রাচীন রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে পুণায় এখনও বৃদ্ধগণের মুখে এইরূপ আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাজী রাও মস্তানীকে অন্তঃপুরে আশ্রয়-দান করিয়াছেন

দেখিয়া তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। বাজী রাও মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী বীরপুরুষ ও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের আশ্রয়দাতা হইলেও সামাজিকেরা আপনাদিগের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় বিরত হয়েন নাই। তাঁহাদিগের চেষ্টায় পুণাতে ব্রাহ্মণদিগের একটি মহতী সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় যবন-সংসর্গ-রূপ ধর্ম্ম-বহির্ভূত কার্য্য করিবার অপরাধে বাজী রাওকে সমাজ-চ্যুত করিবার প্রস্তাব আলোচিত হইতে লাগিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের অনেকে বাজী রাওয়ের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিলে একজন সন্ন্যাসী সভা-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন, "মোগলদিগের আক্রমণ হইতে মহারাষ্ট্র-সম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে পারেন, এমন একমাত্র বীরপুরুষকে হারাইলে সমাজের কতদূর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার বিষয় চিন্তা না করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যখনও উচিত নহে। বাজী রাওয়ের ব্যক্তিগত চরিত্র দূষণীয় হইলেও মহারাষ্ট্র-জাতির কল্যাণ-সাধনে তিনি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করা উচিত। যাঁহারা নিতান্তই বাজী রাওকে সমাজচ্যুত করিবার পক্ষপাতী তাঁহারা অগ্রে মহারাষ্ট্র-সমাজকে বাজী রাওয়ের ন্যায় একজন জাতীয় মঙ্গলকামী মহাবীর দান করুন, তাহার পর তাঁহারা বাজী রাওয়ের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে অগ্রসর হউন।" সন্ন্যাসীর এই যুক্তিগত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বাজী রাওয়ের প্রতিপক্ষীয়েরা নিরুত্তর হইলেন। সভার বিবেচনায়, বাজী রাওয়ের জাতীয় (national) সদ্‌গুণাবলীর অনুরোধে তাঁহার ব্যক্তিগত দোষে উপেক্ষা করাই বিধেয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সেকালের ব্রাহ্মণ-সমাজ কিরূপ প্রবল-শক্তিসম্পন্ন অথচ সুবিবেচক ছিলেন, তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-সমাজে বাস করিয়া, বাজী রাও সমশের বাহাদুরের উপনয়নের সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য। এই কারণে আমরা তদ্বিষয়ক আখ্যায়িকাকে সেকালের কৌতুকপ্রিয় লোকের রটনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। মিষ্টার কিংকেড এই ঘটনাকে সত্য মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বোম্বাই অঞ্চলের সমাজসংস্কারকেরা এই জনরবের উল্লেখ করিয়া অনেক হৈচৈ করিয়াছেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

মৃত্যু-মিলন।

উপক্রমণিকা।

মন্দিরে।

দোল পূর্ণিমার আর এক দিনমাত্র বিলম্ব আছে। নগরে উৎসবের সূচনা সূচিত হইতেছে, আসন্ন উল্লাসের সাড়া পড়িয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইলেই উৎসবের আরম্ভ,—নাগরিকগণ তাহার আয়োজনে ব্যস্ত। গৃহদ্বার সুসজ্জিত; রাজপথে মধ্যে মধ্যে পত্রপুষ্প-শোভিত চারু তোরণ; গৃহচূড়ায় বসন্তপবনান্দোলিত কেতন। সান্ধ্য গগন নক্ষত্র-খচিত;—চতুর্দ্দশীর চন্দ্র আপনার অতি সামান্য অসম্পূর্ণ দেহ লইয়া চক্রবাল হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছে; চারুচন্দ্রালোকে উৎসবসজ্জাসজ্জিত রাজধানীর প্রখর সৌন্দর্য্য কোমল দেখাইতেছে—যেন বিবাহসভায় ঘৃতশমীপল্লবলাজগন্ধী পূত হোমাগ্নি হইতে সমুত্থিত স্বচ্ছ ধূমের অন্তরালে বধূর উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য স্নিগ্ধশোভায় পরিণত হইয়াছে।

দেবমন্দিরে আরতির ঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিত হইল। বৃহৎ ঘণ্টার বিপুল ধ্বনি শব্দতরঙ্গের মত নগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। মন্দির-তোরণে বাদকদল বাদন আরম্ভ করিল। নবোদিত চন্দ্রের কিরণ যেমন স্ফূটফেনশোভিত সমুদ্রকে বেলাসকাশে আনয়ন করে, সেই ঘণ্টাধ্বনি তেমনই সুবেশসজ্জিত পুরনরনারীকে মন্দিরদ্বারে উপনীত করিল।

মন্দির সুসজ্জিত। আজ মন্দিরে সান্ধ্য আরতির বিপুল আয়োজন। তাই কথায় ও কলহাস্যে রাজপথ মুখরিত করিয়া নরনারী মন্দিরাভি-মুখগামী হইল; স্রোতস্বতী যেমন সমুদ্রবক্ষে জলরাশি সমর্পণ করে, রাজপথ তেমনই মন্দিরদ্বারে জনস্রোতঃ সমর্পণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বৃহৎ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। মন্দিরমধ্য হইতে ধূপগন্ধামোদিত ধূম পবন-ধূনিত চীনাংশুকের মত প্রাঙ্গণে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

আবার ঘণ্টা বাজিল। আরতি আরব্ধ হইল। বৃদ্ধ পুরোহিত আজ স্বয়ং আরতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল বপু গৌরবর্ণ, নয়ন

জ্যোতির্ম্ময়, কেশজাল ও শ্মশ্রুরাজি কুন্দধবল, পরিধানে শ্বেত-বস্ত্র, অঙ্গে বিশদ উত্তরীয়, উন্নত কপাল চন্দনচর্চ্চিত। সমবেত পুরোহিতগণমধ্যে তাঁহাকে বহুশৃঙ্গ গিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। জরাস্পর্শে তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু সেই সুগঠিত, বিশাল দেহে বিকৃতির চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না; বরং মুখশ্রী গাম্ভীর্য্যে সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে। বয়সের আধিক্যে কেবল চঞ্চল সৌন্দর্য্যের লোপ হয়। কয় বৎসর হইতে তিনি আর স্বয়ং আরতি করিতেন না; স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শিষ্যদিগকে আরতির প্রণালী শিখাইতেন,—এখন তাহারাও সুশিক্ষিত। আজও তাহারা তাঁহার আদেশপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল—তিনি যাহাকে আদেশ করিবেন, সে-ই আরতি করিবে। এমন সময় অজিনাসন হইতে উত্থিত হইয়া তিনি স্বয়ং মার্জ্জন-চিক্কণ দীপাধার তুলিয়া লইলেন। শিষ্যবর্গ বিস্মিত হইল। সেই বৃহৎ দীপাধারের ভরে সে হস্ত কম্পিত হইল না। তিনি আরতি করিতে লাগিলেন। কয় বৎসর পরে আবার তাঁহাকে আরতি করিতে দেখিয়া জনতা হইতে আনন্দধ্বনি উঠিল।

সে ধ্বনি পুরোহিতের কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না; তিনি তন্ময় হইয়া আরতি করিতেছিলেন। আজ কয় দিন হইতে তিনি কেমন অন্যমনস্ক। কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, তাঁহার নয়নদ্বয় আর্দ্র। অতি দীর্ঘ আরতি শেষ করিয়া তিনি যখন দীপাধার নামাইয়া রাখিলেন, তখন একটি দীর্ঘশ্বাসে তাঁহার হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনারাশি যেন বাহির হইবার চেষ্টা করিল, অর্দ্ধশতাব্দীর অভ্যাস—বংশপরম্পরাগত বন্ধন ত্যাগ করা সহজসাধ্য নহে।

আরতি শেষ হইয়া গেল।—বিশাল প্রাঙ্গণ পূর্ণ; বিপুল জনতার হ্রাস নাই; নরনারী বৃদ্ধ পুরোহিতের চরণধূলি লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি দেউল হইতে আসিয়া মোহন অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণে নামিবার সোপানে দাঁড়াইলেন। তাঁহার চন্দ্রকরধৌত দেহ মর্ম্মরগঠিত দেবমূর্ত্তিরই মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সমাগত নরনারীগণ সাগ্রহে—ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে জনস্রোতঃ আবার রাজপথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রাঙ্গণ শূন্য হইতে আরম্ভ হইল। যখন প্রাঙ্গণ হইতে জনস্রোতঃ অপসৃত হইয়া গেল,

তখন কেবল এক পার্শ্বে তিন জন পুরুষ ও একজন রমণী অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রজনীর প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গেল। প্রহরীরা দেউলদ্বার রুদ্ধ করিয়া সিংহদ্বারে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। একজন বলিল, "আমরা গ্রাম হইতে ঠাকুরের নিকট আসিয়াছি। পুরোহিত তখন মোহনে প্রগনুবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কি ভাবিতে ছিলেন। তিনি তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, কি চাহ?"

তাহারা কথা কহিতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া পুরোহিত প্রহরিগণকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহারা চলিয়া গেল। তখন আগন্তুক দিগের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে বলিল, "আমরা রাজ্যের সীমান্তগ্রামবাসী; আপনার নিকট আসিয়াছি।"

পুরোহিত সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের কি আবশ্যক?"

"মোগল-সেনার অত্যাচারে আমরা বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছি।"

"কেন?"

"তাহারা প্রায়ই আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে; বলপূর্ব্বক দ্রব্যাদি গ্রহণ করে। প্রভু, বলিতে কি, আমাদের মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্মও নিরাপদ নহে।"

"তাহারা কি ধর্ম্মহানিকর কোন কার্য্য করে? শুনিয়াছি, কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা আকবরের আদেশ-বিরুদ্ধ।"

"সত্য; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারীরা সে আদেশ পালন করে না। বিশেষ কেহ কেহ আমাদের দেবতাকে বিদ্রূপ করিয়া আমাদিগকে বাদসাহের প্রবর্ত্তিত নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলে।"

শুনিয়া পুরোহিতের নয়নদ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "নূতন ধর্ম্ম! আকবরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়াও তাহার তৃপ্তি হয় নাই; পরন্তু ঘৃতাহুতিপাতে পাবকের মত উপভোগে কামনার বৃদ্ধিই হইয়াছে। তাই বিষয়বাসনাবদ্ধ, ভগবচ্চিন্তাহীন মানব আপনার লোক-বলে বলীয়ান্ হইয়া আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনক্ষম বিবেচনা করিয়াছে, আপনাকে দেবতার আসনে উন্নীত মনে করিয়াছে। ধর্ম্ম স্বার্থগন্ধহীন। আকবরের উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি—রাজশক্তি ও ধর্ম্মশক্তি করতলগত করিয়া ভারতবর্ষে আপনার বংশের প্রভুত্ব স্থায়ী করা। ভ্রান্ত মানব! তুমি অজস্র যত্নে যাহা গঠিত কর, বিধাতা সামান্য ঘটনার ফুৎকারে তাহার ধ্বংস করিতে পারেন।"

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার পর আগন্তুক-দিগের মধ্যে একজন বলিল, "ঠাকুর, আমাদের উপায় কি ?"

পুরোহিত বলিলেন, "এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া যে রাজা রাজ্যরক্ষায় সমর্থ তাঁহার অধিকারে চলিয়া যাও।"

একজন বলিল, "সে কি, ঠাকুর! পিতৃপুরুষের ভিটা, জমী, জমা—সব ফেলিয়া যাইব ?"

রমণী বলিল, "বিগ্রহের কি হইবে ?"

পুরোহিত বলিলেন, "এ কার্য্য সহজ নহে সত্য, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। আমার কথা ভাবিয়া দেখ। এই রাজবংশ যত দিনের, এ মন্দিরের পৌর-হিত্যে ততদিন বংশপরম্পরাক্রমে আমাদের অধিকার। আমি এই মন্দিরের পৌরহিত্য ব্যতীত আর কোন কার্য্য শিখি নাই। শৈশব হইতে আমি এই শিক্ষায় শিক্ষিত; পঞ্চাশ বৎসর আমি স্বয়ং এই কার্য্য করিতেছি। এখন—এই বৃদ্ধ বয়সে আমি যে এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, সে কি বড় সুখে ?"

রমণী সবিস্ময়ে বলিল, "দেবতাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন ?"

পুরোহিত মৃদুহাস্য করিলেন, বলিলেন, "বৎসে, যে জীবন দেবসেবায় উৎসৃষ্ট সে জীবন থাকিতে দেবতাকে কেমন করিয়া ত্যাগ করিব ? দেবতা তাঁহার সেবককে ত্যাগ করিতে পারেন; সেবকের সাধ্য কি, তাঁহাকে ত্যাগ করে ?"

বৃদ্ধ উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিয়া আবার বলিলেন, "আমি দেবতার দাস, রাজার দাস নহি। দেবতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কেবল যে রাজ্যে রাজা অধর্ম্মরত, সে রাজ্যে তিনি প্রসন্ন নহেন,—কুপিত।"

"আপনি কবে যাইবেন ?"

"আগামী পরশ্ব—প্রতিপদে—প্রত্যুষে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইব।"

"এ মন্দিরে দেবসেবার কি হইবে ?"

"দেবতার সেবকের অভাব কি ? আমার বিংশাধিক শিষ্য; সকলেই দেবসেবায় সমর্থ। তাহারা সে কার্য্য করিবে। আমি যদি আজ মরিয়া যাই, তাহা হইলে কি দেবসেবার ত্রুটি হইবে ?"

"রাজা এ কথা জানেন ?"

"আমি আজ মন্ত্রীকে বলিয়া পাঠাইয়াছি।"

একজন বলিল, "কিন্তু রাজা কি করিবেন?"

পুরোহিত বলিলেন, "তিনি রাজ্যরক্ষা করিবেন।" প্রাঙ্গণপ্রান্তে একটি সারমেয় শয়ান ছিল; তাহার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ উচ্ছিষ্টমুষ্টিপুষ্ট সারমেয়কে স্বাধিকারচ্যুত করিবার চেষ্টা কর, ও তোমাকে দংশন করিবে।"

"রাজা বাদশাহের সঙ্গে বলে পারবেন কি?"

"তিনি কি চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন? প্রকৃত রাজশক্তি প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তোমরাই রাজার বল। রাজা সে শক্তি প্রবুদ্ধ করিতে কি চেষ্টা করিয়াছেন? করগ্রহণ ব্যতীত প্রজার সহিত যে রাজার সম্বন্ধ নাই রাজ্য-রক্ষা ও রাজ্যশাসন যিনি কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না—তিনি অত্যাচারি-মাত্র। তোমরা প্রজা; তোমরা রাজার জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে পার, রাজার সহিত তোমাদের এমন কি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে? রাজা সে ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপনের কি চেষ্টা করিয়াছেন?"

"রাজার কর্ম্মচারীরা প্রতীকারে অক্ষম। রাজাকে একবার অবস্থা জানাইব কি?"

"চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি স্তাবকদলের স্তুতিগুঞ্জনের মধ্যে প্রজার আর্ত্ত-নাদ রাজকর্ণে প্রবেশ করে।"

পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া আগন্তুকগণ চলিয়া গেল। পুরোহিত বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণ জনশূন্য,—চন্দ্রকিরণপ্লাবিত। প্রাঙ্গণে কয়টি পুষ্ট বৃষ ও একটি সারমেয় শয়ান। প্রস্তরগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও দুই একটি তৃণ আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে। সবই যেন তাঁহার পরিচিত। তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে চন্দ্র গগনপ্রান্তগামী হইল। প্রাঙ্গণে দেউলের দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হইতে লাগিল। তিনি তখনও চিন্তামগ্ন।

পূর্ব্বগগন যখন উদয়োন্মুখ রবির কিরণপাতে রক্তাভ হইয়া উঠিল—তখন বিহগ-বিরাবে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

উৎসব।

—*—

আজ দোলোৎসব। রাজপুতানার একটি খণ্ড রাজ্যের রাজধানীতে আজ মহোৎসব। এই উৎসব সে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। উৎসবে বিপুল আয়োজন—অবারিত আনন্দ—অসীম আমোদোচ্ছ্বাস। পৌরজন এই উৎসবের আশায় সমস্ত বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। উৎসবে যোগ দিবার জন্য নানা স্থান হইতে আগন্তুকগণ সমাগত হয়। উৎসবে রাজধানীতে আনন্দস্রোতঃ প্রবাহিত হয়।

আজ আনন্দের দিন—মিলনের দিন—উৎসবের দিন। আজ পুরবাসীরা দৈনিক জীবনের বৈষয়িক কার্য্য—জীবনসংগ্রাম ভুলিয়াছে। চকে দোকান বন্ধ; পথে ভারবাহী যানের চক্রঘর্ঘর নাই। যেন নিত্যকার্য্যের রথ সহসা পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সারথীর ভ্রকুটিকুটিল মুখে স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবিরাম প্রবহমান কর্ম্মস্রোতঃ যেন সহসা নিশ্চল—নিষ্কম্প হইয়াছে।

রাজপথ পরিষ্কৃত—সুগন্ধসলিলসেচনস্নিগ্ধ। দুই পার্শ্বে হর্ম্ম্যমালা পত্রপুষ্পপতাকায় শোভিত। গৃহদ্বারে মঙ্গলঘট—গৃহচূড়ায় পতাকা। কোন কোন গৃহের সজ্জিত আলিসায় উজ্জ্বলবর্ণবৈচিত্র্যমনোরম ময়ূরগুলি গৃহসজ্জারই অঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে। রাজপথে জনস্রোতঃ—সকলেরই পরিধানে নূতন বস্ত্র,বর্ণের বৈচিত্র্যে মনে হয়, বুঝি নানা প্রস্ফুটিত-পুষ্পশোভিত উদ্যানে বিচরণ করিতেছি। পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রে ও উত্তরীয়ে একই প্রকার বর্ণ, রমণীর বসনে বিচিত্রবর্ণের সমাবেশ।

উপরে নীল আকাশ মেঘলেশহীন—সূর্য্যকরোজ্জ্বল। মধ্যে মধ্যে এক এক দল পারাবত বা টিয়া উড়িয়া যাইতেছে। রাজপথে স্থানে স্থানে জলাধারে আবীররঞ্জিত বারি। সেগুলিকে ঘিরিয়া পিচকারীধারী বালক-

গণ ও যুবকদল দাঁড়াইয়া আছে--এ উহার মুখে, চক্ষুতে, বসনে জল দিতেছে। পথে এ উহার দিকে আবীর প্রক্ষিপ্ত করিতেছে। রাজপথ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। জনতা ও বাড়িতে লাগিল। সকলেরই মুখে প্রতীক্ষার ভাব। সকলে এক এক বার উত্তর দিকে চাহিতেছিল। রাজপথ সরল -যতদূর দৃষ্টিচলে কেবল নরমুণ্ড। গত সন্ধ্যায় রাজা প্রাসাদ হইতে নগরোপকণ্ঠে কুঞ্জগৃহে গমন করিয়াছেন। আজ তিনি সদলে সেই কুঞ্জগৃহ হইতে নগরমধ্য দিয়া মন্দিরে যাইবেন। সেই সময় উৎসবের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।

সহসা দূরে বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল। ধ্বনি অস্পষ্ট—মধুর, পবনে হিল্লোলিত হইয়া আসিতে লাগিল; যেন দূরে উচ্চবৃক্ষশাখায় বিহগশাবক প্রভাত-পবনে অস্ফুট কাকলী ঢালিতেছে। জনতা হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল।

বাদ্যধ্বনি ক্রমে স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল। পথিপার্শ্বে গৃহের ছাদ বর্ণবহুলবেশসজ্জিতা রমণীমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া উঠিল;—কাহারও হস্তে কুঙ্কুমা,—কাহারও বাম করে আবীরের পাত্র,—কেহ পিচকারী পূর্ণ করিয়া দণ্ডায়মানা। কেহ কেহ নিম্নে রাজপথে জনতার উপর এক এক মুষ্টি আবীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল; পথিকদিগের মধ্যে কেহ ঊর্দ্ধে চাহিলে তাহার চক্ষু আবীরে পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কোন রমণী বা রাজপথে কোন পরিচিত বা পরিচিতাকে দেখিয়া আবীর নিক্ষেপ করিতেছে বা পিচকারী-মুখে রঞ্জিত বারি দিতেছে; বলা বাহুল্য, চূর্ণ বা বারি উদ্দিষ্ট বা উদ্দিষ্টা ব্যতীত আরও অনেকের উপর পড়িয়া জনতামধ্য হইতে উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত করাইতেছে।

ক্রমে বাদ্যধ্বনি নিকটে শ্রুত হইতে লাগিল। তাহার পর উদগ্রীব জনতা দূরে ক্রমশঃ অগ্রসর জনারণ্য দেখিতে পাইল। সে জনারণ্য ক্রমে নিকটে আসিল। প্রথমে অশ্বারোহী সেনাদল,—বাম করে বল্গা, দক্ষিণ করে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার মুক্ত কৃপাণ—তাহাতে রবিকর প্রতিফলিত। অশ্বারোহীদিগের শুভ্র উষ্ণীব ও বেশ আবীরে রঞ্জিত। দ্রুতগতি অশ্বগণ বল্গাকর্ষণে সংযত হইয়া গ্রীবা বক্র করিয়া যেন নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতেছে। তাহার পর পদাতিদল। সর্ব্বাগ্রে বর্শাধারীরা সমপদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে—দীর্ঘ

বর্শার পরিষ্কৃত ফলক রবিকরে জ্বলিতেছে। তাহার পর বন্দুকধারীরা গুরুভার, দীর্ঘনল বন্দুক বহন করিয়া যাইতেছে। তাহার পর ধানুষ্কগণ—পৃষ্ঠে তূণ নিঃশব্দে শত্রুপ্রাণঘাতী শরে পূর্ণ—করে ধনুক। তাহার পর নানারূপ সৈন্য। তাহাদের পশ্চাতে ভারবাহী উষ্ট্রের শ্রেণী। উষ্ট্রের পর শিকারসঙ্গী চিতা—শৃঙ্খলিত—নয়নে ভীষণ তৃষ্ণা—চারিদিকে চাহিতেছে। তাহার পর দণ্ডধারীদল রৌপ্য-দণ্ড বহন করিতেছে।

তাহার পর সমান উচ্চ দুইটি করী; তাহাদের পৃষ্ঠে বাদ্যকরদল নানা-যন্ত্রবাদনরত। তাহাদের পশ্চাতে বিশালকায় দন্তী,—দন্তদ্বয়ে স্বর্ণালঙ্কার; মুক্তাখচিত আস্তরণ দুই পার্শ্বে প্রায় ভূমি স্পর্শ করিতেছে; পৃষ্ঠোপরি আসন; চারি কোণে চারিটি স্বর্ণ-দণ্ডে বহুমূল্য বস্ত্রের আবরণ বদ্ধ। আসনে রাজা উপবিষ্ট। রাজার বয়স চল্লিশের নিম্নে; মুখে যৌবনের লাবণ্য বা পরিণত বয়সের গাম্ভীর্য্য কিছুই নাই; নয়নে আলস্য ও বিরক্তিভাব। আজ তাঁহার ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্য দেখা যাইতেছিল সত্য, কিন্তু সে হাসি নির্ঝরমুক্ত বারির মত স্বতঃ উচ্ছ্বসিত নহে—তাহা কৃত্রিম, ভাবগোপনচেষ্টার ফল—অস্বাভাবিক। রাজার আসনের পশ্চাতে একজনমাত্র প্রহরী দণ্ডায়মান।

দুই পার্শ্বে গৃহ হইতে শত পিচকারী রাজাকে লক্ষ্য করিয়া আবীররঞ্জিত বারি বর্ষণ করিল; সহস্র অলঙ্কারশিঞ্জিত হস্ত কুঙ্কুম নিক্ষেপ করিল। চারিদিকে আনন্দকোলাহল। রাজার ওষ্ঠাধরে তেমনই মৃদু হাস্য। হস্তী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিম্নে বিপুল জনতা পরস্পরকে রঞ্জিত করিতে লাগিল। রাজহস্তীর পশ্চাতে আর একটি বৃহৎ হস্তী—তাহার পৃষ্ঠে একটি অনতিবৃহৎ রৌপ্য নির্ম্মিত কামান; সেই কামান ঘন ঘন আবীররঞ্জিত সুগন্ধ জলধারা উদ্গীরণ করিয়া জনসঙ্ঘকে স্নাত করাইতে লাগিল।

আজ উচ্চ নীচ ভেদ নাই। আজ একই আনন্দস্রোতে সকলে ভাসিয়া চলিয়াছে; ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আজ সকলেই এক উৎসবে মত্ত। যেমন সহসা বান আসিলে নদী কূল প্লাবিত করিয়া সমগ্র গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনই আজ এক উল্লাস-প্রবাহ রাজধানীতে সকল নাগরিককে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বহুদিন বন্ধনে অভ্যস্ত অশ্ব সহসা বন্ধনমুক্ত অবস্থায় শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে আসিলে যেমন উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, দীর্ঘ এক বৎসর কার্য্যরত জনগণ তেমনই আজ কার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া

উৎসবে যেন উন্মত্ত হইয়াছে। সে আনন্দস্রোতঃ প্রাসাদ হইতে প্রবাহিত হইয়া নগরী প্লাবিত করিয়াছে।

রাজার গমনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণও মন্দিরাভিমুখগামী হইল। মন্দিরের সিংহদ্বারে রাজা করিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। মন্দির তাহার পূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রক্ষিদল বহু কষ্টে রাজার জন্য একটি সঙ্কীর্ণ পথ জনশূন্য রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল; মন্দির-প্রাঙ্গণে আবীর কয় অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজা মোহনে উঠিলেন। পুরোহিতগণ মাল্য, চন্দন ও আবীর লইয়া রাজার অভ্যর্থনা করিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত এক পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। তিনি আসিলেন না দেখিয়া একজন পুরোহিত যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রাজা আসিয়াছেন।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

পুরোহিত দেখাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমি ত দেখিতেছি, বাচাল বালক। যে রাজা রাজ্য-রক্ষায় অক্ষম, তাহার হস্তে রাজদণ্ড শোভা পায় না।"

পুরোহিত বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

রাজা বৃদ্ধের কথা শুনিতে পাইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে ক্রোধের চিহ্ন-মাত্র প্রকাশ পাইল না; কেবল ওষ্ঠাধরলিপ্ত মৃদুহাসির রেখা লুপ্ত হইয়া গেল। যেন শরতের রবিকরে সরসী-সলিল জ্বলিতেছিল, সহসা বর্ষণলঘু মেঘখণ্ড রবিকর নিবারিত করিল—জল স্বচ্ছ অন্ধকারময় দেখাইতে লাগিল।

রাজা দেউলে প্রবেশ করিয়া দেবপ্রণাম করিলেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে দেবপ্রসাদ আবীরে রঞ্জিত করিয়া দিলেন। তিনি প্রণামী দিয়া দেউল হইতে বাহির হইলেন। মোহন অতিক্রম করিবার সময় রাজা দেখিলেন, বৃদ্ধ পুরোহিত তেমনই ভাবে বসিয়া আছেন।

রাজা প্রাঙ্গণে আসিলেন। জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজহস্তী তাঁহার আরোহণজন্য উপবিষ্ট ছিল। রাজা করিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন না; পদব্রজে অদূরবর্ত্তী উদ্যান-গৃহে চলিলেন। তাঁহার মুখে সেই স্বচ্ছান্ধকার লাগিয়াই রহিল।

রাজা গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেনাদল অভি-

বাদন করিয়া চলিয়া গেল। ক্রমে জনতাও মিলাইয়া গেল। দিবসের উৎসবের অবসান হইল।

সেই দিন সন্ধ্যায় যখন নগরী আলোকমালায় সজ্জিতা হইয়া উঠিল, মন্দিরে সমারোহে সান্ধ্য আরতি আরব্ধ হইল, তখন মন্ত্রীর সহকারী আসিয়া বৃদ্ধ পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া জানাইলেন, মন্ত্রী তাঁহার দর্শন-লাভ-প্রয়াসী।

বৃদ্ধ বলিলেন, "মন্ত্রী বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন, আমি মন্দিরের পৌরহিত্য ত্যাগ করিয়াছি।"

সহকারী জিজ্ঞাসা করিলে, "মন্ত্রী মহাশয়কে কি নিবেদন করিব?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বলিবেন, আমি আজ আর রাজার মন্দিরের পুরোহিত নহি। আমার সহিত রাজমন্ত্রীর কি কার্য্য থাকিতে পারে?"

সহকারী প্রত্যাবৃত্ত হইলে মন্ত্রী রাজাকে বৃদ্ধের কথা জানাইলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর মন্দিরে জনতার হ্রাস হইলে রাজমন্ত্রী স্বয়ং সাধারণ বেশে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

মন্ত্রী বিনীত ভাবে বৃদ্ধকে কি নিবেদন করিলেন। বৃদ্ধ প্রথমে অসম্মতি জানাইলেন, পরে মন্ত্রীর প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। উভয়ে মন্দির হইতে বাহির হইয়া অদূরবর্ত্তী সেই উদ্যান-গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় নিভৃত কক্ষে রাজার সহিত বহুক্ষণ বৃদ্ধের কি কথা হইল। আর কেহ তাহা জানিতে পারিল না।

বৃদ্ধ পুরোহিত পরদিন তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন।

(ক্রমশঃ)

চিতোর।

—:০:—

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইয়া চিতোর গড় দেখিতে গিয়াছিলাম। সেবার একাকীই পর্য্যটন করিতেছিলাম—কোন সঙ্গী জুটে নাই। দেখিলাম, একাকী ভ্রমণে অনেক শিক্ষা হয়। নানারূপ গোলযোগ ও ঝঞ্চাটের মধ্যে আপনাকে ঠিক রাখিতে রাখিতে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বাড়ে এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে।

ট্রেণে কোন্ শ্রেণীতে ভ্রমণ প্রশস্ত সে বিষয়ে মতভেদ আছে। সামর্থ্য থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়; কারণ তাহা হইলে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইলে ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ হয়; মধ্যম শ্রেণীতে মধ্যবিত্ত এবং তৃতীয় শ্রেণীতে দরিদ্র ব্যক্তিগণের সহিত মিলা-মিশা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ট্রেণে অপরিচিত লোকের সহিত যেরূপ সহজে আলাপ পরিচয় হয়, সেরূপ অতি অল্প স্থানেই হইয়া থাকে।

বরোদা রাজ্য এবং মালব অধিত্যকার মধ্য দিয়া রাজপুতানায় আসিয়া পড়িলাম। এ প্রদেশটি সমতল এবং শস্যশালী; তবে বাঙ্গালার ন্যায় এ স্থানে জল সুলভ নহে।

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে তদ্দেশীয় কৃষকাদি দরিদ্র লোকের সহিত গল্প করিতে করিতে যাইতেছিলাম। লোকগুলি স্বভাবতঃ শান্ত ও অমায়িক। আমার মাথায় পাগড়ী নাই দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীদিগকে বুঝাইল, আমাদের বাঙ্গালার ঐরূপ 'হালচাল'।

গাড়ীতে এক যুবক মাড়য়ারী বণিক শুইয়া ছিল, এমন সময় একজন দরিদ্র বৃদ্ধ রাজপুত সেই কামরায় উঠিল। বৃদ্ধের হস্তে তরবারি; * তাহার দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু রাজপুত ধরণে দুই গণ্ডের উপরে উত্তোলিত। বণিক উঠিয়া বসিতে চাহে না দেখিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রাজপুত যখন "শা—বেণিয়া!" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তখন তাহার বীরমূর্ত্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া

* আমারা যেরূপ ছড়ি ব্যবহার করি, রাজপুতগণ সেইরূপ তরবার ব্যবহার করেন।

গেলাম। বণিক অর্থে এবং শারীরিক সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠতর হইলেও বিনাবাক্য-ব্যয়ে উঠিয়া রাজপুতের বসিবার স্থান করিয়া দিল। সেই 'বেণিয়া' শব্দটা সে কি ঘৃণার সহিতই উচ্চারণ করিয়াছিল! শব্দটার মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবটা যেন প্রচ্ছন্ন ছিল—"তুমি অর্থকরী ব্যবসায়ের কল্যাণে আজ ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছ—কিন্তু, আমার শিরায় রাজপুত রক্ত বহিতেছে, মরিয়া গেলেও আমি তোমার ন্যায় নীচ ব্যক্তিকে ভয় করি না।"

যখন চিতোরগড় ষ্টেসনে পৌঁছিলাম তখন রাত্রি প্রায় দশটা। এই অপরিচিত স্থানে একাকী কোথায় যাইব? কাযেই, রাত্রিটুকু ষ্টেসনের ওয়েটিং রুমে কাটাইয়া দিলাম।

প্রত্যুষে উঠিয়া চিতোর পাহাড় অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ষ্টেসন-মাষ্টারকে বলিয়া আমার দ্রব্যাদি তাঁহার আফিস ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলাম। ষ্টেসনটি অতি ক্ষুদ্র—খাবার মিলে না। যাহা হউক, সৌভাগ্য-ক্রমে সকালে একজন চা-বিস্কুট-বিক্রেতা আসিল—তাহার নিকট চা ও বিস্কুট ক্রয় করিলাম; তাহার পর পাহাড় অভিমুখে রওনা হইলাম।

চারিদিকে সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে চিতোর পাহাড় মাথা তুলিয়া আছে। পাহাড়টি অত্যধিক উচ্চ না হইলেও, অত্যন্ত দীর্ঘ এবং প্রস্থেও কম নহে। পাহাড়ের উপরে বিস্তৃত চিতোর দুর্গ—পাদদেশে চিতোর নগর। বহুদুর হইতে এই পাহাড় এবং তদুপরিস্থ রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়।

ষ্টেসনটি মাঠের মধ্যে অবস্থিত। প্রায় এক মাইল মাঠ অতিক্রম করিয়া গম্ভীরা নদীর তীরে উপনীত হইলাম। গ্রীষ্মে জল শুকাইয়া প্রস্তরকঙ্করময় তলদেশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—মধ্যে মধ্যে ঝির ঝির করিয়া একটু জল বহিতেছে; হাঁটিয়া পার হইয়া গেলাম। নদীর উপর একটি সেতু আছে, একা বা হস্তী এবং বর্ষাকালে মানুষ তাহারা উপর দিয়া নদী পার হয়।

ক্ষুদ্র নদীটির পর পারেই চিতোর—এককালে মেবার রাজ্যের মহাসমৃদ্ধি-শালিনী রাজধানী, এক্ষণে সামান্য একটি গণ্ডগ্রামমাত্র। সকল 'পশ্চিমা' সহরের মত সঙ্কীর্ণ গলি এবং দুই ধারে পাথরের বাড়ী, তাহাতে দরজা-জানা-লার সম্পর্ক অতি কম। প্রখর সূর্য্যতাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং দস্যুতস্করের উপদ্রবনিবারণ জন্যই বোধ হয় বাড়ীগুলি এইরূপে নির্ম্মিত হইত।

পাহাড়ে উঠিবার পূর্ব্বে সহর হইতে একজন পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করিবার

ইচ্ছা হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর একজন লোক মিলিল। সে অগ্রিম চারি আনা পয়সা লইয়া আমাকে পাহাড়ের সকল স্থান দেখাইয়া দিতে সম্মত হইল। সে জাতিতে বাদ্যকর—বিবাহাদিতে ঢোল বাজায়।

সহরের শেষে, যে স্থানে পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা আরব্ধ হইয়াছে, সেই স্থানে উদয়পুরের মহারাণার একটা থানা হইতে গড় দেখিবার জন্য একখানি অনুমতি পত্র লইতে হইল।

অপ্রশস্ত ঢালু রাস্তা ক্রমাগত ঘুরিয়া ফিরিয়া উপরে উঠিতেছে, এক ধারে সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীর পাহাড়ের তলদেশস্থ শত্রু হইতে পথ রক্ষা করিতেছে, অন্যধারে পাহাড় সরল ভাবে উঠিয়াছে। প্রাচীরের উপর হইতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বন্দুক ও কামান ছুড়িবার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। রাস্তার প্রতি বাঁকে একটি করিয়া ফটক এবং নিকটে কতকগুলি দুর্গরক্ষক সৈন্যের বাসগৃহ। দুর্গ অধিকার করিতে হইলে শত্রুকে এইরূপ কতকগুলি সুরক্ষিত তোরণ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। তোরণগুলির নাম হনুমান পোল, গণেশ পোল, সূরয পোল ইত্যাদি। এক একটি তোরণ কত শত সহস্র শিশোদীয় বীরের রক্তে রঞ্জিত!

প্রতি ফটকে একজন করিয়া বন্দুক-তরবারি-ধারী রাজপুত সৈনিক পাহারা দিতেছে।—তাহাদিগকে ছাড়পত্রখানি দেখাইয়া যাইতে লাগিলাম। এই সৈনিকগুলির কি গম্ভীর মূর্ত্তি, কি গর্ব্বিত মুখভাব! এই গর্ব্ব ও গাম্ভীর্য্য অতীত গৌরবের চিতাভস্ম রক্ষকের পক্ষে বড়ই শোভন বোধ হইতেছিল।

পাহাড়ের উপর কেবল অট্টালিকা, মন্দির, সমাধিস্তম্ভ, জয়স্তম্ভ, পুষ্করিণীর ঘাট প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ। তাহার মধ্যে কত ঐতিহাসিক তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে!

এই বিস্তৃত শ্মশানে কেবল কয়েক ঘর দরিদ্র অধিবাসী, গুটিকয়েক ভগ্ন-মন্দির-নিবাসী সন্ন্যাসী এবং রাণার জনকয়েক ভৃত্য এবং সৈনিক বাস করিতেছে।

এত উচ্চে পাহাড়ের উপর সুপেয় জল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কয়েকটি কূপের তলদেশ হইতে উৎসের জল বাহির হইতেছে। জলের সুবিধা না থাকিলে কোন পাহাড়ের উপর দুর্গ নির্ম্মাণ করা বাতুলতামাত্র, কেন না দুর্গ আক্রান্ত হইলে সৈন্যগণ জলাভাবেই বিনষ্ট হইবে।

দুর্গমধ্যে নীলকণ্ঠের মন্দির। এই পুরাতন শিব মন্দিরটির উপর এ প্রদেশের লোকের অচলা ভক্তি—অনেক দূর হইতে লোক নীলকণ্ঠ দর্শন করিতে আইসেন। সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগী বীরগণের সমাধির পার্শ্ব দিয়া যাইতে যাইতে রাণা কুম্ভের শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত জয়স্তম্ভের নিকট আসিয়া পড়িলাম। অতি উচ্চ স্তম্ভ, নয় তলে বিভক্ত—স্তম্ভের গাত্রে নানাবিধ সুন্দর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সমরে বার বার মুসলমানগণকে পর্য্যুদস্ত করিয়া কুম্ভ এই কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। নিকটে জৈনদিগের দ্বারা নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ, দুর্গমধ্যে একদা জৈনগণের সমৃদ্ধির পরিচয় স্বরূপ দণ্ডায়মান। চিতোরাধিষ্ঠাত্রী করালী কালীর মন্দিরটি প্রায় ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। ইনিই এককালে রাজপুত-রক্ত-পিপাসায় অধীরা হইয়া বলিয়াছিলেন "মৈ ভুখা হুঁঃ! মৈ ভুখা হুঁঃ!" নিকটবর্ত্তী সরোবরের তীরে বসিয়া দেখিতে লাগিলাম, ভগ্ন প্রস্তররাজির উপর ময়ুর পেখম খুলিয়া বেড়াইতেছে! মহারাণা কুম্ভের মহিষী, হরিভক্তি পরায়ণা মীরা বাইয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরটি এখনও সুরক্ষিত। কয়েকটি রাজপুত স্ত্রী ও পুরুষ মন্দিরে অর্চ্চনা করিতেছিলেন। মন্দিরের শীতল ছায়ায় কিছুক্ষণ উপবেশন করিলে মন শান্তিরসে পূর্ণ হইল। কিয়দ্দূরে মহারাণী পদ্মিনীর প্রাসাদ; সরোবরের মধ্যে সুন্দর, অতি বৃহৎ অট্টালিকা। উদয়পুরের মহারাণা কর্ত্তৃক সম্প্রতি ইহার জীর্ণ-সংস্কার হইয়াছে।

এই প্রাসাদের সম্মুখে বসিয়া মেবারের ইতিহাসের কত কথা ভাবিতেছিলাম। মীরা ও পদ্মিনী রাজস্থানের দুইটি অতুলনীয় রমণীরত্ন। একজন রাজরাণী হইয়াও সন্ন্যাসিনী—মহাবীর কুম্ভের সৈন্য কোলাহলের প্রতি কর্ণপাতমাত্র না করিয়া হরিনামামৃত পানে বিভোরা। আর এক জন মূর্ত্তিমতী ক্ষত্ররাজলক্ষ্মী—ক্ষত্রিয়গণকে কর্ত্তব্য-পালনে প্রোৎসাহিত করিতেছেন এবং আর্য্য রমণী যাহাতে সতীত্বের মর্য্যাদা বিস্মৃত না হয়েন সে বিষয়ে যত্নবতী রহিয়াছেন। উভয়েই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠা, তবে দুই জনের দুই বিভিন্ন পন্থা। এক জন মূর্ত্তিমতী ভক্তি, আর এক জন দেহধারিণী কর্ত্তব্যবুদ্ধি। ভক্তিযোগের ও কর্ম্মযোগের এরূপ মনোহর দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে সুলভ নহে। রাজপুতগণের সমকক্ষ বীর গ্রীসে ছিল, রোমে ছিল এবং আরও কোন কোন স্থানে ছিল, স্বীকার করি—কিন্তু মেবারের রমণীবৃন্দের ন্যায় শৌর্য্যবতী রমণী কোন দেশে কোন কালে ছিল বলিয়া ত মনে

হয় না। একজন নহে, দুইজন নহে, দলে দলে সুন্দরীকুল সঙ্গীতকলতানে প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া অগ্নি-প্রবেশ করেন, এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য, পৃথিবীতে এই স্বর্গের অভিনয়,—পাঠক কি আর কোথাও দেখিয়াছেন?

প্রতি বৎসর অনেক সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় পর্য্যটক এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গড় দেখিতে আসিয়া থাকেন;—তাই বোধ হয় মহারাণা বাহাদুর গড়টিকে অনেকটা সংস্কৃত অবস্থায় রাখিয়াছেন এবং মধ্যস্থলে বিশ্রামের জন্য একটি সুন্দর উদ্যান রচিত করিয়া দিয়াছেন। একস্থানে একটি অস্ত্রাগারে সেকালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান, গোলা প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। এই পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে নির্ম্মিত কামানগুলি যেমন বর্ত্তমান কালে অব্যবহার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে, গিরিদুর্গ গুলিও সেইরূপ সেকালে অজেয় হইলেও একালে সেরূপ নহে। আজকাল যেরূপ কামান এবং গোলা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ক্ষুদ্র কোনও দুর্গ (গিরিদুর্গ অতি বিস্তৃত হইতে পারে না) অধিক দিন আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এই জন্যই ইংরাজ গভর্মেণ্ট সহ্যাদ্রি পর্ব্বতস্থ শিবাজীর গিরিদুর্গগুলি ব্যবহার করেন না—, অথচ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে এই গিরিদুর্গগুলি অজেয় ছিল।

আমার পথপ্রদর্শক নিরক্ষর এবং ইতিহাসবিষয়ে অজ্ঞ। আমি যতই তাহাকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখাইতে বলি, ততই সে মনসা, কালভৈরব গণেশ প্রভৃতির প্রতিমা দেখাইয়া বেড়ায়। তবে পদ্মিনীর প্রাসাদের ন্যায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ স্থানগুলি অবশ্য তাহার পরিচিত। তাহার নিকট হইতে তদ্দেশ-প্রচলিত এই বাক্যটি শুনিলাম—

"গড় ত চিতোর গড় ঔর ত গড়ৈয়া;
রাণী ত কমলাবতী ঔর ত গধৈয়া
তড়াগ ত ভূপাল তড়াগ ঔর ত নঢৈয়া।"

চিতোরের ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার এইটুকু জ্ঞান আছে যে, এইস্থানে বহুকাল ধরিয়া রাজপুত বীরগণ 'কালীকা মা'জী'র সহায়তায় মুসলমানগণকে যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত করেন। যখন গড়ের উপর হইতে নামিলাম তখন রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

পথে কষ্টের অন্ত ছিল না; কিন্তু দেশ দেশান্তর হইতে তীর্থযাত্রীরা অজস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া তীর্থক্ষেত্রে উপনীত হইলে যেমন শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন-মাত্র তাঁহাদের সমস্ত ক্লেশ দূর হইয়া হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে,

তেমনই মুসলমান যুগে হিন্দু ইতিহাস রূপ অমাবস্যা রজনীর সর্ব্বোজ্জ্বল নক্ষত্র রামার্জ্জুন-বংশধর পুণ্যশ্লোক ক্ষত্রবীরগণের লীলাক্ষেত্র এবং আদর্শ-ভারত-রমণীকুলের বিহারভূমি এই চিতোরতীর্থ যে আমি দর্শন করিয়াছি—সে পবিত্র ধূলির স্পর্শে যে আমি পবিত্র হইয়াছি—ইহাতেই আমি আপনাকে সৌভাগ্যমান বলিয়া বিবেচনা করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় নদনদীর জীবন-সংগ্রাম।

কূলপ্লাবিনী প্রবাহিনী পর্ব্বতশিখর হইতে প্রবাহিতা হইয়া যখন সাগর-সঙ্গমে মিশিতে যায় তখন সে যেন ক্রীড়াচ্ছলে কখন বা তীর ভাঙ্গিতে কখন বা নূতন পলীস্তর দ্বারা তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকে। জগতের নিয়মে নূতন পুরাতনের স্থান অধিকার করে। যেমন নূতন ঋতু আসিয়া পুরাতনকে অপসৃত করিয়া দেয়, যেমন নূতন রাজা আসিয়া প্রাচীন নরপতির অধিকার স্বীয় করতলগত করিয়া থাকেন, সেইরূপ বৎসর বৎসর নূতন জলস্রোতঃ আসিয়া প্রবলবেগে পুরাতন তটভূমি ও সিকতারাশি বিভগ্ন ও বিধ্বস্ত করিয়া অন্য স্থানে নূতন চরের সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রবাহিনীর বেগ যত প্রবল হয়, নদী যত প্রখরা হয়, এই চর সৃষ্টি-ক্রিয়াও তত দ্রুত হইয়া থাকে। আমাদের বঙ্গদেশে নদ-নদীর অভাব নাই। পূর্ব্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা, তিস্তা (ত্রিস্রোতা) ও পশ্চিম বঙ্গে গঙ্গা, ভাগীরথী, প্রভৃতি কত নদ, নদী, উপনদী, শাখানদী প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ যে যে স্থান বিধৌত করিয়া প্রবাহিত ছিল এখন সেই সেই স্থান নদী হইতে বহু দূরে। সেই গতি-পরিবর্ত্তন কেন হইল বর্ত্তমান নিবন্ধে তাহারই আভাস দেওয়া হইবে।

নদী সচরাচর উচ্চদেশ হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর প্রদেশে ধাবিত হইয়া থাকে। সেইজন্য আমাদিগের সকল নদনদীই উন্নত হিমাচল-পর্ব্বত-প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমশঃ বঙ্গদেশের সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া সাগর-গর্ভে নিপতিত হইয়াছে। প্রবাহিনী যখন উচ্চতর প্রদেশ হইতে নিম্নতর

ভূমিতে প্রবাহিত হয় তখন সে গমনপথে বহু বাধা বিভগ্ন করিয়া ধ্বংসিত চূর্ণ বিচূর্ণ প্রস্তর ও পলী বারিরাশির সহিত ভাসাইয়া লইয় যায়। নদীর প্রখর গতি রোধ করিবার মত শক্তি অতি অল্প বস্তুরই আছে। কিন্তু যে স্থানে কোন কারণে সেই প্রচণ্ড বেগের গতিরোধ হয়, সে স্থানে সে বার নদীর প্রবাহ বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। পর বর্ষে বর্ষাবারিপাতে পুষ্টা প্রবাহিনী আকুল আবেগে আবার সেই বাধা অতিক্রম করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তখনও যদি তাহার শক্তি বাধার শক্তি অপেক্ষা ক্ষীণ হয় তাহা হইলে নদীর গতি চিরকালের জন্য অন্য দিকে কেবল যে ফিরিয়া যায় এমন নহে, পরন্তু সেই বাধা আপনার শক্তিবৃদ্ধি করিবার মত সামগ্রী লাভ করে। প্রবাহিনী যে সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ প্রস্তরাবলী ও পলীমাটীর অংশ ভাসাইয়া আনিতেছিল, তাহার অধিকাংশই বাধার মুখে আসিয়া জমিতে থাকে; ক্রমশঃ জল সরিয়া যাইলে সে সব শুষ্ক হইয়া জমাট বাঁধিয়া নূতন স্তরে পরিণত হয়, আর পর বৎসর আরও প্রবল জলে বাধা দিবার অবসর পাইয়া থাকে।

বঙ্গীয় নদনদীর জীবন সংগ্রাম কত দিন হইতে কি ভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং পরে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস আমরা মিষ্টার টি, এইচ, ডি, লাটুস লিখিত এসিয়াটিক সোসাইটিতে পঠিত বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভে পাইয়াছি।

আমাদের এই পৃথিবীর জন্মকাল হইতে মানবজাতির অস্তিত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে ভূতত্ত্ব হইতে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি। এক কালে এই প্রলয়প্লাবিত ভূতল চিরতুষার-নিহিত ছিল। ক্রমশঃ আভ্যন্তরিক উত্তাপ-সন্তাড়নে ইহার উপরিতল বিপর্য্যস্ত—বিধ্বস্ত হইয়াছে, বহু নূতন ভূমি জলমধ্য হইতে উপরে উঠিয়াছে। হিমালয়ের গাত্র পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই অভ্রভেদী হিমাচলও একদিন তুষার-নিহিত ছিল। তাহার নানা নিদর্শন বর্ত্তমান। এই হিমালয়-প্রদেশস্থ উপত্যকা ও অধিত্যকানিচয়ে এই তুষারাবরণের অনেক নিদর্শন এখনও পতিত হইয়া আছে। তবে উপত্যকা-পাদদেশে নিদর্শন যত সহজে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সমতল ভূমিতে তত অল্পায়াসে নয়নগোচর হয় না। সেই জন্য সাধারণ সমতল ভূমিতে তুষারাবরণের তাদৃশ নিদর্শন বিদ্যমান নাই। তবে সমতল ভূমিতে নিদর্শন সংগ্রহ করিবার উপায় ও আছে। কোন নদীর তীরস্থিত উভয় দিকের

মৃত্তিকাস্তরের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর করিয়া এবং তাহা কি ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং কিরূপে স্তর ভেদ করিয়া নদী তাহার গতি অব্যাহত রাখিয়াছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া প্রাচীন তুষারাবরণের অনেকানেক নিদর্শন লাভ করা যায়।

গঙ্গা ও তাহার উপনদী সমূহের তটভূমি এইভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার পার্শ্বস্থ উভয় দিকের মৃত্তিকাস্তরণের মধ্যে প্রাচীন পলী-স্তর বিদ্যমান আছে। এমন কি ঐই পলীস্তর সচরাচর বন্যার সময় জল যত দূর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে তাহার অপেক্ষা প্রায় একশত ফুট উচ্চে বিদ্যমান। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, তুষারাবরণ যুগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। কাযেই যখন সেই তুষারাশি হইতে বারিরাশি পর্ব্বত, উপত্যকা ও নদী-বক্ষ দিয়া প্রবাহিত হয় তখন বরফের চাপে অনেকানেক পর্ব্বতগাত্র বিভগ্ন হইয়া যায়, এবং সেই অপরিমেয় বারিপ্রবাহ যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল সে স্থানের ভূমি বিধৌত হইয়া পলী মৃত্তিকারূপে প্রচুর পরিমাণে সেই জল মধ্যে ভাসিয়া আসিয়াছিল। পর্ব্বতোপত্যকায় বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এখন সেই তুষারাবরণ কালের নিদর্শন স্বরূপ পড়িয়া আছে; আর সাধারণ সমতল ভূমিতে, নদীর খাতে, তীর-ভূমির গাত্রে প্রাচীন পলীস্তর সেই একই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাহাকে অধুনা পূর্ব্ববঙ্গের মধুপুর জঙ্গল বলে—যাহার উচ্চতা এখন বৃদ্ধি পাইয়া সাধারণ বন্যার জলসীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে—সেই মধুপুর জঙ্গল এইরূপে তুষার-বিগলিত-জলরাশি-বাহিত পলী মৃত্তিকায় গঠিত বলিয়া মনে হয়। পরে বৎসর বৎসর বর্ষার জলাগমে নূতন পলী পড়িয়া তাহা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। সামান্য চর ক্রমশঃ বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে পরিণত হইলে নদীর গতিও যে বাধা পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

এইরূপে নদীর গতি প্রতিহত হইয়া নদীপ্রবাহ অন্য দিকে ধাবমান হইলে তাহাতে নদীতীরস্থ স্থানসমূহের অনেক প্রকার ক্ষতি হয়। আজ যদি ভাগীরথী ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে কলিকাতা নগরীর বিচিত্র সৌন্দর্য্য, বিপুল বাণিজ্য এ সব কোথায় যাইবে? ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্ব্বে ঢাকা নগরীর পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত ছিল এখন তাহার প্রবাহ কত দূরে গিয়া পড়িয়াছে! পরিবর্ত্তন বিস্ময়কর।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মিষ্টার ফার্গুসন মধুপুর জঙ্গলস্থ ভূখণ্ড কিরূপে

সামান্য চর হইতে এত উচ্চ ভূমিখণ্ডে পরিণত হইল, সেই বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, এই মধুপুর জঙ্গলস্থ প্রদেশসমূহ কোনপ্রকার "ঊর্দ্ধগমন ফলে" উথিত হইয়াছে এবং সেইজন্যই ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ মেঘনা ও শ্রীহট্টের "ঝিলের" দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু এ কথা সহজে স্বীকার করা যায় না। কারণ তাহা হইলে সমস্ত প্রদেশেই বহু নৈসর্গিক চিহ্ন প্রকটিত থাকিত। আর যদি মধুপুর জঙ্গল এই প্রকার ঊর্দ্ধগমনজন্য উচ্চতা লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ সাধারণতঃ ও স্বভাবতঃ পশ্চিম দিকে ধাবিত হইত।

তিব্বতের সাঁম্পূ নদীর জল পাইয়া ব্রহ্মপুত্রের শক্তি বিকাশ করিবার সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে মানচিত্রে সাম্পুর প্রবাহ-পথ অন্যরূপ প্রদর্শিত হইত; কিন্তু মিষ্টার রেনেল ১৭৬৫ খৃঃঅব্দে স্থির করেন যে, সাম্পুর জল ডিহাং নদী হইয়া ব্রহ্মপুত্রে, পতিত হইতেছে। এই জল না পাইলে ব্রহ্মপুত্রের এত শক্তি বিকাশ বোধ হয় সম্ভবপর হইত না। আর মিষ্টার বরার্ত্ত ও মিষ্টার হেডিন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই জলাগমের পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ গঙ্গা নদী অপেক্ষা নিস্তেজ ও অল্পশক্তিসম্পন্ন ছিল। আর সেই জন্যই গঙ্গার আনীত পলীস্তরসম্ভূত মধুপুর চর বা আধুনিক মধুপুর জঙ্গল ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যখন ডিহাং নদী দিয়া সাম্পুর জল একত্রিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পড়িল তখন ব্রহ্মপুত্রের গতি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল।

অধুনা আবার তিস্তা নদীর 'বিশ্বাঘাতকতায়' গঙ্গার যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ব্রহ্মপুত্রের সেই পরিমাণ শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে। ১৭৮৭ খ্রীঃঅব্দে তিস্তানদীর জল, গঙ্গা-বক্ষ প্রবাহিত না করিয়া সহসা ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পড়ে; আর সেই অবধি ব্রহ্মপুত্রের শক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। ইহার ফল কি হইবে তাহা প্রথমে কেহ বুঝিতে পারে নাই। ইহার পর হইতে গঙ্গার ও ব্রহ্মপুত্রের সংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে, সংগ্রামের শেষ হইয়া যে ফলাফল নির্দ্ধারিত হইয়াছে এমন মনে হয় না। হয়ত ভবিষ্যতে এই সংগ্রাম ফলেই বঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গঠিত হইবে। ব্রহ্মপুত্র এখন যেরূপ ক্ষমতাশালী, তাহাতে সে যে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে এমন বোধ হয় না। কারণ, যত দিন পর্য্যন্ত আসামের উপত্যকা প্রদেশ সম্পূর্ণভাবে সমতলাকার ধারণ না করে, ততদিন ব্রহ্মপুত্র স্বীয় তেজ ও পরাক্রম

প্রকাশে যত্নবান থাকিবে। বন্যার সময় নদীর পরাক্রম নিম্নস্থ প্রদেশেই সমধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়া থাকে; কারণ খরস্রোতে উপর হইতে জল আসিয়া প্রবলবেগে নিম্নে জমিতে থাকে। ১৮৩৮ খৃঃঅব্দে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলের নিকট গঙ্গাকে এমন ভাবে সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছিল যে গোয়ালন্দের নিকট অনেক স্থলে লোকে পদব্রজে পার হইতে পারিত। এই কারণেই গরাই স্বল্পতোয়া ক্ষুদ্র নদী হইতে গভীর ও প্রশস্ত প্রবাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। জল বদ্ধ হইয়া অতিরিক্ত জল গরাই নদী-গর্ভে প্রবাহিত হইয়া কলিকাতা হইতে উত্তরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে যাতায়াতের বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আবার এই রূপ নূতন বিস্ময়কর ঘটনার সংঘটন অসম্ভব নহে। কালে ভাগীরথীর জল একেবারে নিঃশেষিত হইয়া জলাঙ্গীর নিকট হইতে অন্যদিকে প্রধাবিত হইতেও পারে। এই ঘটনা ঘটিলে বর্ত্তমান বঙ্গে কি স্বপ্নাতীত পরিবর্ত্তন ঘটিবে! ত্রিস্রোতাকে পুনর্ব্বার যদি গঙ্গা-গর্ভে প্রবাহিত করিতে পারা যায় তাহা হইলে কতকটা সুফল ফলিতে পারে। কিন্তু স্বভাবের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা অধিকাংশ স্থলেই মানবের বুদ্ধির ও শক্তির পক্ষে অসম্ভব। তবে বিজ্ঞানের উন্নতির' সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভের আশাও করিতেছে।

শ্রীকালীকুমার দত্ত।

সংগ্রহ।

—:o:—

সাহিত্য।

ওমর খৈয়ম।

আজকাল য়ুরোপে ওমর খৈয়মের কবিতার যে অসাধারণ আদর লক্ষিত হইতেছে এডওয়ার্ড ফিট্‌জিরাল্ডকৃত অনুবাদেই সে আদরের আরম্ভ। ওমরের কবিতায় মানব-হৃদয়ের অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির জন্য ব্যাকুল ব্যাগ্রতা যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—মানবের সুখলাভ-লালসা যেরূপে সপ্রকাশ হইয়াছে—সংসারের অনিত্যতা যে প্রকারে পরিস্ফুট হইয়াছে তেমন আর কোথাও হইয়াছে কি না সন্দেহ। সুতরাং সে কবিতার সমাদরে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। সংপ্রতি 'ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট্' পত্রে মুস্তাফা আলি খাঁ ফিট্‌জিরাল্ডের অনুবাদ উপলক্ষ করিয়া একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেই প্রবন্ধ আমাদিগের অবলম্বন।

পরিচয়।

ফিট্‌জিরাল্ড স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন; তিনি পল্লীগ্রামে বাস করিতেন; সর্ব্বদা লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি প্রগাঢ় সাহিত্য-রসিক ছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কাওয়েলের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। কাওয়েলের প্ররোচনায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ফিট্‌জিরাল্ড পারসিক ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কাওয়েল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে ওমরের কবিতার এক-খানি পাণ্ডুলিপি পাইয়া অধ্যাপকরূপে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে বন্ধুকে তাহার এক খানি প্রতিলিপি দিয়া আসিয়াছিলেন। কবিতাগুলি ফিট্‌জিরাল্ডের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। ইহার পর কলিকাতা হইতে কাওয়েল বন্ধুকে অন্যান্য পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিও পাঠাইয়া-ছিলেন।

অনাদর ও আদর।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ওমরের কবিতার ৭৫টি শ্লোকের অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া ফিট্‌জিরাল্ড 'ফ্রেজারস্ ম্যাগাজিনে' প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন। উহা প্রকাশিত না হওয়ায় কবি উহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। তখন মোট ২৫০ খানি পুস্তক মুদ্রিত হয়। পুস্তক বিক্রয় হয় না দেখিয়া প্রকাশক মূল্য হ্রাস করিয়া ইহা এক আনা (গস্ বলেন, চারি আনা) মূল্যে বিক্রয় করেন। সেই সময় কবি রসেটী ও কবি সুইন্‌বার্ণ ইহার পরিচয় পাইয়া কয়খানি পুস্তক ক্রয় করেন। ক্রেতা দেখিয়া প্রকাশক মূল্য বৃদ্ধি করেন ও পরদিন পুস্তকের মূল্য দুই আনা ধার্য্য হয়। ইহার পর

অনেকেই ইহার যশসৌরভে আকৃষ্ট হয়েন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে একজন আমেরিকান প্রথম সংস্করণের একখানি পুস্তকের জন্য ৬৭৫ টাকা পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন। ফিট্‌জিরাল্ডের পুস্তক দারুণ অনাদরের পর কিরূপ অসাধারণ আদর লাভ করিয়াছে, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

অনুবাদ।

দশ বৎসর পরে পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহাতে ১১০টি শ্লোক সন্নিবিষ্ট ছিল। অনুবাদক অনুবাদে এত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন যে, পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনে ও পরিবর্জ্জনে ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছে। প্রকাশিত অনূদিত শ্লোকগুলির মধ্যে প্রায় অর্দ্ধাংশ এক একটি মূল শ্লোকের অনুবাদ। প্রায় আর অর্দ্ধাংশ একাধিক মূল শ্লোকের ভাবব্যঞ্জক, চারিটিতে অন্য পারসিক কবির ভাব অভিব্যক্ত; আর কতকগুলি ফিট্‌জিরাল্ডের মৌলিক রচনা।

ওমর।

যৎকালে নর্ম্মাণগণ ইংলণ্ড অধিকার করিতেছিল, তৎকালে নিশাপুরে (খোরাসান) ওমরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দরিদ্র তাম্বু-নির্ম্মাতা ছিলেন; কিন্তু মেধাবী পুত্রকে সুশিক্ষা দিতে ব্যয়কুণ্ঠ হয়েন নাই। ওমর শেষে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ইমাম মৌয়াফকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আবুল কাসেম ও হাসান বিন সাব্বা তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। এই তিনজন বিদ্যার্থী উত্তর কালে পরস্পরকে উপার্জ্জিত অর্থের সমান অংশ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। আবুল কাসেম সুলতানের উজীর হইয়া বন্ধু-দ্বয়কে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে চাহিলে ওমর বিদ্যাচর্চ্চা করিবার জন্য রাজদরবার হইতে "বার্ষিক" চাহিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য বন্ধু বন্ধুর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ওমর শিল্প দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতিষ চর্চ্চা করিতেন। ওমর প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। সুলতান জেলালুদ্দীন যে আটজন পণ্ডিতের উপর পঞ্জিকা-সংস্কারের ভার অর্পণ করেন, ওমর তাঁহাদিগের একজন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন জর্ম্মণ অধ্যাপক ওমরের বীজগণিত সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ওমর অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনায় কালাতিপাত করায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোক ব্যতীত অন্য কোনরূপ কবিতার রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রত্যেক শ্লোকে এক একটি সম্পূর্ণ ভাবের অভিব্যক্তি। সে সকল শ্লোক এমনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যে, অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনায় অবসরের অভাবে ওমর যে আর অধিক কবিতার রচনা করিতে পারেন নাই, ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে।

অনুবাদ ও অনুবাদক।

ফিট্‌জিরাল্ডের মনে হইল, যেন ওমর তাঁহার মনের কথা বলিয়াছেন; যেন তিনি ওমরের প্রতিকৃতি; যে ভাবপ্রাবল্য ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ফিট্‌জিরাল্ডের স্বভাবনিবদ্ধ—ওমরের কবিতায় তাহাই পরিস্ফুট। তাই বেন্‌সন্ সত্যই বলিয়াছেন, ওমরের উপাদানে নিপুণ শিল্পী ফিট্‌জিরাল্ড অনিন্দ্যসুন্দর রচনা রচিত করিতে পারিয়াছিলেন। ফিট্‌জিরাল্ডের শব্দসম্পদের অভাব ছিল না। তিনি সুকবি ছিলেন। ওমরের কবিতায় তিনি যেন আপনার ঈপ্সিত বস্তু পাইয়াছিলেন। যে ছন্দে তিনি ওমরের কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলেন, সে ছন্দ ফিট্‌জিরাল্ডের নিজস্ব।

বিদেশে পূজিত ওমর স্বদেশে শ্রেষ্ঠ কবিকুলে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। কেবল যে দীর্ঘ কবিতা রচনা না করাতেই তাঁহার শ্রেষ্ঠকবিসম্মানলাভ ঘটে নাই, এমন নহে! তাঁহার কল্পনার দৌর্ব্বল্যই তাহার কারণ। তিনি অঙ্কশাস্ত্রের চর্চ্চায় নিমগ্ন থাকায়—কল্পনাকুশল হইতে পারেন নাই। তাঁহার হৃদয়াস্থিত প্রত্যেক ভাব এক শ্লোকে সপ্রকাশ। কিন্তু সেই জন্যই সে সকল শ্লোক সম্পূর্ণ ও সুমধুর। কবির দেশবাসীদিগের নিকট যে কারণে তাঁহার সম্মানের অভাব, সেই কারণেই ফিট্‌জিরাল্ড তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অনুবাদে ওমরের কবিতা ভোগের গান:—

ওমরের আদর।

স্বরগের আশা আছে, নরকের ভয়;
আমি জানি, এ জীবন বহু দিন নয়।—
এই কথা সত্য জানি,
আর সব মিথ্যা মানি।
এই কথা জানি আমি সার,——
যে ফুল বারেক ফুটে—ফুটে না সে কখন আবার।

ওমরের কবিতার মতামত লইয়া বহু বিতর্ক হইয়াছে। সে কবিতা ভোগের, কি ধর্ম্মের, তাহার বিচারের অবসর আমাদের নাই। তবে হেরন এলেন্ সত্যই বলিয়াছেন, ওমরের কবিতামুকুরে প্রত্যেক পাঠক স্বীয় হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবেন। ফিট্‌জিরাল্ড সে কবিতায় আপনার মতের অভিব্যক্তি দেখিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অনুবাদ তাঁহাকে ইংরাজি কবিকুঞ্জে স্বর্ণাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে অক্ষয় যশে যশস্বী করিয়াছে।

মতামত।

ওমরের কবিতার অনুবাদে ফিট্‌জিরাল্ড অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অধ্যাপক নর্ট ন বলিয়াছেন, অনুবাদ একজন কবির ভাবে অনুপ্রাণিত অন্য কবির কবিকীর্ত্তি; ইহা অনুকরণ নহে, প্রতিকৃতি, অনুবাদ নহে—কবির ভাবের পুনরাভিব্যক্তি। ডেনহ্যাম বলিয়াছিলেন, কবিতার মাধুরী অনুবাদে থাকে না; যদি অনুবাদে অনুবাদক নূতন ভাবের সঞ্চার করিতে না পারেন, তবে তাহা রসহীন শব্দসমষ্টি মাত্র হয়। ফিট্‌জিরাল্ড অনুবাদে নূতনভাব-সংস্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ওমরের ভাবে ওতপ্রোত হইয়া ওমরের কবিতাকে আপনার সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছিলেন—তাই ইংরাজি ভাষা যতদিন স্থায়ী হইবে—ফিট্‌জিরাল্ডের অনুবাদ ততদিন অমর।

কৃতিত্ব।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

রাজপুত রাজ্যে।

এখন প্রতি বৎসর হিমাগমে বহু বিদেশী ভ্রমণকারী ভারত-পর্য্যটনে আসিয়া থাকেন। স্বদেশে বর্ষব্যাপী কার্য্যের পর এ ভ্রমণ বিশ্রামের নামান্তর মাত্র। বিশেষ প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে প্রভেদ এমন প্রবল ও পরিস্ফুট যে, সাধারণ ভ্রমণকারীর পক্ষে ভারত-ভ্রমণে নূতন নূতন দৃশ্যদর্শন ব্যতীত বিশেষ কিছু লাভ ঘটে না; ভারতের অন্তর্নিহিত রহস্যভেদ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ভারত-ভ্রমণ কষ্টবহুল জীবনের বিরলপ্রাপ্ত সুখমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। কোন কোন বিদেশী ভ্রমণকারী সতর্ক পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচালনা করিয়া ভারতের অন্তর্নিহিত রহস্যভেদ করিতে সচেষ্ট হয়েন—সে চেষ্টা, সর্ব্বত্র না হউক, কোথাও কোথাও যে সফল হয় তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বিশেষ যে সহানুভূতি ব্যতীত অপরের হৃদয়ে প্রবেশাধিকারলাভ অসম্ভব, সে সহানুভূতি-সম্বল যাঁহাদিগের থাকে তাঁহাদিগের চেষ্টা সহজে সফল হয়। এইরূপ সাফল্যের ফল 'পিয়েরলোটি' ছদ্মনামধারী ফরাসী লেখকের ও সার ফ্রেড্রিক ট্রিভসের ভারত-ভ্রমণ-বিবরণে দেখা যায়। গত বৎসর মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আপনার ভ্রমণবিবরণ ও অভিজ্ঞতার বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিতেছেন। 'ডেলি ক্রনিকেল' পত্রে তিনি রাজপুতরাজ্যের বিষয়ে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন নিম্নে তাহার সার সঙ্কলিত হইল:—

বরোদার উত্তরে ভূমি সমতল ও তৃণাস্তৃত। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অধিবাসিগণের পরিবর্ত্তন ও সহজে অনুভূত হয়। ইহারা সমধিক 'দর্শনধারী'। ইহাদিগের শ্মশ্রু মধ্যভাগে বিভক্ত ও কর্ণ পার্শ্বেবদ্ধ।

পুরাতন।

ইহাদিগের হস্তে পুরাতন আগ্নেয়াস্ত্র ও তরবার। সন্ধ্যাগমে চারি দিকে নানা পথ দিয়া গৃহপালিত পশুপাল গ্রামে ফিরিয়া আইসে। এই রাজপুতানা—বীরপ্রসবিনী—বীরাঙ্গনা-জন্মভূমি। বরোদা যেন হাসিয়া বলে, "আমি নূতন।" রাজপুতানা গর্ব্বিত স্বরে বলে, "আমি পুরাতনপ্রিয়"। রাজপুতানার কোন কোন অংশ বাণিজ্যের ও রাজনীতির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই; কোন কোন রাজপুত রাজা বিদেশীর অনুকরণতৎপর। কিন্তু এ সব পরিবর্ত্তন এখনও সর্ব্বত্র সংক্রমিত হইতে পারে নাই।

রাজপুত রাজাদিগের মধ্যে প্রতাপ সিংহের সহিত লেখকের প্রথম পরিচয় হয়। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; হয়ত তাঁহার ভাগ্যে আর রণক্ষেত্রে গমন নাই।

শৌর্য্য।

ইঁহার সহিত দুই তিন দিন একত্র বাস করিয়া লেখক রাজপুতের স্বভাবসিদ্ধ শৌর্য্যের বিষয় বুঝিতে পারেন; সে শৌর্য্য চিতোরের

দান। ভারতে-গমন করিয়া ধ্বংসকরস্পৃষ্ট চিতোরের মন্দির, প্রাসাদ, বাজার, সরোবর না দেখিলে ভারত ভ্রমণ পণ্ডশ্রমমাত্র। চিতোরের পুরপ্রাচীরে কিম্বদন্তী কি পূতস্রকদাম বিজড়িত করিয়াছে। সুদৃঢ়-প্রাচীর-মধ্যবর্ত্তী তোরণ-বহুল বঙ্কিম পথে যাইতে যাইতে যেন মনে হয়, রাজপুত সেনার অশ্বপদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে; পর্ব্বতের পাদ দেশে ও উপরে অবস্থিত পল্লীর কোলাহল শুনিয়া মনে হয়, বুঝি রাজপুত নারী মোগলের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য গান গাহিতে গাহিতে হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছেন। এই পথে —এই ধ্বংসস্তূপের উপর যাইবার সময় নগ্ন পদে নগ্ন মস্তকে যাইতে হয়। এ মহাশ্মশানে সবই পবিত্র। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সহসা চারিদিকে বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল,—মন্দিরে মন্দিরে দীপ জ্বলিয়া উঠিল,—স্তবস্তোত্র পাঠের উদাত্ত ধ্বনি গগন পূর্ণ করিল। মনে হইল, যেন সমস্ত দেশের উপর অতীতের ছায়াপাত হইল। চিতোরে অতীত মৃত নিশীথে তাহার স্বরূপ অনুভূত হয়। কিন্তু নূতন রাজধানী উদয়পুরে অতীত দিবালোকে দেদীপ্যমান।

অস্পৃশ্য যেমন মন্দিরের বাহিরে দাঁড়ায় মন্দিরমধ্যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই—রেল পথ তেমনই উদয়পুরের বাহিরে শেষ হইয়াছে। তথা হইতে নগর প্রায় এক ক্রোশ দূর।

উদয়পুর।

নগরে বহু সমুচ্চ শ্বেত প্রাসাদ ও মন্দির—চারিদিকে পর্ব্বতেও প্রাসাদ, দুর্গ ও মন্দির। রাজপথে ভস্মভূষিত নগ্নপ্রায় সন্ন্যাসীরা যাতায়াত করিতেছেন, বা তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া অনন্তের চিন্তা করিতেছেন। নগরে যাইয়া লেখক শুনিলেন, প্রাসাদ হইতে ধর্ম্মসংসৃষ্ট শোভাযাত্রা আরব্ধ হইয়াছে। অশ্বে ও গজে বহু লোক আসিতেছে—স্বর্ণাতপত্রতলে মহারাণা স্বয়ং আসিতেছেন। শৃঙ্গনাদ, ঢক্কানাদ, ভেরীনাদ শ্রুত হইতেছে। বর্ষা শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই সময় সামন্তগণ সমবেত হইয়া রাণার সহিত যুদ্ধযাত্রা করিতেন। যাত্রার পূর্ব্বে দেবতাকে তুষ্ট করা আবশ্যক। সেই জন্য একজন সাধু অঙ্কে তরবার লইয়া অনাহারে—অনিদ্রায় দশ দিন মন্দিরে বসিয়া থাকিতেন, প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সসামন্ত মহারাণা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিতেন। এখন ও সেই প্রথা প্রচলিত আছে। পরলোকগত কোন রাণার তরবার অঙ্কে লইয়া একজন যোগী মন্দিরে বসিয়া আছেন—যেন দেশে শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই—যেন বর্ষার পর দিকে দিকে রণবাদ্য বাজিয়া উঠে। পর দিন প্রাতে মহারাণা লেখককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রাসাদমধ্যে সবই গোলমাল; রবিকরদীপ্ত অমলধবলপ্রাচীরপরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণে উষ্ট্র, অশ্ব, গজ বিহগ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শিশু হইতে বৃদ্ধ সবই তথায় বিদ্যমান। বিচারার্থীরা আবেদন পত্র লইয়া দ্বারে বসিয়া আছে, সৈনিকগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, লেখক ও পারিষদগণ স্তম্ভে হেলান দিয়া বসিয়া আছে বা মর্ম্মরবেদীতে শয়ন করিয়া আছে। বহু পথ ও সোপান অতিক্রম করিয়া লেখক রাণার সমীপে নীত হইলেন।

রাণা বলিলেন, তিনি পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার অঙ্কে একখানি তরবার ছিল। তিনি সেখানি নাড়িতেছিলেন। রাণার নিকটে আসিলে মনে হয়, যেন সুদূর অতীতে

রাণা।

উপনীত হইলাম। রাণার গর্ব্ব এই যে, তাঁহার পরিবারের সহিত কখন মুসলমানের বিবাহ-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই; তিনি কখন রাজ-

পুতের মূল মন্ত্র ত্যাগ করেন নাই:—যে ধর্ম্ম রক্ষা করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করে। তিনি বলেন, তিনি প্রাচীন প্রথার সমর্থক। রাজ্যে ভ্রমণ কালে তিন সহস্র অনুচর তাঁহার সহগামী হয়। তিনি প্রতিদিন প্রাতে দেবপূজা করেন, প্রতিদিন বিচারপ্রার্থীদিগের আবেদন শুনেন; মৃন্মূর্ত্তি খণ্ডিত করিয়া তরবার-চালন-কৌশল অব্যাহত রাখেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন মোগলের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই, তাঁহার ঘড়ী ও তেমনই কলিকাতার সময় রাখে না। লেখক যখন প্রাচীন প্রথার বিলোপের প্রতিবাদ করিলেন, তখন রাণা বলিলেন, তাঁহার সামন্তগণ সকলে প্রাচীনের প্রতি অনুরক্ত নহেন। রাজপুতের দেশে—প্রাচীনের প্রিয় ভূমি ও বিজয় দুর্গ রাজপুতানায় পুরাতনের স্থান নূতন অধিকার করিতেছে। ইহা অনিবার্য্য। তবে পুরাতনের ভিত্তির উপর যে নূতন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই স্থায়ী হয়, তাহাই সমাজের উপযোগী ও উপকারী; অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তার ফলে যে নূতনের অভ্যুদয়, তাহা সমাজের কল্যাণকর হয় না।

—:•:—

বিবিধ।

ভারতীয় অবস্থা ও ব্যবস্থা।

সার থিয়োডোর মরিসন আলিগড়ে মুসলমান কলেজের পরিচালক ছিলেন; এক্ষণে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতে শিল্প-সংস্থান বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়া অর্থনীতির আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি আগ্রা ও অযোধ্যা অঞ্চলের অবস্থার ও ব্যবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। এই অঞ্চলের সহিত তাঁহার পরিচয় সপ্তদশবর্ষব্যাপী। সুতরাং এই অঞ্চলের অবস্থার ও ব্যবস্থার আলোচনায় তাঁহার বিশেষ সুবিধা ছিল। আমরা অর্থনীতি সম্বন্ধে যে সকল য়ুরোপীয় ও আমেরিকান পুস্তক পাঠ করি, সে সকলে বর্ণিত অবস্থার সহিত ভারতের অবস্থার তুলনায় আলোচনা ব্যতীত আমাদের উপকারের সম্ভাবনা নাই। সকল দেশে ও সকল সমাজে একই ব্যবস্থা উপকারী হয় না,—হইতে পারে না। যে সকল ব্যবস্থা সমাজবিশেষের পক্ষে হিতকর, সে সকল অন্য সমাজের পক্ষে যে হিতকর হইবেই এমন নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডে অনুসৃত অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের অবস্থা বুঝিয়া ভারতীয় ব্যবস্থার নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। ভারতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনা এখনও যথেষ্ট হয় নাই। এ সম্বন্ধে পরলোকগত রাণাড়ে মহোদয়ের পুস্তকই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সে পুস্তকও এই জটিল বিষয়ের সম্পূর্ণ বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আলোচনা নহে। তিনি কেবল পথ দেখাইয়াছেন সার থিয়োডোর সংপ্রতি লণ্ডনে ভারতীয় অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়টি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। সে সকল প্রবন্ধে ভারতীয় অর্থনীতির কথা আলোচিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাঁহার কথার সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম:—

বহুদিন পূর্ব্বে 'এরিক ম্যাকে' বলিয়াছিলেন, ভারতে অন্নাভাব সর্ব্বব্যাপী,—দুর্ভিক্ষও লাগিয়াই আছে। ভারতে দুর্ভিক্ষ এখন ঋতুপরিবর্ত্তনেরই মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাযেই ভারতের অর্থনীতির কোন কথা বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দুর্ভিক্ষের কথা বলিতে হয়; দুর্ভিক্ষের করাল কাদম্বিনীজালের অপসারণ ব্যতীত ভারতের ভাগ্যগগনে সুখসূর্য্যালোকবিকাশ অসম্ভব। সার থিয়োডোর ও তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে ভারতে দুর্ভিক্ষের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, সেকালে পথের ও যানের অসুবিধা থাকায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রভূত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যপ্রেরণ অসম্ভব ছিল। সেকালে য়ুরোপে ও ভারতে এই কারণে সর্ব্বদাই দুর্ভিক্ষের ভয় থাকিত; তখন ধনবানগণ ইচ্ছা করিলেও বিপন্নের বিপদ নিবারণ করিতে পারিতেন না। ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাকা রাস্তা, খাল, রেলপথ প্রভৃতির প্রবর্ত্তনের ফলে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের-দুর্ভিক্ষ-কালে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে ও শস্য-সম্পদ-সম্পন্ন স্থানে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের তারতম্য হয় নাই। এই জন্য সরকারের পক্ষে বাণিজ্যের ব্যবস্থাপরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু খাদ্য দ্রব্য পাইলেও লোকের কিনিবার সাধ্য কোথায়? ভারতে বৎসর না ফিরিলে—আবার বর্ষণ-স্নিগ্ধ ভূমিতে শস্য উৎপন্ন না হইলে—দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস হয় না। এইজন্য সেবার ল্যাঙ্কাসায়ারে তুলার দুর্ভিক্ষে শতকরা সাড়ে আটজন লোক মাত্র বিপন্ন হইয়াছিল, আর ভারতে দুর্ভিক্ষে শককরা পঁয়ষট্টিজন লোক বিপন্ন হয়। তাই সরকার বিপন্নদিগকে খাটাইয়া পারিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা করেন।

দুর্ভিক্ষ।

সার থিয়োডোর পুরাতন কথা বলিরাছেন; এক পক্ষের কথা বলিয়াছেন। রেলপথ বিস্তারের সহস্র সুবিধার কথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু ইহার অসুবিধার দিকটা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। রেলপথ সম্বন্ধে ভারত সরকারের ভুতপূর্ব্ব পরামর্শদাতা মিষ্টার হোরেস বেল এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ১৮৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কমিশন বলিয়াছিলেন—রেলপথ বিস্তারে দুর্ভিক্ষ দূর না হউক—দুর্ভিক্ষের প্রকোপহ্রাস হইবে। তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন আর ১০,০০০ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হইলেই দুর্ভিক্ষ দানব নখদন্তহীন হইবে। এখন ১০,০০০ মাইলের অধিক রেল পথ বিস্তৃত হইয়াছে; কিন্তু দুর্ভিক্ষ-দমন হয় নাই। রেল-বিস্তারের ফলে খাদ্যশস্যের অপ্রাপ্তি অসম্ভব হইয়াছে; কিন্তু হয়ত রেলপথ-বিস্তারের ফলেই খাদ্য-শস্যের মূল্য এত বাড়িয়া যায় যে, দরিদ্রের পক্ষে তাহা ক্রয় করা অসাধ্যসাধন হইয়া দাঁড়ায়। সার জর্জ ক্যাম্বেল বলিয়াছিলেন, পথের সুবিধার ফলে লোকে শস্য-সঞ্চয়ের অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছে; ফলে সুসময়ে সঞ্চয়শীল না হইয়া তাহারা দুঃসময়ে দুর্দ্দশায় পতিত হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশন ও এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। আবার পথের সুবিধায় এখন অনেক খাদ্য-শস্য-প্রদ ক্ষেত্রে বিদেশের জন্য অন্য শস্যের চাষ হইতেছে। আবার একে ত খাদ্যশস্যের মূল্য যে হারে বাড়িয়াছে পারিশ্রমিক সে হারে বাড়ে নাই, তাহাতে আবার পথের সুবিধায় দুর্ভিক্ষের আরম্ভেই শঙ্কিতজনগণ পল্লী হইতে কর্ম্মকেন্দ্র সহরে আসিয়া পারিশ্রমিকের হার আরও কমাইয়া

ভালমন্দ।

দেয়। সুতরাং রেলপথ-বিস্তারে সুবিধাও যেমন—অসুবিধাও তেমনই ; ইহাতে উপকার ও অপকার উভয়ই আছে।

প্রবন্ধান্তরে সার থিয়োডোর ভারতে পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মধ্যে যাতায়াতের অসুবিধা, শ্রমবিভাগের অভাব, মূলধনের অল্পতা ও শ্রমজীবী কর্ত্তৃক শিল্পের পরিচালনা পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবস্থার বিশেষত্ব ছিল। এখন সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যেমন প্রাচীনের স্থান নবীন অধিকার করিয়াছিল, এখন ভারতে তেমনই পুরাতনের পতন ও নূতনের অভ্যুদয় হইতেছে। গতায়াতের সুবিধা ব্যতীত নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন অসম্ভব ; সে সুবিধা হইয়াছে। ইহাতে যে কিছু অপকার হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সুযোগে বিদেশী দ্রব্যের প্রবল প্রতিযোগিতায় ভারতের সঙ্কুচিত শিল্পের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলের কাপড়ের আমদানীতে তাঁতের সর্ব্বনাশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ক্ষতির তুলনায় লাভ অনেক অধিক। ভারতেও কলকারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। বাস্তবিক ভারতে কলকারখানা-সংস্থাপন এরূপ প্রবল বেগে সম্পাদিত হইতেছে যে, য়ুরোপেও সর্ব্বত্র সেরূপ হয় নাই। মৃত রাণাড়ে মহোদয় ইহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ পূর্ব্বে কেবল কৃষিজাতের উৎপাদনে ব্যাপৃত ছিল, এখন ভারতে কলকারখানা সংস্থাপিত হইতেছে, বাণিজ্য ও প্রসার প্রাপ্ত হইতেছে। এ কথা যে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষ অন্য দেশের প্রবল প্রতিযোগিতার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইলে ভারতের পক্ষে প্রতীচ্য প্রথার অবলম্বন আবশ্যক। কিন্তু ইহাতে ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইবে না। প্রতীচ্য প্রথায় যে গৃহবদ্ধ শিল্পের (cottage industries) সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সেই শিল্পে দেশে দারিদ্র্যের প্রকোপ নিবারিত হইতে পারে। য়ুরোপে ও আমেরিকায় বড় বড় কলকারখানার ফলে একদিকে পুঞ্জীকৃত ধন—অন্য দিকে দারুণ দারিদ্র্য, একদিকে গর্ব্বিত ধনী—অপর দিকে নিষ্পিষ্ট শ্রমজীবী—সমাজে বিষম অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সার থিয়োডোর সে সকলের আলোচনা করেন নাই। তাই তাঁহার প্রবন্ধ এক পক্ষের কথায় পূর্ণ।

অর্থনৈতিক বিপ্লব।

———

সমালোচনা।

রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত।*

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসের' সমালোচনা করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।" আজ রাজনারায়ণ বাবুর আত্ম-চরিতের আলোচনা করিতে যাইয়া সেই কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। রাজনারায়ণ বাবু বাঙ্গালার সন্ধি যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন মুসলমান প্রভাবে প্রভাবিত বাঙ্গালার "মরা গাঙ্গে"—ইংরাজী প্রভাবের বন্যা প্রবেশ করিতেছে। সেই নূতনের ও পুরাতনের সন্ধিকালে রাজনারায়ণ বাবুর জন্ম। তৎকালে দেশে ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাজনীতি ও সমাজ—এই সব দিকে সংস্কার কার্য্যে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই বসু মহাশয়ের বন্ধু বা সহকর্ম্মী। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলে নব্য বাঙ্গালার প্রথম যুগের বিশদ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন। ভল্‌টেয়ার দেখাইয়াছেন,—নৃপতির বিবরণে ও যুদ্ধের বর্ণনায় ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না—দেশের লোকের অবস্থার আলোচনাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য। দেশের জনগণের নেতৃবৃন্দের—সংস্কারকদিগের কথা ইতিহাসের হিসাবে নৃপতিবৃন্দের কার্য্য-বিবরণের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন ঃ—

"ভারতের পরাক্রান্ত নৃপতিনিচয়
হয়েছে অদৃশ্য সহ রাজ্য-সিংহাসন,
ত্রিকালের সীমা ওই হের নিরূপিয়া
দাঁড়ায়ে রয়েছে তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
নশ্বর জোনাকিরাশি গিয়াছে নিবিয়া,
অমর তারকাবলি রয়েছে চাহিয়া।"

বাঙ্গালার সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাস লিখিবার সুযোগ ও সম্বল রাজনারায়ণ বাবুর ছিল। নব্যবঙ্গের গঠনকারীরা অনেকেই যে বসু মহা-

* রাজনারায়ণ বসুর আত্ম চরিত—কুন্তলীন প্রেস হইতে প্রকাশিত, মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১।৵০, কাগজের মলাটে ১৵০।

শয়ের বন্ধু বা সহকর্ম্মী ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার যে সূক্ষ্ম পরিবেক্ষণশক্তি ঐতিহাসিকের আবশ্যক গুণ, বসু মহাশয়ের তাহা প্রচুর পরিমাণ ছিল। আলোচ্য পুস্তকে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত—সমিতি-বর্ণনায় পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। ইহাতে অল্প কথায় তিনি অনেক লোকের ও ঘটনার এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সময়ের আচার-ব্যবহারের চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। আর তাঁহার অসাধারণ সরলতার আলোকে সেই চিত্র উদ্ভাষিত :—

"১৮৭৫ সালে ৩০শে জুলাই তারিখে আমি তদানীন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার্ রিচার্ড টেম্পল দ্বারা বেলভিডিয়ার ভবনে সান্ধ্য সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হই। ঐ সান্ধ্য সম্মিলনে সকল প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সার্ রিচার্ড টেম্পলের যাহা দোষ থাকুক না কেন তাঁহার একটি মহৎ গুণ ছিল। তিনি বাঙ্গালী জাতিসাধারণের প্রিয় হইবার চেষ্টা করিতেন। আমি যে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বেলভিডিয়ারে যাই, সেই গাড়ীতে প্রসিদ্ধ নাটককার মনোমোহন বসু ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, 'ছোটলাট বাহাদুরের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিব তাহা প্রতি পদে পদে আমাকে শিক্ষা দিবেন।' আমরা যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন ছোটলাট অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সাহেবের সহিত আহার করিতেছিলেন। আমরা গিয়া চাপরাসী-প্রদত্ত আসনে বসিলাম। সাহেবরা আহারের পর যে ঘরে আমরা ছিলাম সেই ঘরে আসিলে আমরা চাপরাসীশ্রেণীর ন্যায় দুই লাইনে কাতার দিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার মধ্য দিয়া ছোটলাট ও ছোটলাট পত্নী প্রত্যেকের সঙ্গে কর-মর্দ্দন করতঃ চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বর্ষীয়সী লেডি টেম্পল পিসী ঠাকুরাণীর ন্যায় ঈষদ্ধাস্য করতঃ সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন। তিনি এমন সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিলেন যে তাঁহাকে আমি মনে মনে পিসী ঠাকুরাণী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ছোটলাট যখন চলিয়া যাইতে লাগিলেন এই কথা বলিবার সময় সগুম্ফ চলিয়া যাইতে লাগিলেন আমার বলা উচিত ছিল। এমন জমকাল গোঁফ কখন দেখি নাই। সার রিচার্ড টেম্পলের নিকট তাঁহার গোঁফ বড় শ্লাঘার বিষয় ছিল। লোকে বলিত যে তাঁহার গোঁফ নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির ন্যায় ছিল। যেমন তিনি আমাদের মধ্য দিয়া প্রত্যেকের করস্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন গভর্ণমেণ্টের বঙ্গানুবাদক রবিনসন্ সাহেব (টৌনসেণ্ড ও রবিনসন্‌কে বুড়া শিব মার্শমেনের নন্দী ভৃঙ্গী বলিয়া ঈশ্বর গুপ্ত বর্ণন করিয়াছিলেন) আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় তাঁহার নিকট দিতে আরম্ভ করিলেন। সকল গ্রন্থকর্ত্তা অপেক্ষা মনোমোহন বসু ছোটলাট সাহেবের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হইলেন। অতএব ছোটলাট সাহেবের নিকট কিরূপ আচরণ করিতে হইবে সে বিষয়ে আমাদের নিকট হইতে তাঁহার আর কোন শিক্ষা লইতে হইল না। বরং তিনি যদি আমাদিগের প্রতি নেক্ নজর করিতে লাট সাহেবকে অনুরোধ করিতেন তাহা হইলে শোভা পাইত। হেয়ার সাহেবের স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়ের প্রণীত 'বঙ্গের সুখাবসান

নাটকের কথা পাড়িয়া ছোটলাট তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। সেই নাটকে হরলাল বাবু কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীনতাস্পৃহা প্রকাশ করাতে ছোটলাট সাহেবের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। * * উল্লিখিত সান্ধ্য সম্মিলনে মান্দ্রাজের (ঐ সময়ে ভাবী) গবর্ণর গ্রণ্টডফ্ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারত-ভ্রমণ জন্য ঐ সময় বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন। উক্ত মজ্‌লিসে বঙ্গহিতৈষী মনস্বী কটন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ইনি মেদিনীপুরে যখন আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তথায় আমার নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। এই মজ্‌লিসে মুঁসে মিনায়ফ্ উপস্থিত ছিলেন। ইনি রুষদেশীয় পণ্ডিত, সংস্কৃত ভাল জানেন। ইনি একদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে গিয়া আমার প্রণীত ইংরাজী পুস্তিকাসকল ক্রয় করিয়াছিলেন। ইনি আগ্রহের সহিত আমার করমর্দ্দন করিলেন। ইনি এই সময়ে ভারত-ভ্রমণার্থ আসিয়াছিলেন। বিখ্যাত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সমভিব্যাহারে ইনি ভাটপাড়া ও নবদ্বীপের টোল সকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পরিদর্শন সময়ে তিনি কেবলই ইংরাজের নিন্দাবাদ ও রুষের প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার রোটস্ নামক বিলাস-তরণীস্থ সম্মিলনে (আগষ্ট, ১৮৭৫ সাল) নদী ভ্রমণে উল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। সে দিন অনেক বড়মানুষদিগকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সেইদিন গরীব গ্রন্থকর্ত্তা ও বড়মানুষ লইয়া এক চমৎকার মিশ্র দৃশ্য হইয়াছিল। বড়মানুষদিগের মুখশ্রীতে বিস্ময়ের চিহ্ন আমরা অনুভব করিলাম। তাঁহারা মনে মনে করিতেছিলেন, "এ বেটারা কোথা হইতে আইল?' সার রিচার্ড টেম্প্‌লের পর ইডেন সাহেব লেফটেনেণ্ট গবর্ণর হইলে আমাদিগের নাম বেলভিডিয়ার রাজভবনে নিমন্ত্রণীয়দিগের নামের ফর্দ্দ হইতে উঠাইয়া দেন। বিলাস-তরণীতে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের জলযোগজন্য ছোটলাট বিশিষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব দিন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটরী বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলিয়া তাঁহার পরিবারদিগের দ্বারা এক হাজার পানের খিলি প্রস্তুত করান হইয়াছিল। সোডাওয়াটার, লেমনেড, আইস্‌ক্রিম্, সন্দেশ ও নারিকেল যথেষ্ট ছিল। দেখিলাম, পরলোকগত রাজা নর্সিংএর বিখ্যাত কৃপণ পুত্র বিনাব্যয়লব্ধ রাজবাটীর আইস্‌ক্রিম্ বেগল্‌গস্ ভক্ষণ করিতেছিলেন। আমি কিছু আহার করিতে মানস করিয়াছিলাম কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) প্রকাশ্য রূপে ইংরাজের তরণীতে জলযোগ করিতে নিষেধ করাতে আমি তাহা হইতে বিরত হইলাম। ইংরাজের তরণীতে আমার প্রকাশ্য রূপে জলযোগ করাতে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু বৃদ্ধের কথা শুনা কর্ত্তব্য বোধ করিলাম। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় আমার পরলোকগত পিতার ও আমার পরম সুহৃদ ছিলেন। প্যারীচাঁদ বাবু অপ্রকাশ্যরূপে যবনস্পৃষ্ট দ্রব্য খাইতেন কিন্তু প্রকাশ্যরূপে খাইতে বিহিত বোধ করিতেন না। যে ষ্টীমার রোটসকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল সেই ষ্টীমারে যখন ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল ও নদীর স্নিগ্ধ বায়ু গায়ে লাগিতে লাগিল তখন মনে বড় আনন্দের উদয় হইল। সগুম্ফ সার রিচার্ড টেম্পল সহাস্য বদনে প্রত্যেক ব্যক্তির করমর্দ্দন করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। এক দিন

বেলভিডিয়ারের হাতার তাম্বু গাড়িয়া তাহার ভিতর আমাদিগকে পোলাও খাওয়াইতে ছোটলাট সাহেব সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্ট বশতঃ তিনি শীঘ্রই বোম্বাইয়ের গবর্ণর হইয়া যাওয়াতে সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।"

রাজনারায়ণ বাবুর সতীর্থদিগের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"আমার সহাধ্যায়ীর মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারিচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র দেব ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন। পরলোকগত কবিবর মাইকেল মধুসূদন সেকেণ্ড ক্লাস হইতে খ্রীষ্টিয়ান হইয়া ছাড়িয়া যান। তৎপরে বিশপ্স কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। প্যারীচরণ সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রোফেসর এবং সুরাপাননিবারিণী সভার প্রথম সংস্থাপক ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বারিষ্টর। তিনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া বিলাত যান। ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদে দিন কতক নিযুক্ত ছিলেন। * * লিভিতে ইহাঁর কন্যার ভারতীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া ভারত সাম্রাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বড় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যখন ভারতে ছিলেন, তখন এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'I am a Brahmin Christian' মানুষ হাজার উদার হউক তাহার পক্ষে জাত্যভিমান সম্যকরূপে পরিত্যাগ করা সুকঠিন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃত যশের সহিত Inspector of Schools পদের কার্য্য সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন। ইনি বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং 'গার্হস্থ্য বিধি' প্রভৃতি কতকগুলি অতি উত্তম গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে রচনা করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার বিখ্যাত কালীশঙ্কর ঘোষদিগের বংশজাত। ইনি গণিত বিদ্যাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্য কিছুদিন করিয়া পরলোক গমন করেন। আনন্দকৃষ্ণ বসু বিখ্যাত সর্ রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র। * * ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান * * জগদীশ নাথ রায় বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম District Police Superintendent পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র অনেক দিন অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্য করিয়া এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন। পরলোকগত নীলমাধব মুখোপাধ্যায় কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। গিরীশ চন্দ্র দেব অনেক কাল হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা কার্য্য খ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত সেকালের ছোট আদালতের জজ বিখ্যাত রসময় দত্তের পুত্র। আমি কলেজে থাকিতে ইংরাজী কবিতা পড়িতাম না বলিয়া, তাহা গিলিতাম বলিলে হয়, তাহা এমনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। ইনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে এক-হৃদয় ছিলেন বলিলে হয়। প্রাচীন ও আধুনিক ক্ষুদ্রতম ইংরাজী কবির গ্রন্থ পর্য্যন্ত আমরা পড়িতাম। * * * ইনি ইংরাজী কবিতা উত্তম রচনা করিতে পারিতেন। ইনি বিখ্যাত তরু দত্তের পিতা। ইনি যেমন স্বভাবতঃ ভদ্রলোক ছিলেন এমন অতি অল্প পাওয়া যায়।"

রাজনারায়ণ বাবু আপনার পিতামহ রামসুন্দর বসুর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামপ্রসাদ বসুর কথায় সেকালের সমাজের যে মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা একালে অনুকরণযোগ্য :—

"রামপ্রসাদ বসু বড় উদারচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশ দান করিতেন। বোড়ালের ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ ও অন্যান্য বস্তু দান করিতেন। সুবর্ণ দানে অনেক ফল বলিয়া তাহা দান করিতেন। সেকালে অতিথি-সেবা একটী পরম ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইত। এদিকে খড়ো বাড়ী (সেকালে কোটাবাড়ী করিবার রীতি এত প্রচলিত হয় নাই) এবং পিতামহী ঠাকুরাণীদিগের হাতে রূপার পৈঁচে, তথাপি বাটীতে প্রত্যহ দুই বেলা এক শত পাত পড়িত। পিতামহী ঠাকুরাণীরা স্বহস্তে পাক করিয়া লোকদিগকে খাওয়াইতেন, এবং কেবল বাটীর কর্ত্তা ঘি খাইলে ভাল দেখায় না বলিয়া সকলের জন্য প্রস্তুত রাশীকৃত উষ্ণ অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া দিতেন। কোন কারণ বশতঃ আমার বড় ঠাকুর দাদা ঢাকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। যখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাটীতে বসিয়া ছিলেন, তখন উপরি উল্লিখিত স্বপ্নাদ্য ঔষধ একমাত্র জীবনোপায় ছিল। * এক দিন গ্রামের একটি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, কল্য আমার খাওয়া হয় নাই। ঐ সময়ে তাঁহার নিকট একটিমাত্র টাকা ছিল। তিনি আপনার কি হবে না ভাবিয়া ঐ টাকাটি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইতে অসম্মত হন। অনেক জেদাজেদির পর তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। ব্রাহ্মণ যাইবার সময় বড় ঠাকুরদাদামহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাকে আমি এই টাকাটি দিলাম, বড় গিন্নি (তাঁহার বড় স্ত্রী) যেন টের না পায়, তাহা হইলে আমাকে গালি দিয়া ভুত ছাড়া করিবে; যেহেতু এই টাকাটি আমার অদ্যকার এক মাত্র অবলম্বন।' ঈশ্বরের কি কারখানা! ক্ষণেক পরে, কলিকাতার এক বাবুর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে ষোল টাকা আইসে। * * * * আমার পিতামহ রামসুন্দর বসুও বড় উদারচিত্ত লোক ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি ছাতি ঘাড়ে করিয়া গ্রামের প্রত্যেক লোকের বাটীতে যাইতেন এবং প্রত্যেক লোকের সেই দিনের জন্য আহার দ্রব্য আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন। যাহার না থাকিত, তাহাকে তাহা নিজ বাটী হইতে পাঠাইয়া দিতেন। বিদেশে চাকরী করে, এমন লোকের পুষ্করিণী খনন অথবা বাটী নির্ম্মাণের ভার লইয়া দুই প্রহর রৌদ্রে * * ছাতা লইয়া ঐ কার্য্য তদারক করিতেন। * * * * ঠাকুরদাদা বাটীতে যে সকল রোগী স্বপ্নাদ্য ঔষধ লইতে আসিত তাহাদিগের বিষ্ঠামুত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। রোগীদিগের সঙ্গীদিগকে সেবা করিতে দিতেন না, নিজে স্বহস্তে তাহাদিগের সেবা করিতে ভাল বাসিতেন। ইহা তিনি পুণ্য-

---

* বসু মহাশয়ের প্রপিতামহ পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়া "হত্যা দিবার" জন্য বৈদ্যনাথে যাইতেছিলেন। রাস্তায় স্বপ্ন হয়। তাহাতে তিনি স্বপ্নাদ্য ঔষধ লাভ করেন।

কার্য্য মনে করিতেন। এক্ষণকার সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাহাদিগের বিষ্ঠা-মূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে ঘৃণাবোধ করিতেন না।"

ইহারপর বসু মহাশয় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ—

"কোন কোন ইংরাজকে আপনাদিগের অতি প্রিয়বন্ধুর এইরূপ শুশ্রূষা করিতে দেখা যায়। ইহাকে তাঁহারা nursing বলেন। পুরুষ অপেক্ষা বিবিরা এই কার্য্য অধিক করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান বাঙ্গালী বাবুরা, যাঁহারা ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা এই কার্য্যকে ঘৃণা করেন। আমরা ইংরাজদিগের দোষগুলি অনুকরণ করিতে পটু, সদ্‌গুণ অনুকরণ করিতে পটু নহি। রামসুন্দর বসু দীনদরিদ্রের যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিতেন, বর্ত্তমান বাবুরা ততদূর না করুন, খুব নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের ঐরূপ শুশ্রূষা করিতে ঘৃণা না করিলে বাঁচি।"

যে সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা বসু মহাশয়ের চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল সেই সরলতা ও সত্যপ্রিয়তাপ্রযুক্ত ঐতিহাসিক হিসাবে আলোচ্য পুস্তকের মূল্য বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। * * তাঁহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন মনে না করিতেন। আমাদিগের বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল। আমি পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিক-কাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপ-কাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবার কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শক কার্য্য মনে করিতাম। একদা আমি গোলদীঘিতে মদ খাইয়া টুপভুজঙ্গ হইয়া রাত্রিতে বাটীতে আসাতে মাতাঠাকুরাণী অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আমি আর কলিকাতার বাসায় থাকিব না, বোড়ালে গিয়া থাকিব।" পিতাঠাকুর আমার আচরণের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে পরিমিত মদ্যপায়ী করিবার জন্য একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। * * * সেকালে মুন্সি আমীর আলী সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। * * পিতাঠাকুরের সহিত মুন্সি আমীর আলীর আন্তরিক বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। মুন্সি সাহেব আমার পিতাঠাকুরকে 'রাজদার দোস্ত' বলিতেন। যে বন্ধুকে গোপনীয় কথা বলা যাইতে পারে, পার্শিতে তাহাকে 'রাজদার দোস্ত' বলে। প্রায় প্রতিদিন মুন্সি আমীর আলীর বাটী হইতে আমাদিগের বাসায় একটা টিনের বাক্স আসিত। আমি মনে করিতাম যে, মুন্সি আমীর আলী পিতাঠাকুরকে তরজমা জন্য সদর দেওয়ানীর কাগজপত্র

পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। * * একদিন সন্ধ্যার পর আমাকে পিতাঠাকুর তাঁহার লিখিবার ঘরে ডাকিলেন। ডাকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে ব্যাপারটা কি? তাহার পর দেখিলাম, তিনি একটি দেরাজ খুলিয়া একটি কর্কস্ক্রু ও একটি সেরীর বোতল ও একটি ওয়াইন গ্লাস বাহির করিলেন। তৎপরে প্রকাণ্ড টিনের বাক্সটি খুলিলেন। টিনের বাক্স খোলা হইলে আমি দেখিলাম যে, তাহাতে সদর দেওয়ানীর কাগজ নাই, পোলাও, কালিয়া, ও কোপ্তা রহিয়াছে। পিতাঠাকুর আমাকে বলিলেন, 'তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে এই সকল উত্তমদ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু মদ (সেরী) দুই গ্লাসের অধিক পাইবে না; যখনই শুনিব অন্যত্র মদ খাও, সেই দিন অবধি এই খাওয়া বন্ধ করিয়া দিব।' কিন্তু আমি সেইরূপ পরিমিত পানে সন্তুষ্ট হইতাম না। অন্যত্র পান করিতাম। এইরূপ অপরিমিত মদ্যপানে আমার একটি পীড়া জন্মিল।"

বসু মহাশয় যে দুই যুগের সন্ধিকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই দুই যুগের গুণভাগ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার চরিত-কথা বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। তিনি ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন এবং ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার প্রভাবে বঙ্গীয় সমাজের সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অকারণ ও অনাবশ্যক অনুকরণের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থে তিনি পুনঃ পুনঃ হীন অনুকরণের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন:—

"আমাদের দেশের কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ভুতপূর্ব্ব লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বিডন সাহেবের সহিত ধুতি চাদর পরিয়া দেখা করিতে যাইতেন, তাহাতে গবর্ণর সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। একবার গ্রীষ্মের সময় দেখা করিতে গিয়াছেন, গিয়া দেখেন, গবর্ণর সাহেব ঢিলে পাজামা ও পাতলা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছেন। আমাদিগের বন্ধুকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন,—'তোমাকে দেখিয়া আমার হিংসা হচ্চে, ইচ্ছা করে, তোমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিয়া থাকি।' আমাদিগের বন্ধু উত্তর করিলেন,—'তাই কেন করুন না?' বিডন সাহেব বলিলেন, 'ওরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা আমাদের দেশাচার-বিরুদ্ধ, সুতরাং কেমন করে করি?' আমাদের বন্ধু উত্তর করিলেন,—'আপনাদিগের বেলা দেশাচার বলবৎ, আর আমাদিগের বেলা তাহা কিছুই নহে, আপনারা এরূপ বিবেচনা করেন কেন?"

ঐ পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন:—

"আমি বিলাতে যাইবার প্রতিপক্ষ নহি। বিলাতে যাইলে অনেক উপকার আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজের সহিত একেবারে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা এক্ষণে বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন হিন্দু-সমাজ তাঁহাদিগকে নোকসানের খাতায় লিখিতে বাধ্য হয়েন। বাবু বিলাত হইতে,

সাহেব সাজিয়া ফিরিয়া আসিলেন, না কাহারে সঙ্গে পোষাগে মিলে, না কাহারো সঙ্গে ব্যবহারে মিলে। কোথায় তাঁহারা যে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া আইসেন, সেই জ্ঞানালোকে স্বদেশীয়দিগকে বিভূষিত করিবেন না একেবারে সমাজছাড়া হয়ে বস্‌লেন। তাঁহার উভয় দলের ত্যাজ্য হয়েন। বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে তো তাঁহাদিগের মিলে না, ইংরাজেরা ও তাঁহাদিগকে অনুকরণকারী শাখামৃগ বলিয়া ঘৃণা করে।"

সমাজ-সংস্কারের কথায় তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কারকেরা যদি স্বদেশীয় ভাবকে পত্তন ভূমি করিয়া সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন সন্দেহ নাই।"

বসু মহাশয় খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে ষ্টীমারে আসাম যাত্রার কথায় তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমার ধাতু বরাবর গাঢ় বাঙ্গালীতর ; আমার কলেজের শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই। আমি মধ্যে মধ্যে খানা ও মদ খাইতাম বটে, কিন্তু সচরাচর প্রত্যহ দুই বেলা মাছের ঝোল ভাত না খাইলে চলিত না। ক্রমাগত মদ ও খানা খাইলে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিত। ষ্টীমারে কিরূপ জীবন যাপন করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে জানিলে সেইরূপ উপায় করা যাইত অর্থাৎ ফ্লনেল তৈল ইত্যাদি সঙ্গে লইতাম। ষ্টীমারে রুক্ষ স্নান ও দিবসের মধ্যে তিন বার অর্থাৎ হাজরি, টিফিন ও ডিনরে মাংস খাওয়াতে ঢাকায় না পৌঁছিতে পৌঁছিতে তিন চারি দিবসের মধ্যে বিজাতীয় গরম হইয়া উঠিল। রাত্রিতে ঘুম হয় না। ঢাকায় যখন ষ্টীমার পৌঁছিল তখন আমাকে ছাড়িয়া দিতে দেবেন্দ্র বাবুকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম। তিনি আমাকে ঢাকায় নামাইয়া দিলেন। আমি মাছের ঝোল খাইবার অভিলাষে আমার কলেজের সমাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ঈ, চ, মি, র বাসায় আশ্রয় লইতে তদভিমুখে গমন করিলাম। * * কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখি তিনি ও টেবিল পাতিয়া ইংরাজি রকমে আহার করিতেছেন। কি করি, আমি বসিয়া গেলাম। পাছে আমাকে নিতান্ত বাঙ্গালী বলিয়া মনে করেন সেই জন্য তাঁহাকে মাছের ঝোলের কথা তিন চারি দিন বলিতে আমার সাহস হইল না। পরে বিজাতীয়োপরি বিজাতীয় গরম হওয়াতে আমি তাঁহাকে এক দিন আমার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহার স্ত্রীর এক মুসলমান দাসী ছিল। তাহাকে মাছের ঝোল প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সে মুসলমান বলিয়া পেয়াজ রসুন দিয়া কি এক রকম জিনিস তৈয়ার করিয়া দিল তাহা আমার বড় খারাপ লাগিল। তৎপরে ঈ বাবুর স্ত্রীকে অনুরোধ করিয়া পাঠানতে তিনি অনুগ্রহ করিয়া স্বহস্তে মাছের ঝোল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অনেক দিনের পর মাছের ঝোল খাইয়া তাহা গলার ভিতর দিয়া পেটে যখন পড়িল কি পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইলাম বলিতে পারি না। ঈ বাবু এক দিন এক কাণ্ড করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিবার সাধ হওয়াতে তিনি পার্শ্বের ঘর

হইতে তাঁহাকে বাহির করিবার জন্য তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন। তিনিও কোনমতে আসিবেন না। পরে আমি এ ঘর হইতে অনেক বলাতে আলাপ করানো কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। অনেক দিন ইংরাজী রকমে সাবান মাখিয়া রুক্ষ স্নান করাতে অত্যন্ত গরম হওয়াতে এক দিন ঐ বাবুর চাকরকে দিয়া বাজার হইতে তৈল আনাইয়া নীচের তলায় একটি অন্ধকার ঘরে তৈল মর্দ্দন করিতেছিলাম। সে অন্ধকার ঘরে ঐ বাবুর কখন আসিবার প্রয়োজন হয় নাই। সে দিন কোন প্রয়োজন বশতঃ আসাতে আমি তৈলমর্দ্দনরূপ অপকর্ম্ম করিবার সময়েই তাঁহা কর্ত্তৃক ধৃত হইলাম। তিনি বলিলেন, 'এ কি'? আমি বলিলাম, 'তৈল বাজার হইতে আনাইয়া মাখিতেছি। অনেক দিন তৈল না মাখাতে গরম বোধ হইতেছে।' তিনি বলিলেন, 'আমাকে বলিলেই হইত, আমি আনাইয়া দিতাম।' আমি বলিলাম, 'পাছে তুমি আমাকে নিতান্ত বাঙ্গালী ঠাওরাও এই জন্য বলি নাই।' এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লিখিতাম না; ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে আমাদিগের যৌবনকালের কোন কোন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তির আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহা জানাইবার জন্য লিখিলাম।"

বসু মহাশয়ের এই খাঁটি বাঙ্গালীত্ব এমনই সপ্রকাশ ছিল যে, যে কেহ তাঁহার সংস্রবে আসিলে তাহা অনুভব করিতে পারিত। আমার তাহা জানিবার যে সকল সুযোগ ঘটিয়াছিল সে সকলের মধ্যে একটির উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী বর্ষারম্ভে আমার জ্যেষ্ঠ ও আমি বসু মহাশয়কে নববর্ষের উপহার পাঠাইয়াছিলাম। সেই উপলক্ষে তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেনঃ—"তোমাদিগের উদ্দিষ্ট উপহার পাইয়া বাধিত হইলাম কিন্তু নববর্ষের অভিবাদন এখন করিব না, ১লা বৈশাখ (যদি তত দিন বাঁচিয়া থাকি) করিব। ঐ দিনের জন্য Art Studio দ্বারা বাঙ্গালা ক্ষুদ্র কবিতাযুক্ত উল্লিখিত উপহারের ন্যায় উৎকৃষ্ট উপহার দ্রব্য কি প্রস্তুত করাইতে পার না?" পর বৎসর ১লা বৈশাখ তিনি লিখিয়াছিলেন, "নববর্ষের অভিবাদন পাইয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না। প্রতিবৎসর ১লা বৈশাখেই এইরূপ অভিনন্দন করিবে।"

বসু মহাশয়ের এই আত্ম-চরিত বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসের লেখকের পক্ষে অমূল্য উপাদানের আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্য ও সমসাময়িক সকল সৎকর্ম্মে উদ্যোগী পুরুষের চরিত-কথা বলিয়া বঙ্গদেশে এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

প্রভাতে।

—ঃ০ঃ—

এখনো নয়ন ঘুমে অচেতন ?
পূরবে শোনিমা অরুণ-রাগে ;
প্রভাত-সমীর বহিছে অধীর,
সরমে শিহরি' কমল জাগে ;

বিহগের স্বরে সুধাধারা ঝরে !
কুসুমে বদ্ধ জাগিছে অলি ;
আপন গোপন সুরভি পবন
এসেছে যাচিতে, ফুটিছে কলি ;

ম্লান শশি-কায় গগনে মিলায় ;
কবরীর মালা হয়েছে ম্লান।
তৃষিত আমার নয়ন তোমার
সুপ্তসুষমা করিছে পান।

অধরে আমার জাগিছে তোমার
কোমল-সোহাগ-পরশ-সুধা ;
তৃষিত অধরে নয়নের 'পরে
এখনো আমার আকুল ক্ষুধা।

জগরণারুণ নয়ন করুণ
মুদিয়া দিয়াছি আদরে চুমি,'
বাহুপাশে লয়ে, লয়েছি হৃদয়ে,
জেগে চেয়ে আছি—ঘুমায়ে তুমি।

দিবালোক রাশি বাতায়নে পশি'
এখনি জাগা'বে সরম মাখি ;
বিহগ কূজনে সুরভি পবনে
মিল নিমিলিত কমল আঁখি।

Printed by S. C. Ghose at the Lakshmi Printing Works.
64/1 & 64/2 Sukea's Street.

নিরুদ্দেশ যাত্রা।

১

কয় বৎসর পূর্ব্বে কিছুদিন ধরিয়া সংবাদপত্রে একটি অসাধারণ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা পোতাশ্রয়ের কর্ত্তারা বিজ্ঞাপনদাতা;—বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য—কোন নিরুদ্দিষ্ট গৃহস্বামীর সন্ধান। পোতাশ্রয়ের প্রসার-বৃদ্ধি-কল্পে ভূমিক্রয়কালে একজন গৃহস্বামীর সন্ধান না পাইয়া পোতাশ্রয়ের কর্ত্তারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে গৃহের অধিকারীর জন্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ, সে গৃহ ক্ষুদ্রায়তন নহে; বিস্তৃত ভূমিখণ্ড-মধ্যে অবস্থিত; কিছুকাল হইতে জনশূন্য। গৃহসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে পূর্ব্বে পুষ্পোদ্যান ছিল, এখন উলু জন্মিয়াছে—মধ্যে মধ্যে কোথাও বা একটি গোলাপ গাছ, কোথাও বা একটি টগর গাছ আত্মরক্ষার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছে—সেই চেষ্টায় তাহাদের শীর্ণ শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইতেছে, সে শক্তি আর কুসুমে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না। ছাতের আলিসা স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মুক্ত দ্বার ও বাতায়ন পথে আলোক ও বাতাস যেন কাহাকে সন্ধান করে। সমস্ত গৃহখানি যেন রহস্যের কুজ্ঝটিকায় আবৃত। দশ বৎসর হইতে গৃহ জনহীন। কিম্বদন্তী এই গৃহে বহু অলৌকিক কীর্ত্তির কল্পনা প্রচার করিয়া রহস্যকুজ্ঝটিকা আরও ঘন করিয়া তুলিয়াছে।

২

এই গৃহের যে নিরুদ্দিষ্ট অধিকারীর জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহার পূর্ব্বনিবাস বর্দ্ধমান জিলার কোন সমৃদ্ধ পল্লীগ্রামে। এ দেশে প্রায় দেখা যায়, লক্ষ্মীর কৃপা কোন পরিবারে দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। কিন্তু তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে পরিবারে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। শতবর্ষাধিক কাল হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সে অঞ্চলে ব্যবসায়ীদিগের "মহাজন"। এই কার্য্যে তাঁহাদের অর্থ বাড়িয়া শেষে তাঁহারা সে অঞ্চলে প্রধান ধনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যাহার ধনবল থাকে—তাহার শত্রুর অভাব হয় না; কিন্তু সেই ধনবলহেতুই শত্রুরা সহজে তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। এই নিরুদ্দিষ্ট গৃহস্বামীর পরিবারে

ধন যেমন বাড়িয়াছিল—ধন ভোগ করিবার লোক তেমন বাড়ে নাই; কাযেই বিভাগে সে ধনের হ্রাস হয় নাই। এই নিরুদ্দিষ্ট গৃহস্বামী পরিবারের সমস্ত সঞ্চয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্রসন্তান জন্মে নাই; প্রৌঢ় অবস্থায় এক কন্যামাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই কন্যাই তাঁহার উত্তরাধিকারী। যথাকালে কন্যার বিবাহ হয়। গৃহিণীর অনুরোধে তিনি জামাতাকে গৃহে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক সন্দেহ-প্রাবল্য হেতু তিনি কিছুতেই জামাতাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তাঁহার ব্যবহারে সে সন্দেহ সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশ করিত। ইহাতে পূতচরিত্র জামাতার হৃদয় ব্যথিত হইত। জামাতা আর শ্বশুরের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না; বরং আপনার পরিবার প্রতি-পালনের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ব্যস্ত হইতেন। জামাতার এই ভাবে শ্বশুরের সন্দেহ ক্রমে বিরক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমে ঘনীভূত হইয়াছিল। কথায় কথায় সেই মনোমালিন্য সপ্রকাশ হইত। শেষে শ্বশুরের ব্যবহারে জামাতার আত্মসম্মান আহত হইতে লাগিল। তখন তিনি একদিন পত্নীকে বলিলেন, "আমি আর শ্বশুরের গলগ্রহ হইয়া থাকিব না। আমি এ গৃহ ত্যাগ করিব।" পত্নী কিছুদিন হইতে পতির মনোভাব উপলব্ধি করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "যে গৃহে তোমার স্থান নাই, সে গৃহে আমারও স্থান নাই।" ফলে চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশীথে দুই মাস মাত্র বয়স্ক শিশুপুত্রকে লইয়া পতি-পত্নী সেই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াইলেন।

যাইবার সময় দুহিতা জননীকে একখানি পত্র লিখিয়া যাইলেন;—

মা,

আমি বিদায়কালে তোমার পদে প্রণাম করিয়া যাইতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ মরিলেও যাইবে না। কিন্তু তুমি জানিতে পারিলে আমি যাইতে পারিব না। তুমিই শিখাইয়াছ, যেথায় স্বামীর স্থান—সেথায় স্ত্রীর আশ্রয়। যে স্থানে মানুষ আদরের আশা করে সে স্থানে অনাদর বড় বেদনার কারণ; যেথায় মানুষ বিশ্বাসের আশা করে, সেথায় সন্দেহ বড় যাতনাদায়ক। তাই তিনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, কাযেই আমিও যাইতেছি। মা আমার—তোমার দুঃখিনী কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিও, যেন—যে আশ্রয়ের আশায় তোমার আশ্রয় ত্যাগ করিতেছি সে আশ্রয়ে আমার সকল জ্বালার অবসান হয়।

তোমার হতভাগিনী কন্যা।

তখন গৃহ নীরব; পুরবাসীরা সুপ্তিমগ্ন; সাবধানে ক্ষিপ্রহস্তে দ্বারার্গল মোচনের শব্দ কাহারও শ্রুতিগোচর হইল না। পিতৃগৃহত্যাগী কন্যার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পিতৃগৃহাঙ্গণে পতিত হইল। এই তিনি প্রথম সে গৃহ ত্যাগ করিলেন। তিনি এ আশ্রয়ে আর ফিরিবেন কি না কে জানে? স্নেহশীলা জননীর কথা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল। তিনি যে তাঁহার একমাত্র সন্তান!

৩

প্রভাতে উঠিয়া ভৃত্যগণ দেখিল, গৃহদ্বার মুক্ত। কে গৃহদ্বার খুলিল, এই কথা লইয়া তাহারা আন্দোলন করিতে লাগিল—এ উহাকে দোষী প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইল। সেই আন্দোলনকলরবে গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। কলরবের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যাইবার সময় তিনি দেখিলেন, কন্যার কক্ষদ্বার মুক্ত—কক্ষে কেহ নাই। কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, শয্যা অভুক্ত—সেই অভুক্ত শয্যায় কন্যার পত্র রহিয়াছে। সেই পত্র পাঠ করিয়া গৃহিণী হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া পড়িলেন; তাঁহার বোধ হইল, যেন জগতের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

গৃহিণীর এই অবস্থা দেখিয়া একজন ভৃত্য যাইয়া কর্ত্তাকে সংবাদ দিল। তিনি কন্যার কক্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন। কর্ত্তাকে দেখিয়া গৃহিণী উন্মাদের মত তাঁহাকে কন্যার পত্রখানি দিলেন; বলিলেন, "এখনই সন্ধানে লোক পাঠাও।" এতক্ষণ বেদনার আতিশয্যে তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে নাই,—এখন সমবেদনা-প্রাপ্তির আশায় তাঁহার নয়ন অশ্রুসজল হইয়া আসিল।

কর্ত্তা কন্যার পত্র পাঠ করিলেন। তাঁহার চক্ষুতে রোষদীপ্তি বিকশিত হইয়া উঠিল, মুখে কঠোর ভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "যাহারা আমার অপমান করিয়াছে, আমার গৃহে আর তাহাদের স্থান নাই।"

গৃহিণী সলিলস্তম্ভিতনয়নে কর্ত্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে কাহাকে লইয়া সংসারে থাকিব?"

কর্ত্তা বলিলেন, "আমি পোষ্যপুত্র লইব।"

গৃহিণী উঠিয়া বসিয়াছিলেন; কর্ত্তার এই নিষ্ঠুর কথায় আবার হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া পড়িলেন। কর্ত্তার কথা যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিল। হায় মাতৃ-হৃদয়! পুরুষের সাধ্য কি তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে?

কর্ত্তা কন্যার পত্রখানি হর্ম্ম্যতলে ফেলিয়া দিয়া বহির্বাটীতে গমন করিলেন। গৃহিণী সেখানি কুড়াইয়া লইয়া আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। সে পত্র তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্বের শেষ সম্ভাষণ।

৪

গৃহিণী সেই যে শয্যা লইলেন, আর উঠিলেন না। অনাহারে—অনিদ্রায় তিন দিন কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিন তাঁহার প্রবল জ্বর দেখা দিল। তিনি কাহাকেও জ্বরের কথা বলিলেন না। শ্বাপদসঙ্কুল, কঙ্করকণ্টকাকীর্ণ পর্ব্বত-পথে—তমিস্রাতমসে পথভ্রান্ত শ্রান্ত পথিক উষালোকবিকাশে যেমন আনন্দিত হয়, পীড়ায় তিনি তেমনই আনন্দিত হইলেন,—যদি মৃত্যু মুক্তি দেয়। হইলও তাহাই। জ্বর প্রকাশের তিন দিন পরে বিকার দেখা দিল; অনাহারজীর্ণ—চিন্তাশীর্ণ দেহে ব্যাধি দেখিতে দেখিতে ভীষণ আকার ধারণ করিল। শেষে যে পূর্ণিমারজনীতে কন্যাজামাতা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই পূর্ণিমার পর অমাবস্যা আসিতে না আসিতেই জ্বরঘোরে শিশু দৌহিত্রের কথা বলিতে বলিতে গৃহিণীর সকল জ্বালা জুড়াইল। এক পক্ষের মধ্যে সূর্য্যকান্তের গৃহ শূন্য হইল। গৃহিণী পরলোকে—কন্যাজামাতা-দৌহিত্রের কোন উদ্দেশ নাই,—বিপুল ধন লইয়া শূন্য গৃহে সূর্য্যকান্ত একক! তিনি বুঝিলেন, তাঁহার এ অবস্থা—এ দুর্দ্দশা তাঁহারই কৃতকর্ম্মের ফল। তিনি যে অহঙ্কারে অন্ধ হইয়াছিলেন—সে অহঙ্কার দারুণ আঘাতে তাঁহারই হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিল।

৫

গৃহিণীর মৃত্যুর পর সূর্য্যকান্ত দেখিলেন, গৃহ শূন্য—হৃদয় শূন্য। যে অহঙ্কারের আবরণ তাঁহার অপত্যস্নেহকেও আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, গৃহিণীর চিতানলে তাহা ভস্মসাৎ হইয়াছিল। তাই প্রকৃতি যখন আত্মপ্রকাশ করিল—সে স্নেহ যখন মেঘমুক্ত দীপ্ত দিবাকরের মত প্রকাশিত হইল—তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। তখন তাঁহার মনে হইল, তিনিই পত্নীর মৃত্যুর কারণ; আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—এ দুর্দ্দিনে যাহারা নিকটে থাকিলে বেদনার দংশনজ্বালা প্রশমিত হইত—যাহারা শোকে সান্ত্বনা—তাঁহারই দুর্ব্ব্যবহারে তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তিনি বিষম যাতনায় ব্যাকুল হইলেন।

এই অবস্থায় সূর্য্যকান্ত বিষয়কর্ম্মে—জনসঙ্গে যাতনা ভুলিতে সচেষ্ট

হইলেন। বৃথা চেষ্টা। বিষয়কর্ম্ম ভাল লাগে না। কেহ তাঁহার সঙ্গ চাহে না। বরং লোকে তাঁহার সকল কথা জানিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করে। তাঁহার সম্পদপ্রাচুর্য্যে তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না; শত্রুদল এখন তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তাহাদের উপহাস সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে বিষাক্তবিশিখবৎ বিদ্ধ হইত। এখন তিনি বুঝিলেন, কন্যাদৌহিত্র তাঁহার কত প্রিয় ছিল। তাহাদিগকে হারাইয়া শূন্য গৃহে বাস ও লোকের ঘৃণা ও উপহাস ভোগ তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।

৬

যে অপরিচিত জনতার মধ্যে আপনার অতীত জীবন ভুলিবার চেষ্টা করে তাহার পক্ষে জনাকীর্ণ নগরে বাসই সুবিধাজনক। সূর্য্যকান্ত কলিকাতায় আসিলেন; নগরোপকণ্ঠে গৃহ ক্রয় করিলেন। তিনি নূতন স্থানে আসিলেন, কিন্তু নূতন সমাজে মিশিতে পারিলেন না—ভয়, পাছে সকলে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পায়—তাঁহার জীবনকাহিনী জানিতে পারে। প্রতিবেশীরা তাঁহার গৃহে গমন করিলে তিনি বিব্রত—চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। তাঁহার এইরূপ ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা শিষ্টাচারের অনুষ্ঠানে বিরত হইলেন। তাঁহারা এই নূতন প্রতিবেশীটিকে একটি অদ্ভুত জীব মনে করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মানুষ কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতে পারে না। অবসরের প্রাচুর্য্য অধিকাংশ স্থলে কষ্টের কারণ। যাহার কোন কায নাই তাহার 'অকাযের' আকর্ষণ প্রবল। বিশেষ সূর্য্যকান্তের মত যাহারা কার্য্যের ব্যস্ততায় হৃদয়ের যাতনা ভুলিতে চাহে—তাহাদের পক্ষে কার্য্যের অভাব একান্ত কষ্টকর। সূর্য্যকান্ত কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতে পারিলেন না।

প্রতিবেশীরা সবিস্ময়ে দেখিলেন, সূর্য্যকান্ত অসীম উৎসাহে গৃহসংলগ্ন ভূমিতে উদ্যান রচনা করিতেছেন। প্রভাত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দিন শ্রমজীবিগণকে লইয়া তিনি উদ্যান-রচনায় ব্যস্ত।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার গৃহসংলগ্ন ভূমি নবীন শ্রী ধারণ করিল। তথায় নানা জাতীয় বৃক্ষলতা রোপিত হইল—নানাবিধ লতাকুঞ্জ—বৃক্ষাগার প্রভৃতি রচিত হইল। নানা স্থান হইতে দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষাদি সংগৃহীত হইল। সে উদ্যানে গোলাপের প্রাচুর্য্যে সকলেই বিস্মিত হইল। সূর্য্যকান্ত শ্বেত, রক্ত, পীত, নানাবর্ণের নানাজাতীয় গোলাপগাছে উদ্যান পূর্ণ করিলেন।

সূর্য্যকান্ত উদ্যান লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে সচেষ্ট। লোকে বলিত, সখ বটে! কিন্তু তাঁহার সে কার্য্যের প্রকৃত কারণ আর কেহই জানিত না।

৭

সূর্য্যকান্তের উদ্যান-রচনা শেষ হইল। অজস্র যত্নে রোপিত ও বর্দ্ধিত বৃক্ষে ফুল ফুটিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের শূন্য ঘুচিল না। তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ। তাঁহার দেহে অকালজরার বিকাশ বিস্ময়কর।

একদিন ফাল্গুনের অপরাহ্নে তিনি উদ্যানদ্বারের উপর লৌহশলাকার অবলম্বনে কুসুমসুষমাসুন্দর কুইস্‌কালিসলতা দেখিতে দেখিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন, বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপথে কয়টি বালক দাঁড়াইয়া তাঁহার উদ্যান লক্ষ্য করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে ডাকিলেন—উদ্যানমধ্যে আসিতে বলিলেন। বালকগণ প্রথমে আসিতে চাহিল না, শেষে ফুললাভের প্রলোভনে আসিল। সূর্য্যকান্ত তাহাদিগকে উদ্যানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুলগুলি দিয়া বলিলেন, তাহারা যখন ইচ্ছা আসিয়া উদ্যানে ফুল তুলিতে পারে। তাঁহার এই ব্যবহারে বালকদিগের ও তাঁহার ভৃত্যদিগের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

পরদিন বিদ্যালয়ে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে প্রত্যাবর্ত্তনপথে বহু বালক সূর্য্যকান্তের উদ্যানে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের কলরবে সূর্য্যকান্তের উদ্যান যেন সজীব হইয়া উঠিল—যেন তাহার প্রাণহীন সৌন্দর্য্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল।

বালকদিগের আনন্দ-কলরবে সূর্য্যকান্ত এক নূতন অনুভূতি অনুভব করিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত নহেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, তিনি আপনার কর্ম্মফলে হৃদয়-সর্ব্বস্বদিগকে হারাইয়া আজ পরকে লইয়া হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণের বৃথা চেষ্টায় চেষ্টিত। হায়—তাঁহার দুহিতা সে আজ কোথায়? তাঁহার সেই স্নেহের পুত্তল দৌহিত্র—এই দুই বৎসরে সে কত বড় হইয়াছে?

সূর্য্যকান্তের উদ্যানে অতিথির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। বিদ্যালয়ের বালক ছাত্রগণ ফুলের লোভে নিত্য সে উদ্যানে আসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর বালকবালিকারাও আসিতে লাগিল। সূর্য্যকান্তের গৃহের অনতিদূরে একটি বহুজনাকীর্ণ 'বস্তি' ছিল। বহু দরিদ্র পরিবার সেই 'বস্তিতে' স্বল্পপরিসর গৃহে বাস করিত। সেই সকল পরিবারের বালক-

বালিকারা দিনান্তে এই উদ্যানে আসিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত। তাহাদের সরলতাময় সুন্দর আননে আনন্দবিকাশ লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যকান্তের হৃদয় যুগপৎ আনন্দে ও বিষাদে পূর্ণ হইত। এইরূপে একবৎসর কাটিয়া গেল।

৮

ক্রমে এমনই দাঁড়াইল যে, সূর্য্যকান্ত মধ্যাহ্ন হইতে উদ্যানে বালকবালিকা-দিগের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেন। যাহারা নিত্য আসিত তাহাদের মধ্যে একজন না আসিলে তিনি বিষণ্ণ হইতেন। ইহাদিগকে লইয়া তিনি শূন্য হৃদয়ের এক অংশ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমনই ভাবে তাঁহার দিন যাইতে লাগিল। যখন সন্ধ্যা হইত, বালকবালিকারা যে যাহার গৃহে চলিয়া যাইত, তখন সূর্য্যকান্তের মনে হইত—বিশাল বিশ্বে তাঁহার কোন কায নাই—তাঁহার জীবনের কোন সার্থকতা নাই।

তাঁহার গৃহের নিকটস্থ 'বস্তি' হইতে যে সকল বালকবালিকা তাঁহার উদ্যানে আসিত ফাল্গুনের শেষে এক দিন তাহাদের সঙ্গে একটি শিশু আসিল। তাহার পরিধানে ছিন্ন বসন—কোমল চরণদ্বয় নগ্ন। তাহার মুখে হাসি নাই—পরন্তু নিবিড় বিষাদান্ধকার ব্যাপ্ত। তাহাকে দেখিলে অকালজলদোদয়ে সঙ্কুচিত প্রভাতপদ্মের মত বোধ হয়। যে বয়সে চাঞ্চল্য ও চপলতা স্বাভাবিক সেই বয়সে বালকের মুখে গাম্ভীর্য্য ও বিষণ্ণভাব সপ্রকাশ। বালককে দেখিয়া সূর্য্যকান্তের দয়া হইল; তাঁহার হৃদয়ে স্নেহের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহাকে বক্ষে লইবার চেষ্টা করিলেন; বালক যে বালিকার সহিত আসিয়াছিল তাহার বসন চাপিয়া ধরিল। সূর্য্যকান্ত তাহাকে নানাবিধ ফুল দিতে চাহিলেন; বালক লইল না। সূর্য্যকান্ত তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; বালক উত্তর দিল না—কেবল একবার বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল।

সূর্য্যকান্ত তাহার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কেবল ইহাই জানিতে পারিলেন যে, কয়দিন পূর্ব্বে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার আশ্রয়-হীনা বিধবা জননী পুত্রকে লইয়া 'বস্তিতে' স্বামীর এক বন্ধুর আশ্রয়ে আসিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে বায়ুকোণে ঘন ধূসর মেঘ পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল; দিবসের শেষ আলোক মলিন হইয়া উঠিল। যেন সহজাত-সংস্কার-বশে

কোন আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় গগনে উড্ডীয়মান বিহগকুল বিস্তারিত পক্ষ সঙ্কুচিত করিয়া দ্রুত নামিয়া আসিতে লাগিল। সূর্য্যকান্তের উদ্যানে সমাগত বালকবালিকারা গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। 'বস্তি' হইতে একজন বৃদ্ধা দাসী বালকবালিকাদিগকে লইতে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সূর্য্যকান্ত জানিলেন, বালকের জননী কোন পল্লীবাসী ধনীর একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতা কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে গৃহে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কুব্যবহারে অভিমানী জামাতা শ্বশুরের আশ্রয় ত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী ও পতির অনুগামিনী হইয়াছিলেন। তখন বালকের বয়স দুইমাসমাত্র। বালকের পিতা পত্নীপুত্র লইয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় উদরান্ন-সংস্থানের চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার কোন দূর সম্পর্কীয় কুটুম্বের সাহায্যে তাঁহার একটি চাকরী জুটিয়াছিল। সে চাকরীর বেতনে অতিকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইতে পারে। অজস্র সুখে—বিলাসে অভ্যস্ত পত্নীপুত্রের কষ্টে তিনি সর্ব্বদাই কষ্ট পাইতেন এবং অধিক উপার্জ্জনের আশায় অত্যধিক পরিশ্রম করিতেন। অবস্থাবিপর্য্যয়ে দুশ্চিন্তায় ও অতিরিক্ত শ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কিন্তু দরিদ্রের ভাগ্যে মৃত্যু ব্যতীত বিশ্রামলাভ ঘটে না। দুই বৎসরের অধিককাল দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কয়দিন হইল তাঁহার ভাগ্যে সেই বিশ্রামসুখলাভ ঘটিয়াছে। তাঁহার যে কুটুম্ব তাঁহার চাকরী জুটাইয়া দিয়াছিলেন দয়া-পরতন্ত্র হইয়া তিনি তাঁহার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন—তাঁহার পত্নী-পুত্রকে আশ্রয় দিয়াছেন। তাহাদের কিছুই নাই—বালকের জননী পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আর সব বিক্রয় করিয়া স্বামীর চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। সম্বল কেবল যে আফিসে স্বামী চাকরী করিতেন সেই আফিসের সাহায্য-ভাণ্ডার হইতে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি। কিন্তু পাঁচ টাকায় কি হইবে? যিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন—তিনিও দরিদ্র—সামান্য বেতনে চাকরী করেন। তিনি বালকের মাতামহকে সংবাদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বালকের জননী কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যেন সে কায করা না হয়। তাঁহার শারীরিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারও বাঁচিবার আর অধিক দিন নাই।

দাসী বালকবালিকাদিগকে লইয়া চলিয়া গেল। ততক্ষণে অন্যান্য

বালকবালিকারা যে যাহার গৃহে চলিয়া গিয়াছে। গগনে মেঘের উপর মেঘ পুঞ্জীকৃত হইতেছে।

বৃদ্ধা দাসীর কথা শুনিতে শুনিতে সূর্য্যকান্তের বোধ হইতেছিল, যেন কোন গুরু চাপে তাঁহার হৃদপিণ্ড নিষ্পিষ্ট হইতেছিল। ইহারা কাহারা? তিনি জীবনব্যাপী যাতনায় যাহাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন,—ইহারা কি তাহারা? যদি তাহারা হয়! সূর্য্যকান্তের অন্ধকার হৃদয়ে আশার আলোক বিদ্যুদ্দীপ্তির মত দেখা দিল। তাহার পর নির্ব্বাপিত-বিদ্যুদালোক গগনে অন্ধকার যেমন নিবিড়তর হয়—তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার তেমনই নিবিড়তর হইল। যদি ইহারাই তাহারা হয়,—তবে তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারের ফলে তাহাদের কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে!

সূর্য্যকান্ত উঠিয়া গৃহে আসিলেন; একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বালকের ও তাহার জননীর পরিচয় জানিয়া আসিতে উপদেশ দিলেন।

ভৃত্য চলিয়া গেল। সূর্য্যকান্ত বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

৯

বায়ুকোণে পুঞ্জীভূত অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া কুটিল রেখায় বিদ্যুদ্দীপ্তি বিকশিত হইয়া উঠিল। মেঘগর্জ্জনে ধরণী গগন কাঁপিয়া উঠিল; সূর্য্যকান্তের বাতায়নে কাচকপাট ঝন্ঝন্ করিয়া উঠিল। বাত্যা ও বৃষ্টি যেন এই সঙ্কেতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। দীর্ঘকাল বদ্ধ থাকিবার পর সহসা মুক্তিপ্রাপ্ত দ্রুতগতি অশ্বের মত পবন প্রবল বেগে বহিতে লাগিল; অদূরে বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিবার শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামিল। চারিদিক অন্ধকার—এক একবার মেঘস্তনিতসহচর বিদ্যুদালোকে প্রকৃতির ক্লিষ্ট মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত ভৃত্যের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রবল ঝড়ে পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—বারিপাত হইতেছিল; সেই দুর্যোগে পথে বাহির হওয়া বিপজ্জনক বলিয়া ভৃত্য প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব করিতে লাগিল। পরে বহুক্ষণ অপেক্ষার পর সে কোনরূপে গৃহে আসিয়া উপনীত হইল। সূর্য্যকান্ত ততক্ষণ দারুণ মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছিলেন। ভৃত্য আসিয়া যাহা বলিল তাহাতে বালকের জননী যে তাঁহারই একমাত্র সন্তান সে বিষয়ে সূর্য্যকান্তের আর সন্দেহ রহিল না। তাঁহার হৃদয়ে বেদনার উপর বেদনার ভার একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। আপনাকেই কন্যার সর্ব্বনাশের কারণ জানিয়া তাঁহার হৃদয় আত্মগ্লানির তুষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।

সূর্য্যকান্ত ভৃত্যকে বলিলেন, "চল আমি তথায় যাইব।"

ভৃত্য বলিল "এ দুর্যোগে যাইতে পারিবেন না।"

সূর্য্যকান্ত শুনিলেন না, ভৃত্যকে সঙ্গে আসিতে আদেশদান করিয়া তিনি সেই দারুণ দুর্যোগে গৃহের বাহির হইলেন; কিন্তু কয় পদ যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার প্রবল মানসিক শক্তি প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাভূত করিতে পারিল না। তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ সিক্ত হইয়া গিয়াছিল,—পরিবর্ত্তন করিবার কথা তাঁহার মনে হইল না। তিনি মুক্তবাতায়নমুখে বসিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; বাত্যাবাহিত বৃষ্টিবারি তাঁহাকে সিক্ত করিতে লাগিল। সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার হৃদয়ে প্রবলতর ঝটিকা বহিতেছিল।

ঝড়ের বেগ প্রশমিত হওয়া দূরে থাকুক, বাড়িতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, উন্মাদ প্রকৃতি সৃষ্টি-সংহারে সমুদ্যত হইয়াছে।

১০

নিশাশেষে পবনের বেগ প্রশমিত হইল; বৃষ্টি থামিয়া গেল। যখন পবন-চঞ্চল, বর্ষণলঘু, ধূসরাভ মেঘে পূর্ণ গগনে পূর্ব্বসীমায় উষালোক ফুটিয়া উঠিল—তখন বাত্যা ও বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্তি; যেন চঞ্চল বালক ক্রীড়াচ্ছলে যাহা পাইয়াছে নষ্ট করিয়া—শ্রান্তিবশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিন্ন ও ভগ্ন দ্রব্যাদির মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সূর্য্যকান্তের সযত্নরচিত উদ্যান ছিন্ন ভিন্ন; সম্মুখে রাজপথ ভগ্ন ও পতিত বৃক্ষশাখায় দুর্গম।

দিবালোক ফুটিতে না ফুটিতে সূর্য্যকান্ত নিদ্রিত ভৃত্যকে ডাকিয়া তুলিলেন। ভৃত্য প্রভুর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইল। তিনি যেন উন্মাদ!

সূর্য্যকান্ত ভৃত্যকে লইয়া 'বস্তিতে' গমন করিলেন। 'বস্তি'র এক অংশে কয়খানি গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। তাহারই একখানিতে তাঁহার কন্যা ও দৌহিত্র আশ্রয় পাইয়াছিল। তখন ঘর সরাইয়া পতিত গৃহের অভ্যন্তরে জীবন্তসমাধি-প্রাপ্তদিগকে বাহির করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়স্পন্দন যেন থামিয়া গেল।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর চালের এক অংশ কাটিয়া সরান হইল। বৃদ্ধ উন্মাদের মত ছুটিয়া যাইয়া দেখিলেন, দ্বারের নিকটে মলিনবসনা, শীর্ণকায়া রমণীর শব; রমণীর বক্ষে শিশুর মৃতদেহ। বোধ হয় জননী পুত্রকে লইয়া বাহির হইতেছিলেন,

এমন সময় প্রাচীর ভাঙ্গিয়া উভয়ের উপর গৃহের চাল পড়িয়াছিল। উভয়ে আঘাতের উপর জীবন্ত সমাধির দারুণ যাতনা ভোগ করিয়া মরিয়াছে।

আর সকলে শবদেহ টানিয়া বাহির করিল। মৃতমুখে দিবালোক পড়িল। সে মুখ সূর্য্যকান্তের পরিচিত; তাঁহার পিতৃহৃদয়ে তাঁহার যে প্রতিচ্ছবি আছে—তাহা তিনি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই।

শঙ্কাতাড়িতের মত চঞ্চলপদে সূর্য্যকান্ত সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তিনি আর গৃহে ফিরেন নাই। তিনি নিরুদ্দেশযাত্রার যাত্রী। তিনি কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না। তাঁহার শূন্য গৃহে মুক্তবাতায়নপথে পবন যেন কাহার সন্ধান করিয়া ফিরে—তাহাকে না পাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মিলন।

১

সেই প্রাণ, মন আছে, শুধু মোর নাহি কাছে,
একখানি তরুণ হৃদয়!
আছে পড়ি' কর্ম্মরাশি, পিছে নাই স্নিগ্ধ হাসি,
আছে যশ, নাহি তাহে জয়!
আছে দিন, নিশি-পরে, সে নহে আমার তরে,
বহে তা'র আকুল নিশ্বাস;
দিনশেষে নিশি আসে, ফিরিতে আপন বাসে,
শূন্য শয্যা করে উপহাস!

২

শুক্ল সন্ধ্যা সেই আসে, আর না গবাক্ষ-পাশে,
হেরি তা'র মধুর মুরতি,
দেখিত যে অনিমেষে— চাঁদ যায় ভেসে ভেসে,
নীল জলে মরাল যেমতি।
আছে জ্যোৎস্না—আছে নিশি, আছে চির সপ্ত-ঋষি,
শুধু সে-ই নাহিক ধরায়;
জীবনের কোন্ পারে, 'আজি সুধাইব কারে,'
এক জন্ম আগে সে কোথায়?

৩

রেখে গেছে প্রেম পথ, সেই ধ্রুব ভবিষ্যৎ,
চলিতে হইবে সেই পথে ;
দোঁহা মাঝে সেই সেতু, হ'বে মিলনের হেতু,
জন্মে জন্মে জগতে জগতে !
দীন আমি ক্ষীণপুণ্য, মোর ভাগ্যে থাকে শূন্য,
প্রেমে সব করিয়া পূরণ ;
তাহাই পাথেয় করি,' ভেসে যা'বে জন্মতরী,
সেই কূলে—যেখানে মিলন।

৪

আছে জন্ম, আছে ক্ষয়, এক জন্মে শেষ নয়,
কাল চির—অনন্ত জগৎ।
জগতের তীরে—তীরে, কত জন্ম যাবে ফিরে,
কত জন্ম গেছে এ যাবৎ।
ভরা প্রেমরাশি নিয়া, মোর আগে গেছে প্রিয়া,
কোন্ স্বর্গে রচিয়াছে নীড় ;
সেথা—মোরে, মনে হয়, পুরাতন পরিচয়,
প্রেমপাশে বাঁধিবে নিবিড়।

৫

আছি তাই পথ চাহি'— জানিবার কিছু নাহি,
আছে শুধু মিলন-প্রতীতি ;
দুটি কুসুমের ঘ্রাণ— মিলে যা'বে দুটি প্রাণ,
দুটি সুরে একখানি গীতি।
হেথাকার ছন্দ সুর, সেথা হবে পরিপূর,
সাঙ্গ হবে অসমাপ্ত গান ;
জীবনদুঃস্বপ্নশেষে— প্রভাত উঠিবে হেসে,
বিরহের হবে অবসান।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

সোণাবিবি।

কোন বীর্য্যবতী ভারতরমণীর কথা বলিতে হইলেই আমাদিগকে বাঙ্গালার শ্যামল প্রান্তর ছাড়িয়া দূর রাজপুতানার উষর ক্ষেত্রের এবং মহারাষ্ট্র দেশের রুক্ষ পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়। কিন্তু সত্য সত্যই কি এত বড় বাঙ্গালা দেশে এমন একজন বীরাঙ্গনাও জন্ম গ্রহণ করেন নাই যাঁহার বীরকীর্ত্তি-গাথা গাহিয়া আমরা ধন্য হইতে পারি? এক দিন যে দেশের নরনারীর নিকট সহমরণের পুণ্যকথা একান্ত পরিচিত ছিল—যে দেশের নারী সংসারের শত মায়ার বন্ধনকেও মৃত পতির পূত স্মৃতির নিকট তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সানন্দে মরণকে বরণ করিয়া লইতেন—সে দেশের অধিবাসী আমরা, আমাদের নিকট রাজপুতললনা-গণের 'জহর ব্রতের' কথা যত পরিচিত—একজনও বঙ্গীয় রমণীর আত্ম-বিসর্জ্জন-কাহিনী তত পরিচিত নহে। ইতিহাসকে পূর্ণাবয়বে গড়িয়া তুলিতে হইলে এক দিকে যেমন দেশের বীরপুত্রগণের মহজ্জীবনীর আলোচনা করা আবশ্যক, অন্য-দিকে আবার তেমনই অনুসন্ধান দ্বারা বীরাঙ্গনাগণের বিস্মৃত কীর্ত্তি-কথার উদ্ধার সাধনে যত্নবান হওয়াও আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা সেই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই অদ্য বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে একজন বীর্য্যবতী বঙ্গরমণীর অপূর্ব্ব বীরত্বের ও আত্ম-বিসর্জ্জন-কাহিনীর পুণ্য ইতিহাস পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিলাম। আশা করি, তাঁহারাও ভবিষ্যতে আমাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকের নিকট বারভূঞার কাহিনী চিরপরিচিত। আবার সে সকল প্রাতঃস্মরণীয় ভূঞাগণের মধ্যে বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বীরত্ব-গাথাই বা কাহার অজ্ঞাত? আমাদের প্রবন্ধোক্ত সোণাবিবি চাঁদ রায়ের কন্যা ও কেদার রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সোণামণি বা স্বর্ণময়ী বালবিধবা। তৎ-কালে তাঁহার রূপ-লাবণ্যের খ্যাতি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র প্রবাদের ন্যায় প্রচলিত ও পরিচিত ছিল। বিধবা সোণামণি হিন্দুর চিরপবিত্র ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা পিত্রা-লয়ে দিনাতিপাত করিতেন। কিন্তু ভাগ্যচক্রের বিস্ময়কর আবর্ত্তনে তাঁহার জীবন ভিন্ন পথে চালিত হইয়া কল্পনাতীত কার্য্যপরম্পরার সৃষ্টি করিয়াছিল।

সে ষোড়শ শতাব্দীর কথা। তখন বাঙ্গালা দেশে বড় গোলযোগ। মোগল সম্রাট আকবর স্বীয় সুদীর্ঘ জীবনের সন্ধ্যায়, এবং তাঁহার পরলোক গমনের পরে, সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার সিংহাসনারোহণের পরেই বারভূঞাগণের বিদ্রোহ সমা-

চারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। "যশোর নগর ধামের" প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের চাঁদ ও কেদার রায়, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত জমীদারগণের স্বাধীনতা-ঘোষণার বাণী—দলিত পন্নগগণের ফণা উত্তোলনের মত সম্রাট জাহাঙ্গীরকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল; তাই তিনি বারভূঞারূপ ক্ষুদ্র পতঙ্গ কয়টিকে দমন করিবার নিমিত্ত মানসিংহকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিবার মন্ত্রণা করিতেছিলেন। এ হেন দুর্দ্দিনে বার ভূঞাগণের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন যে কতটা দৃঢ় হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। সে সময়ে আবার বার ভূঞাগণের মধ্যে ধনবলে ও জনবলে খিজিরপুরের ঈশা খাঁ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এই খিজিরপুর সরকার সোণারগাঁর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এতদ্ব্যতীত উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের বহুস্থলেও ঈশা খাঁ স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কত্রাভূপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। রালফ্ ফিচ্ ঈশা খাঁর সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে * * * The chiefe king of all these countries is called Isacan,and he is chiefe of all other kings, and is a great friend to all Christians. * এই ঈশা খাঁর সহিত চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল; তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যদি তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ মনান্তর না হয় তাহা হইলে এই নদনদীসঙ্কুল দেশে মোগলের শক্তি-বিস্তার অসম্ভব হইবে। কিন্তু তাঁহাদিগের মিলনমঙ্গলের মধ্যে চির অশান্তির বীজ নিহিত ছিল। কিম্বদন্তীতে প্রকাশ যে, একবার ঈশা খাঁ কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরে আসিলে কোন প্রকারে চাঁদ রায়ের একমাত্র দুহিতা স্বর্ণময়ীকে দেখিতে পাইয়া তদীয় রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়-পটে সে অপুর্ব্ব রূপসীর রূপলাবণ্য মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াই চাঁদ রায়ের নিকট তদীয় দুহিতার পাণিপ্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঈশা খাঁর এতাদৃশ অশিষ্টাচরণে রায়ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয়ে ঘৃণার ও বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে যে, ঈশা খাঁ অর্থবলে চাঁদ রায়ের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীমন্ত খাঁকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সহায়তায় চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোণামণিকে করতলগত করতঃ তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন।† সোণামণিও

* Harton Ryley's Ralph Fitch p. 118.

† ডাক্তার ওয়াইজ এসিয়াটিক সোইটির জার্ণালে (Vol. XLIII, Part I. 1874, p. 202). প্রকাশিত তদীয় বারভূঞা শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, "Between Isa Khan

ঈশা খাঁর শৌর্য্যবীর্য্যদর্শনে মোহিতা হইয়া সোণামণি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া ঈশা খাঁর সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। * ঈশা খাঁ সোণামণির পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার নাম অলিনেয়ামত বিবি রাখিয়াছিলেন; কিন্তু দেশের লোকে র নিকট সে নাম পরিচিত হয় নাই—তিনি চিরদিনই সোণাবিবি নামে পরিচিতা হইয়া আসিতেছেন। এই সোণাবিবির বীরত্বকাহিনীই আমাদের বক্তব্য বিষয়। পাঠকসাধারণের সুবিধার জন্যই আমাদিগকে এখানে প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইয়াছে।

সোণামণির অপহরণঘটিত অপমানের তীব্র জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া চাঁদ রায় অত্যল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। কেদার রায়ের হৃদয় হইতে অকলঙ্ক-কুলে কলঙ্ককালিমার সঞ্চারহেতু প্রজ্জ্বলিত প্রতিহিংসাবহ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত

---

of Khizrpur, whose stronghold was on the opposite bank of the Ganges, and the two brothers there was constant warfare. Isa Khan made a successful raid into his enemies' country, carried off and forcibly married Sonai (Svarnamayi), the only daughter of Chand Rai." ডাক্তার ওয়াইজের এই উক্তির সহিত কিন্তু চির প্রচলিত কিম্বদন্তীর এবং অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিকগণের মতের মিল নাই। ঈশা খাঁ যেরূপ স্পর্দ্ধিত হইয়া সোণামণিকে বিবাহ করিবার জন্য চাঁদ রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন সেইরূপ সমুচিত শিক্ষাও পাইয়াছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজ তাঁহার এ উক্তির সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। অতএব শ্রীমন্তের বিশ্বাসঘাতকতায় ঈশা খাঁর সোণামণিকে লাভ করিবার কথাই সঙ্গত বলিয়া মনেহয়। এ বিষয়ে 'স্বর্ণগ্রামের ইতিহাস' প্রণেতা স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণীর সহিত বিক্রমপুরের চিরবিশ্রুত সোণামণি সম্পর্কিত ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য আছে। স্বরূপ বাবু তদ্রচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "ঈশা খাঁ বিক্রমপুরের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ রায়ের পরমাসুন্দরী বিধবা কন্যা সোণামণিকে বিবাহ করিবার মানসে তথায় দূত প্রেরণ করেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায় শ্রবণমাত্র জ্বলন্ত অগ্নিবৎ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রথম আক্রমণেই চাঁদ রায়, ঈশা খাঁর কলাগাইছার দুর্গ বিধ্বস্ত করেন। ঈশা খাঁ, ত্রিবেণীর দুর্গে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। চাঁদ রায় ত্রিবেণী অবরোধ করিয়া খিজিরপুরের বহুতর অনিষ্টসাধন করিতে লাগিলেন। ঈশা খাঁ মনে মনে স্থির করিলেন, কোনওরূপে সোণামণি আমার হস্তগত হইলেই চাঁদ রায় কন্যার শোকে বিহ্বল হইবেন এবং হয়ত যুদ্ধ করিতেও নিবৃত্ত থাকিবেন। ঈশা খাঁ অর্থবলে চাঁদরায়ের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষকে হস্তগত করেন। প্রধান কর্ম্মচারী বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক সোণামণিকে ঈশা খাঁর হস্তে সমর্পণ করেন।" (স্বর্ণগ্রামের ইতিহাস ১০৩-৪পৃষ্ঠা)

* Sona Bibi won by the courage and address of her captor soon ceased to repine at her lot, and renouncing Hinduism she embraced

হইল না। ঈশা খাঁ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন যেমন তিনি পুনঃ পুনঃ তদীয় রাজ্যের বিভিন্নাংশ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও শান্তি দেন নাই, ঈশা খাঁর মৃত্যুর পরেও তেমনই তিনি তাঁহার ত্যক্ত রাজ্যাভিমুখে স্বীয় সৈন্য প্রেরণ করিতে থাকেন। সে সময়ে আরাকানদেশবাসী মগগণের অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষরূপে সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহলুণ্ঠন, স্ত্রীলোকের সতীত্বাপহরণ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দুষ্কার্য্য করিতে এই সকল মগগণ বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিত না। * ঈশা খাঁর বীরত্বপ্রভাবে মগগণ তদীয় রাজ্যমধ্যে কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই, কিন্তু এখন তাহারা সুযোগ বুঝিয়া ঈশা খাঁর রাজ্য অধিকারের প্রলোভনে ধাবিত হইল। রাজ্য অরাজক, কাযেই চারিদিক হইতে সকলেই সুযোগ বুঝিয়া সোণারগাঁর দিকে অগ্রসর হইল। মগদের অত্যাচার ও ত্রিপুরেশ্বর ও বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের ভীষণ আক্রমণ হইতে কে এখন ঈশা খাঁর রাজ রক্ষা করিবে? অরাতিবৃন্দ সকলেই ভাবিয়াছিল যে, তাহাদিগকে সোণারগাঁ অধিকার করিতে কোনওরূপ ক্লেশ পাইতে হইবে না; অতি সহজেই উহা অধিকৃত হইবে। কিন্তু শীঘ্রই তাহাদিগের এ ভ্রম অপনোদিত হইল।

---

her husband's faith remaining throughout his life a devoted helpmate, and defending the kingdom against his enemies, her kith and kin, even after his decease. *Romance of an Eastern Capital* by F. B. Bradley Birt. pp. 79-80.

* বিক্রমপুরে অদ্যাপি মগদিগের দ্বারা উৎপীড়িত কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। ইঁহারা জনসাধারণের নিকট 'মউগা ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত। ইঁহারা রায়োপাধিক ব্রাহ্মণ। মুন্সিগঞ্জ থানার নিকটবর্ত্তী কাঠাদিয়া নামক গ্রামে ইঁহারা বাস করিতেছেন। গ্রামস্থ জনগণ ইঁহাদের সহিত সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্ম দূরে থাকুক আহারাদিও করে না। গ্রামবাসীকর্ত্তৃক এইরূপ ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ইঁহারা এখন নিতান্তই অনাদৃত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইয়াও ইঁহারা এখন সমাজ কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়া অবস্থাপন্ন কৃষকদিগের ন্যায় আচারপরায়ণ হইয়াছে। কিম্বদন্তী এই যে, যখন মগেরা বিক্রমপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন এই কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং গৃহস্থ কুলকামিনীগণ অপমানিতা হইয়াছিলেন। তদবধি এই ব্রাহ্মণগণ পতিতব্রাহ্মণরূপে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমানকালে ইঁহারা লুপ্ত পদমর্য্যাদার পুনপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ সচেষ্ট। এখন বিদেশে আর ইঁহারা পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন না। মগদিগের এইরূপ লুণ্ঠনে ও দুষ্কার্য্যে পূর্ব্বাকালের সামাজিক চিত্রের যে শোচনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা এই আলেখ্যে বিশেষরূপে পরিস্ফুট।

ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর সোণাবিবি নিজহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সময় সোণাবিবি যে অপূর্ব্ব বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি শতমুখে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর ইতিহাসে এইরূপ রাজনীতি-কুশলতা, স্বাধীন ভাবে রাজ্য-পরিচালনার ক্ষমতা সোণাবিবি ব্যতীত অন্য কোনও রমণী প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। কথিত আছে যে, ত্রিপুরার রাজা ও কেদার রায় সসৈন্যে সোণারগাঁয় উপস্থিত হইলেই কেদার রায় তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া দূত প্রেরণ করেন। তদুত্তরে সোণাবিবি বলিয়াছিলেন, "আমার শরীরে এক বিন্দু শোণিত থাকিতে বিনাযুদ্ধে আমার স্বামীর পরিত্যক্ত একখণ্ড সামান্য ভূমিও কাহারও হস্তে সমর্পণ করিব না।" বীরাঙ্গনার এই অপূর্ব্ব বীরবাণীতে কেদার রায় বিস্মিত হইয়াছিলেন। এ কি তাঁহাদের স্নেহপালিতা আদরিণী সেই স্বর্ণময়ী! এক দিকে একজন বিধবা রমণী—অন্য দিকে ত্রিপুররাজ, মগগণ ও কেদার রায়—ত্রিশক্তির সম্মিলিত আক্রমণ!

উভয় পক্ষে বহুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। সোণাবিবি স্বয়ং সৈনিকগণকে পরিচালিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! একা রমণীর পক্ষে এইরূপ শক্তিশালী শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা অসম্ভব। অবশেষে যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কোনরূপেই আর রক্ষা নাই—তখন তিনি স্বামীর প্রিয়তম দুর্গ শত্রুহস্তে সমর্পিত হওয়া অপেক্ষা ধ্বংস হওয়াই সঙ্গতবোধে—সৈন্যগণকে শীতললক্ষ্যানদীতীরবর্ত্তী সাধের সোণাকুণ্ডা দুর্গে অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ করিলেন,—রাণীর আদেশে উহাতে অগ্নি সংযুক্ত হইল, দেখিতে দেখিতে বহ্নির বিকট গ্রাসে ঈশা খাঁর দুর্গ ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে চলিল—আর সেই প্রবল অগ্নিরাশিতে প্রকৃত বীরাঙ্গনার ন্যায় সোণাবিবি পতিপদ চিন্তা করিতে করিতে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। বঙ্গ-রমণীর এরূপ অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী কয়জন বাঙ্গালী অবগত আছেন জানি না—কিন্তু যদি কেহ কোন দিন নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী সোণাকুণ্ডা নামক স্থানে বেড়াইতে যায়েন, তাহা হইলে অজ্ঞ কৃষকদিগের মুখে সোণাবিবির এই বীরত্ব-কাহিনী শুনিতে পাইবেন। তাহারা অদ্যাপি সেই দুর্গের শেষ চিহ্ন একটি মৃত্তিকাস্তূপ দেখাইয়া বলে—"ঐ দেখুন, সোণাবিবির কেল্লা।*"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

* F. B Bradley Birt তদীয় *Romance of an Eastern Capital* নামক গ্রন্থের

পাষাণের কথা।

(১)

আমার সময়ের ধারণা নাই, সুতরাং আমার জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে কত কাল অতীত হইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। যতদূর স্মরণ আছে তাহাই বলিতেছি। শৈশবের কথা এইমাত্র মনে পড়ে যে, প্রশস্ত সমুদ্রসৈকতে আমি ও আমার ভ্রাতৃবর্গ খেলা করিয়া বেড়াইতাম—বায়ুভরে উড়িয়া যাইতাম, ঘূর্ণবাত্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতাম, কখন বা সমুদ্রের জলে পতিত হইতাম, জল সরিয়া যাইলে—ভূমি শুষ্ক হইয়া যাইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতাম। সে সমুদ্রের বিশালতা ধারণা করিবার শক্তি তোমাদিগের নাই। সে সমুদ্রসৈকতের বিস্তৃতি তোমাদিগের মহা-প্রদেশসমূহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিক। যে সকল জলজন্তু সেই মহাসমুদ্রে বাস করিত যৌবনের মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তাহাদিগকে আর দেখি নাই। আমার শৈশবে আমি একবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখি, আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছি। শুনিয়াছি, তোমাদিগের এই সংগ্রহশালায় সেই মহাসমুদ্রের

৭৯—৮০ পৃষ্ঠায় সোণাবিবির এই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Isha Khan's death was the signal for his enemies to swoop down upon his kingdom and wreak the vengeance which they had so often before attempted in vain. Kedar Rai * * * with the Raja of Tipperah sailed up the Megna with a great fleet, confident of success now that the great Afghan Chief was gone. But they were soon to find tha though Isha Khan was dead, a valiant defender remained to guard hi memory and protected his kingdom. Their own kinswoman, the Afghan's widow was as vigorous and determined a foe as Isha Khan himself. Entrenched in the fort of Sonakunda on the Lakhiya she held out stubbornly for many weeks, defying all the forces of her enemies, and at length, when the end drew near, determined that her dead lord's fort should never surrender to his foes, she ordered it to be burned to the ground, and perishing in its ashes, made of it her funeral pyre. To this day the memory of Sona Bibi is held in honour on the banks of the Lakhiya."

জীবজন্তুর অস্থি আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্বেতকায় বিরলকেশ একজন সাধক পর্ব্বত ভেদ করিয়া সেই সকল জীবজন্তুর অস্থি লইয়া আসিয়াছিলেন।

কতদিন সমুদ্রসৈকতে উড়িয়া বেড়াইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। অবস্থান্তরপ্রাপ্তির পূর্ব্বের কথা সামান্যমাত্র আমার মনে পড়ে। একদিন মধ্যাহ্নে প্রখর সূর্য্যতপ্ত বায়ু আমাকে অপর কতকগুলি বালুকণার সহিত সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সেদিন যত দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, জীবনে আর কোন দিন ততদূর আসিতে পারি নাই। আমার জীবনযাত্রায় সেই প্রথম পাদক্ষেপ। সে দিন বুঝিতে পারি নাই যে, পরে অতীতকালের সাক্ষিস্বরূপ বহুযুগের ইতিহাস বহন করিয়া আমাকে সংগ্রহশালায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। সে দিন যে স্থানে আসিয়াছিলাম সে স্থান হইতে সমুদ্রের জল সরে না, সুতরাং শৈশবের আবাসভূমি আর কখনও দেখি নাই।

সমুদ্রগর্ভে অপরাপর বালুকণার সহিত বহুকাল বাস করিয়াছি। কত অপরূপ জলজন্তু আমাদিগের বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইত! আমরা তাহাদিগের জন্মমৃত্যু দেখিতাম। বালুকাময় সমুদ্রগর্ভে তাহাদিগের জন্ম হইত। তাহারা আমরণ সেই বালুকাক্ষেত্রেই বাস করিত। জীবনান্তে তাহাদিগের অস্থিগুলি শুভ্র বালুকাক্ষেত্রটিকে শুভ্রতর করিয়া তুলিত। সেই সকল অস্থি তোমাদিগের অতীত জীববিদ্যার মূল। তোমরা সেই যুগের কোন জীবেরই সমগ্র কঙ্কাল সংগ্রহ করিতে পার নাই, একখানি দুইখানি অস্থি লইয়া তোমরা অতীত যুগের জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহ; কিন্তু তাহা হয় না। অতীতের সাক্ষী আমি সেই সকল জীব দেখিয়াছি। আমি তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছি, তাহাদিগের জীবনের প্রারম্ভ হইতে তাহাদিগের চৈতন্যের শেষসীমা পর্য্যন্ত তাহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছি, জীবনান্তে বহুযুগ তাহাদিগের অস্থিনিচয় বক্ষে ধারণ করিয়াছি—আমি বলিতেছি, তাহা হয় না। তোমরা অতীতযুগের জীবসমূহের যে চিত্রাবলী রাখিয়াছ তাহা হাস্যোদ্দীপক। বালুকণার যদি উচ্চহাস্য করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমার উচ্চহাস্যে তোমাদিগের এই গৃহ ধ্বনিত হইয়া উঠিত। আমি দেখিয়াছি, আমার স্মরণ আছে, কিন্তু আমার মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, তোমাদিগের মত বলিবার বা লিখিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং সব জানিয়াও আমার কিছু বলা হইল না।

সমুদ্রগর্ভস্থ বালুকাক্ষেত্রে কত দিন বাস করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার সময়ের ধারণা নাই। শৈশবে যে আমার

মূর্চ্ছা হইয়াছিল তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। একদিন সূর্য্যাস্তকালে কোন দারুণ আঘাতে সমুদ্রগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল, গভীর আলোড়নে বিশাল জলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, বহু জলজন্তুর জীবনান্ত হইল। আমি মূর্চ্ছিত হইলাম। তাহার পর কালপ্রবাহ কি ভাবে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা কেমন করিয়া বলিব? অজ্ঞান অবস্থায় আমি যেন অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতাম, যেন দুর্ব্বিষহ যাতনা অনুভূত হইত, বোধ হইত যেন কেহ ভীষণ বলে আমার ক্ষুদ্র দেহখানিকে ক্ষুদ্রতর করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই স্মরণ নাই। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখি, অজ্ঞাত শক্তির প্রয়োগে বালুকাক্ষেত্রে বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সেই সমুদ্রসৈকত, সেই বিশাল জলরাশি, সেই সব জীবজন্তু উদ্ভিদ্ সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে, সে জগৎ আর নাই; অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে লক্ষ লক্ষ বালুকাকণা একত্র হইয়া রক্তবর্ণ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে, আমার শৈশবের দেহ তখন বিশাল অশ্মখণ্ডের কণিকামাত্রে পরিণত হইয়াছে, আর আমার স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে।

চেতনার প্রারম্ভে দেখিলাম, নূতন জগতে তৃণশষ্প, তরুলতা, জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে নূতন জগতের আকার অনেকটা বর্ত্তমান জগতের ন্যায়। তাহার পর স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। আমি তখন যে প্রস্তরখণ্ডের দেহে লীন হইয়াছিলাম মূর্চ্ছা অবসানে দেখি, তাহার দেহ স্নিগ্ধ শ্যাম দুর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত; নূতন আকারের চতুষ্পদ জীব তাহার উপরে বিচরণ করিতেছে। সময়ে সময়ে মসীকৃষ্ণবর্ণ ছাগচর্ম্মাচ্ছাদিত তোমা-দিগের স্বশ্রেণীর জীবগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিত। তাহারা নখ, দন্ত, বা উপলখণ্ডের সাহায্যে চতুষ্পদ জীবগুলিকে জয় করিবার চেষ্টা করিত ও লোকবলের আধিক্যে অনেক সময় তাহাদিগকে নিধন করিতে সমর্থ হইত; কিন্তু কখন কখনও শৃঙ্গের তাড়নায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেও বাধ্য হইত। আমার নিকটে ইহাই মানব-জীবনের ইতিহাসের সূত্রপাত। মনুষ্য আমার নিকটে তখন নবজাত জীব। আমি যখন জ্ঞানলাভ করি তখন মনুষ্যজাতি উন্নতির পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং মনুষ্য জীবনের প্রারম্ভের কথা বলিতে আমি অক্ষম। আমি সর্ব্বপ্রথমে মনুষ্যজাতীয় যে সকল জীব দেখিয়াছিলাম তাহারা অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি ছিল এবং মৃগয়াই তাহাদিগের উপজীবিকা ছিল বলিয়া বোধ হইত। শুনিয়াছি তদ্বংশীয়েরা দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে অদ্যাপি বাস করিয়া থাকে; অপেক্ষাকৃত বলবান জাতি কর্ত্তৃক

তাড়িত হইয়া তাহারা এখন বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়াছে; বৃহদাকার জন্তুর অভাবে তাহারা কীটপতঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা জঠরানল নিবৃত্তি করিয়া থাকে। ইহারাই এই দেশের প্রকৃত অধিপতি, কারণ মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভে ইহারাই শুষ্ক ভূমির এই অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পরে তোমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ প্রভৃতি যে সকল জাতি আসিয়া এদেশে বাস করিয়াছে তাহারা সকলেই দস্যু ও অধর্ম্মাচারী। যে কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকার মনুষ্যজাতির কথা বলিলাম, তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প ছিল—শতাধিক ব্যক্তিকে কখনও একত্রিত হইতে দেখি নাই। তাহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না, শিলাখণ্ডই তাহাদিগের একমাত্র আয়ুধ ছিল। কিছুকাল পরে সে জাতীয় মনুষ্য এ প্রদেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। তাহারা কোথায় গেল, কেন গেল তাহা বলিতে পারি না, কারণ তখনও আমরা ভূগর্ভনিহিত ছিলাম। তোমরা অনুমান কর, সভ্যতর জাতি আসিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকার মনুষ্যজাতির ধ্বংসসাধন করিয়াছিল। তাহার কতকটা সত্য হইতে পারে, কারণ ইহার পরবর্ত্তী মনুষ্যেরা উজ্জ্বল ধাতুময় অস্ত্রের সাহায্যে মৃগয়া করিত। একদিন এক জন ঐরূপ অস্ত্রের সাহায্যে আমাদিগকে ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। দূরে পাটলীপুত্র-বাসী ভিক্ষুদত্ত যে স্তম্ভ দেখিতেছ উহার একপার্শ্বে অদ্যাবধি সেই অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। পরে জানিয়াছি, ঐ ধাতু তাম্র। শুনিয়াছি, যে জাতীয় মনুষ্য তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিত তাহাদিগের বংশধরেরা বিস্তীর্ণ দাক্ষিণাত্যে এখনও বাস করিতেছে। তোমাদের সংগ্রহশালায় তাম্রনির্ম্মিত আয়ুধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু তুমি বোধ হয় এই জাতীয় অস্ত্র অনেক দেখিয়াছ। তোমা-দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখন পূর্ব্ববাসীরা তাড়িত হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে বিজেতারাও লৌহ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাম্রের ব্যবহার রহিত হইয়া যায়। একদিন রাত্রিকালে তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রধারী কতকগুলি লোক আমাদিগের বক্ষের উপরে আসিয়া কয়েক স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিল। বহুকাল পরে সেই দিন ঐ আলোক দর্শন করিলাম। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা যাহা বলিয়াছি তাহা পার্শ্ববর্ত্তী বালুকাকণার নিকট শুনিয়াছিলাম। অগ্নির সাহায্যে ক্রমে আমাদিগের বক্ষ ও পার্শ্বস্থিত তৃণক্ষেত্র ভস্মে পরিণত হইল। দারুণ উত্তাপে আমরা বিদীর্ণ হইয়া গেলাম ও জনগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। ক্ষণকাল পরেই শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘকায়, সুদীর্ঘ পিঙ্গলবর্ণকেশধারী কতকগুলি মনুষ্য

পার্শ্ববর্ত্তী বনভূমি হইতে নির্গত হইয়া আসিল। তাহারা আসিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ, তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রধারী পুরুষ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া মৃত্যুকালে অগ্নি ও আকাশকে লক্ষ্য করিয়া নূতন ভাষায় গম্ভীর শব্দে কি বলিয়া গেল। সেই শব্দমালার গাম্ভীর্য্য এত অধিক যে, আক্রমণকারীদিগের মধ্যে কয়েকজন ভীত হইয়া পলায়ন করিল। শ্বেত-কৃষ্ণ মনুষ্যের বিবাদের ফলে আমি অগ্নির আলোক দর্শন করিলাম। পরে কতবার সেরূপ আলোক দেখিয়াছি, কতবার উজ্জ্বলতর অগ্নি আমার নিকটে প্রজ্বালিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম সে আলোকদর্শনে যে আনন্দ তাহা পরে আর কখনও অনুভব করি নাই। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজতশুভ্রবর্ম্মাবৃত, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী শ্বেতকায় সৈনিকগণ দলে দলে আসিয়া ভস্মরাশি বেষ্টন করিয়া ফেলিল। বিলাপে পর্ব্বতের সানুদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দলে দলে সৈনিকবর্গ কাষ্ঠ অন্বেষণে চলিয়া গেল। কেবল কয়েকজনমাত্র মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল মধ্যে চিতাধূম গগন স্পর্শ করিল, অরণ্যবাসী শ্বেতকায় মনুষ্যগুলির দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। দগ্ধাবশিষ্ট অস্থিগুলি একটি ক্ষুদ্র মৃণ্ময় পাত্রে রক্ষিত হইল, দলে দলে শ্বেতকায় মনুষ্য আসিয়া তাহাতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে একটি গুরুভার দণ্ডের সহিত ভস্মাধারটি ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। ইহার পর কয়েক দিবস চারি পার্শ্বের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে গভীর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইত। শুনিতে পাইতাম, কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যজাতির শোণিতে পর্ব্বতের সানুদেশ রঞ্জিত হইতেছে, ভীষণ প্রতিহিংসার প্রাবল্যে শ্বেতকায় সৈনিকগণ কৃষ্ণকায় জাতির ধ্বংস সাধন করিতেছে, বৃদ্ধ ও বালক, স্ত্রী ও পুরুষ দলে দলে নিহত হইতেছে, পর্ব্বতের উপত্যকাগুলি ক্রমশঃ জনশূন্য হইতেছে। বায়ু আসিয়া ভস্মরাশিকে উড়াইয়া লইয়া গেল, ভস্মসিঞ্চিত ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত হইল, অতি অল্পকালের মধ্যে উপত্যকা আবার স্নিগ্ধশ্যাম বনরাজিতে আবৃত হইল। ইহার পর আমরা আর সর্ব্বদা মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইতাম না, কৃষ্ণকায় মনুষ্যেরা অতি সাবধানে মৃগয়া করিতে আসিত, অধিক সংখ্যক কৃষ্ণকায় মনুষ্য আর কখনও দেখি নাই। কখন অরণ্যবাসী জটাশ্মশ্রুধারী পুরুষগণ সমিধপুষ্পাহরণের জন্য গভীর বনে আসিতেন, কখন বা প্রতিহিংসাপরবশ কৃষ্ণকায় অলক্ষ্যে শ্বেতকায় বনচারীর পশ্চাদ্‌গমন করিত। কিন্তু সে পর্ব্বতের সানুদেশে বা উপত্যকায় বহুকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের বাস ছিল না।

শুনিয়াছি, ক্রমে শ্বেতকায় মনুষ্যে দেশ প্লাবিত হইয়া গেল, কৃষ্ণকায় মানবজাতি ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল, যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা অধীনতা স্বীকার করিয়া

নবাগত জাতির অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল ও ক্রমে শ্বেতজনসঙ্ঘে মিশিয়া গেল। শ্বেতাঙ্গ জনগণের চরম উৎকর্ষের অবস্থা আমি দেখি নাই। আমি যখন পুনরায় মনুষ্যসমাজের সংসর্গে আনীত হইয়াছিলাম তখন শ্বেতকায় জাতির অবনতি সূচিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, এই জাতির যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল এতদ্দেশবাসী অপর কোন জাতিরই সেরূপ হয় নাই। তাহারা বৃহৎ কাষ্ঠের দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিত, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা হর্ম্ম্যাবলী সুদৃশ্যচিত্রশোভিত করিত, ক্রমে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে পর্ব্বতগাত্র ছেদন করিয়া গৃহনির্ম্মাণের জন্য পাষাণ লইয়া যাইত, অস্ত্রসাহায্যে তাহার মলিনত্ব দূর করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিত। তাহারা কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে জলরাশি উত্তীর্ণ হইত, বৃহদাকার কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নে বর্ত্তুলাকার কাষ্ঠখণ্ড সংলগ্ন করিয়া গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি বনবাসী জীবসমূহকে ভারবহনে নিযুক্ত করিত। যে ব্যক্তি বর্ত্তুলের পরিবর্ত্তে রথে চক্র যোজন করিয়াছিল তাহার নাম অদ্যাপি তোমরা করিয়া থাক। ক্রমে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে ও কৃষ্ণকায় জাতির সহিত মিশ্রণে তাহাদের বর্ণের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যখন মনুষ্যসমাজে নীত হইলাম তখন দেখিলাম, নবাগত জাতির বর্ণের বৈষম্য ঘটিয়াছে, আচারব্যবহারে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বলেরও লাঘব হইয়াছে।

বহুকাল পরে পার্শ্বদেশে দারুণ ক্লেশ অনুভব করিলাম। শুনিয়াছি, পাষাণে যে ক্লেশ অনুভব করে তাহা তোমরা এখন স্বীকার কর। দেখিলাম, মলিনবেশধারী জনৈক মনুষ্য আমার পার্শ্বে লৌহকীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেক চেষ্টার পর, অনেকগুলি কীলক ভগ্ন হইবার পর একটি কীলকের কিয়দংশ আমার পার্শ্বে প্রবেশ করিল। আমার যন্ত্রণা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই, রোধ করিবার ক্ষমতা নাই, সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তথাপি বলিতে পারি, এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা কখনও ভোগ করি নাই। এরূপ অসহনীয় যন্ত্রণা সমুদ্রগর্ভে বাসকালে মূর্চ্ছার প্রারম্ভেও বোধ হয় অনুভব করি নাই, পরবর্ত্তী জীবনে একবার মাত্র ভোগ করিতে হইয়াছিল। ক্রমে সংবাদ আসিল যে, পর্ব্বতের নানাস্থানে মনুষ্যগণ কীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, দারুণ যন্ত্রণায় সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। একটি, দুইটি, তিনটি ক্রমে দশটি কীলক সমরেখায় প্রোথিত হইল। আমাদিগের আক্রমণকারী লৌহদণ্ডধারী আরও কয়েকজন মনুষ্যকে আহ্বান করিয়া আনিল। কীলকমূলে লৌহদণ্ড প্রয়োগে ও মনুষ্যবর্গের সমবেত চেষ্টায় আমরা সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেলাম। আমাদিগকে অপসারিত করিয়া আততায়ীরা পুনরায় কীলক প্রোথিত করিতে লাগিল। ক্রমে

পর্ব্বতের সানুদেশে সমস্ত স্থান হইতেই এই নিষ্ঠুর বিদারণের শব্দ আসিতে লাগিল; আমরা জানিতে পারিলাম যে, উপত্যকার সর্ব্বস্থানেই পাষাণের উপর অত্যাচার হইতেছে। এইরূপে সন্ধ্যাগমের পূর্ব্বেই পর্ব্বতসানুর আকার অন্যরূপ হইয়া গেল। অন্ধকারের আগমনের সহিত চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত হইতে লাগিল, বনভূমি বহুকাল পরে মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত অগ্নিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পরে জানিয়াছিলাম, স্তূপনির্ম্মাণের জন্য নগর হইতে সহস্রাধিক ব্যক্তি পাষাণ ছেদন করিতে পর্ব্বতের নিকটে আসিয়াছিল। তাহারা সমস্ত দিন পাষাণ ছেদন করিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে রাত্রিযাপন করিত। সূর্য্যোদয় হইতে সন্ধ্যার সমাগম পর্য্যন্ত পাষাণ ছেদনের শব্দে ও সেই শব্দের প্রতিধ্বনিতে শৈলশ্রেণী কম্পিত হইত। শ্বাপদসঙ্কুল বনাবৃত সানুদেশ জীবশূন্য হইয়া উঠিল। মানবগণ মাসদ্বয় পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে শিলাছেদনে ব্যাপৃত ছিল। শিলাছেদন শেষ হইলে নগর হইতে শত শত গোযান আসিয়া উপস্থিত হইল, গোযান যাতায়াতের জন্য উপত্যকা হইতে নিম্নভূমি পর্য্যন্ত পথ প্রশস্ত করা হইয়াছিল। দলে দলে বৃহৎকায় হস্তিগণ পর্ব্বতনিম্নে আনীত হইল ও দিনের পর দিন হস্তিগণ বৃহৎ পাষাণখণ্ডসমূহ শুণ্ডে উঠাইয়া গোযানে স্থাপন করিতে লাগিল। দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে হীনবল মানব জাতি কিরূপে এই গুরুভার পাষাণরাশি পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বহুদূরবর্ত্তী নগরের সান্নিধ্যে লইয়া গিয়াছিল, বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত গুরুভার পাষাণ কিরূপে ভূমি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া তোমরা বিস্মিত হও, কিন্তু আমি তখন আশ্চর্য্যজনক বিশেষ কিছুই দেখি নাই। আমি কিসে বিস্ময় বোধ করি শুনিবে? আমার বিস্ময় বোধ হইয়াছিল গোশকট দেখিয়া, গোশকটের চক্র দেখিয়া, চক্রের প্রবর্ত্তন দেখিয়া। আমি ভাবিয়াছিলাম, কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চক্র গুরুভার পাষাণের ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে না, ভার বহনেও যদি সমর্থ হয় শকট চলিতে সমর্থ হইবে না, নিশ্চয়ই কোন না কোন বিপদ ঘটিবে। কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই শকট চলিল, চক্র প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল, ক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পথ অতিবাহিত হইতে লাগিল। সেরূপ গোশকট তোমরা এখন আর ব্যবহার কর না, দুই একজনমাত্র, তাহার পাষাণে খোদিত চিত্র দেখিয়া থাকিবে। তাহা বর্ত্তমানকালে প্রচলিত গোশকটের ন্যায় নহে। বর্ত্তমানের গোশকট দ্বিচক্র, কিন্তু সেগুলি চারি বা ততোধিক চক্রের উপরে স্থাপিত হইত। রথচক্র কোন স্থানে ভূমিতে প্রবেশ করিলে বা পথের কোন স্থান কর্দ্দমাক্ত থাকিলে হস্তিবৃন্দ আসিয়া সাহায্য করিত, শুণ্ডে রথচক্র মুক্ত করিত, কখন বা ভারবাহী গোসমূহকে সাহায্য করিত। এইরূপে গোশকটে সহস্রাধিক শিলাখণ্ড নূতন

পথ ধরিয়া শতাধিক যোজন পথ আনীত হইল। শিলাবাহী শকটসমূহ যে দিন নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিল সে দিন নগরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। দলে দলে নগরবাসিগণ আসিয়া আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনেকে এরূপ দীর্ঘকায় প্রস্তর পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই; তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে শকটশ্রেণী নগরপ্রাকার অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। তখন জনতা ক্রমে পথরোধ করিয়া ফেলিল। মুষ্টিমেয় রাজপুরুষের চেষ্টায় পথ মুক্ত হইল না; তখন অতি বৃদ্ধ লোলচর্ম্ম, মুণ্ডিতশীর্ষ কাষায় বস্ত্র পরিহিত একজন মনুষ্য আসিয়া ভগবান্ বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করিয়া পথমুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধের ও রাজপুরুষগণের চেষ্টায় পথ মুক্ত হইল। শকটসমূহ নগর অতিক্রম করিয়া পুনরায় নগরপ্রাকারের বাহিরে এক প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইল। এই সময়ে দেখিলাম, মনুষ্যজাতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; অনেক উন্নতি হইয়াছে, অনেক বিষয়ে অবনতিও হইয়াছে। নূতন নাম, নূতন আচার ব্যবহার, নূতন অস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী আসিয়া আমার পূর্ব্বপরিচিত শ্বেতকায় জাতিতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। বুদ্ধ, স্থবির, ভিক্ষু, সঙ্ঘ, সঙ্ঘারাম, চীবর, কাষায় প্রভৃতি কথা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। মনুষ্যজাতির আবাসস্থল নগরসমূহ সুদৃশ্য গগনস্পর্শী আবাসভবনে পরিপূর্ণ হইয়াছে; রাজপথসমূহ প্রস্তরাচ্ছাদিত হইয়াছে; বিশালনগরে জলাভাব দূর করিবার জন্য কৃত্রিম নদীসমূহ খনিত হইয়াছে; হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি জীবগণ নরজাতির বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে বহন করিতেছে, উষ্ট্র ও অশ্ববাহিত শকটের শব্দে শ্রুতিরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে; নগরমধ্যে জলপথে বিচিত্র তরণীসমূহ ইতঃস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে। আমি এরূপ নগর পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, ক্রমে হস্তিযূথের সাহায্যে শকট হইতে প্রস্তরসমূহ ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইল, সমুদায় প্রস্তর নামাইতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। শকটের পশ্চাতে যে বিশাল জনসঙ্ঘ প্রান্তরে আসিয়াছিল, তাহারা একে একে নগরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। ক্রমে বিশাল প্রান্তর জনশূন্য হইয়া গেল। পূর্ব্বে নগর ও নাগরিক কখন দেখি নাই। সে দিন সহস্র সহস্র নাগরিকের কথোপকথন কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহার কতক বুঝিতে পারিতেছিলাম, কতক পারি নাই। তবে এইমাত্র নিশ্চয় জানিয়াছিলাম যে, মানবজাতির ভাষার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে কৃষ্ণকায় বনবাসী মানবজাতির মুখে যে ভাষার প্রয়োগ শুনিয়াছিলাম সে ভাষার অবিমিশ্র প্রয়োগ আর শুনি নাই। পূর্ব্বে নবাগত শ্বেতকায় জাতির মুখে যে ভাষা শুনিতাম, সে ভাষাও আর শুনি নাই। এখন নাগরিকগণকে যে ভাষা

ব্যবহার করিতে শুনিলাম, তাহা প্রাচীন শ্বেতকায় জাতির ভাষার ন্যায়, কিন্তু সেরূপ পরুষ নহে, তাহা অপেক্ষাকৃত কোমল ও সুশ্রাব্য।

বহুকাল পরে মনুষ্যজাতি দেখিলাম। আমি বৃদ্ধ,—অতি বৃদ্ধ,—আমার বয়সের পরিমাণ করিবার যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমার বয়স শুনিয়া তোমরা বিস্মিত হইতে। বৃদ্ধগণ সাধারণতঃ প্রগল্‌ভ হইয়া থাকে; নগরবাসী মনুষ্য জাতিকে কি প্রকার দেখিলাম তাহা বলিতেছি, তুমি চিত্ত সংযত কর, আমার প্রগল্‌ভতায় বিরক্ত হইও না। শকট-বাহিত পাষাণ দেখিতে নানাবিধ মনুষ্য আসিয়াছিল। যাহারা রাজপথে আসিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ, বৃদ্ধ ও বালক, শ্বেত ও কৃষ্ণ, সর্ব্ববিধ মনুষ্যই দেখিয়াছিলাম। যাহারা আমাদিগকে ছেদন করিতে পর্ব্বতপার্শ্বে গমন করিয়াছিল, তাহারা শ্রমজীবী, কঠোর পরিশ্রমে পটু, পরুষভাষী, বহুভাষী ও বহুভোজী। শকটে প্রস্তর আসিতেছে শুনিয়া যাহারা নগরপ্রান্তে আমাদিগকে দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা অধিকাংশই শ্রমজীবী, তবে তাহাদিগের মধ্যে দুই একজনকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহারা যেন অপর কোন জগতের মনুষ্য, তাহাদিগের সুদীর্ঘ বপু ও কোমল মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইয়াছিল, যেন তাহারা কঠোর শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত নহে। তাহারা সুদৃশ্য বহুমূল্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, তাহারা যে স্থান দিয়া চলিয়া যায় সে স্থান সুগন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অথচ যেন আলস্যজড়িত। পরে জানিয়াছিলাম, তাহারা বিলাসপ্রিয় নাগরিক। নগরপ্রাকার অতিক্রমকালে আর এক শ্রেণীর মনুষ্য দেখিয়াছিলাম, তাহারা দীর্ঘকায়, সুদর্শন, কোমল অথচ কঠোর, তাহারা পরিচ্ছদের উপর লৌহবর্ম্ম ধারণ করিয়াছিল, কোমলহস্তে শাণিত লৌহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও বলদৃপ্ত। পরে জানিয়াছিলাম, তাহারা যুদ্ধব্যবসায়ী। পূর্ব্বে যে শ্বেতকায় জাতি দেখিয়াছিলাম তাহাদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধ করিত,তাহারাই দেবসেবা করিত, তাহারাই হলকর্ষণ করিত; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে বিলাসিতা ছিল না। বর্ত্তমান কালে এ কথা তোমাদিগের নিকট শ্রুতিকঠোর হইবে। সহস্র সহস্র বর্ষকাল ব্যাপিয়া তোমরা জাতিভেদে—জাত্যানুসারে কর্ম্মভেদে অভ্যস্ত, সুতরাং এ কথা তোমরা হয়ত বিশ্বাস করিবে না। তোমাদিগের নিকটে তোমাদিগের প্রাচীন প্রথার অবশেষ যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে তোমরা জানিয়া আসিতেছ যে, জাতিভেদ বহুকালের। কিন্তু আমি জাতিভেদ অপেক্ষাও প্রাচীন, আমি মনুষ্যজাতি অপেক্ষা প্রাচীন, আমি সর্ব্বজীবাপেক্ষা প্রাচীন, আমার কথা বিশ্বাস করিও। নগর কাহাকে বলে তাহা সেই দিন দেখিলাম। দেখিলাম, তাহা

মনুষ্যের অরণ্যবিশেষ। যতদিন পর্ব্বতের পদপ্রান্তে পড়িয়াছিলাম ততদিন দেখিয়াছি, জীব দেখিলে জীব হয় তাহার নিকট আসিয়া মিলিত হয়, নহে ত দূরে পলায়ন করে, হয় আলাপে প্রবৃত্ত হয়, নহে ত পরস্পরের প্রাণহরণের চেষ্টা করে। এত অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে, এত অধিক জীব পরস্পর বিবাদ না করিয়া, হিংসা না করিয়া কিরূপে বাস করে তাহা আমার নিকট অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু শুনিয়াছি, বিবাদ ও হিংসার প্রকারভেদ হইয়াছে; যে স্থানে জীবের অস্তিত্ব আছে বিবাদ ও হিংসা এখনও সে স্থানে বিদ্যমান আছে। যখন নগরপ্রাকার অতিক্রম করিয়া নগরমধ্যে গমন করিতেছিলাম তখন দেখিতেছিলাম, জনস্রোতঃ নানা পথ হইতে আসিয়া একত্র মিলিত হইতেছে। পরস্পর অভিভাষণ না করিয়া, এমন কি পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া যে যাহার গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতেছে। প্রথম দিন নগর দেখিয়া ইহা আমার নিকট একান্ত বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী, অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা, বিপুল পণ্যের সমাবেশ প্রথম দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। বিপণীর উপরে গবাক্ষ-পথে শকট-শ্রেণীদর্শন-লোলুপ অবগুণ্ঠনশূন্যা অন্তঃপুরিকাগণকেও দেখিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে কখনও এত অধিক স্ত্রীজাতির একত্র সমাবেশ দেখি নাই। সে দিন কত অলঙ্কার, কত বস্ত্র, কত বেশবৈচিত্র্য দেখিয়াছি তাহা কি বলিব! শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রথম নগর দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল সেরূপ আনন্দ আর কখনও উপভোগ করিব কি না সন্দেহ। আমাদিগকে দেখিতে নগরের প্রায় সমুদায় লোকই আসিয়াছিল; রাজাও আসিয়াছিলেন। তিনি নগরের মধ্যভাগে অষ্টাশ্বযোজিত সুবর্ণনির্ম্মিত রথারোহণে আসিয়াছিলেন। অশ্বারূঢ় রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ছিল; তাঁহাকে দেখিয়া নগরবাসিগণ আনন্দধ্বনি করিতেছিল, বাতায়নপথে নাগরিকাগণ পুষ্প ও লাজ বৃষ্টি করিতেছিল। রাজসমাগম যেন একটি স্বতন্ত্র উৎসব হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপথে দেখিয়াছিলাম, সুন্দরী রমণীগণ পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নাগরিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের আকার, ইঙ্গিত, আচার, ব্যবহার তখন আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন। পরে শুনিয়াছি, তাহারা বারাঙ্গনা বা লেনা-শোভিকা। বারাঙ্গনা নাম শুনিয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিও না, বর্ত্তমান কালে মনুষ্যজাতি বারনারীগণকে যেরূপ ঘৃণা করে, অস্পৃশ্য বিবেচনা করে, প্রাচীনকালে নাগরিকগণ সেরূপ করিত না। তখন বারাঙ্গনাগণ সমাজে সম্মাননীয়া ছিল, সমাজে পাপের

অবাধস্রোতঃ রোধ করিবার উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। সমাজের পঙ্কিল জল নির্গমনের পয়ঃপ্রবাহরূপে বারাঙ্গনাগণ তখন সমাজের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত।

নগর অতিক্রম করিয়া দেখিয়াছিলাম, নগর প্রাকারের বহির্ভাগে সুসজ্জিত পুষ্পবাটীকাসমূহ নরনারীতে পরিপূর্ণ। বিবিধবর্ণে রঞ্জিত, নানা আভরণে ভূষিত সুন্দরীগণের কলহাস্যে নগরোপকণ্ঠ যেন নূতন শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আসবপানে ঈষদ্রক্ত আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন কঠাক্ষপাতে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেরূপ বিলাসবিহ্বল দৃষ্টি পরে আর কখনও দেখি নাই। যাহারা কাদম্ব পান করিত, তাহাদিগের কাদম্বের সহিত তাহারাও অন্তর্হিত হইয়াছে। লোকে নিত্য যাহা দেখিয়া থাকে তাহার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না; যাহা নূতন দেখে তাহা দেখিয়া যেন তৃপ্তি হয় না। নগর, নাগরিক, নাগরিকা, উপনগর, পুষ্পবাটীকা, উৎসব সকলই তখন আমার নিকট নূতন। সেদিন যে ভাবে মনুষ্যজাতিকে দেখিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বে কখনও সে ভাবে দেখি নাই, আর কখনও সে ভাবে দেখিব না। যখন পর্ব্বতের সানুদেশে ছিলাম তখন দেখিতাম সন্ধ্যাগমে বনরাজী নিঃশব্দ হইত, যে দিন চন্দ্রোদয় হইত না, সেদিন খদ্যোতের আলোকে পর্ব্বতমালা ভীষণ বোধ হইত। নগর দেখিয়া আমার সেই কথা মনে হইত। আমরা যে প্রান্তরে পড়িয়াছিলাম, সন্ধ্যাগমে সেই স্থান হইতে দেখিতাম, দূরে বিশাল পর্ব্বতমালার ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন সৌধশ্রেণীর অস্পষ্ট মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে, পর্ব্বতগাত্রে খদ্যোতশ্রেণীর ন্যায় নগরে অসংখ্য দীপ-শ্রেণী প্রজ্বলিত হইয়াছে। দীপ কাহাকে বলে পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। অগ্নির আলোক দেখিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে দীপালোক দেখি নাই। দূর হইতে স্নিগ্ধ দীপালোক স্নিগ্ধতর বোধ হইত। নিশাগমে নগরের নানা স্থান হইতে গীত-বাদ্যের রব আসিত। ক্রমে নদীবক্ষে দুই একখানি তরণী দেখা যাইত; ক্ষুদ্র তরণীতে যুবক যুবতী একত্র নৈশবায়ু সেবনে নির্গত হইয়াছে, যুবতী গান গাহিতেছে, যুবক ক্ষেপণী চালন করিতেছে। কোন কোন বৃহদাকার তরণীতে বিলাসীরা আসবোন্মত্তা বারনারী পরিবৃত হইয়া কলরব করিতে করিতে চলিয়াছে। তাহাদিগের আমোদ প্রমোদ, আশা ভরসা, সুখ দুঃখ লইয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে, কেবল সুদূর অতীতের সাক্ষিরূপেই যেন আমাকে রাখিয়া গিয়াছে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু-মিলন।

—:•:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

রাজা।

—:•:—

চৈত্রের মধ্যাহ্ন। বাতাস উষ্ণ। গগন নীল। বৃক্ষলতায় নবীন পল্লব—প্রস্ফুটিত পুষ্প। মধ্যে মধ্যে বিহগ-কূজন শ্রুত হইতেছে। প্রাসাদে বিশ্রামগৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে একটি ক্ষুদ্র কুঞ্জমধ্যে মর্ম্মররচিত আসনে বসিয়া রাজা ভাবিতে-ছেন। কুঞ্জ ছায়াসুশীতল—সলিলসেচনস্নিগ্ধ। কুঞ্জে লবঙ্গলতিকা কুসুমের ভারে অবনতবল্লরী—দুই একটি বৃন্তচ্যুত কুসুম রাজার মস্তকে, অঙ্কে, বেশে পতিত হইতেছে। রাজার সে দিকে দৃষ্টি নাই। তিনি ভাবিতেছেন। উপবনে নানা-জাতীয় বিহগ—কেহ মুক্ত, কেহ বদ্ধ, কেহ দণ্ডে, কেহ পিঞ্জরে; তাহারা কূজন করিতেছে। আজ রাজার সে দিকে মন নাই। তিনি চিন্তামগ্ন। দূরে একটি মাত্র দ্বার মুক্ত—আর সব দ্বার রুদ্ধ; মুক্ত দ্বারে একজন মাত্র প্রহরী,—উদ্যানে আর কেহ নাই।

আজ দশ দিন হইল বৃদ্ধ পুরোহিত চলিয়া গিয়াছেন। এ দশ দিন রাজা তাঁহার কথা ভাবিতেছেন। বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, যে জীবনে আপনার বা অপরের কোন উপকার করে নাই—যে জীবনে আপনি প্রকৃত সুখ পায় নাই, আর কাহাকেও সুখী করিতে পারে নাই—তাহার জীবন ব্যর্থ। রাজা ভাবিতেছিলেন, তাঁহার জীবন সত্য সত্যই ব্যর্থ। তিনি জীবনে আপনার বা অপরের কোন উপকার করিতে পারেন নাই, স্বয়ং সুখ পায়েন নাই, আর কাহাকেও সুখী করিতে পারেন নাই।

আজ কয় দিন রাজা কেবল আপনার অতীত জীবনের আলোচনা করিয়াছেন। আজও তিনি তাহাই করিতেছিলেন। বাল্য হইতে আজ পর্য্যন্ত কত দিনের কত কথা আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। শৈশব হইতে তাঁহার শিক্ষা বিলাসে বেষ্টিত। সে শিক্ষা তাঁহাকে রাজার প্রকৃত কর্ত্তব্য শিখায় নাই—তাঁহার মনুষ্যত্ব-

বিকাশে সাহায্য করে নাই। আবার সংসর্গদোষে—শিক্ষকেরদোষে তিনি সে শিক্ষারও সার অংশ—গ্রহণীয় অংশ—গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তাহার পর কৈশোর যৌবনে বিকশিত হইতে না হইতে তাঁহার পরিণয় নিষ্পন্ন হইয়া গেল। তখন তরুণ হৃদয়ে নবীন আশা—জগৎ সুখময়—স্বপ্নময়। কি আনন্দে, কি আশায়, কি উৎসাহে যুবকের হৃদয় নূতন জীবনে সুখের কল্পনা করিয়াছিল! পত্নীর সহিত দ্বিতীয় সাক্ষাতে সে কল্পনা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন যৌবন-পুলকে তাঁহার তরুণ হৃদয়-নন্দন হিল্লোলিত। পত্নী-সমাগম-পুলকে তাহার কুসুম শোভা বিকশিত হইয়া উঠিল—দিকে দিকে বিহগকুজন শ্রুত হইল। জীবনে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনায়—আশায় অধিক সুখ।

প্রথমে তাঁহার প্রেমাবেগ যেন তাঁহার পত্নীর হৃদয়ে সংক্রান্ত হইয়া সে হৃদয়েও প্রেম-পুলক সঞ্চারিত করিয়াছিল। তাঁহার ব্যবহারেও প্রেম সর্ব্বদা সপ্রকাশ বোধ হইত। পত্নীর অসামান্য রূপে যুবকের হৃদয় তখন মুগ্ধ; পত্নীর প্রেমে তিনি তখন ধন্য হইবার আশায় আশান্বিত। তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল, সে আশা ফলবতী হইবে—সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী।

এই ভাবে কয় মাস গেল। সে সময় অনর্গল সুখের।

তখন তিনি প্রেমেই সুখের ও শান্তির সন্ধানে ব্যস্ত। অবকাশ যাপনের প্রধান উপায় মৃগয়ায় তাঁহার আর অনুরাগ নাই; তেজস্বী অশ্বে মন্দুরা পূর্ণ—তিনি তাহাদিগকে আর দেখেন না; সমবয়স্ক সঙ্গীরা আর সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎ পায় না—তাহারা গোপনে বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, সম্মুখে কিছু বলিতে সাহস পাইত না।

তাহার পর তাঁহার পত্নী তাঁহাকে রাজ্যসম্বন্ধীয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি একে কখনই রাজকার্য্যের বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না, তাহাতে আবার কিছু দিন স্বরচিত স্বপ্নলোকের বাহিরের সংবাদ লয়েন নাই। তিনি সকল কথার উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জিত হইতেন; সময় সময় স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন, রাজকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার পত্নী অধিক সংবাদ রাখেন।

ইহার পর হইতে কোন অজ্ঞাত কারণে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি বহু চেষ্টায় আপনার অপরাধ বা ত্রুটি বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রেমের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ পত্নীর [illegible]স অবহেলায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—কিছুতেই তাহা দূর করিতে পারে নাই। ক্রমে উভয়ের

মধ্যে ব্যবধান বর্দ্ধিত হইয়াছে; তাঁহার জীবনের সুখস্বপ্ন অসার প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতৃপ্ত নয়নে পত্নীর অসামান্য সুন্দর মুখে চাহিয়া বহু বার তাঁহার মনে প্রাচীন কবির সেই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে—

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা
কান্তে কথং ঘটিতবামুপলেন চেতঃ॥

ইন্দীবরে নিরমিলা যুগল নয়ন;
অম্বুজে গঠিলা ওই আনন সুন্দর;
শুভ্র কুন্দে নিরমিলা দশন মোহন;
নবীন পল্লবে বিধি রচিলা অধর;
চম্পকের দলে অঙ্গ করিলা নির্ম্মাণ।
কেবল হৃদয় কেন কঠিন পাষাণ?

সে কথা মনে হইতে—সে স্মৃতিসিন্ধু মথিত হইতে, আজও তাঁহার হৃদয়ে বিষম বেদনার সঞ্চার হইল; তাঁহার নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া আসিল।

তাহার পর পিতার মৃত্যুতে রাজ্যভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। কিন্তু তিনি কি রাজার কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন? প্রজার হিতসাধনে তিনি কি স্বার্থ-ত্যাগ করিয়াছেন? আজ রাজ্য বিপন্ন, প্রজা দুর্দ্দশাগ্রস্ত, মোগলের সর্ব্বগ্রাসী বিজয়লালসা তাঁহার ক্ষুদ্ররাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত। তিনি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্যই বলিয়াছেন, যে রাজা রাজ্য-রক্ষায় অক্ষম তাহার হস্তে রাজদণ্ড শোভা পায় না।

এইরূপ নানাচিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে রাজা যখন দুশ্চিন্তাপ্রবাহে কূল পাইতেছিলেন না, তখন দূরাগত বহুনরকণ্ঠোদ্ভূত কলকল ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি প্রহরীকে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রহরী চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—অগ্নিযোগে চক ভস্মীভূত হইতেছে।

রাজা যে বেশে ছিলেন সেই বেশেই উদ্যান ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম গৃহ ও তাহার পর কয়টি প্রাঙ্গণ ও কক্ষ অতিক্রম করিয়া সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন। সিংহদ্বারে দুই পার্শ্বে দুইজন অশ্বারোহী প্রহরী ছিল। রাজা ইঙ্গিত করিতে তাহারা ভূমিতে অবতরণ করিল। চকে তাঁহার অশ্ব পাঠাইতে আদেশ প্রদান

করিয়া রাজা একজনের হস্ত হইতে কশা লইয়া এক লম্ফে তাহার অশ্বে আরোহণ করিলেন। তিনি বহুদিন অশ্বারোহণে অনভ্যস্ত; কিন্তু অশ্ব বুঝিল, আরোহীর অশ্বারোহণ-নিপুণতা অনন্যসাধারণ। কশাঘাতে অশ্বকে বেগে চালাইয়া রাজা চকের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিস্ময়ে প্রহরিদ্বয় কিছুক্ষণ মূকবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

চকে উপস্থিত হইয়া রাজা দেখিলেন, ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, পবন-বিকম্পিত শত শিখা গগনে উঠিতেছে—গৃহ হইতে গৃহান্তরে ধ্বংসবীজ লইয়া যাইতেছে। চকের সম্মুখে বিশাল জনতা; তত লোক সত্য সত্য চেষ্টা করিলে অগ্নিনির্ব্বাপণ অসম্ভব হয় না, কিন্তু অনেকেই সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট—দর্শক, সমালোচক বা উপদেষ্টা মাত্র। একজন এক কার্য্য করিতে বলিলে দশ জন তাহার সমালোচনা করিতেছে। কেবল গৃহের অধিকারীরা অগ্নি নির্ব্বাপণের ব্যর্থ চেষ্টায় চেষ্টিত। জনতার নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজা বলিলেন, "পথ ছাড়।"

সকলে ফিরিয়া সবিস্ময়ে দেখিল,—রাজা! কোনরূপে পথ পাইয়া রাজা সাবধানে অশ্বকে পরিচালিত করিলেন। চকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাজা আদেশ-প্রদানে অভ্যস্ত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, "কেহ আমার অশ্ব ধর।"

অশ্বের বল্গা ধরিবার জন্য শত হস্ত প্রসারিত হইল। রাজা অবতরণ করিয়া বলিলেন, "আইস, অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হইবে।" তিনি স্বহস্তে একটি পতিত কুম্ভ তুলিয়া লইলেন। তখন চারি দিকে সকলেই অগ্নি নির্ব্বাপণকার্য্যে ব্যস্ত হইল। রাজার আদেশে হস্তিশালা হইতে শিক্ষিত হস্তী আনীত হইল। করিপৃষ্ঠে জল আসিতে লাগিল; গজশুণ্ডে আকৃষ্ট হইয়া প্রজ্বলিত গৃহ ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। রাজার বিশ্রাম নাই। যে স্থানে কেহ যাইতে ইতস্ততঃ করে, তিনি সে স্থানে গমন করেন,—অপরে তাঁহার অনুসরণ করে।

অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। রাজা উত্তরীয়ে ভস্মমলিন ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া দাঁড়াইলেন। সেই ম্লানতেজ দিবালোকে প্রজাবর্গ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া জয়ধ্বনি করিল। তখন রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই আসিয়াছেন। রাজা বলিলেন, "অগ্নিযোগে যাহাদের গৃহ ধ্বংস হইয়াছে, তাহারা সকলে প্রাসাদে চল; আহার ও আশ্রয় পাইবে।" তাঁহার অশ্ব উপস্থিত ছিল; অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিবার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশ্রয়হীনগণ প্রাসাদে যাইতেছে ত?

একজন নিবেদন করিল, "একজন বৃদ্ধ দোকানদার কিছুতেই উঠিতেছে না।"

রাজা তাহার নিকট গমন করিলেন। সে তখন ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছিল। রাজা তাহাকে বলিলেন, "প্রাসাদে চল।"

সে বলিল, "প্রভু আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। আমার আর বাঁচিয়া ফল কি? আমি আর আহার করিব না।"

রাজা স্বহস্তে তাহার ধূলিমলিন হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে তুলিলেন, বলিলেন, "বৎস, তুমি অভুক্ত থাকিলে আজ আমি আহার করিব না। আজ তুমি অনাহারে থাকিলে তোমার রাজার অকল্যাণ হইবে।"

রাজার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতায় কাঁদিয়া ফেলিল। সে জনতার অনেকেরই নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল।

রাজা আসিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্ব প্রাসাদাভিমুখগামী হইল। সে দিন রাজা হৃদয়ে যে আনন্দ অনুভব করিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে একান্তই অননুভূতপূর্ব্ব।

বিপুল জনতা তাঁহার সহগামী হইল। সে দিন সহস্র প্রজা তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত; তিনি ইঙ্গিত করিলে সহস্র প্রজা তাঁহার অশ্বের পদতলে বক্ষ পাতিয়া দিত। জনতা মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

অন্তঃপুরে রাণী অদূরবর্ত্তী সাগরের গর্জ্জনের মত সে ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি তখন পরিচারিকার নিকট বর্ণিত ঘটনার বিবরণ শুনিতেছিলেন। পরিচারিকা ভৃত্যবর্গের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ধ্বনি কিসের?" পরিচারিকা বলিল, "বোধ হয় রাজা ফিরিতেছেন।"

রাণী অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য পরিহার করিয়া ব্যস্তভাবে প্রাসাদচূড়ায় আরোহণ করিলেন,—যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা দেবতার উপভোগযোগ্য। তাঁহার মনে হইল, প্রজার ভক্তির প্রভায় রাজার মুখশ্রী স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সুন্দর হইয়াছে। তিনি হৃদয়ে কি নূতন ভাব—কি ব্যথা—কি আনন্দ অনুভব করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—•—

বিচারক।

—•—

শঙ্কর সিংহ রাজার বয়স্য—সুহৃদ—সখা। রাজবংশের এক শাখার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁহার পিতা রাজার পিতার সখা ছিলেন। শঙ্কর সিংহ শৈশবে রাজার খেলার সাথী ছিলেন;—বাল্যে উভয়ে একত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন;—যৌবনে তিনি মৃগয়ায় ও ভ্রমণে সর্ব্বদা রাজার সঙ্গে থাকিতেন;—এখনও উভয়ের মধ্যে সেই অনাবিল বন্ধুত্ব অনাহত। শঙ্কর সিংহের নিকট রাজা কোন কথা গোপন করিতেন না। শৈশব হইতে অন্তঃপুরেও শঙ্কর সিংহের অবারিত গতি—আজও অন্তঃপুরদ্বার তাঁহার পক্ষে মুক্ত; বর্ত্তমান রাণীও শঙ্কর সিংহের সহিত কথা কহিয়া থাকেন। আবার শঙ্কর সিংহের ভগিনী বিবাহের অল্প দিন পরে বিধবা হইলে রাণী তাঁহাকে সখী করিয়া অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন;—তিনি উমাকে ভগিনীর মত দেখেন। রাজার বিশ্বাস, শঙ্কর সিংহের মত হিতৈষী তাঁহার আর নাই।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যে দিনের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহার পর দিবস প্রভাতে প্রাসাদে রাজার বিশ্রামগৃহে যাইয়া শঙ্কর সিংহ দেখিলেন, রাজা সভায় গমনোদ্যোগী। শঙ্কর সিংহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "বিচারালয়ে যাইব।"

রাজা রাজপদপ্রাপ্তির পর কয়মাসমাত্র স্বয়ং বিচারালয়ে বসিয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে বিচারালয়ে রাজার আসন শূন্য থাকে—মন্ত্রীই বিচার করেন। তথাপি আজ রাজার এই কথা শুনিয়া শঙ্কর সিংহ বিস্মিত হইলেন না। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে রাজার যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন তাহাতে রাজার এ কার্য্য বিস্ময়কর বোধ হইল না। রাজার এই পরিবর্ত্তনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছিলেন।

রাজা শঙ্কর সিংহের সহিত বাহির হইয়া বিশ্রামগৃহ ও বিচারালয়ের মধ্যবর্ত্তী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিচারালয়ের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণে গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি বিচারপ্রার্থীদিগকে জানাইয়া দিল, অবিলম্বে বিচারকার্য্য আরব্ধ হইবে। রাজা বিচারালয়ের পশ্চাদ্বর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তাহার পর যে দ্বারপথে তিনি সেই কক্ষ হইতে বিচারালয়ে প্রবেশ করিতেন, সেই দ্বার মুক্ত করিলেন।

দ্বার বহুদিন বদ্ধ ছিল ; মুক্ত করিতে শব্দ হইল। সেই শব্দে সকলে চাহিয়া দেখিলেন—রাজা!

সকলে বিস্ময়াবেগপ্রহত হইয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা আপনার আসনে উপবেশন করিয়া অভিযোগ-তালিকা চাহিয়া লইলেন।

এদিকে অন্তঃপুরে রাণী সংবাদ পাইলেন, রাজা স্বয়ং বিচারগৃহে বিচারকার্য্য করিতেছেন। বিচারগৃহে যে স্থানে রাজার আসন তাহার পশ্চাতে প্রাচীরের শিরোভাগে প্রস্তরে লতাপত্রপুষ্পের মধ্যে মধ্যে ছিদ্র বিদ্যমান। পশ্চাতের কক্ষ হইতে সেই সকল ছিদ্রপথে শুদ্ধান্তশোভিনীরা বিচারালয়ের ঘটনা লক্ষ্য করিতে পারেন। অন্তঃপুর হইতে সেই কক্ষে আসিবার স্বতন্ত্র আবৃত পথ আছে। রাজা বিচারগৃহে আগমন বন্ধ করার পর রাণী আর সে কক্ষে আইসেন নাই। আজ এই সংবাদ শুনিয়া তিনি উমাকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়জন পরিচারিকাও চলিল।

রাণী যে পথে চলিলেন, সে পথ বহুদিন ব্যবহৃত হয় নাই ; পরিচারিকারা পথ পরিষ্কৃত রাখিত সত্য, কিন্তু সযত্নে নহে। গবাক্ষমুখে উর্ণনাভ জাল পাতিয়াছে, হর্ম্ম্যতল মলিন, স্থানে স্থানে ধূলি। রাণী পরিচারিকাদিগকে তিরস্কার করিলেন।

নিম্নে বিচারালয়ে রাজার একবার মনে হইল, যেন উর্দ্ধে—প্রাচীরের পশ্চাতে অলঙ্কারশিঞ্জিত শুনিতে পাইলেন। রাণী আসিয়াছেন! রাজা মনে মনে হাসিলেন—সে কল্পনাও যে অসম্ভব! তাঁহার কাযে রাণীর আর কোন আকর্ষণ নাই।

বিচারকার্য্য আরব্ধ হইল। সে দিন কয়টিমাত্র অভিযোগ ছিল। সেগুলির নিষ্পত্তি হইলে রাজা বলিলেন, "আর একটি অভিযোগের বিচার আবশ্যক। নগরপালের বিরুদ্ধে বিষম অভিযোগ আছে। নগরে থাকিয়া নগরের ও নগরবাসীর বিপদ নিবারণ ও সম্পদ সংরক্ষণ তাঁহার কর্ত্তব্য। অনুমতি ব্যতীত তাঁহার পক্ষে নগরত্যাগ নিষিদ্ধ। গত কল্য চকে অগ্নিযোগে সহর বিপন্ন হইয়াছিল। নগরপাল তখন কোথায় ছিলেন?"

মন্ত্রীর ইঙ্গিতে নগরপাল ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অভিযুক্তের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলেন। তাঁহার উদ্ধত শির আজ নত—নগরবাসীর ভীতির কারণ দৃষ্টি আজ ধরাতলবদ্ধ—কঠোর কণ্ঠস্বর আজ নীরব। তাঁহার মুখে কথা সরিতেছে না।

রাজা বলিলেন, "আমি অবগত হইয়াছি, আমি চকে যাইবার পর তাঁহার সহ-

কারীরা নগরোপকণ্ঠে বিলাসগৃহ হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনাইয়াছিল। কর্ত্তব্যের এরূপ অবহেলা কঠোর শাস্তির উপযুক্ত। নগরপালের স্বপক্ষে কিছু বলিবার আছে?"

নগরপাল কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

এই সময় দূরে রাজপথে—বিচারালয়প্রাঙ্গণপ্রবেশদ্বারের নিকটে বালকণ্ঠে রোদনধ্বনি শ্রুত হইল। রাজা উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, বোধ হইল, কেহ বিচারালয়প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে, পারিতেছে না। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রোদন করে?"

মন্ত্রী বলিলেন, "বোধ হয় ভিখারী হইবে।"

"যেই হউক; বিচারালয়ের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত।"

রাজার আদেশে প্রহরী বাহিরে গেল এবং অনতিবিলম্বে একটি বালককে লইয়া আসিল। সে রোদন করিতেছিল,—বিচারগৃহমধ্যে নীত হইয়া যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। রাজা তাহার অবস্থা দেখিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদিতেছিলে?"

বালক বলিল, "হাঁ।"

"কেন?"

"আমার বাড়ী প্রায় দুই ক্রোশ দূরে—"

মন্ত্রীর সহকারী বালককে রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিলেন। রাজা তাঁহাকে নিবারিত করিলেন।

বালককে বহু প্রশ্ন করিয়া রাজা বুঝিলেন, বালকের গৃহ দুই ক্রোশ দূরে। গৃহে তাহার রুগ্না জননী ব্যতীত আর কেহ নাই। আজ সে গৃহপ্রাঙ্গণস্থ তরুর দুইটি ফল লইয়া রাজধানীতে আসিয়াছে; মূল্য যাহা পাইবে, তাহাই দিয়া জননীর জন্য পথ্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে। সে বাজারে যাইতেছিল। পথে প্রাসাদের প্রধান প্রহরী তাহার একটি ফল লইয়াছে। প্রহরী প্রথমে মূল্য দিতে চাহে নাই, শেষে যে মূল্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছে তাহাও ন্যায্য মূল্য নহে। তাহার গ্রামবাসীরা তাহাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিল—এ পথে যাওয়া নিরাপদ নহে। সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল।

শুনিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "তবে প্রাসাদের পথে দস্যু তস্করের ভয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে! বিচারালয়ের দ্বারে প্রজার দ্রব্য অপহৃত হয়!"

রাজা বলিলেন, "সে প্রহরী কোথায়?"

একজন কর্ম্মচারী যাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল।

রাজা ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই বালকের দ্রব্য লইয়া মূল্য দাও নাই?"

প্রহরী প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনার ভৃত্য এমন কায করিতে পারে না। বালক অত্যধিক মূল্য চাহিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিয়াছি, অবশিষ্ট ফলটি সে যে মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে, আমি সেই মূল্য দিব।"

রাজা বুঝিলেন, চতুর বটে। তিনি মনে মনে হাসিলেন, বলিলেন, "সে ভাল কথা।"

তখন মূল্যনিরূপণের জন্য ভাণ্ডারীর ডাক পড়িল।

ভাণ্ডারী আসিলে রাজা তাহাকে ফলটি দেখাইয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। যে কর্ম্মচারী ভাণ্ডারীকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে তাহাকে সব কথা বলিয়াছিল। প্রহরীর সুবিধার জন্য ভাণ্ডারী ফলের মূল্য কম করিয়া বলিল। সে মূল্যের কথা শুনিয়া বালক কাঁদিয়া উঠিল। রাজা তাহাকে শান্ত হইতে বলিয়া ভাণ্ডারীকে বলিলেন, "রাজসংসারের জন্যও অবশ্য এ ফল ক্রয় করা হয়?"

ভাণ্ডারী স্বীকার করিল।

রাজা ভাণ্ডারীকে হিসাব আনিয়া সে কত মূল্যে ঐ ফল ক্রয় করিয়াছে, তাহা দেখাইতে বলিলেন। ভাণ্ডারীর মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! কিন্তু আর উপায় নাই। ভাণ্ডারী হিসাব আনিয়া দেখাইল।

হিসাব দেখিয়া রাজা বলিলেন, "ভাণ্ডারী ফলটির যে মূল্য নির্দ্দেশ করিয়াছে, হিসাবে লিখিত মূল্য তাহার চতুর্গুণ। রাজসরকারের জন্য ভাণ্ডারী ক্রয় করিলে যদি দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ হয়, তবে রাজা আপনার জন্য স্বয়ং ক্রয় করিলে দ্রব্যের মূল্য ভাণ্ডারীদত্ত মূল্যের চতুর্গুণ হওয়া অসম্ভব নহে। ফলটি আমি ক্রয় করিলাম। এই হিসাবে বালককে মূল্য দেওয়া হউক।"

তাহার পর রাজা প্রহরীকে বলিলেন, "তুমি বলিয়াছ, বালক অবশিষ্ট ফলটির জন্য যে মূল্য পাইবে, তুমি তাহাকে তাহাই দিবে। আমি ভাণ্ডারীকে যে মূল্য দিতে বলিলাম—তুমিও তাহাই দাও।"

সমস্ত গৃহে যেন আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। সকলে বুঝিল, রাজার বুদ্ধির নিকট আর সকলের বুদ্ধি পরাজিত হইল; ভাণ্ডারীর অসাধুতা প্রতিপন্ন হইল;

প্রহরীর শিক্ষা হইল; বালক উপকৃত হইল। দুই একজন কাণাকাণি করিল,—এইত রাজা।

ইহার পর রাজা আবার নগরপালের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নগরপালকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বপক্ষে কিছু বলিবার আছে?

নগরপাল কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

রাজা বলিলেন, "এ বিচারে তিনটি বিষয় বিবেচ্য—প্রথম, আমার কর্ত্তব্য; দ্বিতীয়, নগরপালের কর্ত্তব্য; তৃতীয়, শাস্তি। যে কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন করে না, পরন্তু স্বাধিকারপ্রমত্ত হইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করে, তাহাকে সে কার্য্যের অনুপযুক্ত জানিয়া আর সে কার্য্যে না রাখাই আমার কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যপালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমি নগরপালকে কর্ম্মচ্যুত করিলাম। নগরপালের অনবধানতায় যথাকালে অগ্নিনির্ব্বাপণের কোন ব্যবস্থা হয় নাই—তাহাতে নগরবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যথাকালে অগ্নিনির্ব্বাপণের চেষ্টা হইলে এত ক্ষতি হইত না। সেই ক্ষতিপূরণ নগরপালের কর্ত্তব্য। সুতরাং আমি আদেশ করিতেছি, রাজকোষ হইতে ক্ষতিগ্রস্তগণের অর্দ্ধেক ক্ষতি পূরণ হইবে, অপরার্দ্ধ নগরপালকে দিতে হইবে।"

শুনিয়া নগরপাল বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না। কিন্তু এই কথা শুনিয়া আনন্দে বহু কণ্ঠ হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

সে কোলাহল নিবৃত্ত হইলে রাজা বলিলেন, "আমি নগরপালের শাস্তির কোন ব্যবস্থা করিব না, কারণ, এ বিষয়ে আমিও দোষী। এত দিন নগরপালের কার্য্যের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা না করায় আমার পক্ষে কর্ত্তব্যের অবহেলা হইয়াছে। সুতরাং আমি তাহাকে শাস্তি দিবার উপযুক্ত নহি।

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে বিচারকার্য্য শেষ হইল।

রাজা উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

ঊর্দ্ধে প্রস্তরপ্রাচীরের পশ্চাতে পুনরায় অলঙ্কারশিঞ্জন শ্রুত হইল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাণী উঠিলেন। তাঁহার মুখে বিষাদ ও আনন্দ ছায়ালোকের মত শোভা পাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

মোহিনী।

—০—

নিদাঘের মধ্যাহ্ন। পবনে অনলের আভাস। আকাশ তপ্ততাম্রবর্ণাভ। একজন অশ্বারোহী একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে একটি সরোবর। সেই সরোবরকূলে জলাসন্নতরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিবার জন্ম অশ্বারোহী অবতরণ করিলেন। অশ্ব ও আরোহী উভয়েই শ্রান্ত। আরোহী সৈনিকবেশধারী।

আরোহী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সজ্জা নামাইয়া লইলেন, বল্গা মাত্র রহিল। অশ্ব সুশিক্ষিত। তাহাকে মুক্ত রাখিয়া আরোহী অশ্বপৃষ্ঠসজ্জা ভূমিতে সংস্থাপিত করিলেন; তাহার পর সেই সজ্জা উপাধান করিয়া শ্যামশষ্পাস্তৃত ভূমিতে শয়নের উদ্যোগ করিলেন।

অশ্ব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল,—সরোবরে জলপানার্থ নিম্নগ ভূমি অতিক্রম করিয়া জলাভিমুখগামী হইল। তাহা দেখিয়া অশ্বারোহী উঠিলেন; অশ্বের বল্গা ধরিয়া তাহাকে কিছুক্ষণ ছায়ায় রাখিয়া পরে জলপান করাইয়া আনিলেন; তাহার পর কোষবদ্ধ তরবারী বাহির করিয়া অদূরে একটি বৃক্ষের গাত্রাবলম্বী লতিকার ছেদন প্রয়াসে অগ্রসর হইলেন। দীপ্ত রবিকরে অঞ্জনপুঞ্জাভ তরবারী ঝলকিতে লাগিল। লতিকা আনিয়া সৈনিক তাহা বল্গার সহিত বদ্ধ করিয়া অশ্বকে বৃক্ষ-শাখায় বদ্ধ করিয়া স্বয়ং শয়ন করিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভি-ভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রায় এক প্রহর পরে সৈনিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সূর্য্যের কর আর প্রখর নহে, বৃক্ষের ছায়া ক্রমে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া উঠিতেছে, দূরে—মেঘের কোলে গিরিশৃঙ্গে বর্ণবিকাশ সূচিত হইতেছে।

সৈনিক উঠিয়া বসিতেই সম্মুখে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। তিনি যে স্থানে শয়ন করিয়া ছিলেন, তথা হইতে অনুমান দুই হস্ত ব্যবধানে উদ্যানসীমাবৃতি। উদ্যান সযত্নে রচিত ও সুরক্ষিত। উদ্যানের মধ্যভাগে গৃহ—ক্ষুদ্রায়তন, কিন্তু সুন্দর—সুসংস্কৃত—সুসজ্জিত। গৃহের সোপান হইতে কঙ্করাস্তৃত পথ সরল ভাবে উদ্যানের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে ছায়াবহুল—সুখাস্ত-

ফল তরুরাজি। সৈনিক যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে উদ্যানমধ্যে একটি কূপ দেখা যাইতেছিল। কূপের নিকটে পুষ্পোদ্যান; তাহাতে নানা-জাতীয় বৃক্ষ, কোন কোন বৃক্ষে ফুল ফুটিয়া আছে।

সৈনিক দেখিলেন, দুইজন যুবতী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া কূপের নিকটে আসিলেন। উদ্যান পরিদর্শন করিয়া উভয়ে সৈনিক যে দিকে ছিলেন সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। উভয়ের প্রায় একই বয়স; তবে বেশে বুঝিতে পারা যায়, একজন পরিচারিকা বা সখী। সে উদ্যানপরিদর্শনকালে কয়টি ফুল তুলিয়াছিল, সেগুলি অপরার চুলে পরাইয়া দিল। সেই কুসুমভূষণে তাঁহাকে পার্ব্বতীর মত দেখাইতে লাগিল। উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুইজনে সমবয়সী—যৌবনসুলভ চাপল্যে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধানের লেশমাত্র অনুভূত হইতেছিল না; হাসিতে হাসিতে—কথা কহিতে কহিতে উভয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন।

সৈনিকের তৃষিত নয়ন যেন সৌন্দর্য্যসুধাপানে পরিতৃপ্ত হইতেছিল। সখী-সহগামিনীর সৌন্দর্য্য সত্যই অসাধারণ। বর্ণ গৌর—মুক্ত বায়ুর স্পর্শ ও অটুট স্বাস্থ্যসম্পদ তাহাতে রক্তাভার সঞ্চার করিয়াছে; নগরের বদ্ধ বায়ুতে বর্ণের যে পাণ্ডুতা অনিবার্য্য যুবতীর বর্ণে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। কেশরাশি মুক্ত,—সেই দীর্ঘ, চিক্কণ কৃষ্ণ কেশরাশির সান্নিধ্যে যুবতীর সৌন্দর্য্য যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুবতীর সুগঠিত নাসিকায় ও নয়নের দৃষ্টিতে দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে। পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্যের উপর স্বাস্থ্যের কমনীয় লাবণ্য শোভা পাইতেছে—যেন ভাদ্রের ভরা নদীতে ঢল নামিয়াছে। মুখে লজ্জার বা সঙ্কোচের ভাব নাই।

সৈনিক মুগ্ধ নয়নে সেই মোহিনীর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ভাবিলেন, উদার অম্বরতলে, মুক্ত পবনে, অনাহত রবিকরে যে কুসুম বিকশিত হয় প্রাসাদের বিলাসবহুল শুদ্ধান্তে তাহার তুলনা কোথায়?

যুবতী উদ্যানবৃতির সন্নিকটে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চিমগগনগামী রবির করজাল সেই সৌন্দর্য্যের উপর পড়িল, সে সৌন্দর্য্য যেন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল।

যুবতী ফিরিয়া সখীকে বলিলেন, "ভদ্রা, আজ বেলা ঠিক করিতে ভুল হইয়াছে। দেখ, এখনও শিলাখণ্ডের উপর রৌদ্র রহিয়াছে।

বৃতির পরই একটি প্রাচীন বৃক্ষ। তাহারই মূলে একখণ্ড শিলা পতিত ছিল।

যুবতী অপরাহ্নে আসিয়া সেই শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিতেন। আজ সময়নির্দ্ধারণে ভ্রমহেতু তিনি যখন আসিয়াছেন, তখনও শিলাখণ্ডের উপর হইতে তপনকিরণ অপসৃত হয় নাই। যুবতী হতাশভাবে সখীকে বলিলেন, "চল, ফিরিয়া যাই।"

ভদ্রা বলিল, "অল্পক্ষণের মধ্যেই ছায়া পড়িবে। আর ফিরিয়া যাইয়া কায নাই। বরং চল, ততক্ষণ ছায়ায় ছায়ায় একটু বেড়াইয়া আসি।"

"না। আমি ছায়ায় দাঁড়াই। সে দিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, ঝুলনায় উঠিতে পার নাই বলিয়া তুমি বড় দুঃখ করিয়াছিলে। আজ ততক্ষণ তুমি ঝুলনায় দুল। আমি দোল দিব।"

ভদ্রা প্রস্তাবে সম্মতি দিল। যৌবন চঞ্চল ক্রীড়া যেমন ভালবাসে আর কিছুই তেমন ভালবাসে না।

ভদ্রা বৃক্ষশাখায় বদ্ধ ঝুলনা ঝুলাইতে ঝুলাইতে বলিল, "পাতরখানা গড়াইয়া আনা যায় না?"

যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "চেষ্টা কর,—তুমি নিশ্চয়ই পারিবে। সে দিন দাদা চেষ্টা করিয়া পারেন নাই।"

ভাবে বোধ হইল, যুবতীর নিকট "দাদা"ই বলবানের আদর্শ।

ভদ্রা বলিল, "তোমার কি মনে হয়, কেহ এই পাতরখানা গড়াইয়া এই ছায়ায় আনিতে পারে না?"

যুবতী বলিলেন, "না।"

ভদ্রা হাসিয়া বলিল, "যদি কেহ পারে, তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মতা আছ?"

যেমন প্রশ্ন—তেমনই উত্তর;—যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়।"

তখন ভদ্রা বলিল, "দেখ, কোন্ রাজপুত্র সহসা আসিয়া এই কার্য্য করিয়া তোমাকে লইয়া অশ্বচালনা করিয়া চলিয়া যায়েন। তখন আমি গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরাণীকে কি বলিব?

"তাইত! যদি বলিবার কথা খুঁজিয়া না পাও, তবে না হয় তুমিই রাজপুত্রের সঙ্গে যাইও; আমি গৃহে ফিরিয়া যাহা বলিবার—বলিব।"

"তখন কি আর সে কথা মনে হইবে? তখন ভদ্রার কাছে একবার বিদায় লইতেও বিলম্ব সহিবে না।"

এইরূপ রহস্যালাপ করিতে করিতে ভদ্রা ঝুলনাখানি খুলিল।

যুবতী ঝুলনায় দোল দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। সে ভঙ্গিটিতে তাঁহাকে যেন আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সৈনিক যুবক মুগ্ধ নয়নে সে সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন।

ভদ্রা অভ্যস্ত ভাবে দুই দিকের রজ্জু ধরিয়া ঝুলনায় উঠিয়া বসিল। যুবতী দোল দিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন।

সহসা বৃতির পরপারে সৈনিককে দেখিয়া ভদ্রা ত্রস্তে নামিয়া পড়িল, অনুচ্চ-স্বরে যুবতীকে বলিল, "বৃতির পারে কে বসিয়া আছে।"

যুবতী চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন।

সৈনিক তাহা দেখিয়া মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি সৈনিক। এই পথে ফিরিবার সময় দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলাম। ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। নিদ্রাভঙ্গে আমি উঠিলে আপনাদের খেলার ব্যাঘাত ঘটিবে বুঝিয়া কি করিব, ভাবিতেছিলাম। অপরাধ লইবেন না। আমি চলিয়া যাইতেছি।"

যুবতী গমনোদ্যোগ স্থগিত করিলেন।

সৈনিক ভদ্রাকে বলিলেন, "আপনারা বসিবার স্থান পাইতেছিলেন না। যদি অনুমতি করেন, প্রস্তরখানি ছায়ায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করি।"

ভদ্রা ভাবিল, সৈনিক সে কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইবে। রঙ্গ দেখিবার অভি-প্রায়ে সে বলিল, "ভাল"।

যুবতী ভদ্রার প্রতি ভ্রূকুটি করিলেন।

সৈনিক এক লম্ফে বৃতি অতিক্রম করিয়া উদ্যানে আসিলেন; প্রস্তরখণ্ড গড়াইবার চেষ্টা করিলেন। প্রথমবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ভদ্রা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সৈনিকের দ্বিতীয়বার চেষ্টায় প্রস্তর উল্টাইয়া গেল। সৈনিক আর একবার গড়াইয়া সেখানি ছায়ায় আনিয়া দিলেন।

যুবতী বিস্মিত হইয়া যুবকের দিকে চাহিলেন। চারি চক্ষু মিলিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে যুবতীর দৃষ্টি চরণ-সংলগ্ন হইল। সৈনিকের মনে হইল, সে দৃষ্টির উজ্জ্বল মাধুরীতে যেন হৃদয়ের কি চাঞ্চল্য ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

সৈনিক পুনরায় বৃতি অতিক্রম করিয়া আসিয়া অশ্বকে সজ্জিত করিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইবার সময় সৈনিক ভদ্রাকে বলিলেন, "আপনার সখী আপনার প্রস্তর গড়াইবার কথায় যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, তাহা মনে

করিয়া তাঁহার লজ্জিতা হইবার কোন কারণ নাই। তিনি যেন রহস্যচ্ছলে উচ্চারিত সে প্রতিশ্রুতিতে আপনাকে বদ্ধ মনে না করেন।"

যুবক অশ্বচালনা করিলেন। পশ্চাতে কি যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি চিত্তসংযমে অভ্যস্ত—চিত্ত সংযত করিলেন।

যুবতী শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া ভাবিলেন, যে আপনার প্রতিশ্রুতিতে আপনি বদ্ধ, কে তাহাকে মুক্ত করিতে পারে?

অশ্বারোহী ক্রমে রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

তিনি প্রাসাদদ্বারে উপনীত হইলে প্রহরীরা ব্যস্তভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

দ্বারের পর প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া তিনি যে কক্ষে উপনীত হইলেন, সে কক্ষে কয়জন লোক বসিয়া ছিলেন; তাঁহার আগমনে তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একজন বলিলেন, "আমরা আপনার আগমন-বিলম্বে চিন্তিত হইতেছিলাম।"

সৈনিক বলিলেন, "আমি অন্য পথে আসিতে পথে বৃক্ষছায়ায় নিদ্রাগত হইয়াছিলাম। তাই আসিতে বিলম্ব ঘটিয়াছে।"

ঊষা।

১

তুমি এস ধীরে ধীরে চম্পক-করে
অবগুণ্ঠন সরায়ে,
এস নির্ম্মল নব-মেঘ-শিরে
স্বর্ণ-মুকুট পরায়ে।
তুমি এস আলো করি' বকুলবীথিকা,
অরুণ কিরণ ছড়ায়ে,
মৃদু কম্পনে নব কিশলয়ে
শিশিরবিন্দু ঝরায়ে।

২

তুমি এস স্মিত মুখে কুঞ্জকাননে
অঞ্চলখানি লুটায়ে,
অমিয়স্নিগ্ধ পরশে তোমার
কুসুমপুঞ্জ ফুটায়ে ;
দিকে দিকে দিয়ে চিরসঞ্চিত
সৌরভরাশি ছুটায়ে,
গুঞ্জনরত মত্ত অধীর
মধুপবৃন্দ জুটায়ে।

৩

হেথা লুব্ধ সমীর বহিবে—তোমার
মুক্তঅলক পরশি'
নবতৃণদল উঠিবে—তোমার
চরণালক্তে সরসি'।
হেথা কোকিল করিবে বন্দনা তব
সঙ্গীতধারা বরষি,'
বিম্বিত তব স্বর্ণকান্তি
বক্ষে ধরিবে সরসী।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

সমালোচনা।

ম্যালেরিয়া।*

ম্যালেরিয়া নামক জনপদবিধ্বংসী ব্যাধির প্রভাবে আজ সমগ্র বঙ্গদেশ, কেবল বঙ্গদেশ কেন প্রায় সমগ্র ভারত—অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। যে দেশ সর্ব্বদাই সুকুমার শিশুর হাস্যকৌমুদীতে, সদানন্দচিত্ত যুবক-যুবতীর প্রেমালাপে, প্রৌঢ়প্রৌঢ়ার প্রীতিসম্ভাষণে, স্থবিরস্থবিরার ধর্ম্মালাপে মুখরিত থাকিত; যে দেশে সন্ধ্যার পর প্রতিগ্রামে আরাত্রিকের ঘণ্টাধ্বনি, ও নিশীথ পর্য্যন্ত সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইত আজ সেই দেশ এই লোকসংহারী ব্যাধির প্রভাবে নীরব, নিথর ও স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিয়াছে। যে বাঙ্গালা এক সময় "কুসুম-দামসজ্জিত দীপাবলি তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম" ছিল, আজ সেই দেশে এই দুরন্ত রোগের প্রভাবে "একে একে শুকায়েছে ফুল এবে, নিবেছে দেউটী, নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী।" সর্ব্বত্রই যেন প্রলয়কালীন ভীষণ অন্ধকার জলস্থল আবৃত করিয়া রহিয়াছে, কেবল শ্মশান-সৈকতে চিতানলের উৎকট আলোকরশ্মি সেই দিগন্ত-বিসারী অন্ধকারের সমতা ভঙ্গ করিয়া উহার ভীষণতা বৃদ্ধি করিতেছে।

প্রতিবর্ষে বাঙ্গালায় জ্বর রোগে সতের আঠার লক্ষ লোক কালান্তকের কবলে নিপতিত হইতেছে; এই খণ্ডিত বঙ্গের পশ্চিমার্দ্ধেই প্রতিবর্ষে প্রায় বার লক্ষ করিয়া লোক শমনসদনে নীত হইতেছে। এই খণ্ডিত বঙ্গের পশ্চিমার্দ্ধে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ১১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত ৭৯ জন, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ১১ লক্ষ ৭১ হাজার ৫ শত ৪০ জন এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭ শত ৪ জন লোক কেবলমাত্র জ্বররোগেই প্রাণ হারাইয়াছে। ইহা ভিন্ন কত লোক প্রতিবর্ষে এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। অনুমান হয়, এই অষ্ট কোটী আধিবাসী-অধ্যুসিত বঙ্গে অন্ততঃ পাঁচ কোটী লোক এই দুরন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। যাহারা এই রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহাদের জীবনী-শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তখন অন্যান্য নানা ব্যাধি সহজে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং জ্বররোগে প্রতিবর্ষে মুখ্যতঃ এগার বার লক্ষ লোক মরে সত্য, কিন্তু গৌণতঃ এই রোগ যে আরও অনেক অধিক লোকের মৃত্যুর কারণ এ কথা

* ম্যালেরিয়া—শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত, এল্, এম্, এস্, প্রণীত; শ্রীকিরণচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মুঙ্গের। মূল্য ১৲ টাকা।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং একমাত্র জ্বররোগই এই সোণার বাঙ্গালাকে শ্মশানে পরিণত করিয়া ফেলিতেছে, একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। অন্ত কোন দেশে এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটিলে ইহার নিদান ও প্রতিকারের উপায় জানিবার জন্ত সমস্ত দেশে ঘোর আন্দোলন ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত। কিন্তু এই অপূর্ব্ব অদৃষ্টবাদপ্লাবিত দেশে ইহার জন্ত জনসাধারণের অন্তরে বিষম বিক্ষোভ উপস্থিত হইলেও বাহিরে সে বিক্ষোভ বিশিষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে না।

যাহা হউক, সম্প্রতি ম্যালেরিয়াসম্বন্ধে বঙ্গদেশে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই রোগসম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তকও বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ম্যালেরিয়াসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে কয়খানি পুস্তক দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত মহাশয়ের প্রণীত 'ম্যালেরিয়া' নামক পুস্তকখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ম্যালেরিয়া-সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, চিকিৎসকসমাজে যে মত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, ডাক্তার শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত তাহাই তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গুপ্তমহাশয় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, বর্ত্তমানে চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত। এই রোগসম্বন্ধেও তিনি বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। তাহার উপর ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। তাঁহার ভাষা সরল, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। যাহার ভাষায় সামান্তমাত্র অধিকার আছে, সেও তাঁহার রচনা সহজে বুঝিতে পারিবে। যাঁহারা চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়েন নাই, চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দের সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই, তাঁহারও এ পুস্তক পড়িলে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বিশেষরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। তবে এরূপ পুস্তক একেবারে পারিভাষিক-শব্দ-বর্জ্জিত হইতেই পারে না। সুতরাং ইহাতে পারিভাষিক শব্দ অনেক আছে। কিন্তু ডাক্তার গুপ্তমহাশয় সে সকলের অর্থ বেশ সরল ভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহার পুস্তক পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ মণ্ডল নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি 'বঙ্গে ম্যালেরিয়া' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মণ্ডল মহাশয় ডাক্তার বা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নহেন; কিন্তু তিনি ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানে সংগৃহীত তথ্য তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন কয়েক জন হোমিওপ্যাথী ও এলোপ্যাথী

চিকিৎসকও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে দুইএকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এ প্রবন্ধে সে পুস্তকগুলির আলোচনা করিব না।

এই শ্রেণীর পুস্তকে তিনটি অতি আবশ্যক বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা থাকে—(১) পীড়ার নিদান, অর্থাৎ যে সকল কারণ হইতে পীড়ার উৎপত্তি হয় তাহা; (২) পীড়ার লক্ষণ, বিকাশ ও পরিণতি বা শেষ ফল; (৩) চিকিৎসা। এই তিনটির একটির অভাবে পুস্তক অঙ্গহীন হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন পীড়া-প্রাদুর্ভাবের ইতিহাস, জনসাধারণের উপর ইহার প্রভাব, আলোচ্য রোগের আনুষঙ্গিক পীড়া, আলোচ্য রোগোৎপত্তির অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা, প্রতিষেধক উপায়, রোগিচর্য্যা, পথ্যাপথ্য, ইত্যাদি অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই শ্রেণীর পুস্তকে লিখিত থাকে। গুপ্ত মহাশয় তাঁহার পুস্তকে এই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

গুপ্ত মহাশয় তাঁহার পুস্তকের প্রথমেই ম্যালেরিয়া রোগের একটি ইতিবৃত্ত দিয়াছেন। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, "ম্যালেরিয়া কবে আমাদের দেশে শুভাগমন করিল, এবং কত দিন হইতে সে 'অতিথির মত আসিয়া কুটুম্বের মত রহিয়া গেল'—তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই।" তাহার পর তিনি শুশ্রুত, চরক প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থ হইতে বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ সকল গ্রন্থে এক প্রকার বিষম জ্বরের উল্লেখ আছে,—ঐ রোগের লক্ষণের সহিত ম্যালেরিয়ার লক্ষণের কতকটা সৌসাদৃশ্যও আছে। সেই লক্ষণগুলির উপরেই নির্ভর করিয়া আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ম্যালেরিয়া ছিল একথা নিশ্চিত বলা যায় না। "কেননা এই সকল জ্বরে ম্যালেরিয়ার অন্যান্য লক্ষণের উল্লেখ দেখা যায় না।" মুসলমান রাজত্বকালে এক একটি জনপদবিধ্বংসী ব্যাধি প্রকট মূর্ত্তি ধরিয়া বিশাল বিস্তৃত জনপদকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার লিপিবদ্ধ বিস্তৃত বিবরণ না থাকায় তাহা ম্যালেরিয়া, প্লেগ অথবা অন্য কোন জনপদবিধ্বংসী ব্যাধি তাহার নির্ণয় করা কঠিন।

পলাসীর যুদ্ধের পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল মধ্যেও এদেশে ম্যালেরিয়ার কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নাই। সরকারী কাগজপত্রে এ রোগের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে ও কাশিমবাজারে ভীষণ জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হয়। অল্পকালমধ্যে বহুলোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া শমনভবনে নীত হয়। সেইবার ম্যালেরিয়ার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। তাহার পর বিশ বৎসর কাল নীরবে চলিয়া গেল। লোকে "মুর্শিদাবাদের মড়কের" কথা

অনেকটা বিস্মৃত হইল। অকস্মাৎ যশোহরে সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদপুরে ম্যালেরিয়ার বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল। কয়েক মাসের মধ্যে এই দুরন্ত রোগে সহস্র সহস্র লোক কালান্তকসদনে প্রেরিত হইল। ক্রমে চিত্রানদীর উভয় তীরস্থ জনবহুল জনপদসমূহে ভৈরব রবে ম্যালেরিয়ার তূর্য্যনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। নলডাঙ্গা, গদখালি প্রভৃতি জনকোলাহলমুখরিতা সমৃদ্ধিশালিনী নগরীগুলি শ্মশানে পরিণত হইল। তাহার পর ক্রমশঃ নদীয়া, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জনাকীর্ণ জিলা এই রোগের প্রকোপে জনশূন্য হইয়া উঠিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই রোগ হুগলী জিলার দ্বারবাসিনী হইতে ২৪ পরগণার বারাসত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইহা কাটোয়া হইতে মেহেরপুর পর্য্যন্ত এবং হুগলী জেলার দ্বারবাসিনী হইতে ২৪ পরগণার গোবরডাঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৮৬৬—৬৭ খৃষ্টাব্দে এই রোগ বর্দ্ধমান জিলার সর্ব্বনাশ সাধন করে। এখন ইহা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বাস্তু ভুজঙ্গের মত বাস করিতেছে।

গুপ্ত মহাশয় তাহার পুস্তকে এই লোমহর্ষণ ইতিবৃত্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। এই দুরন্ত রোগের প্রভাবে বাঙ্গলার গ্রাম—জনপদ কিরূপ শ্রীহীন হইয়াছে,—বাঙ্গালীর মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক ক্ষতি কিরূপ হইয়াছে, তাহা তিনি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পাঠক তাহা মূলগ্রন্থে পড়িয়া দেখিবেন।

অতঃপর গুপ্ত মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে এই রোগের নিদানসম্পর্কে পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই স্থলে তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

"ম্যালেরিয়া রোগের কারণ সম্বন্ধে আগে কত লোকে কত কথাই না বলিত। কেহ বলিত ইহার কারণ দূষিত বায়ু, কেহ বলিত ইহা আর্দ্র ভূমিসঞ্জাত। কত নূতন নূতন মত প্রচারিত, পরিবর্ত্তিত, বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহার আর সংখ্যা নাই ; কত আলোচনা, কত গবেষণা প্রবীণ মস্তিষ্ক আলোড়িত করিল, তাহার সীমা নাই ; কেহ বলিল ইহা আব হাওয়ায় শৈত্য ও বৈদ্যুতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে ঘটিয়া থাকে (Chill and Electrical theory), কেহ বলিলেন ইহার কারণ দূষিত বায়ু ভিন্ন আর কিছুই নয় ; পরে ঠিক হইল ভূমিই সকল অনিষ্টের মূল ; জমির দোষে ও বিকারেই এই পীড়ার উদ্ভব ও প্রসার (Telluric theory) কেহ কেহ আবার এই কয়টি মতের সমন্বয় করিয়া বলিলেন যে প্রান্তরের উদ্ভিজ্জ ও পাতা লতা বর্ষার জলসেকে সরস ও সূর্য্যতাপে তপ্ত হইয়া এক প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়,—পচিয়া কি গাঁজিয়া উঠে (Fermentation theory) এবং তাহা হইতে এক প্রকার দূষিত বায়ু জন্মে ; তাহা সমীর-সঞ্চালিত হইয়া যখন যেখানে আসে, সেইখানেই এইরূপ জ্বর হয়।"

বলা বাহুল্য গুপ্ত মহাশয় পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের সকল মত বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই,—এবং সকল মতের ও উল্লেখ করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতে পারে Fungus Theory বা রক্তের পরব্রূহ মতের উল্লেখ তাঁহার পুস্তকে দেখিলাম না। ঐ সকল মতের বিশদভাবে আলোচনায় বিলক্ষণ লাভ আছে। ঐ সকল মত অধুনা পরিত্যক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাদের বিশদভাবে আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা এই রোগের কারণতত্ত্ব আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মত ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহারাও তাঁহাদের গবেষণার ফলে প্রকৃত কারণের কতকটা সন্নিহিত হইয়াছিলেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংলণ্ডের ইসেক্স অঞ্চল দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার আকর ছিল। জলনিকাশের সুব্যবস্থার পর হইতে ঐ অঞ্চল একেবারেই জ্বরজ্বালাশূন্য হইয়াছে। ইটালির ক্যাম্পানা ও পণ্টাইন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল, এখনও বোধ হয় কতকটা আছে। প্রাচীন রোমকেরা "মশক মত" (Mosquito theory) জানিতেন না সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহারা ঐ অঞ্চলে জলনিকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখনও "মশক মত" সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই। এখনও অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক দূষিত বাষ্পমতের (Miasma theory) পক্ষপাতী। সুতরাং পূর্ব্বতন মত গুলির একটু বিশদ আলোচনা থাকিলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত।

যাহা হউক, "মশক মত" কি প্রকারে গৃহীত হইল, আলোচ্য গ্রন্থে তাহা সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। আমরা নিম্নে তাহার একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

"১৮৮০ খৃঃ যে দিন ফরাসিস্ সুধী ডাক্তার ল্যাভেরণ জ্বররোগীর শোণিতে অনুবীক্ষণ-যোগে বহু জীবাণুর সন্ধান পাইলেন, সেই দিনেই এই ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ একরূপ স্থিরীকৃত হয়। এবং তাঁহার ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কারণও ছিল ;—কেন না,

(১) ম্যালেরিয়া রোগীমাত্রেরই শোণিতে কখনও না কখনও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়।

(২) এই জীবাণুর পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের ন্যূনাধিক্য বিষয়ে ও পালার প্রাকারভেদ দেখা যায়।

(৩) এই জীবাণুর পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ইহা এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ রঞ্জক পদার্থ প্রস্তুত করে, তাহা ম্যালেরিয়া রোগীর যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতিতে সঞ্চিত দেখা যায়। রক্তের সহিত তাহারা শরীরের বিভিন্ন অংশে আসিয়া জমে।

(৪) ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত যদি সুস্থ শরীরে কোনও ব্যক্তির দেহে সঞ্চারিত করা যায়, তাহা হইলে তাহার রক্তেও এই জীবাণু সংক্রমিত হয় এবং সুস্থ ব্যক্তিও ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয়।

(৫) যে কুইনাইন এই জ্বর বন্ধ করে, তাহা এই জীবাণুকুলও ধ্বংস করে।

ক্রমে অনেক আলোচনা ও অনেক গবেষণার পর সমস্ত সুধী পণ্ডিতবর্গ কর্ত্তৃক ইহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়।"

ইহার পর ডাক্তার গুপ্ত মহাশয় তাঁহার পুস্তকে ম্যালেরিয়া জীবাণু সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই জীবাণু মানব দেহে কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করে, কি প্রকারে উহা মানব-শোণিতের রক্তকণিকাতে আশ্রয় করিয়া মানবের সর্ব্বনাশসাধন করে,তাহার বিবরণ বিশেষরূপ বিস্ময়কর ও কৌতুহল-প্রদ। আলোচ্য গ্রন্থে উহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

মশকই মানবদেহে ম্যালেরিয়ার বীজাণু বিসর্পিত করে এই মত ইদানীং বৈজ্ঞানিক সমাজে অন্ততঃ অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থেও এই মত অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থে কতকগুলি প্রমাণও প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

"মশকসাহায্যে এই জীবাণুকুল যে নরশোণিতে প্রবেশ লাভ করে তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশ হইতে আনীত কতকগুলি মশক দ্বারা ইংলণ্ডের কয়েক জন নীরোগ ব্যক্তিকে আক্রমণ করান হয়। তাহাতে দংশিত ব্যক্তিমাত্রেরই জ্বর হয়, অথচ লণ্ডনে তখন মোটেই ম্যালেরিয়া ছিল না। * * *
জাপান গবর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া জ্বর মশকদংশনে ঘটে কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য ম্যালেরিয়া-প্রধান ফর্ম্মোসা দ্বীপে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করেন। তথায় তাহারা ১৬ দিন বসবাস করে। এক দল বেশ জাল দিয়া ঘেরা ঘোরা মশকের অগম্য যায়গায় বাস করিতেছিল, অপর দলের সে বন্দোবস্ত ছিল না। প্রথম দলের কাহারও ম্যালেরিয়া হয় নাই, দ্বিতীয় দলের ২৩৯ জন ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া পড়িলে এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহের কারণ রহিল না। বিশেষ জ্বর-মশক না থাকিলে সে দেশে মোটেই ম্যালেরিয়া হয় না ইহাও লক্ষ্য করা গেল।"

যে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক, সে স্থানে যে মশকও যথেষ্ট ইহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয় তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"শয্যার বিষজ্ঞাপন করিবার জন্য যেমন ছারপোকার সৃষ্টি, বায়ুর বিষজ্ঞাপন করিবার জন্য সেইরূপ মশককুলের সৃষ্টি, সুতরাং মশক ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি বা বিস্তার কর্ত্তা নহে, ম্যালেরিয়ার জ্ঞাপক মাত্র।"

তিনি তাঁহার পুস্তকেই লিখিয়াছেন ;—

"কোন কোন ডাক্তারের মতে মশককুলই ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে ও নানা স্থানে মশকধ্বংসের ব্যবস্থাও হইতেছে। ম্যালেরিয়াক্রান্ত বা দূষিত বায়ু-পূর্ণ স্থানমাত্রেই মশকের আধিক্য দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

বাস্তবিকই, ম্যালেরিয়ার সহিত মশককুলের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, কোন স্থানের মশকের সংখ্যা দৃষ্টে তাহার ম্যালেরিয়ার পরিমাণ স্থির করিতে পারা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া মশককুল ম্যালেরিয়ার কারণ বা তাহাদের বিনাশে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার হইতে পারে, এ কথা, বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ম্যালেরিয়া থাকিলেই মশক থাকিবে, ইহা নিশ্চিত। মশক থাকিলেই ম্যালেরিয়া আছে ইহাও নিশ্চিত। সুতরাং মশককে ম্যালেরিয়ার জ্ঞাপক বলা যাইতে পারে, ম্যালেরিয়া একটি রূপ, রস, গন্ধাদিবিহীন বিষাক্ত পদার্থ মাত্র। ম্যালেরিয়া বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতরূপে রোগ জন্মাইবার পূর্ব্বে, ইহার অস্তিত্ব জানিবার অন্য উপায় নাই; এই জন্যই পরম পিতা পরমেশ্বর পূর্ব্ব হইতেই তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য মশককুলের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন।"

কিন্তু তিনি এই পুস্তকের অন্য স্থানে লিখিয়াছেন ;—

"আমার স্মরণ হয়, সে আজ ৩০ বৎসরের কথা, তখন আমার বয়স ১৪।১৫ বৎসর: প্রথম যে বৎসর আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া আসিল, সে ভীষণ ব্যাপার মনে করিতেও ভয় হয়। গ্রামে শিশু স্ত্রীলোক লইয়া প্রায় ২০০০ লোক ; জ্বরে পড়িল না এমত কেহই রহিল না। আমার এক বাল্য বন্ধুকে মাত্র এই জ্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে দেখিয়াছিলাম, উপরি উপরি তিন বৎসর এইরূপ ভীষণ প্রকোপ, কিন্তু তিন বৎসরই তিনি এড়াইয়াছিলেন। আমি নানারূপ প্রশ্নাদি দ্বারা জানিয়াছিলাম যে গ্রামের অপর সকল লোক হইতে তাঁহার অন্য পার্থক্য কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র রাত্রে নিদ্রায় সময় আপাদমস্তক আবৃত করিয়া বারমাস একখানি মোটা গাত্রবস্ত্র ব্যবহার তাঁহার অভ্যাস ছিল। এই কারণেই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক তাঁহার সেই ভীষণ তিন বৎসরের মধ্যে আদৌ জ্বর হয় নাই।"

মণ্ডল মহাশয় কার্য্যতঃ আপনিই আপনার কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানপ্রণালীতে অভ্যস্ত নহেন। ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানে মশকের আধিক্য দেখিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা মশকই ম্যালেরিয়ার কারণ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই। তাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। আমরা ডাক্তার গুপ্ত মহাশয়ের পুস্তক হইতে সেই অনুসন্ধান প্রণালীর দুইটি দৃষ্টান্ত উপরে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। মণ্ডল মহাশয়ের বাল্যবন্ধু রাত্রিকালে মোটা চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া নিদ্রা যাইতেন, সেই জন্য তিনি তিন বৎসর কাল ভীষণ ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। মোটা চাদর ভেদ করিয়া মশক তাঁহাকে দংশন করিতে পারিত না, সেই জন্য তিনি জ্বরগ্রস্ত হয়েন নাই। যদি দূষিত বাষ্প ম্যালেরিয়ার কারণ হইত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জ্বরগ্রস্ত হইতেন। তাঁহার নিঃশ্বাসের সহিত দূষিত বাষ্প নিশ্চয়ই তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইত। আর এক কথা, দূষিত বাষ্প ম্যালেরিয়ার কারণ হইলে ঐ রোগের প্রথম অবস্থাতেই শ্বাস

যন্ত্রের কোনও না কোনও রূপ বিকৃতি দেখা যাইত। কিন্তু ঐ রোগের প্রথম অবস্থায় শ্বাসযন্ত্র বিকৃত হয় না, রক্ত এবং প্লীহা ও যকৃতেরই বিকৃতি দৃষ্ট হয়। সুতরাং দূষিত বাষ্প ইহার কারণ বলিয়া মনে হয় না।

অনেক স্থানে মশা আছে, ম্যালেরিয়া নাই। ইহার কারণ, সকল মশাই ম্যালেরিয়ার জনক বা বিসর্পক নহে। মশকেরা নানা জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে এনোফিলিস জাতীয় মশকই মানবদেহে জ্বর রোগের সঞ্চার করিয়া দেয়। যেমন সর্পের মধ্যে ঢোঁড়া, হেলে ডাঁড়স প্রভৃতির বিষ নাই, অন্ততঃ সে বিষ মানুষের প্রাণনাশক নহে, সেই রূপ কয়েক শ্রেণীর মশকের দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুবর্দ্ধক পদার্থ নাই। তাহারা মশকজাতির মধ্যে ঢোঁড়া। তাহাদের কামড়ে জ্বালা আছে, জ্বর নাই। যেমন বোড়া, চিতি প্রভৃতি কতকগুলি সাপের বিষে সহসা মৃত্যু হয় না, কিন্তু শরীরে বিষম ক্ষত জন্মে, সেই রূপ এক শ্রেণীর মশক গোদ, বাত শিরা, সাঁজ্বর প্রভৃতির জীবাণু বহন করে। আর এনোফিলিস মশক জাতির মধ্যে কেউটে,—ইহাদের বিষেই ম্যালেরিয়া জীবাণুর পুষ্টি ও মানবদেহে সঞ্চার হয়।

এই এনোফিলিস জাতীয় মশক দেখিতে অন্যান্য মশক হইতে অনেক বিভিন্ন। গুপ্ত মহাশয় তাঁহার পুস্তকে তাহাদের আকৃতির প্রতিকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। আমরা গুপ্ত মহাশয়ের পুস্তক হইতে ইহাদের একটু পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

"এই জ্বরমশকেরা নিশাচর, দিবালোকে পাপ বড় বিরল। দিবাভাগে ইহারা ঘরের কোণে, গোশালায়, ঘনবনচ্ছায়ায়, ঝোপে ঝাপে অলিতে গলিতে, নর্দ্দমার কোণে, আলনার পাশে লুকায়িত থাকে। যেমন আঁধার হয়, আর অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়া রক্তশোষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। আবার প্রভাত হইবামাত্র অদৃশ্য হইয়া যায়। কাজেই ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইবার ভয় এই রাত্রে। গ্রাম উপকণ্ঠস্থ বা গ্রামের ভিতরকার খাল, ডোবা, পয়োনালায় ইহাদের উৎপত্তি ও পরিণতি এবং লোকালয় ইহাদের আশ্রম। উৎপত্তিস্থল হইতে এক পোয়া এবং গ্রাম হইতে অর্দ্ধ পোয়া দূরে এই মশকেরা উড়িয়া যাইতে পারে না। বর্ষা ও গরমের সময় ইহাদের বংশবৃদ্ধি, শীতকালে ইহারা মৃতপ্রায় হইয়া কোন রকমে টিকিয়া থাকে। পরিণতি ও বংশবৃদ্ধি শীতকালে ইহাদের প্রায়ই হয় না।"

এনোফিলিস জাতীয় সকল মশকও মানবদেহে ম্যালেরিয়া-বিষ বিসর্পিত করিয়া দিতে পারে না। যে সকল এনোফিলিস মশকের শরীরে জীবাণু-কোরক সঞ্চিত থাকে, এবং যে সকল কোরক তাহাদের শরীরে সুপরিণত হইয়া স্ত্রী-পুরুষযোগে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে, সেই সকল মশকের দংশনে ম্যালেরিয়ার

উৎপত্তি হইয়া থাকে। মশক মনুষ্য-শরীর হইতে এই বিষ গ্রহণ করে। ম্যালেরিয়া জ্বরোৎপত্তির অনুকূল অবস্থা কি কি তাহা আলোচ্য গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—

"প্রথমতঃ। কোনও দেশে বা স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে জ্বর মশক থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ। ম্যালেরিয়া জ্বরগ্রস্ত রোগী থাকা চাই, তবে না মশক শোণিতসহ ঐ জীবাণু শিশু গ্রহণ করিয়া তাহাকে পরিণত ও আত্মবিভাগদ্বারা তাহার শত গুণ বংশবৃদ্ধি করিয়া মানবদেহে পুনঃ সঞ্চারিত করিবে।

তৃতীয়তঃ। মশক হইতে মনুষ্য শরীরে ও মনুষ্য শরীর হইতে পুনশ্চ মশকদেহে জীবাণুকুলের গমনাগমনের সুবিধা থাকা চাই।

চতুর্থতঃ। মশকের পরিণতি ও বংশবৃদ্ধির অনুকূল আবহাওয়া নহিলে চলে না।

এই কয়টির কোনও একটীর অভাব থাকিলে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় না। এই জন্য অনেক দেশে জ্বর মশক সত্ত্বেও ম্যালেরিয়া নাই, এবং অনেক স্থানে মশকও জ্বর সত্ত্বেও বৎসরের অনেক সময় জ্বর বিমুক্ত থাকে। তখন আবহাওয়া এমন হয় যে তাহা মশকদংশন ও মশক-ভ্রূণের পরিণতির পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে। যেমন আমাদের দেশে শীত কাল ও বসন্ত কালের প্রথম ভাগটা। তাহা ছাড়া জ্বরমশকের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহারা সকলেই কিছু সমান জীবাণু বহন করে না। যেখানে জ্বর মশক কম জীবাণু বহন করে সেখানে জ্বর কম হয়, যেখানে বেশী বহন করে, সেখানে জ্বর বেশী হয়।"

আমরা আলোচ্য গ্রন্থ হইতে মোটামুটি "মশক মতের" আভাসমাত্র প্রদান করিলাম। মশক মানব, শরীর হইতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু লইয়া নিজ শরীরে উহার পরিণতি ও বংশবৃদ্ধি করিয়া উহা আবার মানবশরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। মানব-শোণিতে উহার অযোনিসম্ভব (asexual) বংশবৃদ্ধি ও মশক শরীরে উহার যোনিজ (sexual) বংশবৃদ্ধি হয়। মশকশরীরে পরিপক্কতা লাভ না করিলে ঐ জীবাণুর জ্বর-জনন-শক্তি জন্মে না। এখন জিজ্ঞাসা, মানব শরীরে এই প্রাথমিক জীবাণু কোথা হইতে আইসে? ইহাই এই "মশক মতের" প্রধান সমস্যা।

গুপ্ত মহাশয় কুইনাইনকেই ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকখান চিকিৎসক ও জনসাধারণের বিশেষ উপকারে আসিবে। বাঙ্গালার এই শ্রেণীর পুস্তক যতই প্রণীত ও আদৃত হয়, ততই মঙ্গল।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বুদ্ধাস্থি।

—:০:—

[কয়মাস পূর্ব্বে পেশোয়ারের নিকটে কনিষ্কের কীর্ত্তি স্তূপের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ভগ্নাবশেষমধ্যে—ভূগর্ভে প্রোথিত আধারে বুদ্ধাস্থি পাওয়া গিয়াছে। পেশোয়ারে এই স্তূপের বিষয় বহু চীন দেশীয় পর্য্যটক বলিয়া গিয়াছেন। পেশোয়ারের বিবরণ লিখিবার সময় প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও পুরাতত্ত্ববিদ কানিংহাম সে কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কানিংহামের বিবরণ পাঠে জানা যায়, ৪০০ খৃষ্টাব্দে ফা হিয়েন ফো-নিউ-সা বলিয়া পেশোয়ারের উল্লেখ করেন। পরে ৫০২ খৃষ্টাব্দে সুং ইউন ইহার উল্লেখ করেন। তৎকালে গান্ধারের নৃপতির সহিত কাবুল, গজনী ও সন্নিহিত প্রদেশের রাজার যুদ্ধ চলিতেছিল। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাং যখন ভারতে আসেন তখন গান্ধার কাবুলের অধীন। কিন্তু পূর্ব্ব-রাজধানী পেশোয়ার (পরশাওয়ার) তখনও সমৃদ্ধির সমুচ্চ চূড়ায় সমাসীন। ইহার পর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মসুদী, একাদশ শতাব্দীতে রিহান ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাবর ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। আকবর পরশাওয়ার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া পেশোয়ার (সীমান্ত নগর) নাম রাখিয়াছিলেন। এই স্থানে বুদ্ধের কমণ্ডলুর ও একটি বিততবহুশাখ বৃক্ষের উল্লেখ—সকল বিবরণেই পাওয়া যায়। কিম্বদন্তী ছিল যে, এই বৃক্ষ ছায়ায় সমাসীন হইয়া বুদ্ধদেব কনিষ্কের আবির্ভাবের কথা ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন। ফা হিয়েন এই বৃক্ষের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সুং ইউন এই ঘনপল্লব বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃক্ষমূলে পূর্ব্ববর্ত্তী চারজন বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে বাবর এই বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন। তখন এই বৃক্ষ অন্ততঃ ১৫০০ বৎসরের। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে 'আইন আকবরীতে' ইহার উল্লেখ না থাকায় অনুমান হয়, তৎপূর্ব্বেই বৃক্ষটি মরিয়া গিয়াছিল। কনিষ্কের স্তূপ এই বৃক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ফা হিয়েন বলেন, ইহা ৪০০ ফিট উচ্চ এবং বহু বহুমূল্য দ্রব্যে মণ্ডিত। সুং ইউন বলেন, প্রকাশ, ভারতে ইহার তুল্য স্তূপ আর নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম লিখিয়াছিলেন,—"এখন আর এই স্তূপের কোন নিদর্শন নাই।"

দীর্ঘকাল পরে এই স্তূপের ভগ্নাবশেষের ও বুদ্ধাস্থির আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ভারত সরকার এই বুদ্ধাস্থি ব্রহ্মদেশে সংস্থাপিত করিতে দিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে যাঁহারা বুদ্ধাস্থি লইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহা-

দিগকে এই পূত অস্থি প্রদানের সময় ভারত সরকারের পুরাবস্তুবিভাগের ডিরেক্টার জেনারল সুধী মিষ্টার মার্শাল এই বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদিগের অনুরোধে তিনি আবশ্যক সংশোধন করিয়া ঐ প্রবন্ধ আমাদিগকে দিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। নিম্নে সেই প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক]

এই পূত দ্রব্যের ইতিহাসের উদ্ধার করিতে হইলে আমাদিগকে ভারতে আগত চীনদেশীয় ভ্রমণকারীদিগের বিবরণের আলোচনা করিতে হইবে। এই সকল ভ্রমণকারী খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ফা হিয়েন, সুং ইউন ও হিউয়েন সাং—এই তিন জন পেশোয়ারের সন্নিকটে রাজা কনিষ্কের কীর্ত্তি একটি বৃহৎ স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। হিউয়েন সাং স্পষ্টই বলিয়াছেন, এই স্তূপে বুদ্ধদেবের মরদেহাবশেষের এক অংশ রক্ষিত ছিল। এই সকল ভ্রমণকারী, এই স্তূপটির অসাধারণ সৌন্দর্য্যের ও বৈভবের কথা বলিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে মধ্যে বহুমূল্য দ্রব্যের বেষ্টনী ছিল এবং আয়তনে ও বৈভবে ভারতে আর কোন স্তূপ ইহার সমকক্ষ ছিল না। ভূমির উপরেই ইহার পরিধি প্রায় এক চতুর্থ মাইল ছিল। ইহার উচ্চতা কাহারও মতে চারি শত আবার কাহারও মতে সাত শত ফিট ছিল। এই ত্রয়োদশতলে বিভক্ত স্তূপের নিম্নাংশ প্রস্তরে গঠিত ও উপরিভাগ কাষ্ঠ রচিত হইয়াছিল এবং স্তূপ চূড়ায় স্বর্ণাম্বরাবৃত বৃত্ত শোভা পাইত।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তখন পর্য্যন্ত এই স্তূপ বিদ্যমান ছিল। তাহার পর ইহার কি দশা ঘটিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। তবে ইহা যে পরে আরও অনেক বৌদ্ধ স্তূপাদির মত মামুদের লুণ্ঠনলোলুপ অনুবর্ত্তীদিগের দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল—এ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। সে যাহাই হউক পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। শেষে ভারতের সীমান্ত প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকে ইহার অস্তিত্ব-নিদর্শনও বিস্মৃত হইয়াছিল।

যাহা হউক চীনদেশীয় পর্য্যটকদিগের রচনায় ইহার স্থাননির্দ্দেশের উপায় ছিল। সেই নির্দ্দেশের অনুবর্ত্তী হইয়া ফরাসী পণ্ডিত মশো ফসার বর্ত্তমান পেশোয়ার নগরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কতকগুলি মৃত্তিকা স্তূপই ইহার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া স্থির করেন। তাঁহার মতের অনুসরণ করিয়া আমরা ভূমিতলে এই প্রসিদ্ধ স্তূপের অবশেষসন্ধানে ব্যাপৃত হই। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার স্পূনার এই

কার্য্য আরম্ভ করেন। কার্য্যারম্ভের পর কয় মাস পর্য্যন্ত স্তূপের ভগ্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছু পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় নাই। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বৃহৎ স্তূপের প্রস্তররচিত ভিত্তিপ্রাচীর পাওয়া গেল। ভিত্তিপ্রাচীরের আয়তন দেখিয়া বুঝা গেল, ভারতে এমন বিশাল স্তূপ আর ছিল না। অন্যান্য বিষয়েও চীনদেশীয় পর্য্যটকদিগের বর্ণিত স্তূপের বিবরণ মিলিতে লাগিল।

ইহাই যে রাজা কনিষ্কের সেই প্রসিদ্ধ স্তূপ সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। তখন আমি ডাক্তার স্পূনারকে বলিলাম, এই স্তূপে বুদ্ধদেবের মরদেহাবশেষের এক অংশ রক্ষিত হইয়াছিল; তাহার সন্ধান করা আবশ্যক। তখন বহু আয়াসে নিম্নতলের মধ্যস্থল খনন করা হইল। প্রায় ২০ ফিট নিম্নে আমরা একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরগঠিত কক্ষে উপনীত হইলাম; তথায় আমরা প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজা কনিষ্করক্ষিত বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের আধার প্রাপ্ত হইলাম।

এই স্তূপেই যে রাজা কনিষ্কের কীর্ত্তি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যদি বা সন্দেহের কোন কারণ থাকিয়া থাকে—এই কক্ষে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির পরীক্ষায় সে সন্দেহের আর অবকাশ রহিল না;—পরন্তু সকল সংশয় দূর হইয়া গেল। এই আধারে যে রাজমূর্ত্তি উৎকীর্ণ তাহার সহিত কনিষ্কের মুদ্রায় মুদ্রিত মূর্ত্তির সৌসাদৃশ্য সুস্পষ্ট; এই মূর্ত্তির নিম্নে খরস্তিতে তাঁহারই নাম লিখিত বলিয়া বোধ হয়। আবার আধার-পার্শ্বে—যেন সকল সংশয় দূর করিবার জন্যই কনিষ্কের একটি মুদ্রা পতিত ছিল।

কাযেই এই স্তূপ যে কনিষ্কের কীর্ত্তি হিউয়েন সাংএর এই উক্তি সত্য বলিয়াই বোধ হয়। এই স্তূপাভ্যন্তরে যে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষই সংরক্ষিত হইয়াছিল ইহাতেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কনিষ্কের রাজ্য উত্তর ভারতে ও আফগানিস্থানে বিস্তৃত ছিল। সুতরাং তাঁহার পক্ষে রাজ্যান্তর্গত কোন স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষসংগ্রহ সহজসাধ্যই ছিল। বিশেষতঃ তিনি যে স্বীয় রাজধানীতে স্বয়ং বুদ্ধদেব ব্যতীত আর কাহারও দেহাবশেষ রক্ষা করিয়াছিলেন বা আর কাহারও দেহাবশেষ রক্ষার্থ এইরূপ অতুলনীয় স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

এই সকল কারণে মনে হয় হিউয়েন সাংএর উক্তিই সত্য এবং এই স্তূপমধ্যে প্রাপ্ত আধারে রক্ষিত দেহাবশেষ স্বয়ং বুদ্ধদেবের। তাঁহার দেহাবশেষ কুশীনারে পরিনির্ব্বাণের পর অষ্ট ভাগে বিভক্ত ও পরে সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক আরও বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

সংগ্রহ।

—:*:—

সাহিত্য।

—•—

ভারতীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য।

ভারতবাসীদিগের ইতিহাস-বিমুখতা প্রসিদ্ধ। "মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তি বর্ণনে প্রয়োজন নাই"—"এই বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ"—বঙ্কিমচন্দ্র এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে জাতির ইতিহাস নাই, সে জাতির দুঃখের সীমা নাই। সে দুঃখ আমরা বিশেষ রূপ ভোগ করিয়াছি ও করিতেছি। ইংরাজ লেখকগণ ভারতের এই অভাব-মোচনে যে অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা ভারতবাসীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র। ইংরাজ লেখকগণ যে ভ্রান্তসংস্কার হেতু স্থানে স্থানে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন—স্বজাতিপ্রীতি বশতঃ স্থানে স্থানে ভাবের ফেনপুঞ্জতলে সত্যের ক্ষীণ ধারা দেখিতে পায়েন নাই—এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহাও সামান্য নহে। এই ইতিহাসের উদ্ধার কার্য্যের গুরুশ্রমে একাধিক ইংরাজ সত্য সত্যই প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। কিটো, প্রিন্সেপ, কানিংহাম প্রভৃতির ত কথাই নাই, এল্‌ফিনষ্টোন, লেনপুল, স্মিথ, মিল, হাণ্টার হইতে মেকলে পর্য্যন্ত অনেক ইংরাজ লেখকই এ কার্য্যে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা প্রাচীন ভারতের কেহ বা মুসলমানাধিকৃত ভারতের, কেহ বা ইংরাজাধিকৃত ভারতের ইতিহাস রচনা করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে মেকলের কার্য্য কেবল "সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালের কার্য্যের" মত নহে।

মেকলে।

মেকলের বিরাট কীর্ত্তি—ইংলণ্ডের ইতিহাস। কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার স্থান উচ্চে নহে, সম্মান সমাধিক নহে। তিনি কোবিদ ছিলেন। তাঁহার রচনা বিচিত্রশব্দকুসুমকুন্তলা। তাঁহার রচনাশক্তি অনন্যসাধারণ। তাঁহার ভাষা অতুলনীয়। কিন্তু পাণ্ডিত্য, রচনাকৌশল, বর্ণনাশক্তি—এই গুলিই ঐতিহাসিকের সর্ব্বস্ব নহে। যে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তি, যে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ঐতিহাসিকের পক্ষে অত্যাবশ্যক, মেকলের তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। বিখ্যাত লেখক হ্যারিসন বলিয়াছেন, মেকলের ইতিহাসের আদর্শই অভ্রান্ত নহে। তিনি ইতিহাসকে সত্যমূলক উপন্যাস করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে কার্য্যে তিনি সফলশ্রম হইয়াছিলেন। তাঁহার ইতিহাস—সত্যমূল উপন্যাস। এরূপ পুস্তক সুখপাঠ্য হয়—এক শ্রেণীর পাঠককে ইতিহাসে আকৃষ্ট করে। কিন্তু ইহা ইতিহাস নহে। ইহাতে মানবসমাজে পারম্পর্য্য প্রদর্শন, ঘটনার কার্য্যকারণবিচার—এ সকলের অবকাশ হয় না। ইহা স্বল্প স্থানের আংশিক চিত্রমাত্র। ইহা কেবল বাহ্যিক বর্ণের বিকাশ লইয়াই ব্যস্ত। ইহাতে ব্যক্তির ও ঘটনার বিচারে ও

বর্ণনায়—কালক্রমাগত পরিবর্ত্তনের দিকে লেখকের মনোযোগ থাকে না। ইতিহাস মানব সমাজের অভিব্যক্তির বিবরণ ; ঐতিহাসিক উপন্যাস তাহা নহে। মেকলে বলিয়াছিলেন, ইতিহাস কবিতার ও দর্শনের সংমিশ্রণ। কার্য্যকালে তিনি কবিতার স্থানে শব্দচিত্র ও দর্শনের স্থানে ব্যক্তিগত বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে মেকলের স্থান উচ্চে নহে। ভারতবর্ষের ইতিহাসবিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব অধিক নহে। শব্দমন্ত্রে তাঁহার শিষ্য হাণ্টারও বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ তাঁহার প্রবল প্রতিভার অধিকারমধ্যে ছিল সত্য, কিন্তু এ দেশ তাঁহার অভিজ্ঞতা-সীমার বাহিরে ছিল। তথাপি ভারতের ইতিহাস-বিস্তারে তাঁহার কার্য্য নিতান্ত নগণ্য নহে। সংপ্রতি ইংলণ্ডে কোন সভাস্থলে সার আলফ্রেড লায়াল সেই কথার আলোচনা করিয়াছেন।

আরম্ভ।

সার আলফ্রেড আরম্ভেই বলিয়াছেন, এসিয়াবাসীর লিখিত এসিয়ার ইতিহাস চিত্তাকর্ষক নহে ; পরন্তু নিরস, তাহাতে রাজনৈতিক অভিব্যক্তির আলোচনা নাই। তাহাতে কেবল নৃপতিবৃন্দের ও সংগ্রামের উল্লেখ আছে। সার আলফ্রেড যাহাই বলুন, ভলটেয়ারের পূর্ব্বে য়ুরোপেও রাজার ও যুদ্ধের কথাই ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত—জনসাধারণের কথা ইতিহাসে আলোচিত হইত না। সুতরাং ভলটেয়ারের পূর্ব্ববর্ত্তী এসিয়াবাসী ইতিহাসলেখকদিগকেই দোষী করা উচিত নহে। তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন—এই পর্য্যন্ত। ইহার পর ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ইংরাজের আবির্ভাব, আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ—প্রাচীর প্রাচীন পথে নূতন শিক্ষার, সভ্যতার ও আদর্শের আগমন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট ভারতের বিষয়ে মনোযোগ দান করেন। কিন্তু তখন ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ। তাঁহাদিগের নিকট অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পুস্তক অপাঠ্য। এই শ্রেণীর লেখকদিগেরও যে দোষ ছিল না এমন নহে। তাঁহারা অভিজ্ঞতামাত্র লাভ করিয়াছিলেন ; রচনা চিত্তাকর্ষক করিতে শিখেন নাই। কাযেই লোকে ভারতের কথা শুনিত না—জানিত না।

মেকলের কৃতিত্ব।

মেকলেই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ জনসাধারণকে ভারতে ইংরাজের কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করেন। ক্লাইব ও হেষ্টিংস এই দুইজনের সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধে ইংরাজ পাঠক জানিতে পারেন যে, সুদূর সিন্ধুপারে মুষ্টিমেয় ইংরাজ বহু বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া রাজ্যবৃদ্ধি করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক মেকলের মতই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেকলে এই দুই জনের চরিত্রের উজ্জ্বল অংশই দেখাইয়াছিলেন। লোকে তাহাই দেখিয়াছিল। বিশেষ তাঁহারা ইংলণ্ডের রাজ্যবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সেই জন্য ইংরাজ জনসাধারণ তাঁহাদিগের দোষবিষয়ে অন্ধ হইয়াছিল—তাঁহাদিগের কৃতকর্ম্মের ফলভোগী হইয়া তাঁহাদিগের কার্য্যের ভালমন্দ বিচার করে নাই।

রচনা-কৌশল।

এই দুইটি প্রবন্ধে মেকলের অসাধারণ রচনাকৌশল স্বপ্রকাশ। মেকলে ঈপ্সিত ফললাভের উপযোগী বিবরণাদি বাছিয়া লইয়া আবশ্যক মত সাজাইয়া লইতে জানিতেন। তিনি নিপুণ শিল্পীর মত, অল্প কথায় বক্তব্য বিষয়

চিত্রের মত সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিতেন। ক্লাইবের সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দুই পৃষ্ঠায় মোগলদিগের পতনের পরে দেশব্যাপী অশান্তির ও অরাজকতার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজের অসাধারণ অজ্ঞতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা অ্যাংলোইণ্ডিয়ান লেখকদিগের যে দোষের উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রবন্ধে তিনি সে দোষেরও উল্লেখ করিয়াছেন; এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, ইংরাজবালক য়ুরোপের ইতিহাসের তুচ্ছ ঘটনার বিষয় অবগত আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সংঘটিত জ্ঞাতব্য ঘটনার বিষয়ে একান্ত অজ্ঞ—ইহা আক্ষেপের বিষয়। ইহার জন্য ঐতিহাসিকগণও দোষী। মিলের উৎকৃষ্ট পুস্তক নিরস বলিয়া চিত্তাকর্ষক নহে। অর্ম্মের পুস্তক সূক্ষ্ম বিচার ও বর্ণনাবাহুল্য হেতু অনাদৃত। মেকলে তাঁহার কোন বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে অতি সামান্য তুচ্ছ ঘটনায় যেরূপ আন্দোলন হয় ভারতে তিনটি যুদ্ধেও সেরূপ আন্দোলন হয় না। তাই বোধ হয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে ইংরাজ জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট করা মেকলের এই দুইটি প্রবন্ধ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

হিতে বিপরীত।

কিন্তু ইহাতে যে হিতে বিপরীত ঘটে নাই, এমনও নহে। তাঁহার রচনাকৌশলে মুগ্ধ পাঠকের নিকট অন্য সকল লেখকের রচনা-পাঠ ক্লেশকর হইয়া উঠে। সাধারণ পাঠক মেকলের রচনা পাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট হইত; আলোচ্য বিষয় বিশেষতঃ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান লেখকদিগের রচনা তাহার নিকট বিরক্তিকর বোধ হইত। এমন কি মেকলের প্রবন্ধ প্রকাশে এল্‌ফিনষ্টোনের মত অভিজ্ঞ লেখকও আপনার রচনা-প্রকাশে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন ক্লাইব ও হেষ্টিংস এই দুই জনের চেষ্টায় বৃটিশ সাম্রাজ্য বৃদ্ধির বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন মেকলের প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশিত হইল। সেই প্রবন্ধদ্বয়ের অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যে তিনি বিস্মিত—মুগ্ধ হইলেন। মিলের ও মেকলের রচনার পর আর এই বিষয়ক রচনার আবশ্যক নাই মনে করিয়া তিনি আরব্ধ কার্য্যে নিরস্ত হইলেন। কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠককে আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, এল্‌ফিনষ্টোনের এই সঙ্কল্প আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। ভারতে ইংরাজের কার্য্যে মিলের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না; মেকলে খুঁটিনাটি বাদ দিয়া—স্থানে স্থানে সত্য অতিক্রম করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর দেশব্যাপী অশান্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা বিদ্যুদ্দীপ্তির মত ভারতের রাজনৈতিক গগনে সঞ্চিত অজ্ঞতান্ধকারে শোভা পাইয়াছিল। তাহাতে সে অন্ধকার বিলুপ্ত হয় নাই—হইতে পারে না। তবে মেকলে ভারতের ইতিহাসের প্রতি ইংরাজ জনসাধারণের ও ইংরাজ লেখকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন তাহার ফলে ভারতের ইতিহাসের বহু অংশ বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। সুতরাং ভারতের ইতিহাস রচনা বয়য়ে মেকলের কৃত কর্ম্ম নিতান্ত নগণ্য নহে; পরন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ।

সিপাহি সীতারাম।

গত মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ফিলট কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির বৈঠকে সীতারাম নামক জনৈক সিপাহীর আত্মচরিতের আলোচনা করিয়াছিলেন। সীতারাম ইংরেজী ভাষা জানিতেন না; জীবনের সায়াহ্নে, সমরবিভাগে আটচল্লিশ বৎসর কায করিয়া অবসর গ্রহণের পর স্বীয় গৃহে একান্তে বসিয়া হিন্দি ভাষায় কেবলমাত্র স্মৃতির সাহায্যে এই কৌতূহলোদ্দীপক আত্মকাহিনী লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মকাহিনীতে শিখিবার ও জানিবার বিষয় অনেক আছে। সেইজন্য আমরা সংক্ষেপে সেই আত্মকাহিনীর অল্পমাত্র আভাস প্রদান করিলাম।

বাল্যজীবন।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যাপ্রদেশের কোন গণ্ডগ্রামে সীতারামের জন্ম হয়। সীতারামের পিতা গ্রামের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন—তাঁহার নিজের এক বিঘা জমি ছিল। সীতারাম ব্রাহ্মণসন্তান; বাল্যকালে জনৈক সরলস্বভাব পণ্ডিতের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। হিন্দুস্থানে, বিশেষতঃ হিন্দিভাষাভাষীর দেশে;—ব্রাহ্মণ শিক্ষক 'পণ্ডিতজী' নামে অভিহিত। সীতারামের পণ্ডিতজী সীতারামকে মোটামুটি নীতিশিক্ষা দিয়াছিলেন। বৈচিত্র্যময় জীবনের অনেক সঙ্কটসময় সেই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া সীতারাম সন্তোষ ও সান্ত্বনা লাভ করিতেন। সীতারামের এক মাতুল কোম্পানী বাহাদুরের পল্টনে কায করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে ছুটী লইয়া গৃহে যাইবার সময় ভগিনীর গৃহেও যাইতেন। তথায় গ্রাম্যলোকের নিকট "সাহেব লোক" দিগের সম্বন্ধে তিনি অনেক বিস্ময়জনক গল্প বলিতেন। লোকে সেই সব গল্প শুনিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ রহিত। এই স্থানে বলা আবশ্যক, এই সময়ে অযোধ্যারাজ্য ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। তখন অযোধ্যায় একজন নবাব ছিলেন। সীতারামের দৃষ্টিতে তাঁহার মাতুল সেই নবাব অপেক্ষাও "মস্ত লোক" বলিয়া বোধ হইত।

সাহেব লোক।

এই সময় অযোধ্যা প্রদেশে "সাহেব লোক" দৃষ্ট হইত না। আগ্রা অঞ্চল তখন য়ুরোপীয়দিগের পদরেণুস্পৃষ্ট হইয়াছিল। অযোধ্যা অঞ্চলের লোক তখন ইংরেজ ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গদিগের সম্বন্ধে অনেক "আষাঢ়ে গল্প" সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। তখন তথাকার গ্রাম্য লোকের বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের দেশের লোক যেরূপভাবে জন্ম গ্রহণ করে, য়ুরোপীয়গণ সেরূপে জন্মে না। কোন সুদূর নীলাম্বুধিবেষ্টিত দেশে এক প্রকার অদ্ভুত বৃক্ষে শ্বেত ডিম্ব ফলিয়া থাকে। সেই ডিম্ব হইতে 'তা' দিয়া "সাহেব" শিশুদিগকে বাহির করা হয়। একবার সীতারামের সম্মুখে যখন "সাহেবদে"র উৎপত্তিসম্বন্ধে ঐরূপ গল্প হইতেছিল তখন তথায়, এক বৃদ্ধা উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধা কিছু দিন আগ্রায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "একথা সম্পূর্ণ সত্য, আগ্রায় আমি ইহার প্রমাণ স্বয়ং দেখিয়াছি, তথায় এক 'সাহেব' ছিলেন। তিনি প্রত্যহ এক পরীর সহিত বেড়াইতেন। সে পরীর কান্তি দুগ্ধফেনশুভ্র।

তাহার সুন্দর পালক ছিল। পাছে সে উড়িয়া পলায়ন করে, এই জন্য 'সাহেব' তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতেন।" সীতারাম পরে আগ্রায় এই ইংরেজ মহিলাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি শিখিপুচ্ছবিনির্ম্মিত অঙ্গাবরণ পরিধান করিতেন। "সাহেবদের" সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অলৌকিক গল্প শুনিয়া সীতারামের মন কোম্পানী বাহাদুরের চাকরী করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

আগ্রাযাত্রা।

জননীর অনিচ্ছা, পণ্ডিতজীর নিষেধ প্রভৃতি সত্ত্বেও সীতারাম কোম্পানীর সিপাহী হইবার জন্য মাতুলের সহিত আগ্রা যাত্রা করাই স্থির করিলেন। সীতারামের বয়স তখন সপ্তদশবর্ষমাত্র। যাইবার জন্য পণ্ডিতজী শুভদিন শুভলগ্ন দেখিয়া দিলেন, পিতা একটি টাটু ঘোড়া দিলেন, আর স্নেহিনী জননী অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুত্রের মঙ্গলকামনায় কত কথাই বলিয়া দিলেন। সীতারাম সিপাহী হইবার জন্য আগ্রায় রওনা হইলেন।

ঠগী হস্তে।

এই সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই ঠগী নামক দস্যুদলের অত্যন্ত উৎপাত ছিল। মাতুলের সহিত আগ্রায় যাইবার সময় সীতারাম পথে ঠগীদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। আগ্রায় যাত্রাকালে সীতারামের মাতুল পথে আর দুই জন অবকাশপ্রাপ্ত সিপাহিকে সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলেন। উহার মধ্যে একজন সিপাহি তাঁহার ছোট ভাইকে পণ্টনে ভর্ত্তি করিবার জন্য আগ্রায় লইয়া যাইতেছিলেন। একদিন একদল বাদক পথে তাঁহাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। তাহারা আসিয়া সিপাহি-দিগকে বলিল যে, ঐ অঞ্চলে ঠগীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব; সেই জন্য ভয়ে তাহারা সিপাহিদিগের সঙ্গ লইতে আসিয়াছে। এক রাত্রিতে ঐ দলের কোন কার্য্য দেখিয়া সীতারামের মাতুলের মনে সন্দেহের উদয় হয়। সেরাত্রিতে সকলে সতর্ক ছিলেন; পরদিন প্রাতে তাঁহারা ঐ বাদক-দলকে বিদায় করিয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরেই একদল মজুর আসিয়া এই সিপাহিদলের সহিত মিলিত হয়। উহারা সংখ্যায় বারজন ছিল। তাহাদিগের নিকট বাঁশী প্রস্তুত করিবার অনেক নল ছিল। প্রাতে সীতারাম বলিল,—এই কুলিদলের একটা লোকের সহিত সেই গায়কদলের একটা লোকের বিলক্ষণ আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে। এই নবাগত দলস্থ লোকের ভাষা স্বতন্ত্র; ইহারা কুলি; সেই জন্য কেহ বালকের কথা বিশ্বাস করিল না। যাহা হউক সিপাহিরা একটু সতর্ক হইলেন, নিশীথে অকস্মাৎ একটা অস্ফুট শব্দে সীতারামের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল, সে চীৎকার করিয়া উঠিল। চিৎকারে তাহার মাতুল জাগিয়া তরবারির আঘাতে একজন কুলিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্ট কুলিগুলি নল ফেলিয়া পলাইল। মুহূর্ত্তমধ্যে এই ব্যাপার ঘটিল। কিন্তু তখন দেখা গেল যে, যে সিপাহিবালককে তাহার ভ্রাতা পণ্টনে ভর্ত্তি করিবার জন্য লইয়া যাইতেছিলেন তাহার গলদেশে রেশমের রজ্জুর ফাঁস লাগান রহিয়াছে,—প্রাণ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়াছে এবং তাহার ভ্রাতা অচেতন অবস্থায় পতিত রহিয়াছেন; সীতারামের মাতুলের স্বর্ণনির্ম্মিত মালা অন্তর্হিত হইয়াছে। নিকটেই গঙ্গা; পরদিন সকলে শোকার্ত্ত হৃদয়ে সেই উমেদার বালকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাহিত করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। যথাসময়ে সীতারাম আগ্রায় পৌঁছিলেন।

সীতারামের মাতুল প্রথমে তাহাকে এডজুটেন্টের নিকট ও পরে ডাক্তার "সাহেবের" নিকট লইয়া যায়েন। ডাক্তার "সাহেবের" বাসায় যাইয়া সীতারাম দেখিলেন, ডাক্তারের দুইটি শ্বেতাঙ্গ শিশুকে আয়া ডিম প্রভৃতি খাওয়াইতেছে। দেখিয়া তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহার পণ্ডিতজী বলিয়াছিলেন, শ্বেতাঙ্গের চাকুরী করিলে তাহার জাতি রক্ষা করা কঠিন হইবে। জাতিনাশের ভয়ে সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ডাক্তার "সাহেব" সেই সময় তাহার বক্ষস্থল পরীক্ষার্থ তাহাকে গাত্রবস্ত্র খুলিতে বলিয়াছিলেন। অন্যমনস্কতাহেতু সে তাহা শুনিতে পায় নাই। ছেলেরা অমনি বলিয়া উঠিল "শুন্‌তে পাচ্ছিস্‌নে, গাধা, শুয়ার, পেঁচা?" ডাক্তার সাহেবও বিরক্ত হইয়া তাহাকে "জঙ্গলী" বলিলেন। তাহা শুনিয়া সেই দুইটি দুর্ব্বিনীত শ্বেতাঙ্গ শিশু বলিয়া উঠিল,—"বাবা ওটার গা কি লোমে ঢাকা?"

সেনাদলে।

সীতারাম তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত সিপাহিপদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার সেই গ্রাম্য সরলতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তখনকার সিপাহিরা পল্টনে ভর্ত্তি হইলে "ড্রিল হাবেলদার"কে ১৬ টাকা করিয়া প্রদান করিত। দলের য়ুরোপীয় সার্জ্জেণ্ট সেই টাকার কিয়দংশ পাইত। সীতারাম সেই টাকা প্রদান করেন নাই। সেই জন্য তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পারিত না। তিনি ইহাতে বিস্মিত হইতেন। ঐ সময়ে প্রতি সেনাদলে এক জন করিয়া য়ুরোপীয় সার্জ্জেণ্ট থাকিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেশীয় ভাষায় সুন্দর কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন ও সিপাহিদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন। আর কতকগুলি সার্জ্জেণ্ট সিপাহিদিগকে সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেন ও তাহাদিগকে ঘুসি মারিতেন। ইহাতে প্রায়ই নানা হাঙ্গামার উদ্ভব হইত। ঐ সময়ে সিপাহিরা তাহাদের দলের শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী

সিপাহি।

দিগের এক একটা নাম রাখিত। একজন সাহেবের ঘাড় লম্বা ছিল বলিয়া পল্টনের সিপাহিরা তাহাকে "উট সাহেব" বলিত। একজন খুব নবাবী মেজাজে চলিত বলিয়া তাহাকে সকলে "নবাব সাহেব" বলিত। একজন সিপাহিদিগের সহিত অবাধে মিশিয়া তাহাদের সহিত কুস্তি করিত। সেই শ্বেত পুরুষটি দৈর্ঘ্যে ৬ ফিট ৩ ইঞ্চি ছিলেন। আকড়ার সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করিত এবং ভাল বাসিত। তাঁহাকে সিপাহিরা "পালোয়ান সাহেব" বলিত। ঐ সময় পল্টনের শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীরা সিপাহিদিগের সহিত অবাধে মিশিতেন, সিপাহিদিগের সহিত শিকারে যাইতেন এবং সিপাহিদিগের চিত্ত-বিনোদের জন্য নাচ দিতেন। সীতারাম লিখিয়াছেন "পাদ্রি সাহেবদের পরামর্শে এখনকার 'সাহেবেরা' নাচ দেন না। পাদ্রি 'সাহেবরা' বলেন, 'নাচ দেওয়া অন্যায়'। ইঁহারাই 'সাহেব' দিগকে সিপাহিদিগের 'পর' করিয়া দিয়াছেন।" সীতারাম লিখিয়াছেন, "আমার কার্য্যকালের শেষকালে একজন সেনাধ্যক্ষ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সিপাহিদিগকে কি বলিতে হইবে তাহা তিনি জানেন না। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন সিপাহিদিগকে কি বলিতে হইবে, কি ভাবে তাঁহাদের সহিত কথা বার্ত্তা বলিতে হইবে "সাহেবেরা" তাহা জানিতেন। এখন তাঁহারা নূতন পরীক্ষা দিয়া

পালোয়ান সাহেব।

তাহাতে উত্তীর্ণ হয়েন, সেই জন্য কথা বলিতে পারেন না।” সেকালের অন্যান্য সিপাহির ন্যায় সীতারামের অনেক “সাহেব” বন্ধু ছিল। তখন গোরা সেনা সিপাহিসেনার সহিত ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব করিত। ১১ নং পদাতিক দল সীতারামের সেনাদলকে “ভাই” বলিত; ১৬ নং লান্সার দলের গোরারা প্রাণান্তেও সিপাহিদিগের চুল্লির নিকটে যাইত না।

নেপাল যুদ্ধে।

সীতারাম নেপাল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। সেনাপতি জিলেস্পি ও সেনাপতি অকটার্লোনী ঐ যুদ্ধে সেনা পরিচালনা করেন। ঐ যুদ্ধে ৫৩ সংখ্যক পদাতিক দলের অনেক সেনা নিহত হয় এবং একটি দুর্গও শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে ইংরেজ সেনা ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। তাহারা বার, বার, ঐ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে “পালোয়ান সাহেবের” বক্ষস্থলে একটি তীর বিদ্ধ হয়। তিনি ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়েন। সীতারাম “পালোয়ান সাহেবের” জন্য অত্যন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, “তাঁহার বিচ্ছেদ অসহ্য।” এই যুদ্ধে নেপালীরা শেষে

ইংরেজের উদারতা।

পরাজিত হইয়াছিল; শত্রু পরাজিত হইলে ইংরেজরা আমুর তাপ্পাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে দিয়াছিলেন। ইংরেজ জাতি বীরত্বের সম্মান করিয়া থাকেন। সীতারাম লিখিয়াছেন—“ইহা বড়ই বিস্ময়জনক। সাহসী লোক্‌ই ত ভীতিজনক শত্রু। আমি ইংরেজদিগের চরিত্র বুঝিতে অক্ষম। আমি স্বয়ং তাহাদিগকে আহত শত্রুর জীবন রক্ষা করিতে দেখিয়াছি। একজন ইংরেজ সেনাপতি অনেক আহত শত্রুর জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু তিনি যেমন পশ্চাৎ ফিরিলেন, অমনই সেই আহত শত্রু তাঁহার গলদেশে গুলি করিল। আর একজন ‘সাহেব’ একজন আহত আফগানকে জল দিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় সে তরবারির আঘাতে ‘সাহেবের’ পা

গোরা সেনা।

কাটিয়া দিয়াছিল”। সীতারাম লিখিয়াছেন,—“ইংরেজ সেনা পরাজয়কে গ্রাহ্য করে না; সেই জন্যই তাহারা অজেয়। নেপাল যুদ্ধে এক দল ইংরেজ সেনার অনেক লোক ক্ষয় হইলে তাহারা হটিয়া আসিল; কিন্তু আবার তাহারা প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রু-সেনার উপর গিয়া পড়িল। পাঁচ বার এইরূপ হয়; কিন্তু তাহাদের প্রথম আক্রমণ যেমন ভীষণ পঞ্চম আক্রমণও তদ্রূপ। সেনাপতি নিহত হইলে উহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে না। এক লোটা মদের জন্য ইহারা দশটা যুদ্ধ করিতে পারে। ইহারা লুণ্ঠন করে বটে, কিন্তু এক বোতল ব্র্যাণ্ডির জন্য ইহারা এক টুপি ভর্ত্তি করিয়া টাকা দিয়াছে, ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি।”

পিণ্ডারী যুদ্ধে।

সীতারাম পিণ্ডারী যুদ্ধেও উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে আহত হইয়া তিনি জঙ্গলের মধ্যে হারাইয়া যায়েন। নিকটে একটি বালিকা মহিষ চরাইতেছিল। সে নিকটবর্ত্তী কূপ হইতে জল আনিয়া তাঁহার মুখে দেয় ও তাঁহাকে আপনার কুটীরে লইয়া যায়। তাঁহাকে সেখানে কয়দিন রাখিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে এক বৈরাগীর নিকট রাখিয়া আসে। বৈরাগী তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করে। ঐ সময় পিণ্ডারীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া ঐদিকে আসে। বৈরাগী তাঁহাকে সেই

সময় এক দুর্গন্ধময় গোরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে। তাহার পর কোম্পানীর সেনা সে দিকে আসিলে সীতারাম ইংরেজ সেনাশিবিরে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধে সীতারামের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভগ্ন হইয়া পড়ে। তিনি অবকাশ লইয়া গৃহে গমন করেন। সেই সময় তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার বিবাহ দেন। সীতারাম "শশীকলা সম" কোন সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিবেন—ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল তাহার মুখমণ্ডল বসন্তের লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত। সীতারাম প্রিয়তমার মুখচন্দ্রে শশীকলার শোভার পরিবর্ত্তে শশলাঞ্ছনের আধিক্য দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিয়া নাগপুরে সেনাদলে আসিয়া যোগ দিলেন। এইবার আসিয়াই তাঁহার এক বিপদ ঘটিল। একটি দুর্গ দখল করিতে যাইয়া তিনি ভূপ্রোথিত বারুদের স্ফুরণে উৎক্ষিপ্ত মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়েন। দুইজন গোরা তাঁহাকে অচৈতন্য অবস্থায় টানিয়া বাহির করে এবং "রাম" মদ্য পান করাইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করে। এই সময় তাঁহার মাতুল কোথায় উড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহার পর সীতারাম চিকিৎসার্থ হাসপাতালে প্রেরিত হয়েন।

বিবাহ ও বিপদ।

হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাম এক নূতন সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অনতিবিলম্বে ইনি এই সেনাদলের বেতন দাতা হাবিলদারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে তখন সিপাহিদিগের বেতন দিবার ভার ছিল। সিপাহিরা তখন মাসে মাসে বেতন লইত না,—উহা হাবিলদারের নিকট গচ্ছিত রাখিত; শেষে ছুটি পাইলে গৃহে যাইবার সময় উহা লইয়া যাইত। হাবিলদারগণ ঐ টাকা সেনা বিভাগের ইংরেজ কর্ম্মচারিগণকে কর্জ্জ দিত। সীতরাম যে সেনাদলে ছিলেন, সেই সেনাদলের জনৈক কর্ম্মচারীর নৌকা জলমগ্ন হইয়াছিল; সেই জন্য তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। তিনি সীতারামের নিকট হইতে সেই জন্য বিস্তর টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। শেষে যখন সিপাহিদের ছুটীর সময় আসিল, তবন সেই সেনাদলের কাপ্তেন ও সীতারাম বহুচেষ্টা করিয়াও পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৩৭ টাকা অকুলান রহিয়া গেল। তহবিল তছরুপাতের অভিযোগে সীতারাম সামরিক আদালতে দণ্ডিত হইলেন। তাঁহার এই পদ গেল। সীতারাম বলিলেন "যে কায সকলেই করে, সকলেই যাহা জানে, তাহার জন্য আমার চাকরী গেল, সরকারের চমৎকার ব্যবস্থা!"

পদচ্যুতি।

ইহারা কিছুদিন পরে সাহ সুজাকে আফ্‌গান রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরাজ আফ্‌গান রাজ্যে সেনা প্রেরণ করেন। এই সেনাদলে হাবিলদারি পদ পাইয়া সীতারাম আফ্‌গান্ রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি আহত ও শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। শত্রুরা তাঁহাকে কাবুলের বাজারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত করেন। অনেক গোরাও তথায় বিক্রয়ার্থ নীত হয়। একজন ধনাঢ্য আফ্‌গান তাঁহাকে ২৪০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। সীতারাম অবিলম্বে পারস্য-

আফ্‌গান যুদ্ধে।

ভাষা শিখিয়া লইলেন। এদিকে ঐ অঞ্চলে ইংরেজ সেনা প্রেরিত হইল। তাহারা আফ্‌গানদিগকে পরাজিত করিয়া ফিরিয়া আসিল; কিন্তু কেহই সীতারামের সন্ধান পাইল না বা তাঁহাকে উদ্ধার করিল না। শেষে সীতারাম একজন আফগানকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার সহিত পলায়ন করিলেন। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি ইংরেজ শিবিরে উপনীত হইলেন। তথায় একজন সুবাদার তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তখন সুবাদার ও ডেপুটী কমিশনার উভয়ে পাঁচশত টাকা দিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করিলেন।

আফগান চরিত্র।

সীতারাম তাঁহার জীবন-কাহিনীতে আফগানদিগের বিশ্বাসঘাতকতার কথা, আফগান রমণীদিগের ঘোর চরিত্রহীনতার কথা ও আফগান যুদ্ধে ইংরেজদিগের বিপত্তির কথা বিশদ ভাবে লিখিয়াছেন।

নানা কথা।

সীতারামের বৈচিত্র্যময় জীবনের সকল কথা বলিবার স্থান আমাদের নাই। পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল পল্টনের কার্য্য করিবার পর তিনি জমাদারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন; তাঁহার শৈশবের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অর্থাগম হয় নাই। সেনাবিভাগে কার্য্য করার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার অঙ্গে সাতটি অস্ত্রলেখা ও চারিটি মেডেল ছিল। জমাদার হইয়া তিনি মুলতান অবরোধে ও চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাহার পর সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি ছুটী লইয়া দেশে যায়েন। সেই সময় অনেক সিপাহী অযোধ্যা অঞ্চলে গমন করিয়া লোকদিগকে উত্তেজিত করিতে থাকে। সীতারাম তাহাদিগকে ঐরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা তাঁহার মুখে গলিত সীসা ঢালিয়া দিয়া হত্যা করিবার জন্য একখানি গাড়িতে তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে লইয়া আসিতে থাকে। পথে একদল ইংরেজসেনা তাঁহাকে উদ্ধার করে।

পুত্রহত্যা।

এইবার সীতারামের জীবনে অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। লক্ষ্ণৌ সহরের সান্নিধ্যে একটি গৃহে কতকগুলি বিদ্রোহী সিপাহী প্রভৃতি ধড়া পড়ে। উহাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ হয়। সীতারামের উপর ঐ গুলি চালান কার্য্যের নেতৃত্ব ন্যস্ত হয়। গুলি করিবার পূর্ব্বে সীতারাম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সিপাহীদিগের নাম, ধাম, রেজিমেণ্ট্‌ প্রভৃতি লিখিয়া লইতেছিলেন এমন সময় সেই দলে তিনি তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধ সীতারামের মস্তক ঘুরিয়া গেল, হৃদয় যেন স্পন্দন-রহিত হইল। তিনি সেনাধ্যক্ষকে বলিয়া ঐ কার্য্যভার অপরকে দিলেন এবং মন্থর গমনে শিবিরে আসিয়া সেই ভীষণ বন্দুকের শব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সেই শব্দ শ্রুত হইল। সীতারামের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। যাহা হউক, তিনি তাঁহার পুত্রের সৎকার করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। অন্য সকল বন্দীর মৃত দেহ শিবা শকুনির ভক্ষ্য হইয়াছিল।

ইহার ৪৮ বৎসর চাকরী করিয়া সীতারাম পেন্সন লইয়াছিলেন।

আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম।

ধর্ম্মমত বিষয়ে এসিয়ার গৌরব অন্য সকল ভূখণ্ডের গৌরব অপেক্ষা অধিক। এসিয়ায় বিবিধ ধর্ম্মমত উৎপন্ন হইয়াছে। বৈদিক (হিন্দু) ধর্ম্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম—এসিয়ায় উৎপন্ন হইয়া জগতের সর্ব্বত্র শান্তির ও সান্ত্বনার উৎস উৎসারিত করিয়াছে। আবার এসিয়ার মধ্যে ধর্ম্মমত বিষয়ে ভারতবর্ষের গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম্ম বিততসহস্রশাখ বৃহৎ বনস্পতির মত মানবসমাজকে অবারিত ছায়াদানে স্নিগ্ধ করিয়াছে। ইহারই স্নিগ্ধ ছায়ায় উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মমত হিমাচলের অভ্রভেদী বিরাট বপু ও বারিধির তরঙ্গভঙ্গ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে, চীনে, জাপানে ও কোরিয়ায় ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে—শিল্প ও সাহিত্য বিষয়েও ভারতের প্রভাব বিস্তার করিয়া যে আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক বিপ্লব ও সামাজিক পরিবর্ত্তন অবাধে উপেক্ষা করিয়া আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারই অবারিত ছায়ায় অত্যাচারতাড়িত পারশিক ধর্ম্মমত আশ্রয়লাভ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। ইহারই উদার আদর্শে বিজয়-গর্ব্বোদ্ধত মহম্মদীয় ধর্ম্মে শান্তরসের সঞ্চার হইয়াছিল। ইহারই আশ্রয়ে মদ্রদেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম স্বাধিকার-সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারই আদিস্থান পঞ্চনদ প্রদেশে বৈদিক ও মহম্মদীয় ধর্ম্মমতদ্বয়ের সংমিশ্রণে শিখ ধর্ম্মমত জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের ইতিহাসে এক নূতন শক্তির লীলা প্রকট করিয়াছিল।

ধর্ম্মেই ভারতের গৌরব—ধর্ম্মেই তাহার প্রাধান্য। ভারত ধর্ম্মপ্রাণ। যে রোমের প্রবল প্রতাপে পৃথিবী কম্পিত হইত, সুদূর ভারতেও যাহার সৈনিকপদভার অনুভূত হইয়াছিল সে রোম আজ মৃত; রাজপথে, দুর্গে, প্রাসাদে তাহার সভ্যতার শেষ চিহ্ন বর্ত্তমান। যে গ্রীসের বিজয়-লালসা ভারতবর্ষকেও আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিল—সে গ্রীস আজ মৃত; শিল্পে ও সাহিত্যে তাঁহার সভ্যতার ধ্বংসাবশেষমাত্র বিদ্যমান। যে মিশর নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়া বাণিজ্যের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিল, সে মিশর আজ মৃত; বিরাট পাষাণ-স্তূপে তাহার বিগত সমৃদ্ধির সাক্ষ্যমাত্র রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বহুশতাব্দীর বিজয় বাত্যায় পর্য্যুদস্ত হইয়াও জীবিত আছে; তাহার আধ্যাত্মিকতাই তাহার এই অসাধারণ শক্তির কেন্দ্র ও কারণ। কিছুকাল জগতে জড়বাদের সমাদর ও আধ্যাত্মিকতার অনাদর ঘটিয়াছিল। তখন ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মমতের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়ে নাই। এখন সেই ভ্রান্ত মত দিবাকর-কিরণ-বিকাশে কুজ্ঝটিকার মত অপসৃত হইতেছে; তাই ভারতীয় ধর্ম্মমত আবার সমাদৃত হইতেছে; ভারতবর্ষ আবার জগতে গুরুর আসন অধিকার করিতেছে। আমেরিকায় বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার ইহাই সূচিত করিতেছে। ইহার মধ্যেই সানফ্রান্সিস্কোয় হিন্দুমন্দির সংস্থাপিত হইয়াছে। সংপ্রতি আমেরিকায় 'ইভনিং পোষ্ট' পত্রে সেই মন্দিরের ও মন্দিরাধিকারীদিগের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহার সার সংগৃহীত হইল :—

আমেরিকায় হিন্দু মত।

যে দর্শন শাস্ত্র জগতে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, আমেরিকায় তাহাই নূতন। সভ্যতার আরম্ভ কালে গঙ্গার ও সিন্ধুর প্রবাহপূত ভারতে যে তত্ত্বকথা আলোচিত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল—আমেরিকায় আজ তাহাই প্রচারিত হইতেছে।

প্রাচ্য হইতে ধর্ম্মের জ্যোতি প্রতীচ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন কালবশে আবার প্রাচ্য হইতে ধর্ম্মালোক প্রতীচ্যে প্রতিফলিত হইতেছে।

হিন্দু মন্দির।

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ বৈদিক তত্ত্বকথা প্রচারের জন্য আমেরিকায় সানফ্রান্সিস্কো নগরে হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার বেলুড়-মঠের রামকৃষ্ণ প্রচার মণ্ডলীর চেষ্টায় এই মন্দির ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের স্থপতিকার্য্য বিভিন্ন ধর্ম্মালয়ের বিশেষত্বব্যঞ্জক। প্রবেশ পথের ছাতে সহস্রদল পদ্মের প্রতিকৃতি। এই সহস্রদল পদ্ম মস্তিকের স্বরূপ—মনঃসংযোগে ও ধ্যানে ইহার বিকাশ। মন্দিরের উপর আমেরিকার জাতীয় চিহ্ন ঈগল পক্ষ বিস্তার করিয়া যেন অভয় দান করিতেছে। হিন্দুদিগের নিকট সকল কার্য্যেরই গুপ্ত উদ্দেশ্য বর্ত্তমান—সকল বস্তুতেই ভগবানের বিকাশ। হিন্দুদিগের নিকট ঈগল (গরুড়) অসীম শক্তি, অবিচলিত ভক্তি ও দ্রুত উন্নতি—এই তিনের চিহ্ন। মন্দিরের প্রতি স্তম্ভে কোন না কোন নিদর্শন সপ্রকাশ। মন্দিরের অলঙ্কার রূপে কল্পিত সূর্য্য, চন্দ্র, ত্রিশূল প্রভৃতি এক একটি ভাবের অভিব্যক্তি। মন্দিরটি ত্রিতল। নিম্নতলে শিক্ষাগার—এই সকল কক্ষে শিক্ষাপ্রদান ও বক্তৃতা হয়। মধ্যতলে ছাত্রাবাস। সর্ব্বোচ্চে বিহার। দুইজন "স্বামী" মন্দিরে বাস করিয়া শিক্ষাদান করেন।

শিষ্য।

স্বামীদিগের শিষ্যগণ সকলেই আমেরিকান্। ইঁহারা যে যাহার অবলম্বিত কার্য্য করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রচারকল্পে ব্যয় করেন। পরধর্ম্মাবলম্বীকে স্বীয়ধর্ম্মাবলম্বী করিবার চেষ্টা হিন্দুর স্বভাববিরুদ্ধ। ইঁহারা কেবল ধর্ম্মপ্রচার করেন। যাহার ইচ্ছা—এ ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে পারে। মঠে কয়জন মহিলাও বাস করেন। ইঁহাদিগের বাসস্থান স্বতন্ত্র। ইঁহারাও যে যাহার কার্য্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের জীবনযাপনপ্রণালী আড়ম্বরবর্জ্জিত—সুতরাং অত্যল্পব্যয়সাধ্য। জীবনাশে বীতস্পৃহা হেতু ইঁহারা ফলমূলাহারী। শিষ্যদিগের মধ্যে একজন পূর্ব্বে মুদ্রাকর ছিলেন—বর্ত্তমানে তিনি মঠের সমস্ত মুদ্রন কার্য্য করিয়া থাকেন।

মঠে।

মঠে প্রবেশ করিলে প্রথমেই মঠাধিকারী স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আগন্তুকের সহিত করমর্দ্দন করেন না। তিনি বলেন সম্প্রীতি হৃদয়ে। করমর্দ্দন আধ্যাত্মিক সম্ভাষণ নহে;—হইতে পারে না। তাঁহার পাঠাগারে বহু-পুস্তক-সজ্জিত কক্ষটি শোভন ভাবে সজ্জিত। এমারসন, সোপেনহিউর, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির রচনার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ।। তিনি কথা কহিতে কহিতে, কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে তাঁহাদিগের গ্রন্থ বাহির করিয়া আপনার বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দেন।

বেদান্ত।

বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনাকালে স্বামী ত্রিগুণাতীত বলেন, ইহা কোন দর্শন বা সংহিতামাত্র নহে; পরন্তু সর্ব্বদর্শনসার—সর্ব্ববিজ্ঞানসার। ইহা কাহারও রচনা নহে পরন্তু নিত্যবস্তু—অনাদি—অনন্ত। মানুষ এই বিশাল বিশ্বে আপনার স্থান নির্ণয়ে ব্যাকুল;—বেদান্ত সে স্থানের নির্ণয় করিয়া দেয়। যে সত্যসত্যই বেদান্তবাদী সে জগতে সকল বস্তুতেই ভগবানকে দর্শন করে। ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, লোভ আর তাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়া কলুষিত করিতে পারে না। জগতে সকল ধর্ম্মপ্রচারকই এই সত্যের প্রচারক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত বলেন, বাসনাবহ্নি প্রতীচ্য সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। প্রতীচ্য

বাসনা-বহ্নি।

দরিদ্র মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্নের, মধ্যবিত্ত ধনীর ও ধনী অতিধনীর অবস্থা পাইতে প্রয়াসী—ব্যাকুল। এই বাসনাবহ্নিতে তাহাদের মনুষ্যত্ব, আধ্যাত্মিক জীবন ধ্বংস হইয়া যায়। ইহাতে দেহ ও মন উভয়ই ব্যাধিগ্রস্ত হয়। প্রকৃত সভ্যতায় মানুষ এই বাসনা-বহ্নির দহনজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সংসাধন করিয়া চরম ও পরম গতি লাভ করে।

এ অবস্থার প্রতীকারের উপায় কি? স্বামীর মতে পথ প্রশস্ত। বাসনা-বহ্নিতে ইন্ধন দানেই

প্রতীকার।

তাহার শতশিখা প্রবল হইয়া উঠে। বাসনার নিবৃত্তিতেই শান্তিলাভ করা যায়। প্রতীচ্যে অনেকে পান, ভোজন ও বেশভূষা জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে করে। তাহারা ভ্রান্ত। তাহাদের ভ্রান্তির অপনোদন আবশ্যক। জীবনে সরলতাই চরম আদর্শ করিতে হইবে। বিলাসবর্জ্জিত জীবন যাপন করাই মনুষ্যের উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। এরূপ আদর্শের অনুসন্ধানের জন্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনবাস অনাবশ্যক। আত্ম-সংযমেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ প্রতীচ্যের বিলাসবহুল জীবনের আদর্শ লইয়া প্রাচ্যে খৃষ্টের ধর্ম্মকথা প্রচার করিতে গমন করেন। তাঁহারা বুঝেন না যে, খৃষ্ট স্বয়ং প্রাচ্যদেশসম্ভূত, অনাড়ম্বর—সরল জীবনে অভ্যস্ত। প্রাচ্যবাসীরা তাঁহার সেই আদর্শ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। জগতে যুগে যুগে অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কল্পে যে সকল বেদান্তবাদী শিক্ষকের আবির্ভাব হইয়াছে, খৃষ্ট তাঁহাদের এক জন। হিন্দুধর্ম্ম সমুদ্রের মত উদার। তাহার বিশাল বক্ষে সত্যমাত্রেরই স্থান আছে। যে যে উপায়েই মোক্ষ লাভের চেষ্টা করুক না কেন—লক্ষ্য একই। 'গীতায়' শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:-

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

এই উদারতাই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। এই উদারতাহেতুই হিন্দুধর্ম্ম পরিবর্ত্তনপ্লাবনে ভাসিয়া যায় নাই, কালবক্ষে অক্ষয় জ্যোতি বিকাশ করিয়া আছে। যদি এই উদারতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আবার সত্যধর্ম্ম দেশে দেশে প্রচারিত হয় তবে তাহার স্নিগ্ধ ছায়ায় বিবাদকোলাহল ভুলিয়া আবার মানবকুল শান্তি ভোগ করিতে পাইবে। আমেরিকায় এই ধর্ম্মের আদর কি সেইদিন সূচিত করিতেছে না?

খণ্ডগিরি।

—:•:—

খণ্ডগিরির সহিত আমার প্রথম পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। 'সীতারামে' খণ্ডগিরির সেই বর্ণনা আমার তরুণ হৃদয়ে অতীত-গৌরব-স্মৃতি-সমুজ্জ্বল একখানি মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। তখন যাহা স্বপ্ন ছিল এতদিনে তাহা বাস্তবে পরিণত হইল। পাঁচ মাইল পথ গোযানে অতিক্রম করিয়া দিবাবসানের কিছু পূর্ব্বে খণ্ডগিরিতে আরোহণ করিলাম। ত্রয়োবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে মানুষ কি প্রবল ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উত্তেজনায় পাষাণ কাটিয়া গুহা গঠিত করিয়াছিল! তাহারা কি অসাধারণ উৎসাহে ও উদ্যমে আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল! কি অস্ত্রে,—কি কলাকৌশলে তাহারা পাষাণবক্ষে আপনাদের মনোভাব স্থায়িরূপে অঙ্কিত করিয়াছিল! প্রস্তরগঠিত সোপনের ভগ্নাবশেষের উপর দিয়া উঠিবার সময় এই সকল কথাই মনে হইতেছিল। আর মনে হইতেছিল, হয়ত এমনই এক দিনান্তে কলিঙ্গাধিপতি—প্রবলপরাক্রম খারবেল কোন মুণ্ডিতশীর্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট অবনতমস্তকে মানবজীবনের নশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া নির্ব্বাণলাভকামনায় এই গুহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কে সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু যিনি ধর্ম্মের প্রভাবে স্পর্দ্ধিতরাজগর্ব্ব বিনম্রাবনত করিয়াছিলেন? ত্রয়োবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন; তিনি আজ বিস্মৃত। হস্তীগুম্ফার পাষাণপৃষ্ঠে ক্ষোদিত—বিস্মৃতির অন্ধকারে সমাচ্ছন্নপ্রায় যুগের লিপির দুই চারিটি অক্ষর যদি লিখিত না থাকিত বা কালবশে মুছিয়া যাইত তাহা হইলে নৃপতি খারবেলের নামও কেহ জানিতে পারিত না। ত্রয়োবিংশশতাব্দীপূর্ব্ববর্ত্তীদিগের কীর্ত্তির সহিত আজ আমার পরিচয়! আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমি আর কর্ম্মকোলাহলময় বিংশ শতাব্দীর মানব নহি; আমি ত্রয়োবিংশ শতাব্দীপূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সহিত নিভৃতে অনন্ত সমাধির আয়োজন করিতেছি। গুহা হইতে গুহান্তরে চলিলাম; স্তম্ভ, দ্বার, কারুকার্য্য, মূর্ত্তি—সব দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু দেখিয়া মনে যে ভাবের উদয় হইল, তাহা প্রকাশের ভাষা নাই।

খণ্ডগিরি ক্ষুদ্র পর্ব্বত। ইহার সানুদেশ হইতে চূড়া ১২৩ ফিট মাত্র উচ্চ। পর্ব্বতের এক অংশের নাম—খণ্ডগিরি। এই অংশে কয়টি প্রাচীন গুহা বিদ্যমান। সাধারণতঃ সমগ্র গিরিমালাকেই খণ্ডগিরি বলা হয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। উত্তরাংশের নাম—উদয়গিরি। এই উদয়গিরিতে উৎকীর্ণ লিপিবহুল বহু গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দক্ষিণাংশের নাম—ধবলগিরি

বা ধউলী। এইস্থানে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের অনুশাসনের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এককালে যে এইস্থানে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল গুহার কালনির্ণয় লইয়া বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে মতান্তর আছে। কিন্তু কিছুই স্থির হয় নাই।* বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। তবে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে—অর্থাৎ সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে যে এই প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল বন্যা বহিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল গুহার স্থাপত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; কেবল সাঁচী স্তূপের স্থাপত্যের সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যাহারা এই সকল গুহা রচিত করিয়াছিল তাহারা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তর স্থাপত্য জানিত কি না এবং কিরূপে তাহারা সে বিদ্যা শিক্ষা করে তাহা জানিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। কিন্তু কৌতূহলতৃপ্তির উপায় নাই।

যে শিল্পী গুহাখননোদ্দেশে সর্ব্বপ্রথম কম্পিতকরে খনিত্র ধারণ করিয়া প্রস্তর ছেদন করিয়াছিল, সে তখন আপনার শিল্পচাতুরী-বিকাশ-চেষ্টায় চেষ্টিত ছিল, কি ভিক্ষুদিগের আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ধন্য হইবার বাসনায় সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? ফার্গুসন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতে প্রস্তরস্থাপত্য আলেকজাণ্ডারের সহচরদিগের বা তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রীকদিগের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। কিন্তু মৃত মহাত্মাদিগের এই সকল মহীয়সী কীর্ত্তি দেখিলে সে মতে আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অনুশীলনে ও পরিচালনে

* পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তদীয় উড়িষ্যায় প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক বিরাট গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঐর নামক নৃপতি এই সকল গুহা খনন করাইয়াছিলেন। মিত্র মহাশয়ের মতে এই নৃপতির রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৩১৬ হইতে ৪১৬র মধ্যে। রাজার প্রতিদ্বন্দী মিষ্টার ফার্গুসন পণ্ডিত ইন্দ্রজীর ও অধ্যাপক বুলারের মতের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছিলেন, ঐ নৃপতির নাম খারবেল এবং তাঁহার রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ১৪৬—১৪৭। তিনি অনাবশ্যক অসংযত ভাষায় বলিয়াছেন, মিত্র মহাশয় পালীভাষায় অনভিজ্ঞতা হেতু প্রিন্সেপ কৃত ভ্রান্ত অনুবাদের অনুকরণ করিয়া ও কল্পনার আশ্রয় লইয়া এই ভ্রম করিয়াছেন। (Archaeology in India) মিষ্টার ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ তদীয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ফার্গুসনের গৃহীত মতই অবলম্বন করিয়াছেন; তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। (Early History of India) এস্থলে একটি কথা বলিবার আছে। মিত্র মহাশয়ের মতে ঐর মগধাধিপতি নন্দকে পরাজিত করেন; সুতরাং তিনি তাঁহার সমসাময়িক। তাহা হইলে ঐরের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৩২৫ হইতে ৩৪০ ইহারই মধ্যে। ইন্দ্রজীর ও বুলারের মতে রাজা খারবেল শিলালিপিতে নন্দের নামোল্লেখমাত্র করিয়াছেন; শিলালিপি মৌর্য্যাব্দের ১৬৫ সালে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৫৭ বা ১৫৬ সালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

পূর্ণতাপ্রাপ্ত কলাকৌশল ও আপনার ক্ষমতায় প্রত্যয় ব্যতীত কেহ এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। বরং রাজা রাজেন্দ্রলাল যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, ভারতীয় স্থাপত্য যত দিনেরই হউক না কেন ইহা যে স্বতঃ-অভিব্যক্ত, সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইহার নিয়ম স্বতন্ত্র, প্রকার স্বতন্ত্র। এই সকল গৃহাদি যাহারা নির্ম্মিত করিয়াছিল ও যাহাদের জন্য নির্ম্মিত করিয়াছিল এই স্থাপত্য তাহাদিগের বিশেষত্বব্যঞ্জক। ইহার দোষ ও গুণ ইহার নিজস্ব—উভয়ই বিদেশীপ্রভাববর্জ্জিত। স্থানভেদে ইহার রূপভেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল বস্তুর একত্ববিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজা রাজেন্দ্রলালের পুস্তক প্রকাশের তিন বৎসর পরে ফার্গুসন রাজাকে ও সঙ্গে সঙ্গে "নব্য বঙ্গকে" গালি দিয়া পুনরায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, ভারতীয় প্রস্তরস্থাপত্য অনুকরণমাত্র। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় নেপাল তেরাইয়ে কপিলাবস্তুর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথায় শাক্যসিংহের সমসাময়িক বা পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সৌধাদির ভগ্নাবশেষ ইষ্টক ও প্রস্তর এখনও রহিয়াছে। রাজেন্দ্রলালের মতে খণ্ডগিরির গুহাগুলি অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে—ঋগ্বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে সৌধের উল্লেখ আছে। কানিংহাম রাজগৃহে আবিষ্কৃত জরাসন্ধের বৈঠকের কথায় বলিয়াছেন, এই প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ হয়ত বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে নির্ম্মিত—অশোকের আবির্ভাব কালের অন্ততঃ সার্দ্ধ দুইশত বৎসর পূর্ব্বের। * ইহার পর আর ফার্গুসনের মত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস ও গ্রহণ করিবার উপায় নাই।

ত্রয়োবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় স্থপতিগণ শিলাগাত্রে আপনাদের প্রতিভার ও কলাকৌশলের যে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহার প্রাচীনত্বের মধ্যে অতি অভিনব নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। উদয়গিরির রাণী গুম্ফার ও গণেশ গুম্ফার গাত্রে তৎকালপ্রচলিত একটি গল্পের চিত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। দুই গুম্ফায় ক্ষোদিত ঘটনাবলীতে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও গল্পাংশ একই বোধ হয়। একজন রাজা পালঙ্কে শয়ন করিয়া কোন রমণীর (দুহিতা বা পত্নী—রাজেন্দ্রলাল বলেন, পত্নী) দ্বারা পদসেবা করাইতেছিলেন। এই সময় অন্য একজন রমণী পূর্ব্বোক্তা রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী একজন যুবককে তথায় আনয়ন করেন। রমণী যুবককে অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিলে দুইদলে যুদ্ধ আরব্ধ হয়। এই যুদ্ধে রমণীরাও

* Archaeological Survey of India, vol. III.

অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়ী হইয়া আগন্তুক রমণীকে লইয়া করিপৃষ্ঠে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। রমণী প্রথমে বিষন্ন ভাবে দিনযাপন করিতে থাকেন; পরে যুবকের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সুখে কালযাপন করেন। ত্রয়োবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বেও মানুষ রমণীরূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইত; তাহার জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিত! তখন রমণীরাও সতীত্বের ও সম্মানের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতেন! তখনও মানুষ এখনকারই মত রিপুতাড়না ভোগ করিত, জীবন-স্রোতে ভাসিয়া কাম্য বস্তুর অন্বেষণ করিত! তখনও প্রেম সর্ব্বজয়ী! এই প্রস্তর-শিল্প যেন অনন্তকালের জন্য ঘোষণা করিতেছে, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের চিত্তবৃত্তি একই পথে পরিচালিত। যাহা চিরন্তন, যাহা সত্য—তাহা অপরিবর্ত্তনীয়।

গুহাগাত্রে ক্ষোদিত চিত্র, বিলাসের, রূপের, ঐশ্বর্য্যের, ভোগের। আর এই গুহায় যাহারা বাস করিত তাহারা বিলাস ত্যাগ করিয়াছিল, রূপ তুচ্ছ জ্ঞান করিত, ঐশ্বর্য্য ঘৃণা করিত; তাহারা ত্যাগী। তাহারা নির্ব্বাণলাভপ্রয়াসী। প্রভাতঅরুণালোকে যখন তাহারা ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া পর্ব্বতপদে গৃহস্থের দ্বারে উপনীত হইত, তখন গৃহী সসম্ভ্রমে সেই ভিক্ষাভাণ্ড পূর্ণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত। তাহারা দীর্ঘ দিন ধর্ম্মালোচনায় ও সাধনায় অতিবাহিত করিত। দিবাবসানে গুহামুখে বসিয়া তাহারা ম্লানসূর্য্যালোকপ্লাবিত পশ্চিম গগনে কোন অজ্ঞাতজগতের আভাস পাইত? তাহা বুঝিবার শক্তি আমার নাই।

দেখিতে দেখিতে খণ্ডগিরির উপর সন্ধ্যার ধূসর অঞ্চল লুটাইয়া পড়িল। আমরাও বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কথা মনে করিতে করিতে খণ্ডগিরি ত্যাগ করিলাম:—"পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্যপুষ্পমাল্যাভরণভূষিত, বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সংমিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবন-ভারাবনতদেহা—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভি—

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু?"

Printed by S. C. Ghose at the Lakshmi Printing Works.
64/1 & 64/2 SUKEA'S STREET, CALCUTTA.



প্রজ্ঞা পারমিতা।

বিদুষী।

১

অপরাহ্নে আফিস হইতে ফিরিয়া ব্রজেন্দু আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোটের বোতাম খুলিতেছে এমন সময় দর্পণে পশ্চাতে দ্বারপথে প্রবেশমানা পত্নীর প্রতিবিম্ব দেখিয়া সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ততক্ষণে রমা স্বামীর নিকটে আসিয়াছে। রমা ষোড়শী—তাহার রূপসম্পদসম্পন্ন দেহে যৌবনের লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে; যেন ভাদ্রের ভরা নদীতে জুয়ার আসিয়াছে। তাহার অবগুণ্ঠন সরিয়া আসিয়া কালাপেড়ে কাপড়ের পাড় কবরীতে বাধিয়া ছিল; দুই কর্ণে দুইখানি হীরক জ্বলিতেছিল। ব্রজেন্দু যেন অত্যন্ত ভক্তি দেখাইয়া স্ত্রীকে নমস্কার করিল। রমা যেন অত্যন্ত রাগ দেখাইয়া বলিল, "অমন করিলে আমি আর আসিব না।" স্বামী যুবক—স্ত্রী ষোড়শী; সুতরাং প্রথম পক্ষের ভক্তি ও দ্বিতীয় পক্ষের রাগ কোনটাই যে প্রকৃত নহে, পরন্তু যৌবনসুলভ রহস্যপ্রিয়তার পরিচায়ক তাহা বলাই বাহুল্য।

ব্রজেন্দু বলিল, "রাগ করিলে চলিবে কেন? তোমাদিগের সম্মান না করিলে গৃহস্থের মঙ্গল নাই। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন;—

'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥'

অর্থাৎ, যে কুলে নারীগণের সম্যক সমাদর আছে, তথায় দেবতারা প্রসন্ন আছেন; আর যে পরিবারে তাঁহাদিগের পূজা নাই সে পরিবারের ক্রিয়াকর্ম্ম সবই বৃথা।"

রমা বলিল, "মনু বুঝি নারী অর্থে পত্নীর পূজার কথাই বলিয়াছেন?"

ব্রজেন্দু বলিল, "নিশ্চয়। মনু বলেন, গৃহে শ্রীতে ও স্ত্রীতে—অর্থাৎ লক্ষ্মীতে ও পত্নীতে প্রভেদ নাই।"

রমার নয়নে যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল। সে বলিল, "তুমি বুঝি 'মনু-সংহিতায়' আর কোন শ্লোক পাইলে না? কেন মনুই ত বলিয়াছেন;—

'নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥'

অর্থাৎ, নারীদিগের স্বামী ভিন্ন পৃথক যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই; কেবল পতিসেবায় তাহারা স্বর্গে গমন করে।"

এতক্ষণ দুই পক্ষেই হাসিতে হাসিতে কথা হইতেছিল। কিন্তু ব্রজেন্দু যখন দেখিল, রমা বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করিল, তখন যেন ব্যাপারটা একটু জটিল বোধ হইল। এ কি? রমা যখন শ্লোকের অর্থ বলিতেছিল, তখন ব্রজেন্দু অন্যমনস্ক—আর কি ভাবিতেছে। যেন কি বিস্মৃত কথা তাহার চিত্ত চঞ্চল করিতেছিল।

রমা তাহা লক্ষ্য করিল। সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

কিছুক্ষণ পরে রমা যখন স্বামীর জন্য খাবার লইয়া আসিল, তখন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রজেন্দু আরাম কেদারায় বসিয়াছে। তাহার মুখে একটু চিন্তার ভাব লাগিয়া আছে। সেটি ব্রজেন্দুর বসিবার ঘর, ঘরের একপার্শ্বে দুইটা আলমারী—পুস্তকে পূর্ণ; একপার্শ্বে একটা আয়নাওয়ালা ছোট দেরাজ ও একটা আলনা; মধ্যস্থলে টেব্‌ল, ঘরে আর একখানি আরাম কেদারা ও তিনখানি সাধারণ কেদারা। রমা দক্ষিণ হস্তে ধৃত গেলাসটি টেব্‌লে ব্লটিং প্যাডের উপর রাখিল, তাহার পর বামকরে ধৃত শ্বেত প্রস্তরের থালাখানি দক্ষিণ হস্তে লইয়া আরাম কেদারার একটা হাতার উপর রাখিল। তাহার পর সে গেলাসটি তুলিয়া সযত্নে অঞ্চলে তাহার গাত্র মুছিয়া কেদারার অপর হাতাটার উপর রাখিল।

রমা যাইতেছে দেখিয়া ব্রজেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় পলাইতেছ?"

রমা বলিল, "বড় গরম। পাখা আনিতে যাইতেছি।"

"না। আবশ্যক নাই।"

রমা ফিরিয়া আসিল।

ব্রজেন্দু ফলাহার শেষ করিয়া মিষ্টান্নে হাত দিয়া বলিল, "তুমি সংস্কৃত জান?"

রমা বলিল, "হাঁ।"

"কই আমি ত জানিতাম না।"

রমা দুষ্ট হাসি চাপিয়া বলিল, "আমি শিখিয়াছি।"

ব্রজেন্দু বলিল, "এত উৎসাহ?"

"তুমি লিখাপড়া জানা স্ত্রী ভালবাস বলিয়া।"

কথাটা উড়াইয়া দিবার জন্য ব্রজেন্দু হাসিয়া বলিল, "এ সংবাদটি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলে?"

রমার চঞ্চল নয়নে দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল, সে বলিল, "ঠাকুরঝি আমাকে সব বলিয়াছেন।"

ব্রজেন্দুর ভগিনী পূর্ব্বদিন ভ্রাতার গৃহে আসিয়াছিল। সে একটা অকিঞ্চিৎকর

—বিস্মৃতপ্রায়—অনাবশ্যক কথার উত্থাপন করাতে ব্রজেন্দু মনে মনে স্ত্রীবুদ্ধির অনেক নিন্দা করিল; মনে মনে বলিল, "মেয়েদের একটা কথা না বলিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই।"

কথাটা সে অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যক মনে করিল বটে, কিন্তু তাহারই উত্থাপনে তাহার মন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

২

জগতে কোন কোন লোককে দেখিয়া মনে হয়, বেগবান্ রেলগাড়ী যেমন তাহারই জন্য নির্ম্মিত বিঘ্নবিহীন পথে অবাধে দ্রুত চলিয়া যায়—তাহারা তেমনই বিঘ্নবিহীন জীবন-পথে অগ্রসর হয়; অদৃষ্ট সযত্নে ও সাগ্রহে তাহাদিগের পথ হইতে সকল বাধা বিঘ্ন সরাইয়া রাখেন। ব্রজেন্দু সেই শ্রেণীর লোক। বিপদের ঝঞ্ঝাবাত, দারিদ্র্যের করকাঘাত, অসাফল্যের অশনিপাত—তাহাকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই।

তাহার পিতা হুগলীতে ওকালতী করিতেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহারই মধ্যে তিনি যে সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র ব্রজেন্দুর দারিদ্র্য-দুঃখভোগের সম্ভাবনামাত্র ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ববৎসর তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পরবৎসর ব্রজেন্দু প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় ও উত্তীর্ণ হয়। তাহার পর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নি-পরীক্ষায় সে বরাবরই উত্তীর্ণ হইয়াছে;—কেবল উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিলে যথেষ্ট হয় না, কারণ তাহার সাফল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ও পুরস্কারে ভারাক্রান্ত ও সমুজ্জ্বল হইয়াছিল।

সে যখন বি. এ. পড়ে তখনই তাহার জননী তাহার বিবাহ দিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দু পাঠ শেষ না করিয়া বিবাহ করিবে না বলায় তাহা হয় নাই। মা পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কায করিতেন না। এই মাতাপুত্রের স্নেহসম্বন্ধ যেন সাধারণ স্নেহসম্বন্ধ হইতেও নিবিড় ও মধুর হইয়াছিল।

সে বি.এ. পাশ করিয়া অধ্যয়ন শেষ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিতে চাহিল। কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে মাতাপুত্রে সেই বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল। শেষে ব্রজেন্দু বলিল, "হয় আমি নিত্য কলিকাতায় গতায়াত করি, নহে ত কলিকাতায় একটা বাসা লই—তুমিও চল।"

মা বলিলেন, "তোমার নিত্য গতায়াত চলিবে না। অত পরিশ্রম করা অনাবশ্যক। আর আমিও নিত্য তোমার জন্য ঘর আর বাহির করিতে পারিব

না। বাড়ী ছাড়িয়া যাইলে অনেক ক্ষতি। কিন্তু আমি না যাইলে তোমার অসুবিধা হইবে। অতএব চল, একটা বাসা লইয়া দুইজনেই কলিকাতায় যাই।"

বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিল ;—শুনিয়া মা বলিল, "বোধ হয় সুরমা আসিল।"

নিম্নে বালকণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"মামা বাবু!"

মাতাপুত্র নিম্নে যাইলেন।

সেদিন রবিবার—ছুটী। ব্রজেন্দুর ভগিনীপতি পত্নীপুত্রকন্যা লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন।

৩

মাতাপুত্রে কলিকাতায় যাইবার যে কথা হইয়াছিল মা জামাতা মহিমচন্দ্রকে তাহা বলিলেন।

শুনিয়া মহিমচন্দ্র বলিলেন, "বাড়ীতে তালাবন্ধ করিয়া যাইলে সব নষ্ট হইবে।"

মা বলিলেন, "কিন্তু নিত্য গতায়াতে বড় অসুবিধা।"

"নিত্য গতায়াত করা কেন? ব্রজেন্দু কলিকাতায় থাকিবে। শনিবারে শনিবারে সে বাড়ী আসিবে ; আবশ্যক হইলে অন্য দিনও আসিবে।"

"কখন একা দূরে থাকে নাই।"

"একা থাকিবে কেন? আমি কলিকাতায় থাকিতে ব্রজেন্দু কি 'মেসে' যাইবে?"

ব্রজেন্দু তথায় ছিল। মহিমচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "কি হে, আমার কি জাতি গিয়াছে যে, তুমি আমার বাড়ী যাইয়া থাকিবে না?"

এ কথাটা ব্রজেন্দুর বা তাহার মাতার মনে হয় নাই। মহিমচন্দ্রের কথায় উভয়েই লজ্জা বোধ করিলেন। ব্রজেন্দু হাসিয়া বলিল, "নিমন্ত্রণ না করিলেই যাইব?"

ইহার পর মহিমচন্দ্র ও সুরমা উভয়ে এ বিষয়ে এমন আন্দোলন উপস্থিত করিলেন ও সুরমা মা'র ও দাদার উপর এত অভিমান করিতে লাগিল যে, ব্রজেন্দুর বা তাহার মাতার কোনরূপ যুক্তিতর্কের অবকাশ রহিল না।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে মহিমচন্দ্র সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা ফিরিবার পূর্ব্বে স্থির হইয়া গেল, ব্রজেন্দু কলিকাতায় আসিয়া ভগিনীর গৃহে অধিষ্ঠিত হইবে এবং মা বাড়ীতেই থাকিবেন।

এদিকে বাড়ীতে সেইরূপ ব্যবস্থার আয়োজন হইতে লাগিল এবং মা'র নিকট থাকিবার জন্য কোন দূর আত্মীয়ার সন্ধান করা চলিতে লাগিল।

৪

যথাকালে ব্রজেন্দু ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইল এবং অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইল।

মা কন্যাজামাতাকে পুত্রের বিবাহসম্বন্ধ দেখিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। সুরমাও ঘটকীদিগকে পাত্রীর সন্ধান আনিতে বলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সে ভ্রাতার জন্য 'ডানাকাটা পরীর' সন্ধান করিতেছিল; তাই সহজে মনোমত সম্বন্ধ জুটিতেছিল না। ঘটকীদের গতায়াতে ব্রজেন্দু বিরক্ত হইয়া ভগিনীকে একদিন বলিল, "তুই কি করিতেছিস? আমি কিছুতেই এখন বিবাহ করিব না।"

সুরমা বলিল, "দাদা, মা তোমার কথায় এতদিন জিদ করেন নাই। কিন্তু তোমার ত বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। মা'কে কে দেখে? আমি বিদেশে; সংসারে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যে, দুই দিন যাইয়া মা'র কাছে থাকি। এই এখন—মা কেমন করিয়া একা আছেন, ভাবিয়া দেখ দেখি? আর তোমার বিবাহ না করা চলে?"

ব্রজেন্দু ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। সে বলিল, "আমি বিবাহ করিব না, এমন কথা বলি নাই—বলিতেছি না। আর একবৎসর হইলে আমার পঠদ্দশার শেষ হয়; শেষ হইলে আমি বিবাহ করিব, তৎপূর্ব্বে নহে।"

সুরমা বলিল, "কালইত আর তোমাকে বিবাহ করিতে কেহ বলিতেছে না। সম্বন্ধ দেখা চলুক। মনের মত সম্বন্ধ আসিলে তবে কথা হইবে।"

ইহার পর সুরমা দাদার জন্য পাত্রীর সন্ধান করিতে লাগিল। ব্রজেন্দু সে দিকে মন দিল না। সে আপনার অধ্যয়ন লইয়া ব্যাপৃত রহিল। বাস্তবিক এরূপ ব্যাপার লইয়া অধিক বিচলিত হওয়া ব্রজেন্দুর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। সে জীবনে কখন দুশ্চিন্তার যাতনা, অসাফল্যের বেদনা—ভোগ করে নাই। তাহার স্বাস্থ্য অটুট, শরীর সবল, সাফল্য অনাহত; তাহার জননী স্নেহশীলা, ভগিনী স্নেহময়ী, ভগিনীপতি সহোদরোপম; তাহার আর্থিক অবস্থা উত্তম, সাংসারিক অবস্থা অনেকের ঈর্ষ্যার বিষয়, সে নিজগুণে সকলের প্রিয়। এ অবস্থায় তাহার পক্ষে জীবন সুখময়—কবিত্বময় মনে করাই স্বাভাবিক। অকারণে বা সামান্য কারণে সে অধিক বিচলিত বা বিব্রত হইবে কেন?

ব্রজেন্দু আপনার অধ্যয়ন লইয়া ব্যস্ত রহিল।

এমনইভাবে প্রায় এক বৎসর কাটিল।

৫

এই সময় একটা অতর্কিত উপসর্গ উপস্থিত হইল। মহিমচন্দ্রের বাড়ীর ঠিক পার্শ্বের বাড়ীতে একজন নূতন ভাড়াটিয়া আসিলেন। মহিমচন্দ্রের গৃহে যে কক্ষে ব্রজেন্দু থাকিত—পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের যে কক্ষটি তাহার সম্মুখীন সেই কক্ষ একটি কিশোরী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। দুই কক্ষের মধ্যে দুইটি অলিন্দমাত্র ব্যবধান। ব্রজেন্দু স্বাভাবিক ভদ্রতাহেতু সে কক্ষের দিকে চাহিত না; কিন্তু সময় সময় কিশোরীর মূর্ত্তি যে তাহার নয়ন-পথের পথিক হইত না, এমন নহে। আর তাহার কক্ষে বসিয়া ব্রজেন্দু শুনিতে পাইত, কিশোরী একাকী বিশুদ্ধ উচ্চারণে 'রঘুবংশ' বা 'কুমার-সম্ভব', 'রামায়ণ' বা 'শকুন্তলা' পাঠ করিতেছে; তাহার সুমধুর কণ্ঠস্বর যেন সেই সকল রচনায় নবীন জীবন সঞ্চার করিতেছে। কখন বা সে শুনিত কিশোরী ইংরাজ শিক্ষয়িত্রীর নিকট টেনিসনের কবিতা পাঠ করিতেছে :—

"Woman is the lesser man, and all thy passions, match'd with mine,
Are as moonlight unto sunlight, and as water unto wine."—

নারী কভু পুরুষের তুল্য নাহি হয়;
মোর বৃত্তি তুলনায় তব বৃত্তিচয়—
দিবাকরদ্যুতি আর চাঁদের কিরণ,
অথবা মদিরা আর সলিল যেমন।

অধ্যয়নে অসাধারণ অনুরাগ ব্রজেন্দুকে কিশোরীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেই অধ্যয়ন-অনুরাগ ব্রজেন্দুর নিকট অপরিচিতাকে অপূর্ব্ব লাবণ্যে শোভিত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রজেন্দুর কল্পনা তাহাতে সকল গুণের আরোপ করিত।

ব্রজেন্দু সরলভাবে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে শিখিয়াছিল—মনের ভাব গোপন করিতে শিখে নাই। বিশেষ এই কিশোরীর অধ্যয়ন-স্পৃহার প্রশংসায় যে কেহ আর কোন ভাবের আরোপ করিতে পারে, সে তাহা মনেও করিতে পারে নাই। সে সুরমার নিকট কিশোরীর প্রশংসা করিত। দুইচারিদিন ভ্রাতার মুখে কিশোরীর প্রশংসা শুনিয়া সুরমা একদিন স্বামীকে সে কথা বলিল।

মহিমচন্দ্র পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া পত্নীর নিকট ব্রজেন্দুর এই প্রশংসার বিষয় সব অবগত হইলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন "লক্ষণ ভাল নহে।"

সুরমা স্বামীর ভাব দেখিয়া কিছু শঙ্কিতা হইল ; জিজ্ঞাসা করিল "কেন ?"

মহিমচন্দ্র সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এখন রোগ কঠিন হইবার পূর্ব্বেই ঔষধ দিতে হইবে।"

সুরমা আরও শঙ্কিতা হইল ; বলিল, "কেন ? তোমার কি মনে হইতেছে ? কি করিবে ?"

পত্নীর শঙ্কা দেখিয়া মহিমচন্দ্র হাসিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন,—"যুবকের কল্পনা-বিহগ অধিক দূর উড়িবার পূর্ব্বে পরিণয়-ছুরিকার দ্বারা তাহার পক্ষ দুইটি কাটিয়া দিতে হইবে, যুবক ভাবস্রোতে ভাসিয়া যাইবার পূর্ব্বে পরিণয়-রজ্জু দিয়া তাহার গলদেশে পত্নীরূপ পূর্ণ কলস বাঁধিয়া দিতে হইবে।"

এবার সুরমাও হাসিল। সে বলিল, "অত ভয় কেন ?"

"ভরসাই বা কোথায় ? যে বয়সে মানুষ ভালবাসিতে ও ভালবাসা পাইতে অভিলাষী হয়, ব্রজেন্দুর সে বয়স হইয়াছে। বিবাহটা দিয়া ফেলিলেই নিশ্চিন্ত।"

"কিন্তু পরীক্ষা না দিয়া দাদা বিবাহ করিতে চাহে না।"

"পরীক্ষার ও বিশেষ বিলম্ব নাই। এখন এ উপসর্গটার কি করা যায় ?"

সেই দিন হইতে সুরমা ঘটকীদিগকে বিশেষ তাগাদা দিতে আরম্ভ করিল।

৬

যে উপসর্গের জন্য মহিমচন্দ্র চিন্তিত হইয়াছিলেন, সে উপসর্গ যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল তেমনই অতর্কিত ভাবে অন্তর্হিত হইল। পার্শ্বের বাড়ীর ভাড়াটিয়াটি বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইলেন। তিনি যে তিন মাসের কিছু অধিককাল সে পল্লীতে ছিলেন সে সময়ের মধ্যে কাহারও সহিত মিশেন নাই। কাযেই কেহ তাঁহার গমনে দুঃখিত হইল না। কেবল ব্রজেন্দু যেন কিসের অভাব অনুভব করিল।

সুখের বিষয় তখন তাহার পরীক্ষার সময় সমাগত। সে অধ্যয়ন লইয়া ব্যস্ত ; সে অভাব বিশেষ রূপ অনুভব করিবার সময় পাইল না।

৭

এদিকে একটি মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাইয়া—পাত্রী দেখিয়া মহিমচন্দ্র শাশুড়ীকে সে সম্বন্ধের কথা বলিয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

শাশুড়ী বলিলেন, "তুমি যখন দেখিয়া পসন্দ করিয়াছ, তখন আমার আর অমত কি ? আমার অন্য কোন কথা নাই, কেবল মেয়েটি ভাল বংশের হয়।"

মহিমচন্দ্র বলিলেন, "সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এরূপ ঘর, এরূপ পরিবার সচরাচর দেখা যায় না!"

ব্রজেন্দুর পরীক্ষা শেষ হইলে মহিমচন্দ্র একবার তাহাকে পাত্রী দেখিতে বলিলেন। ব্রজেন্দু বলিল, "তুমি কি আমাকে পাগল পাইয়াছ?"

মহিমচন্দ্র বলিলেন, "কেন? তাহাতে দোষ কি?"

"দোষ না থাকিতে পারে; আবশ্যকও নাই। তুমি দেখিয়াছ; মা মত করিয়াছেন; আবার কেন?"

সে কিছুতেই পাত্রী দেখিতে সম্মত হইল না।

রমার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের কয়দিন পরেই পরীক্ষার ফল বাহির হইল—পরীক্ষায় ব্রজেন্দু সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার এক মাস পরে একটি বিশেষ পরীক্ষা দিয়া ব্রজেন্দু মাসিক দুইশত টাকা বেতনের একটি সরকারী চাকরী গ্রহণ করিল।

৮

ব্রজেন্দুর বিবাহের ছয় মাস পরে একবার পিত্রালয়ে আসিয়া সুরমা বলিল "দাদা, তুমি মেয়েদের লিখাপড়াজানা ভালবাস; বৌর লিখাপড়া শিখিবার ব্যবস্থা কর।"

ব্রজেন্দু বলিল, "কে তোকে বলিল, আমি মেয়েদের বিদ্যাদিগ্‌গজ হইতে বলি?"

"নহিলে আমাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীর ভাড়াটিয়াদের সেই মেয়েটির অত প্রশংসা করিতে কেন?"

"একটি ছোট মেয়ে, পড়িতে ভালবাসিত। তাহার প্রশংসা করিলে কি ইহাই বুঝায় যে, আমার ইচ্ছা সকল স্ত্রীলোক বিদ্যাচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিবে?"

সুরমা আর দাদার সঙ্গে তর্ক করিল না বটে, কিন্তু কলিকাতায় ফিরিয়া সে রমাকে তাহার পিত্রালয়ে যে পত্র লিখিল, তাহাতে তাহাকে লিখাপড়া করিতে পরামর্শ দিল।

এদিকে ব্রজেন্দু ভগিনীকে যাহাই বলুক তাহার কথায় লজ্জিত হইল। সে যে একদিন অসম্ভব আদর্শের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল. এবং সেই আদর্শেই সুখলাভের আশা করিয়াছিল ইহাতে সে লজ্জিত হইল। তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইবার সময় হইতেই সে সেই "অসম্ভব আদর্শ" পরিহার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল।

সে আপনাকে আপনি বুঝাইয়াছে, গৃহই যাহার কর্ম্মক্ষেত্র—তাহার পক্ষে জগতের বিশাল সাহিত্যের সহিত পরিচয় থাকে ভালই, না থাকে ক্ষতি নাই। তাহার জননী ও ভগিনী বিদুষী নহেন; কিন্তু সেজন্য দুই পরিবারে কখন কোন অসুবিধা ঘটে নাই। তবে সে কেন রমার অভিপ্রায় না জানিয়াই তাহাকে বিদুষী করিবার চেষ্টায় "সুস্থ শরীর ব্যস্ত করিবে?" তাহার এই চেষ্টা যে তাহার হৃদয়ে বিদুষীর আদর্শের অস্তিত্বজ্ঞাপক তাহা বলাই বাহুল্য।

৯

তাহার পর রমা স্বামীগৃহে আসিল। সে সহজেই শাশুড়ীর স্নেহ অধিকার করিয়া বসিল, এবং সংসারের সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার সহকারী হইয়া উঠিল। ব্রজেন্দু আফিসে চলিয়া যাইলে সুদীর্ঘ দিন—সে শাশুড়ীকে 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'হরিবংশ' পড়িয়া শুনাইত; দুইজনে কত গল্প—কত কথা হইত। অত্যল্পকালমধ্যে এমনই দাঁড়াইল যে, রমাও যেমন পিত্রালয়ে যাইয়া অধিক দিন থাকিতে পারিত না, তাহাকে ছাড়িয়াও তেমনই তাহার শাশুড়ী অধিক দিন থাকিতে পারিতেন না। ইহাতে ব্রজেন্দুর আনন্দের আর সীমা ছিল না। রমা যে তাহার জননীকে সুখী করিতে পারিয়াছে ইহাতে সে পরম পুলকিত হইয়াছিল।

এদিকে রমাকে ভালবাসিয়া ও রমার ভালবাসা লাভ করিয়া ব্রজেন্দু আর কোন অভাবই বোধ করিত না। তাহার মনে হইত, তাহার সুখে কোথাও কোন অসম্পূর্ণতা নাই।

সুরমা যখনই পিত্রালয়ে আসিত তখনই রমাকে লিখাপড়া করিতে বলিত। রমা শ্বশুরালয়ে আসিবার বর্ষাধিককাল পরেও একবার পিত্রালয়ে আসিয়া সুরমা সে কথা বলিলে মা বলিলেন, "সংসারের অর্দ্ধেক কাযইত রমা করে। আবার আমাকে পড়িয়া শুনায়। আর কখন লিখাপড়া করিবে? আর ব্রজেন্দুত কোন দিন পড়ার কথা বলে নাই?"

সেই দিন সুরমা তাহার বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীর ভাড়াটিয়া সেই কিশোরীর অধ্যয়নস্পৃহা সম্বন্ধে ব্রজেন্দুর প্রশংসার কথা বলিল।

তাহার ফলে পরদিন স্বামিস্ত্রীতে যে কথোপকথন হইয়াছিল গল্পের আরম্ভে তাহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

১০

সেই দিন রাত্রিকালে ব্রজেন্দু আবার রমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সংস্কৃত শিখিলে কবে?"

রমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঠাকুরঝি বলিয়াছেন, তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীতে একজন বিদুষী কিশোরীর অধ্যয়নস্পৃহা লক্ষ্য করিয়া তুমি তাহাকে ভালবাসিয়াছিলে ; তাহা শুনিয়া আমি বিদুষী হইবার চেষ্টা করিতেছি।"

ব্রজেন্দু একটু চাঞ্চল্যব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "আমি কখনও তাহাকে ভালবাসি নাই।

রমা পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাহাকে ভালবাসিলেও ক্ষতি ছিল না। আর কাহাকেও ভালবাসিলে আমি ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া মরিতাম।"

রমার কথা ব্রজেন্দুর নিকট প্রহেলিকার মত বোধ হইতে লাগিল। সে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে পত্নীর মুখে চাহিল।

রমা বলিল, "আমিই সেই।"

ব্রজেন্দু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?"

"বাবা স্বয়ং আমাকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী পড়াইতেন। বাবা বদলী হইলে আমি কাকার কাছে বাঙ্গালা ও শিক্ষয়িত্রীর কাছে ইংরাজী পড়িতাম। সেই সময় আমাদের বাড়ীতে একটি ভৃত্যের বসন্ত হইলে আমরা প্রায় তিন মাস ঠাকুরঝির বাড়ীর পার্শ্বের বাড়ীতে ভাড়াটিয়া ছিলাম।"

ব্রজেন্দুর মুখ হইতে গাম্ভীর্য্যের ছায়া সরিয়া গেল। সে হাসিল। তাহার পর সে বলিল, "তখন বোধ হইত, অধ্যয়নই তোমার নেশা, এখন আর পড় না?"

রমা হাসিয়া স্বামীকে দেখাইয়া বলিল, "তাহারপর যে নেশা জুটিল পূর্ব্বের নেশার তুলনায় তাহা—as moonlight unto sunlight (চাঁদের কিরণ আর দিবাকরদ্যুতি)।" এবার ব্রজেন্দুর আর সন্দেহ রহিল না। এযে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর!

ব্রজেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আর বই ভাল লাগে না?"

রমা বলিল, "না।"

"তবে কি ভাল লাগে?"

রমা স্বামীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "তোমাকে।"

ব্রজেন্দু হাসিতে হাসিতে চুম্বনের পর চুম্বনে রমার মুখ প্লাবিত করিয়া দিল ; বলিল, "বিদুষী অপেক্ষা প্রেয়সী অনেক ভাল।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

পাষাণের কথা।

(২)

পরদিন প্রাতে, পূর্ব্বে যে বৃদ্ধ ভিক্ষুর কথা বলিয়াছি, তিনি আসিয়া নগরের প্রধান ব্যক্তিগণকে প্রান্তরে সমবেত করিলেন। পরে ক্রমশঃ রাজা ও তদ্বংশীয় ব্যক্তিগণও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর বৃদ্ধ সেই জনসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"আমি ত্রিংশদ্বর্ষ পূর্ব্বে আমার জন্মভূমি মগধ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। বাল্যকালে আমি মহারাজ প্রিয়দর্শীকে রাজগৃহের পথে দেখিয়াছি ; কিন্তু সে কথা আমার ভাল স্মরণ হয় না। যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন ও যে ধর্ম্মের জন্য তিনি বৃদ্ধাবস্থায় গিরিব্রজের বনমধ্যে বাস করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্ম তখন বিশেষ সমাদৃত। তখন পূর্ব্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে পশ্চিমে কপিশা পর্য্যন্ত ও উত্তরে খশদেশ হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত সে ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ন। তাঁহার চেষ্টায় যে প্রবল ধর্ম্মলিপ্সা সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত দেশবাসী জনসাধারণের মধ্যে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই জন্য বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ধর্ম্মাশোকের মৃত্যুর পর দশরথ, সঙ্গত, শালিশক প্রভৃতি রাজগণ তাঁহার সযত্ন-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমকোণে গান্ধার, উদ্যান, কপিশা, বাহ্লীক প্রভৃতি প্রদেশে এই ধর্ম্মের এতদূর উৎকর্ষসাধন হইয়াছিল যে, বিজেতা যবনগণও আসিয়া তথাগতের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে যবন রাজা অন্তর্ব্বেদী অতিক্রম করিয়া সাকেত অবরোধ করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা শতবর্ষপূর্ব্বে, স্বর্গগত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের শ্বশুরবংশের অধীনে বাহ্লীক ও কপিশার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যে আন্তীয়োক সপ্তসিন্ধু বিজয় করিতে আসিয়া সৌভাগ্যসেনের নিকট হইতে পঞ্চশত সংখ্যক হস্তিযূথ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারই সময়ে ঐরাণে পারদগণ ও বাহ্লীকে বিদ্রোহী যবনগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। ক্রমে শক জাতির তাড়নায় ইহারা পূর্ব্বদিকে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। বাহ্লীকের যবনরাজ্যের অভ্যুত্থানের সহিত গান্ধারে ও উদ্যানে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের মর্য্যাদাহানি আরব্ধ হইয়াছে। ইহাই মৌর্য্যরাজবংশের ও সদ্ধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত। বাল্যে আমি হিরণ্যবাহুতীরে পাষাণনির্ম্মিত কুক্কুটপাদবিহারে বাস করিতাম। তখন শ্রমণাচার্য্যগণ ঐরাণ, বাবিরুষ,

নীনা ও যবনদ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে সদ্ধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। তখন নগরে প্রতিদিন মহোৎসব হইত। সদ্ধর্ম্মের সেরূপ উন্নতির দিন আর বোধ হয় আসিবে না। ধর্ম্মের এরূপ দুরবস্থা চিরকাল ছিল না, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য আমি এই শতবর্ষের পুরাতন কাহিনীর পুনরবতারণা করিতেছি। তখন শ্রমণ দেখিলে আবালবৃদ্ধ, উচ্চ নীচ সকলেই নতশীর্ষ হইত। পশ্চিমে নগরহার, পুরুষপুর ও তক্ষশিলা, দক্ষিণে উজ্জয়িনী, বিদিশা, ও পূর্ব্বে চম্পা, পুলিন্দ প্রভৃতি স্থান হইতে শিক্ষার্থিগণ পাটলীপুত্রে আসিত। আমি যৌবনে তাহাদিগের সহিত কপোতিক, পারাবত, কুক্কুটপাদ, মহাকাশ্যপীয়, মহাশাঙ্খিক প্রভৃতি বিহারে একত্র শিক্ষালাভ করিয়াছি। তখন শ্রমণ ও ভিক্ষুগণ প্রবাসে যাইতে হইলে অন্ধকারের আশ্রয়ে বনান্তরালের পথ গ্রহণ করিতেন না; পরন্তু বঙ্গ হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত রাজপথ বৌদ্ধগণের ব্যবহার্য্য ছিল। ইহা কল্পনা নহে। যে ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মাশোকের শাসনকালে যজ্ঞকালীন পশুবধ হইতে রাজভয়ে বিরত হইয়াছিল, যাহাদিগকে প্রিয়দর্শী দেবপদচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহারা ক্রমশঃ সোমশর্ম্মণ, শতধন্বা প্রভৃতি দুর্ব্বল রাজগণের রাজত্বে পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিতে লাগিল। মৌর্য্যসাম্রাজ্য ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্ব্বে সৈন্যমধ্যে অহিচ্ছত্রবাসী মিত্রোপাধিধারী সুঙ্গবংশ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তর্ব্বেদীর উত্তরস্থ প্রাচীন অহিচ্ছত্রনগরী ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। পুরুষপরম্পরায় শুনিয়া আসিয়াছি যে, অহিচ্ছত্রনগরে বা মণ্ডলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রভাব অক্ষুন্ন, তথায় তথাগতের ধর্ম্মের স্থান নাই। সুঙ্গবংশীয়গণ ব্রাহ্মণগণের শিষ্য ও সদ্ধর্ম্মের বিরোধী। যে দিন পাটলীপুত্রনগরপ্রাকারের বাহিরে বিশ্বাসঘাতক পুষ্যমিত্র বলদর্শন ব্যপদেশে শেষ মৌর্য্যরাজা বৃহদ্রথকে সংহার করিল, প্রাচীন ভিক্ষু বা যতিমাত্রই সেই দিন বলিয়াছিলেন যে, এতদিনে সদ্ধর্ম্মের শুভদিনের অবসান ও দুর্দ্দিনের সূচনা হইল। কে জানিত দশ বৎসরের মধ্যে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সহিত মাগধসঙ্ঘেরও বিলোপ হইবে? বৃহদ্রথের মৃত্যুর অত্যল্পকাল মধ্যে দুষ্ট ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় নাগরিকগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে নাগরিকগণের উন্নতির ও শিক্ষার জন্য আমরা জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, সেই কৃতঘ্নগণই আমাদিগের ধ্বংসসাধনে তৎপর হইল। যে কারণে আমি মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া—পুণ্যক্ষেত্র মগধ ত্যাগ করিয়া—মহাকোশলের অরণ্যমধ্যে তোমাদিগের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, সেই কারণেই নগরহারবাসী জনৈক ভিক্ষু তথাগতের ভিক্ষাপাত্র লইয়া পুরুষপুর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাক্যরাজপুত্রের উষ্ণীষ কোথায় গিয়াছে তাহার সন্ধান

পাওয়া যায় না। সযত্ন-সংগৃহীত বুদ্ধদেবের ভস্মরাশি পাটলীপুত্রের রাজপথের ধূলিরাশির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। কপোতিক সঙ্ঘারামের মহাস্থবিরের ছিন্নশীর্ষ দক্ষিণনগরদ্বারে কীলকবদ্ধ হইয়া আছে।

মগধে সদ্ধর্ম্মের নাম—তথাগতের নাম লোপ পাইয়াছে। যাহারা এখনও বুদ্ধের নাম স্মরণ করিয়া থাকে, দশশীল বিস্মৃত হয় নাই, ভিক্ষু ও শ্রমণগণকে ভক্তি করে তাহারাও প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয়ে আছে। সদ্ধর্ম্মের লোপের সহিত স্তূপ, গর্ভচৈত্য, বিহার, সঙ্ঘারাম প্রভৃতিরও লোপ হইতেছে। উপাসক-উপাসিকা, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, স্থবির-স্থবিরাগণের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তথাগতের ধর্ম্ম সাধারণ লোকে ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতেছে, এখনও যাঁহাদের স্মরণ আছে তাঁহারাও মন্দিরবিহারাদির অভাবে যথারীতি উপাসনা করিতে পারেন না। মথুরা হইতে পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত ও শ্রাবস্তী হইতে বিদিশা পর্য্যন্ত বৌদ্ধ মন্দির, বিহার প্রভৃতির চিহ্নও দেখা যায় না। আমি বিংশতিবর্ষকাল চেষ্টাকরিয়া এই নগরে বিদিশার সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের ভস্মস্তূপের অনুরূপ, একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদিগের সংখ্যার এত হ্রাস হইয়াছে যে একটি স্তূপ নির্ম্মাণের ব্যয় সংগ্রহের জন্য আমাকে পাটলীপুত্র হইতে বিদিশা পর্য্যন্ত সকল নগরবাসীরই সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। যখন পুষ্যমিত্রের অত্যাচারে মগধ ত্যাগ করিয়া মহাকোশলে আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন তোমাদিগের বর্ত্তমান রাজার পিতা অগরাজু সিংহাসনে আসীন ছিলেন। চিরকাল এই রাজবংশ তথাগতের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, সদ্ধর্ম্মের এই দারুণ দুর্দ্দিনেও ইহাঁদিগের বিশ্বাস অচল রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকের উৎপীড়িত প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের একমাত্র আশ্রয় স্থল এই রাজ্যে এতদিন পরে স্তূপ ও মন্দির নির্ম্মাণের উপায় হইল। শুনিয়াছি, মথুরায় সদ্ধর্ম্মের অনুচরগণ একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছেন, তোমাদিগের রাজা ধনভূতি মথুরাবাসীদিগকেও অর্থ সাহায্য করিতেছেন ও সেই সাহায্যে স্তূপবেষ্টনীর কয়েকটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইতেছে। মহারাজের আনুকূল্যে তোমাদিগের স্তূপের চতুঃপার্শ্বস্থ তোরণচতুষ্টয় নির্ম্মিত হইবে। অবশিষ্টাংশের ব্যয় প্রকৃত বিশ্বাসিগণ বহন করিবেন। ভরসা করি সদ্ধর্ম্মের পুনরুত্থান ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পতন হইবে। যে অশ্মরাশি সঞ্চিত হইয়াছে তাহাদ্বারা নির্ম্মিত গগনস্পর্শী স্তূপ আচন্দ্রার্ক-ক্ষিতি-সমকাল সদ্ধর্ম্মের উন্নতির সাক্ষীরূপে বিরাজ করিবে।"

এই সময়ে নগরের দিকে রাজপথে ধূলি উত্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে দৃষ্ট

হইল জনৈক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে আমাদিগের দিকে আসিতেছে। নিকটবর্ত্তী হইলে জানা গেল সে ব্যক্তি একজন নগররক্ষী; নগরে পশ্চিমদেশবাসী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমনসংবাদ রাজসমীপে নিবেদন করিতে আসিয়াছে। রাজা ও পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ, সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই, নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দিনকরকরবৃদ্ধির সহিত প্রান্তরে জনসংখ্যার হ্রাস হইতে লাগিল; দ্বিপ্রহরকালে বিশাল প্রান্তর জনশূন্য হইয়া গেল।

পরদিন প্রত্যূষে রাজা ধনভূতি বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক ও নগরের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি অভিনব পরিচ্ছদধারী চারিজন বিদেশীয়কে সঙ্গে লইয়া শিলাসঞ্চয়স্থলে উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও সে জাতীয় মনুষ্য দেখি নাই। যবন-সমাগমে ভারতে যখন সর্ব্ববিষয়ে পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছিল, তখন আমি পর্ব্বত-সানুদেশে—অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায়। তাহাদের কথা আমি পরে শুনিয়াছি। সেই প্রথম যবন-দর্শনের দিনে তাহাদিগকে দেখিয়া যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি। দারিদ্র্যপীড়িত হইলেও লাবণ্য যেমন উপলব্ধি করা যায়, ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও অগ্নির অস্তিত্ব যেমন বুঝা যায়, সেইরূপ ভারতীয় পরিচ্ছদ ও ভাষা সত্ত্বেও স্পষ্ট বোধ হইতেছিল যে, তাহারা বিদেশীয়। তাহাদিগের নাম ও রূপাকৃতি ব্যতীত তাহাদিগের যবনত্বের আর সমুদায় নিদর্শনই লুপ্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের পরিচ্ছদ শীতপ্রধানদেশোপযোগী, তাহারা গান্ধার ও মদ্র দেশে ব্যবহৃত পশুলোম-নির্ম্মিত বস্ত্র ও গাত্রাবরণ পরিধান করিয়াছিল; তাহাদিগের বস্ত্র অতি মলিন, অত্যন্ত অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময়। প্রথম প্রহরে যখন সূর্য্যোত্তাপ ক্রমশঃ প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহারা স্বেদপরিপ্লুত হইলে দুর্গন্ধের ভয়ে রাজা দূরে গমন করিলেন। তাহাদের নামগুলিও বিস্ময়কর যথা;—কিলিকীয় মাখেতা, অলসন্দবাসী লিওনাত, উদ্যানক থৈদোর এবং কপিশাবাসী আর্ত্তিমিদর। পরে জানিয়াছি, অলসন্দ নগরে শাকেতবিজয়ী যবনরাজ মেনন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ক্ষোদিত ও তক্ষন শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা হইত। তাহা হইতে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিল্পের সামান্য জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। সে কথা পরে যথাসময়ে বলিব।

রাজা আসিয়া তাঁহার চিরপোষিত আশা অনুসারে সেই প্রান্তরমধ্যে প্রবাহিত ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীতীরে স্তূপ নির্ম্মাণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। পরিশেষে যবনগণের পরামর্শ অনুসারে নদী হইতে অল্প দূরে স্তূপ নির্ম্মাণ করাই স্থির হইল। তখন একে একে দুইয়ে দুইয়ে

মুণ্ডিতশীর্ষচীবধারী ভিক্ষুগণ, কৌশেয় বস্ত্র পরিহিত উপাসক ও উপাসিকা-গণ নগর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষুগণ স্থবির ধর্ম্মযাজকের পশ্চাদ্দেশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, নগর হইতে আনীত সদ্যস্ক পুষ্পরাশি প্রান্তরে স্তূপীকৃত হইল। রাজা, রাণী ও রাজপুত্র বাধপাল, ধর্ম্মযাজকের উপদেশা-নুসারে ধরিত্রীকে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপে পূজা করিলেন। রাজবংশ নিক্ষিপ্ত সেই পুষ্প-মুষ্টির উপরে সমবেত জনসাধারণ ক্রমাগত পুষ্পবৃষ্টি করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্তূপের সৃষ্টি করিল। বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক তখন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যে, তথাগতের বাক্যানুসারে সমুদয় স্তূপ ও গর্ভচৈত্যই অর্দ্ধবৃত্তাকার ও তৎসমুদয়ের উচ্চতা নেমদৈর্ঘের সমান। তখন ধর্ম্মযাজকেরা পুষ্প লইয়া সেই কুসুমস্তূপের পার্শ্বে গোলাকার বেষ্টনী পত্র ও পুষ্প দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন ও পুষ্প, চন্দন ও জলদ্বারা স্তূপের অর্চ্চনা করিলেন। ইহার পর রাজা ধর্ম্মযাজকগণপরিবৃত হইয়া সপ্তবার স্তূপ প্রদক্ষিণ করিলেন। ক্রমে সূর্য্যতাপতাড়িত হইয়া জনসমূহ নগরাভিমুখে চালিত হইল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে, অন্ধকারাগমের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ভীত—চকিত পাদক্ষেপে দুইজন লোক আমাদিগের সমীপে আসিল। তাহারা বিদেশীয় নহে, ভারতীয় বটে; কিন্তু তাহারা যেন বন্য জন্তুর ন্যায় অন্ধকারের আশ্রয়ে ভ্রমণ করে। তাহারা যেন মানবজাতির অধিকারচ্যুত হইয়া নিশাচরে পরিণত হইয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণজাতীয়, ঈর্ষ্যায় তাহাদিগের কলেবর কম্পবান, রোষে তাহাদিগের নেত্র রক্তবর্ণ। আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা যেন আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। তাহারা মুখের ভাবে ও কথোপকথনে প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তাহাদিগের আশা ভরসা, সুখ সম্পদ সকলই দূর হইয়া গিয়াছে। সুদিন প্রত্যাবর্ত্তনের যে আশা ছিল তাহাও যেন এই প্রস্তররাশির আগমনে একেবারে লুপ্ত হইতেছে। অসহায় প্রস্তররাশির উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া ও পদাঘাত করিয়া তাহারা তাহাদিগের মনুষ্যপদলোপের পরিচয় দিতে লাগিল। তাহাদিগের কথোপকথনে জানিলাম যে, বহু পূর্ব্বে সে দেশে ব্রাহ্মণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রিয়দর্শীর রাজত্বকালে ব্রাহ্মণের প্রথম মর্য্যাদাহানি হয়, তাহার পর ব্রাহ্মণগণ আর কখনই পূর্ব্বগৌরবলাভে সমর্থ হয়েন নাই। তবে পুষ্যমিত্রের রাজত্বলাভের পর হইতে বৌদ্ধপ্রভাবের হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু সে অত্যল্প কালের জন্য। পাটলিপুত্রবাসী বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজকের আগমনকাল হইতে ব্রাহ্মণগৌরব পুনরায় তিরোহিত হইয়াছে। তাহারা যতবার সেই বর্ষীয়ান যাজকের নাম গ্রহণ করিল ততবারই ভূমিতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল, তাহারা যেন

আর কোন প্রকারে সম্যক্ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিয়ৎকাল পরে দূরে নগররক্ষীর পদশব্দ শ্রবণে তাহারা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে যবনচতুষ্টয় অসংখ্য শ্রমজীবী সমভিব্যাহারে প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রমজীবিগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। এক ভাগ প্রস্তরসমূহ আচ্ছাদনের নিমিত্ত পর্ণকুটীর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল; অপর ভাগ ভূমিতে গর্ত্ত খনন আরম্ভ করিল ও তৃতীয় ভাগ সঞ্চিত শিলাখণ্ডসমূহ আকারানুসারে শ্রেণীবিভাগ করিতে লাগিল। সেই দিন অপরাহ্নে একজন যবন মসৃণ চর্ম্মখণ্ড, মসী ও লেখনী লইয়া চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইল। যথাসময়ে চিত্রাবলী প্রস্তুত হইলে স্থবির ধর্ম্মযাজক আসিয়া তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যবনগণ কোশলের ও উদ্যানের ভাষা মিশ্রিত করিয়া আপনাদের বক্তব্য তাঁহাকে বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। যথাসময়ে অঙ্কিত চিত্র রাজার অনুমোদিত হইল। তখন বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদেরই খণ্ডিত দেহসমূহ শতধা বিভক্ত হইয়া, সহস্র সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া যেরূপ শ্রেণীবিন্যাসে ন্যস্ত হইবে এই চিত্রাবলী তাহারই। যথাসময়ে পর্ণশালা নির্ম্মিত হইল, আমাদিগের উৎপীড়ন আরব্ধ হইল। পাষাণ-দেহে যদি শোণিত থাকিত তাহা হইলে আমাদিগের শোণিত-প্রবাহে কোশল হইতে চোড়মণ্ডল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ প্লাবিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে লীন হইত। পাষাণের যদি শ্রবণস্পর্শী আর্ত্তনাদের ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমাদিগের আর্ত্তনাদে হিমাচলের পদ কম্পিত হইত; আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ শব্দিত হইয়া উঠিত; তোমরাও বহু পূর্ব্বে আবিষ্কার করিতে যে, পাষাণেরও বেদনা অনুভব করিবার শক্তি আছে। জীবনের প্রারম্ভে সমুদ্র-সৈকতে যে পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ বালুকাকণা একত্র মিলিত হইয়াছিলাম, যাহাদিগের সহিত লক্ষ লক্ষ বর্ষ সমুদ্রগর্ভে, পর্ব্বতসানুদেশে একত্র বাস করিয়াছি তাহাদিগের মধ্যে কত সহস্র কণা সুতীক্ষ্ণ লৌহের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহারা এখন সেই প্রান্তরে বাস করিতেছে। সে প্রান্তর এখন উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, সে নদী শুষ্ক হইয়াছে ও তাহার জলস্রোতঃ অন্য পথে প্রবাহিত হইতেছে। এখনও কোল ও মুণ্ডা জাতি হলকর্ষণকালে আমাদিগের উৎপীড়কদিগকে অভিশাপ দিয়া থাকে; কারণ, তাহাদিগের জন্যই দরিদ্র পার্ব্বত্য জাতির হলফলক অকালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বেদনা দূর হইলে দেখিয়াছি, অসম প্রস্তরশ্রেণী সমান্তরালে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্তম্ভ, সূচি, আলম্বন, তোরণ প্রভৃতি তোমরা যাহা কিছু দেখিয়াছ

তৎসমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে ; কেবল যথাস্থানে বিন্যস্ত হইলেই হয়। দূরে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত অর্দ্ধবৃত্তাকার স্তূপ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আচ্ছাদন-খণ্ডসমূহের মার্জ্জনমাত্র অবশিষ্ট আছে। নগর হইতে প্রতিদিন দলে দলে নাগরিক ও নাগরিকাগণ যবনশিল্পিগণের তক্ষনচাতুর্য্য দেখিতে আসিত। পরিষদ চতুষ্পাঠি ত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ, আয়তন হইতে শিশুগণ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সেই পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে বসিয়া থাকিত। সন্ধ্যাসমাগমে বিলাসিগণ রথারোহণে, হীনবিত্ত নাগরিকগণ পদব্রজে, দলে দলে, নব ক্ষোদিত চিত্রাবলী দেখিতে আসিতেন। তাঁহাদিগের সহিত মিশ্র ভাষায় শিল্পিগণের কথোপকথন হইত, তাহা হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই বলিয়া যাইতেছি ;—

নাগরিকগণ বলিতেন যে, পারসীক-সমাগমের পূর্ব্বে এতদ্দেশে মন্দির বা স্তূপ নির্ম্মাণের প্রথা বা আবশ্যকতা ছিল না, কারণ ভারতীয় প্রথা অনুসারে দেবার্চ্চনার জন্য মন্দির বা স্তূপের প্রয়োজন হইত না। ব্রাহ্মণগণ পর্ব্বতে, বনে বা নদীতীর্থে যাজন করিতেন, উন্মুক্ত আকাশই তাঁহাদিগের মন্দির ছিল। যখন কপিলা হইতে বাহ্লীক ও উদ্যান পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমি পারসীক জাতির পদানত হইয়াছিল তখন তাহাদিগেরই চেষ্টায় এতদ্দেশে দেবায়তন-নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। তখন হইতে মূলস্থানপুরে মিত্র দেবের মন্দির, বরুণ পর্ব্বতে চন্দ্রের মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে লাগিল। অবশ্য ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই এতদ্দেশে তক্ষন্-শিল্প বহুলভাবে প্রচলিত ছিল, তবে ভাস্করগণ অপনাদের শিল্পচাতুর্য্য প্রাচীর, স্তম্ভ, দুর্গ, প্রাকার প্রভৃতির শোভা-সংবর্দ্ধনে নিযুক্ত করিতেন। অদ্যাপি সেই প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যপ্রথা স্তূপ ও মন্দিরবেষ্টনে শোভনকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পারসীকেরা বভেরু বা বাবিরস ও নীনা দেশীয় শিল্প এতদ্দেশে আনয়ন করেন। কিন্তু ভারতীয় ভাস্করগণ কখনই অবিমিশ্রভাবে বিদেশীয় ভাস্কর্য্য অবলম্বন করেন নাই। যখনই ভারতবাসীকে বিদেশীয় জাতির নিকট নতশির হইতে হইয়াছে তখনই বিদেশীয়গণ বর্ব্বর হইলে পদানত জাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু সভ্য ও শিক্ষিত হইলে উভয় জাতির মধ্যে শিক্ষার আদান প্রদান চলিয়াছে। যবনগণ ইহার উত্তরে কহিতেন যে, তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকটে শুনিয়াছেন যে, আদিম যবনদেশে ভাস্কর শিল্পের এতদূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে যে, তাঁহারা পাষাণে মনুষ্যাকৃতি যথাযথ ক্ষোদিত করিতে পারেন। এই শিল্প তাঁহারা মিস্রাইম্ দেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে কোন জাতি এতদূর দক্ষতার সহিত পাষাণে জীবিত মনুয্যের রূপাকৃতি গঠনে সমর্থ হয়েন নাই। মিস্রাইম্

দেশবাসিগণও মূর্ত্তিগঠনে এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিলিকীয় মাথেতা কহিতেন যে, যবনদ্বীপপুঞ্জ ও মিস্রাইম্ দেশের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রকূলে কিলিকিয়া দেশে তাঁহার বাস। যৌবনে তিনি মিস্রাইম্‌বাসী ও আদিম যবনবাসী উভয় জাতিই দেখিয়াছেন; কারণ, স্থলপথে যে স্বার্থবাহগণ নিগমবদ্ধ হইয়া উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যব্যপদেশে গমনাগমন করিতেন, তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই তাঁহার জন্মভূমির মধ্য দিয়া গমন করিতেন, এতদ্ব্যতীত সহস্র সহস্র যবন কিলিকীয়া দেশে বাস করিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণও তাহার মধ্যে অন্যতম। সুতরাং বাহ্লীক বা গান্ধারবাসী যবনগণ অপেক্ষা আদিম যবনদেশবাসী স্বজাতিগণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অপেক্ষাকৃত অধিক। তিনি শুনিয়াছেন যে, অলীকসুন্দরের সহযাত্রিগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ অমূলক। তিনি দেশে শুনিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীরা প্রস্তর ক্ষোদনে নিপুণতার অভাবে দারুময় গৃহে বাস করে ও গৃহসমূহ কারুকার্য্যে শোভিত করে; কিন্তু তিনি এ দেশে আসিয়া দেখিয়াছেন যে, এ দেশে বহু প্রাচীন প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহনগরাদি বিদ্যমান আছে ও ভারতবাসিগণ প্রস্তর-তক্ষনে বিলক্ষণ নিপুণ। পঞ্চনদবাসিগণ কাষ্ঠ-ক্ষোদনে অত্যন্ত নিপুণ এবং প্রস্তরানভাব স্বত্বেও ক্ষোদিত কারুকার্য্যময় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। নাগরিকগণ কহিলেন যে, পারসীক অধিকারকালে বাহ্লীক হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে ঐরাণ দেশীয় ভাস্কর্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ গৃহীত হইয়াছে ও ক্রমে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে স্তূপ নির্ম্মিত হইতেছে তাহার চারিটি তোরণ-স্তম্ভের শীর্ষদেশে যে সিংহচতুষ্টয় ক্ষোদিত হইয়াছে তাহা পারসীক ভাস্কর শিল্প প্রভাবের অন্যতম ফল। কিলিকীয় মাথেতা ইহা স্বীকার করিয়া কহিলেন যে, স্তম্ভশীর্ষে জীব জন্তুর আকৃতির অনুকরণ প্রাচীন জাতি সমূহের মধ্যে ছিল না। প্রাচীন মিস্রাইম্‌দেশীয়গণও স্তম্ভশীর্ষে প্রস্ফুটিত বা প্রস্ফুটোন্মুখ পদ্মের অনুকরণ করিতেন। অলসঙ্গবাসী লিওনাত কহিলেন যে, প্রাচীন ভারতে চতুষ্কোণ বা অষ্টকোণ স্তম্ভ ব্যবহৃত হইত, অনুমান হয়। কারণ প্রাচীন হর্ম্ম্যমাত্রেই এইরূপ স্তম্ভ দেখা যায়; গোলাকার স্তম্ভ অতীব বিরল। বাহ্লীক নিবাসী যবনগণ যখন শকজাতির তাড়নায় পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হয়েন, যখন প্রাচীন বাহ্লীক রাজ্য চির কালের জন্য ভারতীয়গণের হস্তচ্যুত হয়, তখন হইতেই ভারতে যাবনিক শিল্প প্রণালীর সূচনা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অদ্যাবধি সুবস্তু নদীর দক্ষিণ তীরে প্রবেশলাভ করে নাই। কোন একজন বিশিষ্ট নাগরিক কহিলেন যে, তাঁহার

পিতা অনর্ত্ত দেশ হইতে পোতারোহণে ময়ূর বিক্রয়ের জন্য বভেরু নগরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি এই বাণিজ্য যাত্রায় আরব দেশ অতিক্রম করিয়া ধূপ ও গন্ধ দ্রব্য আহরণের জন্য মিস্রাইম্ দেশের দক্ষিণস্থ রাক্ষসগণের দেশে গিয়াছিলেন। সে দেশের অধিবাসিগণ দাক্ষিণাত্যবাসিগণের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও খর্ব্বাকার। তাহারা মনুষ্য খাদক ও অত্যন্ত কুৎসিতাকার। মিস্রাইম্ বাসিগণ এই দেশকে পু-আহিত নামে অভিহিত করেন ও ভারতবাসী বণিকগণ উহাকে অপভ্রংশ করিয়া পুণ্য নাম দিয়াছে। এইরূপ কথোপকথনে দিবস অতিবাহিত হইত। সন্ধ্যাকালে শিল্পী শ্রমজীবী ও নাগরিকগণ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কেবল শান্তিরক্ষক-গণ ক্ষোদিত প্রস্তরের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য রাত্রিকালে প্রান্তরের মধ্যে বাস করিত। কারণ, একদা ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষ্যা বশতঃ অগ্নিসংযোগে পর্ণশালা দগ্ধ করিয়া ভাস্করগণের বহু পরিশ্রমের ফল বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষা।

এস　স্নিগ্ধ, মধুর, শ্যাম, সুন্দর, মেঘ-অম্বর লুটায়ে;
এস　কুটজ-শাখায় অমল ধবল কুসুম-সুষমা ফুটায়ে;
এস　হরিৎ কপিশ কুসুম-গোলকে ভরি' কদম্ব কাননে;
এস　তব আগমন পিয়াসী শিখীরে রঞ্জিত করি' বরণে;
এস　ধরণীর ধূলি- মলিন অঙ্গ হরিৎ দুকূলে আবরি';
এস　বিরহশীর্ণা তটিনীর দেহে নব যৌবন বিতরি';
এস　শীর্ণ তরুর রিক্ত শাখায় নব পল্লব সাজায়ে;
এস　মেঘের গভীর স্নিগ্ধ নিনাদে শান্তি শঙ্খ বাজায়ে;
এস　কৃষক-বধূর উজ্জ্বল নয়নে হরষদীপ্তি জ্বালিয়া;
এস　ধরার দীর্ণ হৃদয় সরসি' স্নিগ্ধ সলিল ঢালিয়া;
এস　প্রিয়াভুজপাশে ফিরায়ে আনিয়া বাঁধিতে পতিরে প্রবাসী;
এস　প্রিয়-বাহু-পাশে আনিতে প্রিয়ারে মেঘ গর্জ্জনে ত্রাসি';
এস　প্রেম-হিল্লোলে পূর্ণ করিয়া ধরণী গগন হরষে;
এস　চিরসুন্দর চিরমধুময় সরস করিয়া নিরসে।

সমরু বেগম।

জগতের ইতিহাসে অনেক সময় মানুষের অবস্থা-পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইতে হয়। দস্যু হইতে ক্রীতদাস পর্য্যন্ত অনেকে হীন অবস্থা হইতে অসাধারণ ক্ষমতা ও অনুকূল ঘটনা হেতু উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ় হইয়া—শেষে রাজবংশ-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অধিক দিনের কথা নহে—ভারতে ইংরাজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে একজন ক্রীতদাসী সামান্য অবস্থা হইতে যেরূপ সম্পদ, সম্মান ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ ঔপন্যাসিকেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। আমরা সেই সমরু বেগমের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দিলাম। বেগমের জীবনের অনেক অংশ এখনও রহস্য কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। তবে কম্পটন, কীন, স্লিম্যান, হেবার্ প্রভৃতি লেখকগণ অনুসন্ধানের ফলে যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং স্লিম্যানের গ্রন্থ-সম্পাদক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ বহু পরিশ্রমের ফলে যে সকল বিস্মৃত ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্ধার করিয়াছেন—সেই সকল হইতে বেগমের ঘটনাবহুল জীবনের সাধারণ ইতিহাস গঠন করা অসম্ভব নহে।*

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ভারতে বাবরের বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত ও আকবরের রাজনীতিকৌশলে দৃঢ়ীকৃত মোগল সাম্রাজ্য শক্তিহীন হইয়া ধ্বংসোন্মুখ, তখন ভারতের নানা দিকে নানা লোক সাম্রাজ্য বা ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ সন্ধান করিতেছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত তখন সর্ব্বদাই রণকোলাহলমুখরিত। সর্ব্বত্র ষড়যন্ত্র, সর্ব্বত্র অবিশ্বাস, সর্ব্বত্র রণসজ্জা। এই সময় অনেক ধনলাভাকাঙ্ক্ষী ইয়ুরোপীয় কোন না কোন পক্ষের সেনাদলে প্রবেশ করিয়া সম্পদসঞ্চয়-চেষ্টায় চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে উচ্চবংশোদ্ভূত উদারহৃদয় বীরের একান্ত অভাব ছিল না সত্য; কিন্তু অধিকাংশই যে নীচবংশসম্ভূত, নিরক্ষর সদসদবিচারবিমুখ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইহারা ধনলালসার পরিতৃপ্তির জন্য সাহসমাত্র সম্বল করিয়া যখন যে দিকে সুবিধা পাইত তখন সেই দিকে যাইত।

---

* Compton—*Military Aventurers of Hindustan.*
Keene—*Hindustan under Free Lances.*
Sleeman—*Rambles and Recollections.*
Heber—*Journal.*

ধনলাভই ইহাদিগের চরম ও পরম উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ইহারা সবই করিতে পারিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বেগম ইহাদিগেরই একজনের পত্নী।

ওয়াল্টার্ রেণার্ড জাতিতে জর্ম্মান। ইহার পিতা ব্যবসায়ে কশাই ছিলেন। রেণার্ড কোন ফরাসী জাহাজে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রথম ভারতে আইসে ও জাহাজ হইতে পলায়ন করিয়া ফরাসীসেনাদলে প্রবেশ করে। এই সময় আত্মগোপন-চেষ্টায় সে সমার্স নাম গ্রহণ করে। কিন্তু তাহার মুখশ্রীতে সৌন্দর্য্যের অভাবহেতু লোকে তাহাকে 'সম্বার' বলিতে আরম্ভ করে। সমরু তাহারই রূপান্তর বা বিকার। কিছুদিন দক্ষিণ ভারতে কার্য্য করিবার পর সমরু বাঙ্গালায় আসিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং সে কার্য্য ভাল না লাগায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া চন্দননগরে ফরাসী সৈন্যদলে প্রবেশ করে। সে কার্য্যও তাহার প্রীতিপ্রদ না হওয়ায় সে সাধারণ সৈনিকরূপে সিরাজদ্দৌলার সেনাদলে প্রবেশ করে। সমরু এই সময় ইয়ুরোপীয় বেশের সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুরোপীয় অভ্যাস বর্জ্জন করিয়া এ দেশের বেশ ও আচার অবলম্বন করে। ইহার পর সমরু কিছুদিন "মেঘ যথা বাতাহত" ভাবে কাটাইয়া পূর্ণিয়ায় শওকতজঙ্গের সেনাবিভাগে একটি ক্ষুদ্র সেনা-দলের ভার লইয়া সেই দলকে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত করিতে আদিষ্ট হয়। অল্পদিন পরে শওকতজঙ্গ যুদ্ধে পরাভূত হইলে সমরু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায়।

ইহার পর আমরা মীর কাশিমের সেনাদলে গুর্গন খাঁর অধীনে দুইটি সেনা-দলের নায়করূপে সমরুর দর্শন পাই। মীর কাশিম তখন কোম্পানীর কর্ম্মচারী-দিগের ব্যবহারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। পাটনার হত্যাকাণ্ডে (৩রা অক্টোবর, ১৭৬৩) সমরুই নেতা ছিল। ইংরাজ বন্দীদিগকে হত্যা করিতে আদিষ্ট হইলে ভারতীয় সৈন্যগণ বলিল, তাহারা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মত; কিন্তু নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করা কশাইয়ের কর্ম্ম, তাহারা সে কার্য্য করিবে না। এই সময় সমরু প্রাণনাশের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় ও স্বহস্তে হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করে। * ইহার পর মীর কাশিম ইংরাজের নিকট পরাজিত হইলে সমরু তাহার অধীনস্থ সেনাদলদ্বয়সহ অযোধ্যার নবাবের সেনাদলে প্রবেশ করে। সে পূর্ব্বেই বহু অত্যাচারে মীর কাশিমের নিকট হইতে

* Annual Registerএ প্রকাশ, ১৪৮ জন ইংরাজ হত হইয়াছিল। ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ বলেন, স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকায় প্রায় ২০০ ইংরাজ হত হইয়াছিল—সমরু স্বয়ং ইহাদিগের মধ্যে প্রায় ১৫০ জনের জীবননাশ করিয়াছিল।

স্বীয় সেনাদলদ্বয়ের বেতন আদায় করিয়া লইয়াছিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সমরু চারিটি সেনাদলের নায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। বক্সারে ইংরাজের নিকট নবাবের পরাজয় হইলে ইংরাজপক্ষ পাটনার হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া সমরুকে তাঁহাদের করে সমর্পণ করিবার জন্য নবাবকে আদেশ করিলেন। উত্তরে নবাব বলিলেন, সমরুর অধীনে বহু সৈন্য থাকায় তাহাকে সমর্পণ করা সহজসাধ্য হইবে না; বরং, ইংরাজ বলিলে, তিনি তাহাকে নিহত করিতে পারেন। ইংরাজ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। এ দিকে সমরু এই সকল কথা অবগত হইয়া স্বীয় সৈন্যদলসহ অযোধ্যার বেগমদিগকে ও মীর কাশিমকে আক্রমণ করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিল। সেই অর্থে সৈন্যগণকে বশীভূত করিয়া সমরু রোহিলাখণ্ডে গমন করিয়া রহমত আলির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; তাহার পর বিজয়ী ইংরাজ সেনার সান্নিধ্য নিরাপদ নহে বুঝিয়া ভরতপুরে রাজার অধীনে কার্য্য স্বীকার করিল। কয়মাস পরেই সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া সমরু জয়পুরের রাজার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। জয়পুরপতি সমরুর চরিত্রকথা অবগত হইয়া অল্পদিন পরেই তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। তথন সমরু সৈন্যদল সহ মাসিক ৬৫০০০ টাকা বেতনে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের মন্ত্রী, রক্ষক ও অভিভাবক নজফ আলি খাঁর অধীনে কার্য্য স্বীকার করিল। অল্পকালে বহু প্রভুর সেবা করিয়া চঞ্চলচিত্ত সমরু এইবার স্থায়ী কার্য্য গ্রহণ করিল। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সমরু সম্রাটের কর্ম্মচারী ছিল এবং নবাবের নিকট হইতে দিল্লীর বিংশ ক্রোশ উত্তরে মিরাটের নিকটে সার্দ্ধানা নামক জায়গীর পাইয়াছিল। এই জায়গীরের লোভ ও বেগমের প্রভাবই এবার সমরুর স্থির ভাবে সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার কারণ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চন্দননগরত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সমরু ইয়ুরোপীয় বেশ ও আচার ত্যাগ করিয়া ভারতীয় বেশ ও আচার গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময় হইতেই সমরু ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার হারেম বা শুদ্ধান্ত সৃষ্টি করে।

সমরু বেগমের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'নর্থওয়েষ্ট প্রভিন্স্ গেজেটিয়ারে' মিষ্টার অ্যাট্কিন্সন বলেন, তিনি মিরাট জিলানিবাসী আমেদ খাঁ নামক জনৈক আরবের রক্ষিতার গর্ভজাতা। এই স্থলে বলা আবশ্যক, মুসলমান সমাজে পরিণীতা পত্নীর ও রক্ষিতার গর্ভজাত সন্তানদিগের পদমর্য্যাদা প্রায় তুল্য। আমেদের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিণীতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের অত্যাচারে বেগম ও তাঁহার মাতা দিল্লীতে চলিয়া আইসেন। তথায় কন্যা সমরুর শুদ্ধান্তে গমন করেন। ক্রমে তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে সমরুকে করতলগত করেন ও সমরু

সার্দ্ধানায় বাস করিতে আরম্ভ করিলে তাহার পরিণীতা পত্নীরূপে পরিগণিতা হয়েন। কাহারও কাহারও মতে বেগম সৈয়দকন্যা সুতরাং তাঁহার বংশমর্য্যাদার অভাব ছিল না। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি কাশ্মীরী নর্ত্তকী ছিলেন। সে যাহাই হউক সমরু যে তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বেগমের জন্মকাল সম্বন্ধেও মতভেদ বিদ্যমান। কিন্তু এ বিষয়ে অ্যাট্‌কিন্‌সনের মতই প্রামাণ্য বোধ হয়। তাঁহার মতে, বেগম ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

সমরুর সহিত বেগমের বিবাহ ব্যাপারও বিশেষত্ববর্জ্জিত নহে। তাঁহাকে বিবাহ করিবার সময় সমরু খৃষ্টান বলিয়া পরিচিত; অথচ তাহার মুসলমান মতে পরিণীতা এক উন্মাদরোগগ্রস্তা পত্নী ও বর্ত্তমান। সুতরাং বেগমের সহিত তাহার কোন্ মতে বিবাহ হইয়াছিল, তাহা স্থির করা দুষ্কর। সে যাহা হউক, উত্তর কালে তিনি সমরুর পরিণীতা পত্নী ও সমরুর মৃত্যুর পর তাহার বিধবা বলিয়াই পরিচিতা। এই উন্মাদিনীও পূর্ব্বে সমরুর রক্ষিতা ছিলেন।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ৪ ঠা মে তারিখে আগ্রায় সমরুর মৃত্যু হয়। তখন তাহার উন্মাদরোগগ্রস্তা পত্নী ও তাহার গর্ভজাত এক পুত্র বর্ত্তমান। সমরুর মৃত্যুর পর দিল্লীশ্বরের নির্দ্দেশমতে বেগমই সার্দ্ধানা জায়গীরের উত্তরাধিকারী হয়েন। পূর্ব্বে তাঁহার ধর্ম্মমত যাহাই থাকুক না কেন সমরুর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে—১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে তারিখে তিনি সপত্নীপুত্রসহ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হয়েন। তখন তিনি জোয়ানা নাম গ্রহণ করেন ও পরে তাহাতে 'নোবিলিস' যোগ করেন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ আলম বিদ্রোহী নাজফ কুলীকে শাসন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলে বেগম স্বয়ং স্বীয় সৈন্যাধ্যক্ষ জর্জ্জ টমাসের সহিত সসৈন্যে সম্রাটের সেনাদলে যোগ দেন। ৫ই এপ্রিল্ মোগল সৈন্য নাজফ কুলীর প্রধান আশ্রয় গোকুলগড় অবরোধের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারা তথায় উপস্থিত হইবামাত্র শত্রুরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে মোগল সেনাদল এই অতর্কিত আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়নোদ্যত হইল। শত্রুরা সম্রাটশিবিরে প্রবেশ করিয়া সম্রাটের পটাগার আক্রমণের উদ্যোগ করিলে বেগম শিবিকারোহণে ত্বরিতে টমাসের সঙ্গে সসৈন্যে যাইয়া সম্রাটকে উদ্ধার করিতে উদ্যোগী হইলেন। শত্রুরা তাঁহার পাশ্চাত্যপ্রথায় সুশিক্ষিত সেনাদলের আক্রমণ সহ্য করিতে অক্ষম হইল। এই সময় একদল অশ্বারোহী মোগলসেনা আসিয়া পড়ায় শত্রুদল পরাজিত ও শত্রুর

দুর্গ অধিকৃত হইল। সেইদিন অপরাহ্নে প্রকাশ্য দরবারে সম্রাট বেগমকে আপনার উদ্ধারকর্ত্রী বলিয়া সম্মান করেন ও তাঁহাকে জেব-উন-নিস্‌সা উপাধি দান করেন। এই সময় বেগমের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয়, বেগম স্থূলাঙ্গী ও গৌরবর্ণা; তাঁহার নয়নদ্বয় বিস্তৃত ও চঞ্চল। জাতিতে মুসলমান ও বেশে প্রাচ্য হইলেও তিনি কতক পরিমাণে পাশ্চাত্য আচারব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সেনানায়কদিগের সহিত একত্র অনবগুণ্ঠিতা হইয়া আহার করিতেন। *

এই সময় বেগমের সেনাদলে প্রায় তিন শত ইয়ুরোপীয় ছিল। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই গোলন্দাজ বা অনুরূপ নিম্নপদস্থ। সম্রাটের এই অভিযানে গোকুলগড়-বিজয় ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তিনি প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গোলাম কাদের কর্ত্তৃক নৃশংসরূপে নির্য্যাতিত হয়েন। গোলাম কাদের ২৯শে জুলাই হইতে ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত গুপ্তধনের সন্ধানে প্রাসাদের হর্ম্মতল খনন করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া শেষে বৃদ্ধ সম্রাটের ও পুরাঙ্গনাগণের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল। মহিলারা প্রাসাদ হইতে রাজপথে বিতাড়িতা হইলেন। পরিশেষে শেষোক্ত দিবসে প্রবল মোগল শক্তির ক্ষীণ অবশেষ শাহ আলম সিংহাসনে উপবিষ্ট গোলামকাদেরের নিকট নীত হইলেন এবং পুনরায় গুপ্তধন বাহির করিয়া দিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি যখন বলিলেন যে, তাঁহার আর কিছুই নাই তখন সিংহাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া কাদের সম্রাটকে ভূপাতিত করিয়া স্বহস্তে ছুরিকা-দ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয় দৃষ্টিহীন করিল। ইহাতেও পিশাচের তৃপ্তি হইল না; সে সম্রাটকে উপহাস করিয়া বলিল, "এখন কি দেখিতেছিস?" সম্রাট গাম্ভীর্য্য সহকারে উত্তর করিলেন, "তোমার ও আমার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য দেখিতেছি।" আততায়ী পূর্ব্বে "ঈশ্বরের বাক্য" কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সে সম্রাটকে রক্ষা করিবে ও তাঁহার কার্য্য করিবে। এই ভীষণ অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া বেগম সসৈন্যে সম্রাটের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করেন। বেগমের প্রত্যাবর্ত্তনের পর গোলাম কাদের

---

* কীন তদীয় *Hindustan under Free Lances* গ্রন্থে বেগমের যে চিত্র দিয়াছেন তাহাতে বেগমকে খর্ব্বাকৃতি বলিয়া মনে হয়। উহা বেগমের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের চিত্র। উহা সার্দ্ধানা প্রাসাদ হইতে আনীত ও বর্ত্তমানে এলাহাবাদে গভর্মেণ্ট্ হাউসে রক্ষিত চিত্রের প্রতিলিপি। শ্লিম্যানের ও কম্পটনের গ্রন্থে বেগমের যে ক্ষুদ্র চিত্র আছে, তাহা সুস্পষ্ট নহে।

ইস্মাইল বেগের সহিত পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার সম্রাটের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। তখন তাহাদিগের সৈন্যসংখ্যার আধিক্যহেতু বেগম আর সম্রাটকে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ইহার পর চার বৎসর বেগমের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বেগমের সেনানায়ক টমাস তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করেন এবং তৎপদাভিষিক্ত লুভাসুল্‌ত নামক জনৈক ফরাসী বেগমের পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ গোপনে রোমান্ ক্যাথলিক মতে সম্পন্ন হয়। বিবাহ গোপনে নিষ্পন্ন করা যে অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল, তাহা পরে দেখা যাইবে। তবে লুভাসুল্‌ত স্বীয় সৈন্যদলের বার্ণিয়ার ও সালুর নামক দুইজন কর্ম্মচারীকে সাক্ষী রাখিয়াছিলেন। কীনের বিশ্বাস টমাস বেগমের পাণিপ্রার্থী ছিলেন এবং ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করেন। লুফাসুল্‌ত কিছু উদ্ধতপ্রকৃতির লোক ছিলেন; কিন্তু নিরক্ষর ছিলেন না। বেগমের অপর সেনানায়কগণ মূর্খ ও বর্ব্বর ছিলেন। লুভাসুল্‌ত আদেশ করিলেন, তাঁহারা আর তাঁহার ও বেগমের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ একত্র আহার করিতে পাইবেন না। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা বেগমের বিবাহের কথা অবগত ছিলেন না। সুতরাং, নূতন সেনাপতিকে বেগমের প্রণয়প্রার্থীমাত্র ভাবিয়া তাঁহার এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া বেগমের সপত্নীপুত্র তাঁহাদিগকে আরও উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই যুবক কিছুদিন হইতে দিল্লীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি ভারতীয় রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ও নবাব জাফর ইয়াব খাঁ মজফ্‌ফর উদ্দীন নামে পরিচিত ছিলেন। এই কার্য্যে লেজোয়া নামক একজন কর্ম্মচারী তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন।

এদিকে বেগমের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি টমাস স্বতন্ত্র সেনাদল সংগঠিত করিয়া মেবাতিগণের নিকট এক বৎসরের রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন এবং তিজারা ও ঝাঝার নামক দুইটি স্থান অধিকার করিলেন। তিনি বাহাদুরগড় আক্রমণে অগ্রসর হইলে সংবাদ পাইলেন, লুভাসুল্‌ত, বেগমের সৈন্যদলসহ তাঁহাকে আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন। মুষ্টিমেয় অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্য লইয়া সুশিক্ষিত বহুসেনার সহিত সংগ্রাম বিপজ্জনক বুঝিয়া টমাস তিজারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লুভাসুল্‌ত মেবাতিগণের নিকট যথাসাধ্য অর্থ আদায় করিয়া ঝাঝার আক্রমণ করিলেন। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন, সার্দ্ধানায় বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি পত্নীর রক্ষার্থ সার্দ্ধানায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

মে মাসে লেজোয়া বেগমের সৈন্যদলের য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের নিকট এক অঙ্গীকার পত্র লইলেন যে, তাঁহারা জাফর ইয়াবের আদেশমত কার্য্য করিবেন। এই পত্র লইয়া তিনি দিল্লীতে গমন করিলেন। এই পত্রের স্বাক্ষরকারীরা প্রায় সকলেই নিরক্ষর বলিয়া "ঢেরা সহি" করিয়াছিলেন। এই আকস্মিক বিপদের আভাস পাইয়া বেগম ও তাঁহার স্বামী ইংরাজের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন এবং অনুপসহরে যাইয়া আশ্রয় লইতে আদিষ্ট হইলেন। এই সকল ব্যবস্থায় গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হইল। এই সময় মাধোজী সিন্ধিয়া দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি ও আর্য্যাবর্ত্তের ভাগ্যবিধাতা। বেগম দিল্লীশ্বরের সৈন্যসাহার্য্যার্থ প্রদত্ত জায়গীর ভোগ করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে স্থানত্যাগের জন্য সিন্ধিয়ার অনুমতি লইতে হইল। এদিকে আবার ইংরাজরাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য বেগমকে ইংরাজ শাসনকর্ত্তার অনুমতি লইতে হইল। কাযেই বিলম্ব অনিবার্য্য।

বেগম ইংরাজ সরকারের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে গভর্ণর জেনারল সার জন শোর সিন্ধিয়ার দরবারে তাঁহার হইয়া অনুরোধ করিবার জন্য ইংরাজ দূত পামারকে উপদেশ দিলেন। সিন্ধিয়া বলিলেন, বেগম দ্বাদশ লক্ষ টাকা দিলে তাঁহাকে দিল্লীশ্বরের কার্য্যত্যাগের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। উত্তরে বেগম ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন, এবং সমরুর ও তাঁহার প্রদত্ত অস্ত্রাদির মূল্য বাবদ চার লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। বহু কষ্টে তিনি কার্য্যত্যাগের অনুমতি পাইলেন। স্থির হইল, বেগম স্থায়িভাবে চন্দননগরে বাস করিবেন, সিন্ধিয়ার একজন সৈনিক কর্ম্মচারী সার্দ্ধানার সৈন্যদলের ভার পাইবেন এবং সমরুর পুত্র মাসিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তি পাইবেন।

অক্টোবর মাসে একদিন প্রত্যূষে বেগম পাল্কীতে ও লুভাসুলৃত অশ্বারোহণে সার্দ্ধানা ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা সঙ্গে প্রচুর অস্থাবর সম্পত্তি ও অর্থ লইলেন। তাঁহারা তিন মাইল পথ অতিক্রম না করিতেই পশ্চাতে ধূলি দেখিয়া অনুসরণকারী শত্রুদিগের আগমন অনুমান করিলেন। তখন পতিপত্নী এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, একজনের মৃত্যু হইলে অন্যজন আত্মঘাতী হইবেন। লুভাসুলৃত অর্থবাহকদিগকে দ্রুত যাইবার জন্য তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনুসরণকারীরা অল্পকাল মধ্যেই আসিয়া শিবিকা অবরোধ করিল। বেগম স্বীয় অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিলেন। একজন কর্ম্মচারী বেগমের একখণ্ড রক্তসিক্ত বস্ত্র লুভাসুলৃতের নিকট আনিলে তিনি বেগমের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করিলেন। বেগমের আঘাত গুরুতর হয় নাই। শত্রুরা তাঁহাকে বন্দী

করিয়া ধনসম্ভার লইয়া সার্দ্ধানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বেগম সপত্নীপুত্রের নিকট বন্দী হইলেন।

লুভাস্যুল্তের মৃতদেহ সার্দ্ধানায় নীত হইয়া তিন দিন পথিপার্শ্বে পতিত রহিল। কেহ তাহার সংকার করিল না। শব পশুপক্ষীর খাদ্য হইল ও অবশিষ্ট অংশ পয়ঃপ্রণালীতে নিক্ষিপ্ত হইল। বেগম বন্দিভাবে সাতদিন অনশনে কামানে বদ্ধ রহিলেন। তাঁহার অপমানের ও নির্য্যাতনের অন্ত রহিল না। কোন বিশ্বস্তা পরিচারিকা গোপনে মধ্যে মধ্যে কিছু আহার্য্য ও পানীয় না দিলে বেগমের মৃত্যু হইত। জনরব, স্বামীর ব্যবহারে সৈন্তদলে বিদ্রোহ অনিবার্য্য দেখিয়া বেগম এই আত্মহত্যাচেষ্টার ষড়যন্ত্র করেন। স্লিম্যানের পুস্তকের সম্পাদক ভিনসেণ্ট স্মিথ এই জনরবে বিশ্বাস করিলেও স্লিম্যান স্বয়ং ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। স্লিম্যান যখন এ দেশে ছিলেন, তখনও বেগম জীবিতা; স্লিম্যান এই অসাধারণ মহিলার দর্শনের আশায় যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু বেগমের মৃত্যুতে তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। এ অবস্থায় স্লিম্যানের কথাই বিশ্বাস-যোগ্য বিবেচিত হয়। কীনও এই জনরব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কম্পটন যদিও বলেন, বেগম অনিচ্ছায় ছুরিকা লইয়া আপনার বক্ষে সামান্ত আঘাত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি এই ষড়যন্ত্রের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লুভাস্যুল্তের সহিত বেগমের বিবাহের সাক্ষিদ্বয়ের মধ্যে সালুর অন্যতর। সালুর বেগমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দেন নাই। এক্ষণে বেগমের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া তিনি টমাসকে সংবাদ দিলেন। টমাস পূর্ব্বব্যবহার বিস্মৃত হইয়া বেগমকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে বেগমের বিদ্রোহী য়ুরোপীয় সেনানায়কগণ তাঁহার সপত্নীপুত্রকে সার্দ্ধানার সিংহাসনে বসাইয়া আমোদে মত্ত ছিলেন। টমাস তাঁহাদিগকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, বেগমের সপত্নীপুত্রকে একান্ত অকর্ম্মণ্য জানিয়া সিন্ধিয়া শীঘ্রই সার্দ্ধানার সেনাদলকে বিদায় দিবেন ও জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদেরই কর্ম্ম যাইবে। এই কথায় তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইল। আবার টমাসও সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আবার বেগমকে প্রভু স্বীকার করিয়া প্রায় তিন শত য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী এক অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সালুর ব্যতীত আর সকলেই "ঢেরা সহি" করিলেন। সালুরই সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। সিন্ধিয়ার যে কর্ম্মচারী সেনাদলের ও জায়গীরের ভার লইতে আসিয়াছিলেন, তিনি সার্দ্ধেক

লক্ষ টাকা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই উপলক্ষে টমাসের প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়; তিনি এ টাকা আর ফিরিয়া পায়েন নাই।

সমরুর পুত্র জাফর ইয়াব বন্দিরূপে দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। তথায় ১৮০৩ (কীনের মতে ১৮০১) খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি কোন য়ুরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যাকে বেগমের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ডাইস বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র ডাইস সম্বার বেগমের সম্পত্তি পাইয়াছিলেন।

সালুয়ের অধীনে বেগমের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া সেনাদল ছয় দলে বিভক্ত হয়। ইহার মধ্যে পাঁচ দল সালুয়ের অধীনে সিন্ধিয়ার দাক্ষিণাত্য-অভিযানে যোগ দেয় ও এসাই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় পক্ষে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আর্য্যাবর্ত্তে লেক ও দাক্ষিণাত্যে ওয়েলেসলী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিধ্বস্ত করিলে বেগমও ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। এই বৎসর ভারতের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। এই বৎসর মহারাষ্ট্রীয় শক্তির বিনাশ ও ইংরাজশক্তির বিকাশ হয়; এক কথায় এই বৎসর ভারতবর্ষ প্রকৃত পক্ষে ইংরাজের অধীন হয়।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ স্কিনার বংশের প্রতিষ্ঠাতা জেম্‌স্ স্কিনারের কনিষ্ঠ রবার্ট এই সময় বেগমের সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনিই লর্ড লেকের নিকট বেগমের আনুগত্যস্বীকারপ্রস্তাব উপস্থিত করেন। বেগম যখন আনুগত্য স্বীকার করিবার জন্য লর্ড লেকের শিবিরে উপস্থিত হইলেন তখন সেনাপতি সায়মাশান্তে সীধুপানে প্রফুল্ল। তখন অতি নগণ্য রাজার আনুগত্য স্বীকারও ইংরাজের নিকট বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত এবং আনুগত্য-স্বীকারার্থীকে যথেষ্ট সম্মান করা হইত। বেগমের আগমন সংবাদে সেনাপতি শিবিরের বাহিরে আসিলেন এবং গোলমালে অতিথি পুরুষ কি স্ত্রীলোক তাহা বিস্মৃত হইয়া তৎকালপ্রচলিত প্রাচ্য প্রথা অনুসারে বেগমকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। পরক্ষণেই স্বীয় ভ্রম বুঝিয়া সেনাপতি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে প্রত্যুৎপন্নমতি বেগম স্বীয় অনুচরবর্গকে বলিলেন, "খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক কিরূপে ভ্রান্ত কন্যাকে গ্রহণ করেন, দেখ।" সৈনিক বেশধারী পুরুষকে ধর্ম্মযাজক বলা অভিজ্ঞের নিকট হাস্যোদ্দীপক হইলেও বেগমের অনুচরগণ তাঁহার কথাই বিশ্বাস করিল।

এই সময় বেগমের ছয়টি পদাতিক সৈন্যদল, একদল গোলন্দাজ সৈন্য ও প্রায় ৪০০ অশ্বারোহী সৈন্য—সর্ব্বসমেত ৩৩৭১ জন সৈন্য ও সেনানায়ক এবং ৪৪টি

কামান ছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার প্রাসাদের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ মধ্যে একটি সুসজ্জিত অস্ত্রাগার ও কামান ঢালাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। এই সকলে তাঁহার বার্ষিক চার লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িত। তাঁহার জায়গীরের বিচার ও শাসন বিভাগের ব্যয়ও এক লক্ষ টাকা ছিল। তাঁহার নিজ ব্যয়ও ঐ পরিমাণ হইত। এই সমস্ত ব্যয়ই সার্দ্ধানার জায়গীরের আয় হইতে নির্ব্বাহ হইত। ইহার পর দেশে শান্তি-সংস্থাপনের ফলে এক দিকে যেমন তাঁহার আয়বৃদ্ধি হয়, অপর দিকে তেমনই প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল তাঁহাকে আর সৈন্য রাখিতে হয় নাই। এই আয়বৃদ্ধিতে ও ব্যয়সঙ্কোচে তিনি অসাধারণ ধনী হইয়া উঠেন এবং বিশেষ সম্মান সম্ভোগ করেন। ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীরা প্রায়ই তাঁহার সার্দ্ধানাস্থ প্রাসাদে ও মিরাটস্থ গৃহে অতিথি হইতেন। অন্যান্য ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরাও সে অঞ্চলে যাইলে বেগমের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন।

বেগম মৃত্যুকালে নগদ প্রায় ষাট লক্ষ টাকা রাখিয়া যায়েন। ইহার অধিকাংশই তাঁহার সপত্নীপুত্রের দৌহিত্র ডাইস সম্বার পাইয়াছিলেন। বেগম ইঁহার দুই ভগিনীকেও প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন। ডাইস সম্বারের বার্ষিক আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল। বেগম মৃত্যুর পূর্ব্বে বহু সৎকর্ম্মে অর্থদান করিয়াছিলেন। তিনি সার্দ্ধানায় একটি গির্জ্জার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সংস্কার ও অন্যান্য আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এক লক্ষ টাকা, স্থানীয় দরিদ্রদিগের সাহায্য ভাণ্ডার সংস্থাপনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা, ভারতে রোমানক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারকদিগের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা, রোমে পোপকে তাঁহার ইচ্ছামত কোন সৎকর্ম্মে ব্যয়ের জন্য সার্দ্ধেক লক্ষ টাকা, কোন সৎকার্য্যে ব্যয়ের জন্য ক্যানটারবেরির আর্চ্চ বিশপকে পঞ্চাশ হাজার টাকা, কলিকাতার দরিদ্র প্রোটেস্ট্যাণ্ট বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কলিকাতার বিশপকে পঞ্চাশ হাজার টাকা, কলিকাতার দুস্থ ঋণীদিগের উদ্ধার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতার রোমানক্যাথলিক প্রচার মণ্ডলীর জন্য এক লক্ষ টাকা, আগ্রায় রোমানক্যাথলিক প্রচার মণ্ডলীর জন্য ত্রিশ হাজার টাকা, মিরাটে একটি রোমানক্যাথলিক গির্জ্জা সংস্থাপন করিয়া তাহার আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দ্বাদশ সহস্র টাকা, মিরাটে প্রোটেস্ট্যাণ্ট গির্জ্জা সংস্থাপন জন্য দশ সহস্র টাকা দিয়াছিলেন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন, তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়দ্বয়ের হিতার্থেও অর্থ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে সকল দানের বিশেষ বিবরণ দেন নাই।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী তারিখে বেগমের মৃত্যু হইলে সরকার জায়গীর

বাজেয়াপ্ত করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী সরকারের সহিত মোকর্দ্দমা করিয়া শেষে প্রাসাদ ও প্রাসাদসংলগ্ন ভূমি পাইয়াছিলেন। পরে রোমানক্যাথলিক বিশপ এই প্রাসাদ ক্রয় করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মযাজকদিগের শিক্ষাগারে পরিণত করিয়াছেন। যাঁহারা বেগমকে দেখিয়াছিলেন, এরূপ বহু লোকের নিকট স্লিম্যান শুনিয়াছিলেন, বেগমের মত গম্ভীরপ্রকৃতি লোক সচরাচর দেখা যায় না। ইংরাজের সহিত সখ্যসংস্থাপনের পর হইতে বেগম য়ুরোপীয় আচারব্যবহার অবলম্বন করেন। তিনি অশ্বারোহণে, গজপৃষ্ঠে বা শিবিকায় সাধারণের সম্মুখে বাহির হইতেন এবং অতিথিদিগের সহিত এক সঙ্গে আহার করিতেন।

শেষ জীবনে স্বদেশযাত্রার ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিবার সময় বেগমের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী ও জীবনরক্ষক টমাস স্বীয় পত্নীকে, পুত্রকে ও কন্যাদ্বয়কে বেগমের নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন। পথে বহরমপুরে টমাসের মৃত্যু হয়। বেগম তাঁহার পরিবারবর্গকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বেগমের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সার্দ্ধানার প্রাসাদে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতির মধ্যে তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়া মনে হয়,বেগম তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি টমাসের নিকট আপনার ঋণের বিষয় বিস্মৃত হয়েন নাই।

বেগম দুষ্কৃতের শাসনজন্য সময় সময় অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন সত্য; কিন্তু সে সময়ের প্রচলিত প্রথাই সেইরূপ ছিল। তখন বেগমের সম্মানের অন্ত ছিল না। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কর্ম্মত্যাগকালে বেগমকে "সমাদৃত বন্ধু" বলিয়া সম্বোধন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বেগমের বদান্যতার ও পরোপকার বৃত্তির বিশেষ প্রশংসা ছিল।*

তিনি লিখিয়াছিলেন :—

To Her Highness the Begum Sumroo.

My esteemed Friend,—I cannot leave India without expressing the sincere esteem I entertain for your highness's character. The benevolence of disposition and extensive charity which have endeared you to thousands, have excited in my mind sentiments of the warmest admiration; and I trust that you may yet be preserved for many years, the solace of the orphan and widow, and the sure resource of your numerous dependants. To-morrow morning I embark for England; and my prayers and best wishes attend you, and all others who, like you, exert themselves for the benefit of the people of India.

I remain,
With much consideration,
Your sincere friend
(Signed) M. W. Bentinck

Calcutta, March 17th, 1835.

বেগমের উত্তরাধিকারী—তদীয় সপত্নীপুত্রদৌহিত্র ডাইস সম্বার—লর্ড সেণ্ট্‌-ভিন্‌সেণ্টের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি প্যারিসে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার বিধবা লর্ড ফরেষ্টারকে বিবাহ করেন। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না।

কীন সত্যই বলিয়াছেন, ক্রীতদাসীর এই বিচিত্র জীবনকথা কল্পনাপ্রসূত কাহিনীকেও পরাজিত করে।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কীটাণুতত্ত্ব।

(ইতিহাস।)

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইল ব্যাধির সহিত কীটাণুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে। সেই সময় হইতে কীটাণুতত্ত্ব চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে ও নানাস্থানে কীটাণুতত্ত্বের আলোচনাকল্পে গবেষণাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জার্ম্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই আলোচনায় অজস্র অর্থব্যয় হইতেছে, এই কার্য্যে সুধীরা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে একটি গবেষণাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডাক্তার রজার্স ইহার অধ্যক্ষ। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর গবেষণাগৃহে ডাক্তার হ্যাফকিন বিসূচিকার টীকার রোগরস আবিষ্কার করেন। বোম্বাই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগৃহে প্লেগের তত্ত্বানুসন্ধান হইত; এক্ষণে তাহা প্রাদেশিক গবেষণাগৃহ বলিয়া পরিচিত। ডাক্তার হ্যাফকিন প্যারিসে পাস্তুর গবেষণাগৃহে শিক্ষালাভ করিয়া ডাক্তার সিম্‌সনের সহিত ভারতে আইসেন ও কলিকাতায় কার্য্য করিবার পর বোম্বাইয়ে প্লেগতত্ত্বানুসন্ধান গৃহের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন। বর্ত্তমানে ইনি ভারত সরকারের জীবতত্ত্ব গবেষণাগৃহের অধ্যক্ষ। আগ্রায় গবেষণাগৃহ অধ্যাপক হ্যান্‌-কিনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। মান্দ্রাজে রোগপ্রতিষেধ ঔষধাগারে মানুষের সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টীকার জন্য রোগরস প্রস্তুত করা হয়। শিমলার সন্নিকটে কাশৌলীতে ও মান্দ্রাজে কুনুরে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার্থ পাস্তুর গবেষণাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুই স্থানে অনুসৃত চিকিৎসাপ্রণালী ডাক্তার পাস্তুরের আবিষ্কৃত। নাইনিতাল অঞ্চলে মুক্তেশ্বর শৈলে ভারতসরকারের

গবেষণাগৃহে অশ্ব ও গোজাতির সংক্রামক ব্যাধির টীকার ব্যবস্থা হয়। এই গবেষণাগৃহ ৭৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত ; এবিষয়ে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ডাক্তার লিঙ্গার্ড সপ্তদশবর্ষ কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করায় ক্যাপ্টেন হোম্‌স্ ইহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে এই গবেষণাগৃহের জন্য স্থান নিরূপিত হয়। গৃহের উপকরণ এদেশে সংগৃহীত ও যন্ত্রাবলী বৎসর বৎসর বিদেশ হইতে আনীত হয়। এই জন্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যোপযোগী হয় নাই। পর বৎসর অগ্নিদাহে তিন ঘণ্টায় ছয় বৎসরের পরিশ্রমের ফল ভস্মীভূত হইয়া যায়। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ বঙ্গীয় পশু চিকিৎসালয় সংলগ্ন কীটাণুসন্ধান গৃহ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কক বিসূচিকার কীটাণুর সন্ধানে ভারতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ভারতে কীটাণুতত্ত্বের অলোচনা সূচিত হয়। তাহার পর ডাক্তার হ্যাফকিন কর্ত্তৃক বিসূচিকার টীকার রোগরস আবিষ্কারের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার পর ভারত সরকারের বিশেষ অনুরোধে ডাক্তার কক আর একবার ভারতে আসিয়াছিলেন। পরে ম্যালেরিয়ার কারণ-নির্ণয়ের জন্য ডাক্তার কুষ্টোফার ও ডাক্তার ষ্টীফেন্‌স্ এবং প্লেগ কমিশনসম্পর্কে ইটালীয়ান্ ও জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের আগমন।

কীটাণুতত্ত্বের ইতিহাস লিখিতে হইলে প্রথমেই ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত পাস্তরের নাম করিতে হয়। তিনিই প্রথমে সেপ্টিসিমিয়া অ্যানথ্রাক্স, চিকেন কলেরা প্রভৃতি ব্যাধির পরীক্ষাদ্বারা কীটাণুর সহিত সংক্রামক ব্যাধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করেন। তাহার পর লিষ্টার "অ্যান্টিসেপ্টিক" অস্ত্র চিকিৎসার আবিষ্কার দ্বারা চিকিৎসাশাস্ত্রে নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন। এই আবিষ্কার লিষ্টারকে অক্ষয় যশে যশস্বী করিয়াছে। ইহার পর জার্ম্মান ডাক্তার কক বিবিধ সংক্রামক ব্যাধির—বিশেষতঃ বিসূচিকার ও যক্ষ্মার—কীটাণু আবিষ্কার করিয়া সভ্য জগতে কীটাণুতত্ত্বর আলোচনায় নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত করেন।* প্রায় সার্দ্ধদ্বিশতাব্দী পূর্ব্বে কারচার এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, সংক্রামক ব্যাধিসমূহ কীটাণুকর্ত্তৃক উৎপাদিত। তিনি বিবিধ পণ্যদ্রব্যে বহু কীটাণু দেখিয়াছিলেন। সে সকল কীটাণু চক্ষুর অগোচর—অনুবীক্ষণসাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। কারচার কোন কোন ব্যাধির কীটাণুসন্ধান করিয়া ব্যর্থশ্রম হইয়াছিলেন। বোধ হয়

* গত ২৭শে মে বেডেন-বেডেনে হৃদ্‌রোগে এই অসাধারণ পণ্ডিতের মৃত্যু হইয়াছে।

তাঁহার অনুবীক্ষণ এই সকল কীটাণু দেখিবার উপযুক্ত শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু তাঁহার অসাফল্যেই এই মত অত্যল্পকালের জন্য বৈজ্ঞানিক জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পুনরায় অনাদৃত ও উপেক্ষিত হয়।

ডেনমার্কবাসী অ্যাণ্টনী ভন লেময়েনহক বাল্যকাল হইতে কাচ পরিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে পরকলা পরিষ্কার ও অনুবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতেন। তিনি কীটাণু সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তাঁহার নাম অনুবীক্ষণবিদ্‌গণের মধ্যে সুপরিচিত। তাঁহার তৎকালের কার্য্যবিবরণ রয়াল সোসাইটীর কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃষ্টির জলে, কূপোদকে, তৃণমর্জ্জিত সলিলে, লালায় ও দন্তাচ্ছাদনীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু দেখিয়াছিলেন। তিনি এই সকল কীটাণুর আকার, পরিমাণ ও গতিবিধি নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এই সকল আবিষ্কারের চিত্র (কাষ্ঠফলকে ক্ষোদিত) প্রকাশিত হয়। এই সকল চিত্রের সাহায্যে কীটাণুগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইহারা লিপ্‌টোথ্রিক্স, ফিলামেণ্টস্, ভিটিয়স্ ও স্প্রিল্লা দলভুক্ত। চিত্র না দেখিয়া কেবল বর্ণনা পাঠ করিয়াও ইহাদিগকে কীটাণু বলিয়া বুঝা যায়। ইহাদিগের গতিবিধি এত দ্রুত যে ইহারা ঘূর্ণমান লাটিমের মত বিচরণ করে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, স্বতন্ত্র ভাবে একটিকে লক্ষ্য করা কষ্টসাধ্য। একত্র অবস্থিত কীটাণুপুঞ্জকে মশকের ঝাঁকের মত বোধ হয়। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেন যে, তিনি কীটাণুর পরিসর নির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি স্থির করেন, একটি কীটাণু একটি বালুকা-কণার অপেক্ষা একসহস্রগুণ ক্ষুদ্র। যেগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তাহাদের গতিবিধি ও অন্যান্য কার্য্য দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। লেময়েনহক মানবশোণিতে এই সকল কীটাণুর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কারের পর বহু চিকিৎসক স্বীকার করেন যে, কীটাণুই ব্যাধির কারণ। এই সকল চিকিৎসকের মধ্যে নিকোলাস অ্যাণ্ড্রির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই বিষয়ে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৭১৮ খৃষ্টাব্দে লান্‌সিসি প্রচার করেন যে, ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানের দূষিত বায়ু কীটাণুপূর্ণ; এবং ১৭২১ খৃষ্টাব্দে টুলোঁর ও মার্সেলের প্লেগ কীটাণুকর্ত্তৃক উৎপাদিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যাহা হউক, তৎকালে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সর্ব্ববিধ ব্যাধিই কীটাণুকর্ত্তৃক উৎপাদিত বলায় লোকে কীটাণুবিজ্ঞানকে উপহাস করিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ উপহাস সত্ত্বেও কীটাণুর সহিত সংক্রামক রোগের ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ একরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিৎ লিনেকাস এ কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি লেময়েনহুকের আবিষ্কৃত কীটাণুগুলিকে সংক্রামক জ্বরের ও পচন ক্রিয়ার কারণ বলিয়া তাহাদিগকে "কেয়স" শ্রেণীভুক্ত করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি সংক্রামক ব্যাধির ও পচনশীল দ্রব্যের সহিত কীটাণুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু তিনি এই মতের বিশেষ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারায় এই মত পুনরায় অনাদৃত হয়।

কিন্তু কিছুদিন "যে তিমিরে সে তিমিরে" থাকা সত্ত্বেও এই মতের আলোচনা চলিতে লাগিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারণ গ্লেসেন উদ্ভিজ্জ পচনশীল দ্রব্যের কতকগুলি কীটাণুর সচিত্র বর্ণনা প্রকাশ করেন এবং জ্যাবলট্, লেসর, রুমুর, হিল ও অন্যান্য বিজ্ঞানবিৎ এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। হিল বলেন, পৃথিবীতে কোন স্থান কীটাণু-শূন্য নহে; এক বিন্দু জলে শত সহস্র কীটাণু দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু ইহারা নিত্য নূতন কীটাণুর আবিষ্কারচেষ্টায় ব্যস্ত থাকায় আবিষ্কৃত কীটাণুগুলির পরীক্ষায় ও শ্রেণীবিভাগে মনোযোগী হয়েন নাই। কাযেই কীটাণু-বিজ্ঞানেরও বিশেষ উন্নতি হয় নাই। তাহার পর কোপেনহেগেনের বিখ্যাত পণ্ডিত মুলারের আবির্ভাবে কীটাণুবিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তিনি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিত্য নব কীটাণুর আবিষ্কারস্পৃহার প্রতিবাদ করিয়া আবিষ্কৃত কীটাণুগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া ও বিশেষত্ব নির্ণয় করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায়ে, পরিশ্রমে ও গবেষণায় কীটাণুতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহার পর বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কীটাণু স্বতঃজনিত কি পূর্ব্ববর্ত্তী কীটাণুজ এই বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই স্বতঃজনন মতবাদের ফলে কীটাণুর জীবনের ইতিহাস ও ব্যাধির সহিত কীটাণুর সম্বন্ধ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

মৃত্যু-মিলন।

—:০:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

রাণী।

—•—

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্ম। মধ্যে মধ্যে যে দুই এক পশলা বৃষ্টি হয়, তাহাতে ধরণী শীতল হয় না। অন্তঃপুরসংলগ্ন উদ্যানে রাণী ও উমা একখানি আসনে উপবিষ্টা। সম্মুখে সরসীর সচ্ছ সলিলে শশধরের প্রতিবিম্ব শোভা পাইতেছে। বাতাসের অভাবে সরসী-সলিল অকম্পিত—স্থির, যেন মসৃণ কাচখণ্ড মাত্র। সরোবরের চারিদিকে সোপানশ্রেণী তীর হইতে জলে নামিয়াছে। তীরে কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরস্তম্ভের উপর ছাত—চাঁদিনী। উত্তর-দিকে চাঁদিনীতে রাণী ও উমা উপবিষ্টা। রাণীর মুখ গম্ভীর—যেন তিনি চিন্তা-বিষ্টা। তাঁহার সৌন্দর্য্যে কোমলতার কমনীয় ভাবের কিছু অভাব। নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—প্রখর বুদ্ধির পরিচায়ক। অধরে দৃঢ়তা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। মুখ-ভাবে ঔদাস্য ও বিরক্তি সপ্রকাশ—যেন তাঁহার ভালবাসিবার, আশা করিবার, আকাঙ্ক্ষার কোন বস্তুই নাই; যেন সুখ বা দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তাঁহার সৌন্দর্য্যও সেইরূপ। তিনি অনিন্দ্যসুন্দরী; কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে ভাবের লেশ-মাত্র নাই। সে সৌন্দর্য্য স্থির—স্থায়ী। যেমন কোন ভাবের আতিশয্যে তাঁহার স্থির হৃদয় চঞ্চল হয় না, তেমনই কোন কারণে তাঁহার সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ বা ক্ষীণ হয় না। মাতৃত্বের বিকাশে সে হৃদয় সরসতায় বা সে সৌন্দর্য্য কোমলতায় শোভিত হইবার অবকাশ পায় নাই। তিনি যেন নিপুণ ভাস্করের সার্থক স্বপ্ন—সৌন্দর্য্যের আদর্শ—রূপের প্রতিমা; কেবল তাহাতে প্রাণ নাই।

আজ এই উদ্যানমধ্যে বসিয়া রাণী কি ভাবিতেছিলেন। উদ্যান চন্দ্রালোক-বিধৌত। চন্দ্রালোকে সৌন্দর্য্যহীনকেও সুন্দর দেখায়—সুন্দরকে আরও সুন্দর দেখায়। আজ চন্দ্রালোকে উপবনখানি চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। উদ্যানে বড় গাছ নাই। পাতায় পাতায়—ফুলে ফুলে স্নিগ্ধ আলো; গাছের তলে তরল অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে কুঞ্জ—কুঞ্জমধ্যে আলোকসূচিবিদ্ধ অন্ধকার, গাঢ় নহে, কিন্তু স্নিগ্ধ। নানা জাতীয় কুসুম বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু পবনে রজনীগন্ধার

প্রখর সৌরভ ও যুথিকার স্নিগ্ধ গন্ধই ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাম হস্তের বদ্ধ মুষ্টির উপর মস্তকের ভার সংস্থাপিত করিয়া উর্দ্ধমুখে চাহিয়া রাণী ভাবিতেছেন। আকাশে উজ্জ্বল তারকার মত তাঁহার কৃষ্ণ কেশে কয়খানি হীরক চন্দ্রকরে জ্বলিতেছে।

উমা রাণীর পার্শ্বে বসিয়া আছে। তাহার নয়ন ক্রমে নিদ্রা-বিজড়িত হইয়া আসিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে রাণী উমাকে বলিলেন, "উমা, তুমি গৃহে যাও।"

উমা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যাইবেন না ?"

"আমার যাইবার বিলম্ব আছে।"

"আমার থাকিতে কোন বাধা আছে কি ?"

"কিছু মাত্র না। রাত্রি অনেক হইয়াছে। তোমার নিদ্রার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তাই তোমাকে যাইতে বলিতেছি।"

"আপনি কি আরও জাগিয়া থাকিবেন ?"

"আমার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে না। ঘরে বড় গরম। এ স্থানে বায়ু একটু শীতল বোধ হইতেছে ; তাই যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

উমা যাইবে কি থাকিবে স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, এমন সময় একজন পরিচারিকা রাণীর নিকটে আসিল।

পরিচারিকা রাণীকে জানাইল,—"শঙ্কর সিংহ বিশেষ আবশ্যক কার্য্যে এখনই এই উপবনে আসিতে চাহেন।"

রাণী বিস্মিতা হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নিশীথে এ উদ্যানে শঙ্কর সিংহের কি প্রয়োজন ?"

"আমি তাহা জানি না।"

"যাও ; জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।"

পরিচারিকা জানিয়া আসিয়া বলিল, "তিনি বলিলেন, তিনি রাজকার্য্যে এ উদ্যানে আসিতে চাহেন।"

রাণী বলিলেন, "নিশীথে—অন্তঃপুরের উদ্যানে রাজকার্য্য !" তাহার পর তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন, "তাঁহাকে লইয়া আইস।"

পরিচারিকা শঙ্কর সিংহের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল।

শঙ্কর সিংহ রাণীকে বলিলেন, "আমি রাজকার্য্যে বাধ্য হইয়া আপনাকে বিরক্ত করিলাম। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

রাণী বলিলেন, "এখন এ উদ্যানে কি প্রয়োজন ?"

"আমি রাজার কার্য্যে আসিয়াছি। আপনি যে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এ উদ্যানে থাকিবেন—ইহা আমরা জানিতাম না। জানিলে—"

"জানিলে কি হইত ?"

"জানিলে অন্য ব্যবস্থা করিতাম।"

"কিসের জন্য ব্যবস্থা ?"

শঙ্কর সিংহ নীরব রহিলেন।

রাণী বলিলেলেন, "শঙ্কর সিংহ, নিশীথে অন্তঃপুরে রাজার সুহৃদের কি প্রয়োজন, আমার কি তাহা জানিবার অধিকারও নাই ?"

রাণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। শঙ্কর সিংহ ভাবিলেন, রাণী বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বলিলেন,"আপনি আদেশ করিলে আমি সে কথা অবশ্যই বলিব। কিন্তু পরিচারিকার সমক্ষে সে কথা বলা বোধ হয় রাজার অভিপ্রেত নহে।"

নারীজনসুলভ কৌতূহল তখন রাণীর ব্যাকুলতা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি করসঞ্চালনে পরিচারিকাকে অপসৃত হইতে আদেশ করিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "রাজা আমাকে মধ্য রাত্রিতে এই উদ্যানে থাকিতে বলিয়াছেন।"

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

"রাজা এই উদ্যানের দ্বারপথে প্রাসাদে প্রবেশ করিবেন।"

রাণীর বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের দৃষ্টি শঙ্কর সিংহের মুখে স্থাপিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা প্রাসাদে নাই ?"

শঙ্কর সিংহ ধীরভাবে বলিলেন, "না।"

"তিনি কোথায় ?"

"বাহিরে গিয়াছেন।"

"কেন ?"

শঙ্কর সিংহ মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "প্রজার অবস্থা-পর্য্যবেক্ষণের ও তাহাদের মনোভাব জানিবার উদ্দেশ্যে।"

রাণীর নয়নে উজ্জ্বল দীপ্তি দেখা দিল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার এ পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিবার কারণ কি ?"

"পরিচয় না পাইলে প্রহরীরা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। পরিচয়

দিলে, এ কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে—ভবিষ্যতে তাঁহার পক্ষে আর আত্মগোপন সম্ভব হইবে না।

"আর কেহ এ কথা জানে না?"

"না।"

"কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে না?"

"তিনি ছদ্মবেশে গমন করেন।"

"ছদ্মবেশে! কেহ সঙ্গে থাকে না?"

"প্রথম কয় দিন আমি সঙ্গে ছিলাম; এখন আর আমাকে সঙ্গে লইয়া যায়েন না।"

রাণী কি ভাবিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন্ রাজার ফিরিবার সম্ভাবনা?"

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "বোধ হয় শীঘ্রই ফিরিবেন।"

রাণী উঠিয়া পশ্চাতে দ্বারের দিকে চলিলেন। শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "দ্বারে পাঁচ বার মৃদু করাঘাতশব্দ শুনিলে বুঝিবেন, রাজা আসিয়াছেন। তখন আমাকে ডাকিবেন।"

রাণী যাইয়া দ্বারের নিকটে একখানি আসনে বসিলেন, উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

মাথার উপর হইতে চন্দ্র ক্রমে পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িল, রজনীর স্তব্ধতা যেন ঘনীভূত বোধ হইতে লাগিল। রাণী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সেই জ্যোৎস্না-লাক—সেই কুসুমসৌরভ কিছুতেই তাঁহার কোন আকর্ষণ নাই।

উমা রাণীর নিকটে অন্য আসনে বসিয়া রহিল, শঙ্কর সিংহ কিছু দূরে রহিলেন।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। চন্দ্র পশ্চিম দিক্‌চক্রবালের দিকে আরও অগ্রসর হইল। রাণী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আজ এই নিশীথে চারি দিকে যে স্নিগ্ধ শান্তি তাহার সহিত তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতার কি প্রভেদ! আজ বসিয়া বসিয়া তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন!

সহসা রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বারে মৃদু করাঘাত শব্দ শ্রুত হইল। রাণী শঙ্কর সিংহকে ডাকিলেন না; স্থির হইয়া শুনিলেন। শব্দ মিলাইয়া গেল।

তাহার পর আবার পাঁচ বার শব্দ শ্রুত হইল।

রাণী স্বয়ং যাইয়া দ্বারের অর্গল মোচন করিলেন।

ছদ্মবেশে রাজাকে চিনিতে পারা দুঃসাধ্য। দ্বার মুক্ত করিয়া—তাঁহাকে দেখিয়া রাণী সহজাতসংস্কারহেতু দুই পদ পিছাইয়া আসিলেন।

রাণীকে সম্মুখে দেখিয়া রাজার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। তিনি ভাবিলেন, এ আবার কি দুর্ভেদ্য রহস্য!

রাজা বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—"রাণী!"

রাজা দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া ফিরিতে না ফিরিতে রাণী বলিলেন- "এই নিশীথে একাকী বাহিরে যাওয়া কি একান্ত আবশ্যক?"

রাজা ভাবিলেন, বুঝি রাণীর প্রেমহীন, কঠিন হৃদয়ও সন্দেহ-দংশন হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তিনি বলিলেন,—"একান্ত আবশ্যক কার্য্যে আমাকে যাইতে হয়।"

রাণী বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে কি বিপদ ঘটিতে পারে না?"

দৃঢ় বিশ্বাস ক্রমে সংস্কারে পরিণত হইলে মানুষের হৃদয়ের সকল বৃত্তিকে আপনার বর্ণে রঞ্জিত করে। রাজা রাণীর কণ্ঠস্বরে আকুলতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে। কিন্তু সে আশঙ্কাকে ঘনীভূত করিয়া আমাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারে আমার এমন কোন আকর্ষণ নাই। আমার বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে কাহারও ত কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।"

রাজার কথার তীব্র তিরস্কার রাণীর হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল।

শঙ্কর সিংহকে রাণীর উদ্যানে অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রাজা উদ্যান ত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্যথিতা।

রাজা উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যত দূর দেখা গেল, রাণী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই আসনে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল।

রাণী কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন; তাহার পর—যেন অসহনীয় বেদনায়—ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আগ্নেয় গিরি যত দিন পারে কঠোর শিলার বন্ধনে তাহার হৃদয়স্থিত দুঃসহ তাপ রুদ্ধ করিয়া গোপন রাখে; কিন্তু শেষে এক

দিন তাহার শিলাবন্ধ কমলপত্রের মত অসার প্রতিপন্ন করিয়া সে তাপ জ্বালাময়ী গৈরিক নিস্রাবে—লেলিহান অনলশিখায়—দ্রবীভূত সংহারাস্ত্রে আত্মপ্রকাশ করে। রাণী এত দিন অন্তরে যে ভাব গোপন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে ভাব আজ তাঁহার অভ্যস্ত অবিচলতা অনায়াসে অবহেলা করিয়া সদর্পে বাহিরে আসিল।

উমা রাণীকে কখনও এমন বিচলিত দেখে নাই। সে বিস্ময়ে মূক হইয়া রহিল। আর সেই বিকশিত উপবনে অটুট-গাম্ভীর-গর্ব্বচ্যুতা রাণী বেদনা-ব্যথিতা বালিকার মত আকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। রোদনোচ্ছ্বাসে তাঁহার দেহ পবনবিচলিত কুসুমভারনম্র লতিকার মত কম্পিত হইতে লাগিল। উমা ভাবিল—এ কি? সে কয় দিন হইতে রাণীর অভ্যস্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে বিলয়-ভূয়িষ্ঠ বিদ্যুতের মত যে চঞ্চলতা লক্ষ্য করিতেছিল, তাহা বুঝি এই প্রলয়-ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ! কয় দিন হইতে রাণী কেমন অন্যমনস্কা—তিনি যেন চেষ্টা করিয়া তাঁহার অভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য নিবিড়তর করিয়া তুলিতেছিলেন—সে বুঝি ঝটিকার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী নিষ্কম্প স্থিরভাব? কিন্তু এ ঝটিকার কারণ কি? সরলা—সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা যুবতী, কোথায়—কত দিনে—কি কারণে ঝটিকা উৎপন্ন হয়, তাহা কে বলিতে পারে? সে যখন সাজান বাগান শ্মশান করিয়া চলিয়া যায়, তখন আমরা ভাবিয়া মরি—আর আমাদের অক্ষমতা উপলব্ধি করি।

আজ বিবাহিত জীবনের সকল কথা একে একে রাণীর মনে পড়িতে লাগিল। রুদ্রমূর্ত্ত নিদাঘের তীব্র তপনতাপে যখন ধরাপৃষ্ঠ রসলেশশূন্য, শুষ্ক, কঠিন হইয়া পড়ে তখন শষ্পাস্তরণ শুকাইয়া যায়; তখন ধূলি-ধূসর, দীর্ণ ধরাপৃষ্ঠে চাহিয়া কেহ বুঝিতে পারে না যে, ধরণী সযত্নে সেই সৌন্দর্য্যের বীজ সংরক্ষণ করিয়াছে—তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া নূতন জীবনের আনন্দে ও আগ্রহে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নিদাঘের পর যখন স্নিগ্ধ গম্ভীর ভেরীনাদে বনভূমি বিকম্পিত করিয়া,—উজ্জ্বলতাপতাম্র গগন মেঘজালে স্নিগ্ধ—সরস করিয়া পয়োদজালবাহীপবনসহচর বর্ষা দেখা দেয়, তখন—যখন গিরিকন্দর শিখিনৃত্যে মনোরম ও পল্বল ভেককলরবে মুখরিত হইয়া উঠে—বর্ষার প্রথম বারিধারা ধরাবক্ষ সরস করিতে না করিতে ধরণী সেই সযত্নসংরক্ষিত বীজ হইতে নূতন শষ্পাস্তরণ বিস্তৃত করিয়া দেয়। তেমনই আমরা জীবনের যে সকল ঘটনা বিস্মৃত হইয়াছি মনে করি, যে সকল ঘটনার কথা দৈনন্দিন জীবনের অজস্র ঘটনার মধ্যে—সংসারের নিত্য প্রবহমান ঘটনার স্রোতে—দেখা দেয় না, স্মৃতি

সে সকলকে, সযত্নে রক্ষা করে; সে তাহাদের ভুলে না—ফেলে না। কিন্তু যে দিন—যখন যে মুহূর্ত্তে সে সুযোগ পায় সেই মুহূর্ত্তেই সে অতীতের আবরণে সুরক্ষিত সেই সকল ঘটনা নূতনের উৎসাহে ও আগ্রহে, আনন্দে ও আকুলতায় আনিয়া উপস্থিত করে। আজ স্মৃতি রাণীর বিবাহিত জীবনের সকল ঘটনা তেমনই ভাবে আনিয়া উপস্থিত করিতেছিল।

রাণীর মনে পড়িতে লাগিল, বিবাহের সময় সখীদল বিবাহিত জীবনের কত আশার কথা তাঁহার কর্ণমূলে গুঞ্জন করিয়াছিল। সেই সকল আশা লইয়া তিনি প্রথম স্বামিগৃহে আসিয়াছিলেন। পিত্রালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার মুগ্ধ হৃদয় সেই আশার আলোকে রঞ্জিত কল্পনার সুখস্বপ্নলোকে বাস করিতে লাগিল। সেই স্বপ্নলোকে জীবনে দুঃখ নাই, কুসুমে কণ্টক নাই, হৃদয়ে বেদনা নাই, জগতে অন্ধকার নাই। সে স্বপ্নলোকে সর্ব্বত্র সুখের উৎস উৎসারিত। তাহার সহিত দুঃখশোকতাপপূর্ণ মরলোকের কোন সাদৃশ্য নাই। প্রেম প্রেমিকপ্রেমিকাকে সেই স্বপ্নলোকে লইয়া যায়—তথায় অবারিত সুখ ভোগ করিতে দেয়। প্রেম হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে—জীবনের সৌন্দর্য্য বিকশিত করে। তাই প্রথম-প্রণয়-স্পর্শে হৃদয় প্রজাপতির পক্ষে আরোহণ করিয়া কল্পনাকুসুমসৌরভসুরভিত সুখলোকে বিচরণ করে।

রাণীর হৃদয় তখন সেই সুখলোকে বিচরণ করিতেছিল। আর তাহার কল্পনা তখন স্বামীকে বেষ্টন করিয়া ফিরিতেছিল।

এই ভাবে কয় বৎসর গেল। তখন রাজপুতানায় দুর্দ্দশার ছায়াপাত হইতেছে, কূটবুদ্ধি আকবর দিল্লীর সিংহাসনারোহণকালেই স্থির করিয়াছিলেন, ভারতে মোগল-প্রভুত্ব যাহাতে বদ্ধমূল হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। পিতার লাঞ্ছনার কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি ছলে,বলে, কৌশলে ভারতে মোগল-প্রভুত্ব স্থায়ী করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘজীবন সেই চেষ্টাতেই ব্যয়িত হইয়াছিল। হিন্দুকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া তাহার সহায়তা লাভ করা, হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্যসংরক্ষণসঙ্কল্প নষ্ট করা, হিন্দুকে মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট রাখিয়া তাহাকে তাহার প্রকৃত অবস্থা বিচারে অক্ষম করা,-- এই সকলই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আর এই উদ্দেশ্যই তাঁহার রাজনীতি গঠিত করিয়াছিল। বীরভূমি রাজপুতানা তাঁহার শ্যেন-দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি রাজপুতদিগকে মোগল সিংহাসনে বদ্ধ করিবার চেষ্টায় চেষ্টিত ছিলেন। সংগ্রামে, সমাজবন্ধনে, সখ্যতায়—কেহ কেহ মোগলের সহায় হইতেছিলেন।

রাণীর পিতা প্রবীণ রাজপুত। তিনি রাজপুতদিগের এইরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছিলেন। তিনি তাঁহাদের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া যে সকল রচনা রচিত করেন—চারণগণ তাহা গান করিয়া ফিরিত। রাজপুতানার ইতিহাসে সেই সকল বীরত্ব-উদ্দীপক রচনার বিশেষ উল্লেখ আছে। রাণী বালিকা-বয়সে সেই সকল রচনা শুনিতেন; পিতার নিকট রাজপুতের অতীত গৌরব ও বর্ত্তমান অধঃপতনের কথা শুনিতেন; পিতার মতে আকৃষ্টা হইতেন। বালিকা-হৃদয়ে রাজপুত-গৌরব সমুজ্জ্বল রাখিবার বাসনা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল।

এই অবস্থায় তিনি স্বামীর 'ঘর করিতে' আসিলেন। তখন তাঁহার উন্মেষোন্মুখ হৃদয়ে বাসনা—তিনি স্বামীকে রাজপুতগৌরবসংরক্ষণে সচেষ্ট করিবেন; তাঁহার দ্বারা রাজপুতানা একসূত্রে বদ্ধ করিয়া রাজপুতকে মোগলের বন্ধুত্ববন্ধনে—অর্থাৎ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে দিবেন না; ভারতে রাজপুতশক্তি মধ্যাহ্ন ভাস্করের মত প্রদীপ্ত শোভায় সমুজ্জ্বল করিবেন। তরুণ হৃদয়ের কল্পনা সেই বাসনাকে বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি তখন সেই বাসনার প্রভাবে প্রভাবিতা—তাহার জন্য ব্যাকুলা।

সেই প্রবল বাসনা লইয়া তিনি স্বামীর 'ঘর করিতে' আসিলেন; আসিয়া প্রথমেই স্বামীর একটি কার্য্যে স্বামীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা ভক্তিতে পরিণতি-প্রাপ্ত হইল।

কুলপ্রথা অনুসারে রাণীর সহিত কয়জন সখী আসিয়াছিল। এইরূপ সখীরা রাজ-অন্তঃপুরেই থাকিয়া যাইত; জামাতার জন্যই তাহারা প্রেরিত হইত। রাজা তখন যুবরাজ। তিনি এই প্রাচীন প্রথার বিরোধী হইলেন। তিনি পত্নীর সখীদিগকে ফিরাইয়া পাঠাইলেন; কিন্তু সে কার্য্য এমনভাবে সম্পন্ন করিলেন যে, তাহাতে অশিষ্টাচারের ছায়াস্পর্শও হইল না। বলা বাহুল্য পত্নীর উন্মেষোন্মুখ হৃদয়ে ইহাতে আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বিস্ময়ে, পুলকে, প্রেমে ও শ্রদ্ধায় আকুল হইয়া উঠিলেন। এ কার্য্যে যুবরাজ যে দৃঢ়তা ও যে সাহস দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার পত্নীর হৃদয়ে আশা জন্মিল—রাজপুতের গৌরব-রক্ষা তাঁহা হইতেই সম্ভব হইবে। তিনি সেই আশায় উৎফুল্ল হইলেন।

কিন্তু যুবরাজ পত্নীর সে ভাব বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তখন প্রেমস্বপ্নে বিভোর। পত্নী রাজ্যের কথা—প্রজার কথা—মোগলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন, সে সকল বিষয়ে পতির মনোযোগ নাই। তিনি বড় আশায় হতাশ হইলেন।

তাহার পর মোগলের অত্যাচারের কথা অন্তঃপুরেও পৌঁছিতে লাগিল। পত্নী

দিন দিন ভাবিতে লাগিলেন, পতি শৌর্য্যবীর্য্যহীন—জড়বৎ জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার প্রেম প্রথমপ্রবাহপথে হতাশার শিলাপ্রাচীরে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাহার পর তিনি শুনিতে লাগিলেন, অন্তঃপুরে কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল—যুবরাজ পত্নীর জন্য রাজকার্য্য বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কি লজ্জা! কি আক্ষেপ! তিনি কি চাহিয়া কি পাইলেন! তাঁহার প্রতিহত প্রেম তাঁহার হৃদয়েই রুদ্ধ রহিয়া হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল।

তাহার পর এরূপ অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই হইল; উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়িতে লাগিল। প্রেমের প্রভাত-কিরণে জীবন সমুজ্জ্বল হইতে না হইতে হৃদয়ে ঔদাসীন্যের গাঢ় ছায়া পড়িল। প্রেমের প্রবাহে যদি ঔদাসীন্যের বাধা পড়ে তবে তাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলে।

যুবরাজ রাজ্যলাভ করিলেন। কিন্তু রাজ্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। রাণী বুঝিতে পারিলেন না,—প্রেমের প্রথম উচ্ছ্বাস অপগত হইলে তিনিই শক্তিসঞ্চার করিয়া রাজাকে কর্ত্তব্য-সাধনে সমুৎসুক করিতে পারিতেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না,—তাঁহারই ব্যবহারে রাজার আর কোন বিষয়ে উৎসাহ নাই,তাই—তিনি রাজকার্য্যেও মনোযোগ দান করেন না।

এই ভাবে এত দিন কাটিতেছিল।

এখন রাজার ভাবান্তর দেখিয়া রাণীর হৃদয়ে সেই সঞ্চিত প্রেমরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিলেন;—হায়, তিনি কি অন্ধ! যাঁহার এত গুণ, তাঁহার গুণবিষয়ে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন! যিনি সর্ব্বতোভাবে রাজগুণে বরেণ্য, তিনি তাঁহাকে অসার মনে করিয়াছেন!

রাণী কাঁদিতে লাগিলেন। হায়, তিনি কি ভ্রান্তিবশে কি অমূল্য রত্ন [illegible]াইয়াছেন!

বহুক্ষণ কাঁদিয়া মনের ভার লঘু হইলে রাণী উঠিলেন। তখন চন্দ্র পশ্চিম দিকচক্রবাল স্পর্শ করিতেছে—দিবালোক ফুটে ফুটে। সেই স্নিগ্ধমধুর আলোকে—সেই দিবা ও নিশার সন্ধিস্থলে উমার মনে হইল, যেন রাণীর রূপরাশি কোমলতায় স্নিগ্ধ হইয়াছে—তাঁহাকে শিশিরস্নাত কুসুমের মত দেখাইতেছে।

রাণী মুখ তুলিয়া উমাকে দেখিলেন; উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "উমা, আমি কি ভ্রান্ত!" রাণীর হৃদয়ে প্রবল বাসনা জন্মিল, রাজার কাছে সকল কথা বলিবেন। তিনি উদ্যান ত্যাগ করিয়া প্রাসাদে রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা সে গৃহে নাই!

প্রজ্ঞাপারমিতা।

'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীর যে মূর্ত্তির প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তাহা মালদহ ও রাজসাহীর সংযোগস্থলে গাঙ্গুর গ্রামে এক মৎস্যজীবীর গৃহে বহুকাল বিরাজ করিতেছিল। প্রায় এক বৎসর হইল ইহা আমার হস্তগত হইয়াছে। গাঙ্গুর গ্রাম সম্ভবতঃ কোন সময়ে পাল রাজগণের রাজধানী ছিল। এখানে বিবিধ প্রকারের বুদ্ধমূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং ভগ্ন প্রাসাদেরও নানারূপ চিহ্ন বিদ্যমান আছে। গাঙ্গুর নাম আমাদের নিকট সুপরিচিত। বেহুলা স্বামীর শব লইয়া গাঙ্গুর নদীতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। এই গ্রাম কি সেই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল?

মূর্ত্তিসম্বলিত সমগ্র প্রস্তরখানি ৩১ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ১৫ ইঞ্চ প্রশস্ত। কেবল মূর্ত্তিটি ১৮ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ১২ ইঞ্চ প্রশস্ত। প্রস্তর ফলকের নিম্নে একটি কীলক আছে। মূর্ত্তির দক্ষিণে হয়গ্রীব এবং বামভাগে তারা। পাদপীঠে দক্ষিণ দিকে দুইটি ভক্ত। ঊর্দ্ধে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ এবং মূর্ত্তির দক্ষিণে ও বামে প্রস্তরফলকে ভুজঙ্গধর সচঞ্চু শিখী এবং সিংহ ও অশ্ব উভয়ের আকৃতিযুক্ত জন্তু বিশেষের চিত্র ক্ষোদিত। ঊর্দ্ধতম ধ্যানী বুদ্ধের নিম্নে সিংহমুখ। ইহা দেবীর অভিষেক-নিমিত্ত ফোয়ারা স্বরূপে কল্পিত হইয়া থাকিবে। প্রজ্ঞাপারমিতা দেবী বিকশিত শতদলে আসীনা। ইনি দ্বিভুজা—এক হস্ত ত্যাগ ও বরদানের সঙ্কল্পে অর্দ্ধ প্রসারিত। অপর হস্তটি ভগ্ন হইয়াছে কিন্তু তাহা যে সমৃণাল বিকাশোন্মুখ পদ্ম কুসুমটি ধারণ করিয়াছিল, তাহা দৃষ্ট হইতেছে। দেবীর কিরীট ভগ্ন হইয়াছে কিন্তু তদীয় শিরের জ্যোতির্ম্ময় পরিবেষ্টন রহিয়াছে।

বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে যাঁহারা এই মূর্ত্তিটি দেখিয়াছেন, তাঁহারা অ[illegible] ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা মাগধ কলা[illegible] কিন্তু মূর্ত্তির গণ্ডদেশে, ভ্রূযুগে ও ওষ্ঠাধরে চীন শিল্পাদর্শের কিঞ্চিৎ চিহ্ন বিদ্যমান। ভারতীয় পরবর্ত্তী যুগের মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে এই শ্রেণীর মূর্ত্তির একটু বিভিন্নতা আছে। পরবর্ত্তী ভাস্করগণ কিছু অলঙ্কারপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বিগ্রহের কণ্ঠাবলম্বী হার, বাহুর অঙ্গদ, কটির মেখলা ও পরিধেয় বস্ত্রের নানা অপূর্ব্ব ভঙ্গী ক্ষোদিত করিতে যেরূপ যত্ন প্রদর্শন করিতেন, বিগ্রহের দেবভাব রক্ষা করিতে ততটা প্রয়াসী হইতেন না। ভারতীয় কলা-শিল্পের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, শিল্পিগণ ধ্যানের ভাব ধারণা করিতে পারিতেন। তাঁহারা বিগ্রহে কেবল মনুষ্যের

আকার দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; পরন্তু সেই বিগ্রহ যে দেবতা এবং উপাস্য, তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে সেই ভাবের অভিব্যক্তিসাধনে প্রয়াসী হইতেন। এই জন্যই সেই প্রাচীন বিগ্রহগুলির বাহ্য গঠনে যদি কিছু অসামঞ্জস্য বা দোষ থাকে, আমরা তাহা ভুলিয়া যাই। যে মহত্ত্বের ছটা বিগ্রহের ললাট ও অধরোষ্ঠে বিচ্ছুরিত, যে ধ্যানের ভাব সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও করাঙ্গুলীর সঙ্কেতে প্রকটিত, তাহাই আমাদিগের চিত্তকে ভক্তির ও বিস্ময়ের ভাবে পরিপ্লুত করে।

গান্ধার ভাস্কর্য্যের নিদর্শনগুলি ভারতীয় মিউজিয়মের কক্ষে বিরাজ করিতেছে। বুদ্ধের বিচিত্র মূর্ত্তি তথায় দর্শনীয়। এই শিল্প-শালায় কোথাও বা বুদ্ধ প্রচার করিতেছেন, দীর্ঘশ্মশ্রু বৃদ্ধ মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতেছে, বালক ও রমণীগণ বুদ্ধের উপদেশ শুনিবার জন্য আগ্রহসহকারে তাঁহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়াছে। কোথাও বা বুদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত; সম্মুখে উৎকণ্ঠিত শিষ্যবর্গ। গান্ধার শিল্পশালায় মূর্ত্তিগুলি অনেকটা গ্রীক আদর্শে বিরচিত। মাগধ মূর্ত্তির বাহ্যগঠনের ত্রুটি গান্ধার ভাস্কর্য্যে দৃষ্ট হয় না; সুতরাং প্রথম দৃষ্টিতে গান্ধারের আদর্শই ভারতীয় ভাস্কর্য্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতরূপে ভারতীয় শিল্পমহিমা জানিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, গান্ধারের আদর্শে ধ্যান নাই। তাহাতে বাহিরের আকার আছে, ভারতীয় দেব-ভাব নাই; তাহা মানুষের অনুকরণ, কিন্তু স্বর্গকে সাধকের চক্ষুতে প্রতিভাত করে না। বুদ্ধদেব প্রচার করিতেছেন,—সেই দৃশ্য গান্ধারবাসী ভাস্কর সাধারণ ঘটনায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন, প্রচারক ও শ্রোতার কোন বিশেষত্ব নাই। এদিকে অজন্তার চিত্রে বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, নগরের রমণী ও বালক ভিক্ষা দিতে যাইয়া তাঁহার রূপ দেখিয়া ভিক্ষা দিতে ভুলিয়া গিয়াছে; সহসা দেবতা দেখিলে মানুষের যেরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িবার কথা, চিত্রকর তাহাই আঁকিয়া দেখাইয়াছেন; বুদ্ধের রূপসুধা পান করিয়া ভিক্ষাপ্রদানোদ্যত বালকের ও নারীর চক্ষু ধ্যানের ভাবে উর্দ্ধগ হইয়াছে। অন্য দেশের চিত্রকর এই ভাবটি চিত্রে আঁকিয়া বুঝাইতে পারিতেন না।

মগধ কলা-শিল্প ও তৎপথাবলম্বী চিত্রাদর্শের ইহাই বিশেষত্ব! সেই সকল বিরাট দেবদেবীর মূর্ত্তির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমরা বিস্মিত হইয়া পড়ি। ভাস্কর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করিয়াছেন, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠনের প্রতি তিনি কতকটা উদাসীন। তাঁহার দৃষ্টি উচ্চতর-লক্ষ্য-বদ্ধ। আত্মার যে প্রশান্ত ভাবকে বৌদ্ধগণ

নির্ব্বাণ ও হিন্দুরা যোগ আখ্যা প্রদান করেন, যাহাতে অবস্থিত হইলে মানুষ দেবতা হয়, মাগধ ভাস্কর সেই মহাশক্তির ভাব বিগ্রহে আনিতে চেষ্টিত। এই চেষ্টায় প্রাচীন কালের অসমগঠন বিরাট প্রস্তরখণ্ডগুলি মহিমান্বিত দেববিগ্রহে পরিণত হইয়াছে। সেই সকল সিংহবৎ তেজস্বী অথচ মায়ামুক্ত, বিরাটকায় অথচ নিষ্কম্পদীপবৎ প্রশান্ত আদর্শ-পুরুষ মূর্ত্তি দেখিলে অন্য সর্ব্ব প্রকার চিত্র বা প্রস্তর মূর্ত্তি আমাদের চক্ষুতে ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে। মগধ হইতে কপিলাবস্তু বহু দূরে অবস্থিত নহে। মাগধ ভাস্কর কপিলাবস্তুর ভিক্ষুরাজকে যথাযথ গঠন করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তিনি যে তাঁহারই করুণাকে জীবন্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রজ্ঞাপারমিতার রূপ প্রস্তরে ক্ষোদিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রজ্ঞাপারমিতা মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণের প্রধান দেবতা। ইনিই ধর্ম্ম,—স্ত্রীরূপা। দয়া ইঁহার প্রধান লক্ষণ। আলোচ্য মূর্ত্তিখানি নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের ক্ষতচিহ্ন ধারণ করিতেছে; কিন্তু তথাপি ইহাঁর ওষ্ঠাধরে যে সর্ব্বজনমনোহর হাস্যের একটু বিকাশ আছে, তাহা অনিন্দ্য দেবহাস্য, নরজগতে ইহার উদাহরণ বিরল। ঘুমন্ত শিশুর হাস্যের সঙ্গে এই হাসির একটু সাদৃশ্য আছে। হস্তের ভঙ্গী ও অবয়বের প্রতি দৃষ্টি করুন, ইনি যেন শরীরী হইয়াও অশরীরী। দেহে পূর্ণযৌবনলক্ষণ বিদ্যমান, কিন্তু ইহাঁর শরীর যেন করুণার ছায়ামাত্র। ইনি চিন্ময়ী প্রতিমা। বরপ্রদায়ী হস্তের ভঙ্গীতে হৃদয়ের করুণা আভাসে ব্যক্ত হইতেছে। মুখমণ্ডল ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা যেন ভাস্কর করুণাকে জীবন্ত করিতে প্রয়াসী। তিনি বিগ্রহকে উপলক্ষ করিয়া যেন স্বর্গীয় ভাবটিকে শরীরে পরিণত করিয়াছেন। সেই ভাব দেবীর রাতুল পদযুগলে, সকরুণ দৃষ্টিতে, সুধামধুর হাসিতে ও সমস্ত অবয়ব-ভঙ্গীতে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুবতী নারী বিশ্বমাতৃরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন।

গাঙ্গুর গ্রামের, এই বিগ্রহ কোন্ পাল রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া কতকাল পূজা পাইয়াছিলেন, কে বলিতে পারে? স্বাধীন বঙ্গনৃপতির শিরস্থিত মণি-মুকুটের জ্যোতিতে কতবার ইহাঁর চরণনখর উজ্জ্বল হইয়াছে, কে বলিতে পারে? কত নরনারীর আনন্দ-কোলাহলে, কত পুরোহিতের করধৃত দীপাবলীতে ইহাঁর আরতি হইয়াছে, কে বলিবে? নির্ম্মল কুসুম যেরূপ ছিন্নদল হইয়াও তাহার স্বর্গীয় সুষমাটুকু রক্ষা করে, উন্মত্ত মুসলমানের কৃপাণে বিক্ষত হইয়াও সেইরূপ এই মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব দেবহাস্যটুকু এখনও সম্যক্ লোপ পায় নাই। মাগধ-কলাশিল্পী যে দেবভাব আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই হাসিটুকু তাহারই ইতিহাস

রক্ষা করিয়াছে। যে দিন নিরঞ্জন শর্ম্মা কালাপাহাড় রূপ ধারণ করিয়া গান্ধুর ধ্বংসের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে দিন কত না ভক্তের প্রাণ এই বিগ্রহের জন্য বিদীর্ণ হইয়াছিল? ইহার অঙ্গ ক্ষত করিবার পূর্ব্বে ভিন্নধর্ম্মীর অসি কত ভক্তের হৃদ্‌পিণ্ডনিঃসৃত তপ্ত রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল?

এই মূর্ত্তির ঊর্দ্ধে যে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে, ইহার সঙ্গে আমাদের একটু বিশেষ সম্পর্ক আছে। প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্ত্তি ব্যতীত অপরাপর বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তিরও শিরোর্দ্ধে বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তির মুকুটের উপরও অক্ষোভ্য বুদ্ধের ধ্যানী মূর্ত্তি অনেক সময় দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ চণ্ডী বিগ্রহের শীর্ষেও তদ্রূপ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দুর্গা প্রতিমার শিরোর্দ্ধে যে ক্ষুদ্রকায় মহাদেব-মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা সেই অক্ষোভ্য বুদ্ধের একটি সংস্করণমাত্র। হিন্দুগণ তাঁহাকে শুধু মহাদেবে পরিণত করিয়া ছাড়েন নাই; পরন্তু তাহার শ্বশুরালয়-যাত্রার একটা কাব্য কথার ও সৃষ্টি করিয়া বৌদ্ধ সংশ্রবের প্রাচীন তত্ত্ব একবারে লোপ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের চিত্রকর ও ভাস্কর দেবপ্রতিমা সম্বন্ধে একবার যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছে, পুরুষানুক্রমে তাহাই করিবে, সুতরাং, চণ্ডীর মূর্ত্তি গড়িতে যাইয়া সে অক্ষোভ্য বুদ্ধটিকে বাদ দিতে সম্মত হয় নাই, পুরোহিতের অনুরোধে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তিটির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া মহাদেব গড়িয়া দিয়াছে, এইমাত্র।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সিন্ধু-জলে।

(হায়েন)

জ্বলিছে সাগরবারি রবির কিরণ,
গলিত কাঞ্চন যেন তায়।
জীবনের জ্যোতিঃ যবে নিবিবে মরণে,
সিন্ধু-জলে ভাসায়ো আমায়।

সিন্ধুরে বেসেছি ভাল আকুল প্রণয়ে।
ওই স্নিগ্ধ প্রবাহমালায়
শান্তিধারা ঢালিয়াছে এ দগ্ধ হৃদয়ে;
বন্ধু তাই মোরা দু'জনায়।

সমালোচনা।

রাণী ভবানী।*

—:০:—

কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক ম্যাসন ইংরাজী উপন্যাসগুলিকে ত্রয়োদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার কথা বলিয়াছিলেন। নব্য বঙ্গে ইংরাজী উপন্যাসের আদর্শে উপন্যাস রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। সেই জন্য অধ্যাপক ম্যাসন যে ত্রয়োদশ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে কয়েক শ্রেণীর উপন্যাস বাঙ্গালাতেও দৃষ্ট হইবে। ঐতিহাসিক উপন্যাস ইংরাজীতে আছে, বাঙ্গালাতেও হইয়াছে। 'রাজসিংহের' ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না।"—অর্থাৎ এই গ্রন্থত্রয়ে তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে ইতিহাসের অনুগমন করেন নাই। তাহা না করিলেও যে হিসাবে ইংরাজী সাহিত্যে থ্যাকারের 'এসমণ্ড' ঐতিহাসিক উপন্যাস সে হিসাবে এই গ্রন্থত্রয়ও, ভাল হউক আর মন্দ হউক, ঐতিহাসিক উপন্যাস, বলা যাইতে পারে। আমাদিগের আলোচ্য 'রাণী ভবানী' ও ঐতিহাসিক উপন্যাস। বরং ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস না বলিয়া ইতিহাস ও উপন্যাস বলিতে ইচ্ছা করে। আমাদের দুঃখ এই যে, লেখক ইতিহাসের ও উপন্যাসের সম্মিলন না করিয়া কেবল ইতিহাস লিখেন নাই।

ইংরাজী সাহিত্যে থ্যাকারের 'এসমণ্ড' ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ। আলোচ্য গ্রন্থ পাঠকালে আমাদের পুনঃ পুনঃ 'এসমণ্ডের' কথা মনে পড়িয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে দুই পুস্তকে সাদৃশ্য সপ্রকাশ। উভয় পুস্তকেই ঘটনার প্রাচুর্য্য আছে; কিন্তু আখ্যানবস্তু অত্যন্ত দীর্ঘ,—সুসম্বদ্ধ নহে। উভয়েরই গল্পাংশ স্বতঃবিকশিত নহে; পরন্তু ঘটনাবহুলকালসুলভ ঘটনাপুঞ্জের সমষ্টি; এই সকল ঘটনা নদীর স্রোতে একের পর অপর তরঙ্গের মত উপস্থিত হইয়াছে—দুইটির মধ্যে কোথাও অবকাশ নাই। উভয় পুস্তকই ঐতিহাসিক চিত্র। সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত। কিন্তু যে গুণে 'এসমণ্ড' ইংরাজী সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ, সে গুণ 'রাণী

* রাণী ভবানী—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। ৩৮।২, ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা —'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

ভবানীতে' সর্ব্বত্র ফুটে নাই। সমালোচক ব্রিমলী বলিয়াছেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকদিগের কতকগুলি বিপদ আছে; তাঁহারা অনেক সময় উপকরণ গোপন রাখিতে পারেন না, যে কৌশলে তাঁহারা অতীত চিত্র চিত্রিত করেন সে কৌশল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, বর্ত্তমানের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা অতীতের বিচারে ও বিবেচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। থ্যাকারে এই সকল বিপদ লঙ্ঘন করিতে পারিয়াছিলেন, তাই 'এসমণ্ড' ইংরাজী সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ। 'রাণী ভবানী'র গ্রন্থকার সর্ব্বত্র সেই সকল বিপদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। ইহা সর্ব্বত্র অক্ষমতাবশতঃ নহে; পরন্তু স্থানে স্থানে ইচ্ছাকৃত। সেই জন্য আমাদের দুঃখ, তিনি ইতিহাস লিখেন নাই—ঐতিহাসিক উপন্যাস, বা ইতিহাস ও উপন্যাস লিখিয়াছেন।

দুর্গাদাস বাবু এই গ্রন্থে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সময় হইতে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" পর্য্যন্ত অনতিদীর্ঘ কালের বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের আভাস দিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাস এই সময় অত্যন্ত ঘটনাবহুল; এই সকল ঘটনার সম্যক আলোচনায় বাঙ্গালীর শিক্ষা হইতে পারে। এই সময় বাঙ্গালার রাজদণ্ড অত্যাচারী মুসলমানের হস্তচ্যুত হইয়া ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল; এই সময় সঙ্কীর্ণস্বার্থপরবশ কর্ম্মচারীদিগের দোষে বাঙ্গালায় হাহাকার উঠিয়াছিল; এই সময় বাঙ্গালার জামীদারদিগের প্রতাপতপন মধ্যগগন হইতে ক্রমে অস্তাচলাভিমুখগামী হইয়াছিল; এই সময় "বর্গীর হাঙ্গামায়" বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সমাজিক চিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; এই সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পুরাতন ও পরিচিত পূর্ব্বপুরুষানুসৃত পথের পথিক। দুর্গাদাস বাবু যেরূপে এই সময়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন; তিনি যেরূপ সযত্নে এই সময়ের ইতিহাসের উপকরণ একত্র করিয়াছেন; তিনি যেরূপ সাগ্রহে যে কিম্বদন্তীর ফেনপুঞ্জমধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের শীর্ণধারা লুক্কায়িত থাকে তাহার সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহাতে তিনি উপন্যাস না লিখিয়া ইতিহাস রচনায় শক্তি নিয়োগ করিলেই ভাল হইত। যদি শ্রমবিমুখতা তাঁহার উপন্যাস রচনার কারণ হয়, তবে বলিতে পারি, তিনি আত্মশক্তির পরিমাণ বুঝিতে পারেন নাই।

বাস্তবিক তিনি এত ঐতিহাসিক উপকরণ একত্র করিয়াছেন যে, সেই সকলের ব্যবহার-চেষ্টাতেই উপন্যাসের দ্রুত লঘু গতি বিঘ্নপ্রাপ্ত হইয়াছে, অবান্তর প্রসঙ্গের উত্থাপন হইয়াছে। তিনি এত কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন যে, বিশেষ চেষ্টা সত্বেও তিনি সর্ব্বত্র অতিরঞ্জনবর্জ্জিত সত্যের উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

আমাদের প্রথম মন্তব্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপে "সতী," "সহমরণে," "পূর্ব্বস্মৃতি" প্রভৃতি অংশের ও দ্বিতীয় মন্তব্যের দৃষ্টান্তস্বরূপে বদরগঞ্জের ঘাটে হাঙ্গরের গ্রাসে কৃত্তিবাসের আত্মবিসর্জ্জন-চেষ্টার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিম্বদন্তী যে অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া রটনা করিয়াছে—সে অঞ্চলে হাঙ্গরের আবির্ভাব অসাধারণ ঘটনা।

দুর্গাদাসবাবু যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকলের যথেষ্ট সদ্ব্যাবহারও করিয়াছেন। সুতরাং উপন্যাসের হিসাবে পাঠকের যাহা লোকসান, ইতিহাসের হিসাবে তাহা লাভ। লাভ লোকসান খতাইলে মোটের উপর কিছু লাভই থাকিয়া যায়। আর পাঠকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ, আদর্শ হিন্দুরমণীর পুণ্য চরিত্রের বিবরণ পাঠে। রাণী ভবানীর নাম বঙ্গে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তিনি পুণ্যবতী হিন্দু বঙ্গনারীর আদর্শ; তাঁহার জীবন পরার্থে উৎসৃষ্ট; তিনি ভোগের মধ্যে থাকিয়াও ত্যাগী; সর্ব্বোপকারক্ষম গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া তিনি পুণ্য জীবনের যে আদর্শ দেখাইয়াছে তাহা ঃ—

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।"

এই গ্রন্থমধ্যে একটি কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে।—তাহাতে প্রকাশ, রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র সাধক রামকৃষ্ণ ভবানীধামে সাধনা করিতেন। "ভবানীপুরের পীঠস্থানে একদিন তিনি ভবানীর সাধনায় তন্ময় হইয়াছিলেন। দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন,—'তুমি আমার আরাধনা কি করিতেছ? তোমার মাতা ভবানী আমার অংশরূপিনী। যদি আমার অনুকম্পা পাইতে চাও, জননীর চরণে শরণাপন্ন হও।' এই প্রত্যাদেশ শুনিয়াও সাধনা পরিত্যাগ না করায়, মহারাজ রামকৃষ্ণ ভবানীপুর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কে যেন আসিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া, দক্ষিণের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। পরদিন প্রভাতে পাকুড়িয়ার সেতুর নিকট মূর্চ্ছিতাবস্থায় রাজাকে দেখিতে পাওয়া যায়। পাকুড়িয়ার ঠাকুর মহাশয়দিগের যত্নে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে, মহারাজ তাঁহাদিগকে বলেন,—'আপনারা আমাকে অবিলম্বে আমার মাতার নিকট পৌঁছাইয়া দেন।' রঘুমণি ঠাকুর এবং ভোলানাথ ঠাকুর প্রভৃতি মিলিত হইয়া বড়নগরে মহারাণী ভবানীর নিকট তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেন। সেখানে পৌঁছিয়া, ত্রিরাত্রি গঙ্গাবাসের পর, গঙ্গাজলে মাতার পাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া মহারাজ রামকৃষ্ণ দিব্যধামে গমন করেন।"—এই কিম্বদন্তী হইতেই বুঝা যায়, দেশের লোক রাণী ভবানীকে মূর্ত্তিমতী দেবী বলিয়াই মনে করিত।

তাহাদের সেরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ও ছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সর্ব্বপ্রথম রাণী ভবানীর পুণ্য জীবনের বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত করেন। তিনি সত্যই বলিয়াছেন—"রাণী ভবানীর জীবন-কাহিনী আমাদের দেশের অর্দ্ধ শতাব্দীর সুখদুঃখের বিস্তৃত কাহিনীর সঙ্গে এরূপ ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে, সমসাময়িক ইতিহাসের আলোচনা না করিলে, তাঁহার জীবন-কাহিনীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার উপায় নাই।" লোকে রাজার ও রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা বিস্মৃত হয়, কিন্তু জনহিতকর অনুষ্ঠানের প্রমাণ বহুদিন বর্ত্তমান থাকে। তাই বাঙ্গালার রাজনৈতিক ব্যাপারে রাণী ভবানীর সংশ্রব ও কার্য্য লোকে বিস্মৃত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার পুণ্য কীর্ত্তিরকথা আজও সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তৎকালে বাঙ্গালার জমিদারদিগের অসাধারণ সম্পদ ও সম্মান ছিল। সম্পদে ও সম্মানে নাটোররাজ বাঙ্গলার জমিদারদিগের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। হলওয়েল লিখিয়াছেন, রাণী ভবানীর অধিকৃত রাজশাহীর রাজ্য ঘুরিয়া আসিতে ৩৫ দিন লাগিত। গ্রাণ্টের মতে এত বৃহৎ জমিদারী ভারতে আর কুত্রাপি ছিল না। তখন রাজসাহী, নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান—এই কয় জিলার অধিকাংশ স্থান এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাণী ভবানী এই বিশাল রাজ্যের বিপুল আয় জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয় করিতেন। অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন,—"রাণী ভবানীর যে সকল পুণ্য কীর্ত্তি এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তন্মধ্যে তাঁহার জলাশয়গুলিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেব-মন্দিরের উচ্চ চূড়া ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার সংস্থাপিত অনেক অতিথিশালার ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত ও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বহুব্যয়নির্ম্মিত অনেক রাজপথ কণ্টকবনে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় লোকচলাচল রহিত হইয়া গিয়াছে;—কিন্তু তিনি যে সকল দীর্ঘিকা ও সরোবর খনন করাইয়া দিয়া দরিদ্রের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহার স্বচ্ছ সলিলে তাঁহার পুণ্য কীর্ত্তি এখনও প্রতিবিম্বিত হইতেছে। তিনি কোথায় কত সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন, পরোক্ষভাবে কত স্থানে জলাশয় খননের উৎসাহদান করিয়াছিলেন, এখন আর তাহার সংখ্যা-নির্ণয় করা সহজ নহে। একবার দুর্ভিক্ষসময়ে রাঢ়দেশের দুর্দ্দশার অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিবার জন্য স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রতাপে অশ্বারোহণে দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, যেখানেই এক একটি প্রসন্নসলিলা বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা দেখিয়া জলদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেখানেই লোক দুই হাত তুলিয়া রাণী ভবানীর নাম

করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। কেহ যদি এখন ও পুরাতন রাজসাহী রাজ্যের সকল স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তবে এইরূপ শত শত জলদান ব্রতের কীর্ত্তি-স্তম্ভে রাণী ভবানীর সহৃদয় শাসননীতির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।" কেবল বাঙ্গালায় নহে, তৎকালে দুরধিগম্য কাশীতে ও গয়াক্ষেত্রেও তাঁহার পূণ্য কীর্ত্তি বিদ্যমান। লোকহিতকল্পে হিন্দুর পবিত্রতীর্থ—মোক্ষধাম কাশীর সীমানির্দ্ধারণ রাণী ভবানীর কীর্ত্তি। এই জনহিতৈষণার—এই আত্মত্যাগের—পূর্ণ পরিণতি "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" সময় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তখন স্রোতস্বতী যেমন দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি স্নিগ্ধ ও উর্ব্বর করিবার প্রাণান্ত চেষ্টায় আপনার সর্ব্বস্ব দান করে, রাণী ভবানী তেমনই দেশব্যাপী দারুণ হাহাকার নিবারণ করিবার চেষ্টায় আপনার অতুল সম্পদ দান করিয়াছিলেন। সেবার তিনি সত্য সত্যই আপনার সর্ব্বস্ব দান করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

আলোচ্য পুস্তকে পাঠক রাণী ভবানীর এই সকল পূণ্য কীর্ত্তির বিবরণ পাইবেন।

এই স্থলে পুস্তকের আর একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করিব। যে চিরনবীন চঞ্চল প্রেম অধিকাংশ উপন্যাসের মেরুদণ্ড এ গ্রন্থে তাহার স্থান নাই। রাণী ভবানী এই গ্রন্থের নায়িকা। বলিয়াছি, দেশের লোক তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী দেবী বলিয়া মনে করিত; তিনি মাতৃরূপিনী। সেই জন্য তাঁহার দাম্পত্যজীবনে লেখক চঞ্চল প্রেমের অনাবিল শ্রদ্ধায় পরিণতিই দেখাইয়াছেন। প্রেম জীবনের স্বপ্ন—শ্রদ্ধা জীবনের সাধনা; প্রেম সুখ—শ্রদ্ধা শান্তি। প্রেমের চিরচঞ্চল মানাভিমানবিতাড়িত প্রবাহে বৈচিত্র্য বিকশিত হয়। কিন্তু শ্রদ্ধার অচঞ্চল গাম্ভীর্য্য ব্যতীত সংসারিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব। এ অবস্থায় গ্রন্থকার যে চঞ্চল প্রেমের চটুল সৌন্দর্য্য বর্ণনার প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার কৃতিত্বেরই পরিচায়ক।

এখন পুস্তকের কয়টি ত্রুটির উল্লেখ করিব। প্রথম, ছাপার ভুল। গ্রন্থে ছাপার ভুল অত্যন্ত অধিক। বিরামচিহ্ন, উদ্ধার চিহ্ন প্রভৃতির ভুল এত অধিক যে, মনে হয় প্রুফ সংশোধন হয় নাই—বা ভাল করিয়া হয় নাই। ৯ পৃষ্ঠায় "জমীদারের" স্থানে "জড়িদার", ২৩ পৃষ্ঠায় "দেউড়ীর" স্থানে "দেউরী", ৩৯ পৃষ্ঠায় "সান্ত্বনা দান করিয়া" স্থানে "সান্ত্বনা করিয়া", ১১৪ পৃষ্ঠায় "জিহ্বালেহন", ১১৫ পৃষ্ঠায় "নাদির শাহের পাষাণ হৃদয়ের" স্থানে "পাষাণ নাদির শাহের হৃদয়," ১১৭ পৃষ্ঠায় "হৃদয়ের" স্থানে "হৃদয়ে হৃদয়ে," ১৩৬ পৃষ্ঠায় "কলরবের" স্থানে "কলরবে," ১৫৬ পৃষ্ঠায় "কর্ণের" স্থানে "কর্ণে কর্ণে," ২৫৮ পৃষ্ঠায় "সড়কিওয়ালার" স্থানে "সরকিওয়ালা," ২৬৪ পৃষ্ঠায় "শ্বেত-শুভ্র" প্রভৃতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ২৯৯ পৃষ্ঠায়

প্রৌঢ়ার সঙ্গিনীর উক্তির কতকাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়, ভাষার কথা। গ্রন্থমধ্যে লেখক মহাশয় "রাত্রে" ও "চক্ষে" বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। চলিত ভাষায়—কথোপকথনে অনেক সময় "রাত্রির" স্থানে "রাত্রে" ও "চক্ষুতের" স্থানে "চক্ষে" ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সে ব্যবহার অশুদ্ধ—সুতরাং অসিদ্ধ। যে 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয়ের চেষ্টায় 'রামায়ণের' ও 'মহাভারতের' বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত বিশুদ্ধ অনুবাদ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে স্থান পাইয়াছে, 'শাস্ত্রপ্রকাশ' যে 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয়ের বিরাট অক্ষয় কীর্ত্তি, সেই 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকে—দুর্গাদাস বাবুর মত প্রবীণ লেখকের রচনায় এরূপ অপাংক্তেয় শব্দের সমাদর একান্তই দুঃখের কারণ। লেখক মহাশয় "তখন" শব্দের প্রয়োগে অকারণ কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ৪৬ পৃষ্ঠায় আছে,—"এই বলিয়া, কীর্ত্তিবাস তাহাদিগকে যখন তাড়াইয়া দিবার উদ্যোগ করিল, তাহারা ধীরে ধীরে আপন আপন বঁটি সংযত করিয়া গজ গজ করিতে করিতে মাছ কুটিতে বসিয়া গেল।" এস্থলে "তাহারা" শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে "তখন" শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত গ্রন্থমধ্যে অনেক আছে। লেখক লিপিকুশল, ভাষাসম্পদের অধিকারী; কাযেই তাঁহার পক্ষে এ সকল ত্রুটি ইচ্ছাকৃত বলিয়া সন্দেহ হয়, এবং সেইজন্যই আমরা এত কথা বলিলাম।

তৃতীয়, অন্যান্য কথা। লেখক গ্রন্থমধ্যে "গেট" ও "বাবু" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সমালোচনার প্রারম্ভে আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকদিগের যে সকল বিপদের কথা বলিয়াছি, বর্ণিতকালে অপ্রচলিত ও পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত শব্দের ব্যবহার সেই সকলের মধ্যে একটি। এই গ্রন্থে বর্ণিত কালে "গেট" শব্দ প্রচলিত ছিল না; "বাবু" শব্দ প্রচলিত ছিল, কিন্তু গ্রন্থকার যেরূপ স্থলে তাহার ব্যবহার করিয়াছেন সেরূপ স্থলে ব্যবহৃত হইত কি না সন্দেহ। রাণী ভবানীর বিবাহে তদীয় পিতা "গৌরী দান" করিয়াছিলেন—ইহাই কিম্বদন্তী। লেখকও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ১৩ পৃষ্ঠায় ও ৪৫ পৃষ্ঠায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে। সে অবকাশ না থাকিলে ভাল হইত। মানসিক চাঞ্চল্য অনেক সময় শারীরিক চাঞ্চল্যে আত্মপ্রকাশ করে সত্য, কিন্তু মানসিক চাঞ্চল্যে শারীরিক-চাঞ্চল্য-বাহুল্য হয় না। "চিন্তাতরঙ্গ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই অনাবশ্যক শারীরিক-চাঞ্চল্য-বাহুল্য সপ্রকাশ। ১৯৫ পৃষ্ঠায় রামকান্ত বলিয়াছেন, "শ্বশুর মহাশয়কে তো আমিই জিদ করে' বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি।" কিন্তু ২৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ তিনি

চণ্ডীদাস শিরোমণি মহাশয়ের পরামর্শেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সিরাজ-দ্দৌলার সহিত ফৈজীর কথোপকথন বাঙ্গালাতে হইতে হইতে সহসা অকারণে হিন্দীতে হইয়াছে। ইহাতে রসভঙ্গ হইয়াছে। ৩৮৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ, "কৃত্তি-বাসের একটী পুত্র, পুত্রবধূ, দুইটী কন্যা ও স্ত্রীমাত্র এখন তাহার সংসারে বিদ্যমান আছে।" ১৭ পৃষ্ঠায় কৃত্তিবাস বলিয়াছিল, "সংসারে ছয়টী পোষ্য।" একটির বিয়োগকথা গ্রন্থে নাই। লেখক একই স্থানে সংস্কৃত ও প্রচলিত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন,—"আমার স্বামিপুত্রের কি অসাবধানতা ছিল? রাজার সংসার, রাজভৃত্যগণের পরিচর্য্যা; রাজবৈদ্যগণ নিয়ত মুখপানে চাহিয়া ছিল; কিন্তু তাঁহাদিগকেও ত কৈ রাখিতে পারিলাম না। তবে আর কেন? ভগবানের যা মনে আছে, তাই হবে।" "ভবানী সহমরণে যাইবেন, অনেকদিন হইতেই মনস্থ করিয়াছিলেন"—লেখকের এই উক্তিতেই আমাদের সর্ব্বপ্রধান আপত্তি। যে হিন্দুরমণী স্বামীর মৃত্যুতে স্বেচ্ছায়—সানন্দে চিতানলে দেহত্যাগ করিতেন সেই হিন্দুরমণীর আদর্শ স্থানীয়া রাণী ভবানীর পক্ষে স্বামিবিয়োগের পূর্ব্ব হইতেই সহমরণে যাইবেন মনস্থ করা অস্বাভাবিক। স্বামীর মৃত্যুকে তাঁহার পক্ষে সহমরণে যাইবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক, তখন তাঁহার স্মৃতিপথে মুর্শিদাবাদে মহারাষ্ট্রীয় মহিলার সহমরণের কথা সমুদিত হওয়াও স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ব হইতেই কল্পিত বৈধব্যের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়।

যাহা সুন্দর তাহার সামান্য ত্রুটি সহজে দৃষ্ট হয়—ইংরাজ কবি বলিয়াছেন, তুষারের উপর ক্ষুদ্রতম দাগটিও দৃষ্ট হয়। তাই এই গ্রন্থের এই সকল সামান্য ত্রুটি সহজে লক্ষিত হইয়াছে; তাই এ সকলের উল্লেখ করিলাম। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ সকল ত্রুটি থাকিবে না।

যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন—তাঁহারা ইহার বহু গুণেও লেখকের চিত্র ও চরিত্রাঙ্কনক্ষমতায় মুগ্ধ হইবেন। ইহাতে পাঠক অর্দ্ধ শতাব্দীর বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস ও সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ হিন্দুরমণীর জীবনব্যাপী পুণ্য কার্য্যের বিবরণ জানিতে পারিবেন। এরূপ পুস্তকের আদর অবশ্যম্ভাবী। দুই সপ্তাহ মধ্যে যে দুই সহস্র পুস্তক বিক্রীত হইয়াছে ইহা আমাদের গর্ব্ব করিবার বিষয়। আশা করি, এই গ্রন্থের প্রচারফলে বাঙ্গালার গৃহে গৃহে আবার রাণী ভবানীর আদর্শে অনুপ্রাণিতা গৃহলক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে; এবং তাহারই ফলে বাঙ্গালার জীবন পুণ্যময় ও সুখময় হইবে।

ব্রজাঙ্গনা।

সুদূর দ্বাপর হ'তে প্রেমলীলা তব
মধুর স্বপন সম আসে অনিবার,—
পুলকিত প্রেমলীলা নিত্য অভিনব,
পুষ্পিত যৌবনকুঞ্জে মধুপ-ঝঙ্কার।
তব প্রেম-অনুরাগে ধরায় বসন্ত জাগে;—
ললিতা, বিশাখা, রাধা কুরঙ্গ-নয়না;—
অয়ি, ব্রজাঙ্গনা!
বিরহ-ব্যথিতা তব নয়ন-ধারায়
এখনো যমুনা বহে করুণ বিলাপে;
রঞ্জিত বিচিত্র তব আশা নিরাশায়—
এখনো গগন শোভে চারু ইন্দ্রচাপে;
এখনো নিশীথ যবে তোমার মঞ্জীর-রবে
মুখরিত কুঞ্জ-পথ—শঙ্কিত-চরণা—
অয়ি, ব্রজাঙ্গনা!
সুরভিত দীর্ঘশ্বাস বহিয়া তোমার
এখনো মলয়বায়ু দেয় ফুলে ফুলে;
মধুর মিলনে তব আনন্দে অপার
এখনো কদম্ব ফুটে যমুনার কূলে;
মিলন-মধুর হাসি তোমারি সে আসে ভাসি
মেঘহীন চন্দ্রালোকে—হে স্মিত-আননা,
অয়ি, ব্রজাঙ্গনা!
জাগরণারুণ তব কমল নয়ন
এখনো রঞ্জিত করে তরুণ দিবস;
এখনো সাঁঝের তারা মলিন-কিরণ
হেরি' কুঞ্জ-দ্বারে তোমা বিরহ-বিবশ;
প্রভাতে তমালশাখে কোকিল তোমায় ডাকে
কিশলয় শয্যা'পরি মিলন-মগনা—
অয়ি, ব্রজাঙ্গনা!

এখনো বাঁশরী স্বর যমুনা-পুলিনে
তোমায় খুঁজিয়া ফিরে আকুল আশায় ;
তোমারি মালার লাগি এখনো বিপিনে
কুসুম ফুটিয়া উঠে, বিষাদে শুকায় ;
জলদে বিজলী-রেখা এখনো গগনে লেখা—
তোমারি মিলন-স্মৃতি জাগে, সুলোচনা—
অয়ি, ব্রজাঙ্গনা !

এখনো তমাল-শাখে মাধবী জড়ায়,
প্রেমের সৌরভ ভাসে যূথিকার বাসে ;
তোমারি প্রেমের মত পবিত্র শোভায়
তরুণ করুণ ফুটে শুভ্র স্মিত হাসে ;
এখনো কানন-মাঝে পলাসে শোনিমা রাজে
তোমারি মিলন-লাজে—রক্তিম-বরণা,—
অয়ি, ব্রজাঙ্গনা !

এখনো সলিলে তব জললীলা স্মরি'
পুলকে যমুনা-বারি উঠিছে উছলি'
এখনো যমুনা-জলে ভরিতে গাগরি
কিশোরীর কর্ণে পশে অস্ফুট কাকলি ;
এখনো তোমার তরে পিয়ালের শাখা প'রে
পথপানে চেয়ে আছে শিখী আনমনা ;—
অয়ি, ব্রজাঙ্গনা !

তোমারি প্রেমের লীলা ধরণী-গগনে ;
তোমারি প্রেমের স্মৃতি ভুলোকে দ্যুলোকে ;
এখনো মিলন-সুখে, বিরহ-বেদনে
হৃদয় ভরিয়া উঠে আঁধারে আলোকে ;
সুখে, দুখে, অভিমানে এখনো মানব-প্রাণে
অক্ষয় প্রণয় জাগে, তোমারি সাধনা,—
অয়ি, ব্রজাঙ্গনা !

———

ভারতীয় অরণ্যানী।

মার্কিণ প্রদেশে উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠা-কামনায় ইংরাজগণ যখন তথায় উপস্থিত হইয়া দেশ শ্বাপদ-সঙ্কুল-অরণ্য-সমাকুল দেখেন, তখন তাঁহারা তরুমাত্রকেই শত্রু ভ্রমে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। সভ্যতা বিস্তারের ও লোক সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশ ক্রমশঃ অরণ্য-বিরল হইতেছে। লোকাবাস-নির্ম্মাণ-কারণে অনেক নিবিড় ও হিংস্রজীবজন্তু-পরিপূর্ণ অরণ্য নগরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অরণ্য-সংরক্ষণে মানব সমাজের কি পরিমাণ হিতসাধন হইয়া থাকে, লোকের কি পরিমাণ উপকার হইয়া থাকে, সে বিষয়ে জনসাধারণের চিত্ত অত্যল্প দিন হইতে আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতে এখনও সাধারণ কৃষকগণ বা জনসাধারণ অরণ্য-সংরক্ষণে প্রকৃতির কি বিচিত্র নিয়ম অক্ষুন্ন থাকে, তাহা বুঝিতে অসমর্থ। দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অরণ্যের উপর নির্ভর করে। বায়ুবাহিত জলীয় বাষ্পে ও পৃথিবীর মৃত্তিকাস্থিত রসে উদ্ভিদের পরিবর্দ্ধন হয়। অরণ্যে বন্যার জলোচ্ছ্বাসের প্রতিবন্ধকতা জন্মে এবং গিরিগাত্রে অরণ্যানী উৎপন্ন হইয়া তত্রত্য মৃত্তিকাকে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত করে। প্রকৃতির এই প্রকার প্রয়োজন-সংসাধনই অরণ্যানীর কেবল মাত্র উপযোগিতা নহে। এতদ্ভিন্ন অরণ্যজাত ফল, মূল, ওষধি মানবের নানা প্রকার প্রয়োজনে আসিয়া থাকে। আরণ্য দ্রব্যের ব্যবসায়ে দেশের বিলক্ষণ লাভ হয়। দুর্ভিক্ষে আরণ্য ফল, মূল ও তৃণ সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করে।

অধুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে অভিনব পন্থায় আবশ্যক তত্ত্বাবধানে সকল সভ্য দেশেই অরণ্য সংরক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই অভিনব পন্থাবলম্বনের পূর্ব্বে, লোকে বহ্নি ও কুঠার সংযোগে অরণ্যের উচ্ছেদ সাধন করিত। সেই জন্য যে দেশে প্রাচীনকাল হইতে সভ্যসমাজের বসবাস হইয়াছে সে দেশে বন বা জঙ্গলের পরিমাণ অল্প। আর সেই জন্য সেই সকল দেশবাসিগণ আবশ্যক আরণ্য দ্রব্যের অভাবে অনেক অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। অরণ্যজাত কাষ্ঠ হইতে গৃহস্থালীর কত আসবাব, সাজ, সরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার ঠিক নিরূপন করা নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু আমাদিগের ভারতবর্ষে কেবল কাষ্ঠের জন্য অরণ্যানী সংরক্ষিত হয় না; পরন্তু এদেশে অরণ্য সাধারণ লোকের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব পূরণ করিয়া মানব সমাজের প্রচুর হিতসাধন করিয়া থাকে। ভারবাহী শকট নির্ম্মাণের জন্য কাষ্ঠ ও বংশ, লাঙ্গলাদি কৃষির উপকরণের কাষ্ঠাদি,

আবাসস্থল নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ, তৃণাচ্ছাদনের জন্য তৃণপত্রাদি, রজ্জুর উপকরণ, মাদুর নির্ম্মাণের কাটি, চর্ম্ম পরিষ্কারের নিমিত্ত বৃক্ষত্বক, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা পরিবর্দ্ধক বৃক্ষের পত্র, বিভিন্ন প্রকার রং, গালা, ধূনা, গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী তৈলাদি, বিবিধ প্রকার ফল, মূল, ফুল, মধু প্রভৃতি মানবের নিত্য প্রয়োজনীয় অশেষবিধ সামগ্রী এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। সেগুণ, মেহগিনি, চন্দন, আবলুস প্রভৃতি কাষ্ঠ কারুকার্য্যে ও গৃহসরঞ্জামে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল জাতীয় কাষ্ঠই লোকে "জ্বালানী" রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার হরিতকী, বয়ড়া, অনন্তমূল, মাজুফল, টৌরী প্রভৃতি আরণ্য দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বনে গুটী, লাক্ষা প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফল কথা, অরণ্য-সংরক্ষণে কেবল স্থানীয় লোকের বা জনকয়েক ব্যবসায়ীর সুবিধা নহে, পরন্তু সমগ্র দেশের উপকার।

ভারতীয় অরণ্যবিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ উইলমট সম্প্রতি একটি সন্দর্ভে ভারতীয় অরণ্য-সংরক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষে সরকার হইতে অরণ্য-সংরক্ষণ বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন ও অর্থব্যয় হইয়া বিলক্ষণ সুফল লাভ ঘটিতেছে। নিবিড় অরণ্যে মানবের আবশ্যক যে যে সামগ্রী পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া সরকারী পক্ষ হইতে কলিকাতার সংগ্রহ-শালায় সে সকলের বিবরণ, প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ডাক্তার ওয়াটের অভিধানের (Dictionary of Economic Products of India) অধিকাংশ ভাগ কেবল আরণ্য দ্রব্যের বিবরণে পূর্ণ।

যে আরণ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ অতি সামান্য। তাহার কারণ, দেশের লোক সে সকলের ব্যবহার সম্বন্ধে এরূপ অনভিজ্ঞ যে, অধিকাংশ দ্রব্যই দেশে পড়িয়া পচিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অসুবিধা আছে। অরণ্য হইতে লোকালয়ে দ্রব্য বিক্রয়ার্থ অনিবার পথ তাদৃশ সুগম নহে; আর সেই পথ সুগম করিতে কিম্বা আরণ্য দ্রব্যসমূহ বহন করিয়া আনিতে যে ব্যয় পড়ে, তাহাও সামান্য নহে। অযোধ্যার এবং মধ্য প্রদেশের অরণ্যে তুলনা করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। অযোধ্যার জঙ্গলের সন্নিকটে লোকালয় থাকাতে তথায় প্রতি বর্গ-মাইলে প্রায় তিনশত টাকা কর আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু মধ্য ভারতের জঙ্গল হইতে প্রতি বর্গমাইলে পঞ্চাশ টাকা আয় হয় না; কারণ, এই স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য কাষ্ঠ কাটাইতে কাঠুরিয়াকে সমস্ত কাষ্ঠ বিনামূল্যে দিতে হয়। নিকটে লোকের বসতি থাকিলে এরূপ হইত না।

কৃষিকর্ম্মের সহিত অরণ্য-সংরক্ষণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ট। বর্ত্তমান ভারতের কৃষকের কুটীর অরণ্যজাত বংশ,তৃণ ও রজ্জুর সমাবেশমাত্র। সুতরাং প্রত্যেক কৃষক বহু পরিমাণে আরণ্য দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার কৃষিকার্য্যের জন্য লাঙ্গল প্রভৃতি ও ভারবহনোপযোগী শকট নির্ম্মাণ করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বংশ ও কাষ্ঠের ব্যবহার হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের সহিত অরণ্যের আরও একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। অরণ্যের উদ্ভিদ্‌রাজি জলদজাল আকর্ষণ করিয়া বর্ষা আনয়ন করিয়া থাকে। সেই জন্য দেশমধ্যে যে প্রদেশ অরণ্য-বিরল সে প্রদেশে অনাবৃষ্টি বা স্বল্পবৃষ্টিহেতু শস্যের ক্ষতি হয়। ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী; সুতরাং এ দেশে অরণ্যের সংরক্ষণ বিশেষ উপকারী। অরণ্য যেমন কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে তেমনই কৃষককুলের সাহায্যে অরণ্যের পরিপুষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে। আরণ্য দ্রব্য বিক্রয়জাত আয়ের প্রায় অর্দ্ধাংশ অরণ্যের সংরক্ষণে ও পরিপোষণে ব্যয়িত হইয়া থাকে, আর এই অর্থের অধিকাংশই সাধারণ কৃষকের নিকট হইতে পাওয়া যায়।

সরকারী পক্ষ হইতে প্রায় ২৪০০০০ বর্গমাইল পরিমাণ বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ব্যাপী অরণ্য অভিনব প্রথায় সংরক্ষিত হইয়া থাকে। মিত্র ও করদ রাজ্য ধরিলে সর্ব্বশুদ্ধ সমগ্র ভারতের প্রায় একচতুর্থাংশ ব্যাপিয়া অরণ্য রহিয়াছে। এই আরণ্য প্রদেশ কোথাও কিঞ্চিত অধিক পরিমাণে আবার কোথাও বিরল অবস্থায় বিদ্যমান। যে স্থানে লোকালয় বহুদিনের সে স্থানে অরণ্যের পরিমাণ অল্প; কারণ, পূর্ব্বে লোকে কুঠার ও বহ্নি সাহায্যে অরণ্যের উচ্ছেদ সাধন করিত।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদিগের দেশে অরণ্যানী সংরক্ষিত হইয়াছে বলিয়া অধুনা আমরা কিছু লাভবান হইয়াছি। খাল খনন দ্বারা যেমন কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, নিয়মিতরূপে অরণ্য সংরক্ষণ দ্বারা তেমনই জল সরবরাহের বহুবিধ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু মিঃ উইলমট দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্ত্ত কমিশনের বিবরণে ইহার উল্লেখও নাই। ১৯০৬—৭ খৃষ্টাব্দে অরণ্যজাত দ্রব্যের মূল্যে প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল এবং তের কোটি গৃহ পালিত পশু অরণ্যে বিচরণ করিতে পাইয়াছিল; আর প্রায় তেত্রিশ লক্ষ টাকার কাষ্ঠ ও অন্যান্য আরণ্য দ্রব্য স্থানীয় কৃষক বা বন্য জাতির অরণ্য-সংরক্ষণজনিত পরিশ্রমের পারিতোষিকরূপে দিতে হইয়াছে। এই বৎসরে মোট আয় প্রায় ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা আয় ও মোট ব্যয় প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

দাবানল অরণ্য-সংরক্ষণের প্রধান অন্তরায়। যাঁহারা দাবানল না দেখিয়াছেন,

তাঁহাদের পক্ষে ইহার ভীষণতা হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। শীতের পর গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে বৃক্ষের পত্র শুষ্ক হইয়া দারুণ উষ্ণ বায়ু সংযোগে বা বৃক্ষের ঘর্ষণে অথবা গ্রীষ্মাতিশয্যে দাবানলের উৎপত্তি হয়। ৪০ বা ৫০ ফিট উচ্চ হইয়া অগ্নিশিখা ধূ ধূ করিয়া সমস্ত বৃক্ষরাজি অঙ্গারে পরিণত করিয়া থাকে। আরণ্য জীব-জন্তু উত্তাপে প্রাণত্যাগ করে। কেবল হস্তী এবং ভল্লুক দূর হইতে দাবানলের আঘ্রাণ পাইয়া জল ছড়াইয়া চারিদিক আর্দ্র করিয়া স্ব স্ব প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। জমীর উর্ব্বরতাপরিবর্দ্ধনের জন্য বা শীকারের সুবিধার জন্য অথবা হিংস্র জন্তুর আবাসগহ্বরের উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত লোকে পূর্ব্বে যে অগ্নিকাণ্ডের ব্যবস্থা করিত বা এখনও করিয়া থাকে তাহা হইতে লোককে বিরত করা সহজ নহে। ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে ৪৪৪০০ বর্গ মাইল বন্য দেশ বিশেষ সাবধানতা ও তত্ত্বাবধানের সহিত সংরক্ষিত হইয়াছিল। অগ্নিসংলগ্ন হইবামাত্র তাহা নির্ব্বাপিত করিবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সে বার শতকরা ৬ ভাগ জমি দাবানলে বিনষ্ট হইয়াছিল। অনেক সময় অরণ্য-প্রান্তরে ও অরণ্যের সন্নিকটে গ্রাম বসাইয়া সুফল লাভ ঘটিয়াছে। ১৮৯৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় প্রায় ১১৫ প্রকার আহার্য্য আরণ্য সামগ্রী যুক্তপ্রদেশের দুইটি জিলার লোকের বুভুক্ষা নিবারণ করিয়াছিল। লোকে আরণ্য দ্রব্যের যথাযথ ব্যবহার বা কার্য্যকরী গুণাগুণ জানিলে আরণ্য দ্রব্যের মূল্য ও আদর অনেক অধিক হইত।

অধুনা দেরাদুনে আরণ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই দেরাদুন বিদ্যালয়টিকে কলেজে পরিণত করিয়া শীঘ্রই কতিপয় প্রাদেশিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে। গত ১৯০৬ সালে Forest Research Institute স্থাপিত হইয়াছে। তথায় বিশেষজ্ঞগণ আরণ্য দ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন জীবাণু ও কীটের দংশনে বৃক্ষের যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে তাহারও উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। ফল কথা যে ভাবে আমাদিগের দেশে অরণ্য-সংরক্ষণের চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় আমাদিগের দেশেও অদূর ভবিষ্যতে সুফল লাভ ঘটিবে, আশা করা যায়। প্রায় অষ্টবিংশ বৎসর পূর্ব্বে সার রিচার্ড টেম্পল বলিয়াছিলেন যে, "ভারতে আমরা যে প্রকারে অরণ্য-সংরক্ষণ বিভাগের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং তাহাতে বৈজ্ঞানিক, ব্যবহারিক ও কার্য্যকরী জ্ঞানানুশীলন যেরূপে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় যে, কোন দেশের সহিত তুলনায় আমাদিগের এই বিভাগ কোন অংশে ন্যূন নহে।" আমরাও তাঁহার কথায় পুনরুক্তি করিয়া ভবিষ্যতে সুফললাভের অপেক্ষা করিতেছি।

শ্রীকালীকুমার দত্ত।

সংগ্রহ।

শিল্প।

ভারতীয় ললিতকলা।

ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে য়ুরোপীয় সমালোচকসমাজে মতের বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক সময় য়ুরোপীয়দিগের বিশ্বাস ছিল, ভারতে প্রস্তর স্থাপত্য গ্রীকদিগের প্রদত্ত শিক্ষার ফল; এখন সে মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক সময় ভারতীয় ভাস্কর্য্য নিকৃষ্ট বলিয়া উপেক্ষিত হইত, এখন ভারতে বহু উৎকৃষ্ট ভাস্করকার্য্যের আবিষ্কারে সে মত আর গৃহীত হয় না। পূর্ব্বে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ছিল, ভারতে চিত্রশিল্পের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই; এখন সে মত পরিত্যক্ত হওয়াতে ভারতে প্রাচ্য চিত্র শিল্পের পুনরাবির্ভাবে যে একদল চিত্রকরের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদিগের চিত্র দেখিয়া 'রাজসিংহের' রূপনগরের অন্তঃপুরবর্ণনা মনে পড়ে—"ঘরের দেওয়ালে সাদা পাতরের অসম্ভব পক্ষী সকল অসম্ভব রকমে, অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব জাতির ফুলের উপর পুচ্ছ রাখিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফল ভক্ষণ করিতেছে।" সংপ্রতি ইংলণ্ডে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে মিষ্টার ভিনসেণ্ট স্মিথ ভারতীয় ললিতকলাসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে এই সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

আলোচনা।

লেখক আরম্ভে বলিয়াছেন, ভারতীয় ললিতকলা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সারজর্জ্জ বার্ডউড বলেন, ভারতে ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যা ললিতকলা নামের উপযুক্তই ছিল না। আর একজন ইংরাজ লেখক বলেন, ভারতীয় ভাস্কর্য্য অত্যন্ত অদ্ভুত। আবার কেহ বলেন, ভারতে ভাস্কর্য্যের কোন উন্নতিই হয় নাই। এ দিকে আবার মিষ্টার হ্যাভেল ও ডাক্তার কুমারস্বামী বলেন, ভারতীয় শিল্পের তুলনা নাই। যাহা হউক, এখন ভারতীয় ললিতকলা আর উপেক্ষিত নহে। এক্ষণে ভারতীয় ললিতকলার যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে; এ সম্বন্ধে কয়খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচিত হইয়াছে ও আরও কয়খানি রচিত হইতেছে। লেখকের মতে, ভারতীয় ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে দেবদেবীর প্রতি-

পরিচয়।

কৃতি অনেক স্থলেই অদ্ভুত, কোথাও কোথাও ভীষণ, বিরক্তিকর। তবে ভারতীয় ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে উৎকৃষ্ট উদাহরণও আছে। লেখক ভারতীয় শিল্প বলিতে বংশপরম্পরাগত শিল্পকীর্ত্তির কথা বলেন নাই; পরন্তু শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রতিভার ফলের কথাই বলিয়াছেন। ভারতীয় ললিতকলা যে স্থাপত্যের অঙ্গমাত্র ইহাতে সন্দেহ নাই। ফার্গুসন দেখাইয়াছেন, ভারতীয় স্থাপত্য অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। লেখক ভারতীয় ললিতকলা হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভাগে

বিভক্ত করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈন শিল্প হিন্দু শিল্পেরই অন্তর্গত। তিনি বলেন, পূজা-পদ্ধতির প্রভেদ না থাকিলে সর্ব্ববিধ হিন্দু মন্দির একই প্রকার আদর্শে রচিত হইত। সে আদর্শ প্রাদেশিক। আমরা যে সকল প্রাচীন হিন্দু শিল্পকীর্ত্তি প্রাপ্ত হই, তাহা বৌদ্ধ-শিল্পের উদাহরণ। হিন্দু শিল্পীর জীব ও উদ্ভিদ রচনা গ্রীক শিল্পীর রচনা হইতে উৎকৃষ্ট। উপহৃত উপাদান হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের শাসনকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস রচিত হইতে পারে। সার্নাথে প্রাপ্ত অশোকস্তম্ভের চূড়া গ্রীক শিল্পিকর্ত্তৃক রচিত—মিষ্টার মার্শাল এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। লেখক বলেন, ভারতীয় শিল্পে বিদেশীয় প্রভাবের আতিশয্য সম্বন্ধে প্রচলিত মত অভ্রান্ত নহে। ভারতীয় শিল্পীরা বিদেশীয় আদর্শকে এমন ভাবে আত্মসাৎ করিতে পারিত যে, তাহা নিজস্বই করিয়া লইত। তাহারা বিদেশীয় আদর্শের অনুকরণে যে সকল রচনা রচিত করিত তাহাতে অনুকরণের পরিবর্ত্তে মৌলিকতার দিব্য দীপ্তি শোভা পাইত। মৌলিকতা না থাকিলে কেহ বিদেশীয় আদর্শ এরূপে নিজস্ব করিতে পারে না। সুতরাং, ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তবে উপকরণের অভাবে এই শিল্পের প্রারম্ভকাল নির্ণয় এখনও অসম্ভব।

গ্রীক ও হিন্দু।

পূর্ব্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রাপ্ত গ্রীক-বৌদ্ধ ভাস্করকীর্ত্তি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইত; এবং অভিজ্ঞগণ বলিতেন, এই আদর্শের ভারতীয় আদর্শে পরিণতি শিল্পের হিসাবে ভারতের ও জগতের পক্ষে শোচনীয় ঘটনা। কিন্তু বর্ত্তমান কালে হ্যাভেলপ্রমুখ সমালোচকগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, এই সকল ভাস্কর-কীর্ত্তিই ভারতীয় শিল্পের নিকৃষ্ট উদাহরণ। ইঁহারা মধ্য যুগের ব্রাহ্মণ্য শিল্পকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন এবং এই মত ব্যক্ত করেন যে, বেদান্ত না বুঝিলে ভারতীয় শিল্প বুঝিবার উপায় নাই,—ভারতীয় শিল্পে ভারতীয় ধর্ম্মবিশ্বাস সপ্রকাশ। লেখক বলেন, এই সকল সমালোচকের চেষ্টায় লোকে মধ্য যুগের ব্রাহ্মণ্য শিল্পনিদর্শনের মধ্যে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বিচারে সর্থম হইয়াছে এবং লোকে বুঝিয়াছে যে, দেবমূর্ত্তির দেহের অস্বাভাবিক মসৃণতা হিন্দু শিল্পীর অজ্ঞতার বা অক্ষমতার পরিচায়ক নহে; পরন্তু ধর্ম্ম-নির্দ্দেশের ফল। তাই হিন্দু শিল্পী মূর্ত্তির হস্ত ও পদ রচনায় স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিত। কিন্তু এই সকল সমালোচক যে বলেন, বিকৃত ও অস্বাভাবিক মূর্ত্তিও হিন্দুধর্ম্ম ভাবব্যঞ্জক ও উৎকৃষ্ট, তাহা স্বীকার করা যায় না। যাহা অস্বাভাবিক তাহা সুন্দর হইতে পারে না; যাহা সুন্দর নহে, তাহা সম্প্রদায়বিশেষের হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত জগতের নহে; যে শিল্পকীর্ত্তি সমস্ত জগতের উপভোগযোগ্য নহে—তাহা উৎকৃষ্ট বলা যায় না। লেখক এ স্থলে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, বহুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক লুবেক সেই মত প্রচার করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার পর এ বিষয়ের আলোচনা অনাবশ্যক। প্রাচীন গ্রীকগণ প্রস্তরে যে সকল "অস্বাভাবিক" কল্পনার বিকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আজও জগতের বিস্ময়ের বিষয়। হিন্দুশিল্পে ও বৌদ্ধ শিল্পে প্রভেদ পরিস্ফুট। বৌদ্ধ শিল্পে মানবীয় ভাব সপ্রকাশ; কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম মানবের সুখসংবর্দ্ধনে সচেষ্ট। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অন্যরূপ; তাই হিন্দু শিল্পে মানবীয় ভাবের

একান্ত অভাব। লেখকের এই মতের সহিত অনেকেরই মতের ঐক্য নাই—থাকিতে পারে না। য়ুরোপে দেবতার কল্পনা মানবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই—তাই মিল্‌টনের ঈশ্বর পিউরিট্যান্ নৃপতিমাত্র ; টেন সে কথা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু ভারতে ভাবুকের ও শিল্পীর দেবতার কল্পনা মানবকে অতিক্রম করিয়াছিল। সেই জন্য দুই দেশের দেবকল্পনা ও শিল্পাদর্শ ভিন্ন।

চিত্র।

লেখকের মতে ভারতীয় চিত্রবিদ্যার ইতিহাসের পর্য্যাপ্ত উপাদান নাই। বর্ত্তমানে কেবল খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত উড়িষ্যার গুহা মন্দিরের চিত্র ও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত অজন্তা গুহামন্দিরের চিত্র ও পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত সিংহলে সিজিগ্গির চিত্র ব্যতীত উল্লেখযোগ্য উপাদানের একান্ত অভাব। অজন্তার চিত্রের পর ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের উৎসাহে উন্নতিপ্রাপ্ত ভারতীয়-পারসিক চিত্রেরই উল্লেখ করিতে হয়। এই দুই চিত্রের মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান। ভারতীয়-পারসিক শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি শিল্পের হিসাবেও বিশেষ প্রশংসনীয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতীচ্য বিশেষজ্ঞগণ এই শিল্পের আলোচনা করিতেন। পরে ক্রমে এই শিল্প অনাদৃত ও উপেক্ষিত হয়। লণ্ডনে, প্যারিসে ও ওয়াসিংটনে চিত্রশালায় এই শিল্পনিদর্শন আজও বিদ্যমান। কর্ণেল হানা যে সকল চিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই আমেরিকায় গিয়াছে। এই ভারতীয়-পারসিক শিল্প রাজদরবারের স্নেহে লালিতপালিত হইয়াছিল ; বাদশাহের ও রাজকর্ম্মচারীদিগের উৎসাহে উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শিল্প ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট ছিল না। লেখক মহাশয় ইহার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই ; কিন্তু অভিজ্ঞদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, প্রতিকৃতি রচনার বিরুদ্ধে মুসলমান ধর্ম্মের অনুশাসনই ইহার কারণ। এই অনুশাসনহেতু আওরঙ্গজেব বহু শিল্পকীর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, হিন্দুরা ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট শিল্পে এই ভারতীয়-পারসিক শিল্পের আদর্শও যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় নূতন চিত্রকর সম্প্রদায়ের কার্য্য উল্লেখযোগ্য ; কিন্তু তাঁহারা যে অতিরিক্ত প্রশংসা পাইয়াছেন—তাঁহাদের চিত্র যে তাহার উপযুক্ত নহে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

মতভেদ।

মিষ্টার হ্যাভেল যে বলিয়াছেন, ভারতে হিন্দু সামাজিক অবস্থায় ধনী দরিদ্র সকলেই সমভাবে শিল্প উপভোগ করিয়া থাকেন, সে কথার প্রতিবাদ করিয়া লেখক বলিয়াছেন, ভারতে শিল্প সর্ব্বব্যাপী নহে ; পরন্তু একান্ত বিরল। তিনি সার পার্ডন ক্লার্কের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ভারতীয় শিল্প ভারতের ও ভারতবাসীর পক্ষে উপযোগী, কিন্তু উচ্চাঙ্গের নহে। এই স্থানে লেখকের এই কথার অসারতা প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যক নাই। তবে লেখক মহাশয়কে এই সহজ সত্য স্মরণ করিতে বলি যে, ভারতীয় শিল্প স্থায়ী গুণে বলীয়ান না হইলে তাহা বিদেশী আদর্শ অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারিত না,—বিদেশী-আদর্শ-প্লাবিত দেশে বহুযুগব্যাপী অনাদর সহ্য করিয়াও স্থায়ী হইত না।

ইতিহাস।

শাজাহান-দুহিতা।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ উপন্যাসে লিখিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষীয় মহিলারা রাজ্য-শাসনে সুদক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। পশ্চিমে, কদাচিৎ একটা জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ, বা কাথারাইন পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক রাজকুলজারাই রাজ্যশাসনে সুদক্ষ। মোগল সম্রাটদিগের কন্যাগণ এ বিষয়ে বড় বিখ্যাত। কিন্তু যে পরিমাণে তাহারা রাজনীতিবিশারদ, সেই পরিমাণে তাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ ও ভোগবিলাসপরায়ণ ছিল। ঔরঙ্গজেবের দুই ভগিনী, জাঁহানারা ও রৌশন্‌আরা। জাঁহানারা শাহজাঁহার বাদশাহীর প্রধান সহায়। শাহজাঁহা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন রাজকার্য্য করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে সফল ও যশস্বী হইতেন। তিনি পিতার বিশেষ হিতৈষিণী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে এ সকল গুণবিশিষ্টা ছিলেন, ততোঽধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অসংখ্য লোক তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র ছিল। সেই সকল লোকের মধ্যে ইউরোপীয় পর্যটকেরা এমন ব্যক্তির নাম করেন, যে তাহা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করিতে পারিলাম না। রৌশন্‌আরা পিতৃদ্বেষিণী, ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। তিনিও জাঁহানারার মত রাজনীতিবিশারদ এবং সুদক্ষ ছিলেন, এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জাঁহানারার ন্যায় বিচারশূন্য, বাধাশূন্য এবং তৃপ্তিশূন্য ছিলেন। যখন পিতাকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া, তাঁহার রাজ্য অপহরণে ঔরঙ্গজেব প্রবৃত্ত, তখন রৌশন্‌আরা তাঁহার প্রধান সহায়। ঔরঙ্গজেবও রৌশন্‌আরার বড় বাধ্য ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বাদশাহীতে রৌশন্‌আরা দ্বিতীয় বাদশাহ ছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতই শাজাহানের দুহিতাদিগের সম্বন্ধে প্রচলিত মত। এই মত বার্ণিয়ারের সাক্ষ্য হেতু প্রচলিত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় একাধিক লেখক এই মত গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে ইতিহাসাভিজ্ঞ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বার্ণিয়ারের কথা যে বিশেষ প্রামাণ্য এমন ও নিশ্চয় বলিবার উপায় নাই। মোগল অন্তঃপুরের গুপ্তবার্ত্তা বাহিরে প্রকাশ হওয়া সহজ ছিল না। যাহা রটিত তাহা কতটা সত্য—কতটা মিথ্যা তাহা নিশ্চয় নির্ণয় করা কঠিন কার্য্য। সংপ্রতি 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ দোবে শাজাহানের দুহিতাদিগের কথার আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দোবে মহাশয়ের সেই প্রবন্ধের সার সংগৃহীত হইল। প্রবন্ধটি স্বল্পায়তন হইলেও মনোরম।

সকল দেশের ইতিহাসেই দেখা যায়, দেশের শাসনকার্য্যে পুরাঙ্গনাগণের প্রভাব প্রস্ফুট। ভারতে মোগল-শাসনকালেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আকবরের রাজত্বকালে যোধা বাই, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নুরজাহান, শাজাহানের রাজত্বকালে মমতাজ মহল ও আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁহার ভগিনীগণ অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শাজাহানের তিন কন্যা; সকলেই সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। জ্যেষ্ঠা জেহানারাকে

'বেগম সাহেব' বা 'পাদশা বেগম' বলা হইত। তিনি উৎসাহশীলা, সুন্দরী, স্নেহশীলা, উদার ও পিতার বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। মধ্যমা রোশিনারা সৌন্দর্য্য-সম্পদে জ্যেষ্ঠার সমান না হইলেও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে ও ষড়যন্ত্র-সামর্থ্যে তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠার চরিত্রের সহিত পিতা সাজাহানের চরিত্রের ও মধ্যমার চরিত্রের সহিত ভ্রাতা আরঙ্গজেবের চরিত্রের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। জ্যেষ্ঠা শাজাহানের ও দারার প্রতি এবং মধ্যমা আরঙ্গজেবের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। কনিষ্ঠা গহরারা মৃদুস্বভাব সম্পন্না—সুশীলা ছিলেন। তিনি রাজনীতির আবিল আবর্ত্তে জীবন-তরী ভাসান নাই।

কলঙ্ক-কথা।

মোগল রাজ-কন্যারা অবিবাহিতা থাকিতেন। তাহার একাধিক কারণ ছিল। সম্রাট কাহাকেও কন্যাকর অর্পণের উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন না, আবার কেহ ইচ্ছা করিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিতেও চাহিতেন না। বিশেষ মোগলদিগের মধ্যে উত্তরাধিকারের কোন নিয়ম না থাকায় রাজ-জামাতার পক্ষে রাজ্য-লাভ-চেষ্টার সম্ভাবনা ও যে ছিল না, এমন নহে। রাজকন্যারা বিলাসে পালিতা ও অবিবাহিতা বলিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অনেক কলঙ্ক-রটনা হইত। বিখ্যাত ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ার জেহানারা ও রোশিনারা সম্বন্ধে কলঙ্ককথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জেহানারা একজন পদমর্য্যাদাহীন যুবককে স্বীয় কক্ষে আনাইতেন। এই কথা অবগত হইয়া শাজাহান একদিন সহসা কন্যার কক্ষে গমন করেন। যুবক হতবুদ্ধি হইয়া বৃহৎ কটাহমধ্যে লুকায়িত হয়। সম্রাট তাহা বুঝিয়া কথায় কথায় কন্যাকে স্নান করিতে বলেন। খোজারা কটাহতলে অগ্নি প্রজ্বালিত করে;—তাহাতেই যুবকের মৃত্যু হয়। বার্ণিয়ার আরও বলেন জনপ্রিয় ভাণ্ডারী নাজীর খাঁ ও জেহানারার প্রণয়-পাত্র ছিলেন। শায়েস্তা খাঁ তাঁহার সহিত রাজপুত্রীর বিবাহের প্রস্তাব ও করিয়াছিলেন। সম্রাট সে প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই; পরন্তু দরবারে তাঁহাকে একটি পান দিয়া সম্মানিত করেন। পান বিষাক্ত ছিল; সেই বিষে নাজীরের মৃত্যু হয়। বার্ণিয়ার জেহানারার প্রতি সম্রাটের অবৈধ প্রণয়ের পাপ কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। বার্ণিয়ার রোশিনারার সম্বন্ধে ও এইরূপ কলঙ্ক-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার রোশিনারা কয়দিন দুই জন যুবককে অন্তঃপুরে রাখিয়া এক দিন নিশীথে দাসী-দিগকে একজন যুবককে প্রাসাদ-বাহিরে রাখিয়া আসিতে বলেন। তাহারা তাহাকে উদ্যানে রাখিয়া আইসে। সে তথায় ধৃত ও আরঙ্গজেবের সমক্ষে নীত হয়। সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, সে পুরপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছিল। সম্রাট তাহাকে সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলায় রক্ষিগণ তাহাকে প্রাচীরের উপর হইতে ফেলিয়া দেয়। অপর যুবক যে দ্বারপথে আসিয়াছিল সেই দ্বারপথেই বাহির হইয়া যায়। আরঙ্গজেব রক্ষীদিগের দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু বার্ণিয়ারের কথা কি প্রামাণ্য? তিনি অন্তঃপুরের কোন 'ফিরিঙ্গী' দাসীর মুখে এই সব কথা শুনিয়াছিলেন। মেনুক্কী এই সব কথা বিশ্বাস করেন নাই। কাফী খাঁ এই সকলের উল্লেখমাত্র করেন নাই। এই কথা সত্য হইলে কি আরঙ্গজেব যুবকদ্বয়কে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন না? এল্‌ফিন্‌ষ্টোন, কীন প্রভৃতি ঐতি-

হাসিকগণ এই কথায় আস্থা স্থাপন করেন নাই। লেন-পুল কেবল বলিয়াছেন যে, পত্নীর মৃত্যুর পর শাজাহান জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়েন যে লোকে নানা কথা বলিত।

যাহা হউক শাজাহান যে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

পিতা ও কন্যা।

জেহানারাকে উপঢৌকনে তুষ্ট না করিলে সম্রাটের নিকট কাহারও প্রার্থনা পূর্ণ হইত না। কাযেই জেহানারা অত্যন্ত ধনী হইয়াছিলেন। ট্যাভার্ণিয়ার বলিয়াছেন, একজন আমীর সিন্ধু দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত অত্যাচার করেন। সম্রাট তাঁহার ব্যবহারে প্রজার আর্ত্তনাদে প্রথমে কর্ণপাত করিতেন না; শেষে তাঁহাকে আনিয়া উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সম্রাটকে পঞ্চাশ হাজার ও জাহানারাকে বিশ হাজার আসরফি উপহার দিয়াছিলেন। জেহানারার তত্ত্বাবধানে পিতার আহার্য্য প্রস্তুত হইত। ফতেবাদের যুদ্ধে দারার সিংহাসন লাভের ও শাজাহানের ক্ষমতা প্রাপ্তির আশা নির্ম্মূল হইলে জেহানারাই আরঙ্গজেবের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পর শাজাহান পুত্রের করে বন্দী হইলে জেহানারা স্বেচ্ছায় সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দীর্ঘ আট বর্ষকাল পিতার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনি পিতার সঙ্গী ও সহায়—সান্ত্বনা ও সুখ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরও আরঙ্গজেব তাঁহার প্রতি কোনরূপ কুব্যবহার করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার সমাধির উপর কেবল তৃণাস্তরণ আবৃত হইয়াছিল। সেই তৃণমণ্ডিত সমাধির শিরদেশে শ্বেত মর্ম্মরফলকে তাঁহার শেষ ইচ্ছা উৎকীর্ণ। নবীনচন্দ্র তাহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছিলেন:—

"বহুমূল্য আবরণে করিও না সুসজ্জিত
কবর আমার।
তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীন-আত্মা জেহানারা
সম্রাট কন্যার।"

রোশনারা ভ্রাতা আরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভ্রাতার সিংহাসনলাভ-

রোশনারা।

চেষ্টাকালে তিনি তাঁহাকে প্রাসাদের সকল সংবাদ দিতেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত আরঙ্গজেবের ভাগ্যে সিংহাসনলাভ ঘটিত কি না সন্দেহ। সাজাহান যখন দারাকে বহু অর্থ দিয়া দিল্লীতে যাইতে উপদেশ দিয়া আরঙ্গজেবকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন, তখন রোশনারাই ভ্রাতাকে সংবাদ দেন যে, পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তুর্ক রমণীদিগের হস্তে বন্দী হইবেন। দারা ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইলে দানেশমন্দ খাঁ প্রভৃতি অনেকেই তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে চিরবন্দী রাখিতে বলেন। রোশনারা জানিতেন, দারা লোকপ্রিয়; তাই তিনি তাঁহার মৃত্যুদণ্ড বিধান করিতে বলেন। আরঙ্গজেবও তাহাই করেন। আরঙ্গজেব সম্রাট হইলে বাদশাহের মোহর রোশনারার নিকটে থাকিত। কিন্তু আরঙ্গজেব তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস

করিতেন না,—তাই যে থলিতে সে মোহর থাকিত তাহা তিনি আর একটি মোহর দিয়া বন্ধ করিতেন। সে মোহর তাঁহার হস্তে বদ্ধ থাকিত। এই অবিশ্বাসের কারণ ছিল। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গজেব অত্যন্ত পীড়িত হয়েন। চারিদিকে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। কেহ শাজাহানকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে, কেহ বা আরঙ্গজেবের কোন পুত্রকে সিংহাসনে বসাইতে সচেষ্ট হইলেন। রোশনারা রোগীর কক্ষে আর কাহাকেও প্রবেশাধিকার দিলেন না।—রোগীর প্রকৃত সংবাদ পুরাঙ্গনারাও জানিতে পারিলেন না। তিনি আরঙ্গজেবের পুত্র আকবরকে সিংহাসনে বসাইতে সচেষ্ট হইলেন। আকবর বালক—তাহার নাবালক অবস্থায় স্বয়ং ক্ষমতা পরিচালনের আশাই এ চেষ্টার কারণ। কিন্তু কিছুই হইল না। আরঙ্গজেব সুস্থ হইলেন। সামান্য সুস্থ হইয়াই তিনি মোহরের থলি আনিয়া পরীক্ষা করিলেন; বুঝিলেন, রোশনারা মোহর ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু তিনি শেষে সকল কথা শুনিলেন। ভ্রাতার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া রোশনারা স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আরঙ্গজেব বুঝিলেন, সেই কার্য্যে সম্মতিদান সমীচীন হইবে না। তাই তিনি তাঁহার কন্যাদিগের শিক্ষার তত্ত্বাবধানভার ভগিনীকে দিয়া তাঁহাকে প্রাসাদেই রাখিলেন। ইহার পর রোশনারার জীবনে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা ইতিহাসে নাই।

বিবিধ।

—:•:—

হেষ্টিংশের বন্ধু।

যে সময় হেষ্টিংশপ্রমুখ মুষ্টিমেয় ইংরাজ বাণিজ্য-প্রসার হইতে ক্রমে এদেশে রাজ্য সংস্থাপন করিতেছিলেন, সে সময় বহু ইংরাজ কোম্পানীর কার্য্যে বা ব্যবসায়কল্পে এই দূর ও দুরধিগম্য দেশে—স্বজনবিরহিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। দুই একজন সুহৃদ ব্যতীত কেহ তাঁহাদিগের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকেন নাই; স্বদেশে তাহাদের স্বজনগণ বহুদিন পরে তাঁহাদের মৃত্যু-সংবাদ পাইতেন। স্বনামধন্য ওয়ারেন হেষ্টিংশের বন্ধু চার্লস্ ক্রফ্ট এইরূপে এ দেশে দেহত্যাগ করেন।

সুখসাগর।

গ্রাণ্টের বাঙ্গালায় পল্লীজীবন সম্বন্ধীয় মনোজ্ঞ পুস্তকে "সুখসাগর" গৃহের একখানি চিত্র আছে। এই গৃহ সম্বন্ধে গ্রাণ্ট লিখিয়াছিলেন, এই গৃহ ওয়ারেন হেষ্টিংশ ও আর তিন জন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহসংলগ্ন ভূমিতে তাঁহারা কফি প্রভৃতি চাষের পরীক্ষা করিতেন। চব্বিশ পরগনায় ইহাই য়ুরোপীয় ব্যক্তিবিশেষের সর্ব্বপ্রথম অধিকার; তৎকালে কোম্পানী ইংরাজ-

দিগকে বাঙ্গালায় ভূমি ক্রয় করিতে দিতেন না। এই সম্পত্তি পরে কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যারেট্টোর হস্তগত হয়। ব্যারেট্টো এই গৃহে অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত বাস করিতেন। তিনি এই স্থানে নিজ পরিজনবর্গের ব্যবহারার্থ একটি ক্ষুদ্র গির্জ্জাও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে এই গৃহ ল্যারালেট্টা নামক একজন স্প্যানিয়ার্ডের হস্তগত হইলে তিনি ঐ গির্জ্জায় মাহুতদিগের বাসের ও মোরগ রাখিবার ব্যবস্থা করেন। "সুখসাগর" কলিকাতা হইতে অদূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গার গতিপরিবর্ত্তনে এই গৃহ নদীগর্ভগত। আজ এই উপবনবেষ্টিত গৃহের চিহ্ন মাত্র বিদ্যমান নাই। তখন দার্জ্জিলিং অনাবিষ্কৃত; শিমলা দুরধিগম্য। রাজ্য-সংস্থাপনের ও দেশব্যাপী অশান্তির দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া হেষ্টিংশ প্রভৃতি সময় সময় বিশ্রামলাভের জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠে এই "সুখসাগর" গৃহে গমন করিতেন। ক্রফ্‌ট এই গৃহের গৃহস্বামী ছিলেন। আজও চট্টগ্রামে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। সংপ্রতি 'বেঙ্গল পাষ্ট অ্যাণ্ড প্রেসেণ্ট্‌' পত্রের সম্পাদক মিষ্টার কার্মিঞ্জার ক্রফ্‌টের জীবনের বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন।

পরিচয়।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ক্রফ্‌ট কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মে সহকারী খাজাঞ্চী ছিলেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজস্ব বিভাগের প্রধান আয়ব্যয় পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন। গ্র্যাণ্ড তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, হেষ্টিংশের সহিত বাস কালে তাঁহারা প্রায়ই সপ্তাহশেষে জলপথে ভ্রমণে যাইতেন;—কখন বা গরুটিতে ফরাসী গভর্ণরের গৃহে, কখন বা পরলোকগত মিষ্টার ক্রফ্‌টের গৃহে অতিথি হইতেন। ক্রফ্‌ট তাঁহার গৃহসংলগ্ন ভূমিতে ইক্ষুর চাষ করিতেন। জানিতে পারা গিয়াছে, ক্রফ্‌ট গুড় হইতে "রাম" মদ্য প্রস্তুত করিয়া জাহাজের ব্যবহারার্থ সরবরাহ করিতেন। হেষ্টিংশের পত্রে মনে হয়, এই গৃহ প্রথমে হেষ্টিংশের থাকিলেও পরে ক্রফ্‌টের সম্পত্তি হয়।

বন্ধুত্ব।

হেষ্টিংসের সহিত ক্রফ্‌টের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। হেষ্টিংশ স্বয়ং বলিয়াছেন, একবার অসুস্থ হইয়া তিনি "সুখসাগরে" গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে হেষ্টিংশের বিচারকালে তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, তিনি কোম্পানীর বলদ কিনিবার পূর্ব্ব-প্রচলিত ব্যবস্থা নাকচ করিয়া তাঁহার বন্ধু ক্রফ্‌টের সহিত যে নূতন চুক্তি করেন—তাহা একান্ত অসঙ্গত ও অন্যায়। হেষ্টিংশ ক্রফ্‌টকে তাঁহার পত্নীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে ক্রফ্‌টের বিপদ ঘটে। হেষ্টিংশের পত্নীর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদিগের ভাড়া বাবদ জাহাজের অধ্যক্ষকে ৫০০০ পাউণ্ড দিতে হয়। ক্রফ্‌ট অধ্যক্ষকে নগদ টাকা না দিয়া মসলিন দেন; কথা হয়, অধ্যক্ষ ঐ বস্ত্র বিক্রয় করিয়া অর্থ লইবেন। ক্রফ্‌টের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ বস্ত্রবিক্রয়ে লাভ না হইয়া ৬০০ পাউণ্ড লোকসান হয় এবং অধ্যক্ষ ক্রফ্‌টকে ঐ টাকার জন্য দায়ী করেন। তৎকালে ক্রফ্‌টের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় দাঁড়াইয়াছে। ফরষ্টার বলেন, এই গৃহে ক্রফ্‌ট মসলিন প্রস্তুত করাইতেন এবং রেশম প্রস্তুতের ব্যবস্থাও করাইয়াছিলেন। তাঁহার মদ্য প্রস্তুত করাইবার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংশ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হেষ্টিংশের প্রত্যাবর্ত্তনের কিছু দিন

চট্টগ্রামে

পরে ক্রফ্‌ট চট্টগ্রামে কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া গমন করেন। কটন বলেন, তিনি অসুস্থতানিবন্ধন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামে গমন করেন। চট্টগ্রামে তাঁহার আর এক বিপদ উপস্থিত হয়। তখন এই প্রদেশের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য সেনাদলের ও রাজস্ব সমিতির জন্য আবশ্যক অর্থ-মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ সদরে পাঠাইতে হইত ; অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের বেতন প্রদানও অসম্ভব হইত। সুদীর্ঘ তিন বৎসর এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইহাতে যে দরিদ্র ক্রফ্‌টকে বিশেষ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। চট্টগ্রামে সার উইলিয়ম জোন্‌স্ একবার সস্ত্রীক ক্রফ্‌টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কটন স্বীকার করিয়াছেন, চট্টগ্রামে ক্রফ্‌টের কায তাঁহার মত অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারীর উপযুক্ত না হইলেও নিন্দনীয় নহে। বোধ হয়, স্বাস্থ্যভঙ্গহেতুই তাঁহার কার্য্য আশানুরূপ হয় নাই। চট্টগ্রামে গমনের এক বৎসর পরে তথায় ক্রফ্‌টের মৃত্যু হয়।

ভারতী।

এস, মা, রেখেছি চিত-সরোজ-আসন পাতি ;
উজলি উঠুক তা'য় তোমার রূপের ভাতি।
কুমুদকুসুমজিনি বিমল চরণশোভা,
তুষারধবল পদে শোণিমা লোচনলোভা।
নখরে ভাসিছে কত নিরমল-ইন্দু-ছায়া।
শিথিল কুন্তলে আজ, শ্বেতবাসে শ্বেতকায়া।
চাহ, মা, এ মুখ পানে বসি ভক্তহৃদি' পরে,
নীলাব্জ নয়নে তব—কি স্নেহ—করুণা ঝরে !
ছুটাও নির্ঝর সম জ্ঞান বিদ্যা যুগ্ম ধারা,
ভাসিব মনের সুখে, হইব আপনা হারা।
সিত ভক্তি প্রেমফুলে যতনে গাঁথিয়া হার,
রাজীবচরণে দিনু ; লহ, দেবি, উপহার।

যে ফুলে পূজিনু, মাতঃ! তোমার চরণতল।
শুকা'তে দিব না কভু থাকিতে নয়নে জল।
মানস মঞ্জুলে মাগো উঠুক মঞ্জীররব,
শ্রবণ জুড়াই শুনি' কঙ্কনশিঞ্জন তব।
রক্তিম অধরে আধ হাসিয়া স্বর্গীয় হাসি,
ঢাল এ জীবনকুঞ্জে অগাধ অমিয়রাশি।
বিজলী চমকি যা'ক অমানিশা অন্ধকারে,
ফুটিয়া উঠুক দীপ্তি হৃদয়ের চারিধারে।
মিশাও সমীর সনে সুরভি নিশ্বাস তব,
মোদিত হইবে ধরা সুধাগন্ধে অভিনব।
রেখ না রেখ না মাতঃ! তব বীণা অচেতন,
রাগিণীসম্ভার যার' করে বিশ্ববিমোহন॥
কোমল কমলকরে পরশি' বীণার তার।
জাগাও নিদ্রিত হৃদি মধুর ঝঙ্কারে তা'র॥

শ্রীলালগোপাল মল্লিক।

আসামে আহোম।

আহোম। পশ্চিমোত্তর ভারতবর্ষে মানব জাতির মঙ্গোলিয় শাখাভুক্ত শক হুনপ্রভৃতি জাতিরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করিয়া যেরূপে ভারতীয় হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্ব প্রান্তেও এক জাতির সম্বন্ধে সেইরূপ ঘটিয়াছে। এই জাতি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর ব্রহ্মের শানপ্রদেশান্তর্গত * পাং হইতে আসামে আসিয়াছিল। কিম্বদন্তী এই যে, ইহাদিগের নায়ক চুকাফা ৯০০০ শান, ২টি হস্তী এবং ৩০০ ঘোটক সহ ১২১৫ খৃষ্টাব্দে মৌলুং ত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ ত্রয়োদশবর্ষ

---

* The paramount kingdom, the home of the main branch of the tribe, was known to themselves as Mungman and as Pong to the Monipuris. Gait's *History of Assam*, p. 67.

কাল পাতকৈ পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিভ্রমণের পর ১২২৮ খৃষ্টাব্দে খামজাংএ উপনীত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের আকৃতি ও ভাষা পরীক্ষা করিলে ইহারা যে শান সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। এই শানেরা অতিশয় বীর্য্যবান্ ছিল বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা ইহাদিগকে "অসম" বলিত। এই অসম হইতে অহম—অহোম এবং আসাম নামের উৎপত্তি। বর্ত্তমানে ইহাদিগের সংখ্যা ১৭৮০৮০।

ভাষা।

ইহাদিগের স্বতন্ত্র লিখিত ও কথিত ভাষা ছিল। কিন্তু এখন উহা বিলুপ্ত। এখন ব্রহ্মপুত্রোপত্যকায় প্রচলিত বঙ্গভাষাই উহাদিগের মাতৃভাষা। তবে দেওধাই—(দেও—দেব, ধাই—ধাত্রী) পুরোহিতদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে সেই ভাষা এখনও প্রচলিত আছে।

ধর্ম্ম।

চুকাফা শান প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবেশ করিবার পূর্ব্বাহ্নে শান ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেইজন্য পরবর্ত্তী কালে যে সকল শান—খামৃতি ফাঁকিয়াল, আয়োটোনিয়া, তুরদ এবং খামজান প্রভৃতি সম্প্রদায় আসিয়াছিল তাহারা সকলেই বৌদ্ধ; আর চুকাফার সহচর ধর্ম্মহীন শানেরা—(আহোমেরা) হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছে। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শান্তিপুর সন্নিহিত মালিপোতা নামক গ্রামের ৵ কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য রাজা চুড়ানফাকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কৃষ্ণরামের বংশধরেরা আসামে "পর্ব্বতীয়া" গোস্বামী নামে খ্যাত। আহোমেরা হিন্দু হইয়া অনেক দেবদেবীর মন্দির স্থাপন, জলাশয় প্রভৃতি খনন, ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর দান করিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রোপত্যকা।

পাটকই পর্ব্বতের দক্ষিণ-সীমান্ত-ভাগে ও ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত সমতল ক্ষেত্র অঞ্চলে (খামজানে) ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন শানেরা চুকাফার নায়কত্বে নীত হইতেছিল তখন নাগা প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিরা তাহাদিগের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। সে সময় এই উপত্যকার পূর্ব্ব ভাগে আর্য্য হিন্দু ছিল না। তবে এই উপত্যকার মধ্য ভাগে আর্য্য শাখার কলিতা জাতি ছিল। ইহারা চতুর্দ্দিকস্থ বর্ব্বর জাতির সংঘর্ষে সেই সময় হীনবীর্য্য ও ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল। কাযেই আহোমগণ অনায়াসে ক্রমশঃ শিবসাগর অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তটস্থ কাছারী, মিরি, মিকির, যোয়ং প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য ও রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর তট ভোট, আকা, ডাফলা, মিশমি প্রভৃতি শক্তিশালী জাতিদিগের শাসনাধীন ছিল বলিয়া আহোম-শক্তি সে দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই।

হিন্দুর প্রসার বৃদ্ধি।

ইহারা ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১০ পর্য্যন্ত ৫৮২ বৎসর রাজত্ব ভোগ করে। ইহাদিগের ৩৬ জন রাজার উল্লেখ আছে। এই সুদীর্ঘ কাল এই উপত্যকা ইহাদিগের হস্তে থাকায় উপত্যকাবাসী হিন্দুদিগের প্রসার-বৃদ্ধি হইয়াছে, নচেৎ অসংখ্য পার্ব্বত্য জাতির সহিত সংঘর্ষে হিন্দুদিগের স্বাতন্ত্র্যসংরক্ষণ অসম্ভব হইত।

এই পার্ব্বতীয়-জাতিসমাকুল উপত্যকায় অসভ্য-প্রতিষ্ঠিত শাসননীতির ভারত-ম্যানুযায়ী সুশাসন আহোমদিগের প্রতিষ্ঠিত। তাহা যে তাহাদের গৌরবের বিষয় তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

আহোম শাসন।

আসাম বুরঞ্জীর (বুরঞ্জী শব্দটি শান অর্থ ইতিহাস) ২৮ পৃষ্ঠায় ৺ গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর লিখিয়াছেন "ইহঁতর অনেকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করি বড় নিষ্ঠাপর হিন্দু হইছে।" বাস্তবিক জাঠ প্রভৃতি জাতিগণ ভারতীয় হওয়াতে আমাদের যে লাভ হইয়াছে, এই উপত্যকায় উক্ত মঙ্গোলিয় শাখাভুক্ত শানেরা হিন্দু আহোম হওয়াতেও আমরা সেইরূপ লাভবান হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ কাল কোন কোন বিজ্ঞ আহোমের মত "হিন্দু ধর্ম্মের লগতে এই আত্মসম্মান আরু বংশাভিমানেই যে আহোম সকলর অভনতির মূল।" এই মত বিস্তারলাভ করিলে ভবিষ্যতে যে সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব ও সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বন্ধন শিথিল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমাদিগের লাভ।

শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

আর্য্যাবর্ত্ত।

(খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী।)

প্রসিদ্ধ চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন ভারেতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষ বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। তিনি তাঁহার সমসাময়িক প্রায় সকল রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুদ্ধের জন্মভূমি—পুণ্য তীর্থ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। এই কারণে তাঁহার ভ্রমণকাহিনী পাঠে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থা আমাদিগের মানসনয়নসমক্ষে সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

হিউয়েন সাংএর ভারত ভ্রমণ-কালে উত্তর ভারতে ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি সংখ্যক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকলের মধ্যে কান্যকুব্জের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। তখন দ্বিতীয় শিলাদিত্য এই রাজ্যে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার বাহুবলে বহু নৃপতি পরাজিত ও কান্যকুব্জ রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতললামভূত মথুরা, স্থানেশ্বর, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। হিউয়েন সাংএর গ্রন্থে উত্তর ভারতে এই সকল প্রসিদ্ধ রাজ্যের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের পাদস্থিত কতিপয় পার্ব্বত্য জাতির বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। হিউয়েন সাং হিমালয় প্রদেশে ব্রহ্মপুরা নামক এক রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই দেশ বর্ত্তমান সময়ে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন রমণীর হস্তে এই রাজ্যের শাসন-ভার ন্যস্ত ছিল। হিউয়েন সাং লিখিয়াছেন, "বহুকাল হইতে রমণীরাই এই দেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে এই দেশ স্ত্রীরাজ্য নামে খ্যাত। শাসনকর্ত্রীর স্বামী 'রাজা' উপাধি লাভ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তিনি রাজ্যের অবস্থা বা শাসনকার্য্য সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। পুরুষগণ কেবল যুদ্ধ ও ভূমিকর্ষণ করেন।"

হিউয়েন সাং উত্তর ভারতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নানা কথায় পূর্ণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা নিম্নে তাঁহার লিখিত কতিপয় রাজ্যের বিবরণের অনুবাদ প্রদান করিলাম।

মথুরা।

মথুরা-রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৫ হাজার লি বিস্তৃত। রাজধানী মথুরা নগরীর বিস্তার প্রায় ২০লি। মথুরা-রাজ্যের ভূমি উর্ব্বর এবং ফলশস্যপ্রসূ। মথুরা-বাসীরা আমলকীর উৎপাদনে সবিশেষ যত্নশীল। এই দেশে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়। মথুরা-রাজ্য উষ্ণপ্রধান দেশ। ইহার অধিবাসীরা কোমল-স্বভাব; সন্তোষ তাহাদিগের চরিত্রগত গুণ। তাহারা গুণগ্রাহী ও বিদ্যার উৎসাহদাতা।

মথুরা-রাজ্যে বিংশতি সংখ্যক সঙ্ঘারাম ও পাঁচটি দেবমন্দির আছে। সঙ্ঘারাম-সমূহে দুই সহস্র শ্রমণ এবং দেবালয়গুলিতে সর্ব্ব শ্রেণীর লোক বাস করিয়া থাকেন। বৎসরের প্রথম, পঞ্চম ও নবম মাসে এবং প্রত্যেক মাসের নির্দ্দিষ্ট উপবাস দিনে শ্রমণগণ বৌদ্ধ স্তূপ সমীপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও উপহার প্রদান করেন। তখন মণিমুক্তাখচিত পতাকা উড্ডীন করা হয়, বহুমূল্য ছত্রে চারিদিক আচ্ছাদিত হয়, ধূপধূনাদির গন্ধে আমোদিত ধূম গগনমার্গে উত্থিত হয়, সকল স্থান কুসুমাস্তৃত হয়। দেশের রাজা ও বিশিষ্ট অমাত্যবর্গ এই ধর্ম্মোৎসবে সোৎসাহে যোগদান করিয়া থাকেন। এই সময় শ্রমণগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তি-দর্শন করিয়া থাকেন। অভিধর্ম্মশাস্ত্রপাঠীরা সারিপুত্রের-ধ্যান পরায়ণগণ মৌদ্গল্য-পুত্রের এবং বিনয়শাস্ত্রপাঠীরা উপালীর স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ভিক্ষুণীরা আনন্দের, শ্রমণসম্প্রদায়প্রবেশার্থীরা রহুলের ও মহাযান-শাস্ত্রপাঠীরা বোধিসত্ত্বের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন।

স্থানেশ্বর।

থানেশ্বর-রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৭ হাজার লি ও থানেশ্বর নগর চক্রাকারে প্রায় ২০লি বিস্তৃত। এই দেশের জলবায়ু প্রীতিপ্রদ, ভূমি উর্ব্বর ও শস্যশালী। কিন্তু এই দেশের জনগণ বিলাসপরায়ণ, সরলতাহীন, নিরুৎসাহ। তাহারা যাদুবিদ্যার বিশেষ অনুরাগী। তাহাদের অধিকাংশই ব্যবসায়বাণিজ্যে ব্রতী। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বহুমূল্য ও দুর্ল্লভ পণ্যদ্রব্য থানেশ্বরে নীত হয়। এ দেশে কৃষি-জীবীর সংখ্যা অতি অল্প এবং তিনটি মাত্র সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। এই সকল সঙ্ঘারামে ৭০০ হীনযান মতাবলম্বী শ্রমণ বাস করেন। এদেশে শতাধিক মন্দির আছে।

প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র রাজধানী থানেশ্বর হইতে অদূরে অবস্থিত।

কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র নামে পরিচিত। পুরাকালে আর্য্যাবর্ত্তে দুইজন নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইত। শেষে সেইরূপ লোকক্ষয়-নিবারণকল্পে তাঁহারা স্থির করেন, উভয় পক্ষের কতিপয় সৈন্য রণক্ষেত্রে শারীরিক দ্বন্দ্বে বিবাদের মীমাংসা করিবে। কিন্তু জনগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তখন নৃপতিদ্বয়ের একজন সঙ্কল্প-সাধনোদ্দেশে এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহার নির্দ্দেশে একজন মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পর্ব্বত-গহ্বরে লুকাইয়া রাখেন। অনন্তর নৃপতি স্বপ্নে ঐ গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছেন, এইরূপ রটনা করিলে পর্ব্বত-গহ্বরে ঐ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। এই গ্রন্থ পাঠে লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, রণক্ষেত্রে দেহপাত করিলে স্বর্গলাভ হয়। তখন জনগণ যুদ্ধার্থ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। তখন ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং মৃত-দেহ যষ্টির মত স্তূপীকৃত হয়। সেই সময় হইতে অদ্যাপি এই যুদ্ধ-প্রান্তর নরকঙ্কালে আবৃত রহিয়াছে। *

শ্রুঘন রাজ্য ৭।

এই রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে গঙ্গা প্রবাহিতা, উত্তরে হিমালয় অবস্থিত। শ্রুঘন রাজ্যের পরিমাণফল ৬ হাজার লি। ইহার রাজধানী চক্রাকারে প্রায় ২০লি বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্ব পার্শ্বে যমুনা প্রবাহিতা। শ্রুঘন রাজ্যের লোক সত্যপ্রিয় ও সরলস্বভাব। এই রাজ্যে সঙ্ঘারামের সংখ্যা পাঁচ, এবং শ্রমণের সংখ্যা এক সহস্র। শ্রমণগণ প্রায় সকলেই হীনযান-মতাবলম্বী; অন্য মতাবলম্বীদিগের সংখ্যা অতি অল্প। এই রাজ্যে এক শত দেবমন্দির বিদ্যমান।

যমুনার পূর্ব্ব দিকে ৮ শত লি দূরে গঙ্গা প্রবাহিতা। গঙ্গার জল নীলাভ এবং তাহার তরঙ্গ সাগরোর্ম্মির মত আবর্ত্তিত। ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে গঙ্গা ধর্ম্মনদী নামে অভিহিত। এই নদীর জলে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। যাহারা জীবনে বীতস্পৃহ, তাহারা গঙ্গাজলে জীবন বিসর্জ্জন করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে, এবং তাহাদের আত্মা পরলোকে পরম সুখ ভোগ করে। কাহারও মৃত্যুর পর তাহার অস্থি গঙ্গাজলে অর্পিত হইলেও তাহার আত্মার সদ্গতি হয়। মায়াপুর নগরে গঙ্গার উৎপত্তিস্থান অবস্থিত। † মায়াপুর (বর্ত্তমান হরিদ্বার) চক্রাকারে

---

* হিউয়েন সাং দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার পুস্তকে মহাভারতের এইরূপ বিকৃত বিবরণ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

† পুরাকালে শ্রুঘন দেশে কুরুবংশীয় নৃপতিদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ন্যূনাধিক ২০লি বিস্তৃত এবং জনাকীর্ণ। মায়াপুরের চারিদিকে স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা প্রবাহিতা। মায়াপুর হইতে অদূরে গঙ্গাতীরে বিরাট দেবমন্দির দণ্ডায়মান। এই স্থানে বহুবিধ অলৌকিক কার্য্য সাধিত হয়। ইহার মধ্যভাগে একটি সুদৃশ্য তড়াগ ইহার শোভাসংবর্দ্ধন করিতেছে। ইহা কৃত্রিমসরিৎযোগে গঙ্গাজলে পূর্ণ। এই স্থানে পাপক্ষয় ও পুণ্যসঞ্চয় হয়। বহু দূরদেশ হইতে শত সহস্র যাত্রী গঙ্গাস্নানের জন্য এই স্থানে সমবেত হয়। বদান্য রাজগণ মায়াপুরে পুণ্যশালা সংস্থাপিত করিয়াছেন; সেই সকলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ আবশ্যক পরিমাণ ভূমিও উৎসৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল পুণ্যশালায় বিধবা, শোকাতুর, অনাথ, শিশু ও দীন দরিদ্রগণ সুখাদ্য ও ঔষধ প্রাপ্ত হয়।

কান্যকুব্জ।

কান্যকুব্জ রাজ্য চক্রাকারে ৪ হাজার লি বিস্তৃত। ইহার রাজধানী শুষ্কপরিখাবেষ্টিত এবং একাধিক সুদৃঢ় ও অনুন্নত দুর্গদ্বারা সংরক্ষিত। কান্যকুব্জ নগরের (রাজধানীর) সর্ব্বত্র পুষ্পোদ্যান, বৃক্ষবাটিকা ও দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। কান্যকুব্জ বাণিজ্যস্থান। এই স্থানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য বিপুল পরিমাণে আমদানী হয়। এই রাজ্যের অধিবাসীরা ধনশালী ও সন্তোষসুখে সুখী। তাহাদিগের বাসগৃহ সুগঠিত ও সুসজ্জিত। এ রাজ্যের সর্ব্বত্র ফুল ও ফল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই স্থানের প্রকৃতিপুঞ্জ যথাসময়ে ক্ষেত্রকর্ষণ ও শস্যকর্ত্তন করিয়া থাকে। কান্যকুব্জ রাজ্যের জলবায়ু প্রীতিপ্রদ ও অধিবাসী-দিগের আচার ব্যবহার সরল ও ন্যায়ানুগত। তাহাদিগের আকৃতি সুন্দর ও আনন্দ-বর্দ্ধক। তাহারা কারুকার্য্যখচিত উজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করে। কান্যকুব্জবাসীরা অধ্যয়নশীল ও ধর্ম্মালোচনার অনুরাগী। তাহাদের বিশুদ্ধ ভাষার খ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। কান্যকুব্জ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের ও অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা সমান। এ রাজ্যে শতাধিক সঙ্ঘারাম ও দশ সহস্র শ্রমণ বিদ্যমান। রাজ্য-মধ্যে দুই শত হিন্দুদেবমন্দির আছে।

আমাদিগের বর্ণিত এই রাজ্যের রাজধানীর প্রাচীন নাম কুসুমপুর। বর্ত্তমান নাম—কান্যকুব্জ; তদনুসারে রাজ্যের নামও কান্যকুব্জ হইয়াছে। কুসুমপুর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া কান্যকুব্জ নাম প্রবর্ত্তিত হইবার কারণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

‡ হিউয়েন সাং লিখিয়াছেন, মায়াপুর তখন রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী মতিপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

পুরাকালে গঙ্গাতীরে একজন ঋষি বাস করিতেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল সমাধিস্থ ছিলেন। তৎকালে কোনরূপে তাঁহার স্কন্ধে ন্যায়গ্রোধ (ন্যগ্রোধ ?) বৃক্ষের বীজ পতিত হয় ও বৃক্ষ জন্মে। এই জন্য তিনি লোকসমাজে মহাবৃক্ষ ঋষি নামে পরিচিত ছিলেন। সুদীর্ঘ কাল পরে ঋষির সমাধি ভঙ্গ হয়। একদা তিনি নদীতীরে পরিভ্রমণকালে কুসুমপুর-সিংহাসনাধিপতির নৃত্যপরা শত কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদিগের রূপলাবণ্যদর্শনমাত্র মোহিত হইয়া পড়েন ও রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকট একজন কুমারীর কর প্রার্থনা করেন। কিন্তু একে একে সকল কুমারীই সেই জড়ভাবাপন্ন ঋষিকে পতিত্বে বরণ করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে রাজা ব্রহ্মশাপভয়ে ম্রিয়মাণ হইলে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা ঋষির বাসনা পূর্ণ করিতে সম্মত হয়েন। অতঃপর রাজা ব্রহ্মদত্ত কনিষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ঋষির নিকট গমন করিলেন। ঋষি সর্ব্বকনিষ্ঠা কুমারীকে অবলোকন করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার শাপে অবশিষ্ট কুমারীরা কুব্জত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি কুসুমপুর কুব্জা রাজকুমারীদিগের বাসস্থান বলিয়া কান্যকুব্জ আখ্যা লাভ করিয়াছে।

কান্যকুব্জ রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতির নাম—শিলাদিত্য। তাঁহার পিতার নাম প্রভাকর বর্দ্ধন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজ্যবর্দ্ধন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অচিরকালমধ্যেই কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের হস্তে পরাজিত ও নিহত হয়েন। তখন মন্ত্রিগণ মিলিত হইয়া রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সংবাদ প্রচার করেন। হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শিলাদিত্য পরাক্রমশালী। তিনি রাজ্যের নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারে সফলশ্রম হয়েন। তাঁহার বাহুবলে বহু নরপতি পরাজিত হইয়াছেন এবং কান্যকুব্জ রাজ্যের প্রসারবৃদ্ধি হইয়াছে। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষপাতী। তিনি জীবহত্যা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন এবং নানা স্থানে স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তাঁহার আদেশে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল চিকিৎসালয়ে চিকিৎসকগণ চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

পঞ্চবর্ষের ব্যবধানে শিলাদিত্য ধর্ম্ম-সম্মিলনী আহ্বান করেন; এবং সেই সময় মুক্তহস্তে ধনদান করেন। তৎকালে দানের অযোগ্য অস্ত্রাদি ব্যতীত আর সকল দ্রব্যই বিতরিত হয়।

একবার মহারাজ শিলাদিত্য পরিদর্শন উপলক্ষে গঙ্গাতীরবর্ত্তী কজিনঘর নামক এক ক্ষুদ্ররাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে আমি নালন্দার বিহারে অবস্থান করিতেছিলাম। তখন কামরূপের অধিপতি কুমাররাজও নালন্দার বিহারে বাস করিতেছিলেন। মহারাজ শিলাদিত্য আমাদিগকে তাঁহার সমীপে গমন জন্য কুমাররাজকে আদেশ করিয়াছিলেন। এই কারণে আমি কুমাররাজের সমভি-ব্যাহারে তাঁহার সকাশে গমন করি। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া চীনদেশ সম্বন্ধে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। আমার উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া-ছিলেন। শিলাদিত্য স্বীয় রাজধানীর অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে ধর্ম্মসম্মিলনী আহ্বান করেন এবং শত সহস্র লোক সমভিব্যাহারে গঙ্গার দক্ষিণতীরবর্ত্তী পথে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এই বিপুল জনসঙ্ঘ নবতি দিবস পরে কান্যকুব্জে উপনীত হইয়াছিল।

অতঃপর শিলাদিত্যের আমন্ত্রণে বিংশতি দেশের অধিপতিরা স্ব স্ব অধিকারের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের সহিত আগমন করেন। শিলাদিত্যের আমন্ত্রিত ধর্ম্ম-সম্মিলনী উত্তর ভারতে রাজকীয় মহোৎসবস্বরূপ ছিল। মহারাজ শিলাদিত্য এই সুবৃহৎ জনসঙ্ঘের বাসজন্য গঙ্গার পশ্চিম দিকে একটি বিরাট্ সঙ্ঘারাম ও পূর্ব্বদিকে একটি এক শত ফিট উচ্চ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সঙ্ঘারামের ও দুর্গের মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের পূর্ণকায় স্বর্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বসন্তকালের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশ দিবস পর্য্যন্ত এই মহোৎ-সব সম্পাদিত হয়। এই মহোৎসবকালে শিলাদিত্য ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় সম্প্রদায়-কেই সমান সমাদর করিয়া নানাবিধ সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। সঙ্ঘারাম হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান বহুসংখ্যক পটমণ্ডপে পরিশোভিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে মধ্যে নহবতের জন্য সংস্থাপিত উচ্চ মঞ্চ হইতে সুমধুর বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইত। মহোৎসবকালে একদিন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিসহ শোভাযাত্রা হইয়াছিল। এই সময় সুসজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে বুদ্ধদেবের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া তাহার বাম পার্শ্বে ইন্দ্রের ন্যায় পরিচ্ছদ-পরিহিত শিলাদিত্য ও দক্ষিণ পার্শ্বে কুমাররাজ অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে রক্ষিরূপে পাঁচশত রণহস্তী ছিল। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধমূর্ত্তির পুরোভাগে এক শত হস্তী গমন করিয়াছিল। শোভাযাত্রা-কালে শিলাদিত্য কর্ত্তৃক মণি, মুক্তা, নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত কুসুম বিতরিত হইয়াছিল। অতঃপর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ধৌত করা হইয়াছিল। তাহার পর শিলাদিত্য সেই মূর্ত্তি স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া পশ্চিমে

দুর্গে গমন করেন এবং তথায় তাহা মহার্ঘ পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে ভূষিত করেন। এই সকল ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে বিপুল আড়ম্বরে ভোজন হয়, এবং তাহার পর বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইয়া সুগভীর পাণ্ডিত্যসহকারে ধর্ম্মালোচনা করেন। সন্ধ্যা-কাল সমাগত হইলে মহারাজ বিশ্রামলাভার্থ স্বীয় প্রাসাদে গমন করেন। *

অযোধ্যা।

অযোধ্যারাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৫ হাজার লি এবং ইহার রাজধানী প্রায় ২০ লি বিস্তৃত। এই দেশে ফুল ও ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এ দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ—প্রীতিপদ। অযোধ্যাবাসীরা ধর্ম্মচর্চ্চাতৎপর এবং বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী। এই দেশে ন্যূনাধিক এক শত সঙ্ঘারাম এবং দশটি দেবমন্দির আছে। অযোধ্যারাজ্যে শ্রমণের সংখ্যা তিন সহস্র। তাঁহারা মহাযান ও হীনযান উভয়-মতানুগত শাস্ত্র-গ্রন্থই অধ্যয়ন করেন। অযোধ্যা রাজ্যের দেবমন্দিরে যে সকল অপধর্ম্মাবলম্বী বাস করেন, তাঁহারা নানাসম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক নহে।

প্রয়াগ।

প্রয়াগরাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৫ হাজার লি বিস্তৃত। এই রাজ্যের রাজধানী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই দেশে শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ফলবৃক্ষ দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। এ দেশ উষ্ণ। ইহার অধিবাসীরা মৃদুস্বভাব। তাহারা বিদ্যানুরাগী। এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অল্প এবং দুইটি মাত্র সঙ্ঘারাম আছে। কিন্তু অপধর্ম্মাবলম্বীরা বহুসংখ্যক।

প্রয়াগরাজ্যের রাজধানীতে একটি সুন্দর মন্দির আছে। অপধর্ম্মাবলম্বীদিগের পুরাণেতিহাসে এই দেবমন্দিরের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; তাহাদিগের শাস্ত্রে কথিত আছে, জীবমাত্রেই এই স্থানে সহজে পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারে।

* মহারাজ শিলাদিত্য ভারতবর্ষের অন্যতম প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তদীয় বীরত্ব, বিদ্যানুরাগ, ধর্ম্মপরায়ণতা ও দানশীলতা কম্বদন্তীতে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার সভা কোবিদবৃন্দে পরিশোভিত থাকিত। বিখ্যাত বাণভট্ট তাঁহার সভাসদ ছিলেন। শিলাদিত্য স্বয়ং সংস্কৃত-রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রচনা ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবের প্রাচুর্য্যে সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ' তাঁহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, 'নাগানন্দের' অভিনয়কালে শিলাদিত্য স্বয়ং জীমূতবাহনের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন।

যদি কেহ এই মন্দিরে সামান্য অর্থদান করে, তবে অন্যত্র সহস্র মুদ্রাদান করিলে যে ফল লাভ হয়, সে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। যদি কেহ জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এই মন্দিরে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তবে পরকালে তাহার আত্মার অক্ষয় সুখ-লাভ ঘটে। আমাদিগের বর্ণিত এই দেবমন্দিরের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দণ্ডায়মান, দেখিতে পাওয়া যায়। *

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রত্যহ শত শত লোক স্নান করে ও প্রাণত্যাগ করে। এ দেশের লোকের বিশ্বাস, স্বর্গকামীর পক্ষে তণ্ডুল কণামাত্রও গ্রহণ না করিয়া উপবাসে নদীজলে জীবন বিসর্জ্জন করা আবশ্যক। তাহাদিগের বিশ্বাস, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। এই জন্য বহুদূর হইতে এবং নানাস্থান হইতে বহুলোক এই স্থানে সমাগত হইয়া সপ্তাহকাল উপবাস করিয়া জীবনান্ত করে।

গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমস্থানের সন্নিকটে একটি স্তম্ভ আছে। অপধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীরা সূর্য্যাস্তকালে এই স্তম্ভে আরোহণ করিয়া এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যের স্তুতি ও বন্দনা করিয়া থাকেন।

এই স্তম্ভ হইতে অদূরে নদীতটে দানবেদী নির্ম্মিত আছে। তথায় রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ দানকার্য্য সম্পাদন করেন। বর্ত্তমান সময়ে শিলাদিত্য পূর্ব্বপুরুষগণের অনুকরণে পাঁচ বৎসর অন্তর এই স্থানে পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত ধনরত্ন বিতরণ করিতেছেন। তিনি প্রথমে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সুসজ্জিত করিয়া সেই মূর্ত্তিকে মহার্ঘ রত্নাদি প্রদান করেন ও পরে স্থানীয় আচার্য্যগণকে দান করেন। ইহার পর দূরাগত আচার্য্যগণের পর্য্যায় উপস্থিত হয়। তৎপরে ক্রমে বিখ্যাত কোবিদগণ ও স্থানীয় অপধর্ম্মাবলম্বীরা ধনরত্ন লাভ করেন। সর্ব্বশেষে দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধুবর্জ্জিত ব্যক্তিদিগকে ধন বিতরণ করা হয়। এইরূপ দানে রাজভাণ্ডার শূন্য হইলে রাজা স্বীয় মুকুট ও অন্যান্য রত্নাভরণ দান করেন। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দানে শিলাদিত্য অবিচলিত থাকেন এবং দানশেষে সানন্দে ঘোষণা করেন—"সমস্ত কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইয়াছে। আমার যত ধন সম্পদ্ ছিল, সবই অপাপবিদ্ধ—অক্ষয় কোষে নীত হইয়াছে।" অতঃপর করদ-রাজগণ স্ব স্ব রত্ন ও পরিচ্ছদ শিলাদিত্যকে প্রদান করেন, এবং তাহাতে তদীয় রাজকোষ পুনরায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

* অক্ষয়বট বৃক্ষ।

গর্জ্জপতিপুর (গাজিপুর)।

গর্জ্জপতিপুর রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ২ হাজার লি বিস্তৃত। ইহার রাজধানী গঙ্গাতীরবর্ত্তী এবং ইহার পরিধি প্রায় ১০ লি। এই রাজ্যের অধিবাসিবর্গ ধনশালী। এই স্থানে নগর ও পল্লীসমূহ পরস্পর সংলগ্ন। এ রাজ্যের ভূমি উর্ব্বর ও তাহাতে যথারীতি কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। এ দেশের জলবায়ু প্রীতিকর, প্রকৃতিপুঞ্জ নির্ম্মলচরিত্র, ন্যায়ানুরাগী কিন্তু উগ্রস্বভাব। এ দেশে সত্যধর্ম্মাবলম্বী এবং অপধর্ম্মাবলম্বী উভয়বিধ লোকই দেখা যায়।

বহুকাল পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে তুরখা দেশে দুই কি তিন জন শ্রমণ বাস করিতেন। তাঁহারা জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মকীর্ত্তিরাজি দর্শনের অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু ভারতীয়গণ অপরিচিত বিদেশীয় বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয়দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছিল। সেই জন্য ইঁহারা বহু কষ্ট ভোগ করেন। তাঁহারা অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে এবং রৌদ্রবৃষ্টিতে শুষ্ককায় হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তাঁহারা গর্জ্জপতিপুর রাজ্যের রাজধানীতে উপনীত হয়েন। এক দিন পরিভ্রমণকালে রাজা তাঁহাদিগকে দেখিতে পায়েন এবং কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি ব্যথিত হয়েন এবং তাঁহাদিগের বাসের জন্য একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই সঙ্ঘারাম অদ্যাপি বিদ্যমান। ইহার প্রাচীরগাত্রে নিম্নলিখিত অনুশাসন-লিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—বুদ্ধের, ধর্ম্মের ও সঙ্ঘের অলৌকিক কৃপায় আমি দেশাধিপতির পদ লাভ করিয়াছি এবং মনুষ্যমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠব্যক্তিরূপে সম্মানিত হইয়াছি। আমি মনুষ্যজাতির শাসনাধিকার লাভ করিয়াছি, এই জন্য বুদ্ধদেব ধার্ম্মিক ব্যক্তিমাত্রেরই রক্ষণের ও সন্তোষ-বিধানের দায়িত্ব আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন। আমি বিদেশীয়দিগের আশ্রয়ের জন্য এই সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিলাম।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

বিশুদ্ধ জলের অভাব।

আমাদের বাঙ্গালাদেশে বিশুদ্ধ জলের অভাবে দিন দিন বাড়িতেছে। এই জলাভাব দ্বিবিধ কারণে ঘটিতেছে। প্রথম মানবের অনবধানতা, দ্বিতীয় নৈসর্গিক কারণ।

মানবের অনবধানতা বাঙ্গালা দেশে জলাভাবের এক প্রধান কারণ। বাঙ্গালায় দীর্ঘিকাসমূহের ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। পালবংশীয় রাজাদিগের দীর্ঘিকার পর, অত প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, বোধ হয়, এ প্রদেশে আর খনিত হয় নাই। পরবর্ত্তী কালের দীর্ঘিকাগুলির মধ্যে ত্রিপুরার মহারাজদিগের দীঘি, বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের দীঘি, সীতারাম রায়ের দীঘি প্রধান। তাহার পর কৃষ্ণচন্দ্রের দীঘনগরের দীঘি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আধুনিক কালের মধ্যে মহতাপচন্দ্রের দ্বারা সংস্কৃত বর্দ্ধমানের বিশাল সরোবরগুলির পর আর সেরূপ কোন দীঘি বাঙ্গালাদেশে হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। ঐ গুলি ব্যতীত বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই বড় বড় পুষ্করিণীর অন্তিম দশা দর্শন করা যায়। কোন কোন প্রাচীন পুষ্করিণীর গর্ভে কৃষিকার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। কোন কোনটিতে গ্রীষ্মকালে দেড়হস্তের অধিক জল থাকে না। মানবের অনবধনতা এই সকল পুষ্করিণীর ধ্বংসের কারণ।

মধ্যে মধ্যে পুষ্করিণীসমূহের আমূল সংস্কার আবশ্যক; নহিলে সেগুলি বুজাইয়া দেওয়া উচিত। পুষ্করিণী নিম্ন স্থান; চারিপার্শ্ব হইতে বৃষ্টির জল জমি ধুইয়া উহাতে আসিয়া সঞ্চিত হয়। এই বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ অবস্থায় পুষ্করিণীতে পৌঁছিতে পারে না। উহা মৃত্তিকা ধুইয়া, মৃত্তিকাসংলগ্ন লবণাক্ত পদার্থ এবং জমির উপরিদেশে অবস্থিত জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ লইয়া পুষ্করিণীতে উপনীত হয়। তদ্ব্যতীত স্নানার্থী জনগণের গাত্রনিঃসৃত মল, রজকের ধৌত বস্ত্রের মল, বায়ু ও পক্ষী প্রভৃতি জীবের দ্বারা আনীত বিবিধ উদ্ভিদের বা জীবের বীজ বা দেহাবশেষ ইত্যাদি দূষিত পদার্থও পুষ্করিণীতে দিন দিন অল্পাধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উহার জলের বিশুদ্ধি বিনাশ করে। এইরূপ জল ক্রমে ক্রমে, বিবিধ পচন ক্রিয়া ও রোগের উৎপাদক আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ্‌সমূহের আবাস ভূমির উপযুক্ত হয়; এবং কালক্রমে উহা এমন অবস্থায় উপনীত হইতে পারে যে, উহার জল বা উহার অবস্থান, নিকটস্থ নগরের বা গ্রামের স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ হইয়া উঠে।

তবে প্রকৃতির ভাণ্ডারে পুষ্করিণীর জলের বিশুদ্ধি রক্ষা করিবারও কতকগুলি

উপায় আছে। এগুলি অনন্ত কাল না হউক বহুদিন পুষ্করিণীর জলের বিশুদ্ধি রক্ষার চেষ্টা করে। এই সকল উপায়ের মধ্যে সূর্য্যকিরণ এবং বায়ুই প্রধান। আমাদের অনিষ্টকারী যে সকল আণবিক উদ্ভিদের (Bacteria) কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা আলোক এবং বিশুদ্ধ বায়ুকে বড় ভয় করে। অলোক এবং বায়ুস্থ অম্লজান তাহাদের পক্ষে বিষবৎ কার্য্য করে। তাহারা একটু নিরিবিলি, অন্ধকারময়, দূষিতবাষ্পপূর্ণ, সেঁতা স্থানে জৈব এবং উদ্ভিজ্জপদার্থ খাইয়া সহজে পুষ্ট হইতে এবং বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে। দীর্ঘিকায় জলের অভাব নাই। কিন্তু অধিকাংশ দীর্ঘিকাই যথেষ্ট আলোক ও বাতাস পায়। বাতাস অম্লজানের সাহায্য ব্যতীতও উদ্ভিজ্জাণুগণের অনিষ্ট করে। উহা সরোবরের জলকে আন্দোলিত করে। স্থির জল না হইলে উদ্ভিজ্জাণুগণ (Bacteria) সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না। স্রোতস্বিনীর জলের প্রবল আন্দোলনের জন্যই উহাতে উদ্ভিজ্জাণু জন্মিতে পারে না। ভাগীরথীর প্রবল স্রোতই উহার জলকে উদ্ভিজ্জাণুরকবল হইতে রক্ষা করে। বায়ু এবং সূর্য্যালোক ব্যতীত মৎস্য এবং পক্ষিগণ পুষ্করিণীর জল বিশুদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করে। উহারা সলিলে সঞ্চিত মল ও বহুবিধ ক্ষুদ্র জীব ভক্ষণ করিয়া পুষ্করিণীর দেহজ (Organic) পদার্থের মাত্রা কমাইয়া দেয়। অতএব উহারা উদ্ভিজ্জাণুর খাদ্যের মাত্রা কমাইয়া দেয় এবং অনেক সময়ে উহাদিগকেও ভক্ষণ করে। মৎস্যগণ জলের মধ্যে যাতায়াত করিয়া—জল আন্দোলিত করিয়া উহাদের বংশবৃদ্ধিরও অসুবিধা ঘটায়। পক্ষীর এবং মৎস্যের এই সকল এবং অন্যান্য উপকারের কথা স্মরণ করিয়া যাহাতে দেশমধ্যে মৎস্য ও পক্ষিবংশ নির্ম্মূল না হয়, বরং যাহাতে তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, এরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মানুষের স্নানের সময়, জল আলোড়িত হইয়া তদ্দ্বারাও উদ্ভিজ্জাণুর বংশ-বৃদ্ধির কতকটা অসুবিধা হয় এবং তাহাদের গাত্র-পরিত্যক্ত সর্ষপতৈলের জীবাণুনাশক শক্তিদ্বারাও উহাদের কতকটা অনিষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃতির এইরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও দিন দিন পুষ্করিণীতে দেহজ (Organic) পদার্থের মাত্রা বাড়িতে থাকে এবং কিছুকাল পরে এই সকল পদার্থের মাত্রা এত বাড়িয়া উঠে যে, পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলিও আর দীর্ঘিকার জলের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

ডোবাগুলিতে, উদ্ভিজ্জাণু জন্মিবার পক্ষে যে সব সুবিধার আবশ্যক, সে সবই আছে। উহা বৃক্ষাদির দ্বারা বেষ্টিত এবং ক্ষুদ্র বলিয়া আলোক ও বাতাস অতি অল্প মাত্রায় এবং পত্রাদি দেহজ (Organic) পদার্থ অত্যধিক মাত্রায় পায়। উহাদের স্রোতহীন, অন্ধকারময়, মৎস্যাদিশূন্য প্রচুর জৈব ও উদ্ভিজ্জ

পদার্থাবশেষযুক্ত জল উদ্ভিজ্জাণুবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অতএব ডোবা-গুলি দেশের পরম শত্রু; উহাদের বিলোপের জন্য সকলের বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক।

কেবল মানুষের অনবধানতাই যে বিশুদ্ধ জলের অভাব ঘটাইতেছে, এমন নহে; অনেক সময় সে স্বয়ং লোভবশতঃ উক্ত অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, লোকে অতি প্রাচীন নদীতে বা খালে আল বাঁধিয়া চাষের জমি বা পুষ্করিণী করিয়া স্রোত একবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। পাটের দ্বারা যে কত স্থানে বিশুদ্ধ জল দূষিত হয়, তাহার পরিমাপ কে করিবে? উহার দ্বারা যে পরিমাণ জল দূষিত হয়, যে পরিমাণ মৎস্য বিনষ্ট হয়, যে পরিমাণে লোকের স্বাস্থ্য-হানি ও প্রাণহানি হয়, এই সমুদায় হিসাব করিয়া দেখিলে পাটের চাষ অতি মাত্রায় বাড়াইলে দেশের আর্থিক লাভও বিশেষ হয় কি না, সন্দেহ।

এক্ষণে আমরা নৈসর্গিক উপায়ে, বিশুদ্ধজলপ্রাপ্তির কিরূপ অসুবিধা ঘটি-তেছে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ঐ কারণ দ্বিবিধ ঃ—প্রথম জলাশয়ের লোপ, দ্বিতীয় বৃষ্টির অল্পতা।

যে কারণ মানবকৃত পুষ্করিণীকে মাঠে পরিণত করে, সেই কারণই নদী, হ্রদ প্রভৃতি স্বাভাবিক জলাশয়গুলির লোপ করিতেছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি সবেগে ভূমির উপর পতিত হইয়া উহাকে কতকটা কর্ষণ করিয়া মৃত্তিকা শিথিল করিয়া দেয়, পরে ভূমির উপর সঞ্চিত বৃষ্টির জল মৃত্তিকাসংগ্রহ করিয়া ঘোলা হইয়া, পয়ঃপ্রণালী বহিয়া নিম্নস্থানের অনুসন্ধানে গমন করে। অনেক সময়ে উহা হ্রদ, পুষ্করিণী, ডোবা প্রভৃতি দেশমধ্যস্থ জলাশয়েই বিশ্রাম করিবার স্থান পায়। তথায় কয়েকদিন বিশ্রামের পর উহার মৃত্তিকারাশি থিতাইয়া পুষ্করিণীর তলদেশে একটি স্তর নির্ম্মাণ করে—এইরূপে পুষ্করিণীটি ক্রমশঃ ভরাট হইতে থাকে। বৃষ্টির জল দেশমধ্যে বিশ্রাম করিবার সুযোগ না পাইলে, দেশ ধৌত করিয়া নদীতে নিপতিত হয়। নদী সেই বিশাল জলরাশি বহন করিয়া লইয়া সমুদ্রে ফেলে। কিন্তু কখন কখন নদী সেই জলরাশি-বাহিত মৃত্তিকা, বালুকা ও শিলাখণ্ড বহনে ক্লান্ত হইয়া সেগুলিকে আপনার গর্ত্তের স্থানে স্থানে সঞ্চিত করিয়া আপনার মৃত্যুর পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। সঞ্চিত পদার্থগুলি কিছুকাল পরে চড়ারূপ এক একটি স্ফোটকে পরিণত হয়। অনেক নদী এই স্ফোটকের প্রভাবে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে; কচিৎ মানুষ বিপদ বুঝিয়া স্ফোটকে অস্ত্রাঘাত করিয়া নদীকে বাঁচাইয়াছে। অগভীর নদীর জল বর্ষার সময় দেশ প্লাবিত করে বটে, কিন্তু

গ্রীষ্মের সময় উহার খাতের উপর শুষ্ক বালুকা ধূ ধূ করিতে থাকে। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ নদীই মরণের পথে চলিয়াছে। অমন যে পদ্মা, তাহারও আর সে প্রখর তেজ নাই।

আরও একটা কারণে পৃথিবীর অনেক স্থানে বিশুদ্ধ জলের মাত্রা কমিয়া যাইতেছে। পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে হ্রদের জল বিশুদ্ধ—সুপেয় ছিল, এখন তাহার জল লবণাক্ত—অপেয় হইয়াছে। কেন? বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নিকটবর্ত্তী দেশ ধৌত করিয়া বৃষ্টির জল উহাতে পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর মাটী হইতে উহা অনেক লবণাক্ত পদার্থ লইয়া গিয়াছে। কাযেই হ্রদটি প্রতি প্রতি বৎসর লবণ ও জল পাইয়াছে। জল শুকাইয়া বাষ্প হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার সহিত আনীত লবণ যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া হ্রদটির জল লবণাক্ত করিয়াছে।

কথা হইতেছে এই যে, যে সকল জলস্রোতের তেজে এককালে এই সকল বিশাল নদী সৃষ্ট হইয়াছিল, এখন কি তাহারা আপনাদের তেজে নদীগুলিকে পুনরায় গড়িয়া লইতে পারে না?

কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, নদীগুলির তেজ কমিয়া গিয়াছে। প্রাচীনগণ বলেন, ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে যেরূপ বৃষ্টিপাত হইত এখন তদপেক্ষা অনেক অল্পপরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। কথাটা অনেকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং অনেকে ভাবেন, কতকগুলি অরণ্যের উচ্ছেদই এই বৃষ্টির অল্পতার কারণ। এক্ষণে সেই জন্য অরণ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছে।

অরণ্যের উচ্ছেদ ব্যতীত বৃষ্টির অল্পতার কি অন্য কোন কারণ আছে? পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান কালের অপেক্ষা অল্প বারিপাত হইত কি না, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে নিম্নলিখিত কারণগুলির আলোচনায় অনুমিত হইবে যে, প্রাচীন কালে বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হইত এবং আরও পাঁচ হাজার বৎসর পরে বর্ত্তমানকালের অপেক্ষা অনেক অল্প বৃষ্টিপাত হইবে।

কারণগুলি এই:—

(১) সূর্য্যের তাপ দিন দিন কমিতেছে। কাযেই সূর্য্যের জল শোষণ করিবার ক্ষমতাও দিন দিন কমিতেছে।

(২) সমুদ্র হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘ নির্ম্মাণে সহায়তা করে। সমুদ্রের জল দিন দিন অধিক মাত্রায় লবণাক্ত হইয়া যাইতেছে।

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে উহাতে যে পরিমাণ লবণ ছিল, এখন তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে লবণ আছে এবং পাঁচ হাজার বৎসর পরে লবণের পরিমাণ আরও অধিক হইবে। বিশুদ্ধ জল হইতে যত সহজে বাষ্প উত্থিত হয়, লবণাক্ত জল হইতে তত সহজে বাষ্প উত্থিত হয় না। অতএব সমুদ্র-জলের বর্ত্তমান সময়ের লবণাধিক্য বশতঃ উহা হইতে পূর্ব্বে যে তাপে যে মাত্রায় বাষ্প উত্থিত হইত, এখন সেই তাপে তদপেক্ষা অল্প মাত্রায় বাষ্প উত্থিত হইবে।

(৩) সমুদ্র-জল হইতে শুধু বাষ্প উত্থিত হইলেই বৃষ্টি হয় না; বৃষ্টি উৎপাদনের পক্ষে দেশের পর্ব্বতরাজি বিশেষ উপকারী। হিমালয় ও অন্যান্য পর্ব্বতমালা না থাকিলে ভারতবর্ষ এক বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হইত; বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের বাষ্পরাশি হিমালয় ও তাহার সহযোগিবর্গের গাত্রসংলগ্ন হইয়া ভারতবর্ষের জন্য বৃষ্টি এবং নদী সৃষ্টি না করিয়া হয়ত কোন সুদূর মেরুপ্রদেশে উপনীত হইয়া জমিয়া বরফ হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের জন্মদাতা হিমালয় আপনার বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া ভারতভূমির জলরাশি এই দেশে রাখিয়া আপনার কন্যাকে রক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু পাহাড়গুলিও অক্ষয় নহে; তাহারাও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন দিন দিন নত হইয়া পড়িতেছে। যে বিশাল শক্তি এককালে উহাদিগকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিল, সে শক্তি আর উহাদিগকে সাহায্য করিতেছে না। কিন্তু যে মাধ্যাকর্ষণশক্তি উচ্চ ও নীচকে সমান করিবার জন্য ব্যগ্র—সেই মহাশক্তি এক দিনও পর্ব্বতের দম্ভ দেখিয়া ভুলে নাই। সে পর্ব্বতের জন্মদিন হইতেই উহাকে এককালে সমভূম করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। সে দিন দিন বায়ু, বৃষ্টি, বরফ ও পশুপক্ষীর সাহায্যে পর্ব্বতগাত্র একটু একটু করিয়া ক্ষয় করিয়া নদীর সাহায্যে পৃথিবীর নিম্নস্থানসমূহে লইয়া ফেলিতেছে। এখনও তাহার কার্য্য শেষ হয় নাই—আরও কত যুগযুগান্তের পর শেষ হইবে কে জানে? তবে ইহা নিশ্চয় যে, জাগতিক ঘটনাবলী যদি এইরূপ ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে এককালে—অবশ্য সে কাল বহুদূরবর্ত্তী—পর্ব্বতগুলি সমভূম হইবেই। শুধু পর্ব্বতগুলিই বা বলি কেন, সমগ্র ভূভাগ সমতল হইয়া এক বিশাল সাগরের দ্বারা আবৃত হইবে।

বর্ত্তমানে সে সময়ের কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, তখন মানুষই থাকিবে না। তবে পর্ব্বত সমভূম হইবার বহু পূর্ব্বেও যে বৃষ্টির অল্পতা নিবন্ধন মানুষ অনেক কষ্ট পাইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বাঙ্গালাদেশে প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়েই যথেষ্ট মাত্রায় বিশুদ্ধ জলের অভাব ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে। উপরে যে অনাবৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী করা হইল, তাহা লইয়া কাহারও আহারনিদ্রা ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, সে এত দূরের কথা যে, সে জন্য আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার আবশ্যক নাই। মানুষ আপনার চেষ্টায় প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অনেক হিত করিয়াছে এবং করিতে পারে। বাঙ্গালার যে বিশাল শক্তি—বৃথা চেষ্টায়, আলস্যে, অকর্ম্মে ও কুকর্ম্মে ব্যয়িত হইতেছে, যদি কোন ঐশী মহিমার প্রভাবে সেই শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভূমি-খননকার্য্যে ব্যয়িত হইত!

মানবসৃষ্ট সুন্দর পদার্থনিচয়ের মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘিকা একটি প্রধান স্থান অধিকারের যোগ্য। বিশাল পুষ্করিণীর অভাবে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেকেরও অধিক অল্প হইয়া যাইত। বর্দ্ধমান সহরের যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহার বিশাল সায়রগুলির জন্য। শুনিয়াছি, রাজ-সমন্দরের জন্যই উদয়পুরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। দক্ষিণাবর্ত্তযাত্রিগণ নিশ্চয়ই টেপাকুলমের সৌন্দর্য্য জীবনে ভুলিতে পারিবেন না!

এখন পল্লীগ্রামের অনেক জমীদার পাশ্চাত্য প্রথায় পল্লীনিবাস রচনা করিতে অজস্র অর্থব্যয় করেন। যদি কোন কবি বা চিত্রশিল্পী তাঁহাদিগকে কুমুদ-কহ্লার-পদ্মশোভিত, নীলজল, বিশালসরোবরতীরস্থ অট্টালিকার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা বুঝাইয়া দিতেন!

বাঙ্গালা অতি প্রাচীন দেশ। কিন্তু এ দেশের নিজস্ব কোন প্রাচীন কার্য্য স্থাপত্য বা শিল্পের নিদর্শন একান্ত বিরল। এ দেশে লৌহও নাই, পাতরও নাই; তাই বহুসংখ্যক স্থায়ী শিল্পনিদর্শন গঠিত হয় নাই। এ দেশের মৃত্তিকাও বোধ হয় পুরীর ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মত বিশাল অট্টালিকা বহন করিবার উপযুক্ত নহে। তাই এদেশে স্থায়ী অট্টালিকাও নাই। এ দেশে ছিল শুধু জলের সৌন্দর্য্য। এ দেশে প্রাচীন স্থাপত্য বিদ্যার একমাত্র স্থায়ী নিদর্শন আছে প্রাচীন পুষ্করিণীতে। মহীপালের নাম এখনও প্রসিদ্ধ। লোকের এখনও বিশ্বাস, বাঙ্গালার নদীগুলিতে বাঙ্গালী খনকের বিদ্যার পরিচয় এখনও পাওয়া যাইতে পারে *।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

* মুরশিদাবাদ জিলায় প্রবাদ যে, গঙ্গার ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে গঙ্গার মোহানার তলদেশ তাম্রের চাদরের দ্বারা আবৃত ছিল। ১২৯২ সালের ভূমিকম্পের সময় সেই চাদর বাহির হয় এবং উহাকে তুলিয়া অনেক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হয়। সেই চাদর উঠাইয়া লইবার পর হইতেই ভাগীরথীর দুর্দ্দশা হইয়াছে।

সিদ্ধিদাতা গণেশের বয়স।

ভারতবর্ষ-ঘটিত পুরাতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনেকে যেরূপ বিচার-প্রণালীর অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় নব-পর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনের' তৃতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "গণেশের বয়স প্রায় ১৩ শত বৎসর।" এই সিদ্ধান্তের আনুকূল্যে বিজয় বাবু যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই,—

(১) মার্কণ্ডেয় ও স্কন্দ পুরাণের সৃষ্টির পূর্ব্বে কুত্রাপি সিদ্ধিদাতা গণেশকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

(২) মহাভারতের অনুক্রমণিকায় যখন কেবল একবারমাত্র গণেশের নাম উল্লিখিত, তখন ঐ দেবতা মহাভারত-রচনার সময়ে কদাচ পরিচিত ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অনুক্রমণিকাটি যে পরবর্ত্তী সময়ে রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

(৩) গণেশ নামক স্বতন্ত্র দেবতার কথা রামায়ণে নাই। উত্তরকাণ্ডের এক স্থানে মহাদেবকেই "গণেশ" বলা হইয়াছে; কিন্তু ঐ স্থানটিও স্বদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

(৪) পঞ্চতন্ত্রে গণেশের উল্লেখ নাই। যদি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতেও গণেশের জন্ম হইয়া থাকিত, তবে কদাচ এরূপ অনুল্লেখ সম্ভবপর হইত না।

(৫) বৎস, ভট্টি, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোনও কবির গ্রন্থে গণেশের নাম নাই—ঐ যুগের কোনও প্রস্তরলিপিতেও তাঁহার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

(৬) ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র বা নৃত্যশাস্ত্রে রঙ্গভূমির কল্যাণ-কামনায় যে সকল দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে গণেশের নাম পাওয়া যায় না। গণেশের অনস্তিত্ব ভিন্ন ইহার অন্য কোনও ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে।

(৭) তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে গণেশের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ উপনিষদ্ "অত্যন্ত অর্ব্বাচীন।"

(৮) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত বাণভট্টের কাদম্বরীতে হস্তিমুণ্ডধারী গণপতির প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। কিন্তু সেখানেও "গণ" ও "গন্ধর্ব্ব-

দিগের" আবাসস্থানের প্রসঙ্গে তাহাদের অধিপতিরূপে তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৯) বাণভট্টের সামসময়িক ভবভূতির 'মালতীমাধবে' সর্ব্বপ্রথমে গণেশের পূজ্য পদবী লাভ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবভূতি দাক্ষিণাত্য ছিলেন। সুতরাং সে সময়ে দক্ষিণাপথে গণেশের পূজা প্রচলিত থাকিলেও উত্তর প্রদেশের বাণভট্টের গ্রন্থে তাঁহার কেবল অস্তিত্বমাত্র উপলব্ধ হয়।

(১০) রাষ্ট্রকূট ও চালুক্য রাজাদিগের বিজয়ের পূর্ব্বে দক্ষিণদেশে আর্য্যনিবাস স্থাপিত হয় নাই। দক্ষিণাপথে আর্য্যনিবাস সংস্থাপিত হইবার পরে যে সকল পুরাণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে গণপতির অনেক কথা আছে। মার্কণ্ডেয় ও স্কন্দপুরাণে গণেশের ও স্কন্দের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ঐ পুরাণগুলি কদাচ খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। ভবভূতির সময়ে গণপতি কোনও 'আস্ত' পুরাণে স্থান পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু অল্প সময় পরেই যাঁহার জন্য পুরাণ রচিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই দক্ষিণপ্রদেশে তাঁহার পূজা একটু পূর্ব্ব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এই দশবিধ কারণের উপর নির্ভর করিয়া বিজয় বাবু সিদ্ধিদাতা গণেশের বয়স ১৩ শত বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লেখক যেরূপ যুক্তিপ্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন ও যেরূপ সাহসের সহিত স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা কহিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। কারণ, আজকালকার বিশুদ্ধ বিদেশী পদ্ধতি অনুসারে ভারতবাসীর শ্রদ্ধেয় বস্তু-মাত্রকে প্রথমতঃ যথাসম্ভব আধুনিক বলিয়া স্থির করিয়া লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাহার পর কোনও প্রাচীন গ্রন্থে ঐ বিষয়ের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইলে ঐ গ্রন্থের প্রাচীনত্বে বা উহার যে অংশে ঐ আধুনিক বলিয়া কল্পিত বিষয়ের উল্লেখ আছে, সেই অংশের মৌলিকত্বে যতপ্রকারে সম্ভবপর, সন্দেহ প্রকাশ করিতে হয়। এরূপ না করিলে বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রণালীর মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। এরূপ অবস্থায় গণেশের প্রাচীনত্বমূলক যে সকল প্রমাণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত করিবার সঙ্কল্প করা গিয়াছে, তাহার সকলগুলিই কোনও না কোনও হেতুসূত্রে প্রক্ষিপ্ত বা নিতান্ত আধুনিক বলিয়া প্রতিপাদন করিবার দিকে পাশ্চাত্যমন্ত্রে দীক্ষিত অপর পক্ষের প্রবৃত্তি হইবারে সম্ভাবনা আছে। তথাপি এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম; বিদেশী যুক্তির অগ্নিপরীক্ষায় যদি এই সকল প্রমাণ ভস্মীভূত না হইয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুর পক্ষে তাহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

বিজয় বাবুর প্রথম যুক্তি এই যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির সৃষ্টির পূর্ব্বে কুত্রাপি গণেশকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি মার্কণ্ডেয় ও স্কন্দ পুরাণকে দ্বিতীয়

সত্যাশ্রয় পুলকেশীর (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের) পরবর্ত্তী—এমন কি, ৮ম শতাব্দীর অ-পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সাহসপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিজয় বাবু মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির রচনার যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তর্কচ্ছলে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও গণপতির বয়স যে ১৩ শত বৎসরের অধিক হয় নাই, এ কথা স্বীকার করা দুঃসাধ্য। কারণ, যে বায়ুপুরাণকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সেই বায়ুপুরাণে আমরা গণপতির উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা :—

গণেশস্য পদে শ্রাদ্ধী রুদ্রলোকং নয়েৎ পিতৄন্।
গন্ধর্কর্ণতর্পণকৃৎ নির্ম্মলং স্বর্নয়েৎ পিতৄন্॥ বায়ুপুরাণ, ১১১ অঃ।

এখন এই বায়ুপুরাণ যে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার প্রমাণ 'হর্ষচরিতে' (৬২০ খ্রীঃ) পাওয়া যায়। যথা—

বিনীতমার্য্যক বেশং দধানঃ পুস্তকবাচকঃ সুদৃষ্টিরাজগমে। নাতিদূরবর্ত্তিন্যাং চাসন্দ্যাং নিষসাদ। * * * গমকৈর্ম্মধুরৈঃ আক্ষিপন্ মনাংসি শ্রোতৃণাং গীত্যা পবমানপ্রোক্তং পুরাণং পপাঠ।—তৃতীয় উচ্ছ্বাসঃ।

এই "পবমানপ্রোক্ত পুরাণ" যে বায়ুপুরাণ, সে বিষয়ে বোধ হয় কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিবেন না। 'হর্ষচরিত'-প্রণেতা বাণভট্টের সময়ে (৬০৭ খ্রীঃ—৬৪০খ্রীঃ) যখন বায়ুপুরাণ-পাঠের পদ্ধতি ছিল ও সেই পুরাণে যখন গণেশের পদে পিণ্ডদান করিবার উল্লেখ আছে, তখন বাণভট্টের অন্ততঃ শত বৎসর পূর্ব্বেও উত্তর ভারতে গণেশ "পূজ্য পদবী লাভ" করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

যাঁহারা গণেশের আধুনিকত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াসী, তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, "গণেশস্য পদে শ্রাদ্ধী" ইত্যাদি শ্লোকটি যে পরবর্ত্তী কালে বায়ুপুরাণমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং এই প্রমাণটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। এই তর্কের উত্তরে প্রথম বক্তব্য এই যে, বায়ুপুরাণ হইতে আমরা যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা যে বাণভট্টের সময়ে প্রচলিত বায়ুপুরাণে ছিল না, তাহা সপ্রমাণ করিবার দায়িত্ব ন্যায়তঃ প্রতিপক্ষেরই গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, বাণভট্টের পূর্ব্বগামী লেখকদিগের গ্রন্থেও যখন গণেশের দেবত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বায়ুপুরাণের ঐ শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে না করিলেও চলিতে পারে। দণ্ডী (বিজয় বাবুর মতে, ৫৯০ খ্রীঃ) প্রণীত 'দশকুমারচরিতে' "অদৃশ্যত স্বপ্নে হস্তিবক্ত্রো ভগবান্" এইরূপ উল্লেখ পাওয়া

যায়। এখানে গন্ধর্ব্বদিগের আবাসস্থানের কোনও উল্লেখ নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। অথচ এই কবি বাণভট্টের পূর্ব্বগামী।

এখানেও তর্ক উঠিতে পারে যে, দণ্ডীকে অনেকেই যখন দাক্ষিণাত্য-কবি বলিয়া মনে করেন, তখন তাঁহার গ্রন্থে গণপতির "পূজ্যপদবী লাভ" নিতান্ত স্বাভাবিক। কারণ, বিজয় বাবুর মতে দক্ষিণ প্রদেশেই প্রথমতঃ গণেশপূজা প্রচলিত হইয়াছিল, উত্তর ভারতে বাণভট্টের গ্রন্থে গণেশের কেবল অস্তিত্বমাত্র উপলব্ধ হয়। বিজয় বাবু বাণভট্টের 'কাদম্বরীর' একটি মাত্র স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু বাণ-প্রণীত 'হর্ষচরিতের'ও কয়েক স্থলেই গণেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

(ক) শিখরনিখাতকুব্জকালায়সকণ্টকেণ বৈণবেণ বিশাখিকাদণ্ডেণ সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধি-বিঘ্ন-বিনায়কাপনয়াঙ্কুশেনেব সতত পার্শ্ববর্ত্তিনা বিরাজমানং।

(খ) সকল মহীভৃৎকম্পকৃদুৎপন্নত এক এব নৃপবংশে।
বিপুলেঽপি পৃথুপ্রতিমো দণ্ড ইব গণাধিপস্য মুখে।

(গ) অয়মশিবসহচরো বিনায়কঃ।

শ্রীহর্ষ-প্রণীত 'নাগানন্দের' ৪র্থ অঙ্কেও গণেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষ নিঃসন্দেহ উত্তরভারতীয় নরপতি ছিলেন।

প্রতিপক্ষ হয়ত বলিবেন যে, এই সকল উত্তরভারতীয় রচনায় গণেশের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু তাঁহার দেবত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন কোথায়? উত্তরে আমরা বাণ ভট্ট ও শ্রীহর্ষ অপেক্ষাও প্রাচীনতর লেখকের গ্রন্থ হইতে গণেশের দেবত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি। অমরসিংহ নিঃসন্দেহ উত্তর ভারতীয় গ্রন্থকার ছিলেন। বাণ ও শ্রীহর্ষ যে তাঁহার পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। অমরকোষে আমরা দেখিতে পাই—

বিনায়কো বিঘ্নরাজ দ্বৈমাতুরগণাধিপাঃ।
অপ্যেকদন্ত হেরম্ব লম্বোদরগজাননাঃ॥

অমরকোষের প্রথমেই স্বর্গবর্গ। সেই স্বর্গবর্গের প্রারম্ভে স্বর্গ, দেবাসুর ও দেবযোনিসমূহের পর্য্যায়-কীর্ত্তন; তাহার পরে বুদ্ধদেবের নামাবলী। অমরসিংহ যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাহা ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয়। তাহার পরেই অর্থাৎ ১১শ শ্লোক হইতে পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তির নামাবলী আমরা দেখিতে পাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্ত্তি বা ত্রিদেব অমরকোষে যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছেন। শিবের

পরেই তাঁহার গৃহিণী ভবানীর পরিচয় আছে—চণ্ডিকা নামটিও এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। চণ্ডিকার পরেই গণেশের কথা ও তৎপরে দেবসেনানী কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে যে, অমরসিংহের গণেশ কার্ত্তিকের অগ্রগণ্য ছিলেন। বিজয় বাবুর মতে গণেশের অগ্রগণ্যত্ব বাণভট্টাদির সময়েও স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহার সে মত যে ভ্রান্ত, তাহা অমরসিংহের লেখায় প্রতিপন্ন হইতেছে। শুদ্ধ তাহাই নহে, গণেশের দ্বৈমাতুরত্বের আখ্যায়িকাও অমরের সময় প্রসিদ্ধ ছিল, দেখা যায়। এখন অমরসিংহ যদি কালিদাসের সামসময়িক হয়েন, তবে কালিদাসের গ্রন্থে গণেশের অনুল্লেখ হইতে তাঁহার অনস্তিত্ব কিরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা বুঝিতে পারি না।

অমরসিংহ কোন্ শতাব্দীর লোক? দেশীয় মতে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম. এ. মহাশয় দেশীয় কিম্বদন্তীর যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়া বঙ্গীয় এসিয়াটীক সোসাইটীর জর্ণালে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত যুক্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিম্বদন্তী মতে, অমরসিংহ কালিদাসের সামসময়িক। বিজয় বাবুও এই কিম্বদন্তীতে আস্থাবান্। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বিজয় বাবুও ঐ মতেরই পক্ষপাতী। অমরসিংহের আবির্ভাবকালও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কালিদাসের সামসময়িকত্ব ভিন্ন অন্য কোনও স্বতন্ত্র প্রমাণের বলে অমরের ঐ সময় কেহ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, দেখি নাই। কিন্তু কালিদাসকে, মিষ্টার ম্যাকডোনেল তাঁহার "সংস্কৃত সাহিত্য" বিষয়ক গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথও ঐ মতে সায় দিয়াছেন। মিঃ কিথ বলেন, কালিদাস কখনই ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রাদুর্ভূত হন নাই। এখন যদি কালিদাসের সহিত অমরসিংহের সমসাময়িকত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অমরকোষ পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভকালের বা তদপেক্ষাও পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ম্যাক্সমূলার বলেন, ৫৬১ খ্রীঃ হইতে ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চীনভাষায় অমরকোষের অনুবাদ হইয়াছিল। এই প্রমাণেও অমরকোষকে ৫ম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং গণেশের জন্ম ৫ম শতাব্দীতেও হয় নাই, এ কথা বলা অসঙ্গত হইবে। কিন্তু বিজয় বাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন—"দেশী হিড়িম্বো ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে হেরম্ব হইয়াছিল, তাহা কেহ দেখাইতে পারিবেন না।" এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে বোধ হয় অমরকোষের কথাটা বিজয় বাবুর মনে ছিল না। গণেশের হেরম্ব নাম

যখন অমরসিংহের গ্রন্থে দেখিতে পাই, তখন হেরম্ব নামের উৎপত্তি অমরকোষ রচনার অন্ততঃ এক শতাব্দী পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিয়া মনে করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে কি ?

তর্কপ্রিয় পাঠক হয়ত বলিবেন যে, এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে অমরকোষের গণেশ বিষয়ক শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত কি না, তাহারও বিচার আবশ্যক। এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠকের অবগতির জন্য এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, অমরকোষের অতি প্রাচীন টীকাকার ক্ষীরস্বামী এই শ্লোকের টীকা রচনা করিয়াছেন। ক্ষীরস্বামী কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়ের (৭৫১ খ্রীঃ—৭৮২খ্রীঃ) গুরু ছিলেন। তিনি স্বীয় টীকায় স্থানে স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৩ জন টীকাকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন, দৃষ্ট হয়। ক্ষীরস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারেরা যদি আলোচ্য শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ক্ষীরস্বামীর টীকায় সে বিষয়ের আলোচনা বা উল্লেখ থাকিত, এরূপ অনুমান আমরা করিতে পারি। রামায়ণাদির টীকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করা সে কালের টীকাকারদিগের রীতিসঙ্গত ছিল। কাযেই অমরকোষের আলোচ্য শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার কারণ নাই। পক্ষান্তরে গ্রন্থের ভূমিকায় অমরসিংহ যখন লিখিয়াছেন যে, তিনি "সমাহৃত্যান্যতন্ত্রাণি" অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কোষগ্রন্থসমূহের সারসঙ্কলন করিয়া আলোচ্য কোষগ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তখন অমরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোষগ্রন্থেও গণেশের হেরম্বাদি নাম লিপিবদ্ধ ছিল, এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে।

অমরকোষের ন্যায় বরাহপ্রণীত 'বৃহৎ সংহিতার' কথাও বিজয় বাবুর স্মৃতিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, দেখিতেছি। 'বৃহৎ সংহিতার' ৫৮ অধ্যায়ে বরাহমিহির বিবিধ দেবপ্রতিমার লক্ষণ ও পরিমাণাদির বিচারপ্রসঙ্গে গণেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, দেখা যায় :—

প্রমথাধিপো গজমুখঃ প্রলম্বজঠরঃ কুঠারধারী স্যাৎ।
একবিষাণোবিভ্রন্মূলককন্দং সুনীলদলকন্দম্ ॥ ৫৮।৫৮

বরাহ ৪২৭ শকাব্দের (৫০৫ খ্রীঃ অঃ) লোক ছিলেন ; বিজয় বাবু যদি বরাহমিহিরকে দক্ষিণ-ভারতীয় গ্রন্থকার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতে গণেশের প্রতিমা গড়িয়া পূজা করা হইত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অমরসিংহকেও ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু বরাহের গ্রন্থে রামোপাসনার উল্লেখ ও অমর-

কোষে তাহার অসদ্ভাব দেখিয়া মনে হয়, অমরসিংহ বরাহমিহিরের অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, এমন কি, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীনতর। *

অতঃপর মহাভারতাদি পুরাণেতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। মহাভারতীয় আদি পর্ব্বের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে গণেশের হেরম্ব, গণাধিপ, গণনায়ক প্রভৃতি নামের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু বিজয় বাবুর মতে ঐ অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া তদুল্লিখিত প্রমাণ পরিত্যজ্য। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, অনুক্রমণিকাধ্যায় কত দিনের প্রক্ষিপ্ত; ইহাও কি এই প্রসঙ্গে আলোচ্য নহে? বিগত ১৩০৯ সালের 'বঙ্গ দর্শনে' শিবপূজাশীর্ষক প্রবন্ধে বিজয় বাবু লিখিয়াছেন,—"পূর্ব্বে মহাভারত বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া থাকিলেও আমাদের পরিচিত প্রচলিত মহাভারত অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক; হয়ত তৃতীয় শতাব্দীর।" ঐ প্রবন্ধেই বিজয়বাবু এই তৃতীয় শতাব্দীর মহাভারতকে "সৌতি-বিবৃত নব মহাভারত" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই "সৌতি-বিবৃত নবমহাভারতে" বা "আমাদের পরিচিত প্রচলিত মহাভারতেই" (অনুক্রমণিকাধ্যায়ে) যখন গণেশের উল্লেখ আছে, তখন গণেশের জন্ম যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল, ইহা সহজেই সপ্রমাণ হইতেছে। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর গুপ্তবংশীয় জনৈক নরপতির দানপত্রে যখন লক্ষশ্লোকময় মহাভারতের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তখন মহাভারতের বর্ত্তমান অনুক্রমণিকাধ্যায়যুক্ত শেষ সংস্করণ যে তাহার অন্ততঃ একশতাব্দী পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনেল স্বকৃত সংস্কৃত-সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান অনুক্রমণিকাধ্যায়কে ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করা সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। পক্ষান্তরে উজ্জয়িনীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত চিন্তামণি বিনায়ক বৈদ্য এম. এ., এল. এল. বি. মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয়

---

* বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে, ভগবান রামচন্দ্রের মূর্ত্তি ১২০ অঙ্গুলি পরিমিত গঠন করিবে,—"দশরথতনয়ো রামো বালশ্চবৈরোচনিঃ শতংবিংশম্।" বৃহৎসংহিতা।

পক্ষান্তরে অমরসিংহ বিষ্ণুর নামাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব, বলরাম, অনিরুদ্ধ প্রভৃতিরও নামের তালিকা সংকলন করিয়াছেন; কিন্তু দাশরথি রামচন্দ্রের কোনও উল্লেখ করেন নাই। নানার্থবর্গের ১৪৩ সংখ্যক (মান্ত) শ্লোকেও বলরাম ভিন্ন অন্য কোনও রামের উল্লেখ নাই। সুতরাং ভারতে রামোপাসনার বা রামচন্দ্রের দেবত্ব-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অমরসিংহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, মনে করিলে কি দোষ হয়?

বলেন, মহাভারতের বর্ত্তমান অনুক্রমণিকাধ্যায়যুক্ত শেষ সংস্করণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বিজয় বাবুর স্বীকৃত সময় যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলেও বলিতে হয় যে, "আমাদের পরিচিত বর্ত্তমান প্রচালিত" মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়োক্ত গণেশের উল্লেখ হইতে তাঁহার জন্মকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী দাঁড়াইতেছে। এই বিচারে গণেশের বয়স অন্যূন ১৮ শতাব্দী প্রতিপন্ন হয়। তবে যদি বিজয় বাবু বিশিষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, মহাভারতে বর্ত্তমান অনুক্রমণিকাধ্যায়টি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।

এই প্রসঙ্গে বায়ুপুরাণের ও স্কন্দপুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে ২।১টি কথা বক্তব্য আছে। বিজয় বাবু স্কন্দপুরাণে সিদ্ধিদাতা গণেশের বিস্তারিত বৃত্তান্ত দেখিয়াই উহাকে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই বঙ্গদেশ হইতেই খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্তাক্ষরে লিখিত স্কন্দপুরাণের একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। বঙ্গদেশস্থ এই প্রতিলিপির কত বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রদেশে বা দক্ষিণাপথে স্কন্দপুরাণ রচিত হইয়াছিল, কে বলিবে? মার্কণ্ডেয় পুরাণও বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' রচনার সময় (৬২০ খৃঃ) উত্তরভারতে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক' যে মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত সুপ্রসিদ্ধ 'চণ্ডীর' পূর্ব্ববর্ত্তী, এ কথা বলিতে কি বিজয় বাবু সাহসী হইবেন? বায়ুপুরাণকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করা অসঙ্গত। এ সকল বিষয়ের প্রমাণ ভিন্সেণ্ট স্মিথের গ্রন্থে পাঠক দেখিতে পাইবেন। এই কারণে সে বিষয়ের বিশদ আলোচনা এখানে করা গেল না। ফলতঃ পুরাণগুলিকে বিজয় বাবু যত আধুনিক বলিয়া মনে করেন, সেগুলি তত আধুনিক নহে।

"রাষ্ট্রকূট ও চালুক্য রাজাদিগের বিজয়ের পূর্ব্বে দক্ষিণ দেশে আর্য্যনিবাস সংস্থাপিত হয় নাই"—এইরূপ নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক বিজয় বাবু গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের প্রমাণস্থলে তিনি ডাঃ ভাণ্ডারকরের রচিত ইতিহাসের নামোল্লেখ করিয়া অতীব হাস্যকর ভ্রম সংঘটন করিয়াছেন। বিজয় বাবুর স্মৃতিশক্তি বোধ হয় এ স্থলেও তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে। কারণ, ডাঃ ভাণ্ডারকর স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণাপথের প্রায় শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত সুশৃঙ্খল আর্য্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট ও

চালুক্য রাজগণ ইহার বহু শতাব্দী পরে দক্ষিণাপথ বিজয় করেন। এই সর্ব্বজনবিদিত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্য, গণেশের আধুনিকত্ব ও অনার্য্যত্ব প্রতিপাদনের আগ্রহাধিক্যে, বিজয় বাবুর স্মৃতিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে—ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

'গাথা সপ্তশতী' নামে মহারাষ্ট্রী-প্রাকৃত ভাষায় রচিত একখানি গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থ ডাঃ ভাণ্ডারকর ও মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহোদয়দিগের মতে ৪০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। 'গাথাসপ্তশতীর' পঞ্চম শতকের তৃতীয় গাথায় গণেশের উল্লেখ আছে। যথা –

হেলাকরগ্গ অঠিঠ অজলরিক্কং সাঅরং পআসন্তো।
জঅই অনিগ্গ অবড় গিগ্ভরি অগগণো গণাহিঈ॥
(টীকা) গণাহিবঈ গণাধিপতির্বিনায়কো মণ্ডল নায়কশ্চ।

এখানে শুদ্ধ গণেশ নহেন, তাঁহার শুণ্ডেরও উল্লেখ আছে। যখন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত গ্রন্থেও করিমুণ্ডধারী গণপতির উল্লেখ পাইতেছি, তখন মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে গণেশের উল্লেখ আছে বলিয়া ঐ অধ্যায়কে ১৩শত বৎসরের অপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। সে যাহা হউক, 'গাথা সপ্তশতীর' প্রমাণে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গণেশের অস্তিত্ব ছিল, প্রতিপন্ন হইতেছে।

গুণাঢ্যপ্রণীত 'বৃহৎ কথা' নামে পৈশাচী ভাষায় লিখিত একখানি কথাগ্রন্থও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হয়। ঐ গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না সত্য; কিন্তু 'কথাসরিৎসাগর' সেই 'বৃহৎ কথা' অবলম্বনে রচিত, এ কথা পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ি-মাত্রেই অবগত আছেন। কথাসরিৎসাগরের ষষ্ঠ তরঙ্গে ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ তরঙ্গে গণেশপূজার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। সে সকল স্থল উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়া আমরা সে অধ্যবসায়ে বিরত রহিলাম। এক্ষণে যদি অনুমান করা যায় যে, সোমদেব ভট্ট গণেশপূজামূলক ঐ সকল কথা গুণাঢ্যের মূল বৃহৎ কথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে নিতান্ত দোষ হয় কি? এ অনুমান যথার্থ কি না, তাহা মূল 'বৃহৎকথার' আবিষ্কার না হইলে নির্ণীত হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করি। তথাপি 'বৃহৎকথার' সামসময়িক 'গাথাসপ্তশতীতে' গণেশের উল্লেখ আছে বলিয়াই আমরা 'বৃহৎ কথা' সম্বন্ধে এইরূপ অনুমান করিতে সাহসী হইতেছি।

'গাথাসপ্তশতীর' প্রমাণে সিদ্ধিদাতা গণেশের অস্তিত্ব দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও

ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাহার কত পূর্ব্বে গণেশের জন্ম হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কারণ, 'গাথাসপ্তশতীর' অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই তিন শত বা তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে যে সকল গ্রন্থ এ দেশে রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও কাত্যায়নের বার্ত্তিক ভিন্ন আর কোন গ্রন্থেরই সহিত পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পরিচয় নাই। মহাভাষ্য ও বার্ত্তিকে যে কথার উল্লেখ নাই, তাহা সেকালে অপরিজ্ঞাত ছিল, এমন সিদ্ধান্তও করিতে পারি না। কারণ, পতঞ্জলি ও কাত্যায়ন ব্যাকরণ শাস্ত্রই রচনা করিয়াছেন, ভারতীয় জ্ঞানের 'এন্‌-সাইক্লোপিডিয়া' রচনা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কাযেই বলিতে হয় যে, গণেশের বয়স সার্দ্ধ দুই সহস্র বর্ষ হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নহে।*

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

আত্মপ্রকাশ।

কুসুমের হৃদয়ে গোপনে
লুকায়িত সৌরভ যেমন—
পবনের পুলক-পরশে
নারে আর রহিতে গোপন ;
মানবের হৃদয়ে তেমনি
গুণরাশি নিবসে গোপনে,
আপনি সে আপনা প্রকাশে
পায় যবে গুণগ্রাহী জনে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

---

* পুরাকালে মেক্সিকোতে গণেশের পূজা প্রচলিত ছিল ; খোটানে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গণেশের পূজা হইত। কত পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে গণেশ তথায় নীত হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে সপ্তম শতাব্দীতেই তিনি যখন খোটান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার জন্ম যে সপ্তম শতাব্দীতে হইয়াছিল, এরূপ নির্দ্দেশ কতদূর সঙ্গত ?—লেখক।

কীটাণুতত্ত্ব।

(ইতিহাস।)

২

বহু বৈজ্ঞানিক পচনশীল দ্রব্য হইতে কীটাণুর স্বতঃজননে বিশ্বাস করিতেন। নীড্‌হাম ইঁহাদের মধ্যে অগ্রগামী। তিনি লক্ষ্য করেন, মাংসখণ্ডকে সিদ্ধ করিয়া জলের সহিত বোতলে ছিপি বদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহাতে জীবাণু উৎপন্ন হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে বনেট এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, মাংসখণ্ডেই জীবাণুর বীজ বর্ত্তমান ছিল, বা বোতলের মধ্যস্থ বায়ুতে জীবাণু বিচরণ করিতেছিল। স্প্যালান্‌জেন পরীক্ষাদ্বারা বনেটের মতের সমর্থন করেন। তিনি একটি কাচ-পাত্রে মাংস সিদ্ধ করেন এবং মাংস যখন সিদ্ধ হইতেছিল, তখন পাত্রের মুখ বদ্ধ করিয়া দেন। পাত্রমধ্যে জীবাণুর উৎপত্তি লক্ষিত হইল না। পরে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে পাত্রমধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইলে জীবাণু উৎপন্ন হইতে লাগিল। এই পরীক্ষাফলে নির্ভর করিয়া আপার্ট মাংসের ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের পচননিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। নীডহাম এই মতের প্রতিবাদ করেন এবং ট্রিভারনাস বলেন যে, জীবাণুর স্বতঃজননের জন্য বায়ুর অবস্থান ও অবস্থা-বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলেন, বোতলে বায়ু ছিল এবং সেই বায়ু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্প্যালানজেন এই মতের প্রতিবাদ করেন; কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সুলজ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা নীডহামের মত দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি একটি কাচপাত্রের অর্দ্ধাংশ চুয়ান জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ বস্তু নিক্ষেপ করেন ও একটি ছিদ্রিত ছিপি দিয়া পাত্রটির মুখ বদ্ধ করেন। পরে তিনি প্রত্যেক ছিদ্রপথে একটি করিয়া কাচনল সমকোণ ভাবে বক্র করিয়া প্রবেশ করাইয়া দেন। ঐ পাত্রটি সিদ্ধ করিলে জলীয় বাষ্প দুইটি নল দিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন তিনি প্রত্যেক নলে দুইটি স্থূলমূল নলের (bulb tube) একটিতে কস্‌টিক পটাশের সরবৎ ও অপরটিতে সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড দিয়া aspiration দ্বারা কাচপাত্রে বাহিরের বায়ু প্রবেশ করাইয়া দেন। ঐ বায়ু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্য দিয়া গমনকালে কীটাণুবর্জ্জিত হয়, এবং পাত্রমধ্যে কীটাণুর উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু বায়ু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্য দিয়া না যাইলে অল্পকালমধ্যেই

পাত্রে নানাবিধ কীটাণুর উৎপত্তি হয়। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বায়ু উত্তপ্ত না করিয়াও রাসায়নিক প্রক্রিয়া-দ্বারা কীটাণু বর্জ্জিত করা যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সানও পরীক্ষায় এইরূপ ফললাভ করেন। তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, পচ্য পদার্থকে গলিত খনিজ পদার্থের উত্তাপে উত্তাপিত বায়ুতে রাখিলে কীটাণু উৎপন্ন হয় না। ইহাতে তাঁহার প্রতীতি জন্মে যে, বায়ুতে পচনক্রিয়ার কারণ নিহিত আছে। কেহ কেহ ইহাতে এই আপত্তি উত্থাপিত করেন যে, সুল্‌জের ও সানের পরীক্ষিত বায়ু রাসায়নিক ও ঔত্তাপিক কারণে বিকারগ্রস্ত হওয়াতেই কীটাণু উৎপন্ন হয় নাই। এইজন্য নীড্‌হামের মতে লোক তেমন আস্থা স্থাপন করে নাই।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্রোডার ও ভ্যানডুস পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করেন যে, বায়ুর রাসায়নিক ও ঔত্তাপিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত না করিয়াও পচন নিবারণ করা যায়। বায়ুকে তুলার ভিতর দিয়া শুদ্ধ করিয়া লইলে পচন নিবারিত হয়। শেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হফ্‌ম্যান ও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সেসিনিন ও পাস্তর প্রতিপন্ন করেন যে, তুলার মধ্য দিয়া বায়ু পরিশুদ্ধ না করিয়াও পচন নিবারণ করা যায়। কোন দ্রব্যকে বক্রমুখ কীটাণুবর্জ্জিত—sterile—কাচপাত্রে রাখিলে জীবাণু সকল বক্রমুখের নিম্নে পতিত হয় ও পচন নিবারিত হয়। এইরূপে স্বতঃজননের বিরুদ্ধ মত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইলেও স্বতঃজননমতের পক্ষাবলম্বীরা নানারূপ যুক্তি উত্থাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, উত্তাপ-প্রয়োগ-হেতু জলের স্বাভাবিক গুণ বিনষ্ট হয়, এবং সেই জলে অপরিশুদ্ধ বায়ু প্রবিষ্ট হওয়ায় পচনক্রিয়া আরব্ধ হয়। বার্ডন, স্যাণ্ডারসন ও লিষ্টার প্রমুখ কীটাণুবিদ্‌গণ বিশেষরূপ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, রক্ত, মূত্র ও দুগ্ধ কীটাণুবর্জ্জিত কাচপাত্রে ঢালিবার সময় যদি তাহাতে বাহিরের বায়ু স্পর্শ হইতে দেওয়া না যায়, তবে পচন নিবারিত হয়।

এইরূপ মতবাদ ও বাদানুবাদ-কালে আর এক সমস্যা উপস্থিত হইল। দেখা গেল, কোন দ্রব্য বিশেষরূপ সিদ্ধ করিয়া কাচপাত্রে উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও কীটাণুর উৎপত্তি হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ব্যাসটিয়ান কীটাণুর স্বতঃজননমতের সমর্থন করিয়া এক পুস্তিকা প্রচার করিলেন।

শালগম ও পনীরের ক্কাথ পরিশ্রুত করিয়া দশ মিনিট সিদ্ধ করিবার পর কোন পাত্রে ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেও উহাতে কীটাণুর উৎপত্তি হয়। ইহার কারণ এই যে, সিদ্ধ করাতে কীটাণু বিনষ্ট হইলেও কীটাণুবীজ (spore) নষ্ট হয় না।

ইহারা কীটাণু অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। এই বীজ হইতেই পরে কীটাণু উৎপন্ন হয়। টিণ্ডাল এই মত প্রকাশ করেন যে, দুই তিনবার সিদ্ধ করিলে কোন দ্রব্যে আর কীটাণু জন্মিতে পারে না। কারণ, প্রথম বার সিদ্ধ করিলেও যে সকল বীজ সজীব থাকে—সেই সকল বীজ হইতে উৎপন্ন কাটাণু দ্বিতীয় বার সিদ্ধ করিলে বিনষ্ট হয়।

যৎকালে এই সকল আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় আর কয়জন বৈজ্ঞানিক সংক্রামক ব্যাধির সহিত কীটাণুর সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত ছিলেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লাটোর ও সান আবিষ্কার করেন যে, yeast plant পচনশীল-দ্রব্যসম্ভূত। পচনক্রিয়ার সহিত ব্যাধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকগণের অগোচর ছিল না। এক্ষণে কীটাণুই পচনের কারণ প্রতিপন্ন হইলে অনেকেই মনে করিলেন, কীটাণু হইতেই ব্যাধির উৎপত্তি। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বোয়েম এই মত প্রচার করেন যে, য়ুরোপে বিসূচিকা কীটাণুর দ্বারা উৎপাদিত। ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে ব্যাসী গুটীপোকার সংক্রামক ব্যাধির কীটাণু আবিষ্কৃত করিয়া এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। তিনি আবিষ্কার করেন, ব্যাধিত পোকার দেহ হইতে কীটাণু সুস্থ পোকার দেহে প্রবেশ করিয়া বীজদ্বারা বহু কীটাণু উৎপন্ন করিয়া পোকার প্রাণনাশ করে। এই আবিষ্কারে কীটাণুর সহিত সংক্রামক ব্যাধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়।

হিউন্‌ এই সকল পরীক্ষা করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, কীটাণু হইতেই সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হয়। কিন্তু তিনি বসন্ত ও স্কার্‌লেট জ্বর প্রভৃতির কীটাণু দেখিতে পায়েন না। ব্যাসীর আবিষ্কার ও হিউন্‌লের মত বৈজ্ঞানিকদিগকে নূতন উৎসাহে উৎসাহিত করে, এবং সেই উৎসাহের ফলে বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। এই সময় বহুবিধ সংক্রামক চর্ম্মরোগের কীটাণু ও কীটাণুবীজ আবিষ্কৃত হয়; এবং অনেকে বিসূচিকার কারণ নির্ণয়ে বদ্ধপরিকর হয়েন। সান, বুটান ও বাড বিসূচিকারোগগ্রস্ত ব্যক্তির মলে কীটাণু দেখিতে পাইয়াছিলেন। ডারউইনও অস্ত্রস্থ খাদ্যদ্রব্যে ক্ষুদ্রতম কীটাণু (monad) দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময় বিসূচিকা য়ুরোপ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হওয়াতে এ বিষয়ে আর পরীক্ষা হয় নাই—কাযেই এই কীটাণুর সহিত ব্যাধির সম্বন্ধও নির্ণীত হয় নাই।

লাটোরের ও সানের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পাস্তর প্রতিপন্ন করেন যে, ল্যাকটিক, অ্যাসেটিক ও ব্যুটিক পচনক্রিয়া কীটাণুর কার্য্য। ইহার পূর্ব্বে

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ডারউইন ও রেয়ার সংক্রামকব্যাধিগ্রস্ত মেষের রক্তে দণ্ডাকৃতি কীটাণু দেখিয়াছিলেন। পল্যাণ্ডার গোরক্তেও উহার অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ডারউইন তৎকালে তাঁহার আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হয়,—কীটাণুই মেষের মৃত্যুর কারণ। এই সকল কীটাণু জীবদেহে প্রবেশ করিয়া বংশবৃদ্ধি করে, ও রক্ত বিকৃত করিয়া জীবের প্রাণনাশ করে; কিন্তু তখন অনেকে এ মত গ্রহণ করেন নাই।

যাহা হউক, এই সময় কীটাণুতত্ত্বের যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছিল এবং এই সময় অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পাস্তরের আবির্ভাবে কীটাণুতত্ত্বের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

যেও একবার।

আমার জীবনকুঞ্জে যেও একবার,
 সুমধুর বসন্তের সমীরের মত;
বাজিয়া উঠিবে শত বিহগ-ঝঙ্কার,
 পরশে উঠিবে ফুটি' ফুল শত শত।

তা'র পর আসে যদি চির অন্ধকার
 তবু আমি স্মৃতি-সুখে রহিব বিভোর;
ঝরেপড়া-ফুলগন্ধ নীরব ঝঙ্কার,
 জাগা'বে তোমারি স্মৃতি বাঞ্ছিত আমার।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবীর।

বঙ্গবাসী অধুনা রাজকীয় সেনাবিভাগে প্রবেশলাভ করিতে সম্পূর্ণ অনধিকারী ; এমন কি, অনেক বিদেশীয়ের নিকট বাঙ্গালী ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া গণ্য ; কিন্তু এমন দিন গিয়াছে, যখন আব্রাহ্মণচণ্ডাল সকল বঙ্গবাসীই সেনাবিভাগে প্রবেশ করিতে অধিকারী ছিলেন,—রাজপুরুষদিগের নিকট কেহই ভীরু বা কাপুরুষ বলিয়া নিন্দিত ছিলেন না ; বরং তাঁহারা মুসলমান রাজগণের পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষা করিতেন। তাঁহারা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়া জাতীয় ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের হিন্দুমুসলমানের মধ্যে অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর ফখ্‌রু উদ্দীন্ মুজফ্‌ফর মুবারক শাহ দিল্লীশ্বরকে অমান্য করিয়া সুবর্ণগ্রাম অধিকারপূর্ব্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঐ সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু জমীদার তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। মুবারক যাঁহাদের আনুকুল্যে স্বাধীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত খেলাত ও জায়গীর দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সদ্ভাব স্থায়ী হয় নাই। মুবারক স্বজাতীয় আমীরওমরাহগণের পরামর্শে অল্প দিন পরেই হিন্দু সামন্তবর্গকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন ; এবং সেইজন্য অত্যল্পকালমধ্যেই তাঁহার অধঃপাতের সূত্রপাত হইল। তাঁহারই অভ্যুদয়কালে পশ্চিম বঙ্গে শাম্‌সুদ্দীন্ ইল্‌য়াস্ তাঁহারই নীতির অনুসরণ করিয়া হিন্দু জমিদারগণের সাহায্যে আপনার সৌভাগ্যপথ প্রশস্ত করিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন। মুবারকের হিন্দুবিদ্বেষের পরিচয় পাইবামাত্র তিনি সদলবলে বাঙ্গালী নৌসেনাগণের সাহায্যে মুবারককে আক্রমণ ও সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিলেন। তৎপূর্ব্বেই দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজশাহ শাম্‌সুদ্দীন্‌কে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে রাঢ়দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের বহু হিন্দু জমীদার ফিরোজশাহের পক্ষাবলম্বন করেন। 'তারিখ্‌ই-মুবারকশাহী' ও 'তারিখ্‌-ই-ফিরোজশাহী' পাঠে আমরা অবগত হই যে, তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইল্‌য়াসের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। এমন কি, সহদেব নামে একজন বাঙ্গালী বীর বঙ্গাধিপের সেনাপতি হইয়া দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। অবশেষে

তিনি এক লক্ষ আশী হাজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করেন এবং শাম্‌সুদ্দীন দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়েন।

পশ্চিম বঙ্গ হইতে শাম্‌সুদ্দীন্ পূর্ব্ব বঙ্গে পদার্পণ করিলে বহু হিন্দু জমীদার তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তিনিও ফক্‌রুদ্দীন মুবারকের ন্যায় তাঁহার পক্ষীয় হিন্দু বীরগণকে উপাধি দানে সম্মানিত করিলেন। তন্মধ্যে চট্টবংশাবতংস রাঢ়ীয় কুলীনপ্রবর ত্যাকরপৌত্র মহাধনী মনোহরপুত্র দুর্য্যোধন "বঙ্গভূষণ" উপাধি এবং মুবারকের পক্ষীয় সামন্তরাজ বা জমীদারগণকে পরাস্ত করায় পুতিতুণ্ডবংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন চক্রপাণি "রাজজয়ী" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় ৪ শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাঁহার মহাবংশে উক্ত দুই ব্রাহ্মণ-বীরের এইরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

দুর্য্যোধনের পরিচয়—

"মনো মনীষি ধ নবান্ বিশ্ববিখ্যাতপৌরুষঃ।
জিয়োথ গোবিন্দঃ বুঢ়োগদোকৌ দুজোস্মুজোকৌ চ মনোহরস্য।
পুত্রা বভূবঃ ষোড়শ সুযোগ্যাঃ সর্ব্বে সুচট্টাম্ব জভানুরাস্তে॥
দ্বিজরাজপদং প্রাপ্য দুজো রেজে মহীতলে।
বঙ্গৈকভূষণখ্যাতঃ প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বদেশতঃ॥"

জগৎবিখ্যাত, তেজস্বী, মনীষী ও ধনবান্ মনোহর চট্টের ষোলটি পুত্র, তন্মধ্যে জিয়ো বা জীব, গোবিন্দ, বুঢ়, গদাধর, দুর্য্যোধন ও সুযোধন এই সকলেই চট্টবংশীয় পদ্মের সূর্য্যস্বরূপ। ইঁহাদের মধ্যে দুর্য্যোধন দ্বিজরাজপদ লাভ করিয়া "বঙ্গভূষণ" নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। *

চক্রপাণির পরিচয়—

"সদীশ্বরঃ পুতিকুলাগ্রগণ্যো
ধন্যো যশস্বী গুণবাংশ্চ পুত্রী।
যশ্চক্রপাণি বহুকর্ম্মপূজ্যো
'রাজজয়ী' কর্ম্মচতুষ্টয়েন॥"

পুতিতুণ্ডকুলাগ্রণী, সদাশয়গণের প্রভু, ধন্য, যশোভাজন, গুণবান্ ও পুত্রবান্ যে চক্রপাণি, তিনি বহুকর্ম্মগুণে পূজনীয় এবং চতুর্বিধ কর্ম্মগুণে "রাজজয়ী" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কেবল উক্ত দুই মহাত্মা বলিয়া নহে, আরও বহু ব্রাহ্মণ-

* ইঁহার বংশধরগণও বঙ্গভূষণ চট্ট বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

বীরের পরিচয় প্রাচীন কুলশাস্ত্রে পাইয়াছি। দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ শামস্‌উদ্দীনের বিরুদ্ধে যখন রাঢ় দেশে আগমন করেন, তৎকালে যে সকল জমীদার দিল্লীশ্বরকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক ব্রাহ্মণবীরের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ সকল বীরের মধ্যে সাগরদীয়ার বন্দ্যবংশীয় উদয়ন কবিকঙ্কণ ও তাঁহার সপ্ত বীর-পুত্রের নাম রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যথা ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশে'—

"দৌহিত্রকঃ শ্রীকরচট্টজস্য
বন্দ্য প্রসিদ্ধোদয়নো বভূব।
শব্দার্থসিংহঃ কবিকঙ্কণোঽয়ং
তর্কাম্বুজার্কঃ স্মৃতিশাস্ত্রবক্তা ॥
ভূপাল-শৌর্য্যাতুল-সদ্বিভূতিঃ
প্রসিদ্ধ-বিদ্যাতুল-শুদ্ধকীর্ত্তিঃ।
মুরারিকো মাধবরামকোকাঃ
সন্তোষকঃ পণ্ডিতকঃ কুমারঃ।
এতে চ বন্দ্যোদয়নস্য পুত্রাঃ
সপ্তৈব বীরব্রতধারিণস্তে ॥"

শ্রীকর চট্টের দৌহিত্র সুপ্রসিদ্ধ উদয়ন বন্দ্য। ইনি কবিকঙ্কণ উপাধিতে ভূষিত, শব্দ ও অর্থশাস্ত্রে মহাশক্তিশালী, তর্কশাস্ত্রের অন্ধকার দমনে সূর্য্যস্বরূপ, স্মৃতিশাস্ত্রবক্তা, ভূস্বামী, অতুলশৌর্য্যশালী, উত্তম-বিভূতি-বিশিষ্ট, ও অসাধারণ বিদ্যাপ্রভাবে অমল কীর্ত্তিতে প্রসিদ্ধ। মুরারি, মাধব, রাম, খোকা, সন্তোষ, পণ্ডিত ও কুমার উদয়নের এই সপ্ত পুত্রও বীরব্রতাবলম্বী বলিয়া প্রথিত।

বঙ্গের কুলগ্রন্থরূপ সামাজিক ইতিহাসে এইরূপ বীরগণের পরিচয়ের অভাব নাই। স্থানান্তরে এই সকল খ্যাতনামা মহাত্মগণের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি।*

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

* 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩য়ভাগ (ষষ্ঠঅংশ) ৫৮ হইতে ৭৩পৃষ্ঠা। (গ্রন্থ)

উত্তরাধিকারী।

১

পাড়ার নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা যখন সময় কাটাইবার জন্য একটা সখের থিয়েটার খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—তখন মফঃস্বলে জিলার সদরে আদালতে নকলনবীশ গৌরীচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভবতারণ সেই দলে যোগ দিল। ভবতারণ সে বার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে। বিদ্যালয়ে বুদ্ধিমান বালক বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল; সহসা পাঠে তাহার অমনোযোগ ও রঙ্গালয়-সংস্থাপনে অসাধারণ উৎসাহ দেখিয়া গৌরীচরণ বিরক্ত হইলেন। তিনি কয়বার ভ্রাতাকে পাঠে মনোযোগী হইতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহার কথায় বিশেষ ফল হইল না।

যথাকালে ভবতারণ পরীক্ষা দিল। তাহার পর দীর্ঘ অবকাশ; ভবতারণ ও তাহার সঙ্গীরা সোৎসাহে রঙ্গালয়-সংস্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিল। তাহার পর পরীক্ষার ফল বাহির হইল; ভবতারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। গৌরীচরণ আফিসে এ সংবাদ পাইলেন; তাঁহার আফিসের অনেকেই তাঁহার সহিত সহানুভূতি করিল, সকলেই বলিল,—ভবতারণ থিয়েটারের দলে মিশিয়াই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। কেহ কেহ গৌরীচরণকে বলিল, "তোমার দোষেই ভাইটা নষ্ট হইল। তুমি তেমন শাসন কর না।"

গৌরীচরণ লোকটা স্বভাবতঃ "রগচটা"। তাহাতে আবার সংসারের অসচ্ছল অবস্থা, সেই জন্য তাঁহার মেজাজটা আরও খারাপ থাকিত; সামান্য আয়—সংসারে অনেকগুলি লোক—স্বয়ং, ভ্রাতা, পত্নী, দুই পুত্র। ইহার উপর আবার তিনি কয় মাসপূর্ব্বে ভ্রাতার বিবাহ দিয়াছেন। কাযেই আয়ে ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভ্রাতার অসাফল্যের সংবাদে ও তদুপরি বন্ধুদিগের মন্তব্যে তাঁহার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি সে দিন যে কাযে হাত দিলেন, সেই কাযেই ভুল করিলেন; তিরস্কৃত হইলেন।

ভাবিতে ভাবিতে গৌরীচরণ গৃহে ফিরিলেন। গৃহদ্বারে তাঁহার সহিত ভবতারণের সাক্ষাৎ হইল। সে তখন থিয়েটারের আড্ডায় যাইতেছে। গৌরীচরণ কিছু উষ্ণ স্বরে বলিলেন, "শুনিয়াছ, তুমি 'ফেল' হইয়াছ?"

ভবতারণ কোন উত্তর দিল না; দাঁড়াইয়া রহিল।

গৌরীচরণ দক্ষিণ হস্তে ভ্রাতার মস্তকটি ঝাঁকাইয়া বলিলেন, "বুঝিতে পারিয়াছ?"

বদমেজাজ গৌরীচরণের মৌলিক নহে; পরন্তু কৌলিক। জ্যেষ্ঠের ব্যবহারে কনিষ্ঠের ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম হইল। সে বলিল, "হাঁ।"

গৌরীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ?"

ভবতারণ উত্তর করিল, "মথুরের বাড়ী।"

"আবার থিয়েটারের আড্ডায় যাইতেছ? তথায় যাইতে পাইবে না।"

"কেন?"

"কেন?"—বলিয়া গৌরীচরণ কনিষ্ঠকে চপেটাঘাত করিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি আর কোন দিন সে আড্ডায় যাও, তবে তোমাকে আমার গৃহ হইতে দূর করিয়া দিব।"

গৌরীচরণ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভবতারণ চলিয়া গেল।

২

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ভবতারণ গৃহে ফিরিল না। ততক্ষণে গৌরীচরণের রাগ নিবিয়া আসিয়াছে। তিনি কিছু চিন্তিত হইলেন। ভবতারণ সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময়ই গৃহে ফিরিয়া আইসে। ক্রমে যখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল তখন গৌরীচরণের চিত্ত নানা দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি লণ্ঠন লইয়া ভ্রাতার সন্ধানে বাহির হইলেন। তিনি মথুরানাথের গৃহে—ওরফে থিয়েটারের আড্ডায়, যাইলেন; ভবতারণ তথায় যায় নাই। তিনি তাহার অন্যান্য সহপাঠীর ও বন্ধুর গৃহে গমন করিলেন; কোথাও তাহার সন্ধান পাইলেন না। হতাশ হইয়া রাত্রি দশটার পর তিনি গৃহে ফিরিলেন। সে রাত্রিতে তাঁহার আহার নিদ্রা কিছুই হইল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—কেন তাহাকে প্রহার করিলাম? সে তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা,—বয়সে অনেক ছোট—তাঁহার বয়স ভ্রাতার বয়সের দ্বিগুণেরও অধিক, পিতামাতার মৃত্যুর পর হইতে তিনিই তাহাকে লালনপালন করিয়াছেন। গৌরীচরণ সেই সব কথা ভাবিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বিধবা জননীর মৃত্যু হয়, তখন ভবতারণের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। তাঁহার জন্মের পর ও ভবতারণের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার যে তিনটি ভগিনী ও দুইটি ভ্রাতা জন্মিয়াছিল—তাহারা কেহই পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করে নাই। তাই ভবতারণ জননীর একান্ত—অতিরিক্ত প্রিয় ছিল। মরিবার সময় তিনি

কেবল ভবতারণের কথাই বলিয়াছিলেন। আজ সেই সব কথা গৌরীচরণের মনে পড়িতে লাগিল।

ভবতারণ কোথায় গেল,—গৌরীচরণ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে তাঁহার মনে হইল, সে হয়ত শ্বশুরালয়ে গিয়াছে। অন্য অবলম্বনের অভাবে গৌরীচরণের আশা এই শেষ অবলম্বনই গ্রহণ করিল। গৌরীচরণ পরদিন প্রভাতেই ভবতারণের শ্বশ্রুকে পত্র লিখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রেও "ভাই ভবতারণ তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছ"—ইত্যাদি মামুলি বিজ্ঞাপন প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন।

৩

গৌরীচরণ গৃহে প্রবেশ করিলে ভবতারণ লক্ষ্যহীন ভাবে কিছু দূর অগ্রসর হইল; তাহার পর ভাবিল, "কোথায় যাই?" তাহার মনে পড়িল, তাহার শাশুড়ী স্বয়ং অসুস্থা বলিয়া তাহাকে একবার যাইতে লিখিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে যাইবে বলিয়া সে জ্যেষ্ঠের আদেশ সত্বেও যায় নাই। তাহার শ্বশুরের "ধনাপবাদ" ছিল। তাহার পত্নীই তাহার বিধবা শাশুড়ীর একমাত্র সন্তান।

এক বন্ধুর নিকট হইতে কয়টি টাকা সংগ্রহ করিয়া ভবতারণ শ্বশুরালয়ে গেল।

জামাতার অপ্রত্যাশিত আগমনে ভবতারণের শাশুড়ী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ভবতারণ দেখিল, সত্য সত্যই তাঁহার শরীর অসুস্থ, চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন। সে তাঁহাকে সে কথা বলিল। কিন্তু বলিলে কি হইবে? সুদূর পল্লীগ্রামে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা সহজ নহে। অথচ রোগিণীকে কোথাও লইয়া যাইবার সুবিধা নাই। ভবতারণের শ্বশুর মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া এই গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এ স্থানে তাঁহার কোন আত্মীয় ছিল না। তাঁহার মাতামহের আত্মীয়গণ—এই "পরগাছার" প্রতি তুষ্ট ছিলেন না—তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। এ অবস্থায় কি করা যাইতে পারে? কিছুই স্থির হইল না।

পরদিন ভবতারণ যাত্রার আয়োজন করিল। শাশুড়ী জামাতার এই ব্যবহারে বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিলে ভবতারণ জানাইল, সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই বলিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। সে আর কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নহে। সে দাদার নিকট বিদায় লইয়াছে, এখন তাঁহাদের নিকট শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছে।

জামাতার এই কথায় ভবতারণের শাশুড়ী ভীত হইলেন; বলিলেন, "সে কিছুতেই হইবে না। আমি তোমাকে যাইতে দিব না।

ভবতারণ বলিল, "কিন্তু আমি কি করিব?"

"তোমার শ্বশুর যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তোমাকে কিছু করিতে হইবে না।"

"আমি আর কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিব না।"

"এ সবই তোমার। তুমি আবার কাহার গলগ্রহ হইবে?"

কিন্তু ভবতারণ যখন কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না, তখন তাহার শাশুড়ী একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অল্পে ভয় পাইতেন; তাহার উপর রোগভোগফলে তাঁহার সেই ভীতি-প্রবণতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিধবা ও বন্ধ্যা ভগিনী তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন। ভগিনীর অবস্থা দেখিয়া তিনি ভবতারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিবে?"

উত্তরে ভবতারণ বলিল, "আমি কলিকাতায় যাইয়া পড়িব।

"সে ত ভাল কথা। পুরুষমানুষের বিদ্যাই অলঙ্কার। তুমি কলিকাতায় যাইয়া পড়িতে চাহ, ভাল। কিন্তু দিদিরও তুমি ব্যতীত আর কেহ নহে। তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমি বলি, দিদিকে ও তরুকে লইয়া তুমি কলিকাতায় যাও।"—বলা বাহুল্য ভবতারণের পত্নীর নাম তরুবালা।

ভগিনীর এই কথায় ভবতারণের শাশুড়ী যেন অন্ধকারে আলোক পাইলেন। তিনি মনে মনে ভগিনীর বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করিলেন; প্রকাশ্যে বলিলেন, "তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

অনেক অনুরোধে ভবতারণ শেষে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। কিন্তু সে বলিল, "শাশুড়ী সুস্থ হইলেই তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিতে হইবে। শাশুড়ী ভাবিলেন, "পরের ভাবনা পরে; এখন ত কোনরূপে বিপদ কাটাইলাম।"

তখন যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যে যাত্রার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তৃতীয় দিন ভবতারণ তিনটি মহিলাকে লইয়া একান্ত অপরিচিত জনরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিল।

যাইবার দিন গৌরীচরণের পত্র তাহার হস্তগত হইল। ভ্রাতার হস্তাক্ষর দেখিয়া সে পত্রখানি খুলিল, খুলিয়া পড়িল, পড়িয়া হাসিল। তাহার পর সে পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল, কাহাকেও সে পত্রের কথা বলিল না।

৪

কলিকাতায় আসিয়া ভবতারণ শাশুড়ীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। রোগিণী ডাক্তারের ঔষধ খাইতে আপত্তি করায় কবিরাজ ডাকা হইল। কবিরাজ দুই দিন দেখিবার পর বলিলেন, যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ চিকিৎসা, কিন্তু চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা অল্প; কারণ, রোগভোগের ফলে রোগিণীর জীবনীশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে। চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

এক মাসের কিছু অধিক কাল পরে কন্যার ও ভগিণীর আর্ত্তনাদের মধ্যে ভবতারণের শাশুড়ীর প্রাণবায়ু তাঁহার দেহ ত্যাগ করিল।

ভবতারণ পত্নীকে বুঝাইয়া দেশের সম্পত্তি বিক্রয় করিল এবং কলিকাতায় একখানি গৃহ ক্রয় করিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার শাশুড়ীর ভগিণী তাহার ও তাহার পত্নীর একান্ত অনুরোধে তাহাদের সংসারেই রহিয়া গেলেন।

শাশুড়ীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই ভবতারণ সুরনাথ নাম লইয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিল। এখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া পাঠে মনোযোগ দিল। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবে এবং খ্যাতি ও অর্থ অর্জ্জন করিবে এ বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ভ্রাতার ব্যবহারে তাহার মনে এই সঙ্কল্প সমুদিত হইয়াছিল। সে স্বভাবতঃ একগুঁয়ে—সে এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিবে, স্থির করিয়াছিল।

কলিকাতায় সে কাহারও সহিত মিশিত না। একে সে মফঃস্বল হইতে আসিয়া সবই নূতন বোধ করিত, তাহাতে আবার তাহার অধিকাংশ সহপাঠীই তাহার অপেক্ষা বয়সে ছোট—এই জন্য সে কাহারও সহিত মিশিবার সুযোগ পাইত না,—সে প্রবৃত্তি ও তাহার ছিল না। সে অনন্যকর্ম্মা হইয়া অধ্যয়ন করিত।

তাহার পক্ষে এই অনন্যসাধারণ মনোযোগের ও অসাধারণ উৎসাহের পুরস্কার লাভ করিতে বিলম্ব হইল না। পূর্ব্ববার ভবতারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিল, এবার সুরনাথ নামক একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া বহু বালকের ঈর্ষ্যা ও বহু শিক্ষকের বিস্ময় উৎপাদন করিল।

বলাবাহুল্য এই সাফল্যে ভবতারণ স্বয়ং অসীম আনন্দ লাভ করিল; এবং দ্বিগুণ উৎসাহে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল।

৫

ইহার পর হইতে ভবতারণের সাফল্যে আর কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইল না।

এবার সে যেন ভরা জুয়ারে তরী ভাসাইয়াছিল; তরণী অনাহত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরীক্ষার পর পরীক্ষায় তাহার সাফল্য তাহার সতীর্থদিগকে বিস্মিত করিতে লাগিল। শেষে সে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিল।

ভাগ্যদেবী যখন যাহাকে দয়া করেন তখন আপনার সম্পদ-ভাণ্ডারের দ্বার তাহার পক্ষে মুক্ত করিয়া দেন; তাহার আর কোন অভাব থাকে না। তিনি ভবতারণের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। দিন দিন তাহার পশার বাড়িতে লাগিল, যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উপার্জ্জনের বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এক একদিন আপনার অবস্থার আলোচনা করিয়া ভবতারণ যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। সে দিন সে জ্যেষ্ঠের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল—সে দিনে আর বর্ত্তমান সময়ে কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে! সে দিন সে আশ্রয়হীন, সম্বলহীন—পথের ভিখারী। আর আজ? আজ তাহার যশ অনেকের ঈর্ষ্যার কারণ, তাহার উপার্জ্জন—তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত; আর সকলের উপর তরুবালার অনাবিল প্রেম! সে প্রেমে তাহার হৃদয় চিরমধুময় হইয়াছিল। তাহার বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল, পত্নী হইতেই তাহার সৌভাগের সূচনা—পত্নীই তাহার সৌভাগ্যের কারণ। সে সর্ব্ববিষয়ে পত্নীর কথা শুনিত, কেবল এক বিষয়ে শুনিত না। তরুবালা মধ্যে মধ্যে তাহাকে জ্যেষ্ঠের সংবাদ লইতে বলিত। ভবতারণ সম্মত হইত না; বলিত, "এখনও সময় হয় নাই। পরে লইব।" এবিষয়ে তরুবালা স্বামীর কার্য্যের কারণ বুঝিতে পারিত না।

কিন্তু তরুবালা মনে করিত, বিশেষ কারণ ব্যতীত স্বামী এ কার্য্য করিতেন না। সে স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি করিত। তাহার জনকজননী পরলোকে, তাহার ভ্রাতাভগিণী জন্মে নাই, শিশুর কোমল স্পর্শে তাহার রমণীজন্ম সফলতা প্রাপ্ত হয় নাই; কাযেই তাহার স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা সবই তাহার স্বামীকে অবলম্বন করিয়াছিল। স্বামীই তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া বিরাজিত—সে কি স্বামীর কার্য্য অসঙ্গত বা অকারণ বলিয়া মনে করিতে পারে?

৬

বিশ বৎসর কাটিয়া গেল। ভবতারণের সৌভাগ্য-স্রোতে ভাঁটা পড়িল না। এই সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। দ্রুতগামী রেলগাড়ী সম্মুখে অতর্কিত বাধায় যেমন ধ্বংস হইয়া যায়, তেমনই অতর্কিত বিপদে ভবতারণের সব শেষ হইল। সে বার কলিকাতায় প্রথম 'প্লেগ' দেখা দিল। বোম্বাই বিধ্বস্ত

করিয়া বিষম ব্যাধি কলিকাতা আক্রমণ করিল। ব্যাধি প্রকাশ পাইতে না পাইতে নানারূপ জনরব উঠিতে লাগিল। ফলে যাহার পলাইবার স্থান ছিল, সে পলাইল; বহু পরিত্যক্ত জীর্ণ পল্লীগৃহ সংস্কৃত হইল। ষ্টেসনে, ঘাটে ভারবাহক নাই, কলে মজুর নাই, সকলে প্রাণভয়ে, ততোঽধিক অত্যাচারের আশঙ্কায়, কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পলাইল। সময় বুঝিয়া যানচালক দশগুণ ভাড়া লইল। ষ্টেসনে যাত্রী ধরে না। সকলেই পলাইতে ব্যস্ত। এমনও হইল যে, আসন্ন-প্রসবা কুলবধূ গমন পথে—ষ্টেসনে বা গাড়ীতে প্রসব বেদনায় ব্যথিতা হইলেন। নগরেও নানারূপ অশান্তি সূচিত হইল; শ্রমজীবিগণ ধর্ম্মঘট করিতে লাগিল, লোকে রোগী লইবার যানে অগ্নিযোগ করিল। শেষে এমনই দাঁড়াইল যে, স্বয়ং ছোটলাট ঘাটে ঘাটে যাইয়া অভয় দিতে লাগিলেন,—কাহাকেও বলপূর্ব্বক টীকা দেওয়া হইবে না—কোন ব্যাধিগ্রস্তকে বলপূর্ব্বক গৃহ হইতে হাঁসপাতালে লওয়া হইবে না।

এই সময় কোন কোন ডাক্তার 'প্লেগের' রোগী দেখিতে অস্বীকৃত হইলেন। ভবতারণ তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "যে পরের জীবন আপনার জীবনের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান মনে না করে, তাহার পক্ষে ডাক্তারী করা বিড়ম্বনা মাত্র।" সে প্লেগরোগী দেখিতে ইতস্ততঃ করিত না।

একদিন একটি প্লেগরোগী দেখিতে যাইয়া তাহার দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করিল। ভবতারণ অসুস্থ হইল। এই কথা শুনিয়া সহরের সকল বড় বড় চিকিৎসকই তাহার চিকিৎসার্থ অগ্রসর হইলেন। সে বলিল, "আমার ডাক পড়িয়াছে।"

বলা বাহুল্য চিকিৎসার কোনরূপ ত্রুটি হইল না। মানুষের যাহা সাধ্য তাহা করা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যাধির প্রকোপ বাড়িতে লাগিল।

তিনদিন রোগী জ্বরঘোরে অজ্ঞান হইয়া রহিল। চতুর্থ দিন সব ফুরাইল। তরুবালার সর্ব্বনাশ হইল। তরুবালার মাতৃষ্বসা নিষ্ফল জীবনের সায়াহ্নে যে আশ্রয়ে আসিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন, সে আশ্রয় নষ্ট হইয়া গেল।

৭

তরুবালার দিন কাটিতে লাগিল। গৃহ শূন্য—হৃদয় শূন্য—জীবন দুর্ব্বহ যাতনার ভার; তবুও জীবন যায় না কেন? বর্ষাধিক কাল পরে যখন তাহার সংসারে শেষ সম্বল মাতৃষ্বসার মৃত্যু হইল, তখন সে যেন অকূল সমুদ্রে পড়িল। তাঁহার মৃত্যুতে তরুবালার জীবনের দারুণ শোক যেন নূতন হইয়া উঠিল।

কোন কায নাই। দিন যেন আর কাটে না। সঙ্গে সঙ্গে তরুবালার আর এক ভাবনা জুটিল। ভবতারণ পীড়িত হইয়াই 'উইল' করিয়াছিল। সেই উইল অনুসারে তাহার সমস্ত সম্পত্তি তরুবালার। এখন সে সম্পত্তি যেন তরুবালার নিকট দুর্ব্বহ ভার বোধ হইত। এ সম্পত্তি লইয়া সে কি করিবে? শয়নগৃহে পতির একখানি চিত্র বিলম্বিত ছিল। তরুবালা প্রতিদিন সেইখানির পূজা করিত। এখন কর্ম্মহীন মধ্যাহ্নে বা নিদ্রাহীন নিশীথে সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া তরুবালা জিজ্ঞাসা করিত, হে দেবতা, হে হৃদয়-সর্ব্বস্ব, তুমি এ কি করিলে? আমি এ ন্যাস কি করিব?" সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিত না।

এক একবার তাহার মনে হইত যদি স্বামীর ভ্রাতার কোন সন্ধান পাইত! তখনই, তাঁহার সন্ধানের কথায় ভবতারণের সেই উত্তর তাহার মনে পড়িত,— "এখনও সময় হয় নাই।" সে সময় আর হইবে কি? ভবতারণ কেন এ কথা বলিত, তরুবালা তাহা বুঝিতে পারিত না। সে কেবলই ভাবিত। আবার তাহার মনে হইত, সে কেমন করিয়া তাঁহার সন্ধান লইবে? সন্ধান লইবার উপায় কি?

৮

বৈশাখের মধ্যাহ্ন। বাতাস অগ্নিবৎ। রৌদ্র প্রখর। কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতার রাজপথেও যেন জনস্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে। এ রৌদ্রে কেহ ইচ্ছা করিয়া ঘরের বাহির হইতে চাহে না। পথে মধ্যে মধ্যে ভারবাহী গোযানের গমন-শব্দ শ্রুত হইতেছে; আর সেই মধ্যাহ্নরবিকরতপ্ত পবনে বায়সের 'কা কা' রব বাহিত হইতেছে। আজ একাদশী। তরুবালা অনশনে শূন্য গৃহে কত কি ভাবিতেছে। এমন সময় নিম্নে রাজপথে বালকের কাতর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল—"অন্ধ ভিখারীকে দয়া কর।" এই দারুণ রৌদ্রে যে বালক ভিক্ষার জন্য পথে বাহির হইয়াছে, তাহার মত দুঃখী আর কে আছে? তরু বালার দয়ার উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তরুবালা দাসীকে বলিল, "যাও, ভিখারীকে বাড়ীতে আসিতে বল।" দাসী তখন নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল; এ আদেশে বিরক্ত হইল। সে আপন মনে কি বকিতে বকিতে নামিয়া গেল।

দাসীর আহ্বানে একজন প্রৌঢ় অন্ধকে লইয়া একটি দশম বা একাদশ বর্ষ বয়স্ক বালক গৃহে প্রবেশ করিল। তরুবালা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, গতরাত্রি হইতে তাহারা অনাহারে আছে; ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, রৌদ্রে তাহারা অবসন্ন। তাহারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর তরুবালা তাহাদিগের আহারের ব্যবস্থা করিল। তাহারা আহার করিল।

তাহার পর তরুবালা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

অন্ধ উত্তর দিতে মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিল। পরিচয় দিতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। কিন্তু তরুবালার ব্যবহারে সে সঙ্কোচ স্থায়ী হইল না; সে বলিল, "মুর্শিদাবাদ জিলায়—তেলীরহাট গ্রামে।"

মুর্শিদাবাদ জিলায়—তেলীরহাট গ্রামে! সেই গ্রামে তরুবালার শ্বশুরালয় ছিল। তাহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল। সে বলিল, তুমি কলিকাতায় আসিলে কি প্রকারে?

ততক্ষণে সহানুভূতিলাভের আশায় অন্ধ আপনার দুঃখকাহিনী বলিতে উৎসুক হইয়াছে। সে বলিল, তাহার পিতার নাম গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চাকরী করিতেন। তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া কনিষ্ঠ নিরুদ্দেশ হয়েন। সেই দুঃখে জ্যেষ্ঠের মস্তিষ্কে বিকার-লক্ষণ দেখা দেয়। তাঁহার দুই পুত্র—অন্ধ জ্যেষ্ঠ। এই সময় কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে গৌরীচরণ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হয়েন। চিকিৎসার উপায় নাই। শেষে অনন্যোপায় হইয়া জননী পুত্রের বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন ও পতিকে লইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আইসেন। অন্ধ বিদ্যালয় ত্যাগ করিল। উদরান্ন-সংস্থান-চেষ্টায় চেষ্টিত হইল। শেষে বহু চেষ্টায় তাহার একটি মাসিক দশ টাকা বেতনের চাকরী জুটিল। গৃহে দারুণ দারিদ্র্য। এক বৎসর পরে উন্মাদ পিতার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কেবল কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভবতারণের নাম ধরিয়া ডাকিতেন। তাহার দুই বৎসর পরে তাহার একটি পুত্র জন্মিল—এই বালকই তাহার পুত্র। পুত্র প্রসব করিয়া তাহার পত্নী স্থতিকারোগগ্রস্ত হয়েন এবং বর্ষাধিক কাল রোগ-ভোগ করিয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তি লাভ করেন। সে আজ আট বৎসরের কথা। সে চাকরী করিয়া যাহা পাইত তাহাতে কোনরূপে সংসার চলিত। তাহার জননী পৌত্রকে পালন করিতেন। গত বৎসর বসন্তে জননীর সব জ্বালা জুড়াইয়াছে; সে অন্ধ হইয়াছে। এখন ভিক্ষা ভিন্ন তাহার আর উপায় নাই।

বলিতে বলিতে অন্ধের দৃষ্টিহীন নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আর তরুবালার দুই চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। তরুবালা অন্ধের পরিচয় পাইল। তাহার হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতে লাগিল। সে উদ্দেশে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আজ সময় হইল?" সে কোন উত্তর পাইল না; কিছু

স্থির করিতে পারিল না। শেষে সে অন্ধকে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিল, "তুমি কল্য আবার আসিও।"

অন্ধ ও বালক চলিয়া গেল। তরুবালা আপনার শয়ন কক্ষে যাইয়া পতির চিত্রের নিম্নে হর্ম্মতলে লুটাইয়া কাঁদিল ;—সে এখন কি করিবে ?

৯

পরদিন তরুবালা তাহাদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে দিবাবসান হইল—তাহারা আসিল না। তখন তরুবালার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আরও একদিন গেল ; তাহারা আসিল না। তখন তরুবালা ভাবিল, কেন সেই দিনই তাহাদের থাকিতে বলি নাই? সে আপনাকে আপনি দোষী ভাবিল।

পরদিন প্রাতে বালক একাকী আসিল। তাহার নয়ন ক্রন্দনস্ফীত ; পরিধানে 'কাচা'। সে তরুবালাকে দেখিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে তাহাকে একটু শান্ত করাইয়া তরুবালা জানিল, গত পরশ্ব তাহার গৃহে আসিবার সময় পথে অন্ধের সর্দ্দিগর্ম্মি হয়। সে পথে পড়িয়া যায়। কয়জন পথিক দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যায়েন—তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। হাঁসপাতালের দুইজন ভৃত্য বালকের প্রতি দয়াবশে তাহাকে শবের সঙ্গে লইয়া যাইয়া শেষ কায করাইয়া তাহাকে, তাহার নির্দ্দেশমত, তরুবালার গৃহদ্বারে পৌছাইয়া দিয়া গিয়াছে।

তরুবালা বালককে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছিল বটে, কিন্তু বালকের দুঃখে তাহার আপনার হৃদয় সান্ত্বনা মানিতে ছিল না।

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কাহার কাছে থাকিব ?"

তরুবালা বলিল, "তুমি আমার কাছে থাকিবে।"

বালক ক্রন্দন ভুলিয়া তরুবালার মুখে চাহিল। তাহার দৃষ্টিতে কি অসীম কৃতজ্ঞতা !

সেই দৃষ্টিতে তরুবালার স্নেহের উৎস মুক্ত হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঠাকুরমা তোমাকে খুব ভালবাসিতেন ?"

বালক বলিল, "হাঁ, খুব।"

তরুবালা বলিল, "আমি তোমার ঠাকুরমা হইব।"

বালকের অশ্রুসজল নয়নে হর্ষদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

১০

কয়দিন দারুণ উদ্বেগ, বিষম দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করিবার পর মধ্যাহ্নে আহারান্তে বালক ঘুমাইয়া পড়িল। তখন তরুবালা আসিয়া সেই চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইল, অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "আজ বুঝি সময় হইয়াছে। তাই তুমি এই আলয়-আশ্রয়-অবলম্বনহীন বালককে তোমার আশ্রয়ে আনিয়া দিয়াছ?" সে উদ্দেশে স্বামীকে প্রণাম করিল।

তরুবালার মনে হইল, যেন যে ন্যাসভারে সে প্রপীড়িতা হইতেছিল, আজ সে ভার দূর হইল। সে যে অননুভূতপূর্ব্ব স্নিগ্ধ শান্তি লাভ করিল তাহাতে তাহার মনে হইল, যেন বিশ্বদেবতা ও তাহার হৃদয়দেবতা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন।

সে দিন বালকের জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়া গভীর রাত্রিতে তরুবালা শয়ন করিতে গেল। আজ কতদিনের কত কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে কাঁদিয়া উপাধানসিক্ত করিতে লাগিল। শেষরাত্রিতে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। প্রভাতে বালক-কণ্ঠে "ঠাকুরমা"—সম্ভাষণে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে আহ্বান তাহার পক্ষে একান্ত নূতন। তাহাতে তাহার হৃদয়ে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সে হৃদয়ে এক নূতন স্নিগ্ধ—সরস—কোমল অনুভূতি অনুভব করিল। সে ফিরিয়া দেখিল, গত রাত্রিতে বাতাসে যে মাল্য ভবতারণের চিত্রচ্যুত হইয়া হর্ম্ম্যতলে পড়িয়াছিল, বালক তাহা কুড়াইয়া—একখানি চেয়ারে উঠিয়া যথাস্থানে সংস্থাপিত করিতেছে।

মৃত্যু-মিলন।

—::—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—::—

ভ্রাতা ও ভগিনী।

—::—

যে দিন নিশাশেষে রাণী অশ্রু-আবিল নয়নে রাজার শূন্য শয়নমন্দির হইতে হতাশ হইয়া ফিরিলেন, সেই দিন মধ্যাহ্নে প্রাসাদের শুদ্ধান্ত হইতে একখানি শিবিকা বাহির হইয়া গেল। শিবিকা কয়টি পথ অতিক্রম করিয়া একটি বৃহদায়তন গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহ বৃহৎ—দৃঢ়গঠিত। গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কয়টি মৃগ;—কেহ আহারে ব্যাপৃত, কেহ বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ান—রোমন্থরত। গৃহ-প্রাঙ্গণে শিবিকা প্রবেশ করিলে, তাহারা একবার বিস্তৃত, সুকোমল নয়ন তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। শিবিকা সে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গেল।

প্রাঙ্গণের পর কতকগুলি কক্ষ; সেগুলিতে অপ্রতিহত সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। সেগুলি অতিক্রম করিয়া শিবিকা আর একটি প্রাঙ্গণে উপনীত হইল। বাহকগণ শিবিকা নামাইল। প্রাঙ্গণে বহু পারাবত আহার করিতেছিল। শিবিকা আসিলে তাহারা উড়িয়া যাইয়া কেহ বা কার্নিসে, কেহ বা আলিসায়, কেহ বা দ্বিতলস্থ অলিন্দবৃতিতে বসিল। উমা শিবিকার মধ্য হইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল।

শঙ্কর সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা পারাবতদিগকে আহার্য্য দিতেছিল। সে উমাকে দেখিয়া করধৃত পাত্র ভূমিতে রাখিয়া আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। উমা তাহার মুখচুম্বন করিল। উমার সর্ব্বদা পিতৃগৃহে আগমন ঘটিত না।

উমা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তাহার আগমন-সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সোপানে উঠিতে না উঠিতে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ও ভ্রাতুষ্পুত্রীরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উমা সকলকে আদর করিল;—সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপরে চলিল।

সে দ্বিতলে উপনীত হইতেই শঙ্কর সিংহের পত্নী আসিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল। উমা বলিল, "তুমি ভাল আছ ত? আমি এবার প্রায় একমাস আসি

নাই। তোমাকে দুর্ব্বল দেখাইতেছে।" বলিতে বলিতে উমা ভ্রাতৃজায়ার নিকট হইতে তাহার বর্ষমাত্রবয়স্ক কন্যাকে লইতে গেল। শিশু জননীকে আঁকড়াইয়া ধরিল। উমা হাসিয়া বলিল, "আমাকে পর ভাবিতেছ।"

ভ্রাতৃজায়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "রাজবাড়ীতে কি আর উহাদের মনে পড়ে? উহাদের আর অপরাধ কি?"

উমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সত্য; উহাদের আর দোষ কি?"

ভ্রাতৃজায়া উমাকে পার্শ্বস্থ কক্ষে লইয়া যাইয়া বসাইল।

দুইজনে ঘরসংসারের, ছেলেমেয়ের,—কুটুম্ব-কুটুম্বিতার,—দাসদাসীর কত কথা হইতে লাগিল। রমণীগণের সখ্য সহজে বিশ্বাসে বিকশিত হয়। বিশেষ আপনার জনের নিকটে নহিলে রমণীর অন্তরের কথা বাহির হয় না। সংসারের নিত্য নানা কার্য্যের শত কথা পুরুষের ভাল লাগে না; তাহার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত, কর্ত্তব্য বহুবিধ। রমণীর সে সব কথা রমণীই বুঝিতে পারেন। তাই আপনার জনের সঙ্গে দেখা হইলে রমণীর কথা আর ফুরায় না; কথায় কথায় কথা বাড়িয়া যায়—সে সব কথা সহানুভূতির স্নেহরসে সরস—সমবেদনার আশায় মনোরম। তাই আজ প্রায় একমাস পরে সাক্ষাতে দুইজনের কথা যেন আর ফুরায় না। সংসারের শত ক্ষুদ্র কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায়,—কত আত্মীয় কুটুম্বের সংবাদ জিজ্ঞাসায় দেখিতে দেখিতে প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়া গেল। দুই জনের কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না।

এই সময় ভগিনীর আগমন-সংবাদ পাইয়া শঙ্কর সিংহ অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর সিংহকে দেখিয়া উমা বলিল, "এই যে, দাদা! আমি তোমার সন্ধানে লোক পাঠাইতেছিলাম।"

শঙ্কর সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে। সেই জন্যই আমি আসিয়াছি।"

শঙ্করসিংহ কিছু বিস্মিত হইলেন। উমার সহিত প্রাসাদে তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়। তবে সহসা কি আবশ্যক কথা—কি গোপনীয় কথা বলিবার জন্য সে আসিয়াছে? প্রাসাদে সবই যেন অঘটন ঘটিতেছে! শঙ্কর সিংহ মনে করিলেন, কোন সাংসারিক কথা বলিবার জন্যই উমা আসিয়াছে। তিনি বলিলেন, "কি কথা? বল।"

উমা বলিল, "সে কথা ছেলেদের—এমন কি বধূরও শুনিয়া কায নাই।"

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "তবে আমার বসিবার ঘরে চল। তথায় কেহ নাই।"

কয়টি কক্ষ ও অলিন্দ অতিক্রম করিয়া ভ্রাতা ও ভগিনী একটি বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষের হর্ম্ম্যতলে একখানি বিস্তৃত আসন; কক্ষপ্রাচীরে নানাবিধ অস্ত্র সজ্জিত।

শঙ্কর সিংহ ভগিনীকে উপবেশন করিতে বলিলেন। কক্ষের এক পার্শ্বে একখানি কাষ্ঠাসন ছিল, উমা সেইখানিকে হর্ম্ম্যতলে বিস্তৃত আসনের নিকটে আনিয়া তাহাতে বসিল। শঙ্কর সিংহ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

কয় মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল। উভয়েই নীরব। উমা ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া কথাটার উত্থাপন করিবে? শেষে উমা বলিল, "আমি তোমার নিকট একটি প্রহেলিকার সমাধানজন্য আসিয়াছি।"

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "ভগিনি, তোমার কথাই যে প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছে!"

"সত্য। কিন্তু এ প্রহেলিকার সমাধান তুমি ব্যতীত আর কেহ করিতে পারিবে না। প্রাসাদে কি ঘটিতেছে?"

"কেন?"

"তুমি কি কিছু লক্ষ্য কর নাই? তুমি কি রাজার ও রাণীর ভাবান্তর বুঝিতে পার নাই?"

"কিরূপ ভাবান্তর?"

"যদি তাহা বুঝাইতেই পারিব, তবে আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব কেন? তুমি কি আমার নিকট এ সকল কথা গোপন করিবে?" অভিমানে উমার নয়নে অশ্রু আসিল।

শঙ্কর সিংহ অন্যমনস্কতাহেতু ভুলিয়া গিয়াছিলেন, উমা পিতার, মাতার ও তাঁহার আদরে বড় অভিমানিনী হইয়াছিল। তিনি যেন লজ্জিত হইলেন; বলিলেন, "উমা, তোমার কাছে কি গোপন করিব? রাজার সহসা ভাবান্তর হইয়াছে। তিনি সহসা দীর্ঘকালের আলস্য ও ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া রাজকার্য্যে মন দিয়াছেন।"

"সহসা এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি?"

"দোলের দিন মন্দিরে বৃদ্ধ পুরোহিত রাজাকে বাচাল বালক বলিয়াছিলেন।"

"কেন?"

"তিনি বলিয়াছিলেন, "যে রাজা রাজ্যরক্ষায় অক্ষম, তাহার হস্তে রাজদণ্ড শোভা পায় না।"

"তাহার পর ?"

"তাহার পর রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে কি কথা হয়—কেহ জানে না। সেই দিন হইতে রাজার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

"ভালই হইয়াছে। কিন্তু রাণীর এ ভাবান্তরের কারণ কি ?"

"রাণীর কি ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছ ?"

"যে দিন রাজা চকে অগ্নি-নির্ব্বাপন করিতে গিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে রাণী সর্ব্বদাই কেমন চিন্তিতা। গত রজনীতে তাঁহার অটল গাম্ভীর্য্য যেরূপ বিচলিত দেখিয়াছি, সেরূপ আর কখনও দেখি নাই। তুমি উদ্যানে রাজারাণীর কথোপকথন শুনিতে পাও নাই ?"

"না। আমি দূরে ছিলাম।"

"রাণী পূর্ব্বে কখনও রাজার কোন কার্য্যের কথায় মন দিতেন না। গত রাত্রিতে রাজা আসিলেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—নিশীথে একাকী প্রাসাদের বাহিরে গমনে কি বিপদের আশঙ্কা নাই ?"

"রাজা কি উত্তর দিলেন ?"

"তিনি বলিলেন, বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে; কিন্তু তাঁহার বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে কাহারও ত কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

"তাহার পর ?"

"তাহার পর রাজা তোমার সহিত উদ্যান ত্যাগ করিলেন; রাণী আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দিবালোকবিকাশের অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি মুখ তুলিলেন,—কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিলেন, 'উমা, আমি কি ভ্রান্ত!' তাহার পর তিনি গৃহে ফিরিলেন।"

শঙ্করসিংহ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সত্যই রাণী ভ্রান্তিবশে আপনি দুঃখ পাইয়াছেন, রাজাকেও অসুখী করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অপরাধ কি ? মানুষ মানুষকে প্রায়ই ভুল বুঝে। দোষ সহজে দৃষ্টিপথে পতিত হয়, গুণ লক্ষ্য করা সহজ নহে। তাই মানুষ অপরের গুণবিষয়ে অন্ধ হয়—মহত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারে না।"

উমা জিজ্ঞাসা করিল, "এখন ঘটনাস্রোতঃ কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছে ?"

"তাহা বুঝিবার সাধ্য আমার নাই।"

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর শঙ্কর সিংহ বলিলেন,

"তোমাকে আর একটি কথা বলিব। দেখিও, এ কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।"

উমা বিস্মিত নেত্রে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া রহিল।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "রাজা অন্যান্য রাজপুত রাজাদিগের নিকট প্রস্তাব করিতেছেন,—রাজপুত রাজশক্তির সমবেত চেষ্টায় আত্মরক্ষার উপায় করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।"

উমা বলিল, "সে কি ?"

"রাজা এই প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইতেছেন।"

"এ কথা যদি প্রকাশ পায় ?"

"তাহা হইলে মোগলের বিরাট শক্তি তাঁহার সর্ব্বনাশ-সংসাধনে সচেষ্ট হইবে।"

"রাজা সে কথা বুঝিয়াছেন ?"

"সে কথায় তিনি হাসিয়া বলেন, ভয়ে কর্ত্তব্যচ্যুত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শত গুণে শ্রেয়ঃ। তিনি আরও বলেন, 'আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়াছি। আবশ্যক হইলে দেহশোণিতপাতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব'।'

"দূত গিয়াছে কি ?"

"পক্ষকাল মধ্যে আমাকে যাইতে হইবে।"

"এ চেষ্টা রাজার উপযুক্ত বটে। কিন্তু ইহা সফল হইবার সম্ভাবনা আছে কি ?"

"তাহা এখন বলা অসম্ভব।"

উমা কিছুক্ষণ বসিয়া ভাবিতে লাগিল,— কোন কথা কহিল না।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "ভগিনি, আমি প্রলয় ঝটিকার পূর্ব্বসূচনা লক্ষ্য করিতেছি। প্রাসাদের উচ্চ চূড়ায় ঝটিকাবেগ প্রহত হইবে। তখন যেন আমাদের ভ্রাতা-ভগিনীর কর্ত্তব্যের ত্রুটী না হয়।"

সমালোচনা।

ফরিদপুরের ইতিহাস।*

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও এসিয়ার সভ্যতায় বাঙ্গালা এক সময় অসাধারণ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল। বাঙ্গালার ভূমি সমতল ও কোমল বলিয়া এই প্রদেশে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মত প্রাচীন গৃহের বা জীর্ণ মন্দিরের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয় না—কারণ, বাঙ্গালায় কালজয়ী প্রস্তরের বহুল ব্যবহার ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান কালে অনুসন্ধানের ফলে বাঙ্গালার বহু স্থানে পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই সকল পুরাবস্তু ইতিহাসের অক্ষয় উপাদান। দিনাজপুরে কান্তনগরের মন্দির, মহিপাল দীর্ঘিকা, তাম্রলিপ্তিস্থ বর্গভীমার মন্দির, যশোহরে সীতারামের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ—বাঙ্গালার এই সকল কীর্ত্তিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহার বহু পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে—বাঙ্গালী যবদ্বীপে ও বলিদ্বীপে উপনিবেশসংস্থাপন করিয়াছিল। বাঙ্গালী সিংহল জয় করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নত দশায় বাঙ্গালা হইতে যে ধর্ম্মমত ও শিল্পাদর্শ চীনে, জাপানে ও কোরিয়ায় বিস্তৃত হইয়াছিল আজও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই; পরন্তু সেই শিল্পাদর্শ স্বাতন্ত্র্যহেতু আপনার সজীবতাসংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাল মুসলমানশক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। পাঠানগণ প্রায় ৪০০ বৎসরের চেষ্টাতেও বাঙ্গালাদেশ জয় করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দের নিকট হইতে বাঙ্গালা রাজ্য পাইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। কিন্তু এদেশের প্রকৃত ইতিহাস নাই। বহুদিন পূর্ব্বে ষ্টুয়ার্ট বাঙ্গালার ইতিহাস-গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা নানা কারণে আশানুরূপ ফলবতী হয় নাই। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য লিখিত, একান্ত ক্ষুদ্রায়তন। দ্বিতীয় পুস্তকে মৌলিক তত্ত্বের একান্ত অভাব। এসিয়াটিক সোসাইটীর 'জর্ণালে' ও 'কলিকাতা রিভিউএর' পৃষ্ঠায় যে সকল উপাদান সংগৃহীত হইয়া আছে—সে সকলের ও সম্যক সদ্ব্যবহার হয় নাই।

---

* ফরিদপুরের ইতিহাস।—১ম খণ্ড—শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। ২১০।৫, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

বহুদিন পূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালার ইতিহাস-চাই; নহিলে বাঙ্গালার ভরষা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। * * * * আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদুর সাধ্য, সে তত দুর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।"

মনে হইতেছে, এতদিন পরে বাঙ্গালী এই আহ্বানে বাঙ্গালার ইতিহাস-উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"ধাতু, পাথর ও মাটীর টুকরায় আমরা স্তূপনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ছেঁড়া কাগজের ও পোকায় কাটা তালপাতার জঞ্জালে আমাদের মার্ব্বেল-মণ্ডিত কুঠরী যুগপৎ অধৃষ্য ও অভিগম্য হইয়া পড়িয়াছে; হিজিবিজি হস্তাক্ষরের দৌরাত্ম্যে আমাদের পরিষৎ-পত্রিকা সভ্যগণের ভয়প্রদ হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রত্নতত্ত্বের বিভীষিকা আমাদের কাব্যকলাকুতূহলী বন্ধুগণের হৃদয়ে আতঙ্ক-সঞ্চারের উপক্রম করিয়াছে।" তাই সুধী কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় মহাশয়ের উদ্যোগে রাজশাহী অঞ্চলে ঐতিহাসিক অভিযান আরব্ধ হইয়াছে। তাই অল্পদিনের মধ্যে বাকরগঞ্জ, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর প্রভৃতি বাঙ্গালার অনেকগুলি জিলার ইতিহাস রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাই বাঙ্গালায় বহু উপাদেয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

দেশকে জানিবার জন্য বাঙ্গালীর এই আগ্রহ যে ইতিহাস-উদ্ধার-চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সে চেষ্টা ফলবতী হইলে যে আমাদের পরম উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই জন্মে।"

বাঙ্গালার ইতিহাস-উদ্ধার কার্য্যে বাঙ্গালার জিলাগুলির ইতিহাস যে বিশেষ সাহায্য করিবে—সেই ইতিহাস যে একান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। দেড়-শত বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজের আগমনকালে কলিকাতা কেবল লোকবাসের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। আর তখন বাঙ্গালার মফঃস্বলে কত পরিত্যক্ত রাজধানী শ্বাপদ-

সঙ্কুল অরণ্যে আবৃত হইয়া গিয়াছে, কত দীর্ঘ দীর্ঘিকা জলজগুল্মে পূর্ণ হইয়াছে, কত দেবমন্দিরের অম্বরচুম্বী চূড়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে। তখন বাঙ্গালার মৃত্তিকায় কত কবির, কত ধর্ম্ম-সংস্কারকের, কত বীরের, কত রাজনীতিকের, কত পণ্ডিতের, কত শিল্পীর চিতাভস্ম মিশাইয়া গিয়াছে। তখন বাঙ্গালার নদী বহিয়া কত পণ্যদ্রব্যপূর্ণ তরণী দেশে দেশে ধনসংগ্রহ করিতে গিয়াছে। তখন বাঙ্গালার প্রান্তর কত সৈন্যের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে। তখন বাঙ্গালার পল্লী কত শিল্পকীর্ত্তিতে শোভিত হইয়াছে। তখন বাঙ্গালার সমাজের স্তরে স্তরে কত পরিবর্ত্তন-প্লাবনের পলী সঞ্চিত হইয়াছে। তখন বাঙ্গালীর জীবনে কত পণ্ডিতের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধ দেড়শত বৎসরের ঘটনা; কিন্তু বিষ্ণুপুরের যে রাজগণ মল্লাব্দ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি প্রায় তিনশত বৎসরের (১৬২২ খৃষ্টাব্দের)। বাঙ্গালার স্থাপত্য বাঙ্গালার বিশেষত্বব্যঞ্জক, বাঙ্গালার সাহিত্য বাঙ্গালীর নিজস্ব। এই শিল্প ও এই সাহিত্য বাঙ্গালার মফঃস্বল শোভিত করিয়াছিল, বাঙ্গালার পল্লীতে উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ধনবানগণ জলাশয় ও রাজপথ প্রস্তুত করাইয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতেন। সেই প্রাচীন কীর্ত্তির অবশেষ আজও বঙ্গের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। আলোচ্য গ্রন্থেও সেই সকল কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কেদার রায় চাঁচুরতলার নিকটে যে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন সেই "রাজবাড়ীর অনতিদূরে 'কেশার মার দীঘী' নামে এক বৃহৎ জলাশয় ছিল। প্রবাদ, কেশা অথবা, কেশবের মাতা, পতি-পুত্রহীনা হইয়া, পতিকুলের প্রভু চাঁদরায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করে। * * * * কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, কেশার মাকে তাঁহার ধাত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া, রাজা পুত্রের প্রতিপালনভার তৎকরে ন্যস্ত করেন। কেদার রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, ধাত্রীর ইচ্ছানুসারে এই বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তদ্বারা উৎসর্গ করাইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইহার নাম হয়, 'কেশার মার দীঘী'। আরও প্রবাদ, কেশার মা যতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, ততদূর পর্য্যন্ত এই সরোবর খনিত হইবে বলিয়া কেদার রায় প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ধাত্রী প্রায় ১ মাইল ব্যাপী স্থান হাঁটিয়া অতিক্রম করার পর অঙ্গ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়। এজন্য দীঘীও এক মাইল ব্যাপী স্থান ব্যাপিয়া খনিত হইয়াছিল। অদ্যাপি উহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে।" কাচকির দরজা রায়দিগের আর এক কীর্ত্তি। "উহা এক বৃহৎ রথ্যা—ইদিলপুরের নিকটস্থ বুড়ীরহাট ও দেওভোগ

স্থান হইতে উহার এক শাখা আরম্ভ হইয়া বিক্রমপুর ভেদ করিয়া উত্তর দিকে বরাবর ধলেশ্বরী নদীর তট পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। অপরটি মেঘনার তট হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে বরাবর পদ্মাতট পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। রাস্তা দুইটি বক্র গতিতে নানা জনপদ ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়ায় বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামের যাতায়াতের সুবিধা ছিল। সেন রাজগণের সময়ে যে সমস্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ এই কাচকির দরজার সহিত পরে সংযোজিত হয়। সুতরাং এই রাস্তার সমুদয় ভাগ রায় মহাশয়দের নিজকৃত নয়। * * * * এই রাস্তাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, কেদার রায়ের মাতার অদৃষ্ট গণনা করিয়া কোন জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়াছিল মৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু-সংঘটন হইবে। এই কারণে কেদার রায় (?) রাণীর জন্য কণ্টকহীন মৎস্যের ব্যবস্থা করেন। কাচকির গুড়া নামে একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য নদীতে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। সেই মৎস্য পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী নদীতে প্রত্যহ ধৃত হইয়া যাহাতে সুবিধামত রাণীর জন্য পৌঁছিতে পারে, তন্নিমিত্ত চাঁদ রায় কর্ত্তৃক এই রাস্তার পত্তন আরম্ভ হইয়া কেদার রায়ের সময়ে পরিসমাপ্ত হয়। কথার মূলে যাহাই থাকুক, কাচকি মৎস্য ধৃত করিবার ব্যপদেশে উহার সৃষ্টি, এই কিংবদন্তীই চলিয়া আসিয়াছে, এবং এইজন্য রাস্তার নামও 'কাচকির দরজা' হইয়াছিল। প্রবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, এই চতুর্দ্দিক-প্রসারিত পথগুলি যখন পূর্ণাবয়বে, বিক্রমপুরে বিদ্যমান ছিল, তখন তদ্দেশবাসীরা যে বর্ত্তমান অধিবাসিগণের অপেক্ষা অধিক সুখস্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বাঙ্গালার মফঃস্বল এইরূপ ঐতিহাসিক উপাদানে পূর্ণ। তাহার অনুসন্ধান, কিম্বদন্তীর সংগ্রহ ও উপহৃত উপাদানের বিশ্লেষণ ও সংযোজন আবশ্যক। বাঙ্গালার জিলাসকলের ইতিহাসরচনা সম্বন্ধে আমরা গভর্মেণ্টের ও সরকারী ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের নিকট বিশেষভাবে ঋণজালে আবদ্ধ। সরকারী 'গেজে-টিয়ার' প্রভৃতিতে এই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের আরম্ভ। তাহার পর বেভারিজ বাকরগঞ্জের, ওয়েশ্‌ল্যাণ্ড যশোহরের, টেলার ও ব্রাড্‌লি বার্ট ঢাকার, ওয়াল্‌স মুর্শিদাবাদের, টয়েনবী হুগলীর যে সকল প্রামাণ্য ইতিহাস লিখিয়াছেন সে সকল ঐতিহাসিক উপকরণের আকর বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর সৌধনির্ম্মাণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে।

বাঙ্গালার পল্লীতে ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান বিশেষ যত্নসহকারে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালার পল্লীর নামই স্থানে স্থানে তাহার বয়সজ্ঞাপক।

প্রাকৃত-প্রভাব-প্লাবিত বাঙ্গালায় পরিশেষে সংস্কৃত-সমাদর-যুগে যে সকল গ্রামের প্রতিষ্ঠা, সে সকলের নামেই তাহাদের বয়স সপ্রকাশ। শ্রীপুর, লক্ষ্মীনগর, ইচ্ছাপুর, শ্যামনগর, যশোহর, কৃষ্ণনগর—এই সকল মার্জ্জিত সংস্কৃত নামের বয়স-বিচার কষ্টসাধ্য নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী লোকালয়ের নাম এরূপ মার্জ্জিত নহে। অবশ্য বলা বাহুল্য অন্য প্রমাণের অভাবে কেবল নামের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামের বয়স-বিচার নিরাপদ নহে। গ্রামে সন্ধান করিলে যদি কোন অস্পৃশ্য জাতীয়ের জীর্ণ গৃহে 'ধর্ম্ম ঠাকুরের' মূর্ত্তি পাওয়া যায়, বা গ্রামের কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে 'ধর্ম্ম ঠাকুরের' পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়—তবে বুঝিতে হইবে, সে গ্রাম এক কালে বৌদ্ধ-প্রভাব হইতে অব্যাহতিলাভ করে নাই। সে প্রভাব কতদিন পূর্ব্বে—কিরূপে—কেন আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বাঙ্গালার সকল প্রাচীন পল্লীগ্রামেই দেবালয় ও জলাশয় ছিল। সেই সকলের সম্বন্ধে কিম্বদন্তীরও অভাব ছিল না। সেই সকল কিম্বদন্তীর অতিরঞ্জনের মধ্যে সত্যের অংশ উদ্ধার করিতে হইবে। হয় ত মন্দিরের সম্বন্ধে শুনা যায়, কিছুকাল পূর্ব্বে কোন নৈসর্গিক কারণে পূর্ব্ববর্ত্তী মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। সে কিছু কাল কত দিন পূর্ব্ববর্ত্তী—বর্ত্তমান মন্দিরের বয়স অনুমান কত দিনের—এই সকল সন্ধান করিলে ফললাভের সম্ভাবনা। বর্ত্তমান মন্দির যদি পূর্ব্ববর্ত্তী মন্দিরের ভিত্তির উপর গঠিত না হইয়া অন্যত্র গঠিত হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পরীক্ষায় ঐতিহাসিক উপকরণের আবিষ্কার অসম্ভব নহে। দেবমন্দির অধিকাংশ স্থলেই প্রতিষ্ঠাতার সাম্প্রদায়িক মতের পরিচায়ক। কিন্তু যদি নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামে একই দেবতার মন্দির লক্ষিত হয়, তবে সেই সকল গ্রাম যে শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণব প্রভাবে প্লাবিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। তখন সেই প্রভাবের পোষক প্রমাণের সন্ধান করিলে অনেক অনাবিষ্কৃত সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে। জলাশয়গুলির পরীক্ষায় আরও মূল্যবান্ ঐতিহাসিক উপাদান প্রাপ্তির সম্ভাবনা। মুসলমানের ও মার্হাট্টার আগমনে ও লুণ্ঠনে বাঙ্গালা বহুবার বিপন্ন হইয়াছে। গ্রানৃউইডেল বলিয়াছেন, অন্য ধর্ম্মের প্রতি মুসলমানদিগের দারুণ ঘৃণার ফলে ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যাদির চিহ্নমাত্র নাই।—মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধেও শিল্পকীর্ত্তিধ্বংসের অভিযোগ বর্ত্তমান। মুসলমানের ও মহারাষ্ট্রীয়ের আগমন-সম্ভাবনায় শঙ্কিত জনগণ কতবার বিগ্রহ বা অলঙ্কারাদি মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়াছিল বা জলাশয়ে নিক্ষেপ

করিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? এই সকল লুপ্তপ্রায় জলাশয়ের গর্ভে কত ঐতিহাসিক উপকরণ লুপ্ত হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

এক্ষণে যে সকল উপাদেয় ইতিহাস প্রকাশিত হইতেছে, সে সকলে এইরূপ অনুসন্ধানের পরিচয় অধিক নাই। এরূপ অনুসন্ধান যে শ্রম, সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু এরূপ অনুসন্ধান ব্যতীত ইতিহাস সম্পূর্ণ বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টায় এইরূপ অনুসন্ধানের আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হইবে ও বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাসরচনার পথ পরিষ্কৃত হইবে।

আনন্দনাথ বাবু পরিণত বয়সে যে উৎসাহে ফরিদপুরের ইতিহাস উদ্ধারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অনুকরণযোগ্য এবং বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি বহু যত্নে যে সকল কিম্বদন্তীর সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকল ঐতিহাসিক হিসাবে বিশেষ মূল্যবান্। ভরসা করি, এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে বিশেষ সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থখানির সম্বন্ধে আর দুই চারিটি কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। গ্রন্থখানির ভাষা আরও মার্জ্জিত ও প্রাদেশিকতা-বর্জ্জিত হইলে ভাল হয়। গ্রন্থকার মহাশয় ৩২ পৃষ্ঠায় আদিশূরের ও সেনরাজগণের কালনির্ণয়ের কথায় সূক্ষ্মবিচারকারীদিগের কার্য্যে কিছু বিরক্তিপ্রকাশ করিয়াছেন। সত্যের উদ্ধার-চেষ্টা সর্ব্বত্রই প্রশংসার যোগ্য। তাহাতে আনন্দ বাবুর মত প্রবীণ লেখকের বিরক্তিপ্রকাশ সঙ্গত নহে। গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে সম্প্রদায়-বিশেষের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত অতীত অবস্থার যে তুলনা করা হইয়াছে, তাহা অবান্তর; সে সে তুলনায় গ্রন্থ অনাবশ্যকভারাক্রান্ত না করিলে ক্ষতি ছিল না। ১৭ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন,—"বর্ত্তমান বর্ষে পাটের দর ন্যূন হওয়ায় অনেক মহাজনের ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু চাষীরা তাহা অদ্যাপি অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই।" এইরূপ মন্তব্য সংবাদপত্রে শোভন—সাময়িক পত্রেও চলিতে পারে, কিন্তু ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্তির যোগ্য নহে। গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের বিন্যাস-বিষয়ে গ্রন্থকার মহাশয় আরও মনোযোগী হইলে ভাল হয়। বিষয়বিন্যাসে অমনোযোগ এরূপ গ্রন্থের উপযোগিতার পক্ষে অনিষ্টকর। আমাদের সর্ব্বশেষ বক্তব্য,—এরূপ গ্রন্থে মুখপত্রের বা টাইটল পেজের ও সূচীর অভাব এবং আবরণেই "ভূমিকা" মুদ্রণ গ্রন্থের গৌরববর্দ্ধক না হইয়া গৌরবনাশক হইয়া দাঁড়ায়। এই ক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মহাশয়ের অমনোযোগ পাঠকমাত্রেরই পক্ষে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

সংগ্রহ।

—::—

ইতিহাস।

—::—

অন্ধকূপে ইংরাজ রমণী।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ড বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, নবাব-সেনা ১৭৫৬ অব্দে কলিকাতা নগরী অধিকৃত করিবার পর কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ নবাব-সৈন্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। হুগলীর শাসনকর্ত্তা মাণিকচাঁদ ঐ ইংরাজ নরনারীগণকে ফোর্ট উইলিয়মের কারাগৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই কারাগৃহটি দৈর্ঘ্যেও প্রস্থে বার হাত মাত্র ছিল। নবাব-সেনাগণ সঙ্গীণ ও তরবারি দেখাইয়া সেই সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে ১৪৬ জন শ্বেতাঙ্গকে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। নিদাঘের প্রখর গ্রীষ্মে শ্বেতাঙ্গগণ তথায় আবদ্ধ হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে থাকেন। সেই কারাপ্রকোষ্ঠে দুইটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। প্রাণান্ত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অবরুদ্ধ নরনারীগণ সেই গবাক্ষের সন্নিহিত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠেলাঠেলির ও হুড়াহুড়ির ফলে অবরুদ্ধ শ্বেতাঙ্গগণের কষ্ট আরও অধিক হইতে লাগিল।" ফলে সেই ভীষণ নিদাঘ-রজনী যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে প্রাণহারিণী পিপাসায় ও শ্বাসকষ্টে তাঁহারা একে একে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। পরদিন প্রভাতে রক্ষিগণ সেই কারাপ্রকোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিল, ১৪৬ জন অবরুদ্ধ শ্বেতাঙ্গের মধ্যে ১২৩ জনের শবমাত্র পড়িয়া আছে; অবশিষ্ট ২৩ জন মুমূর্ষু—অচেতনপ্রায় পতিত রহিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন,—যে সকল শ্বেতাঙ্গ অন্ধকূপে হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন,—তাঁহাদের মধ্যে কেবল মিসেস কেরীই রমণী।

অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ডের প্রামাণিকতা লইয়া কিছু দিন পূর্ব্বে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ই প্রথমে বলেন যে, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বার হাত প্রকোষ্ঠে ১৪৬ জন নরনারীকে প্রবিষ্ট করান নিতান্তই অসম্ভব। ইহার অতি অল্প দিন পরেই 'বঙ্গবাসী'র খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুত বিহারীলাল সরকার মহাশয় 'জন্মভূমি' নামক মাসিক পত্রিকায় অন্ধকূপ-সম্পর্কিত ঘটনার অলীকত্ব প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত করেন। তাহার পরই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় নানা যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগে উক্ত ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে শেষোক্ত দুইজন খ্যাতনামা লেখকের যুক্তির ও তর্কের প্রভাবে অন্ধকূপ-সম্পর্কিত বিবরণ সম্পূর্ণ মিথ্যা, অনেকের মনে এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। ইহার পর অধ্যাপক সি. আর. উইলসন

অন্ধকূপ-হত্যা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। লর্ড কার্জ্জন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অন্ধকূপের স্মৃতিস্তম্ভ পুনর্গঠিত করিয়া ঐ ঘটনা ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরজাগরূক রাখিতে সঙ্কল্প করেন এবং তাঁহারই যত্নে লালদিঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে অন্ধকূপের প্রকটীকৃত স্মৃতিস্তম্ভ মস্তক উন্নত করিয়া বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাবের অত্যাচারকাহিনী জগৎসমক্ষে কীর্ত্তন করিতেছে।

কেহ কেহ মনে করেন, পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে অন্ধকূপের হত্যাকাণ্ড অংশতঃ সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। তবে হলওয়েল্ প্রভৃতি ইংরাজ লেখকগণের লিখিত বিবরণ যে নিতান্ত অতিরঞ্জিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ সেই কারাপ্রকোষ্ঠ বৃহত্তর ছিল, অথবা অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের সংখ্যা অনেক অল্প ছিল। সেই কারাগৃহে কেবল ইংরাজ পুরুষই নিক্ষিপ্ত হয়েন নাই; অনেক ইংরাজ রমণীও তথায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিস্তম্ভে মৃত ব্যক্তিগণের তালিকায় মিসেস ইলেনর ওয়েষ্টন নামক জনৈক ইংরাজ মহিলার নাম দৃষ্ট হয়।

অন্ধকূপে কতগুলি ইংরাজ রমণী আবদ্ধ হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের মধ্যে কতজন সেই ভীষণা রজনীতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন,—কত জনই বা রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া ইদানীং একটু আলোচনা হইতেছে। ১৯০৬ অব্দের ২৫শে মার্চ্চ তারিখের 'ষ্টেটস্‌ম্যান্' পত্রে শ্রীযুত এচ. ই. এ. কটন একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন। তাহার পর গত ১৯১০ অব্দের ২৯শে মে তারিখের ষ্টেটস্‌ম্যানে' শ্রীযুত ওয়াণ্টার কে. ফার্ম্মিঞ্জার আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

অন্ধকূপের ঘটনার রাত্রিতে কতকগুলি ইংরাজ যে এক রুদ্ধবায়ুপ্রবেশ প্রকোষ্ঠে সিরাজদ্দৌলার অনুচরবর্গকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন—এবং সেই বন্দিগৃহে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাণ হারাইয়াছিলেন,—এ কথা যাঁহারা একেবারেই অস্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, সেই বন্দিগৃহে পুরুষের সহিত অনেক রমণীও নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যা অল্প ছিল। ইহার কারণও ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এদেশে শ্বেতাঙ্গ যুবক পাঠাইতেন সত্য, কিন্তু তাহাদের সহিত "ঘরকন্না" করিবার জন্য রমণীদিগকে পাঠাইতেন না। ফলে তখন ইংরাজ—সমাজে রমণীর সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। রমণীর অল্পতা নিবন্ধন তখনকার ইংরাজ মহিলারা অতি অল্প বয়সেই উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই অনেক ইংরাজ বালিকার বিবাহ হইয়া যাইত।

অন্ধকূপে রমণী।

অন্ধকূপে আবদ্ধ জনগণের মধ্যে কতজন মহিলা ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন তথ্যই অবিসংবাদিতরূপে সপ্রমাণ হয় নাই। হলওয়েলই প্রথমে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া যায়েন। তিনি কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধিনায়ক ছিলেন এবং ঐ ভীষণা রজনীতে অন্ধকূপে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সেই রাত্রিতে আবদ্ধ জনগণের মধ্যে একটি মাত্র ইংরাজ মহিলা ছিলেন।

সংখ্যা নির্ণয়।

লাবিষ্টন মিলেব ল নামক জনৈক ব্যক্তি একখানি দরখাস্ত লিখিয়াছিলেন, ঐ দরখাস্তে তিনি অন্ধকূপে একটিমাত্র ইংরাজ মহিলা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেক্রেটারী কুক (ইনিও অন্ধকূপে আবদ্ধ ছিলেন) ও অর্ম্ম ঐ ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু সে সময় ভারতে ইংরাজ মহিলাদিগের সংখ্যা যতই অল্প থাকুক না কেন, সার্দ্ধশত ইংরাজের মধ্যে একটিমাত্র মহিলার অবস্থান অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, হলওয়েল যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক কথাই পরে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা কেবল হলওয়েলেরই ধ্বনিতে ধ্বনি মিশাইয়াছেন, তাঁহারাও বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কাপ্তেন মিল্‌স্ নামক জনৈক ইংরাজ সেই স্মরণীয় রজনীতে অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সেই জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। ঘটনার অব্যবহিত পরেই ইনি তৎসম্বন্ধে এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইনি লিখিয়াছেন যে, "অন্ধকূপে ১৪৪ জন নরনারী ও বালকবালিকাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১২০ জনেরও অধিক লোক শোচনীয় ভাবে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়াছিল।" ইঁহার লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, অন্ধকূপে একাধিক রমণী ও অনেক বালকবালিকাও অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের সকলের কথা এখন বিস্মৃতির অতলতলে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে। সে তথ্য উদ্ধারের আশা অতি অল্প।

মিসেস কেরী নাম্নী জনৈকা মহিলা ঐ ভয়ঙ্করী বিভাবরীতে সেই ভীষণ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ ছিলেন, এবং জীবিতাবস্থায় তথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার পর বহু দিন জীবিত ছিলেন,—এ কথা এখন অনেকে স্বীকার করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ টমাস্ বইলু নামক জনৈক ইংরাজ ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মিসেস্ কেরীর সহিত এই বইলুর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার 'হলওয়েলের ট্রক্টের' এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কটন লিখিয়াছেন, "তাঁহার সেই পুস্তকখানি এখন মিসেস বিভারিজের নিকট আছে।" ঐ পুস্তকের পৃষ্ঠায় উক্ত মিঃ বইলু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, মিসেস্ কেরী হলওয়েলের অনেক কথারই সমর্থন করিয়াছিলেন। মিঃ বইলু সুপ্রিম কোর্টের এটর্ণি ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ডাক্তার বস্তিদ তাঁহার "Echoes from Old Calcutta" নামক পুস্তকে এই মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মিসেস্ কেরী বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী, তাঁহার মাতা মিসেস ইলেনর ওয়েষ্টন, ও তাঁহার দশবর্ষবয়স্কা এক ভগিনী অন্ধকূপে প্রাণ হারাইয়াছিলেন; ইহা ভিন্ন অনেক সেনা-সিমন্তিনী ও বালকবালিকা সেই পবনগতি-প্রতিবিদ্ধ প্রকোষ্ঠে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে টমাস বইলু মিসেস্ কেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সে সময় মিসেস্ কেরী আপন মুখেই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর। সুতরাং অন্ধকূপহত্যার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। তখন তিনি কুমারী নহেন—গৃহিণী। অন্ধকূপেই তাঁহার পতি

মিসেস্ কেরী।

প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রকাশ, অন্ধকূপ হইতে বাহির হইবার পর তিনি সিরাজদ্দৌলার অন্তঃপুরে নীত হইয়াছিলেন। হলওয়েল স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তিনি সুন্দরী ও যুবতী ছিলেন, সেই জন্য নবাব তিনি ভিন্ন আর যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অর্ম্ম ও মেকলে এই কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তার বস্তিদ লিখিয়াছেন যে, "অন্ধকূপের যন্ত্রণাভোগের পর আর কাহাকেও সুন্দরী ও যুবতী দেখাইতেছিল না। সম্ভবতঃ মিসেস্ কেরী আর সকলের সহিত কুলীবাজারে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ইংরাজ জাহাজ দেখা যাইতেছিল।" এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, অন্ধকূপহত্যার পর যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চারি জনকে নবাব গুপ্ত ধনের সন্ধান দিবার জন্য আটক রাখিয়াছিলেন। শুনা যায়, ১৮০১ অব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে মিসেস্ কেরীর মৃত্যু হইয়াছিল। মিসেস্ কেরী তাঁহার জননীর ও ভগিনীর সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে অনুসন্ধানের ফলে তাহার যাথার্থ্য অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয় নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতার নাম মিসেস্ ইলেনর ওয়েষ্টন। দ্বিতীয় বার উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তিনি ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা-অবরোধকালে বাঙ্গালার কুঠীতে যে সকল য়ুরোপীয় ও অন্যান্য ব্যক্তি ছিলেন, মিষ্টার হিল তাঁহাদের নামের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই তালিকায় ইলেনর ওয়েষ্টনের নাম নাই। কেবলমাত্র বস্তিদ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই লর্ড কর্জ্জন বর্ত্তমান মনুমেণ্টে ইলেনর ওয়েষ্টনের নাম ক্ষোদিত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুত কটন লিখিয়াছেন, ইলেনর ওয়েষ্টনের সহিত সম্ভবতঃ চার্লস্ ওয়েষ্টনের কোন সম্বন্ধ ছিল। এই চার্লস্ ওয়েষ্টন নন্দকুমারের মোকর্দ্দমায় অন্যতম জুরী ছিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ সংশয়দিগ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত করা সমীচীন নহে।

শ্রীযুত কার্ম্মিগ্লার অন্ধকূপ হইতে জীবদ্দশায় প্রত্যাগত আর একটি রমণীর নাম করিয়াছেন। 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশিত হয়,—"১৮১৫ অব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে ৭৮ বৎসর বয়সে মিসেস্ নক্সের লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের অন্ধকূপ হইতে যাঁহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন,—ইনিই তাঁহাদের শেষ। সেই ঘটনার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর ছিল এবং তিনি ডাক্তার নক্সের স্ত্রী ছিলেন। শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার মানসিক শক্তি অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

আর একজন।

মিষ্টার হিলের তালিকায় নক্স নামধারিণী তিন জন ইংরাজ রমণীর উল্লেখ দেখা যায় বটে কিন্তু ঐ তিন জনের মধ্যে উপরি উক্ত মিসেস নক্স যে অন্যতমা, ইহা নিশ্চয় বলা যায় না। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন নক্স নামধেয় দুইজন ডাক্তার ছিলেন; একজন 'জুনিয়ার,' আর একজন 'সিনিয়ার' নামে অভিহিত হইতেন। সিনিয়ার ডাক্তার নক্সের পত্নীর নাম ছিল এলিজাবেথ নক্স। কলিকাতা অবরোধের সময় তিনি ফলতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি কখনই অন্ধকূপে অবরুদ্ধ হইতে পারেন না। জুনিয়ার নক্স ১৭৫৭ অব্দে

জ্বর ও যকৃৎপ্রদাহে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার পত্নীই কি অন্ধকূপে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন? কেহ কেহ অনুমান করেন, ডাক্তারী করা অপেক্ষা ব্যবসায় করা অধিক লাভজনক বলিয়া ইনি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। আবার গত ৩১ মে তারিখে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—"সেণ্টজন্ চার্চ্চের চ্যাপ্‌লেনের অনুমতি লইয়া আমি প্রাচীন জন্ম মৃত্যু রেজিষ্টারীর তালিকায় এই কথা লিখিত দেখিলাম;—"বাঙ্গালায় কলিকাতায়' ফোর্টউইলিয়মে সমাধি; ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর, মিসেস্ রোজ নক্স; বয়স ৭২।" ১০ই তারিখে যাঁহার দেহান্ত হইয়াছে ১৪ই তারিখে তাহার সমাধি হওয়া সম্ভব। কিন্তু 'কলিকাতা গেজেটে' উঁহার বয়স ৭৪ বৎসর বলা হইয়াছে, গির্জ্জার রেজেষ্টরী খাতায় উহা ৭২ বৎসর লিখিত হইয়াছে। উভয়েই কি একই ব্যক্তি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অন্ধকূপ হত্যার সময় তাঁহার বয়স ১২ বৎসর মাত্র ছিল। ইঁহার পূর্ণ নাম রোজ নক্স; 'কলিকাতা গেজেটে' পূর্ণ নাম প্রকাশিত হয় নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, এরূপ বালিকার পক্ষে অন্ধকূপে রক্ষা পাওয়া কি সম্ভব হইয়াছিল?

আরও একজন।

উড নাম্নী আর একটি ইংরাজ বালা সেই ভয়ঙ্করী বিভাবরীতে অন্ধকূপে বন্দিনী হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ১৭৮০ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে হিকির 'বেঙ্গল গেজেটে' ও কাপ্তেন বাক্‌ল্ লিখিত Bengal Artilleryর ইতিহাসে ইঁহার কথা পাওয়া যায়। ইহা উপন্যাস ও নবন্যাস হইতেও বিস্ময়জনক। চুণার দুর্গ হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী গিরিগাত্রে অবস্থিত কোন মসজিদের দেওয়ালে অঙ্গার-সাহায্যে ইঁহার বৃত্তান্তটি নাকি লিখিত ছিল। আলেকজাণ্ডার ক্যাম্বেল নামক জনৈক ব্যক্তিই নাকি তাহা লিখিয়াছিলেন। সেই অঙ্গার-লিখিত বৃত্তান্তের মর্ম্মার্থ এইরূপ;—"লেফ্‌টনাণ্ট জন উডের পত্নী শ্রীমতী অ্যান্ উড্ এই স্থানে বন্দিনী ছিলেন। সার রজার দৌলার (সিরাজুদ্দৌলা) সেনানায়ক জাফর বেগ ইঁহাকে কলিকাতার অন্ধকূপ হইতে বন্দিনী করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। উক্ত জাফর বেগ চুণার গড়ে বহুদিন ফৌজদারের কার্য্য করিয়া উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। আমি আলেকজণ্ডার ক্যাম্বেল ঐ হতভাগিনী রমণীর সহিত বন্দী হইয়াছিলাম। যে ব্যক্তি আমাদিগের উভয়কে বন্দী করিয়াছিল, সে আমাকে খোজা করিয়া দেয়। যে সময় আমি বন্দী হইয়াছিলাম, তখন আমার বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর মাত্র। ঐ বন্দিনীর পরিচর্য্যা করাই আমার কার্য্য ছিল। চার বৎসর কাল আমি ঐ কার্য্য করিয়াছিলাম। ১৭৬২ খৃঃ অব্দের ৩রা মে তারিখে উক্ত জাফর বেগ ঐ বন্দিনীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যদি তিনি জাফর বেগের সহিত একত্র বাস করিতে সম্মত না হয়েন, তাহা হইলে তিনি আমাকর্ত্তৃকই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া হত হইবেন। ৩রা তারিখে নিশীথে এই গবাক্ষ হইতে আমরা দুইজনে লাফাইয়া পড়ি, তথা হইতে গঙ্গাতীরে যাই এবং চুঁচুড়ায় যাইবার জন্য পঞ্চাশটি সুবর্ণমুদ্রা দিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করি। ১১ই তারিখে আমরা নিরাপদে চুঁচুড়ায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলাম। ঐ স্থানে আমরা প্রথমেই শুনিলাম যে, লেফ্‌টনাণ্ট উড্ দুঃখে প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন। অ্যান উড সেই সংবাদশ্রবণে পীড়িতা হইয়া পড়েন এবং ঐ মাসের ২৭শে তারিখে মৃত্যুমুখে পতিতা হয়েন। মিঃ উড অত্যন্ত অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা উচিত ছিল। আলেকজাণ্ডার ক্যাম্বেল, আমি এখন দৌলার চাকরী করি।" বাক্‌ল্‌ বলেন, অ্যান্‌ উড্‌ যে প্রকোষ্ঠে বন্দিনী ছিলেন, উহা দৈর্ঘ্যে ৯ ফিট ৫ ইঞ্চ, প্রস্থে ৮ ফিট ৯ ইঞ্চ এবং উচ্চতায় ৭ ফিট ৯ ইঞ্চ। গবাক্ষটি ১৮ ইঞ্চ মাত্র।

এই বিবরণটি সত্য কিনা, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। অন্য কোনও ঘটনা বা উক্তির দ্বারা উহা সমর্থিত হয় নাই। তবে এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছে যে, উড্‌ নামক জনৈক ব্যক্তি কলিকাতা মিলিসিয়ার কাপ্তেন ছিলেন; ফলতায় যে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ আশ্রয় লইয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে গৃহপালিত পশ্বাদি যোগান দিতেন এবং কলিকাতা অবরোধের পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়মে আবশ্যক জিনিসপত্র সরবরাহ করিতেন। অঙ্গার-লিখিত বিবরণে পলায়নের পরবর্ত্তী ঘটনা, চুঁচুড়ায় উপস্থিতি ও অ্যান উডের মৃত্যু পর্য্যন্ত লিখিত আছে। পলায়নকালে এ কথা লেখা সম্ভব নহে। পরে কিরূপ অবস্থায়, কখন উহা লিখিত হয়, তাহাও জানা যায় নাই। ঐ সময়ে আলেকজাণ্ডার ক্যাম্বেল নামক কোন শ্বেতাঙ্গ খোজা সিরাজুদ্দৌলার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং সে ঐ ঘটনার পর পুনরায় চুণার দুর্গে ফিরিয়া গিয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। কেবল প্রকোষ্ঠের প্রাচীর-গাত্রে লিখন দেখিয়া এই ঘটনা সত্য বলিয়া অনুমান করা যায় না।

দুর্ভাগ্যক্রমে অন্ধকূপ-সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনাতেই সংশয় করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অথচ নানা স্থানে নানা ঘটনার সহিত ইহার সংশ্রবও রহিয়াছে। ইহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

বারাণসী।

বৈশাখ মাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' আমরা বলিয়াছিলাম, মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ভারত-ভ্রমণের পর 'ডেলি ক্রনিকেল' পত্রে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। নিম্নে তাঁহার বারাণসী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সার সঙ্কলিত হইল।

পূর্ব্বদিক্‌-চক্রবালে হরিদ্রাভ লোহিতরেখা ফুটিয়া উঠিতেছে। শিরোপরে শশধর—যেন নীলমকমলের উপর দীপ্ত রত্ন। পশ্চাতে—পশ্চিমে তারকার দীপ্তি। এখন ও সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধঘণ্টা বিলম্ব আছে। আমি গঙ্গাভিমুখে যাইতেছি।

প্রত্যুষে। বারাণসীর দুর্গন্ধ সঙ্কীর্ণ পথে লোকচলাচল আরব্ধ হইয়াছে। কোথাও একজন রমণী দ্বারপথ মার্জ্জন করিতেছেন, কোথাও কোন সুপ্ত জাগিতেছে, কোথাও কেহ অগ্নি জ্বালিতেছে। ক্রমে আলোক রক্তাভ হইতেছে; ভূমি হইতে

কুজ্ঝটিকা উঠিতেছে। সহসা পথশেষে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলাম। পশ্চিম দিক্ হইতে গঙ্গা বক্রগতিতে আসিয়াছে; কূলে সোপান, মন্দির, হর্ম্ম্য—সর্ব্বোপরি গগনপটে আরঙ্গজেবের মস্‌জিদের চূড়া। এই—বারাণসী।

তীরে জনতাগুঞ্জন ও যাত্রীদিগের গমনাগমন। যেন তাহারা মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে। এদিকে সূর্য্যোদয় হইল। সহস্র কণ্ঠে উপাসনার উদাত্ত ধ্বনি উত্থিত হইল। সহস্র সহস্র লোক গঙ্গাজলে স্নান করিতে লাগিল—মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। স্নানার্থীদিগের পিত্তল বারিপাত্র রবিকরে জ্বলিতে লাগিল।—বর্ণের কি বৈচিত্র্য! এই জনসজ্জোদ্ভূত গুঞ্জন যেন কালবাহিত হইয়া আসিতেছে। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, নদীকূলে বংশীরব—সকল শব্দ মিশিয়া যাইতেছে।

পূজা।

নানা ঘাট, নানা মন্দির, নানা সাধুর আবাস অতিক্রম করিয়া আমরা শ্মশানে উপনীত হইলাম। সমস্ত দিন লোকে বস্ত্রাচ্ছাদিত শব বহিয়া আনিতেছে, চিতা সাজাইতেছে। তাহার পর চিতাধূম গগনে উঠিতেছে—শব ভস্মীভূত হইতেছে। হিন্দুরা বলে—কাল পূর্ণ হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। তবে যাহার চিতাভস্ম গঙ্গাজলে পতিত হয়, সে মুক্ত হয়। বর্ণের কি বৈচিত্র! মানবের ও ভাবার কি বাহুল্য! উচ্চের ও নীচের এবং জীবনের ও মৃত্যুর কি বিস্ময়কর মিলন!

শ্মশানে।

সূর্য্য বহুক্ষণ সমুদিত। দেবমন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি শুনা যাইতেছে; শত কণ্ঠের মন্ত্রপাঠশব্দে পবন পূর্ণ। আমরা নদী হইতে পূত নগরে গমন করিলাম। য়ুরোপের পক্ষে রোম যাহা, ভারতের পক্ষে বারাণসী তাহাই। ইহার সঙ্কীর্ণ পথের বিচিত্র জীবনের বর্ণনা করা অসম্ভব। বারাণসীর বক্ষে যে ভক্তি—যে ছলনা, যে পুণ্য—যে পাপ নিত্য ক্রীড়া করে, তাহা কে বুঝিতে পারে? মন্দির পূজার্থীতে পূর্ণ; তাহাদের গতায়াতের বিরাম নাই। বিধর্ম্মীরা মন্দির-মধ্যে প্রবেশের অধিকারী নহে। তাহারা দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখে,মন্দির-গর্ভে মলিনবর্ণ নরনারী পুষ্পবারিদানে বিকটাকার প্রতিমার পূজায় রত। চারিদিকে বানরবৃন্দের চীৎকার। মন্দিরপ্রাঙ্গণে বহু গাভী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সর্ব্বত্র সন্ন্যাসীর বাহুল্য। রাজপথে সর্ব্বত্র ঘৃণ্য রোগে কাতর বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকের দল। তাহাদের চীৎকার—কাতরোক্তি, অর্থপ্রার্থনা যেন নরকের আভাস দেয়। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। জনস্রোতের শেষ নাই;—কলরবের শান্তি নাই। জনবাহুল্যে—কুসুমসৌরভে- পশুর মলমূত্রাদির দুর্গন্ধে বাতাস তপ্ত—ভারাক্রান্ত। লোকে গলায় যে মালা পরাইয়া দেয়, তাহা লৌহশৃঙ্খলের মত গুরুভার—তাহার গন্ধে চক্ষুতে জল আইসে। সে অবস্থায় অধিক সময় থাকা অসম্ভব। প্রাঙ্গণে বাতাস অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ। তথায় দাঁড়াইয়া বারাণসীর বিচিত্র জীবন লক্ষ্য করা যায়। একপার্শ্বে একটি লৌহপিঞ্জরে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। কয়েক জন বৃদ্ধা তাঁহার উপদেশ লইতেছে। তাঁহাদের বিশুষ্ক বক্ষ, কোটরগত নয়ন,—বিশীর্ণ দেহ দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয়, তাহারা জীবনে সুখের স্বাদ পায় নাই; পরন্তু দুঃখের দাবানলে দগ্ধ হইয়াছে। নিকটে জ্ঞানবাপী।

নগরে।

তাহার বৃত্তির চারিদিকে জনতা। নগ্নপ্রায়—ভস্মাচ্ছাদিতকায় সন্ন্যাসীরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই স্থানে দাঁড়াইলে বারাণসীর অন্তরের আভাস পাওয়া যায়। এই স্থানে লোক বিচার-বিবেচনার অতীত শান্তির সন্ধানে ব্যস্ত। ইহারা ধর্ম্মচিন্তার বিশুদ্ধ নীল আকাশে উড্ডীন হয়—ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানের কর্দ্দমে লুটায়।

ভারতবর্ষ উদার। মানুষের দুর্ব্বলতাজনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করা ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। ভারতবাসীদিগের দেবতারা যেন তাহাদিগের পরিবারভুক্ত—একান্ত প্রিয়। যখন পূজার পর প্রতিমা বিসর্জ্জন হয়, তখন নাকি পুরাঙ্গনাগণের হৃদয় শূন্য হয়—যেন তাঁহারা সন্তানবিয়োগশোকে কাতরা। হিন্দুর এই স্নেহপ্রেমভক্তিপূত দেবপ্রীতি অন্যধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে সম্যক্ বুঝিতে পারা সহজ নহে, হইতে পারে না; কারণ, ধর্ম্ম হিন্দুর সমাজের—পরিবারের—জীবনের অঙ্গীভূত। ধর্ম্মকে এমন করিয়া আর কে আপনার করিয়াছে?

উদারতা।

দর্শন।

আত্মা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম মানবাত্মা সম্বন্ধে যে নিগূঢ় তত্ত্ব জগৎ সমক্ষে প্রচার করিয়াছিল, বেদান্তে যাহার দার্শনিক বিশ্লেষণ ও সমালোচন ভারতীয় প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মকে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহারই অংশবিশেষের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বহু শত বৎসর পরে (খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে) গ্রীসে পিথাগোরাস (ও তৎপরে প্লেটো) প্রবর্ত্তিত আত্মার জন্মান্তরবাদে শ্রুত হইয়াছিল। তৎপরে খৃষ্টের নবধর্ম্মবন্যায় য়ুরোপের সমস্ত পুরাতন ধর্ম্মপ্রথা একে একে ভাসিয়া গেল। তখন পিথাগোরাস-প্রমুখ দার্শনিকগণের আত্মাসম্বন্ধীয় মত পরবর্ত্তিগণের নিকট কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগের ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাস বলিয়া পরিগণিত হইল। কিন্তু এই নবীন ধর্ম্মের প্রভাব যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল, ততই যেন ইহা জ্ঞানসম্পর্কশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। এক কালে এই অজ্ঞানরাশিসম্ভূত নানা কু-প্রথা পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে বিবেকহীন পশুবৎ করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে—লুথারকৃত ধর্ম্মসংস্কার। এই মহাত্মাই সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মনামে অভিহিত অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মের ও জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ খৃষ্টীয় জাতিসমূহকে বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই বেকনের ন্যায় মনীষীও এই মত প্রচার করেন যে, ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য ঈশ্বর ও তৎসংক্রান্ততত্ত্বসমূহ ক্ষুদ্র মানববুদ্ধির অগোচর; অতএব ধর্ম্মের সহিত জ্ঞান সম্পর্কিত হইবার কোন কারণ নাই। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত কোন বিষয় নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও বিশ্বাসের অযোগ্য হইলেও তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে য়ুরোপ এইরূপ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। আর হিন্দুধর্ম্মের সহিত সংঘাত এই চঞ্চলতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। এখন চারিদিকে

বাইবেলের নানারূপ ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। কাউণ্ট টল্‌ষ্টয় ত Old Testament নামক উহার অর্দ্ধাংশ খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াসী। ডাক্তার কার্পেণ্টার রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বহু সমস্যার হাত এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সম্প্রতি 'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' নামক পত্রে ম্যাদাম জীন ডিলেয়ার নাম্নী জনৈক ইংরাজ মহিলা লিখিত 'মানবাত্মা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত' শীর্ষক এক অতি উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিদুষী মহিলা হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব-উদ্ঘাটনে কিরূপ সমর্থ হইয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

লেখিকা বলেন,—খৃষ্টধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম পরস্পর তুলনা করিলে প্রথমটিকে প্রেমাত্মক ও দ্বিতীয়টিকে জ্ঞানাত্মক বলিলে বিশেষ অসঙ্গত হয় না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত নিরস্ত না

তুলনা।

হইয়া আর একটু গভীর ভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টধর্ম্ম দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া কেবল নৈতিকতা লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়াছে. জ্ঞানের দিকে উন্নত হইতে পারে নাই। কিন্তু জ্ঞানই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি হইলেও হিন্দুধর্ম্ম নীতিকেও সঙ্কুচিত না করিয়া বরং পূর্ণ প্রসার দিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম আত্মা সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যাই করিতে পারে নাই। আত্মা অমর,—খৃষ্টধর্ম্মানুসারে এ কথা স্বীকৃত; কিন্তু যখনই ইহার স্বরূপ কিম্বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে, তখনই হয় তাহা শূন্য বাগ্‌যুদ্ধে অথবা অন্ধ ধর্ম্মানুশাসনমাত্রে (dogmas) পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে কেহ এই অনুশাসন ব্যতীত কোনরূপ স্বাধীন মত পোষণ কিম্বা প্রচার করিতে সাহসী হইত, তাহার যে কি দশা হইত, তাহা মধ্যযুগের রক্তাঙ্কিত-ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। এই ত গেল, অপেক্ষাকৃত অতীত কালের কথা। কিন্তু

আত্মা।

এই বিজ্ঞানের যুগেও য়ুরোপীয় মনীষিগণ লিখিত যে সকল গভীর-গবেষণাপূর্ণ আত্মতত্ত্বালোচনা প্রকাশিত হইতেছে—তাহাতেও আত্মা সম্বন্ধে এই জটিল সমস্যার কোন সমাধান দৃষ্ট হইতেছে না। তাঁহাদের ধারণা এই যে, আত্মা অনৈসর্গিক একটা কিছু; তাহার সত্তা জাগতিক অন্য কোন ব্যাপার বা নিয়মের সহিত কোনরূপে সংসৃষ্ট নহে; ইহা একটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন চেতনাণুমাত্র (isolated unit of conciousness)। মানব ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর যে আত্মা থাকিতে পারে তাহা কখনও তাঁহাদের ধারণায় আইসে না। আর এই মানবাত্মার উৎপত্তি দেশকাল-সাপেক্ষ। প্রত্যেক মানবের জন্মকালে তাহার আত্মা সৃষ্ট হইতেছে,—ইহাই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মত; অতএব ইহা অনাদি নহে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যদিও আত্মা এইরূপ আদিবিশিষ্ট, তথাপি খৃষ্টীয় শাস্ত্রানুসারে ইহা একেবারে সহসা অমরতা লাভ করে, এবং অনন্তকাল কোন এক অনির্দ্দেশ্য স্বর্গ ভোগ করিতে থাকে। আত্মার এইরূপ অতিপ্রাকৃত পরিণাম কখনও যুক্তিতর্কের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, যাহার আদি আছে, তাহার অন্ত থাকিবেই; * যাহা অনাদি, তাহাই কেবল অমর ও অনন্তকালস্থায়ী হইতে পারে।

* গীতার কথায়—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।

ইহার উপর খৃষ্টধর্ম্মের অঙ্গীভূত অভ্যুত্থানবাদ (Resurrection) এবং শেষ বিচার (Last Judgment) এই আত্মাঘটিত সমস্যাকে আরও জটিল ও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। কারণ, মৃত্যুর পরেই আত্মার অবস্থিতি কোথায়? সেই শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত কোন অনির্দ্দিষ্ট প্রেতলোকে তাহাকে থাকিতে হয়, না তখনই স্বর্গে কিম্বা নরকে তাহার অবস্থান স্থিরীকৃত হয়? এই প্রশ্নেরও সদুত্তর খৃষ্টধর্ম্মে পাওয়া যায় না। এক কথায় লেখিকা বলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মানুসারে আত্মতত্ত্বের সমাধানের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মানুষই কেবলমাত্র আত্মাবিশিষ্ট জীব এই ধারণামূলক আরও কতকগুলি অতিপ্রাকৃত ও যুক্তিবিরুদ্ধ ধারণা আত্মার প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয় একরূপ অসম্ভব করিয়া ফেলিয়াছে।

অতঃপর লেখিকা হিন্দুধর্ম্ম এই সমস্যার কিরূপ মীমাংসা করিয়াছে, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দুর আত্মা খৃষ্টানের ন্যায় আদিবিশিষ্ট রহস্যময় বস্তু নহে, এবং মানবজন্মের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হইয়া মৃত্যুর পরই ঈশ্বরানুগ্রহে অমরতালাভরূপ অলৌকিকতা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। ভারতবাসীর নিকট প্রাণই আত্মা—মানবজীবন ঐ আত্মার স্ফুরণমাত্র। সমগ্র প্রাণিজগতে এক বিরাট ঐশী শক্তি নিবিড়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। এই দৈবী সজীবতা, যাহা লোক চক্ষুর অন্তরালে গুপ্তভাবে সমগ্র প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাই মানবে আত্মারূপে ব্যক্ত হইয়া উঠে; এবং তখনই তাহার ক্ষণিক স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত এই পরিজ্ঞেয় শক্তিই ঈশ্বর—ব্রহ্ম; এবং তাঁহারই অংশমাত্র মানবজীবনে আত্মারূপে প্রকট হয়। অতএব ঈশ্বরই আত্মা, এবং এই আত্মা তাঁহারই ন্যায় অনাদি অনন্ত।*

সমস্যা সমাধান।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আত্ম-তত্ত্বের অন্তর্নিহিত এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্য্যঋষিগণ গভীরজ্ঞানবলে মানবকে যে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাদিতে বিশ্লিষ্ট করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করা এইরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব এবং এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। এই স্থলে একটি কথা বলা যাইতে পারে; সর্ব্বত্রই মানুষ দেহ ও আত্মার নিরবচ্ছিন্ন সমষ্টিরূপে কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু প্রতীচ্যে মানুষ আত্মাবিশিষ্ট দেহ, আর প্রাচ্যে মানুষ দেহবিশিষ্ট আত্মা। এই মূলগত বিভিন্নতাই হিন্দুকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক করিয়াছে। হিন্দুর নিকট আত্মাই সত্য,—মানুষ আধ্যাত্মিক জীব।

এই নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল বৈচিত্র্যময় জগতের অন্তরালে যে এক শাশ্বত সত্য নিত্য বিরাজ করিতেছে, তাহা মানুষ জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে স্বতঃই অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছে, এবং সর্ব্বকারণভূত সেই সনাতন সত্য কি, তাহা অন্ধতমসাচ্ছন্ন সুদূর অতীত হইতে

* "প্রাণো হি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥"

আজ পর্য্যন্ত মানবজাতির চিন্তা ও অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হইয়াছে। উপনিষদে ইহাকেই স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, নিরাকার, পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ইহাই বৈজ্ঞানিকদিগের 'আদি কারণ' (First Cause), এবং ধ্রুবতাত্ত্বিকগণের (Positivist) 'চরম পদার্থ' (Ultimate Reality)। ইহাই আবার সাকার রূপে জিহোবা, শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখৃষ্ট রূপে প্রতিভাত হইয়া জগতে আপন মহিমা প্রচার করিয়াছে।

মানবদেহও ঐরূপ নিত্য নানা পরিবর্ত্তনের অধীন। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলিয়াছেন, "শরীর পরিবর্ত্তন-পরম্পরার নামান্তর মাত্র।" কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনের মূলে যে অবিনশ্বর অপরিবর্ত্তনীয় সত্য নিয়ত বর্ত্তমান আছে, তাহাই প্রকৃত মানব—Ego—Self.

এই দুই সত্যের মধ্যে সম্বন্ধ কি? মানবাত্মা সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন কোন বৃহত্তর সত্যের—ব্রহ্মের—অন্তর্ভুক্ত। অতএব আত্মাই ব্রহ্ম; ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের আত্মা সম্বন্ধে মীমাংসা।

বিরহে।

১

সে যে গো নিবিড় প্রেমে বেঁধেছিল চির মোরে
দুটি বাহু দিয়া!
পুণ্যপূত হৃদিখানি অর্ঘ্যের ডালায়' তুলি'
স'পেছিল প্রিয়া।
কর্ম্মমাঝে আপনারে রেখেছিল চিরদিন
করিয়া গোপন;
আজি সে গিয়াছে চলি'—কোন্ পরিচয়-হীন
আঁধার ভবন!

২

ছিল যবে গৃহ মাঝে, করে নাই আপনার
সুখ অন্বেষণ;
রিক্ত করে গেছে চলি'; ভাবিতেছি কোথা তা'র
পা'ব দরশন?
আপনার যাহা ছিল, লয় নি কিছুই সাথে,
সব গেছে দিয়ে;
আমি ত পারি নি কিছু তুলে দিতে তা'র হাতে,
যায় নি সে নিয়ে।

৩

আজি ব্যর্থ প্রেমরাশি উঠিছে ব্যাকুলি তাই—
হৃদয়ের তটে ;
এ প্রাণের শত সাধ উথলিত যা'রে চাহি'—
সে নাই নিকটে।
আছে পড়ি শূন্য গেহ, শুনিতে না পাই আর
সম্ভাষণ-বাণী ;
মুকুরে দেখেছি বৃথা, যদি সেথা থাকে তা'র
প্রতিবিম্বখানি !

৪

স্তব্ধ অর্দ্ধ রজনীতে শুনি, পদধ্বনি কা'র—
সে বুঝি সমীর ?
চমকিয়া সম্ভাষিতে ভুল ভেঙ্গে যায়, আর
ঝরে আঁখি-নীর !
পত্র-মরমর শুনি' ভাবি বুঝি তা'রি কথা,
কিন্তু সে কোথায় ?
শয্যা'পরে জ্যোৎস্না আসে, ভাবি' তার তনুলতা
বৃথা বাহু ধায়।

৫

অথবা সে অনুদিন আছে মোর কাছে কাছে,
পেয়েছি সন্ধান।
সে মুখ মুকুরে নাই, আমারি অন্তরে আছে
ভরি' মনপ্রাণ।
আর শোণিতের সনে আছে সেই প্রেম মোর,
ভুলিব কেমনে ?
বিরহ-জীবন-নিশি তা'রি ধ্যানে হ'বে ভোর,
তাহারি স্মরণে।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রজ্ঞাপারমিতা কি ?

'আর্য্যাবর্ত্তের' পাঠকগণ বিদিত আছেন যে, আষাঢ় মাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে,' শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 'প্রজ্ঞাপারমিতা'-শীর্ষক একটি সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দীনেশ বাবুর এই মূর্ত্তিতত্ত্বাভিজ্ঞতার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; যে হেতু, এ তত্ত্বের আলোচনায় আমাদের দেশের অনেকেই কিছু শিথিলপ্রযত্ন, সুতরাং অনেকেরই নিকট উহার উপস্থিতিমাত্রই প্রশংসার্হ। বিশেষ, লেখক বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত, তৎকর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত প্রবন্ধ-বস্তু যে অনেকেরই নিকট অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

আমি ঐ প্রবন্ধ দেখিয়া মনে করি, ভালই হইল—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' যশস্বী লেখক যে, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকার্য্যে ব্রতী হইলেন, ইহা আমাদের দেশের পক্ষে বড় মঙ্গল-সমাচার। সাগ্রহে ছবি মিলাইয়া প্রবন্ধ পড়িলাম। মনে একটু সন্দেহ হইল, প্রজ্ঞাপারমিতার যতগুলি ধ্যান জানা ছিল, সকলগুলির সহিতই একে একে ছবিখানি মিলাইলাম ; মিলিল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম যে, আমার অবগত প্রজ্ঞাপারমিতার ধ্যানগুলি পাঠকবর্গের গোচর করি, তাঁহারাও সেই ধ্যানগুলির সহিত দীনেশ বাবুর সিদ্ধান্তিত প্রজ্ঞাপারমিতার ছবিখানি মিলাইয়া দেখুন, ও উহা প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্র কি না স্থির করুন। ধ্যানগুলি এই :—

(১)

......প্রজ্ঞাপারমিতাং পীতাং অক্ষোভ্যাস্তঃস্থজটামুকুটিনীং ব্যাখ্যানমুদ্রাধরাং পুস্তক-সহিতনীলোৎপলস্য বামপার্শ্বে ধারিণীং......

(২)

প্রজ্ঞাপারমিতাং জটামুকুটিনীং চতুর্ভুজাং একমুখীং হস্তদ্বয়েন ধর্ম্মমুদ্রাধরাং.........বাম-ভুজাসক্তপ্রজ্ঞাপারমিতান্বিতনীলোৎপলধরাং......দক্ষিণহস্তেনাভয়প্রদাং......

(৩)

......অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি প্রজ্ঞাপারমিতোদয়ং যস্যাং ভাবিতমাত্রায়াং নিগ্রহঃ সর্ব্ব বাদিনাং ॥ দ্বিভুজামেকবদনাং.........পদ্মং দক্ষিণহস্তে তু রক্তবর্ণং বিভাবয়েৎ। প্রজ্ঞাপারমিতাং বামে চন্দ্রবজ্রপর্য্যঙ্কসংস্থিতাং......

(৪)

......ভগবতী প্রজ্ঞাপারমিতা পীতবর্ণা দ্বিভুজৈকমুখী পঞ্চতথাগতমুকুটা ব্যাখ্যানমুদ্রা-বতী......বামদক্ষিণপার্শ্বে উৎপলস্থপ্রজ্ঞাপারমিতাপুস্তকধারিণী......

(৫)

......ভগবতীং দ্বিভুজাং একমুখাং শুক্লাং.........রত্নমুকুটধারিণীং প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তকান্বিতকমলদ্বয়ং বামদক্ষিণপার্শ্বয়োরন্তরস্থিতং সঞ্চার্য্য করাভ্যাং ব্যাখ্যানমুদ্রামাবধ্য সিতপদ্মচন্দ্রে বজ্রপর্য্যঙ্কিণীং নবযৌবনোদ্ধতাং বিচিত্রবস্ত্রালঙ্কারভূষিতাং......

(৬)

......শুদ্ধস্ফটিকঘটিতাং ভগবতীং একাননাং...দ্বিভুজাং......সনালরক্তকমলান্বিতদক্ষিণ-পাণিপল্লবাং তদন্যকরেণ হৃঁ হৃদয়বিনিহিতপুস্তকাং... ..প্রজ্ঞাপারমিতাং......

(৭)

......ভগবতীং প্রজ্ঞাপারমিতাং দ্বিভুজাং......ব্যাখ্যানমুদ্রয়া সমুপেতকরাং..... সপুস্তকনীলোৎপলং বিভ্রাণাং বামপার্শ্বতঃ...

(৮)

......প্রজ্ঞাপারমিতাং পীতবর্ণাং......দ্বিভুজামেকমুখীং ব্যাখ্যানমুদ্রাবতীং......রত্ন-মুকুটিনীং বামপার্শ্বেস্থিতপদ্মমধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতাপুস্তকধারিণীং ভাবয়েৎ......

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ঃ—

১। মস্তকে অক্ষোভ্য, হস্তদ্বয় ব্যাখ্যানমুদ্রাযুক্ত, বাম পার্শ্বে নীলোৎপল, তাহার উপরে একখানি পুস্তক (প্রজ্ঞাপারমিতা-নামক)।

২। চারি হস্ত, এক মুখ, জটানির্ম্মিত শিরোভূষণ, দুই হস্ত ধর্ম্ম মুদ্রা অর্থাৎ ধর্ম্মচক্র-মুদ্রাযুক্ত, অপর হস্তদ্বয়ের বাম হস্তে প্রজ্ঞাপারমিতান্বিত নীল পদ্ম, দক্ষিণ হস্ত—অভয়-দানকারী।

৩। দুই হস্ত, এক মুখ, দক্ষিণ হস্তে রক্ত পদ্ম, বাম হস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।

৪। দুই হস্ত, এক মুখ, শিরোভূষণে পাঁচটি তথাগত, ব্যাখ্যানমুদ্রাশালিনী, বাম দক্ষিণ উভয় হস্তের পার্শ্বেই পদ্মের উপর প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।

৫। দুই হস্ত, এক মুখ, রত্ননির্ম্মিত শিরোভূষণ, বাম দক্ষিণ পার্শ্বে প্রজ্ঞাপারমিতা-পুস্তকযুক্ত দুইটি উৎপল, হস্ত ব্যাখ্যানমুদ্রাশালী, নবযুবতী, বিচিত্রবস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা।

৬। দুই হস্ত, এক মুখ, দক্ষিণ হস্তে সনাল রক্ত কমল, বাম হস্তে বক্ষোপরি প্রজ্ঞা-পারমিতা পুস্তক।

৭। দুই হস্ত, ব্যাখ্যান মুদ্রা, বাম পার্শ্বে সপুস্তক নীলোৎপল।

৮। দুই হস্ত, এক মুখ, ব্যাখ্যান মুদ্রা, রত্নের মুকুট, বামপার্শ্বস্থিত পদ্মের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।

এই অষ্টবিধ ধ্যান আমরা জানা আছে। পাঠকবর্গ দেখিবেন, প্রত্যেক ধ্যানে প্রজ্ঞাপারমিতা, 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক পুস্তক ধারণ করিয়া আছেন। কোন স্থানে উক্ত পুস্তক দেবীর হস্তে, কোন স্থানে বা পদ্মের উপরে উহার অবস্থিতির কথা পাওয়া যায়; কিন্তু উহার অবস্থান বিষয় অষ্টবিধ ধ্যানেই বলা হইয়াছে।

দীনেশ বাবুর নিরূপিত প্রজ্ঞাপারমিতার ছবিখানিতে কিন্তু পাঠকবর্গ উক্ত পুস্তকের চিহ্ন পাইবেন না। প্রতি ধ্যানেই পুস্তকের উল্লেখ থাকায়, যদি বলা যায় যে, প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্ত্তির উহাই বিশেষত্ব, তাহা হইলে বোধ হয় কথাটা খুব অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইবে না ; আর সেই বিশেষত্ব নাই বলিয়া দীনেশ বাবুর প্রজ্ঞা-পারমিতা "প্রজ্ঞা-পারমিতা কি না" এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ উপরি উক্ত অষ্টবিধ ধ্যানের একটিরও সহিত ইহার মিল না থাকায় স্বতঃই মনে সন্দেহ হয়, ইহা প্রজ্ঞাপারমিতা কি ? তবে ইহা হওয়া অসম্ভব নহে যে, এই আট প্রকার ব্যতীত প্রজ্ঞাপারমিতার আরও ধ্যান আছে ও তাহার সহিত ইহার মিল আছে ও দীনেশ বাবু তাহারই সাহায্যে ইহা বলিয়াছেন। স্বীকার করি, ইহা হইতে পারে ; কিন্তু এমন একটা সাধারণের জ্ঞান-সম্পাদক প্রবন্ধ প্রমাণবিরহিত করিয়া প্রকাশ করা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে কি ? যাঁহারা এই প্রবন্ধ হইতে প্রজ্ঞাপারমিতা চিনিয়া রাখিতে চাহিবেন, তাঁহারা কোন্ প্রমাণবলে দীনেশ বাবুর অনুসরণ করিবেন ? এ সকল প্রবন্ধ শিক্ষার জন্য ; ইহা হইতে যাহা শিখিলাম তাহা যদি এ সব প্রবন্ধে পরিস্ফুট হয়, তবেই এরূপ প্রবন্ধ মনোহর।(১)

বলিতে কি, দীনেশ বাবুর এ প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হয়, তিনি যেন মনে করেন, বিষয় যেরূপই কেন হউক না, তাহাতে কবিসুলভ কল্পনার নবনীত-প্রলেপ দিলেই তাহা সুখাদ্য হইল। কারণ, তিনি বলিয়াছেন, "ঊর্দ্ধতম ধ্যানী বুদ্ধের নিম্নে সিংহ-মুখ। ইহা দেবীর অভিষেক নিমিত্ত ফোয়ারা স্বরূপে কল্পিত হইয়া থাকিবে।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহার নাম কীর্ত্তিমুখ বা কৃত্তিমুখ এবং উহা ইংরাজী চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে ভাস্কর-কার্য্যের একটি প্রিয়তম নক্‌সা (design) রূপে চলিত। এ সকল বিষয়ক প্রবন্ধ কেবল ললিতমধুর ভাষায় মনোরম হয় না ; পরন্তু অনুসন্ধানলব্ধ তত্ত্বেই গৌরবান্বিত হয়।

দীনেশবাবু কৃতবিদ্য ও সুপ্রতিষ্ঠ, তাঁহার কাছে আমরা সবই সম্পূর্ণ আশা করি, এমন প্রমাণবিরহিত অসম্পূর্ণ কিছুরই আশা করি না। যদি তাঁহার ছবি খানিকে প্রজ্ঞাপারমিতা বলিবার কোন প্রমাণ তাঁহার কাছে বিদ্যমান থাকে, তাহা তিনি সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া অসম্পূর্ণ প্রবন্ধকে সম্পূর্ণ করুন। কথিত মুখ যে সিংহমুখ এবং উহা যে কল্পিত ফোয়ারা তাহারও প্রমাণ দিয়া আমাদিগকে বাধিত করুন।

(১) ধ্যানগুলি 'সাধনমালা" নামক বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

মূর্ত্তিতত্ত্ববিষয়ে আপনার জ্ঞানবিজ্ঞাপন আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি জ্ঞানান্বেষী, গত দশ বৎসর ধরিয়া এই তত্ত্বসম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করিতেছি। আমার মনে হয়, এ তত্ত্বটি জটিল; এবং সেইজন্য ইচ্ছা হয়, আমাদের দেশের কৃতবিদ্য সম্প্রদায় ইহাকে একটা নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় বলিয়া মনে না করিয়া ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করেন। দীনেশবাবু যেন মনে না করেন, ইহা তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিবাদ। ইহা প্রতিবাদ নহে, পরন্তু জিজ্ঞাসা ও আক্ষেপ।

পরিশেষে বক্তব্য, আমার ঝুলিতে যাহা আছে, তাহা ঝাড়িয়া এই মূর্ত্তিটিকে সাধারণতঃ বৌদ্ধ তারা মূর্ত্তি ব্যতীত আর উপস্থিত কিছু নাম দিতে পারি না। তবে মূর্ত্তির বামে ও দক্ষিণে উপবিষ্ট ক্ষুদ্র মূর্ত্তিদ্বয়ই যদি স্ত্রীমূর্ত্তি হয়(১) (ছবিতে আমি ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছি না), তাহা হইলে ইঁহাকে বরদ তারা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বরদ তারার ধ্যান এইরূপ ঃ—

......বামে নীলোৎপলবতীং দক্ষিণে বরদাং অর্দ্ধপর্য্যঙ্কনিষণ্ণাং দক্ষিণপার্শ্বে অশোককান্তা পীতা নানারত্নমুকুটী বামদক্ষিণহস্তয়োরশোকপল্লবকুলিশধরী......বামপার্শ্বে একজটী খর্ব্বা, কৃষ্ণা, ব্যাঘ্রাজিনধরা, ত্রিনেত্রা, দংষ্ট্রাকরালবদনা, জ্বলৎপিঙ্গলোর্দ্ধকেশা, কর্ত্ত্রীকপালধারিণী......

অর্থ—

দেবীর বামহস্তে নীলোৎপল, দক্ষিণ হস্ত বরদান করিতেছে, তিনি পালঙ্কে অসম্পূর্ণরূপে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অশোককান্তা নাম্নী একজন তারা—যাঁহার বামহস্তে অশোক বৃক্ষের পল্লব, ও দক্ষিণ হস্তে বজ্র; এবং তাঁহার বাম পার্শ্বে একজটী নাম্নী তারা—যিনি খর্ব্বকায়া, ব্যাঘ্রচর্ম্মধরা, ত্রিনেত্রা, দংষ্ট্রাকরালবদনা; এবং যাঁহার মাথার কেশ উর্দ্ধোত্থিত, পিঙ্গলবর্ণ সুতরাং যেন জ্বলিতেছে। যিনি কর্ত্ত্রী (কাঁচি) ও নরকপাল ধারণ করিয়া আছেন।

এই ধ্যান অনুসারে আমরা দেখিতে পাই, এই ছবিখানির প্রধান মূর্ত্তির বামহস্তে পদ্ম আছে, ও দক্ষিণ হস্ত বরদান করিতেছে, এবং ইনি দক্ষিণ পদ অধোবিস্তৃত করিয়া পালঙ্কে অসম্পূর্ণরূপে বসিয়া আছেন। ইঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের মূর্ত্তিটি নারীমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইতেছে; এবং উঁহার বামহস্তে যাহা আছে তাহাকে

(১) প্রবন্ধে দেখিতে পাই "মূর্ত্তির দক্ষিণে হয়গ্রীব এবং বাম ভাগে তারা" বলিয়া উল্লেখ আছে; সুতরাং লেখকের মতে দক্ষিণে একটি পুংমূর্ত্তি, বামে স্ত্রীমূর্ত্তি। ছবি দেখিয়া কিন্তু মনে হয়, মূর্ত্তির দক্ষিণ দিকের মূর্ত্তিটি স্ত্রীমূর্ত্তি, বামেরটি পুরুষ। খোদ প্রবন্ধে ঐ মূর্ত্তিদ্বয়সম্বন্ধে এই গোলমাল থাকায় একবার মূল শিলাখানি দেখিতে ইচ্ছা হয়। লেখক

বৃক্ষপল্লব বলিয়াই যেন মনে হয়; বামহস্তের বস্তুটি বজ্রই বটে। এইবার কথা হইতেছে, বাম পার্শ্বের মূর্ত্তি লইয়া। ছবিতে ইঁহাকে পুরুষ বলিয়াই মনে হয়। যদি পার্শ্বদ্বয়স্থ উভয় মূর্ত্তিই স্ত্রীরূপিনী হয়, তাহা হইলে ইঁহাকে বরদ তারা বলিবার পথ পরিষ্কৃত হয়। পাঠক দেখিবেন, এ মূর্ত্তিটি খর্ব্বকায়, মস্তকে কেশ উর্দ্ধোত্থিত; হস্তদ্বয়ে যাহা আছে, তাহার মধ্যে বামহস্তের বস্তুটি কপালই বটে; তবে দক্ষিণ হস্তের বস্তু কর্ত্রী কি না, ছবি দেখিয়া বলা কঠিন; তবে যাদুঘরে আমরা এই জাতীয় মূর্ত্তির হস্তে ঐরূপ প্রকারে যাহা ধৃত থাকে, তাহাকে সচরাচর কর্ত্রীকপাল বলিয়াই দেখিতে পাই।

যাহাই হউক, এ আলোচ্য মূর্ত্তিটিতে বরদ তারার অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় এই মাত্র; কিন্তু ইহাকে স্থিরভাবে সে নাম এখনও দিতে পারিতেছি না। উপস্থিত ইঁহাকে সাধারণ বৌদ্ধ তারা বলাই উচিত।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ।

প্রতীক্ষা।

১

এত নহে আর সাধের কানন,
ফুটেনা হেথায় ফুলদল,
পল্লবহারা তরু তলে বসি'
কেন ফেল মিছে আঁখিজল!
——"বসে আছি তা'র পথচেয়ে,
যদি ফিরে আসে—যাবে ছেয়ে
মুকুলে, নূতন পল্লবে, বন
পরশি তাহার পদতল।
ফুটিবে আবার ফুলদল।"

২

দিন হ'ল শেষ, শ্রান্ত পথিক,
সন্ধ্যাতিমির আসে ঘিরে,
শেষ খেয়া আজ চলে গেছে পারে
কেন তুমি একা নদীতীরে!
——"এসেছি তাহারি পথধরি'
যদি দিন শেষে খেয়াতরী
বাহি' সে আমারে নিয়ে যেতে পারে
আবার হেথায় আসে ফিরে'!
তাই বসে আছি নদীতীরে।"—

৩

নিশীথ রজনী, সুপ্ত জগৎ
লুপ্ত আঁধারে চারিধার;
নিভানো প্রদীপ লয়ে এ সময়ে
জেগে বসে' আছ কেন আর!
——"ঘুচায়ে নিবিড় যবনিকা,
যদি হাতে লয়ে দীপশিখা
নিভৃত নিশায় আসি দিয়ে যায়
জ্বালি' দীপখানি সে আবার!
আছি তাই পথ চাহি' তা'র।"—

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

পাষাণের কথা।

(৩)

শিল্পিগণের কার্য্য শেষ হইল। কতদিনে শেষ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। তোমাদিগের গণনা অনুসারে সে বোধ হয় দীর্ঘকাল। দিন আসিত, দিন যাইত, প্রতিদিন শ্রমজীবিগণ নগর হইতে আসিত, সন্ধ্যাসমাগমে আবার চলিয়া যাইত ; তখন রক্ষিগণ আমাদিগের রক্ষণের ভার লইত। এইরূপ ভাবে যে কতদিন গেল তাহা যদি বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে একটি রাজ্যের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা বলিয়া যাইতে পারিতাম। শিল্পিগণের কার্য্য শেষ হইল। ক্রমে শ্রমজীবিগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্ষোদিত পাষাণ পর্ণশালা হইতে বাহির হইয়া যথাস্থানে নীত হইল। তোমরা বলিয়া থাক যে, গুরুভার পাষাণ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবগণ কর্ত্তৃক কিরূপে ইতস্ততঃ চালিত হইত, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। পর্ণশালাসমূহ হইতে স্তূপ নির্ম্মাণের জন্য নির্ব্বাচিত ক্ষেত্র পর্য্যন্ত পঞ্চহস্ত বিস্তৃত পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। সে পথের ইষ্টক এখনও সে প্রান্তরে পড়িয়া আছে। যেরূপ শকটে আমরা পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে নগরে আসিয়াছিলাম, তক্ষণকার্য্য শেষ হইলে সেইরূপ শকটে আরোহণ করিয়াই আমরা স্তূপক্ষেত্রে নীত হইয়াছিলাম। শত শত শ্রমজীবীর সমবেত চেষ্টায় আমরা যথাস্থানে ন্যস্ত হইয়াছিলাম। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। সে কথা সকলের প্রিয় হইবে না। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে, প্রতিখণ্ড প্রস্তর যথাস্থানে ন্যস্ত হইলে আমরা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিলাম, তাহাই বলিয়া যাই। স্থপতিগণ যখন সৌধ নির্ম্মাণ করে, তখন তাহাদিগের কার্য্যে নয়নপ্রীতিকর কিছুই থাকে না, কিন্তু সমগ্র সৌধ নির্ম্মিত হইলে, তাহা সত্য সত্যই আনন্দবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রমধ্যে অর্দ্ধগোলকাকার স্তূপ নির্ম্মিত হইল ; সমান্তরালে, সমভাবে, সমান আকারের প্রস্তরখণ্ড যোজনা করিয়া শতহস্ত উচ্চ স্তূপ নির্ম্মিত হইল। শেষে তাহার কয়েকখণ্ড প্রস্তরমাত্র পড়িয়া ছিল ; আর অশ্মরাশি নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ সহস্র বর্ষকাল ব্যাপিয়া আপনাদের প্রয়োজনে লইয়া গিয়াছিল ; এতদিনে হয়ত সে কয়খানিও অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন সেই রক্তবর্ণ, মসৃণ, প্রস্তরে নির্ম্মিত অর্দ্ধগোলকাকার বিশাল স্তূপের পরিবর্ত্তে কি দেখিয়া আসিয়াছ? শ্রমজীবি-

গণের পদধূলি সঞ্চিত করিলে সেরূপ মৃৎপিণ্ড নির্ম্মিত হইতে পারিত। স্তূপের ক্ষেত্র বৃত্তাকার, সুতরাং তাহার বেষ্টনও বৃত্তাকার। স্তূপের পার্শ্বে পঞ্চহস্ত বিস্তৃত পরিক্রমণের পথ; এই পথও পূর্ণবৃত্তাকার ছিল। তির্য্যগভাবে যোজিত প্রস্তর-খণ্ডের সমাবেশ করিয়া এই পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরিক্রমণের পথ বলিলে সহজবোধগম্য হইবে না, কালে তীর্থযাত্রীর ভাষাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা এখনও পরিক্রমণ করিয়া থাকে, পূজ্যবক্তির বা বস্তুর অর্চ্চনার পূর্ব্বে বা পরে প্রদক্ষিণ করিবার প্রথা এখনও তীর্থযাত্রীদিগের মধ্যে বর্ত্তমান আছে; ইহাই পরিক্রমণ। পুণ্যার্থী পূর্ব্ব তোরণ দিয়া স্তূপবেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত, পরে পরিক্রমণের পথ তিনবার বা সাতবার অতিক্রম করিয়া পুনরায় স্তূপ অর্চ্চনা করিত। স্তূপ নির্ম্মাণের কাল হইতে মুসলমান-সমাগমকাল পর্য্যন্ত অর্চ্চনার এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। তাহার পর আর কেহ স্তূপের অর্চ্চনা করে নাই। সে অনেক পরের কথা। স্তূপবেষ্টনের পরে ত্রিহস্ত-পরিমিত স্থান ছিল, ইহার পরে বৃত্তাকার প্রথম স্তম্ভশ্রেণী। সমান্তরালে স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে চারিদিকে চারিটি তোরণ ছিল ও প্রতি তোরণের সম্মুখে এক একটি আবরণ স্থাপিত হইয়াছিল। এই আবরণ ও স্তম্ভ, সূচি ও আলম্বন-সজ্জায় নির্ম্মিত। স্তূপের পূর্ব্বদিকে যে তোরণ ছিল, তাহাই প্রধান তোরণ বলিয়া গণিত হইত; কারণ, স্তূপের পূর্ব্বদিকেই নগর অবস্থিত ছিল। দুইটি স্তম্ভের উপর তোরণ স্থাপিত; প্রতি স্তম্ভ একখণ্ড প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত অষ্টকোণ স্তম্ভচতুষ্টয়ের সমষ্টি। স্তম্ভশীর্ষে চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডের উপর পত্রপুষ্পপল্লবমধ্যে দুইটি উপবিষ্ট সিংহমূর্ত্তি। সিংহপৃষ্ঠের উপর ন্যস্ত পুষ্পমালাশোভিত চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডের উপর তোরণগুলি স্থাপিত। সমান্তরালে তিনটি তোরণ এইরূপ চতুষ্কোণ ব্যবধানের উপর স্থাপিত হইয়াছিল। সিংহচতুষ্টয়ের পৃষ্ঠস্থ চতুষ্কোণ শিলাখণ্ডের উপর প্রথম তোরণ। উহার উভয় পার্শ্ব গোলাকার; এই অংশে কুণ্ডলীকৃতপুচ্ছ এক একটি মকর মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। মকরের সম্মুখে, দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মন্দির ও বাম পার্শ্বে একটি স্তূপ। মন্দিরটি স্তম্ভশ্রেণীবেষ্টিত, চূড়ায় কেতন উড্ডীয়মান, মন্দিরমধ্যে পুষ্পাবৃত বেদী ও মন্দিরদ্বার পুষ্পমাল্য পরিশোভিত। স্তূপটি দুই শ্রেণীর স্তম্ভবেষ্টনের মধ্যে অবস্থিত ও স্তম্ভশ্রেণীদ্বয়ের ব্যবধানে পরিক্রমণের পথ। অন্তরের স্তম্ভবেষ্টনের মধ্যে স্তূপের উভয়পার্শ্বে সুদীর্ঘ কেতন উড্ডীয়মান। অর্দ্ধবৃত্তাকার স্তূপ পুষ্পমাল্যবিজড়িত। স্তূপের উভয় পার্শ্বে মকরের নাসিকাগ্র-ভাগে স্তম্ভবেষ্টনীর সম্মুখে প্রস্ফুটিত কমলসমূহ ক্ষোদিত। মন্দির ও স্তূপের

মধ্যভাগের স্থান হস্তিযূথদ্বারা পরিপূর্ণ, তোরণের মধ্যভাগে একটি বোধিদ্রুম ও উহার উভয় পার্শ্বে হস্তিদ্বয় অঙ্কিত। হস্তিগণ শুণ্ডে সনাল উৎপল লইয়া বোধিবৃক্ষ অর্চ্চনায় যাইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় তোরণের ব্যবধানে একাদশটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ, ইহার একটি অষ্টকোণ ও পরবর্ত্তীটি চতুষ্কোণ, চতুষ্কোণ স্তম্ভগুলির সম্মুখে যক্ষিণী ও অপ্সরোগণের মূর্ত্তি। প্রথম তোরণের উপর দুইখণ্ড চতুষ্কোণ প্রস্তর স্থাপন করিয়া তাহার উপরেই দ্বিতীয় তোরণ স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় তোরণের শেষাংশে পূর্ব্বের ন্যায় মকর, স্তূপ ও মন্দির ক্ষোদিত। এই তোরণের মধ্যভাগে বেদীর উপর স্থাপিত কয়েকটি পল্লব ও উহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া সিংহ। সিংহগণের ব্যবধানে প্রস্ফুটিত ও প্রস্ফুটনোন্মুখ পদ্মসমূহ অঙ্কিত। ইহার উপরে তৃতীয় তোরণ। ইহাও চতুষ্কোণ প্রস্তরদ্বয়ের উপর স্থাপিত এবং ইহার ও দ্বিতীয় তোরণের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় কতকগুলি ক্ষুদ্র স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলির কিছু বিশেষত্ব আছে,—যখন এই স্তম্ভগুলি ক্ষোদিত হয় তখন ভাস্করগণ শ্রেণীবিন্যাসে স্থান নির্দ্দেশের জন্য প্রতি স্তম্ভে বর্ণমালার এক একটি অক্ষর ক্ষোদিত করিয়াছিলেন। নাগরিকগণ যখন অসমাপ্ত ভাস্করকার্য্য দেখিতে আসিতেন, তখন তাঁহারা এই স্তম্ভগুলিতে নূতন প্রকারের অক্ষর দেখিয়া ভাস্করগণকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তদুত্তরে তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে, বহুকাল ভারতবর্ষে বাসহেতু তাঁহারা তদ্দেশ-প্রচলিত বর্ণমালা ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাবনিক বর্ণমালা লুপ্তপ্রায়। যে বর্ণমালা তাঁহারা ব্যবহার করিতেছেন, তাহা গান্ধার ও কপিশা প্রভৃতি দেশে প্রচলিত; উহা ভারতীয় বর্ণমালার অনুরূপ নহে। উহা দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে লিখিত হইয়া থাকে ও উহার লিখন-প্রণালী ভারতীয় বর্ণমালার লিখন-প্রণালী হইতে সরল। পারসিকগণ যখন ঐরাণ দেশীয় রাজগণের নেতৃত্বে উত্তরপশ্চিম প্রদেশসমূহ জয় করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের রাজকার্য্যা-লয়ে ব্যবহারপ্রযুক্ত এই বর্ণমালাও তত্তদ্দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসি-তেছে। গান্ধার, কপিশা প্রভৃতি প্রদেশেও ভারতীয় বর্ণমালার প্রচলন আছে, তবে তাহা পারসিক বর্ণমালার ন্যায় বহুল ভাবে প্রচলিত নহে। সর্ব্বোচ্চ তোরণের মধ্যভাগে প্রস্ফুটিত অর্দ্ধকমলের উপর নবপত্রিকা ও তদূর্দ্ধে ধর্ম্মচক্র প্রতিস্থাপিত, ইহার উভয় পার্শ্বে প্রস্ফুটিত শতদলের উপর ত্রিরত্ন। ত্রিরত্নের অন্তভাগ মৎস্য-পুচ্ছাকার ও তাহার পার্শ্বে সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে শ্বেতচ্ছত্র ও চামরদ্বয়। প্রতি তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বের স্তম্ভে রাজার বংশপরিচয় উৎকীর্ণ, "সুঙ্গরাজ্যে গার্গীপুত্র

বিশ্বদেবের পৌত্র; গৌপ্তীপুত্র অগরাজুর পুত্র বাৎসীপুত্র ধনভূতি এই তোরণ ও শিলাকর্ম্ম সম্পন্ন করাইলেন।”

পূর্ব্ব তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বের স্তম্ভে যে লিপি দেখিতে পাইতেছ, তদনুরূপ লিপি অপর তোরণত্রয়েও ছিল। দক্ষিণ তোরণের স্তম্ভদ্বয় হূণগণ অগ্নিসংযোগে বিনষ্ট করিয়াছে। সে কথাও বলিব, কিন্তু সে অনেক পরের কথা। অপর তোরণদ্বয়ের স্তম্ভগুলির ভগ্নাংশমাত্র তোমরা পাইয়াছ, কিন্তু তাহারাও এই পূর্ব্ব তোরণের ন্যায় উচ্চশীর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারাও ভাবিয়াছিল যে,তাহাদিগের উচ্চশীর্ষ আর কথনও মেদিনী স্পর্শ করিবে না। কিন্তু মুসলমানের দণ্ডপ্রহারে, হূণের অগ্নিদাহে ও ব্রাহ্মণগণের পুনরভ্যুত্থানে তাহারাও পুনরায় ধরাশায়ী হইতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্ব তোরণের পার্শ্বে যে স্তম্ভটি আছে, তাহা চাপদেবা-নাম্নী বিদিশাবাসী রেবতী-মিত্র নামক জনৈক শ্রেষ্ঠীর পত্নীর দান। রেবতীমিত্রের পত্নী প্রতি তোরণের সান্নিধ্যে একটি স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন। এইরূপে জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় স্তূপবেষ্টনীর স্তম্ভ ও সূচিগুলি নির্ম্মিত ও যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেকের নাম তদ্দত্ত দ্রব্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। আলম্বন কে দিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ পায় নাই, তবে নগরবাসিগণের কথোপকথন শ্রবণে জানিয়াছিলাম যে, আর্য্যাবর্ত্তবাসী জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি আলম্বন নির্ম্মাণের ও যথাস্থানে স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন; কিন্তু সুঙ্গরাজগণের ভয়ে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। চাপদেবা-প্রদত্ত স্তম্ভের একপার্শ্বে হস্তিত্রয়ের পৃষ্ঠে স্থাপিত পাদপীঠের উপর গরুড়ধ্বজধারী একটি অশ্বারোহীর মূর্ত্তি; অপর পার্শ্বে গণযুগলবাহিত পাদপীঠের উপর তিনটি হস্তি, ইহার মধ্যে মধ্যমটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রত্যেক হস্তীর স্কন্ধে অঙ্কুশহস্তে হস্তিপাল উপবিষ্ট। প্রত্যেক স্তম্ভের উপরিভাগে একটি অর্দ্ধবৃত্ত অঙ্কিত ও উহার মধ্যে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের অর্দ্ধভাগ। সাধারণতঃ তোরণের পার্শ্বে বেষ্টনের প্রথম স্তম্ভ এইরূপে চিত্রিত হইত। অপর স্তম্ভগুলিতে প্রত্যেক পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে একটি ও নিম্নে একটি অর্দ্ধবৃত্ত এবং মধ্যভাগে একটি পূর্ণবৃত্ত অঙ্কিত হইত; ইহার মধ্যে কোনটিতে চিত্র, কোনটিতে জাতক, কোনটিতে প্রস্ফুটিত বা প্রস্ফুটনোন্মুখ পদ্ম ক্ষোদিত হইয়াছিল। ঊর্দ্ধের অর্দ্ধবৃত্ত ও মধ্যস্থলের পূর্ণবৃত্তের অন্তঃস্থ স্থানে কোনটিতে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর নৃত্যশীলা অপ্সরা, কোনটিতে সনাল উৎপল, কোনটিতে সফল আম্রপল্লব, কোনটিতে বা পুষ্পমাল্য ক্ষোদিত হইয়াছিল। স্তম্ভযুগলের ব্যবধানে তিনটি করিয়া সূচি স্থাপিত হইয়াছিল, তিনটি সূচি প্রতি স্তম্ভযুগলকে পরস্পর সংলগ্ন করিত। স্তম্ভের পার্শ্ব সূচিবৎ বিদ্ধ

করিয়া থাকিত বলিয়া বোধ হয় ভাস্করগণ পাষাণময় বেষ্টনের এই অংশের "সূচি" নামকরণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সূচির পার্শ্বে এক একটি পূর্ণবৃত্ত অঙ্কিত থাকিত; সাধারণতঃ সূচিগাত্রে বৃত্তগুলিতে প্রস্ফুটিত পদ্ম ক্ষোদিত ছিল, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক সূচিতে নানাবিধ চিত্রও ছিল।

তাহার পর আলম্বন। উত্তরভারতবাসী কোন্ মহাপুরুষ যে এই আলম্বনের ব্যয় দিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই; কিন্তু আলম্বনটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল। স্তূপবেষ্টনীর সমুদায় স্তম্ভের ও তোরণের আবরণগুলির স্তম্ভসমূহের শীর্ষে আলম্বন স্থাপিত হইয়াছিল। আলম্বনের শীর্ষদেশ ঈষৎ গোল ও মসৃণ; প্রতি পার্শ্বে সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের অভ্যন্তরে, উপরে একশ্রেণী চতুর্ভুজ ও নিম্নে একশ্রেণী পুষ্পমাল্যে লম্বিত ঘণ্টা; এতদ্বয়ের অভ্যন্তরে কোন স্থানে হস্তী, কোন স্থানে বা মকরমুখ হইতে নির্গত মৃণাল বক্রগতিতে চলিয়া গিয়াছে, অবশিষ্টস্থান পত্রপুষ্প-ফল-সিংহ-হস্তি-বানর প্রভৃতি জীব ও নানাবিধ চিত্রে সুশোভিত। আলম্বনের কোনস্থানে প্রদাতার নাম নাই বটে, কিন্তু প্রতি চিত্রের নিম্নে বা উপরে উঁহার নাম অঙ্কিত আছে ও আলম্বন যে স্থানে শেষ হইয়াছে, সেই স্থানে একটি উপবিষ্ট সিংহমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

স্তূপ বা স্তূপবেষ্টনীর নির্ম্মাণকার্য্য যত দিন চলিতেছিল, ততদিন যবন ভাস্করগণ রাজপুরুষ, শ্রমজীবী বা নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহাকেও বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশের অধিকার দেন নাই। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে যবনজাতীয় দেশীয় ভাস্করগণ রাজসমীপে যাইয়া সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পরদিন প্রাতে নগর হইতে দলে দলে নাগরিক ও নাগরিকাগণ আসিয়া প্রান্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, কিন্তু রক্ষিগণ রাজাদেশে কাহাকেও বেষ্টনীর মধ্যে আসিতে দিল না। তখনও মঞ্চসমূহ অপসারিত হয় নাই; গুরুভার তোরণগুলি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিবার জন্য যে মৃৎস্তূপগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেগুলি তখনও দূরে নিক্ষিপ্ত করা হয় নাই; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সর্ব্ববিধ আকারের ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলি পরিক্রমণের পথ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু প্রবল বাসনার বলে সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় সেই বিশাল জনসঙ্ঘ বার বার আসিয়া মুষ্টিমেয় রক্ষিগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। হস্তিপৃষ্ঠে, রথে, উষ্ট্রে ও অশ্বে নাগরিকগণ আসিয়া বেষ্টনীর মধ্যভাগে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; জনতা বর্দ্ধিত হওয়ায় কোষ্ঠপালকে সংবাদ দিয়া রক্ষিসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইল। তখন হতাশ হইয়া সেই জনসঙ্ঘ বেষ্টনের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিল। উৎসাহে ও

দুর্দ্দমনীয় বাসনায় মত্ত হইয়া তাহারা তাহাদিগের বর্ষীয়ান্ ধর্ম্মযাজকের আগমন লক্ষ্য করে নাই। আজ তিনিও যেন নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া নগর হইতে স্তূপবেষ্টন পর্য্যন্ত দীর্ঘ পথ এই বিশাল জনতা ভেদ করিয়া আসিয়াছেন। আজ তাঁহার জন্য জনসমুদ্রের মধ্য দিয়া পথ উন্মুক্ত হয় নাই। তাঁহার ঈষন্নমিত দেহ দেখিয়া যদি একজন সসম্ভ্রমে অপসৃত হইয়াছে, তখনই দশজন দশদিক্ হইতে সেই স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাঁহার ক্ষীণ দেহ জনসঙ্ঘের পেষণে বহুবার পীড়িত হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া যদি কেহ সলজ্জভাবে সরিয়া যাইবার উদ্যম করিয়াছে, তখনই সে বুঝিয়াছে, সে আশা বৃথা ; কারণ, তাহার পরক্ষণেই অপরে সে স্থান অধিকৃত করিয়াছে। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হস্তী ও উষ্ট্রের আস্ফালন ও রথচক্রের ঘূর্ণন উপেক্ষা করিয়া ধূলিধূসরিত দেহে তিনি রক্ষি-গণের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; আসিয়া দেখিলেন, রাজা তখনও আইসেন নাই, যবনচতুষ্টয় তাঁহার জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনিও বেষ্টনীর বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহারই অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চতুরশ্বযোজিত রথ স্তূপবেষ্টনী পর্য্যন্ত আসিতে পথ পায় নাই, নগরদ্বার হইতে বাহির হইয়াই তাঁহাকে রথ হইতে অব-তরণ করিতে হইয়াছে। জনতার মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে সবিনয়ে বেষ্টনীর দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে ; অনুরোধ উপরোধ অতিক্রম করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় জনতাকে শান্ত করিয়া নগ্নপদে রাজা বেষ্টনীর প্রবেশপথে উপ-স্থিত হইলেন। তখন যবন শিল্পিগণ, বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক ও রাজা বেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বেষ্টনীর অন্তরালে কি হইল, তাহা বলিবার বোধ হয় আব-শ্যকতা নাই। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে রাজা দেখিলেন, চারিদিকে চারিটি তোরণ প্রায় আকাশ স্পর্শ করিয়াছে ; প্রতি তোরণগাত্রে তাঁহার নাম ও বংশপরিচয় ক্ষোদিত আছে ; প্রতি স্তম্ভে নাগ, যক্ষ ও কিন্নর প্রভৃতি উপদেবতাগণের মূর্ত্তি, সূচিতে জাতক বা অপর কোন চিত্র। তাঁহার সে সময়ে বিশেষ বাক্য-স্ফূর্ত্তি হয় নাই ; তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে শিল্পকীর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। শিল্পিগণ ও ধর্ম্মযাজক নীরবে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। প্রায় এক প্রহর কাল রাজা স্তম্ভের পর স্তম্ভ, সূচির পর সূচি, সমুদায় স্তূপ ও বেষ্টনী পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। পরে বাহিরে আসিয়া রাজা ধনভূতি ও ধর্ম্মযাজক বহুক্ষণ পরামর্শ করিলেন। ইতোমধ্যে জনসঙ্ঘে কোলাহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সম্মুখ পংক্তির নাগরিকগণ ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিল। রাজাদেশে রক্ষিগণ জনতা-

মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাজসমীপে আনয়ন করিল। তখন তাঁহারা সকলে সেই সূচিবৎ তীক্ষ্ণ শিলাসঙ্কুল অনাবৃত ভূমির উপর উপবেশন করিয়া ভবিষ্যতের কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ নাগরিক-গণকে রাজসমীপে আসিতে দেখিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইল; তাহারা বোধ হয় ভাবিল যে, রাজা হয়ত তাহাদিগের আশা পূর্ণ করিবার জন্য প্রধান প্রধান নাগরিক-গণকে সমীপে আহ্বান করিয়াছেন। কতদিন হইতে তাহারা শুনিয়া আসিয়াছে যে, উপাসক ও উপাসিকাগণের পূজার জন্য তথাগতের দেহাবশেষ আনীত হইবে; মথুরাবাসীরা স্বধর্ম্মীদিগের জন্য ভস্মাবশেষের এক কণা দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। কতদিন হইতে তাহারা শুনিয়া আসিতেছে যে, নগরপ্রান্তে গর্ভচৈত্য নির্ম্মিত হইবে, চৈত্যগর্ভে তথাগতের দেহাবশেষ রক্ষিত হইবে, সুদূর পর্ব্বত হইতে নির্ম্মাণ-কার্য্যের জন্য রক্তবর্ণ প্রস্তর আনীত হইবে, সুদূর উদ্যান, গান্ধার ও কপিশা হইতে যবন শিল্পী আসিয়া নূতন ও পুরাতন ভাস্কর্য্যমিশ্রিত নব প্রথায় স্তূপ-বেষ্টনী নির্ম্মাণ করিবে। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময় পর্ব্বতসানু হইতে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অশ্মরাশি সঞ্চিত হইয়াছে; উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে যবন শিল্পী এবং মগধ ও মথুরা হইতে দেশীয় ভাস্করগণ আনীত হইয়াছে; পাটলী-পুত্র হইতে বিদিশা পর্য্যন্ত ও গান্ধার হইতে আটবীক প্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে সদ্ধর্ম্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে গোপনে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে; স্তূপও নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অর্থপ্রদান করিয়াছে বা বিনা পারিশ্রমিকে পরিশ্রম করিয়াছে, অথচ তাহারা স্তূপ দেখিতে পাইবে না বা বেষ্ট-নীর অভ্যন্তরে যাইতে পারিবে না, ইহা তাহাদিগের নিকট অবিচার বলিয়া বোধ হইল। পরামর্শান্তে রাজসমীপে আহূত নাগরিকগণ জনসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, সপ্তাহান্তে স্তূপগর্ভে তথাগতের শরীর নিহিত হইবে, সেই দিন নগরে অষ্টপ্রহরব্যাপী উৎসব হইবে ও সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে সকলেই বেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবেশের ও অর্চ্চনার অধিকার লাভ করিবে। তাঁহারা জানাইলেন যে, রাজা তখনও ব্রাহ্মণগণের উপদ্রবের আশঙ্কা করেন; কারণ, ইতোমধ্যে তাহারা দুই একবার বিপৎপাতের চেষ্টা করিয়াছে; সুতরাং, অসম্বদ্ধ জনপ্রবাহ বেষ্টনীর অভ্যন্তরে ছাড়িয়া দিলে তাহারা অবসর পাইয়া নূতন কি উৎপাত করিবে, তাহা বলা যায় না। বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা সকলকে বেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবেশলাভের অনুমতি দিবার বিরোধী হইয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিলেন যে, অপর সকলের ন্যায় তাঁহারাও স্তূপ দেখিবার আশায় নগর

পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহারাও প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তখন সেই বিশাল জনসঙ্ঘ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শুনিলাম, সপ্তাহান্তে উৎসব হইবে। তক্ষণের ক্লেশ ভুলিয়া যাইলাম; উৎসব কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য বড়ই আগ্রহ জন্মিল। মনুষ্যজাতিকে অল্পদিন দেখিতেছি, যতই দেখিতেছি, বিস্ময় ততই বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই কৃষ্ণবর্ণ জাতি কোথায় গেল, সেই উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ জাতি কোথায় গেল, শ্বেতকৃষ্ণমিশ্রিত অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকার জাতি কোথা হইতে আসিল? এ সকল কথার মীমাংসা বোধ হয় আজও হয় নাই, কখনও হইবে কিনা সন্দেহ। তবে যদি আমার ন্যায় অতীতের সাক্ষী আরও কেহ আইসে, আমা অপেক্ষা প্রাচীন কথার অবতারণা যদি কেহ করে, অথবা মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইতে তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহে লিপ্ত অপর কেহ যদি নিজের বাক্‌শক্তি পরিস্ফুটিত করিবার চেষ্টায় সফলকাম হয়, তবেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। তখনও মনুষ্যজাতির উৎসব দেখি নাই। নূতন দৃশ্য দেখিবার উৎসাহ ও দৃষ্ট সমৃদ্ধির স্মৃতি এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, সে উৎসবের চিত্র অদ্যাপি আমার মনে পরিস্ফুট আছে। নূতন বেশে, নূতন চিত্রে শোভিত হইয়া তক্ষকের শাণিত অস্ত্রাঘাতের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণাও বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সার্থকতা।

আমার বেদনা স্মরি' যদি তুমি ব্যাথা পাও,
সে বেদনা সার্থক আমার;
ধন্য আমি, মম দুঃখে যদি তব আঁখি' পরে
করুণায় ঝরে আঁখিধার।
উচ্চ আমি—পেয়ে তব করুণ সান্ত্বনাবাণী
পেয়ে তব স্নেহ—ভালবাসা।
তোমারে হেরিয়া আমি ভুলে যাই যে বেদনা
বক্ষোমাঝে বাঁধিয়াছে বাসা।

শ্রীদেবীরাণী ঘোষ।

মৃত্যু-মিলন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

শোকাতুরা।

—•—

বিচারালয়ে বিচারকার্য্য শেষ করিয়া ফিরিবার সময় রাজা বিষণ্ণভাবে শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, "শঙ্কর সিংহ, আমার পরীক্ষার দিন আসিয়াছে।"

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "আপনি অকারণে চিন্তিত হইতেছেন। যদি পরীক্ষার দিন আসিয়াই থাকে, তাহাতে আপনার আশঙ্কার কারণ নাই। আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন।"

"কি জানি। মানব-হৃদয় দুর্ব্বল,—তাই পদে পদে আশঙ্কা।"

সেই দিন রাজা সংবাদ পাইয়াছিলেন, নগরে বিসূচিকা দেখা দিয়াছে, বাজারে তাহার প্রথম প্রকাশেই বহু লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নের পর নগরপালকে ও অন্যান্য আবশ্যক লোকদিগকে লইয়া রাজা ব্যাধিকেন্দ্র বাজারে গমন করিলেন। রবিকর তপ্ত জ্বলদঙ্গারের মত উষ্ণ; পবন অগ্নিশ্বাসী। রাজার সে দিকে মন ছিল না।

বাজারে উপস্থিত হইয়া রাজা অধিবাসীদিগকে ডাকাইয়া সাহস দিলেন—সান্ত্বনা দিলেন; তাহাদিগকে সাবধানে থাকিতে বলিলেন; পথ ও গৃহ পরিষ্কৃত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পর রাজা বলিলেন, "যে সকল গৃহে বিসূচিকা দেখা দিয়াছে, আমি সে সকল গৃহে যাইব।" যে পীড়ায় আত্মীয়স্বজনগণ পীড়িতের নিকটে যাইতে শঙ্কিত হয়, রাজা সেই পীড়াগ্রস্তদিগের গৃহে যাইবেন শুনিয়া জনতা বিস্মিত হইল;—সকলের শ্রদ্ধার উৎস উৎসারিত হইল।

রাজ-বৈদ্য বলিলেন, "আপনার যাইবার প্রয়োজন কি?"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "আমার যাওয়া বিশেষ আবশ্যক। আমার জন্য শঙ্কিত হইতেছেন? রাজা অমর। সময় সময় রাজকর্ত্তব্যসমষ্টির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির তিরোভাব হয়; তাহাতে রাজার মৃত্যু হয় না। আজ প্রজাবৃন্দ ব্যাধি-ভয়ে ভীত,—এ অবস্থায় আমার প্রাণের ভয় করিবার অবকাশ কোথায়?"

রাজ-বৈদ্য আর কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

নগরপাল পথ দেখাইয়া চলিলেন—রাজা তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

সেদিন রাজা যেরূপ গৃহে গমন করিলেন, প্রবল-কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্ররোচনা ও উত্তেজনা ব্যতীত তিনি সেরূপ গৃহে মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারিতেন না।'

সে দিন মলিন, জীর্ণ শয্যার পার্শ্বে রাজার মূর্ত্তি দেখিয়া কত ব্যাধিতের অন্তিম-মুহূর্ত্ত আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল! একজন বৃদ্ধ ব্যাধিত অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "এ মৃত্যুও সুখের। দেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া এ মৃত্যু সাধনার ফল।" রাজাকে যাতনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখিয়া সে দিন কৃতজ্ঞতায় কত কোটরগত নয়ন হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল!

তাহার পর রাজাকে আরও দুষ্কর কার্য্য করিতে হইল। কত গৃহে পুত্র-শোকাতুরা জননীর, ভ্রাতৃহীনা ভগিনীর, পতিগতপ্রাণা বিধবার, পিতৃহীন সন্তানের আকুল ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছিল। তাহাদের সে শোকে সান্ত্বনাদান দুষ্কর কার্য্য। রাজা সে দুষ্কর কার্য্যও করিলেন। সংস্কারবশে লোক রাজাকে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিত; তাঁহার লোকরঞ্জন কার্য্যে ও সে দিনের ব্যবহারে সেই ভক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাই রাজার সান্ত্বনাবাণী ব্যথিতের শোকবিক্ষত হৃদয়ে স্নিগ্ধ ভেষজের মত কার্য্য করিল।

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে প্রাসাদের একজন কর্ম্মচারী মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে কি বলিয়া যাইলেন।

মধ্যরাত্রি অতীত হইবার পর একজনমাত্র প্রহরী সঙ্গে লইয়া রাজা পদব্রজে মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বব্যবস্থামত প্রধান পুরোহিত দ্বারে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আর সকলকে বিদায় দিয়াছিলেন। রাজা প্রহরীকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া পুরোহিতের সহিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। প্রাঙ্গণ জনশূন্য; প্রাঙ্গণে বিরাট দেউলের ছায়া বিরাটতর দেখাইতেছে। কি অনাহত নীরবতা! উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

রাজ্যের কোন বিপদে দেবতাকে পূজা করা কৌলিক প্রথা। আজ রাজা সেই প্রাচীন কৌলিক প্রথা পালন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি দীন ভাবে দেবদ্বারে হৃদয়ের প্রার্থনা লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দীন ভাবে দেবতার চরণে প্রার্থনা জানাইলেন;—সে প্রার্থনা কেবল প্রজার মঙ্গল-কামনা।

রাজা যখন মন্দির হইতে বাহির হইলেন তখন নীলাম্বরে তারকার দীপ্ত দ্যুতি মলিন হইয়া আসিতেছে। মন্দির হইতে রাজা প্রাসাদে ফিরিলেন।

রাজা যখন প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, তখন দ্বারে প্রহরী ব্যতীত আর সকলেই নিদ্রিত বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু অন্তঃপুরে একজন রমণী তখনও জাগিয়া ছিলেন,—তাঁহার বেপমান হৃদয় নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইতেছিল। তাঁহার চিন্তার অন্ত নাই। রাণী তখনও বসিয়া ভাবিতেছিলেন। রাজার পদশব্দে তিনি চাহিয়া দেখিলেন। রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। কক্ষসম্মুখবর্ত্তী অলিন্দে পুষ্পিত তরুলতার অন্তরালে সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল—কারণ, কক্ষ আলোকোজ্জ্বল, অলিন্দ মৃদু আলোকে আলোকিত। রাজা শ্রান্তভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। রাণী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সেদিন ও রাজা পূর্ব্বদিনের মত মধ্যাহ্নের পর নগর-পরিদর্শনে বাহির হইলেন। ব্যাধি নগর মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। রাজাকে নানা দিকে—নানা পল্লীতে যাইতে হইল। তাঁহার যেন শ্রান্তি নাই। তাঁহার সঙ্গীরা শ্রান্ত হইয়া পড়িল--বিরক্ত হইতে লাগিল, কেবল মুখ ফুটিয়া বিরক্তিপ্রকাশ করিতে পারিল না। নগরের লোক বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় মূক হইয়া রহিল। রাজা পল্লীর পর পল্লীতে গমন করিয়া বাধিবিষদুষ্ট গৃহে গৃহে যাইতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর যখন তিনি প্রাসাদমুখগামী হইতেছেন তখন সংবাদ আসিল, মন্দিরের নিকটে—পুরোহিতপল্লীতে একটি শবের সৎকার হইতেছে না। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা জানিলেন, সে গৃহে একটি বালিকা ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাস করিত। বালক প্রত্যুষে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মধ্যাহ্নেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার ভগিনী সেই শব জড়াইয়া কাঁদিতেছে। আত্মীয়স্বজনগণ বহু চেষ্টায় তাহাকে সরাইতে সমর্থ হয় নাই—বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারে নাই। সে কিছুতেই ভ্রাতার শবদেহ ত্যাগ করিতেছে না। শুনিয়া রাজার নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালিকার আর কেহ নাই?"

সংবাদদাতা বলিল, "তাহার পিতা তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। তীর্থযাত্রার পূর্ব্বেও তিনি একরূপ সংসারত্যাগী ছিলেন।"

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার কথা বলিতেছ?"

"মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতের।"

রাজা বিস্মিত নয়নে মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন।

মন্ত্রী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালিকা কি পার্ব্বতী?"

আগন্তুক বলিল "হাঁ।"

মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন, "পুরোহিত মহাশয় তীর্থদর্শন করিতে যাইয়া একবার কয়মাস হরিদ্বারে বাস করেন। তথায় কন্যার জন্ম হয়; তাই তিনি তাহার পার্ব্বতী নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কন্যাকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছেন। এই মাতৃহীনা কন্যার গুণের তুলনা নাই। দীন, দুঃখী, ব্যাধিত, অসহায়—ইহাদিগের সেবা ও উপকার করাই তাহার ব্রত। পুরোহিত মহাশয় সর্ব্বদাই এই কার্য্যে তাহাকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন।"

আগন্তুক বলিল, "লোকে তাহাকে 'দীন-জননী' বলিয়া থাকে।"

রাজা কি ভাবিতেছিলেন।

রাজা নগরপালকে বলিলেন, "আমি পুরোহিত মহাশয়ের গৃহে যাইব।"

নগরপাল পথ দেখাইয়া চলিলেন।

ক্রমে রাজা বৃদ্ধ পুরোহিতের গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। পুরোহিত-পল্লী মন্দিরের পশ্চাতে অবস্থিত, বহুদিনের। পথ সঙ্কীর্ণ,—দুই পার্শ্বে গৃহগুলি উচ্চ; বহুতল। বৃদ্ধ পুরোহিতের গৃহ পুরাতন। দ্বারের সম্মুখে বিশদবসন কয়জন আত্মীয় দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজা আসিলে আরও অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথা অবগত হইলেন। তাঁহারা প্রথম সংবাদদাতার কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। তাঁহারা বালকের শব দেহ আনিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন,—তাহার ভগিনী সেই দেহ জড়াইয়া রহিয়াছে। শেষে তাঁহারা নিরুপায় হইয়া রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন।

রাজা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিম্নতল অন্ধকার। একজন একটি বর্ত্তিকা জ্বালিয়া লইয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন—রাজা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সকলে দ্বিতলে উপনীত হইলেন। অলিন্দ অতিক্রম করিয়া পথপ্রদর্শক একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজা সম্মুখে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

কক্ষের এক পার্শ্বে একটি দীপ মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে। সেই দীপের ক্ষীণ আলোক হর্ম্মতলে শুভ্র শয্যায় শয়ান বালকের মৃত্যু-সুপ্ত আননে পতিত হইয়াছে; আর তাহারই পার্শ্বে তাহার ভগিনী,—সেই দেহ জড়াইয়া আছে,—মধ্যে মধ্যে মৃত ভ্রাতার মরণ-মুদিত নয়নে, মৃত্যু-শীতল কপোলে চুম্বনদান করিতেছে। সে যেন বাহ্যজ্ঞানহীনা।

রাজা সেই শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

তিনি ধীরে ধীরে বালিকাকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর সহানুভূতি-সিক্ত ;—তাঁহার সান্ত্বনা হৃদয়স্পর্শিনী। শোকাতুরাকে এমন করিয়া আর কেহ বুঝায় নাই,—এমন করিয়া আর কেহ সান্ত্বনা দেয় নাই,—এমন সহানুভূতি আর কেহ দেখায় নাই। সে জ্ঞানহীনা—বোধহীনা নহে ; কেবল শোকের আতিশয্যে বিবশা হইয়াছিল। সে সব বুঝিতে লাগিল ; আপনার অবস্থা উপলব্ধি করিতে লাগিল। এতক্ষণ সে কাঁদিতে পারে নাই ; এখন তাহার নয়নে শান্তি-সলিল দেখা দিল। সে কাঁদিতে লাগিল।

রাজা কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস অপগত না হইলে শোকার্ত্তের হৃদয় সান্ত্বনায় শীতল হয় না। তাহার পর রাজা আবার বালিকাকে বুঝাইলেন। তাহার পর তিনি বালকের দেহ লইতে চেষ্টা করিলেন। বালিকা তখনও সে দেহ জড়াইয়া আছে। রাজা তাহাকে বলিলেন, "বালক একা তোমারই নহে। এ শোক কেবল তোমার নহে। আমি তোমার রাজা ;—আমিও আজ শোকার্ত্ত। বালককে আমার কাছে দাও।"

বালিকা আর কিছু বলিল না।

রাজা সযত্নে বালকের দেহ তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—•—

সান্ত্বনা।

—:০:—

রাজা প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুরোহিতের আত্মীয়দিগকে ডাকিয়া বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি ভাবিলেন, এই অসহায়ার কি উপায় করা যাইতে পারে? বৃদ্ধ পুরোহিত তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন ; তিনি কোথায় ছিলেন, তাহা কেহ জানিত না—বালিকাও জানিত না। কাযেই তাঁহাকে সংবাদ দিবার কোনরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব। আত্মীয়গণ রাজার অনুরোধে দুই চারি দিন বালিকাকে যত্ন করিতে পারেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের সে যত্ন বহুদিনস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ এ অবস্থায় তাহার যেরূপ সান্ত্বনা

ও শুশ্রূষা আবশ্যক—তাহার কি হইবে? রাজা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

সে দিন শয্যায় শয়ন করিয়া রাজা সেই কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন-সমক্ষে সেই করুণ দৃশ্য বিরাজিত,—ভগিনী ভ্রাতার শবদেহ জড়াইয়া আছে—জীবন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; সে দৃশ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী স্নেহ সপ্রকাশ। জীবন যাহাদিগকে একত্র আনিয়াছিল, মৃত্যু তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসে বালিকা তখনও ভ্রাতার দেহ জড়াইয়া ছিল। হায়—দুরাশা! মৃত্যু যাহাকে অপনার করিয়া লয়, সে যে সর্ব্ববন্ধনমুক্ত! শোকাতুরার সেই অশ্রুসিক্ত মূর্ত্তি কেবল রাজার মনে পড়িতে লাগিল।

প্রভাতে রাজা শঙ্করসিংহকে সকল কথা বলিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

শঙ্করসিংহ বলিলেন, "আপনি কি কিছু স্থির করিয়াছেন?"

"না। আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

"তাহাকে প্রাসাদে আনিলে হয় না?"

রাজা শঙ্কর সিংহের দিকে চাহিয়া ম্লান হাসি হাসিলেন। শঙ্কর সিংহ তাহার অর্থ বুঝিলেন,—"তুমি কি সব জান না?"

শঙ্কর সিংহ যেন কিছু লজ্জিত হইলেন। তিনি রাজার বেদনার কথা জানিতেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "উমাকে বলিলে সে যত্ন করিবে। যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহাকে রাণীর অনুমতি প্রার্থনা করিতে বলি।"

রাজা বিষণ্ণভাবে মস্তক সঞ্চালন করিলেন; বলিলেন, "উমা অনুমতি চাহিলে অবশ্য অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে দয়া হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত হয় না, সে দয়া অপমান। আমি বৃদ্ধ পুরোহিতের কন্যা—শোকাতুরা বালিকাকে সে দয়ার ভাগী করিতে পারিব না। তাহাকে সে অপমান হইতে রক্ষা করাই রাজার কর্ত্তব্য।"

শঙ্করসিংহ আর কোন কথা বলিলেন না। তিনি আর কি বলিবেন? রাজার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল।

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না। রাজা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি এমনই তন্ময়ভাবে চিন্তাবিষ্ট ছিলেন যে, শঙ্করসিংহের কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলেন। শঙ্করসিংহ কহিলেন, "যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে বালিকাকে পুরোহিত মহাশয়ের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত আমার গৃহে লইয়া রাখিবার প্রস্তাব করি।"

রাজা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "কাহার নিকট প্রস্তাব করা যাইবে ?"

"এখন তাহার আত্মীয়দিগের নিকটই প্রস্তাব করিয়া দেখিতে হয়।"

"আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। বালিকা এ প্রস্তাবে সম্মত হইবে কি না, জানি না। তাহার আত্মীয়গণ কি কোনরূপ দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত হইবেন ? আমার এখন কর্ত্তব্য কি ?"

শঙ্করসিংহ ভাবিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাজা বলিলেন, "চল, উভয়ে একবার পুরোহিতের গৃহে যাই। তথায় অবস্থা বুঝিয়া যে ব্যবস্থা হয়, করা যাইবে।"

রাজা প্রতিহারকে ডাকিয়া তাঁহার জন্য ও শঙ্করসিংহের জন্য দুইটি অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন।

প্রতিহার জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে কয়জন রক্ষী যাইবে ?"

রাজা বলিলেন, "সঙ্গে কাহারও যাইবার প্রয়োজন নাই।"

প্রতিহার চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে প্রতিহার ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, অশ্ব সজ্জিত হইয়াছে, প্রাঙ্গণে উপস্থিত।

রাজা প্রস্তুত হইয়া ছিলেন; এই কথা শুনিয়া প্রাঙ্গণমুখগামী হইলেন। শঙ্করসিংহ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

উভয়ে অশ্বারোহণে পুরোহিতপল্লীতে চলিলেন।

অশ্বদ্বয় বৃদ্ধ পুরোহিতের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলে নানা গৃহ হইতে অনেকে সেই গৃহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বালিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার আগ্রহ দেখিয়া সকলেই এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন সকলেই বালিকার দুঃখে কাতর। কিন্তু তাহা না হইলে, তাঁহারা সেই শোকাতুরার, শুশ্রূষা করা দূরে থাকুক, সংবাদও লইতেন কি না সন্দেহ। রাজা পূর্ব্বদিন যাঁহাদিগের উপর বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসার ফলে অবগত হইলেন, বালিকা এখন শান্ত হইয়াছে; গত রাত্রিতে তাহার শুশ্রূষার কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই, বরং রাজার অনুগ্রহভাজন হইবার আশায় এত অধিক আত্মীয় আত্মীয়তা দেখাইয়াছেন যে, বালিকা বোধ হয় সান্ত্বনার ও শুশ্রূষার আধিক্যে ও অত্যাচারে বিব্রত হইয়াছে।

রাজা পল্লীবৃদ্ধদিগকে বলিলেন, "বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় কোথায়, কেহ

জানে না। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত তাঁহার কন্যার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ?"

কেহ তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কেহ বা তাহাকে নিজগৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন।

সব শুনিয়া রাজা বলিলেন, "এ বিষয়ে বালিকাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি ?"

সে কথা শুনিয়া এ উহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। শেষে একজন বৃদ্ধ বলিলেন, "রাজন্, পার্ব্বতীর পিতার কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। তিনি কোন বিষয়ে কাহারও সহিত পরামর্শ করেন না। তিনি অনেক সময় অপ্রিয় সত্য বলিয়া লোকের বিরাগভাজন হয়েন। তিনি কখন কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়েন নাই। তিনি কাহারও সাহায্য লইতে অনিচ্ছুক। তিনি যাইবার সময় কন্যাকে কিছু বলিয়া গিয়াছেন কি না—তাহা আমরা কেহ বলিতে পারি না। এ অবস্থায় এ বিষয়ে বালিকাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবার, তাহা আপনি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল হয়।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালিকা কি এরূপ বিষয়ে অপরকে কিছু বলিবার মত শান্ত হইয়াছে ?"

"হাঁ।"

বৃদ্ধ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজাকে জানাইলেন, বালিকা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত।

বৃদ্ধ পথ দেখাইয়া চলিলেন। শঙ্করসিংহ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। আর যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ বা গৃহদ্বারেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, কেহ বা গৃহপ্রাঙ্গণে, কেহ বা সোপানমূলে দাঁড়াইয়া পরস্পর নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

রাজা পূর্ব্বরাত্রিতে যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে—পরিচ্ছন্ন সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া অলিন্দে উপনীত হইলেন।

পার্ব্বতী কক্ষমধ্য হইতে একখানি আসন আনিয়া অলিন্দে বিছাইয়া দিল ; রাজাকে বলিল,"দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে অন্য আসনের অভাব। আপনি যেরূপ দয়া দেখাইয়াছেন,তাহাতেই আমি আপনাকে উপবেশনের অনুরোধ করিতে সাহস করিতেছি।"

রাজা উপবেশন করিয়া বলিলেন, "তোমার কুণ্ঠিত হইবার কোনও কারণ নাই। পুরোহিতগৃহে আশীর্ব্বাদই আমাদের পরম লাভ।"

রাজা মুখ তুলিয়া দেখিলেন, দীপালোকে গত নিশায় যাহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সে কিশোরী। যৌবনের প্রথম জলোচ্ছ্বাস কেবল তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেহে সম্পূর্ণতার ও লাবণ্যের সঞ্চার করিতেছে; কিন্তু সে জলোচ্ছ্বাস এখনও তাহার বালিকা-হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার বাক্যে ও ব্যবহারে বালসুলভ সরলতা ও সঙ্কোচহীনতা সপ্রকাশ। পার্ব্বতী শান্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তরের শোক কেবল সংযত হইয়াছে—অপনীত হয় নাই। তাহার মুখ-ভাব দেখিয়া বর্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ষার সজলজলদজালাবৃত, স্বচ্ছান্ধকার আকাশের কথা মনে হয়। সে মুখভাব বিষাদে তেমনই স্বচ্ছান্ধকার; কোমলতায় তেমনই স্নিগ্ধমধুর; আপনাতে আপনি তেমনই সম্পূর্ণ; পূর্ণতায় তেমনই গৌরবান্বিত। রাজার পক্ষে সে এক নূতন অনুভূতি। তিনি পার্ব্বতীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, পুরোহিতের পুণ্য-প্রভাব ব্যতীত অক্ষুণ্ণ সরলতার এ প্রতিমা এমন পুণ্যজ্যোতিসমুজ্জ্বল থাকিতে পারিত না।

রাজা বলিলেন, "তুমি হৃদয় শান্ত করিয়াছ দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখ হইয়াছি।"

পার্ব্বতী বলিল, "রাজন্, পিতা উপদেশ দিয়াছেন, চিত্তবৃত্তি সংযত করিবে—ভাবের প্রভাবে আপনার হৃদয় চঞ্চল হইতে দিবে না। কিন্তু মানুষ অনেক সময় আপনাকে আপনি সংযত রাখিতে পারে না।"

"সত্য। তিনি জ্ঞানগাম্ভীর্য্যে অবিচলিত। কয়জন তাঁহার মত হইতে পারে?"

তাহার পর রাজা বলিলেন, "তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য আমি তাঁহার সন্ধান লইয়াছি। কেহই সন্ধান দিতে পারেন না। তিনি না আসা পর্য্যন্ত তুমি কি করিবে?"

পার্ব্বতী বলিল, "তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যই করিব। কেবল যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য মৃত্যু আর করিতে দিবে না, তাহাই অসমাপ্ত রহিবে।" বলিতে বলিতে পার্ব্বতীর কণ্ঠ বাষ্পোচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হইয়া আসিল।

রাজা কিছুক্ষণ মৌন রহিলেন।—তাঁহারও মুখে কথা সরিতেছিল না। তাহার পর তিনি বলিলেন, "তুমি একাকিনী এই গৃহে থাকিবে?"

পার্ব্বতী বলিল, "অন্যথা পিতার আদেশ লঙ্ঘন করা হইবে।"

"শঙ্করসিংহের পিতা পুরোহিত মহাশয়ের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। যদি প্রাসাদে যাইতে তোমার ইচ্ছা না হয়, শঙ্করসিংহের গৃহে যাইলে হয় না? তথায় তোমার যত্ন ও শুশ্রূষা হইবে; তোমার পক্ষে এখন দুই-ই আবশ্যক। তাহার পর পুরোহিত মহাশয় আসিয়া যেরূপ ব্যবস্থা হয়, করিবেন।"

"আমার জন্য কিছুই প্রয়োজন নাই। বিশেষ পিতার অনুমতি ব্যতীত গৃহত্যাগ আমার পক্ষে অসম্ভব। এ বিষয়ে আমাদের উভয়ের প্রতি পিতার বিশেষ আদেশ ছিল। একজন সে অনুমতির অতীত হইয়াছে। আমি—" পার্ব্বতীর নয়ন দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাজা তাহাকে সে অপ্রিয় প্রসঙ্গ ভুলাইবার জন্য বলিলেন, "আমাকে তোমার জন্য আর কি করিতে বল?"

পার্ব্বতী বলিল, "আমার কিছুই প্রয়োজন নাই।"

"কিছুই না?"

"আমার জন্য কিছুই না।"

"আর কাহারও জন্য কি কিছু করা প্রয়োজন?"

"আপনি স্বয়ং প্রজার দুঃখ দেখিয়াছেন। রাজ্যের ব্যাধিত, রুগ্ন, অসহায়—যদি সম্ভব হয় ইহাদের জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপিত করিলে আমার শোকতপ্ত হৃদয় কিছু শান্তি পাইবে।"

"তাহাই হইবে।"

পার্ব্বতীর নয়ন আনন্দে উজ্জ্বল ও কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

সুখ-শয্যা।

—::•::—

সে শয্যা সুখের নহে প্রেম যা'র,'পরে
আপনার স্নিগ্ধ তনু বিস্তারে প্রথম;
বিরহের তপ্তশ্বাস উষ্ণ যবে করে
তখন সে প্রেম-শয্যা হয় মনোরম।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

আজমীর।

এদেশে ইংরাজের আগমনকালে ইংরাজের অন্যতম সহায় কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি বলিয়াছিলেন :—

কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ'মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ।

ইংরাজের আগমনের শতবর্ষমধ্যে ভারতে যে বাষ্পীয়রথের আবির্ভাব হইয়াছে তাহাতে "ছ'মাসের পথ" ছয় দিনে অতিক্রম করা একান্তই সহজসাধ্য হইয়াছে। ভারতে এই রেলপথ-বিস্তার ইংরাজের বিরাট কীর্ত্তি। ইহার কৃপায় পঙ্গু ও অনায়াসে পর্ব্বতলঙ্ঘন করিতে পারে। দেশদর্শনের এমন সুযোগ পরিত্যাগ করাই দুঃসাধ্য। আমি রাজপুতানা-দর্শনে ইচ্ছুক হইয়া যাত্রা করিলাম। রাজপুতানায় যাইতে হইলে দিল্লী বা টুণ্ডলা হইয়া যাইতে হয়। দিল্লীর পথে সুবিধা এই যে, যানপরিবর্ত্তন করিতে হয় না। কিন্তু তাজমহল দেখিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমি টুণ্ডলায় নামিয়া আগ্রায় গমন করিলাম।

আগ্রায় একটি সরাইয়ে উঠিয়া পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করিয়া শাজাহানের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের পূত স্মৃতি দেখিয়া আসিলাম। তাহার পর আগ্রা ত্যাগ করিয়া পরদিন প্রাতে রাজপুতানা-মালোয়া রেলপথে ভরতপুরে উপনীত হইলাম। এই ভরতপুর হইতেই রাজপুতানার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যতদূর দৃষ্টি চলে—অনুর্ব্বর প্রান্তর; মধ্যে মধ্যে দু' একটি বাবলা গাছ সেই রসহীন ভূমি হইতে কোনরূপে রস সংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। বঙ্গদেশের শ্যামায়মান বনানীর সৌন্দর্য্য বা সিন্ধুকূলের তালীবন-শ্যাম শোভা এ প্রদেশে নাই। প্রান্তর-দৃশ্য রুদ্ধ করিয়া চারিদিকে আরাবলী গিরিমালার অম্বরচুম্বী চূড়া রবিকরে বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত। এইরূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়া পরদিন প্রভাতে আজমীরে উপনীত হইলাম।

আজমীর ইংরাজাধিকৃত রাজপুতানার রাজধানী; চীফ কমিশনারের শাসনাধীন। রাজপুতানার অবশিষ্ট অংশ বহু করদরাজ্যে বিভক্ত। তন্মধ্যে যোধপুর, জয়পুর, আলোয়ার, বিকানীর, উদয়পুর, কোটা, বুন্দি প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। আজমীর চারিদিকে আরাবলী গিরিমালায় বেষ্টিত। উপত্যকায় নগর অবস্থিত। আজমীরের

পশ্চিমে তারাগড়। প্রবাদ, ১৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা অজ প্রথমে পর্ব্বতের উপর ও পরে উপত্যকায় রাজধানী সংস্থাপিত করেন। কথিত আছে, তাঁহার নাম অনুসারে আজমীরের ও চৌহানবংশীয় পৃথীরাজার প্রধানা মহিষী তারা বাইএর নাম অনুসারে তারাগড়ের নামকরণ হয়। পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে আজমীরের উচ্চতা ১৪০০ ফিট। নগরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ একার। এখন পর্ব্বতের উপর ইংরাজ সৈনিকদিগের স্বাস্থ্য-নিবাস সংস্থাপিত হইয়াছে। পর্ব্বতে উঠিবার কয়টি প্রশস্ত পথ আছে। তন্মধ্যে "ত্রিকোনিয়া গেট" দিয়া যাইবার পথে "আড়াই দিনকা ঝোপড়া" দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা পূর্ব্বে একটি বৃহৎ জৈন মন্দির ছিল। আলাউদ্দীন খিলিজী ইহাকে মস্‌জেদে পরিণত করেন। ইহার নামকরণ সম্বন্ধে মতান্তর আছে। কেহ বলেন, ইহা আড়াই দিনে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কেহ বলেন, হিন্দু-যবন-সংগ্রামে হিন্দুরা পরাজিত হইলে মুসলমানগণ আড়াই দিনে মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। দুই মতের কোন্‌টি সত্য, স্থির করা দুষ্কর। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্দিরের প্রায় সবই বর্ত্তমান, কেবল মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। খণ্ডিত-হস্ত-পদ-নাসিকা অনেকগুলি মূর্ত্তি এখন সংগ্রহাগারে সংরক্ষিত হইয়াছে।

আজমীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম; সহরটি সুন্দর। চারিদিকে গিরিমালা। সহরটি প্রাকারবেষ্টিত। রাজপথ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। ষ্টেসনের সম্মুখেই "মাদার দরওয়াজা"—বাজার ও বোম্বাই অঞ্চলের মুসলমান সওদাগরদিগের দোকান। সহরের পশ্চিমভাগে "দৌলতবাগ" ও "কৈসরবাগ" মনোহর উদ্যান। "দৌলত-বাগের" ভিতর দিয়া "বারদুয়ারী" বা "আনারসাগরে" যাইবার পথ। কথিত আছে, পুরাকালে আনা নামক হিন্দু নৃপতি এই বিস্তৃত দীর্ঘিকা খনিত করাইয়াছিলেন। তখন ইহার পরিধি সাত মাইল ছিল। এক্ষণে ইহার কতক অংশ শুষ্ক—পরিধি চারি মাইলে পর্য্যবসিত। এই দীর্ঘিকাকূলে শ্বেতমর্ম্মরে রচিত "বার-দুয়ারী"—উদ্যানবাটিকা। জাহাঙ্গীর এই আনাসাগরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য বহুব্যয়ে এই উদ্যানবাটিকা নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। এই স্থানেই ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে (২৩শে ডিসেম্বর) ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের রাজত্বকালে ভারতে প্রথম ইংরাজ দূত সার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়াছিলেন। এই "বারদুয়ারীর" নির্ম্মাণ-কৌশল বিস্ময়কর। কড়ি বরগা নাই; বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডগুলি কি প্রকারে নিরবলম্বনভাবে গ্রথিত, তাহা দেখিয়া বুঝা যায় না। ইহার কয়টি কক্ষে সংস্কার প্রয়োজন হওয়ায় লর্ড কার্জ্জনের নির্দ্দেশে বহুব্যয়েও স্থানচ্যুত প্রস্তরগুলি পূর্ব্ববৎ গ্রথিত করা যায় নাই। দীর্ঘিকাটি জলপূর্ণ হইলে

এই উদ্যানের শোভা সত্য সত্যই বর্ণনার অতীত হয়। দীর্ঘিকার দক্ষিণ পার্শ্বে কমিশনারের রেসিডেন্সি।

ভারতীয় রাজকুমারদিগের শিক্ষার্থ কল্পিত মেও কলেজ আজমীরে অবস্থিত। লর্ড মেও ইহার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের সম্মুখে তাঁহার পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত।

আজমীর মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে মইনুদ্দিন চিস্তি নামক একজন মুসলমান ফকির এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার বিস্ময়কর, অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ মুসলমানগণ বহু অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার সমাধির উপর একটি মসজেদ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন। সমাধিকক্ষটি স্বর্ণাবৃত। এই "খোজা সাহেবের দরগা" মুসলমানতীর্থমধ্যে মক্কার অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছে। নিঃস্ব মুসলমানগণ মক্কায় যাইতে না পারিলে এই স্থানে আসিয়া মনে করেন, মক্কাদর্শনের ফললাভ হইল। দরগায় জুতা পায় দিয়া যাওয়া নিষিদ্ধ; য়ুরোপীয়গণ কাপড়ের জুতা পরিধান করিয়া গমন করেন। প্রবেশপথের দ্বিতীয় তোরণের দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ ডেক্‌চি। প্রত্যহ প্রথমটিতে ১২৫ মণ ও দ্বিতীয়টিতে ৭৫ মণ খেচরান্ন প্রস্তুত হইয়া বিতরিত হয়। প্রত্যেকটিতে খেচরান্ন রন্ধনের ব্যয় ৩০০ হইতে ৫০০ টাকা। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড পিত্তল-নির্ম্মিত ঝাড় ও নহবতমঞ্চে একটি জয়ঢক্কা আছে। কথিত আছে, আলাউদ্দীন চিতোর জয় করিয়া তথা হইতে এই দুইটি দ্রব্য আনিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে এই স্থানে একটি মেলা বসিয়া থাকে। তখন নানা স্থান হইতে মুসলমান তীর্থযাত্রীদিগের ও নর্ত্তকীদিগের সমাগম হয়।

আজমীরে আর উল্লেখযোগ্য স্থান কেবল "বিচ্‌লা" বা "বিশল্যা" নামক বৃহৎ জলাশয়। জনশ্রুতি, ১০৫০ খৃষ্টাব্দে বিশাল দেও নামক রাজপুত রাজা ইহার প্রতিষ্ঠা করেন।

সহরে কতকগুলি প্রবাসী বাঙ্গালী বাস করেন। কতিপয় বাঙ্গালী যুবকের চেষ্টায় এই দূর দেশেও একটি নাট্যসমিতি, একটি পাঠাগার ও একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ষ্টেসনের সম্মুখেই একটি হিন্দু হোটেল, একটি সরাই, একটি ডাকবাঙ্‌লো ও অফিসারস্‌ ক্লাব অবস্থিত।

পুষ্করতীর্থ আজমীর হইতে সাত মাইল দূরে। পর্ব্বতগাত্রে অপ্রশস্ত পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। পুষ্করে একটি হ্রদ ও হ্রদকূলে কতকগুলি দেবমন্দির

বিদ্যমান। মন্দিরগুলির মধ্যে ব্রহ্মার, সাবিত্রীর, বদ্রিনারায়ণের, বরাহের, শিবের ও অটখটেশ্বর মহাদেবের মন্দির প্রসিদ্ধ। পুষ্কর শব্দের অর্থ পদ্ম। পদ্মপুরাণান্তর্গত পুষ্কর-মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। পুষ্করস্নানের পূর্ব্বে সাবিত্রী দর্শন করিতে হয়। পুষ্কর হইতে সাবিত্রীমন্দির প্রায় এক ক্রোশ দূরে, পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। পূর্ব্বে পাণ্ডারা অর্থের জন্য অত্যন্ত উৎপীড়ন করিত, সেইজন্য আজমীরের পরোলোকগত জনকীনাথ সেন, পরলোকগত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন সাবিত্রী-তীর্থে একখানি প্রস্তরফলকে ক্ষোদিত করিয়া দিয়াছেন যে, কি ভদ্র, কি অভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন—সকল হিন্দুকেই সিন্দূরের জন্য পাঁচ সিকা হিসাবে দিতে হইবে।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার সময় পুষ্করতীর্থে সপ্তদিনব্যাপী একটি মেলার অধিবেশন হয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র।

জিজ্ঞাসা।

—•:*:•—

কি সুর বাজা'লে হৃদয়ে আমার,
হৃদি-বল্লভ মোর ?
আমি সারা দিনমান
শুনি সেই গান,
নয়নে স্বপন ঘোর।
আমি সারানিশি জাগি
সেই গান লাগি'
বুঝিতে পারি না, আকুল নয়নে
কেন এ নয়ন-মোর।

কি ফুল ফুটা'লে জীবনে আমার,
হে মোর জীবনধন ?
তা'র মদির সুবাসে
এ জীবনে ভাসে
সুখ-আশা অগণন ;
আমি লাজে—সুখে মরি—
আপনা পাশরি,
কেমনে গোপনে রাখিব আমার
হরষ-আকুল মন !

কি আলো জ্বালিলে পরাণে আমার,
টুটিলে আঁধাররাশি ?
তা'র কনক কিরণে
গগনে গগনে
ফুটিলে দিনের হাসি ।
সেই আলোকে চাহিয়া
দেখি, মোর হিয়া
আপনি চলিছে, হে পরাণ-প্রিয়,
তোমারি চরণে ভাসি' ।

কি প্রেম ঢালিলে, হৃদি-বল্লভ,
আমার হৃদয়মূলে ?
তাই পূর্ণ আমার
হৃদি চারিধার
বিকাশিত শতফুলে ;
তাই পিক কল কল
হৃদয়ে কেবল ।
শুষ্ক হৃদয়ে এ প্রেম ঢালিলে
হে প্রিয়, কি ভুলে ভুলে ?

আশার সমাধি।

১

আমরা সেবার পুরীতে ছিলাম। আমার ভগিনী বহুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন, তাঁহার সিন্ধু-তীর-বাসের ব্যবস্থা হইলে, আমাকেই অভিভাবকতার ভার লইতে হইল। আমার ভগিনীপতি ডাকবিভাগের কর্ম্মচারী, তাঁহার পক্ষে ছুটি পাওয়া একরূপ অসম্ভব। আমি তখন বি. এ. পরীক্ষা দিয়া "বেকার" অবস্থায় বসিয়া আছি। কাযেই পরীক্ষার কঠিন পরিশ্রমের পর স্বাস্থ্যভঙ্গের নিকট সম্ভাবনা থাকায় পুরীতে ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্যের ভার যখন আমার স্কন্ধে ন্যস্ত হইল, তখন আমি কাহাকেও বুঝাইতে পারিলাম না যে, আমার স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প; যেহেতু পরীক্ষার জন্য যে সকল ছাত্র দিবারাত্রি পরিশ্রম করে, আমি সেই অল্পবুদ্ধি বালকদিগের দলভুক্ত নহি। পরীক্ষাটা নিতান্ত না দিলে নহে, এই মনে করিয়া, কর্ম্মফলে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবেই দিয়াছিলাম; সুতরাং, আমার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষাও পরিপুষ্ট হইতেছে, ইত্যাদি নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া যখন কোনও ফলই হইল না, তখন কাযেই আমাকে একদিন বাধ্য হইয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া পুরী অভিমুখে রওনা হইতে হইল।

পুরীতে গিয়া প্রথম যখন সমুদ্র দর্শন করিলাম, তখন আমার আনন্দের সীমা ছিল না। ঐ শ্রান্তিশূন্য চঞ্চলতা, ঐ নিবিড় বিজনতা, ঐ সীমাহীন বিপুলতা আমাকে বিস্মিত, পুলকিত, স্তব্ধ করিয়া রাখিত। আমি সারাদিন সমুদ্রের সৈকতে, বালুরাশির মধ্যে, নহে ত, বারান্দায় আরামকেদারায় বসিয়া সমুদ্রের বিচিত্র লীলা দেখিতাম। অন্ধকারে যখন আকাশের বিশাল কক্ষটি পূর্ণ হইয়া যাইত,—যখন নিকটের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হইত না, তখনও আমি অতৃপ্ত নয়নে সিন্ধুর দিকে চাহিয়া থাকিতাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে তীরসন্নিহিত ফেনিলোচ্ছল ঊর্ম্মিগুলি দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ রজনীগন্ধার মালার মত তটবক্ষে বিলম্বিত হইত। আমার সেই তটবিলগ্ন কুটীর হইতে আমি যেন তাহার সৌরভ পর্য্যন্ত আঘ্রাণ করিতে পাইতাম। চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশি যখন স্ফীত ও চঞ্চল হইয়া উঠিত, তখন আমি পুলকে আত্মহারা হইয়া যাইতাম। চন্দ্রালোকে সমগ্র তটভূমি শুভ্রবাসে আচ্ছাদিত হইত, তমালতালীবনরাজি সেই বসনপ্রান্ত অলঙ্কৃত করিত।

নিশীথের উৎকট নির্জ্জনতার মধ্যে সিন্ধুর সেই দিগন্তপ্লাবী গর্জ্জনে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা উঠিত, আর আমি উন্মুক্ত বাতায়নপথে সে দৃশ্য দেখিয়া—সেই গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ ও মূক হইয়া রহিতাম। বন্ধু ও স্বজনদিগের মধ্যে আমি উদ্দামপ্রকৃতি বলিয়া পরিচিত ছিলাম। কি নিগূঢ় মন্ত্রের বলে আমার সেই তুচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতা, এই উদ্দাম, বাধাহীন, নিরবচ্ছিন্ন উচ্ছৃঙ্খলতার নিকট আত্মোৎসর্গ করিল, তাহা আমি বলিতে পারি না; আমার এই সংযত, শান্ত, শিষ্ট ভাব দেখিয়া ভগিনী আমাকে অনেক সময়ে "কবি," "দার্শনিক" ইত্যাদি আখ্যায় বিব্রত করিয়া তুলিতেন। তাহার একটু কারণ ও যে না ছিল, এমন নহে। আমি ইহারই মধ্যে প্রায় এক দিস্তা কাগজে কেবল কবিতাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেগুলি তাঁহাকে অবসর মত পড়িয়া শুনাইতাম। আমার ভগিনী যদিও আমার কবিতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহা হইলেও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত, যে কবিতাগুলিতে যথার্থ মৌলিকতা ও ভাবুকতা ছিল।

আমার কবিতার আর একজন সমালোচক হঠাৎ জুটিয়া গেলেন; আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে একজন ভদ্রলোক সপরিবারে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার কন্যা ননীবালা একবার আমার ভগিনীর জ্বর হইলে প্রত্যহ সংবাদ লইতে আসিতেন। সমুদ্রতীরেই ইহাঁদের সহিত আমাদের আলাপ হয়। ভদ্রলোকটি আমার ভগিনীপতির অফিসেই কায করিতেন, সম্প্রতি অন্য বিভাগে গিয়াছিলেন। ইঁহাদের অমায়িকতায় অল্পদিনের মধ্যেই আমরা মুগ্ধ হইলাম; আমার ভগিনীর অসুখের সময় সূর্য্যকান্ত বাবু ও তাঁহার পত্নী নিতান্ত আত্মীয়ের মত আমাদের তত্ত্বাবধারণের সমস্ত ভারই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সূর্য্যকান্ত বাবুর অষ্টাদশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা ননী আমার ভগিনীকে "দিদি" বলিয়া ডাকিতেন, এবং আমার সম্মুখে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। একদিন আমার ভগিনীর সহযোগিতায়, তাঁহার নিকট আমার কবিত্ব ধরা পড়িয়া গেল। আমি মধ্যাহ্নে বারান্দায় বসিয়া একাগ্র চিত্তে সমুদ্রের বর্ণবৈচিত্র দর্শন করিতেছি ও সেই অনির্ব্বচনীয় বিশালতাকে ভাষা ও ছন্দের ক্ষুদ্র গ্রন্থিতে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে আমার ভগিনী ও ননী আসিয়া সহসা আমার চিন্তাসূত্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন। আমি আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। ভগিনী হাসিয়া উঠিলেন। আমি অপ্রতিভ হইলাম, ননীর চক্ষু কিন্তু আমার কবিতার দিকে; কৌতুহলের দীপ্তি সে কমনীয় মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। আমার দুই একটি

কবিতা পাঠ করিবার জন্য যখন আমি আহূত হইলাম, তখন বাস্তবিকই আমার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। আমার স্বাভাবিক সপ্রতিভ ভাব কোথায় চলিয়া গেল! আমি নিতান্তই অনিচ্ছা জানিলাম। আমার ভগিনী বলিলেন, "তবে থাক্। একটা কিছু ভাল লেখা হইলে মোহিন্ আমাদের পড়িয়া শুনাইবে, এই সর্ত্তে আজ আমরা মোহিন্‌কে মাপ করিতে রাজি আছি। কি বল, ননী?" উত্তরের জন্য আমি ননীর দিকে সোৎসুখ ভাবে চাহিলাম। যাহারা কাব্য ও কবিতা লিখে, এবং যাহারা গান গাহিতে জানে তাহারা প্রথম আহ্বানে যুগপৎ ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার দোলায় দুলিতে থাকে। ইচ্ছা, কবিতা পড়িয়া বা গান গাহিয়া শুনায়; কোনরূপে আত্ম-পরিচয় দেয়; কিন্তু লজ্জা—সঙ্কোচ সে ইচ্ছাকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলে। তখন শ্রোতার পক্ষে একটু আগ্রহ ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বড়ই মিষ্ট লাগে। ভগিনীর এই উপেক্ষাব্যঞ্জক উক্তিতে আমি মৌখিক সাগ্রহ সম্মতি জানাইলেও মনে মনে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিলাম না। তাঁহার সঙ্গিনী কিন্তু পূর্ব্বেরই ন্যায় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাকে বিমুখ করিতে পারিলাম না। প্রথমে আমার 'সিন্ধূল্লাস' নামক কবিতাটি পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম। তাহার পর 'জলধি-গীতি' 'জলকল্লোল' প্রভৃতি এক এক করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইতে লাগিলাম। নির্ঝরের ধারার ন্যায় আমার কবিতার উৎস কি এক রহস্যের প্রভাবে স্বতঃই উৎসারিত হইতে লাগিল। আমার শ্রোতাদিগের প্রশংসোজ্জ্বল নেত্রে আমার কবিতার চরিতার্থতা দেখিতে পাইলাম। আমি এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, মধ্যাহ্নের কড়ি মধ্যম কখন অপরাহ্নের নিখাদে গিয়া মিশিল, তাহা আমার আদৌ খেয়াল ছিল না। আমার ভগিনী বলিয়া উঠিলেন, "ভাল, ননী, আজ বুঝি আর বেড়াইতে যাইতে হইবে না? সব কবিদের পাল্লায় পড়িয়া আমার মত অরসিকার নিরুপায় দেখ্‌ছি।" তাঁহার সঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমি আমার "দপ্তর" বাঁধিতে মনোযোগী হইলাম। ননী যাইবার সময় আমার ভগিনীকে বলিলেন, "মোহিনী বাবু ত সুন্দর কবিতা লিখেন; ইনি কালে একজন বিখ্যাত কবি হইবেন, সন্দেহ নাই।" আমার ভগিনী একটু হাসিলেন। বলা বাহুল্য, আমি গলিয়া গেলাম। সেই হইতে ননী আমার কবিতার নিয়মিত সমালোচক হইলেন। আমি আমার সমস্ত কবিতাগুলিই তাঁহাকে শুনাইতাম, তিনিও নিঃসঙ্কোচে ও মুক্তকণ্ঠে সেগুলির প্রশংসা করিতেন। তাঁহার প্রশংসায় আমি উৎফুল্ল হইতাম, এবং প্রতিভার অবশ্যপ্রাপ্য—শ্রদ্ধা, পূর্ণমাত্রায় আদায় করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইতাম।

২

সূর্য্যকান্ত বাবুর পরিবারের সহিত, আমাদের পরিবারের সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত বাবু ব্রাহ্ম; তিনি অতি অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সৌম্য, সুন্দর, বলিষ্ঠ মূর্ত্তিতে সখ্য ও সহানুভূতি সপ্রকাশ ছিল। তাঁহার হাসিতে বালকোচিত সরল প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিত! আমি যেমন তাঁহার ব্যবহারে তৃপ্ত হইয়াছিলাম, তিনিও আমার প্রতি সেইরূপ তুষ্ট ছিলেন। একবার সপ্তাহান্ত ভ্রমণে আমার ভগিনীপতি পুরীতে আসিলে সূর্য্যকান্ত বাবু তাঁহার নিকট শতমুখে আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমি আমার কাব্যকলা ছাড়িয়া, অনেক সময় তাঁহাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য করিয়া উঠিতে পারিতাম না। কিন্তু তাঁহারা অক্লান্তভাবে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য চেষ্টা করিতেন। এইরূপ ভাবে অনতিদীর্ঘকালমধ্যে আমাদের প্রীতি-বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে চলিল। যখন সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যাইতাম, তখন আমি আর ননী হয়ত সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য, গোধূলিতে রক্ত মেঘের নিম্নে শান্ত সমুদ্রের সৌন্দর্য্য, বিরল-নক্ষত্র বিশাল গগনের সৌন্দর্য্য—এই সকল লইয়া আলোচনা, করিতাম। আমি উপদেষ্টার ন্যায় আমার মতগুলি ব্যক্ত করিতাম, ননী শিষ্যার ন্যায় সে সকল শুনিয়া যাইতেন। তাঁহার কবিত্বময়ী কল্পনাকে আমি অভ্রশ্রেণীর স্তর দিয়া, লহরীর সোপান দিয়া, চন্দ্রকিরণের উপর দিয়া, অস্তস্ততোরণ-মালারূপ বলাকাশ্রেণীর সুঠাম গতির মধ্য দিয়া ছুটাইয়া দিতাম; এবং আপনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতাম। ব্রাহ্ম পরিবারে লালিতা, সূর্য্যকান্ত বাবুর ন্যায় পিতার আদর্শে ও সংসর্গে বর্দ্ধিতা ননীবালা যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন, তাহা আমার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সেই জন্যই তাঁহার ন্যায় ভক্ত সঙ্গিনী ও সমালোচক প্রাপ্ত হইয়া আমার গর্ব্ব সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হইতেছিল। অপরাহ্নটা অনেক সময়ে আমরা এক সঙ্গে কাটাইতাম। কোন কোন দিন সমুদ্রবক্ষে মেঘের লীলা দেখিবার জন্য আমরা সমুদ্রকূলে বসিয়া থাকিতাম, এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও আমার ভগিনীকে লইয়া সূর্য্যকান্ত বাবু, আমাদিগকে সত্বর আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া, গৃহে ফিরিতেন। আমরা মেঘান্ধকারে শ্যামায়মান গোধূলিতে নির্জ্জন সৈকতে বসিয়া থাকিতাম। এবং ক্যাক্টাস্-বেষ্টিত রাজপথ বাহিয়া বিদ্যুচ্চমকিত সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিতাম।

আমি প্রত্যুষে সমুদ্রস্নান করিতে যাইতাম। বহুক্ষণ জলে থাকিয়াও আমার স্নানের পিপাসার নিবৃত্তি হইত না। এই যে দিগন্তপ্রসারিত লবণাম্বুরাশি,

যাহা বিপুল রাহুর ন্যায় কৃষ্ণকবলে শস্যশ্যামলা পৃথিবীকে ত্রিপাদ গ্রাস করিয়া পাদমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াও শান্তি লাভ করে নাই, তাহাকে শরীরের অতি নিকটে পাইয়া আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিতাম। যখন ঢেউ এর পর ঢেউ আসিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত, তখন আমি দক্ষিণমেরু পর্য্যন্ত বিস্রান্ত এক সচেতন, প্রবুদ্ধ সত্তার স্পর্শ অনুভব করিতাম। যে দিন সমুদ্রস্নান করিতে না পাইতাম, সেদিন যেন আমার আর স্ফূর্ত্তি বোধ হইত না।

সূর্য্যকান্ত বাবু যখন শুনিলেন যে, আমি একজন নিত্যস্নায়ী, তখন তিনিও নিত্য আসিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে ননী ও তাঁহার মাতা আসিতেন। শেষে সব দিন হয়ত সূর্য্যকান্ত বাবুর এবং তাঁহার স্ত্রীর আসা ঘটিয়া উঠিত না; কেবল ননী আমার ভগিনীর সঙ্গে স্নানার্থ আসিতেন। আমিও তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতাম।

সকালে বৈকালে এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া প্রতীক্ষা করাটাই আমার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একদিন বুঝিতে পারিলাম যে, এ প্রতীক্ষা অভ্যাসের ফলমাত্র নহে—ইহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা একবার ছাড়িয়া দিলে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত হৃদয় প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। প্রথমে আমি আপনার কাছে ধরা দিতে চাহি নাই, নানারূপ কারণ খুঁজিয়া আমার এই ভিখারীপনা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম; সাহিত্যামোদ, পুরীর নির্জ্জনতা, উভয়ের মতের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি ইত্যাদির আশ্রয় লইয়া যথার্থ কারণটাকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু একবার যখন ননী অসুস্থ হইয়া বাড়ীর বাহিরে আসিতে নিষিদ্ধ হইলেন, তখনই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। রমণীর রূপলাবণ্য আমার চিত্তে রেখাঙ্কিত করিতে পারিত না। আমি একটু আধটু সাহিত্য-চর্চ্চা করিলেও এ পর্য্যন্ত কখনও সৌন্দর্য্যচর্চ্চা করি নাই। কাযেই প্রথম যখন আমি আপনার কাছে ধরা পড়িলাম, তখন মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহার সহিত আনন্দের সম্পর্কমাত্র ছিল না। আমি ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। কেমন করিয়া আমি আত্মবিক্রয় করিলাম, কোন্ মুহূর্ত্তে বিশুদ্ধ কাব্যচর্চ্চা প্রেমের পূর্ব্বরাগে পরিণত হইল, কোন্ দুষ্ট দেবতা আমার এই দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া এমন তীব্র পরিহাস আরম্ভ করিলেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। কোথায় গেল আমার কাব্যকলা, কোথায় গেল আমার নূতন নূতন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি! কোথায় একজন বিখ্যাত কবি হইবার আয়োজন করিব না,

কোথায় বিরহের তাড়নায় 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' হইয়া সকল আশার অবসান করিতে বসিলাম। ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে, গম্ভীর এবং হাস্যাস্পদের মধ্যে পাদৈকমাত্র ব্যবধান। আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল।

যাহা হউক, ননীর রূপলাবণ্য সম্বন্ধে আর আমি উদাসীন থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার সুবিন্যস্ত কৃষ্ণকেশপাশ হইতে চঞ্চল চরণক্ষেপভঙ্গী পর্য্যন্ত সমস্তই আমার নয়নে অতুলনীয় সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রেমাস্পদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটী গুলি পর্য্যন্ত চিত্ত আকর্ষণ করে। আমিও সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। যদি মুহূর্ত্তের জন্যও সে আকর্ষণের একটি ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব তাঁহার নয়নে বা ভঙ্গিতে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমার জীবনের সমস্ত সাধনার সফলতা লাভ হইত। কিন্তু কখনও সে ভাবটি দেখিতে পাই নাই। ননীর কথাবার্ত্তায়, পরিহাসকৌতুকে এমন কিছুই কখনও প্রকাশ পায় নাই, যাহার প্রান্তে আমার আশার অতি দীন ঝুলিটি বাঁধিয়া দিতে পারি। সুতরাং আমি বুঝিলাম, নিষ্ফল প্রেমের তুষানল বিধাতা আমার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

ইহার পর যত বার ননীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, আর পূর্ব্বের মত নিঃসঙ্কোচে কথা কহিতে পারি নাই। যেন বাধ বাধ ঠেকিত। কিন্তু তাঁহার আকর্ষণ আরও প্রবল ভাবে অনুভব করিতাম। ননী বা সূর্য্যকান্ত বাবু, কেহই আমার হৃদয়ের এই ভাবপরিবর্ত্তন জানিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার দিদির নিকট আমি সম্পূর্ণ আত্ম-গোপন করিতে সমর্থ হই নাই। সময়ে সময়ে আমার মনে হইত, যেন তিনি আমার অন্তরের কথা জানিতে পারিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতাম ; মধ্যে মধ্যে অপরাহ্নে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িতাম। ননী আসিতেন, আমার সন্ধান করিতেন, এবং আমি তাঁহাদের ফেলিয়া বেড়াইতে গিয়াছি বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

কিন্তু আমার এ কঠোর আত্মনিগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইল ; আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ঘটনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিলাম। যখন কোন স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় সমুদ্র-সৈকতে বালুরাশির মধ্যে আসন রচনা করিয়া আমরা প্রকৃতির রহস্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতাম, ক্রীড়াপরায়ণ বালক বালিকারা যখন ঊর্ম্মির সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া হাস্যকোলাহলে সমুদ্রতীর মুখরিত করিয়া তুলিত, সূর্য্যকান্ত বাবু যখন ভ্রমণক্লান্ত প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগের সহিত আলাপে রত হইতেন, আর জলধিজাত-

সমীর-হিল্লোলে যখন শরীর সিক্ত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, তখন আমি হর্ষ-বিহ্বলনেত্রে ননীর মুখপানে চাহিয়া থাকিতাম। ননীর কবি-হৃদয় স্বভাবের শোভায় নিমজ্জিত হইয়া থাকিত। আমার নীরব—কাতর নিবেদন তাহার মর্ম্মে প্রবেশলাভ করিত না। আমি মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইতাম।

কিন্তু এত দিনে অল্পে অল্পে যে প্রভুত্ব আমি গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, সে প্রভুত্বের নেশায় আমাকে অনেক সময়ে বিভোর করিয়া রাখিত। যে স্থানে মানসিক শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিবার সুযোগ আছে, তথায় সে সুযোগ পরিত্যাগ করা বড় সহজ নহে; বিশেষ, প্রেমাস্পদের নিকট আপনাকে যত বড় করিয়া দেখান যাইতে পারে, ততই আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। অন্য স্থলে যাহাই হউক, তথায় আপনাকে বাড়াইবার ইচ্ছা এত বলবতী হয় যে, সে প্রলোভন সহজে অতিক্রম করা যায় না। আমারও তাহাই হইল, শুধু বিশুদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে নহে, জগতের যাবতীয় তত্ত্ব লইয়া আমি আলোচনা করিতাম ও আপনার মত অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রকাশ করিতাম। ননী যেরূপ অবহিত ভাবে শুনিয়া যাইতেন, তাহাতে আমার উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইত। আমি পুস্তকে যে সকল তত্ত্ব পাঠ করিয়াছিলাম, সেই সকলকে নূতনত্বের আবরণ দিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বিবৃত করিতাম, এবং আমি যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ননীর মনে এমনই একটা ধারণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম। এক দিন সঙ্গীতের সম্বন্ধে কথা পাড়িলাম; কয়েকটি সঙ্গীতের অংশ অনর্গল আবৃত্তি করিয়া ফেলিলাম, এবং গাহিয়া না শুনাইতে পারিলে তাহার সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব, এইরূপ আভাস দিয়া জানাইলাম যে, সঙ্গীতেও আমার বিলক্ষণ অধিকার আছে। ছাত্রমণ্ডলে আমাকে কখন কখন গান করিতে হইত, সুতরাং সঙ্গীতের সহিত আমার পরিচয় ছিল। এখন আমার ইচ্ছা হইল যে, ভগবান যখন আমাকে সু-কণ্ঠ দিয়াছেন, তখন ননীকে একবার গান শুনাইব না? "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা" যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে যদি মুগ্ধ না করিতে পারিলাম, তবে গুণ থাকিয়া লাভ কি?

সেই দিনই অপরাহ্ণে যখন ননীদের পঁহুছিয়া দিয়া বাড়ীতে ফিরিব, তখন ননী সূর্য্যকান্ত বাবুকে বলিলেন, "বাবা, মোহিনী বাবু ভাল গাহিতে পারেন, তাহা জান না!" আমি মস্তক অবনত করিলাম। সূর্য্যকান্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন, "বটে! তা, এতদিন মোহিনী আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে কেন? আমি ভাবি, মোহিনী কাব্য আর দর্শন লইয়াই থাকে।" তাঁহার হাস্যে গৃহপ্রাঙ্গণ ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "বেশ ত, আজই হউক না?" আমি প্রথমে একটু

আপত্তি জানাইলাম, পরে সম্মত হইলাম। একটা টেব্‌ল্‌ হারমোনিয়ম্‌ গৃহাভ্যন্তর হইতে বারান্দায় আনীত হইল। আমি সূর্য্যকান্ত বাবুর মুখের দিকে চাহিলাম, তিনি বলিলেন, "ও সব আমার আসে না, ছেলে মেয়েরা বাজায় আমি শুনি এই পর্য্যন্ত।" আমি একটু বিব্রত হইলাম। বাদ্যটা আমার তত অভ্যস্ত ছিল না। তবুও আমি একটু চেষ্টা করিলাম; সুবিধা হইল না। সূর্য্যকান্ত বাবু বলিলেন, "তুমি এস, ননী, যাও ত, মা।" আমার ত চক্ষু স্থির! আমি যতক্ষণ সপ্রতিভ ভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, ততক্ষণে ননীর চম্পকাঙ্গুলিগুলি অবলীলাক্রমে পর্দ্দার মধ্যে সঞ্চালিত হইতেছিল। আমি আমার যথাশক্তি গান করিতে লাগিলাম। যদি গানের দ্বারা আমার ক্ষুণ্ণ গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল, স্থানে স্থানে স্বরভঙ্গ হইল। আমার উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইল। সূর্য্যকান্ত বাবু ননীকে গান গাহিতে অনুরোধ করিয়া বসিলেন। আমি দেখিলাম, আমার আসন টলিয়া উঠিয়াছে—আমি যে উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া ননীর নিকট কিছু পূর্ব্বে আমার গৌরব প্রচার করিতেছিলাম, বাধ্য হইয়া সে আসন আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। ননী অসুস্থতার দোহাই দিয়া আসন হইতে একেবারে উঠিয়া পড়িলেন। যেন জানি না, আমি তাহাতে একটু প্রীতি অনুভব করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি গৃহে ফিরিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। সে দিন আর আমার মনের অন্ধকার ঘুচিল না।

এই ঘটনার পর অনেক দিন আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতের কথা এক দিনও উঠে নাই। আমার ভগিনী আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, ননী আমার গানের প্রশংসা করিয়াছে। আমি ভাবিলাম, "পরিহাস নহে ত?" পরবর্ত্তী ঘটনায় সে ধারণা আরও বর্দ্ধিত হইল। একদিন 'মলয়া' নামক একখানি মাসিক পত্র আমার দিদির নামে আসিল। এখানি মহিলা-পরিচালিত উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্র। আমার দুই একটি কবিতা ইহাতে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম; মুদ্রিত হয় নাই। ননী এ সংবাদ রাখিতেন। তিনি সম্পাদিকার নির্ব্বাচনী শক্তিকে এ জন্য এক দিন নিন্দাও করিয়াছিলেন। 'মলয়া' যে সময় হস্তগত হইল, ননী তখন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে কবিতা পাঠ করিলাম। তাহার মধ্যে একটি কবিতা আমি একাধিক বার পাঠ করিলাম এবং রচয়িত্রীর প্রশংসা করিলাম। এ সম্বন্ধে ননী আমার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন যে, কবিতাটি সর্ব্বাংশেই নিষ্ফল হইয়াছে। আমাদের এইরূপ মতভেদ বড় হইত না। কাযেই আমি আরও দৃঢ়তার সহিত

সেই কবিতার প্রশংসা করিয়া আমার প্রাধান্য অটুট রাখিতে সচেষ্ট হইলাম। আমার দিদি যখন আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, কবিতাটি ননীর লেখা, তখন আমি বিস্ময়ে, দুঃখে—লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। শ্রীমতী প্রীতিবালা রায় নূতন কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বিনী হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই প্রীতিবালাই কি ননী? ননী পূর্ব্বেই বিদায় লইয়াছিলেন। সুতরাং, আমি আমার মনোভাব সহজেই গোপন করিতে পারিলাম। আমার অন্তঃকরণে তখন যে কি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দিদি জানিতে পারেন নাই। তিনি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলেন; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "কি আশ্চর্য্য, তুমি এত দিন জানিতে না যে, ননী একজন সু-কবি।" আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই ছিল না। ননী কাব্যানুরাগিনী, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু স্ত্রীজাতি স্বভাব-কবি। আমাদের মত চেষ্টা করিয়া, মিল জুটাইয়া তাহাদিগকে কবি সাজিতে হয় না।

যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই মনে মনে লজ্জিত হইতে লাগিলাম। কি আশ্চর্য্য, এত দিন কিছুই জানিতে পারি নাই! আমার কত কি ছাই ভস্ম কবিতা ননীকে পড়িয়া শুনাইয়াছি! আর তাঁহার যে প্রশংসা শুনিয়া আমি আনন্দে কণ্টকিত হইয়া উঠিতাম, তাহা উপহাস! মনে মনে ননীর উপর ক্রুদ্ধ হইলাম। ননীর চরিত্রে স্বাভাবিক মাধুর্য্যের সঙ্গে যে কাব্য-সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত-কলা মিশিয়া অপূর্ব্ব ত্রিবেণী-সঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া আনন্দ অনুভব করিবার মত প্রবৃত্তি তখন আর আমার ছিল না। চিরদিনের মত কবিতাকে বিদায় দিলাম। বহুদূর না হাঁটিলে ক্ষুধা হয় না, শরীর পালনের এই নিয়মের দোহাই দিয়া মহিলাদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিলাম। ননী ও আর পূর্ব্বের মত সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে আসিতেন না; দিদি বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, আমার "কবিতার নদীতে ভাঁটা পড়িয়া যাওয়ায়, ননীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।" কারণটা তিনি ঠিক অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন কি না, বুঝা যায় নাই।

৩

আমার গর্ব্বের এক একটি স্তম্ভ এইরূপ নির্ম্মম ভাবে ভগ্ন হইতে লাগিল, তাহাতে অত্যন্ত অপ্রতিভ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কারণ এই যে, হৃদয় যাহার নিকট এমন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার নিকট অভিমান এইরূপ লাঞ্ছিত ও দলিত হইলে দুঃখের আর সীমা থাকে না। আমি এই নিষ্ফল দুঃখের জ্বালা হৃদয়ে বহিয়া বহিয়া কাতর

হইয়া পড়িতেছিলাম। সমুদ্রের অনাবৃত, সীমাহীন, উদারতা সে জ্বালা প্রশমিত করিতে পারিল না।

এইরূপ অশান্ত হৃদয়ে কিছু দিন বেড়াইলাম, তাহার পর আবার যখন আমার পক্ষে ননীর আকর্ষণ প্রবল হইয়া আসিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে যে ঘটনাটি ঘটিল তাহার স্রোতে আমার গৌরবের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া গেল।

একদিন আমি ও আমার দিদি সূর্য্যকান্ত বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। তাঁহার আরও কয়জন বন্ধুও আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বৃদ্ধদিগের উচ্চ হাস্যে ও শিশুদিগের কলরবে গৃহ আমোদিত হইয়াছে। উৎসবের কারণ শুনিলাম যে, ননী বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ কলিকাতা হইতে আজ আসিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! মধ্যাহ্নে আমিও একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহাতে আমি পাশ না হওয়ায় আমার ভগিনী-পতি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি তাহাতে দুঃখিত হই নাই, কারণ, আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

ননীর সাফল্য-সংবাদে আমি ক্ষোভে, ক্রোধে, লজ্জায় যেন একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া গেলাম। কি বিড়ম্বনা, ইঁহারই নিকট উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া, এত দিন বিদ্যার জন্য বাহাদুরী লইতে চেষ্টা করিয়াছি! ইহা ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিলাম; এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। সূর্য্যকান্ত বাবুকে সংক্ষেপে শারীরিক অসুস্থতা জানাইয়া বিদায় লইলাম। ননীর সহিত সে দিন দেখা হয় নাই।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িলাম। যে মুক্ত বায়ু নিদাঘ মধ্যাহ্নের উত্তাপকেও শীতলতায় পরিণত করিত, আজ তাহা আমার গাত্রজ্বালা দূর করিতে পারিল না। আহত ফণী যেমন আপনাকে আপনি দংশন করিয়া জর্জ্জরিত হয়, অভিমানাহত আমি তেমনই আপনার বিষে আপনি দগ্ধ হইতে-ছিলাম, এই অনলদাহে প্রেমই অধিক ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দিল। বুঝিলাম, স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া এমন এক ক্ষুধিত রাক্ষসকে জাগাইয়া তুলিয়াছি যে, সমস্ত জীবনটি তাহার নির্ম্মম কবলে অল্পে অল্পে নিষ্পেষিত হইতেই হইবে। তারকা-খচিত বিশাল গগনের দিকে চাহিলাম, শুভ্রফেনসজ্জিত তরঙ্গরাশির দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিছুতেই শান্তি দিতে পারিল না। আমার ভগিনী যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন আমি নিদ্রার ভাণ করিয়া রহিলাম।

ননীর সঙ্গ একেবারেই বর্জ্জন করিলাম। ননীও আর আমার সহিত আলাপ

করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন না। সম্ভবতঃ আমার মনোভাব তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। দেখা হইলে, কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াই আমরা অন্য কাযে চলিয়া যাইতাম। এমনই ভাবে অভিমানের অনলে কাব্য, সঙ্গীত, প্রেম- সব পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল।

স্নানের সময়—যে দিন ননীর সহিত দেখা হইত, সে দিন আমার আর ভাল স্নান হইত না। কিন্তু ননী আর পূর্ব্বের মত স্নান করিতে যাইতেন না। কিছু দিন তাহাতে শান্তি অনুভব করিতাম। কিন্তু আবার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। আবার তাঁহার দর্শনের জন্য মন ব্যাকুল হইতে লাগিল; মানুষের অসীম দুর্ব্বলতা সমস্ত সঙ্কল্পকে পরাভূত করিল। মনে হইত, এত রূপ, এত গুণ,—দর্শনে কি দোষ? সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে যে বাধাহীন, ভাষাহীন, অনাবিল মিলন,—তাহাকে বহুদিন হইতে কামনার বস্তু বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি, কাযেই আমার সে অতৃপ্ত কামনা শান্ত হইত না।

সেইরূপ অবাধ মিলন একদিন আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। সে দিন সিন্ধু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। অধীর তরঙ্গগুলি তটভূমিকে বিধ্বস্ত, ব্যথিত, প্লাবিত করিয়া ফেলিল। অনেক স্নানার্থী সমুদ্রের অবস্থা দেখিয়া স্নানে বিরত হইলেন। ভ্রমণরত জনগণ তীর হইতে সমুদ্রের ভীষণভাব দেখিতে লাগিলেন। গর্জ্জনও সে দিন অন্যান্য দিন অপেক্ষা গভীর। মধ্যে মধ্যে কামানের নিনাদের ন্যায় শব্দ হইতেছিল। উর্ম্মিতে সে দিন দূর সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। কেবল যে ভঙ্গপ্রবণ তরঙ্গগুলি প্রবল ছিল, তাহা নহে, স্রোতেরও এমন ভয়ানক টান ছিল যে, স্নানের সময় আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি স্নান করিতে করিতে চাহিয়া দেখি, আমার ভগিনী ও ননী হাত ধরাধরি করিয়া নামিতেছেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম, তাঁহারা গভীর জলে গিয়া পড়িতেছেন, এবং সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তরঙ্গের ও টানের বিরুদ্ধে কূলের দিকে আসিতে পারিতেছেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি সমস্ত অবস্থাটা বুঝিতে পারিলাম, এবং প্রাণপণে তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ যাইতে লাগিলাম। তীর হইতে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিকটে যাইতে অধিক সময় লাগিল না। ততক্ষণে ননী ডুবিয়া গিয়াছেন, আমার ভগিনী তখনও ভাসিয়া ও ডুবিয়া তীরের দিকে আসিতেছেন। আমি নিকটে যাইতেই তিনি হাত বাড়াইয়া দিলেন, আমি অগ্রে ডুব দিয়া প্রবল চেষ্টায় ননীকে জলের উপর তুলিলাম। আমার দিদিও আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। স্রোতের প্রতিকূল দিকে

যাইতে এইবার আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইল। আমি উন্মত্তের মত সমুদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। আমার দিদিকে আমাকে চাপিয়া ধরিতে নিষেধ করিলাম। কিন্তু তিনি ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি আরও দৃঢ়ভাবে আমার গলদেশ বেষ্টন করিলেন। ননীর দেহে স্পন্দন ছিল না। কতক্ষণ এইরূপ সংগ্রাম করিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই, কিন্তু সেই কয় মুহূর্ত্ত আমার পক্ষে যুগের মত বোধ হইতে লাগিল। কতকটা দূর আসিবার পর আমার প্রাণান্ত চেষ্টাও ব্যর্থ হইতে লাগিল। তরঙ্গের সহিত সংগ্রামে আমার হস্তপদ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। কূলের নিকটে আসিয়া আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হইতে লাগিল। তার পর কি হইয়াছিল, তাহা আমি আর ভাল জানি না। তীর হইতে কয়েকজন নামিয়া আমার শিথিল হস্ত হইতে ননীকে ও আমার দিদিকে টানিয়া তুলিলেন, কিন্তু আমাকে ধরিবার পূর্ব্বেই স্রোতে আমাকে অগাধ জলে ভাসাইয়া লইয়া গেল। পরে শুনিয়াছি, ঠিক সেই সময়ে নুনিয়াদের একখানি মাছ ধরিবার নৌকা ফিরিতেছিল, তাহারাই আমাকে সেই আসন্ন সলিল-সমাধি হইতে তুলিয়া লইয়া আইসে।

আমার যখন জ্ঞান হইল, তখন প্রভাতের আলোক ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। দিদি ও ননী আমার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। আমি চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্রই দিদি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ননীও অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। সূর্য্যকান্ত বাবু আসিয়া সস্নেহে আমার মস্তকে হস্ত বুলাইয়া দিলেন।

আমার সুস্থ হইতে এক পক্ষ কাল অতীত হইয়া গেল। আমার অচৈতন্যাবস্থায় সূর্য্যকান্ত বাবু ও তাঁহার কন্যা আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা আমার শুশ্রূষায় তৎপর ছিলেন। একটু সুস্থ হইয়াই তাঁহাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেই সূর্য্যকান্ত বাবু অশ্রুপূর্ণলোচনে, তাঁহার কন্যার জীবনরক্ষার জন্য আমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার সে আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দেখিয়া বাস্তবিক মনে হইল, আমার ক্ষুণ্ন গৌরব সত্য সত্যই পুনরুজ্জীবিত হইল।

এক দিন জ্যোৎস্না-পুলকিত সন্ধ্যায়, ননী আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মোজা সেলাই করিতেছিলেন, তখনও আমি রুগ্নশয্যা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। আমি একমনে তাঁহার অঙ্গুলিগুলির নিপুণ গতি দেখিতেছিলাম। সহসা ননী "উঃ" বলিয়া ছুঁচ ফেলিয়া দিলেন। অঙ্গুলির একস্থানে একটু রক্ত দেখা দিল। আমি

ত্রস্তভাবে তাঁহার অঙ্গুলিটি লইয়া টিপিয়া দিলাম। বেদনার অবসান হইল, কিন্তু তখনও সে কর আমার করে ছিল। ননী হাত সরাইয়া লইলেন না। আমি সাহসভরে বলিলাম, "ননী, তুমিই আমার স্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছিলে, তুমিই আবার তাহা খর্ব্ব করিয়া দিয়াছ। আমাকে ক্ষমা করিয়াছ কি?"

"তুমি ত কখনও কিছু অন্যায় কর নাই; এ কথা বলিতেছ কেন?"

আমি তাঁহার ললাটের কুঞ্চিত উদ্দাম কেশগুলি সরাইয়া দিয়া বলিলাম, "যদি বাঁচি, আর যদি কখনও তোমার উপযুক্ত হইতে পারি, তখন কি আমাকে মনে রাখিবে?"

ননী কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখের স্নিগ্ধ, সলজ্জ, রক্তিম ভাব এবং হস্তের নিবিড় স্পর্শ আমার প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর দান করিল।

এই সময় দিদি সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ননী সসম্ভ্রমে আসন হইতে উঠিয়া গেলেন।

* * *

ননীর উৎসাহে সেই বৎসরই বিলাত যাত্রা করিলাম। তিন বৎসর অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ও আইনের ডিগ্রী লইয়া দেশে ফিরিলাম। প্রবাসে সূর্য্যকান্ত বাবুর স্নেহপূর্ণ পত্র ও তাহার সঙ্গে ননীর প্রীতি-সম্ভাষণ আমাকে উৎসাহিত করিত। কিন্তু যাঁহার জন্য এত পরিশ্রম ও প্রবাস-ক্লেশ স্বীকার করিলাম, দেশে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলাম, তিনি আর ইহ-লোকে নাই।

এখনও আমি প্রতিবৎসর আদালত বন্ধ হইলে পুরীতে গিয়া থাকি; এখনও বিজন সন্ধ্যায় সমুদ্রগর্জ্জনে আমি ননীর আহ্বান শুনিয়া থাকি। যক্ষ্মারোগে কাতর হইয়া ননী, তাঁহার আপনার ইচ্ছায়, পুরীর সমুদ্রতটে বালুরাশিতে দেহ মিশাইয়াছিলেন। তাই সে তীর্থ আমি ভুলিয়া থাকিতে পারি না।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

ঢাকা।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পর্ত্তুগীজ দস্যুদল আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। কোন কাযই এই সকল অবিমৃষ্যকারী, নিষ্ঠুর, লোভী জলদস্যুদিগের অসাধ্য ছিল না। ইহাদের অত্যাচারে ঐ সময় পূর্ব্ববঙ্গের প্রজাগণের ধনপ্রাণ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই জলদস্যুদল ক্ষিপ্র গতিতে অতীব দক্ষতার সহিত নৌকা চালাইতে অভ্যস্ত ছিল। দস্যুতা ও লুণ্ঠনের দ্বারাই ইহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। ঘনান্ধকার স্তব্ধ নিশীথে দ্রুতগামী তরী বাহিয়া ইহারা নিঃশব্দে এক একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদে আসিয়া পড়িত, এবং প্রচণ্ড বিক্রমে সুপ্ত জনপদবাসিগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ধনজন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। কত নরনারী যে এই দুর্বৃত্তগণের ক্রূর হস্তে পতিত হইয়া কঠোর দাসত্বে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। ইহাদের নির্ম্মম অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গের নিরীহ প্রজাকুল পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল। এই পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণই তখন "বোম্বেটে" নামে অভিহিত হইত। তখন "বোম্বেটে" শব্দ উচ্চারিত হইলে বাঙ্গালার লোক শিহরিয়া উঠিত।

পর্ত্তুগীজ বোম্বেটে দলই কেবল সে সময় পূর্ব্ববঙ্গবাসীর একমাত্র শত্রু ছিল না। আরাকানের মগেরাও পূর্ব্ববঙ্গবাসীর বদ্ধবৈরী ছিল। দস্যুতায়, নিষ্ঠুরতায় ও লুণ্ঠনে আরাকানী মগেরা পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। "মগ" বলিলে তখন ঘোর অত্যাচারী দুর্বৃত্ত, ও নিষ্ঠুর লোক বুঝাইত। "মগের মুলুক" কথাতে এখনও বাঙ্গালীর মনে মগদিগের সেই প্রাচীন অত্যাচারের তীব্র স্মৃতি জাগরিত করিয়া দেয়।

পর্ত্তুগীজ ও মগদিগের অত্যাচারে যখন পূর্ব্ববঙ্গ থর থর কাঁপিতেছিল, সে সময় তথায় ঘোর অরাজকতা উপস্থিত। পাঠানদিগের গৌরব-তপন তখন অস্তমিত, মোগলদিগের শৌর্য্য-শশধর তখন ষোলকলায় সমুদিত। ইতঃপূর্ব্বেই পাঠানগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া উড়িষ্যায় আশ্রয় লইয়াছিল, মোগলগণ ব্রহ্মপুত্র নদের তীর পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গালা করায়ত্ত করিয়াছিল। তাহাদের দুর্দ্দান্ত সর্দ্দার কতলু খাঁও মানসিংহের প্রতাপে ভগ্নহৃদয় হইয়া প্রাণ হারায়েন। কতলুর পুত্র ওসমান্ তখন সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও ছয় সহস্র পদাতিক লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিচরণ করিতেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুড়ীগঙ্গার তীর পর্য্যন্ত

ওসমান্ আপন অধিকার বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময় অনেক পাঠান ময়মনসিংহে, ঢাকায় ও চট্টগ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকে। ইহারা এই সময় প্রজাগণের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে পারিত না। সুতরাং তাহারাও অনেক সময় নিরীহ প্রজাগণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত করিত। এইরূপ নানা উপদ্রবে পূর্ব্ববঙ্গের প্রজাগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল শাসকগণও সেই নিঃস্ব প্রজার নিকট হইতে রীতিমত কর আদায় করিতে পারিতেন না। এই কারণে পূর্ব্ববঙ্গের এই ব্যাপারে দিল্লীর বাদসাহ জাহাঙ্গীরের মনোযোগ স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব জাহাঙ্গীর কুলী খাঁর মৃত্যুর পর দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বুঝিলেন যে, সমগ্র বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা একই নবাবের শাসনাধীন রাখিলে পূর্ব্ববঙ্গের এই অশান্তি সহজে লোপ পাইবে না। সুতরাং তিনি আফজল খাঁর হস্তে বিহারের এবং সেখ আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁর হস্তে বাঙ্গালার শাসনভার ন্যস্ত করেন। এই সেখ ইসলাম খাঁ ফতেপুরের সেলিম চিস্তির পৌত্র ছিলেন। সেলিম চিস্তির আশীর্ব্বাদের ফলেই উদিপুরী বেগমের গর্ভে জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। সেখ ইস্‌লাম খাঁ সেই জন্যই সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। যে সময় ইনি বাঙ্গালার মসনদে উন্নীত হইয়াছিলেন সে সময় রাজমহলই বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। প্রতিভাসম্পন্ন ইসলাম খাঁ পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত না করিলে কিছুতেই এই অশান্তির শান্তিবিধান হইবে না। তাই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রাজমহল পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা সহরে বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দী কাল ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী ও দুই শতাব্দী কাল বাঙ্গালার একটি প্রধানা নগরী রূপে বিরাজ করিয়াছিল। ঢাকার ইতিহাস অত্যন্ত বিস্ময়জনক। খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হাসান Echoes from Old Dacca নামক পুস্তকে এই নগরীর ইতিহাস অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকার নর্থব্রুক হলে ইনি সুললিত ভাষায় ঢাকার প্রাচীন কাহিনী সম্বন্ধে একটি অতি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। ইঁহার যত্ন, অনুসন্ধান ও অধ্যবসায়প্রভাবে এই ঐতিহাসিক নগরীর অনেক অতীত কাহিনী সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা সহরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মাভাস আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাবসানে এক দিন প্রভাতে রাজমহল হইতে নানা শ্রেণীর তরণীর একটি বিরাট বহর রাজমহল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিল। কোন কোন তরীতে দেড়শত ক্ষেপণিক ক্ষিপ্র হস্তে ক্ষেপণি সঞ্চালন করিতেছিল। গঙ্গাবক্ষে হেলিতে দুলিতে সেই তরণীশ্রেণী দ্রুতবেগে পক্ষিপালের ন্যায় যেন উড়িয়া যাইতেছিল। তরণীশ্রেণীর মধ্যভাগে নবাবের তরণী, সুন্দরী ও সুসজ্জিতা। তাহার উপর গর্ব্বভরে মুসলমান নবাবের সিংহ-সূর্য্য-চিহ্নিত বৈজয়ন্তী পত পত শব্দে উড্ডীন। সেই সুবর্ণখচিত তরণীর উপর সমগ্র বাঙ্গালার নবাব সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁ বিরাজমান। ইনি ইঁহার রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে নূতন রাজধানী সংস্থাপনের একটি যোগ্য স্থানের অনুসন্ধানার্থ বহির্গত। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় তখনও শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ তখন মোগলগণ কর্ত্তৃক কেবল নূতন বিজিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা হইতে তখন পাঠানগণ কেবলমাত্র পূর্ব্ববঙ্গে বিতাড়িত হইয়াছে। তাহারা সর্দ্দার ওসমানের নেতৃত্বাধীনে গণক পাড়া, গোরী পাড়া ও ধামরাই দুর্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ অঞ্চলে অরাজকতার সৃষ্টি করিতেছে। সুতরাং ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদিগের শান্তিবিধান একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে আবার এক নূতন বিপদ উপস্থিত। পর্ত্তুগীজ বোম্বেটে দিগের সর্দ্দার শিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জেলেস্ মগদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভুলুয়া ও লক্ষ্মীপুরের সন্নিহিত জনপদসমূহ অধিকৃত করিয়া লইয়াছে; এবং নদী বাহিয়া নবজিত মোগল রাজ্যে নানাপ্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতেছে। সুতরাং সৈয়দ ইসলাম খাঁর ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ নবাবের পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব নহে। তাই তিনি এই বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রস্থলে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপন করিতে বাহির হইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে উপনীত হইয়া নবাব ইসলাম খাঁ অনেক স্থানে অবতরণ করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজধানী সংস্থাপনের যোগ্য স্থান অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোন স্থানই তাঁহার মনোমত হইল না। শেষে বুড়ী গঙ্গার তীরে তাঁহার তরণী-শ্রেণী আসিয়া উপনীত হইল। ঢাকা সহরের অপর তীরে সমস্ত তরী নঙ্গর করিল। ইস্‌লাম খাঁ স্বয়ং তরী হইতে অবতরণ করিয়া ঐ স্থান তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন। স্থানটি মনোনীত হইল। তিনি বুঝিলেন, সামরিক হিসাবে ঐ স্থানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যেস্থানে তিনি প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানটি তাঁহারই নামানুসারে ইসলামপুর নামে অভিহিত। উহা সহরেরই অঙ্গীভূত। স্থানটি পরীক্ষা করিয়া তিনি সহরের সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে

করিতে নদীর দিকে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে, কয়েকজন হিন্দু-ঢাক বাজাইয়া পূজা করিতেছে। ঢাকের শব্দে তাঁহার মনে সীমা-নির্দ্ধারণ-সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। তিনি সমস্ত ঢাকীগুলিকে ঐ স্থানের মধ্যস্থলে সমবেত করিলেন এবং তাহাদিগকে প্রাণপণে ঢক্কা নিনাদ করিতে আদেশ দিলেন। বঙ্গ, বিহার, ও উড়িষ্যার অধিপতির আদেশপ্রাপ্তিমাত্র ঢক্কাবাদকগণ প্রাণপণে ঢক্কানিনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ঢাকের গম্ভীর নিনাদে বুড়ীগঙ্গার তীরস্থ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে একজনকে পূর্ব্বদিকে, একজনকে পশ্চিম দিকে, আর একজনকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিলেন। যে স্থানে ঐ গম্ভীর ঢাকের শব্দ আর শ্রুত হইবে না, সেই স্থানেই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের হস্তস্থিত পতাকা প্রোথিত করিতে আদেশ করিলেন। যে যে স্থানে ঐ পতাকা প্রোথিত হয়, সেই সেই স্থানে তিনি তাঁহার অভীপ্সিত রাজধানীর সীমা নির্ণায়ক স্তম্ভ নির্ম্মিত করেন। ঢাকের শব্দে এই নগরের সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল বলিয়া এই মহানগরী ঢাকা নামে প্রখ্যাতা হইয়াছে। নবাব ইসলাম খাঁ এই নগরকে তদানীন্তন দিল্লীর বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নামানুসারে জাহাঙ্গীর নগর নাম প্রদান করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এ নামে ঢাকা কখনই পরিচিতা হয় নাই।

ঢাকা নামের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে খাঁ বাহাদুর যাহা বলিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। যে সময় নবাব ইসলাম খাঁ ঢাকায় আসিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন,—সে সময় ঐ স্থান জনশূন্য প্রান্তর ছিল না। তথায় জনপদ ছিল। নতুবা হিন্দুরা তথায় ঢাক বাজাইয়া পূজা করিবে কেন? শক্তি-পূজা ও চড়কপূজা ভিন্ন অন্য কোন সময় হিন্দুরা ঢাক বাজায় না। যে সময় ইসলাম খাঁ ঢাকায় আসিয়াছিলেন,—সে সময় চড়কপূজার সময় নহে, শক্তি-পূজারও সময় নহে। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান হইতেছে যে, হিন্দুগণ ঢাকে-শ্বরীর মন্দিরেই পূজা দিতেছিলেন বা পূজা দিতে যাইতেছিলেন। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, সম্রাট বল্লালসেন কর্ত্তৃক ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রতিষ্ঠিতা। ঐই জন-শ্রুতিতে অবিশ্বাস করিবার কোন সন্তোষজনক কারণ নাই। খাঁ বাহাদুর বলেন, মন্দিরের গঠনভঙ্গী দেখিয়া উহা মহারাজ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয় না,—মোগল রাজত্বকালের কোন সময়ে নির্ম্মিত বলিয়াই মনে হয়। খাঁ বাহাদুরের দ্বিতীয় কথা, ঐ ঘটনার পূর্ব্বে কোন সময় ঢাকা নামে ঐ স্থানে কোনও নগরী ছিল, সরকারী দলিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না; আইন-ই-আকবরীতে

উহার উল্লেখ নাই। প্রথমতঃ, মন্দিরের গঠনভঙ্গি দেখিয়া তাহার প্রতিষ্ঠাকালের অনুমান করা কখনই নিরাপদ হইতে পারে না, বল্লাল সেনের সময় হইতে মোগল রাজত্বের সময় পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলের স্থাপত্য কিরূপ ছিল, তাহার নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, যে সময় ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, সেই সময়েই বর্ত্তমান মন্দির গঠিত হইয়াছিল, কি তাৎকালিক মন্দির জীর্ণ ও ভগ্ন হওয়ায় তাহার স্থানে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারও নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, ঢাকা নগরীর বয়স তিন শত বর্ষমাত্র। এই তিন শত বর্ষের মধ্যে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইলে উহার প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতির কথা একেবারেই বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়া যাইত না। খাঁ বাহাদুর যদি বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তখনকার কোন অশীতিপর বৃদ্ধকে এই বিগ্রহ ও মন্দির সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলেও তিনি "বল্লাল সেনই উক্ত মন্দির ও বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা" ইহাই শুনিতে পাইতেন। এরূপ জনবহুল স্থানে দুই এক শত বৎসরের মধ্যে যে মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এরূপ প্রাচীন কিম্বদন্তীর বা জনশ্রুতির প্রচলন অসম্ভব না হউক, অত্যন্ত কঠিন। খাঁ বাহাদুর স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, কোন্ বৎসর বা কোন্ সময়ে এই নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। কোন্ সময়ে বা কাহার রাজত্বকালে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে, খাঁ বাহাদুর তাহা বলিতে পারেন কি? তাহা যদি না জানা যায়, তাহা হইলে জনশ্রুতিকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। অন্ততঃ নবাব ইসলাম খাঁর প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সহর অপেক্ষা ঢাকেশ্বরীর প্রাচীনত্বে বিশ্বাস করিতে যেন সহজেই প্রবৃত্তি জন্মে। আইন-ই-আকবরীতে বা সরকারী কোন প্রাচীন কাগজপত্রে ঢাকা সহরের নামোল্লেখ নাই,—ইহাতে ঐ স্থানে যে কোন ক্ষুদ্র জনপদ ছিল না, এ কথা সপ্রমাণ হয় না। যে সময় আইন-ই-আকবরী লিখিত হয়, সে সময় ঐ অঞ্চল মোগলদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল। খাঁ বাহাদুর স্বয়ং বলিয়াছেন যে, নবাব ইস্লাম খাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবের আমলে ঐ অঞ্চল মোগলদিগের করায়ত্ত হয়। সুতরাং তৎসময়ে মোগলদিগের দলিলপত্রে সেই ক্ষুদ্র পল্লীর নাম থাকা সম্ভবে না। পাঠানদিগের সময়ের ইতিহাস ও কাগজপত্র অসম্পূর্ণ ছিল। সুতরাং সরকারী কাগজপত্রে ঢাকার নাম না থাকিলেও ঐ স্থানে ঐ নামের কোনও ক্ষুদ্র নগরী ছিল না, ইহা সপ্রমাণ হয় না।

কেহ কেহ বলেন, ঐ স্থানে ঢাক গাছের জঙ্গল ছিল, সেই জন্য উহার নাম ঢাকা হইয়াছে। এখন কিন্তু ঐ অঞ্চলে ঐ গাছ আদৌ জন্মে না। সুতরাং ঐ অনু-

মান সত্য বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। এই ঢাকার সান্নিধ্যেই ১৬১২ খৃষ্টাব্দে পাঠান দলপতি যুদ্ধে নিহত হয়েন। পূর্ব্ববঙ্গে পাঠানের দৌরাত্ম্য সেই হইতেই কমিয়া যায়। ইসলাম খাঁর প্রভাবে আরাকানের মগগণ ভগ্নবিষাণ ও পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেগণ ভয়চকিত হইয়া পড়ে। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজা ঢাকা হইতে তাঁহার রাজধানী রাজমহলে উঠাইয়া লইয়া যায়েন। কিন্তু সে সময় বাঙ্গালার নবাবের অনেক সেরেস্তাই ঢাকায় রহিয়া যায়। তৎপরে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব নাজিম মীরজুম্লা পুনরায় ঢাকাতেই রাজধানী স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকাই বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ ঐ বৎসর মুর্শিদাবাদ সহরে বাঙ্গালার রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যাযেন। সেই সময় হইতে মুর্শিদাবাদ নায়েব নাজিমের বাসস্থানে পরিণত হয়। মুর্শিদাবাদেই মুসলমান-দিগের গৌরবভাস্কর চিরতরে অস্তমিত হয়।

ঢাকার সহিত মুসলমান ইতিহাসের অনেক স্মরণযোগ্য ইতিহাস জড়িত। এই স্থানেই নবাব সায়েস্তা খাঁ টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় করিয়া যায়েন। সৌভাগ্য সমৃদ্ধিতে এক সময় ঢাকা বাঙ্গালার প্রধান স্থান অধিকৃত করিয়াছিল।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কীটাণু-তত্ত্ব।

—::—

(ইতিহাস)

(৩)

—::—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পাস্তর এ পর্য্যন্ত পচনক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করিতে-ছিলেন। এখন তিনি গুটিপোকার সংক্রামক ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে মনোনিবেশ করিলেন। বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিয়া তিনি শেষে প্রতি-পন্ন করেন যে, এই ব্যাধি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে উৎপন্ন, এবং এই সকল

কীটাণু এত ক্ষুদ্র যে, কেবল অণুবীক্ষণের সাহায্যেই দৃষ্ট হইতে পারে। কর্ণেলিয়া প্রথমে এই সকল কীটাণু দেখিয়াছিলেন। নসেমা এবং লেবার্ট কর্ত্তৃক ইহারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু সকলেই এই ব্যাধির ভেষজনির্ণয়ে ব্যর্থশ্রম হইয়াছেন। পাস্তুর অনেক চেষ্টার পর এই ব্যাধির প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, যদি কোন ব্যাধিগ্রস্ত গুটিপোকাকে জলের সহিত বাটিয়া ফেলা যায় এবং ঐ মিশ্র পদার্থকে পত্রের উপর তুলি দ্বারা লাগাইয়া সুস্থ পোকাদিগকে তাহা ভক্ষণ করান যায়, তাহা হইলে তাহারা ব্যাধিগ্রস্ত হয়। ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, কীটাণুর বীজসকল গুটিপোকার ডিম্বকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। সুতরাং ডিম্বসকলকে বিনষ্ট করিতে পারিলে এই ব্যাধির উৎপত্তি নিবারণ করা যাইতে পারে। স্ত্রীজাতীয় গুটিপোকাগুলিকে পৃথক্ করিয়া রেশমী কাপড়ে ডিম্ব পাড়িতে দেওয়া হয়; এবং সেই কীটজননীকে ভবিষ্যতে পরীক্ষার জন্য কাপড়ের এক কোণে আলপিন্ দিয়া গাঁথিয়া রাখা হয়। কিছুদিন পরে সেই গুটিপোকাকে জলের সহিত বাটিয়া এক এক ফোঁটা করিয়া জল অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় যদি কোন জীবাণু লক্ষিত হয়—তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ডিম্ব সকলকে পুড়াইয়া ফেলা হয়। কিন্তু জীবাণু লক্ষিত না হইলেই তাহাদিগকে ব্যবহার জন্য রাখা হয়।

সংক্রামক ব্যাধির সহিত কীটাণুর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে এরূপ প্রমাণ হইল না যে, কীটাণু হইতেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। কীটাণু সকলকে ব্যাধিগ্রস্ত গুটিপোকার গাত্র হইতে পৃথক্ করিবার কিম্বা তাহাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করাইবার কোন উপায় লক্ষিত হইল না। ডানেনাকের পরীক্ষার ফলও প্রতিবাদসাপেক্ষ। তিনি বলিয়াছিলেন যে, Spleenic Fever দণ্ডাকৃতি কীটাণুর দ্বারা উৎপাদিত। অনেকে বলিতে লাগিলেন, যদি এই সকল দণ্ডাকৃতি কীটাণু-বিশিষ্ট রক্ত দ্বারা কোন সুস্থ মেষকে সংক্রামিত করা যায়, তাহা হইলে সেই মেষের মৃত্যুর পর তাহার রক্তে দণ্ডাকৃতি কীটাণু লক্ষিত হয় না। আবার কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলিতে লাগিলেন, উক্ত ব্যাধির দণ্ডাকৃতি-কীটাণু-বর্জ্জিত রক্ত দ্বারা সুস্থ মেষকে সংক্রামিত করিলে সেই মেষের রক্তে দণ্ডাকৃতি কীটাণু লক্ষিত হয়। অনেকেই প্রতিবাদ করেন যে, Anthrax কিম্বা Spleenic Fever এর প্রাদুর্ভাব কোন কোন ঋতুতে বা কোন কোন স্থানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বলিন্‌জার প্রমাণ করেন যে, Anthraxএ রক্ত দণ্ডাকৃতি-কীটাণু-বর্জ্জিত হইলেও তাহাদের বীজ সকল বহু দিন পর্য্যন্ত বিষাক্ত থাকে। এই

বীজ সকল মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইবার পর জন্তুগণ জল ও তৃণ হইতে উক্ত ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক রবার্ট কক্ উক্ত Anthrax ব্যাধির সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাহাতে তিনি উক্ত ব্যাধির কারণ ও নিদান বিশদভাবে বর্ণনা করেন। কি প্রকারে এই সকল কীটাণু প্রাণী-দেহে পরিবর্দ্ধিত ও কি প্রকারে বীজ সকলের উদ্ভাবন হয়, এই পুস্তকে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা হয়। ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রাণি-দেহ ব্যতিরেকে কীটাণুর উৎপত্তির নিমিত্ত "Solid Media" প্রস্তুত করিয়া এই বিজ্ঞান চর্চ্চার পথ অনেক পরিমাণে সুপ্রশস্ত করিয়া দেন। এই সময়ে পাস্তুরও Anthraxএর আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়েই কক্ কীটাণু তত্ত্বে চারিটি স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ করেন।

(১) কীটাণু কিম্বা তাহার বীজ প্রাণি-দেহের রক্তে কিম্বা মাংসে বর্ত্তমান থাকিবে।

(২) এই কীটাণুগুলি প্রাণি-দেহের রক্ত মাংস প্রভৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া কৃত্রিম Mediaতে উৎপন্ন করিতে হইবে।

(৩) কৃত্রিম Media তে নব উৎপাদিত কীটাণু সকলকে সুস্থ প্রাণিদেহে প্রবেশ করাইলে উক্ত ব্যাধির চিহ্ন লক্ষিত হইবে।

(৪) উক্ত সংক্রামিত প্রাণিদেহ হইতে কৃত্রিম উপায়ে উক্ত কীটাণুসকলকে পৃথক্ করিতে হইবে।

উপরোক্ত চারিটি স্বতঃসিদ্ধ কীটাণু-তত্ত্বকে দৃঢ়তর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছে। ইহা প্রকাশের চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে অনেক সংক্রামক ব্যাধির কীটাণুর আবিষ্কার হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লোএফ্‌লার এবং স্নুজ অশ্বজাতির Glandars নামক এক সংক্রামক ব্যাধির কীটাণুর আবিষ্কার করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কক্ এসিয়াটিক বিসূচিকার কীটাণু আবিষ্কৃত করেন।

রাজযক্ষ্মা যে সংক্রামক ব্যাধি তাহা ভিলিম্যান প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কক্ এই ব্যাধি-কীটাণুর আবিষ্কার করেন। যে নিবন্ধে ককের উক্ত আলোচনার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা চিরকাল কীটাণুতত্ত্ব সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। আবিষ্কারক অধ্যাপক ককের নামানুসারে এই কীটাণুকে সাধারণতঃ "ককের কীটাণু" বলা হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইবার্থ টাইফয়েডের কীটাণু ও ক্লেবস্ ডিপ্থিরিয়ার কীটাণু আবিষ্কৃত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লফ্নারের দ্বারা এই আবিষ্কার বিশেষরূপ প্রমাণিত হয়। সেই বৎসর জাপান দেশীয় কীটাসাটো ধনুষ্টঙ্কারের ও প্লেগের কীটাণুর আবিষ্কার করেন।

যদিও প্রত্যহই বৈজ্ঞানিক জগতে নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে—তথাপি বহু চেষ্টা সত্বেও অদ্যাপি অনেক সংক্রামক ব্যাধির কীটাণু আবিষ্কৃত হয় নাই। মানুষের বসন্ত ও গো বসন্তের কীটাণু আজিও নিরূপিত হয় নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

গঙ্গাবক্ষে।

(কাশীধামে।)

ওই বক্ষে কোন শান্তি সুধা নিরমল
বহে যুগযুগান্তর কহ, প্রবাহিণী ?
তোমার বিমল নীর কি স্নিগ্ধ-শীতল,
জুড়ায় জীবন-তাপ দিবস-যামিনী !
ত্যজি' হিমাদ্রির গেহ ভারত-মণ্ডলে
বহাও অমৃতধারা স্নেহে নিরন্তর।
কিন্তু কোন্ পবিত্রতা বারাণসী-জলে,
স্পর্শিতে অধীর কোটী জীবের অন্তর ?
অলক্ষে নিবসে মুক্তি মণিকর্ণিকায়,
কি মহাশ্মশানে সৃষ্টে আনন্দ-কানন !
ঊর্দ্ধগতি জীবনের সৈকত-চিতায়
মর্ত্ত্য-ঐশ্বর্য্যের বুকে বৈরাগ্য সৃজন !
বিশ্ব-বুকে বারাণসী সর্ব্বতীর্থসার,
হরজটা বিলোড়িত উল্লাসে তোমার।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বিদায়-চুম্বন।

"স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম বটে ; কিন্তু মন সেই সুদূর ভারতে পড়িয়া আছে। পিতৃ-পুরুষের পুরাতন আবাসে ইহলীলা সংবরণ করিবার অভিলাষে বাল্যস্মৃতিবিজড়িত ইংলণ্ডে আসিলাম বটে, কিন্তু ভারতে যদি মরিতে পারিতাম!—যে দেশে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়াছি—সে দেশে দেহভার ন্যস্ত করিতে পারিলে কত সুখ! এ দেশের শীতার্ত্ত-গগনতলে তুষার-শীতল-বাত্যাভিঘাতে জীবনের সায়াহ্নকাল অতিবাহিত করার অপেক্ষা ভারতের সেই মধুরমলয়হিল্লোলে রম্য রবিকরতাপে জীবনের যে অংশ যাপন করিয়াছি, তাহার স্মৃতি কত সুখের!" এই কথা বলিয়া প্রৌঢ়া তাঁহার পদমূলে উপবিষ্টা কনককেশী বালিকা এভেলিনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি যে দেশে বাস করিতাম, সে দেশে প্রীতি, শান্তি, স্নেহ, মমতা, অনুরাগ বিরাজিত। এক্ষণে আমি জীবনের চরম সীমায় উপনীত। এ দেশে সূর্য্য কিরণ বিতরণ করে সত্য, কিন্তু তথায় সূর্য্যের যেরূপ তেজ এখানে সেরূপ নাই। সময়ে সময়ে সে তেজ সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করে বটে"—এই কথা বলিয়া ভারতের গ্রীষ্ম তাঁহার যৌবন-সৌন্দর্য্যের উপর যে কি ভীষণ উপদ্রবই করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া বিগতযৌবনা বর্ষীয়সী অতি বিষণ্ণভাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পদতলে উপবিষ্টা বালিকা বলিল, "কিন্তু তথায় ত প্রাবৃটের নিরবচ্ছিন্ন মেঘরাশি নীল আকাশকে আচ্ছন্ন করে।"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "হাঁ, তাহা সত্য বটে, কিন্তু বর্ষান্তে মেঘমুক্ত গগন কি সুন্দর—কি গাঢ় নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়!" বলিয়া প্রৌঢ়া গৃহের উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া ইংলণ্ডের তৎকালীন নিদারুণ শৈত্যপ্রাখর্য্যের প্রতি বালিকার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন ; বলিলেন, "তুমি তরুণী। যে স্থানে রজনী দিবাভাগ অপেক্ষা অধিকতর রমণীয়, সেই স্থান তোমার নিকট অতি মনোরম। সেরূপ মধুর জ্যোৎস্না হেথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। নাইটেঙ্গেলের গান অপেক্ষা শ্যামার স্বরলহরী অধিক মিষ্ট।—তুমি সেই স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত, আর আমি এই শীতপ্রধান দেশে একাকী নীরবে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি!"

এভেলিন্ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি স্বদেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষকে এত অধিক ভালবাস কেন? তোমার কথায় আমি বিস্মিত হইতেছি—আমি জানি, আমার প্রবাসী দেশবাসীরা সুদূর ভারতে সারাজীবন পরিশ্রমের পর স্বদেশে ফিরিবার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করে।"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "কেন আমি ভারতবর্ষকে এত ভালবাসি, তাহা তুমি কি বুঝিবে? ভারতবর্ষ আমার প্রতি বিশেষ কিছু দয়া প্রকাশ করে নাই—বরং তথায় অধিক দিন অবস্থানহেতু আমি স্বাস্থ্য ও প্রিয় আত্মীয় স্বজনকে চিরকালের জন্য হারাইয়াছি।" বালিকার

কুঞ্চিত কেশরাশির উপর শুভ্র শীর্ণ হস্ত স্থাপিত করিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "বৎসে! তুমি কি বুঝিবে? যথায় মর্ম্মরায়মান তালকুঞ্জ হইতে বুল্‌বুল্ আত্মহারা হইয়া সান্ধ্য সমীরণে আপনার স্বরলহরী মিশাইত, যথায় আমাদের স্বামীস্ত্রীতে প্রথম সাক্ষাৎ, যথায় আমরা একই কার্য্যে আমাদের জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছিলাম—উভয়ে একই সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া জীবনযাপন করিয়াছিলাম, যথায় প্রাণাধিককে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, যথায় যথার্থই আমি 'জীবনের' আস্বাদ পাইয়াছি—পুনরায় তথায় যাইয়া তাঁহার শেষ শয্যার অংশ গ্রহণ করিবার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে—কিন্তু তাহা আর হইবার নহে।"

প্রৌঢ়ার ঈদৃশ চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া এভেলিন্ বলিল, "আর বলিতে হইবে না, আমি বেশ বুঝিয়াছি।"

প্রৌঢ়া উত্তর করিলেন, "তথায় যাইয়া কিছু দিন অবস্থান করিলে তুমি আরও ভালরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবে। সেই এত ঘৃণিত ভারতবর্ষ—যুবকযুবতীদিগের পক্ষে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় স্থান।" আপনার আনন্দময় যৌবনের সুখস্মৃতি স্মরণ করিয়া প্রৌঢ়া মৃদু হাস্য করিলেন।

এভেলিন্ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "না, ভারতবর্ষ তোমার নিকট যেইরূপ মনোরম হইয়াছে, আমার নিকট সেরূপ হইতেই পারে না। আমি বিবাহের নিমিত্ত তথায় যাইতেছি।"

প্রৌঢ়া উত্তর করিলেন, "এভেলিন্, তুমি বিবাহ করিও না এবং তথায় যাইও না।"

বালিকা হাস্য ও ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে বলিল, "আমি তথায় যাইব ও বিবাহ করিব।"

* * * * * *

ইংলিশ্ চ্যানেলের উপর দিয়া এক খানি বাষ্পীয়পোত গন্তব্যপথে ছুটিতেছিল।—ডেকের উপর একটি পূর্ণচন্দ্রনিভাননা সুন্দরী বালিকা দাঁড়াইয়া সুদূর সমুদ্রতীরে স্বদেশের দিকে কৌতূহলপূর্ণ নয়নে দেখিতেছিল। নিকটে কেহই ছিল না। নৈরাশ্যব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বালিকা পরিত্যক্ত জন্মভূমির দিকে স্বীয় হস্তদ্বয় একবার প্রসারিত করিল। চতুর্দ্দিকে সমুদ্রতরঙ্গ উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল—ফেনরাশি বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল, সূর্য্যকিরণ সমুদ্রের উপর পতিত হওয়ায় বিক্ষিপ্ত বারিকণা মুক্তার ন্যায় ঝলকিতে লাগিল। বালিকা নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত মাতৃভূমির কথা স্মরণ হওয়ায় তাহার নারীসুলভ কোমল হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল—কণ্ঠ রুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন ঘনীভূত কুজ্‌ঝটিকায় নীল আকাশ ও সমুদ্র বিলীন হইয়া গেল। বালিকা ভাবিতে লাগিল, এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র একজনের জন্য আমি স্বদেশ ছাড়িয়া চলিয়াছি—তিনি আমার জন্য অতি ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

পশ্চাতে বালিকা কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল;—ফিরিয়া দেখিল, একজন যুবক অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। যুবক অতি বিনীতভাবে বালিকাকে

জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে একখানা চেয়ার আনিয়া দিব কি ?" বালিকার মুখে প্রসন্ন হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, তাহার সুকোমল গণ্ডস্থল রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। চঞ্চল নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সে বিনয়সহকারে সলজ্জভাবে যুবককে বলিল "না। ধন্যবাদ।" এই বলিয়া সে জাহাজের নিম্নতলে নামিয়া গেল।

বালিকাকে লজ্জিত দেখিয়া যুবক ঈষৎ হাস্য করিল। তাহার মনে হইল, বালিকা বিদ্যালয়ের অবকাশ উপভোগ করিবার জন্য ভারতবর্ষে পিতামাতার নিকটে যাইতেছে। তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও রমণীয় কান্তি দর্শনে যুবক একেবারে মোহিত হইল। সে ক্ষিপ্রগতিতে ও অন্যমনস্কভাবে ডেকের উপর পদচারণা করিতে লাগিল;—মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বালিকামূর্ত্তি তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইল না। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল "আরও এক বৎসর আমি স্বাধীন; নানা স্থানে ঘুরিয়া নূতন নূতন আমোদে সময়টা কাটাইতে পরিব। তাহার পর? তাহার পর বিবাহিত জীবনের রীতি অনুসারে আমাকে সম্যকভাবে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গ্যাসৃকনি মেসেঞ্জার একটি চুরুট্ ধরাইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল "অড্রি, তুমি আমার নিকট অতি প্রিয়, কিন্তু স্বাধীনতা প্রিয়তর।" অড্রির নাম করিতেই যুবকের কল্পনানয়নসমক্ষে তাহার নববিকশিত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যে তাহার হৃদয়ের একটি তারও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল না। সে সৌন্দর্য্যের স্মৃতিতে তাহার হৃদয়ে এককণা প্রেমও জাগিল না। অড্রি গ্যাসৃকনীর ভাবী পত্নী।

এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্যাসকনীতে ও এভেলিনে প্রেমালাপ চলিতে লাগিল।

* * * * * * *

রাত্রি অতি মনোরম,—মেঘহীন ও নক্ষত্রপরিশোভিত। এভেলিন্ ড্যারিং অনুভব করিল যেন গভীর নিশীথের শান্তি ও স্নিগ্ধতা তাহার যুবতী-জীবনের কতকটা অবসাদ অপসারিত করিয়া তাহার হৃদয়কন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়া বুরুজে পৌঁছিয়া ষ্টীমার নঙ্গর করিল। পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত ষ্টীমার এই স্থানেই অবস্থান করিবে। এভেলিন্ জাহাজের রেলিং এর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া সম্মুখের নূতন নূতন দৃশ্য দেখিতে লাগিল। পার্শ্ব হইতে গ্যাসৃকনি তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিল, "এভেলিন্, আজ রাত্রিতে অন্য চিন্তায় কায নাই। আইস, আমরা আজ আমাদেরই চিন্তায় মগ্ন থাকি। কারণ, বোধ হয় আমরা আর কখনও মিলিত হইতে পারিব না।"

সহসা গ্যাসকনির দিকে ফিরিয়া এভেলিন্ বলিল "আজিকার রাত্রি এতই স্নিগ্ধ, আকাশ এতই সুন্দর, যে আমি সকল জিনিসই—এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছি।"

উত্তরে গ্যাসৃকনি বলিল, "এভেলিন্, অতি সুন্দর রাত্রি, আমার মনে হইতেছে, কোন একখানি পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম 'ভারতবর্ষে না আসিলে আমরা মানবহৃদয়ের উপর নক্ষত্ররাজির প্রভাব বুঝিতে পারি না।' কিন্তু আমার নিকট এরূপ মধুর রজনী আর কখনও আসিবে না।"

বালিকা এভেলিন্ গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল "আমার অদৃষ্টেও তাহাই আছে।"

গ্যাস্‌কনি এভেলিনের হস্তদ্বয় নিজকরতলে স্থাপন করিয়া বলিল, "এভেলিন্‌, তুমি কিম্বা আমি যদি সম্পত্তিশালী হইতাম। অদ্রি বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী না হইয়া যদি তুমি হইতে, তাহা হইলে তুমি কি এই আমার মত কপর্দ্দকবিহীন সৈনিকের নিকট এত হীনতা স্বীকার করিতে ?"

এভেলিন্‌ অতি মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ, গ্যাস্‌কনি, তুমি বোধ হয় জান, তোমার পদতলে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার জন্য আমি ইহা অপেক্ষা অধিক হীনতা স্বীকার করিতাম।" একেবারে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া বিশেষ অপ্রতিভ ও আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া গ্যাস্‌কনির হস্ত হইতে স্বীয় হস্ত ছিনাইয়া লইয়া এভেলিন্‌ চলিয়া গেল।—গ্যাস্‌কনি মেসেঞ্জার কোন বাধা না দিয়া তাহার পশ্চাদ্গামী হইল। সে জাহাজের নিম্নতলে সোপানের নিকট বালিকাকে অভিমানভরে বলিল, "এভেলিন্‌, এই আমাদের শেষ রাত্রি—আজ এই বিদায়-সময়ে হতভাগ্য গ্যাস্‌কনির নিমিত্ত কি একটি কথা, একটি —"গ্যাস্‌কনি কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই এভেলিন্‌ হস্ত প্রসারিত করিয়া স্থির স্বরে বলিল "তবে বিদায়।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। পরে উদ্বেলিত হৃদয়ে গ্যাস্‌কনি কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "খুব সম্ভব, আমাদের পরস্পরের আর মিলন হইবে না। ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ ; আশা করি, এদেশে তোমার জীবন শান্তিময় হইবে। আমি চিরকালই ঘুরিয়া বেড়াইব। ভারতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার আর কোনও সম্ভাবনা নাই। এভেলিন্‌, তুমি কি আমার একটি সামান্য অনুরোধ রাখিবে না ? আমি বার বার তোমার নিকট সেই ভিক্ষা চাহিয়াছি।"

গ্যাস্‌কনি কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল যে, সে জিতিয়াছে। লজ্জাবশতঃ বালিকার কপোল রক্তাভ হইয়া উঠিল। তাহার সুকোমল অধরপুটে গ্যাস্‌কনি স্বীয় ওষ্ঠাধর স্থাপিত করিয়া হৃদয়ে অগাধ তৃপ্তি অনুভব করিল। হায় ! তখন কে জানিয়াছিল যে, এই চুম্বনই অঘটন ঘটনের মূল !

পরমুহূর্ত্তেই এভেলিন্‌ দেখিল, চার্লস্‌ বেসেট্‌—যাহাকে সে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল—জাহাজের সোপানের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। সে এই বেসেটের বাগদত্তা পত্নী। বালিকা বুঝিল,—তাহার জীবনের সমস্ত আশার শেষ হইল। এভেলিন্‌ জানিত, বেসেট্‌ কঠোর—অতি কঠোর—তাহার হৃদয়ে ক্ষমার স্থান নাই।

* * * * *

ইহার পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বেসেট্‌ কোন মতে আত্ম সম্বরণ করিতে পারিল না ; এই দৃশ্যে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। সে গ্যাস্‌কনির স্পর্দ্ধার কথা ভাবিয়া শত বার তাহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল—এভেলিনের প্রতি তাহার ঘৃণা বদ্ধমূল হইল।

সে এভেলিনের নিকট দৌড়াইয়া যাইয়া কঠোর স্বরে বলিল "এভেলিন্‌, তোমার নিকটে

যে যে বিষয়ে আমি প্রতিশ্রুত আছি সে সবই সম্পন্ন করিব। কিন্তু তুমি অপর একজন পুরুষকে ভালবাস জানিয়া তোমাকে আমি বিবাহ করিতে পারি না।" নক্ষত্র খচিত নীল চন্দ্রাতপতলে ভাগীরথীবক্ষে জাহাজের ডেকের উপর সেই প্রণয়িপ্রণয়িণীর আগ্রহপূর্ণ আলিঙ্গন ও আবেগময় চুম্বনের চিত্র বেসেটের হৃদয়ে চিরাঙ্কিত রহিল। সে ছবি বেসেট্ তাহার প্রস্তরকঠিন হৃদয় হইতে আর মুছিতে পারিল না।

বালিকা এভেলিন্ এই কলঙ্কের কথা ভাবিল। একবার তাহার স্বদেশে ফিরিবার সাধ হইল। বেসেটের নিকট কোনরূপ অনুগ্রহ লাভের সম্ভাবনা তাহার হৃদয় হইতে দূর হইল। সে কোন দিকেই একটা বন্ধন খুঁজিয়া পাইল না। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার কেহই ছিল না। তবে কেন সে এ কলঙ্ক-পসরা মাথায় লইয়া দীর্ঘ-জীবন অতিবাহিত করিবে? জীবন তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল।

এভেলিন্ অল্পবয়স্কা ও অদূরদর্শিনী। পরদিন প্রভাতের পূর্ব্বেই দেখা গেল, বালিকার ক্ষুদ্র শুভ্র দেহখানি নদীবক্ষে তরঙ্গাভিঘাতে ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতেছে। তাহার সকল দুঃখ, সকল কলঙ্ক ভাগীরথীর শীতল জলরাশির স্পর্শমাত্রই শান্তিতে বিলীন হইয়াছে। এইরূপে এভেলিনের কলঙ্কিত জীবনের অবসান হইল।*

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

---

* প্রেসান-লিখিত গল্প হইতে।

সমালোচনা।

—•-•:⁂:•-•—

প্রেম ও প্রকৃতি।*

আমেরিকান কবি পো বলিয়াছিলেন, কবিতা দীর্ঘ হয় না—হইতে পারে না। পো স্বয়ং গীতিকবিতার রচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তির অর্থ এই যে, কবিতা দীর্ঘ হইলে তাহাতে সর্ব্বত্র সমান উৎকর্ষ থাকে না। আবার দীর্ঘ কবিতা—মহাকাব্য শ্রোতৃবর্গের জন্য রচিত হইত; অবসরের অভাবে বিপন্ন পাঠকদিগের পক্ষে—এই পুস্তকবাহুল্যের দিনে মহাকাব্য পাঠ ও তাহার রস উপভোগ দুষ্কর কার্য্য। বিশেষ সময় সময় লোক মহাকাব্যের—দীর্ঘ কবিতার বাহুল্যে বিব্রত হইয়া পড়ে। তখন ক্ষুদ্র কবিতার সমাদর অবশ্যম্ভাবী। ইংরাজী সাহিত্যে টেনিসনের অসাধারণ সমাদরের ইহাও অন্যতম কারণ। বাঙ্গালা সাহিত্যেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী একদিন বাঙ্গালীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তাহার পর—নব্য বঙ্গে যখন মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র দীর্ঘ কবিতায় বাঙ্গালীর জীবনের নূতন ভাব বিকশিত করিতেছিলেন—সেই সময় রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন—এখন সংক্ষিপ্ত না হইলে সাফল্যলাভের উপায় নাই। তাই 'কবি-কাহিনীর' কবি 'ভানুসিংহ' রূপে বাঙ্গালার কবিকুঞ্জে দেখা দিলেন। তাহার পর 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী' ও 'সোনার তরী'—গীতি-কবিতার রাজ্যে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর নিকট সমাদরলাভে বঞ্চিত হয় নাই।

কিন্তু দীর্ঘ কবিতা যে সর্ব্বত্রই বিরক্তিকর—দীর্ঘ কবিতার যুগ যে অতীত হইয়াছে—এমনও বলা যায় না। কবিপ্রতিভা যাহাকে সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, তাহার সমাদর অবশ্যম্ভাবী। কবি কিট্‌স্ সত্যই বলিয়াছেন,—যাহা সুন্দর, তাহা নিত্য আনন্দের। বাল্মীকির 'রামায়ণ', হোমরের 'ইলিয়ড',

* প্রেম ও প্রকৃতি—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত। কলিকাতা; ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব'—চির দিন রসপিপাসু পাঠকদিগকে আকৃষ্ট ও বিমোহিত করিবে।

আবার দীর্ঘ কবিতারও প্রকারভেদ আছে। একরূপ দীর্ঘ কবিতা বিচিত্র—বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্রের সমষ্টি; সকলগুলি একটা কোন মানবীয় ভাবের সূত্রে সংবদ্ধ। কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'মেঘদূত' এইরূপ কাব্যের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অকালনির্ব্বাপিতজীবনদীপ প্রতিভাবান সমালোচক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"খণ্ড খণ্ড চিত্র রচনায় কালিদাসের একটু যেন বিশেষ আনন্দ ছিল। শম্বুক যেমন অতি সহজেই আপনার চারিদিকে বিচিত্রচিত্রিত আবরণ নির্ম্মাণ করে, কালিদাসের প্রতিভা তেমনি দেখিতে দেখিতে আপনাকে চিত্রময় শ্লোকে আবৃত করিয়া তোলে। * * * * একটা চিত্রশালা দেখিয়া আসিলে যেমন মনের ভাব হয়, সমস্ত রঘুবংশ পাঠ করিলেও সেইরূপ হয়। অনেকগুলি ফ্রেমে বাঁধানো ভাল ভাল ছবি।" এইরূপ কাব্য দীর্ঘ হইলেও বিরক্তিকর হয় না। বিশেষ কবির যদি চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা থাকে—তিনি যদি ভাবসম্পদে ধনী ও সেই ভাবকে ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতার অধিকারী হয়েন, তবে তাঁহার কাব্য দীর্ঘ হইলেও বিরক্তিকর না হইয়া আনন্দদায়ক হয়। গ্রন্থকারের এই সকল গুণ আছে বলিয়াই আমাদের আলোচ্য কাব্যগ্রন্থখানি—নগেন্দ্র বাবুর 'প্রেম ও প্রকৃতি' বিরক্তিকর না হইয়া প্রীতিপ্রদ হইয়াছে।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার সরস—মধুর ভাষায়, অনাহতগতি ছন্দে—ভারতের বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ও শিল্পকীর্ত্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। চিত্রগুলি নিপুণ চিত্রকরের অঙ্কিত—বর্ণের বৈচিত্র্য আছে, বাহুল্য নাই; একটি ও অনাবশ্যক রেখায় চিত্র ভারাক্রান্ত হয় নাই; কোনরূপে যাহাতে চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট না হয়, চিত্রকর সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক। কবি চিত্রের বিষয় নির্ব্বাচনেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রকৃতির অংশ অনিন্দ্য সুন্দর। কিন্তু সে অংশ যেরূপ সমুজ্জ্বল ও সুন্দর, প্রেমের অংশ সেরূপ নহে—বরং তুলনায় ম্লান। কালিদাস এই human interest সূত্রে বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি গ্রথিত করিতেন। রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে চিত্রগুলি রাহুমুখমুক্ত চন্দ্রের মত বিরহাবসানে মিলনে সমুজ্জ্বল প্রেমসূত্রে বদ্ধ ঃ—

তব বিম্বাধরসুধা-পিপাসী হৃদয়;
রঞ্জন-বিলম্ব আর সহে না এখন;
তট-বায়ু যেন তাই বুঝি এ সময়
কেতকী-পরাগে রঞ্জে ও বিধুবদন।

বিমান-গবাক্ষ-পথে তুমি যে সময়
পরশিতে মেঘমালা প্রসারিছ কর,
বিজলী-বলয় আনি'—ক্ষণতেজোময়
পরাইছে করে মেঘ—কিবা মনোহর।

ষোড়শ সর্গে চিত্রগুলি প্রোষিতভর্ত্তৃকার বিরহ-ব্যাকুলতা-সূত্রে বদ্ধ :—

যে পথে প্রমদাকুল চলিত নিশায়—
মুখর নুপুর চারু বাজিত চরণে
আপনার পথ হেরি' মুখের উল্কায়
সে পথে শৃগাল ফিরে আমিষান্বেষণে।

ক্ষোদিত পাষাণ-স্তম্ভে মুরতি-নিকর
ধুলায় বিবর্ণ হয়ে রয়েছে এখন ;
ত্যক্ত অহিচর্ম্ম পড়ি' আছে বক্ষোপর—
উরস অবরি' যেন রয়েছে বসন।

'মেঘদুতের' চিত্রগুলি পবনচালিতমেঘমালার মত কান্তাবিরহকাতর বিরহীর দীর্ঘশ্বাসে ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার যদি আলোচ্য গ্রন্থের প্রেমের ভাগ প্রকৃতির ভাগের মত সুন্দর ও সমুজ্জ্বল করিতে পারিতেন, তবে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অভিনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া অক্ষয় যশে যশস্বী হইতেন। কিন্তু এই পুস্তকে প্রেমের স্ফূর্ত্তি সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল নহে।

নাহি হৃদি, নাহি আশা, নাহি স্মৃতি, নাহি ভাষা,
কি দুঃখ তাহায় বল প্রেমিক সুজন ?
তুমি ত ধরায় থাকি' কিছুই রাখ নি বাকি,
তোমার কর্ত্তব্য শেষ—প্রেম-আরাধন।

আবার

ওই সৃষ্টি, ওই সুখ, ওই আশা, ওই দুঃখ,
ওই স্মৃতি, ওই রূপ, ও জন্ম-সাধনা।
ওই কাম, ওই মোক্ষ, ওই ধর্ম্ম, ওই লক্ষ্য,
ওই তাপ, ওই হর্ষ ও চির-কামনা।

এরূপ উক্তি গ্রন্থমধ্যে অধিক নাই। তাহার কারণ কবি প্রকৃতি-প্রেমে বিভোর, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, প্রকৃতির ভাবে তন্ময়। কবি ব্রায়েণ্ট প্রকৃতি-প্রেমের প্রমত্ততা সম্বন্ধে গাহিয়াছিলেন :—

যে জন প্রকৃতি সনে প্রণয়-প্রফুল্ল মনে
বাহ্য দৃশ্য মাঝে তা'র হয় আত্ম-হারা ;
শুধু তা'রি কর্ণে পশে সিক্ত শান্ত সুধারসে
প্রকৃতির প্রেমময় বচনের ধারা।

'প্রেম ও প্রকৃতির' কবি প্রকৃতি-প্রেমে আত্মহারা—তাই তাঁহার প্রকৃতি-বর্ণনা সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহী। 'পুরুষোত্তমে' সমুদ্রের বর্ণনায় এ কথা বুঝা যাইবে :—

"হে আদি সৃষ্টির রূপ, কি মহান্ অপরূপ
এ মহা-তীর্থের পাশে বারিধি তোমার !
বিস্ময়ে চৌদিকে চাই, আদি নাই, অন্ত নাই
কোথা এ ব্যাপ্তির শেষ তব পারাবার।
"ভ্রূভঙ্গে ভ্রূকুটী-ভরে হেলায় ইঙ্গিত ক'রে
জানাও কি অধীরতা প্রকৃতি-জীবনে ;
হৃদয়ে কি অভিলাষ পূরাইতে কোন্ আশ
এ ভীম তাণ্ডব তব শয়নে স্বপনে !
"আছাড়ি গরজে কূলে ঊর্ম্মিমালা ফুলে ফুলে
ছুটে আসে লক্ষ ফণী ফণা বিস্তারিয়া !
কি ভীষণ ! কি কল্লোল ! কি উন্মত্ত উতরোল !
প্রলয়-বিষাণ বাজে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া।
"তরঙ্গে মিশায় কায়, মিশি শোভে সুষমায়
বালুকা রজতশুভ্র সৈকত সুন্দর।
পৃথ্বী-উপকূল-রেখা, যতদূর যায় দেখা,
হিল্লোলিত ততদূর তরঙ্গ-ভূধর !"

এরূপ বর্ণনা গ্রন্থমধ্যে বহু স্থানে পাওয়া যায়। পড়িয়া মনে হয়, বায়রণের মত তিনি বলিতে পারেন :—

"There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society where none intrudes,
By the deep Sea, and music in its roar :
I love not Man the less, but Nature more."

কাশীর বর্ণনায় প্রাকৃতিক শোভার সহিত ভক্তির অপূর্ব্ব মিশ্রণ :—

"বিশ্বাকাশে বারাণসী, পূর্ণিমায় হেমশশী
ভূলোকে দ্যুঃলোকে তার তুলনা কোথায় ;
কি জানে সাধনবলে, অদ্বিতীয় ভূমণ্ডলে
স্বর্গ মর্ত্ত্য চরাচর চরণে লোটায়।

"জাগে কি চেতনা চিতে বিশ্বব্যথা নিবারিতে,
শান্তির সাম্রাজ্য মর্ত্তে অপূর্ব্ব সুন্দর ;
সাধনার পূর্ণ সৃষ্টি, শোভার সুবর্ণ বৃষ্টি,
ধূসর ধূর্জ্জটি-ভালে অৰ্দ্ধ শশধর !
"এ সংসার মহামরু, শান্তি-কাম-কল্পতরু,
ধরেছে বুকের 'পরে কি স্নিগ্ধ ছায়ায় ;
ভবদুঃখে ভাঙ্গা বুক লভে কি সান্ত্বনা সুখ,
এ তীর্থ-নিবাসে আসি জীবন-সন্ধ্যায় !"

শুষ্ক সীমা-নির্দ্ধারণও কবির কৌশলে সুন্দর হইয়াছে। তিনি হিমালয়কে বলিয়াছেন :—

"ভারত উত্তরে থাকি, পশ্চাতে তিব্বত রাখি,
ললাটে ভূস্বর্গ সম কাশ্মীর-কান্তার ;
রহিয়ে পুরবে চুমি, আসামের বনভূমি,
সৃজিয়াছে কিবা এক জলধি শোভার।"

গ্রন্থমধ্যে ভাবের দীপ্ত-দামিনী-স্ফুরণ বিরল নহে। আমরা তিনটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইব :—

"নীহারমণ্ডিত হায়, শ্যাম বনরাজী গায়,
দেখিবে ছায়ার সহ বর্ণের বিকাশ ;
এক মহীরুহে যথা দেখিবে সহস্র লতা
জড়প্রেমে বিশ্বপ্রেম অপূর্ব্ব-প্রকাশ।"

"তটিনী-তরঙ্গ প্রায় এ নরজীবন যায়,
পরাণে জাগিয়া উঠে অনন্ত উচ্ছ্বাস !
এত যে ধরার স্মৃতি, অমিয় জীবন-গীতি,
মরণের মহা স্বপ্নে হয় কি বিকাশ ?"

"ধন্য বিশ্বে বিশ্বনাথ, করি চির প্রণিপাত,
বিশ্বব্যাপী তব পূজা এ বিশ্ব মন্দিরে ;
প্রতি দেহে হৃদিস্থল, তুমি তায় সমুজ্জ্বল,
উষার কনকালোকে সন্ধ্যার তিমিরে।"

এইরূপে বর্ণনার বৈচিত্র্যে, ভাবের মাধুর্য্যে ও ভাষার লালিত্যে আলোচ্য পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে।

পুস্তকখানির কয়টি ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান আলোচনা শেষ করিব। বিরাম-চিহ্ন-সংস্থাপন বিষয়ে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম বহু স্থানে দৃষ্ট হইল ; কোথাও অনাবশ্যক বাহুল্য, কোথাও অকারণ কার্পণ্য। উদ্ধৃত অংশগুলিতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। উদ্ধার-চিহ্ন ও সঙ্কোচ-চিহ্ন সংস্থাপনেও

এইরূপ অমনোযোগ লক্ষিত হইল। এ বিষয়ে গ্রন্থকারের মনোযোগপ্রদান আবশ্যক।

গ্রন্থকার "বিমান" শব্দ আকাশ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবুও 'ছবি ও গানে' লিখিয়াছিলেন :—

"পশ্চিমে ডুবেছে ইন্দু, সম্মুখে উদার সিন্ধু,
শিরোপরি অনন্ত বিমান,
লম্বমান জটাজুটে যোগীবর করপুটে
দেখিছেন সূর্য্যের উত্থান।"

কিন্তু "বিমান" অর্থে "আকাশ" হয় না।

গ্রন্থমধ্যে "চক্ষে" শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। "চক্ষে" শুদ্ধ প্রয়োগ নহে। কবিগণ নিরঙ্কুশ হইলেও অশুদ্ধ প্রয়োগ যত দূর সম্ভব পরিহার করাই কর্ত্তব্য।

গ্রন্থকার ফল্গুকে "অন্তঃশিলা" বলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ফল্গু "অন্তঃসলিলা।"

চতুর্থ সর্গে দেখিতে পাই :—

"মসীদ মিনার কত, হর্ম্মচুড়া শত শত
পল্লবিত তরুচ্ছায়া বক্ষে'র দু'ধারে।"

ইহার দুই শ্লোক পরেই :—

"মতি মস্‌জীদের গলে লোলমুক্তাজ্যোতিঃ জ্বলে
নাগিনা মসজিদ্-চূড়ে সোণার মাধুরী ;"

"মসীদ", "মস্‌জীদ" ও মসজিদ" তিন প্রকার প্রয়োগই দেখা গেল।

"দ্যুলোকে"র স্থানে "দ্যুঃলোক" ব্যবহৃত হইয়াছে। "শাটীর" পরিবর্ত্তে "সাটী"র ব্যবহার বহু স্থানে দৃষ্ট হইল। "বহি"র স্থানে "বাহি", "ঊর্দ্ধফণের" স্থানে "ঊর্দ্ধফণা" ও "ভেঙ্গেছে"র পরিবর্ত্তে "ভেঙেছে"র প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য।

লেখকের শব্দসম্পদ যথেষ্ট আছে। তবে তিনি এক স্থানে যে "স্বপ্নে" ও "যত্নে" —মিল করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অনবধানতাপ্রযুক্ত।

"শ্বেত তরঙ্গের প্রায়, আবরি প্রান্তর-কায়,
চলে গোঠে বৎসমালা কান্তারে কান্তারে।"

অতিরিক্তঅতিরঞ্জনদোষদুষ্ট। এ দোষ গ্রন্থমধ্যে বিরল। কবি ড্রাইডেন বলিয়াছেন "দোষরাশি তৃণসম উপরেই ভাসে—"তাই এ সকল দোষের উল্লেখ করিলাম। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ সকল দোষ সংশোধিত হইয়া এই উপাদেয় কাব্যখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। কবিত্বরসপিপাসী বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এই পুস্তকের আদর অবশ্যম্ভাবী।

সংগ্রহ।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

কাশ্মীরের হ্রদ।

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের তুলনা নাই। তাই কাশ্মীর ভূস্বর্গ নামে অভিহিত হইয়াছে। বিশালা-নগরীর কথায় কালিদাস যাহা বলিয়াছেন—তাহা কাশ্মীরের সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য—

স্বল্পীভূত পুণ্যফল স্বর্গ হ'তে ফিরিতে মরতে
শেষ পুণ্যে সাধু যেন স্বর্গখণ্ড আনিলা জগতে।

ভারতের মোগল সম্রাটগণ এই কাশ্মীরের স্নিগ্ধ শোভার মধ্যে নিদাঘ যাপন করিতেন। আজও কাশ্মীর জগতের সৌন্দর্য্যের সারভাগে সজ্জিতা সুন্দরী মত—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সৃষ্টি তিলোত্তমার মত লোকচক্ষু বিনোদন করিতেছে। তাহার কমকান্তির সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় আকৃষ্ট হইয়া নানাদিগ্দেশ হইতে সৌন্দর্য্য-পিপাসীরা চূতমুকুলগন্ধাকৃষ্ট ভ্রমরের মত কাশ্মীরে সমাগত হইয়া থাকেন। ইঁহাদিগেরই একজন সম্প্রতি 'পাইওনিয়ার' পত্রে কাশ্মীরের হ্রদের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের ভাষা সেই সৌন্দর্য্য-বর্ণনারই উপযোগী। সে ভাষার স্বরূপ বুঝান অসম্ভব। আমরা নিম্নে সেই প্রবন্ধের সার-সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

ডল হ্রদ

জগতের পক্ষে কাশ্মীর যাহা, কাশ্মীরের পক্ষে ডল হ্রদ তাহাই। ডলের ছন্দে কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে; ডলের বক্ষে কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত, ডলের সৌন্দর্য্যে কাশ্মীরের হৃদয়ের বিকাশ। শ্রীনগরের শিরোপরি দণ্ডায়মান তক্তগিরি হইতে দৃষ্ট প্রাকৃতিক দৃশ্য অনিন্দ্যসুন্দর। তিন দিকে নদী-প্রবাহ-খচিত স্বপ্নরাজ্য উপত্যকা, আর দূরে অমল ধবল গিরি, আর এক দিকে ডল হ্রদ। প্রভাত অরুণালোকে ইহার গাঢ় কৃষ্ণ জলরাশি ক্রমে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—ছায়া চঞ্চল চরণে পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতমূলে যাইয়া ক্রমে অদৃশ্য হয়। মধ্যাহ্নমারুতে নীল আকাশেরই মত নীল জলরাশি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠে। সন্ধ্যায় যখন বর্ণের বৈচিত্র-বিকাশ হয়, তখন জলের স্নিগ্ধ প্রশান্তি যেন অনন্তের আভাস দেয়। নিশীথে চন্দ্রকর হ্রদবক্ষে যেন আলোক বর্ত্ম রচিত করে। গাম্ভীর্য্যে, রহস্যে ডলের তুলনা নাই।

উদ্যান।

ডলের শোভা সকলেরই চিত্তহরণ করে। ইহার স্ফটিক স্বচ্ছ জল-বিস্তারে কোথাও গগন প্রতিবিম্বিত, কোথাও পদ্মাদি বহু জলজ গুল্মাদি স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত। কোথাও বা শরবনের মধ্যে লুকায়িত বিহগের কল গীতি পবনে ভাসিতেছে; কোথাও বা ক্ষুদ্র দ্বীপের বৃক্ষপত্রান্তরাল হইতে বিচিত্রচিত্রিত মসজিদ দেখা যাইতেছে, উপাসক-দল নৌকায় তথায় যাইতেছে। তীরভূমিতে মোগল শাসনকালে

রচিত উদ্যানমালা—আনন্দভবন—প্রীতিনিকেতন—কুসুমের বৈচিত্র্যে ও বাহুল্যে নয়নরঞ্জন।

শত বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে মোগল সম্রাটগণ কাশ্মীরকে ভারত সাম্রজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। কাশ্মীর স্বীয় সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগের বীর হৃদয় জয় করিয়াছিল। কাশ্মীর জানিলে—তাজমহলের স্বরূপ বুঝা যায়। তাজমহল যে কবিত্বপূর্ণ বার্ত্তা বিঘোষিত করে—সে বার্ত্তা ডলের, বক্রগতি ঝিলাম নদীর, ছায়াস্নিগ্ধ কুঞ্জবনের, রবিকরদীপ্ত গিরিমালার। কাশ্মীরকে অন্তরঙ্গ রূপে না জানিলে—তাজমহল বুঝিতে পারা অসম্ভব। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, আওরঙ্গজেব—সকলেই কাশ্মীরে নিদাঘযাপন করিতেন। জাহাঙ্গীর বলিয়াছিলেন, কাশ্মীরই কবিবর্ণিত স্বর্গ। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া মোগল সম্রাটগণ বিপুলবাহিনী সঙ্গে লইয়া প্রতি বৎসর নিদাঘাগমে ভারতের ধূলিধূসর তাপতপ্ত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে আসিতেন। সে কি বিপুল আয়োজন—কি বিরাট ব্যাপার—কি বিস্ময়কর দৃশ্য! জাহাঙ্গীর এই ভূস্বর্গে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ নিদাঘ যাপন করিয়া মরণাহত হইয়া কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের শোভার মধ্যে মর জীবনের অবসান করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কাশ্মীরের নিকটে আসিয়া তাঁহার জীবন শেষ হয়।

তাজমহল।

কাশ্মীরে আর একটি হ্রদ আছে। অঞ্চারের সহিত সহিত ডলের কি প্রভেদ! ডল প্রফুল্ল—অঞ্চার গম্ভীর। ডল জনকোলাহলমুখরিত—অঞ্চারে জনসমাগম প্রায় নাই! কেবল ধূসর কুজ্ঝটিকাবৎ জলবিস্তার- যেন অসমাপ্ত শিল্পকীর্ত্তি। অঞ্চারের শরবনে জলচরবিহঙ্গের বিস্ময়কর বাহুল্য। কোথাও বা বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া ভেকবহুল জলে ভেকের সন্ধান করিতেছে—ভেক ধরিয়া আত্মসাৎ করিতেছে। কোথাও বা বক শিরোপরি চক্রাকারে উড়িয়া বেড়াইতেছে—শরবনে নামিয়া আসিতেছে।

অঞ্চার।

হ্রদে মানুষের মধ্যে কেবল হ্রদবাসী শ্রমজীবীরা। তাহারা বিষন্ন—উদয়াস্ত শ্রমের ফলে জীবিকার্জ্জন করে। দীর্ঘ দিনে গৃহপালিত পশুর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বা ফল উৎপাদনের জন্য ভাসমান উদ্যান রচনা করিয়া সন্ধ্যায় তাহারা গৃহে প্রত্যাগত হয়। তাহাদের নয়নে বিষাদ—মুখে বাক্য যাই। তাহারা নিদাঘের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার অবসর পায় না;—নিদারুণ শীতের জন্য সঞ্চয়ে ব্যাপৃত রহে। এই সৌন্দর্য্যের মধ্যেও বিষাদের অভাব নাই। তবে প্রকৃতির এই কাম্য কাননে বিষাদ ও এক অভিনব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

হ্রদবাসী।

সমাজ-তত্ত্ব।

বঙ্গে সমাজসংস্কার।

গত এপ্রিল মাসের সুবিখ্যাত 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় শ্রীযুত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গে সমাজসংস্কার" শীর্ষক একটি সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে,—তাহাই মুখ্যতঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আলোচ্য বিষয়। প্রবন্ধের প্রথমেই লেখক লিখিয়াছেন যে, প্রতি সমাজেরই এক একটি বিশেষত্ব আছে। কোন সমাজে ধর্ম্মভাব প্রবল, কোন সমাজে ঐহিক চিন্তাই সর্ব্বস্ব। মানবের মধ্যে যেমন আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য বর্ত্তমান, সমাজমধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য বর্ত্তমান। জীবশরীর যে যে নিয়ম অনুসারে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, সমাজশরীর ও প্রায় সেই সেই নিয়ম অনুসারেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তিগত গুণ ও বিশেষত্ব যেমন কতকগুলি নিয়ম অনুসারে বিকশিত হয়, সামাজিক রীতি-নীতি ও সেইরূপ কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মবশেই অভ্যুদিত হইয়া থাকে। মানব-শরীর যেমন অবস্থাবিশেষে অসুস্থ ও পীড়িত হইয়া পড়ে,—সমাজ-শরীর ও সেইরূপ অবস্থা-ভেদে বিকৃত ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেই সামাজিক বিকৃতির ফলে সমাজে নানা কুরীতি ও কদাচার দেখা দেয়। দৈহিক ব্যাধির ন্যায় অনেক সামাজিক ব্যাধিও বহু দিন ধরিয়া সমাজ-শরীরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং অল্পে অল্পে সমাজের জীবনী শক্তিকে সংহার করিতে থাকে।

সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতিকে হঠকারিতার সহিত বিপর্য্যস্ত করা বিধেয় নহে।

পরিবর্ত্তন।

কোন রীতি বা ব্যবহার সমাজের স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ফলে আবির্ভূত হইয়াছে অথবা তাহা সামাজিক বিকৃতির ফলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহারই বিচার করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। অন্য সমাজের আদর্শ দেখিয়া তাহার অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাওয়া উচিত নহে;—ঐ সমাজের ইতিহাসের ও অবস্থার আলোচনায় সামাজিক সমস্যায় সমাধান করাই কর্ত্তব্য। হঠকারিতার সহিত কোন সামাজিক রীতির মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব নহে,—আর যদিই বা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার ফল ঘোর অনিষ্টজনকই হইয়া থাকে।

সমাজসংস্কারকগণ তিনটি বিষয়ের সংস্কার করিতে চাহেন। বিধবাবিবাহের প্রচলন,

উদ্দেশ্য।

জাতিভেদের উচ্ছেদ,এবং বিলাতফেরতগণকে সমাজে গ্রহণ তাঁহাদের অভিপ্রেত। প্রথম দুইটি বিষয়ে তাঁহারা সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তৃতীয় বিষয়ে তাঁহারা অনেকটা সাফল্যের সন্নিহিত হইয়াছেন। ইহার কারণ তৃতীয় বিষয়সম্পর্কে প্রয়োজনের আধিক্য এত অধিক হইয়াছে যে, রক্ষণশীলতার বৃতি আর সে চাপ সহিতে পারিতেছে না। সুতরাং এ বিষয়ে সংস্কারকগণের সাফল্যলাভ অনেকটা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজে বিধবাবিবাহ চলে নাই;—তাহার

কারণ, সমাজ উহার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। হিন্দুদিগের বিবাহ প্রথা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সহিত বিবাহ প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হিন্দুসমাজ পুনর্ভূপত্নীকে ধর্ম্মপত্নীর সহিত একাসনে বসায় নাই। পুনর্ভূপত্নী চিরকালই ধর্ম্মপত্নীর অনেক নিম্নে স্থান পাইয়াছেন। পৌনর্ভব পুত্র তাহার পিতার ঔরস পুত্রের সহিত সমানভাবে পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার পায় নাই। বশিষ্ঠ ও বিষ্ণু দায়াদের ক্রমিক তালিকায় পৌনর্ভব পুত্রকে চতুর্থ স্থান, এবং যাজ্ঞবল্ক ষষ্ঠ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক পৌনর্ভব পুত্রকে কানীন পুত্র অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর স্থান দান করিয়াছেন। মনু লিখিয়াছেন, বিধবাবিবাহকারী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অপাঙ্‌ক্তেয়। ইহাতেই বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুসমাজ বিধবাবিবাহের প্রতিকূল। পরাশর কলিযুগে বিবাহিতা বিধবাকে সকৃত বিবাহিতা রমণীর তুল্যাসন দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। পরবর্ত্তী মনীষিগণ বিধবাবিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ করিয়া যায়েন। আদিপুরাণই তাহার প্রমাণ। ইঁহারা নিশ্চয়ই কোন গুরুতর সামাজিক দোষ দেখিয়া বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কি প্রকার সামাজিক দোষের আবির্ভাব দেখিয়া পরাশরের পরবর্ত্তী মণীষিগণ বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এখন তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই।

বর্ত্তমান আন্দোলন।

সম্প্রতি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সমাজে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সামাজিক অবস্থা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা কর্ত্তব্য। সামাজিকগণের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রতিকূল ভাব এখনও প্রবল রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মুখোপাধ্যায় মহাশয় আদম সুমারীর হিসাব হইতে দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যা অনেক অল্প; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিপত্নীক অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা, অনেক অধিক। ইহাতে রমণীসমাজে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ন্যূনতাই সূচিত হইতেছে। সুতরাং ঔদ্বাহিক ব্যাপারে পুরুষ ও রমণীর সাম্য স্বীকার করা যায় না। ইহা ভিন্ন খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম সমাজে অনূঢ়া রমণীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। এই সকল অনূঢ়া রমণীর মধ্যে অনেকেই বিবাহ করিতে অভিলাষিণী, ইহা সহজেই অনুমেয়। পক্ষান্তরে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যা সওয়া লক্ষ অধিক। বাঙ্গালার হিন্দু পুরুষদিগের মধ্যে অনেক বিদেশী গণিত হইয়াছে। পশ্চিম অঞ্চল ও ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে অনেক ব্রাহ্মণ, রাজপুত প্রভৃতি এ দেশে আসিয়া পৌরহিত্য, কমেষ্টবলী, জমীদারের বরকন্দাজী, প্রভৃতি কার্য্য করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত; যাহারা বিবাহিত তাহারাও প্রায় তাহাদের রমণীদিগকে এ দেশে লইয়া আইসে না। তথাপি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সাড়ে এগার লক্ষ পুরুষ ও ১২ লক্ষ স্ত্রীলোক বর্ত্তমান। মোট ব্রাহ্মণ পুরুষ অপেক্ষা মোট ব্রাহ্মণ মাহিলার সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ অধিক। ইহা হইতে

যদি বিদেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণ পুরুষদিগকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ মহিলার সংখ্যা আরও অধিক হয়। বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে উচ্চ বর্ণের মধ্যে স্ত্রী জাতির সংখ্যাই অধিক। আবার পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে বিবাহ করেন না,—কিন্তু স্ত্রীজাতিদিগের বিবাহ হিন্দুর অপরিহার্য্য সংস্কার। সুতরাং বিবাহের বাজারে "বর" অপেক্ষা "ক'নে"র সংখ্যাই অধিক হইতেছে,—ইহা ভুক্তভোগীমাত্রেই বুঝিতেছেন। বিধবা-বিবাহের প্রচলন নাই বলিয়া সকল মহিলাই একবার বিবাহ করিবার সুবিধা পাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাহাতেও কন্যার বিবাহপ্রদান কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর যদি আবার বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অনেক রমণীকে চিরকুমারী থাকিতে হইবে। গ্রেটব্রিটনে ও য়ুরোপের অন্যান্য অনেক রাজ্যে বহু রমণীর ভাগ্যে বিবাহ হইয়া উঠে না। তথায় শতকরা ৫৯·৬ জন রমণী অবিবাহিতা ৩২·৮ জন সধবা আর ৭·৬ জন বিধবা। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তথায় শতকরা ১৫ জনেরও অধিক রমণী "বৃদ্ধা কুমারী" অবস্থাতে কালগ্রাসে পতিতা হয়েন। ভারতীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজেও এই অবস্থা ঘটিতেছে। অন্য সমাজের রমণীগণ অবিবাহিতা থাকিয়াও যদি প্রবৃত্তির তাড়নায় পদস্খলিতা হইয়া পাপপঙ্কে পতিতা না হয়েন, তাহা হইলে হিন্দু বিধবাগণই কেন উন্মার্গগামিনী হইবেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

হিন্দু বিধবাগণের মধ্যে দুই একজনের পক্ষে পদস্খলিত হওয়া যে, অসম্ভব এমন নহে। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। সধবাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ পাপ পথে প্রলুব্ধা হয়েন। বিধবাদিগের পদস্খলনের এইরূপ বিরল দৃষ্টান্ত দেখিয়া যদি বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিতে হয়, তাহা হইলে সধবাদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিবাহ প্রথা উঠাইয়া দিতে হয়। মার্কিণের কোন কোন ব্যক্তি এই অজুহতে বিবাহকে ক্ষণস্থায়ী চুক্তিমাত্রে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন!

প্রত্যেক সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠান কালসহকারে অবনত ও বিকৃত হইয়া থাকে।

সংস্কার।

তাহার সংস্কার আবশ্যক,—সংহার কর্ত্তব্য নহে। মধ্যযুগে য়ুরোপে অনেক মঠ ছিল। তথায় বহু ধর্ম্মপ্রাণা রমণী ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় ব্রহ্মচর্য্যপালনে জীবন অতিবাহিত করিতেন। কালসহকারে ঐ সকল অনুষ্ঠান পাপের পঙ্কিল পল্বলে পরিণত হয়। ফলে য়ুরোপীয় সামাজিকগণ উহার উচ্ছেদ করেন। এখন সামাজিক অবস্থায় বাধ্য হইয়া অনেক রমণীকে চিরকুমারী থাকিতে হইতেছে; কিন্তু তাঁহারা আর ধর্ম্মের সে সুবিমল ছায়ায় আশ্রয় ও অভয় পাইতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রবৃত্তির প্রখর তাপে দগ্ধ হইয়া আজীবন যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন এবং বারিপানের আশায় পাপের পঙ্কিল পল্বলে যাইয়া ইহকাল পরকাল হারাইতেছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে স্ত্রী জাতিকে ধর্ম্মের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়াই আমরা এই বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছি।

শশী বাবু তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন, যে বাঙ্গলার মুসলমানসমাজে চিরকুমারী নাই, তাহার কারণ তাহাদের মধ্যে স্ত্রী জাতির সংখ্যা অনেক অল্প; দ্বিতীয়তঃ,

তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে বহুবিবাহের প্রবর্ত্তনা সম্ভবে না। কেহ কেহ বলেন, বিধবা-বিবাহের প্রচলন নাই বলিয়া হিন্দুজাতির সংখ্যা কমিতেছে। কিন্তু দেখা যায়, যত রমণী আছেন, তাঁহাদের পঞ্চমাংশ যদি সন্তান প্রসবিনী হয়েন, তাহা হইলেও লোকসংখ্যা কমিবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

শশী বাবু শেষে বলিয়াছেন যে, আদম সুমারীর বিবরণে দেখা যায় যে, অনেক শিশু এক বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই বিধবা হয়। তিনি লিখিয়াছেন, এরূপ শিশু-বিবাহে সমাজের অতি নিম্নস্তরে প্রচলিত। সে স্তরে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐরূপ শিশু-বিবাহ বিবাহই নহে। তাঁহার মতে বাল-বিধবার সংখ্যা হ্রাস করিতে হইলে বালিকাগণকে একটু অধিক বয়সে বিবাহিতা করাই কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের নজীর ও শাস্ত্রের অনুশাসনই বলবৎ করা বিধেয়।

বিবিধ।

ভারতের ভাবী বিপদ।

গত জুন মাসে বোম্বাই প্রদেশস্থ ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসনের অধিবেশনে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পানামা যোজক কাটিয়া খাল নির্ম্মাণ করিলে ভারতের যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেই সম্বন্ধে ডাক্তার মেজর গর্ডন টকার একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এই বিষম মহামারী—"পীতজ্বরে"র ভীষণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণলাভের উপায়-উদ্ভাবন করিয়া তৎসঙ্গে ভারতীয় গভর্ণমেন্ট কি ভাবে এই মহামারীর প্রবল পরাক্রম হইতে ভারত রক্ষা করিবেন, সে বিষয়ে তিনি স্বীয় মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন।

তিনি বলেন, পীতজ্বর আমেরিকার নিম্নভূমি বা জলাভূমি পল্লীতেই বিশেষ প্রবল।

উৎপত্তি।

সেই জন্যই নিকটবর্ত্তী জামেকা দ্বীপকে লোকে শ্বেতকায়দিগের সমাধিক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আর এই পীতজ্বরের প্রাদুর্ভাবে এতদিন পানামা যোজক খনিত করা অসম্ভব বলিয়া মনে হইত। এখন যদি এই যোজক কর্ত্তন করিয়া খালে বা প্রণালীতে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে অতি অল্পকালমধ্যেই ভারতে এই পীতজ্বরের আমদানি হইবে। পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এই জ্বরের বীজাণু মশকের দ্বারা লোকশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসারলাভ করিয়া থাকে। অস্বাস্থ্যকর নিম্ন জমীতে যাহাদের বাস, তাহারাই এই রোগের করাল কবলে পতিত হয়। অধুনা পৃথিবীর বিষুবরেখার ২২ ডিগ্রীর মধ্যে আমেরিকার যে যে স্থান অবস্থিত, সেই সকল স্থানেই এই পীতজ্বরের সমধিক প্রাদুর্ভাব কিন্তু অন্যান্য স্থানেও এই জ্বর হইয়া থাকে। রেলবিস্তারের ফলে এই রোগ বিভিন্ন দেশে পরিচালিত হইয়া যে ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতে এই রোগের সূত্রপাতের যে সম্ভাবনা আছে, তাহারও কতিপয় প্রমাণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ভারতের সহিত হংকং, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, পিনাং, সিঙ্গাপুর এবং অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত বন্দর হইতে যে বাণিজ্যব্যবসায় আছে, ক্রমশঃ তাহার প্রসার-বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা আছে। এই বাণিজ্যপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে হনলুলু নামক স্থানটি—একটি বিশিষ্ট বন্দরে উন্নীত হইতে পারে—ইহাতে তখন আমেরিকাবাসীদিগের প্রভুত্ব-বিস্তার ঘটিতে পারে। বাণিজ্য-বিস্তারের সহিত মার্কিণবাসী লোকসমাগমের বৃদ্ধিলাভ ঘটিবে, আর তখন পীতজ্বর-বীজাণু অতি সহজেই উপরিকথিত প্রদেশে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে। বাণিজ্যপোতে বা যাত্রীর জাহাজে যদি কাহারও শরীরে পীতজ্বরের বীজাণু গুপ্ত ভাবেও নিহিত থাকে, তাহা হইলে পীতজ্বরের আদিস্থান হইতে রোগ অতি সহজেই বিদেশে উপনিবেশ-সংস্থাপন করিতে আসিবে।

আশঙ্কা।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, মশকের সাহায্যে রোগের প্রচলন ও সংক্রমণ হয়। যে জাতীয় মশক এই বীজ বহন করিয়া মনুষ্য-শরীরে দংশন করিয়া রক্ত দূষিত করিয়া দেয়, সেই জাতীয় মশক পৃথিবীর অনেক স্থানে আছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমেরিকা ভিন্ন স্পেন, দক্ষিণ ইটালি, জাপান, ফর্ম্মোসা দ্বীপ, চীন, সেলিবেশ দ্বীপপুঞ্জ, নিউ গিনি, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ, ব্রহ্ম-দেশ, বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ, ভারতের দক্ষিণস্থ তীরভূমি, বোম্বাই, পূর্ব্ব অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার পূর্ব্বাংশ এবং মরিশস প্রভৃতি স্থানে ঐ জাতীয় মশক বিদ্যমান। এই জাতীয় মশক পৃথিবীর বিষুবরেখার ৪০ ডিগ্রী উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিত সমস্ত প্রদেশে বিভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে। এখন কথা উঠিতে পারে, কোন কোন জাতির এই রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। চীনবাসীকে যে এই রোগের আক্রমণ হইতে নিরাপদ বলিয়া মনে করা যাইত, তাহা অমূলক। এই পীতজ্বরে অনেক চীনদেশীয় লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সুতরাং কোন জাতিই নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না।

মশক।

এখন জিজ্ঞাস্য, পীতজ্বরের বীজাণু এ দেশে পর্য্যন্ত আসিতে পারে কি না? তাহার উত্তরে মেজর টাকার বলিয়াছেন যে, পীতজ্বরের আকর জামেকা দ্বীপ হইতে পানামা প্রণালী পর্য্যন্ত আসিতে দুই দিবস লাগে। পানামা প্রণালী খাত হইবার পর উহা পার হইতে যদি বার ঘণ্টা লাগে, আর জ্বরের বীজ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পর সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে যদি ৩৬ ঘণ্টা হইতে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত লাগে, তাহা হইলে এই পাঁচ দিনের পর আরও তিন দিনের মধ্যে এই রোগের সমস্ত লক্ষণ বুঝিয়া রোগনির্ণয় করা পোতের চিকিৎসক কিম্বা পোতাধ্যক্ষের পক্ষে নিতান্ত সহজ হইবে না। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে মশককুল এই রোগের বীজে আক্রান্ত হইতে পারে। আর বোর্ণিও প্রভৃতি মালয় দ্বীপপুঞ্জের সন্নিধানে যে সমস্ত বন্দর আছে, তাহাতে পীতজ্বরের লক্ষণ সহজে বুঝিতে পারেন এমন বিচক্ষণ চিকিৎসকও নাই। বন্দরে যে প্রকার পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চলিয়া আসি-

সম্ভাবনা।

তেছে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ডাক্তার টকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, প্লেগের সময় সুয়েজ বন্দরে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ড ও পর্ত্তুগাল পর্য্যন্ত প্লেগ উপস্থিত হইয়াছিল। মানব-শক্তির আয়ত্তে রোগব্যাপ্তি নিবারণের কোন উপায় নাই।

ডাক্তার টকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন :—

উপায়।

প্রথমতঃ, বোম্বাই ও কলিকাতায় এই রোগবাহী মশকের উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে। কারণ, বাণিজ্য-পোত বন্দরে আসিয়া মশকের দ্বারা এই রোগের বীজ দেশমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারে। কিন্তু মশকের উচ্ছেদসাধন কত দূর সম্ভব, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। কারণ, সামান্য মশকের উচ্ছেদসাধনে কামান পাতিলে চলিবে না। কলিকাতা ও বোম্বাই সহর যাহাতে আবর্জ্জনাহীন ও পরিষ্কৃত থাকে—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অপরিষ্কারতার ও অপরিচ্ছন্নতার আশ্রয় লইয়া অস্বাস্থ্যকর মশকের উৎপত্তির সহায়তা করিবে, তাহার শাস্তিবিধান করা সম্ভব নহে। সুতরাং সে প্রকার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা একপ্রকার অসম্ভব। হাবানা সহরে কিন্তু ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল—তাহার কারণ, তথায় শাসনতন্ত্র কঠোর সামরিক বিভাগ দ্বারা পরিচালিত। দ্বিতীয়তঃ, ভারত গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র-বন্দরস্থ চিকিৎসকগণের মধ্যে কয়েকজনকে যে যে স্থানে অল্প মাত্রায় পীতজ্বর মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের এই বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যয়ভার গ্রহণ করুন। একবার ইটালীয় রণপোতে ২৪৯ জন সৈন্যের মধ্যে প্রথম একজনের পীতজ্বর হয়, ভ্রমবশতঃ চিকিৎসক সেই জ্বর নির্ণয় করিতে না পারায় ২৪২জন জ্বরাক্রান্ত হয় ও তন্মধ্যে ১৩৪ জনের মৃত্যু হয়। তৃতীয়তঃ, ডাক্তার টকার বলিয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট যেন কতিপয় কীটাণুতত্ত্ববিদ্‌কে এই রোগের জীবাণু ও বীজাণু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ ও তত্ত্বানুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা রোগের বীজাণু নষ্ট করিয়া দিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিলে বসন্তের টীকা বা প্লেগ-নিবারক Inoculation এর মত লোক নিরাপদ হইবার কথঞ্চিৎ আশা পায়। উপসংহারে ডাক্তার টকার বলিয়াছেন যে, স্যার প্যাট্রিক মনসন মহোদয় সান্‌ফ্রানসিস্কোর কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে এসিয়া ও প্রাচ্য মহাদেশে যে ভীষণ বিভীষিকা ভবিষ্যতের গর্ভে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার বিষয়ে বিশেষ আতঙ্কপ্রকাশ করিয়াছেন।

নদীয়া জিলার সিদ্ধ যোগী।

(বলরামচন্দ্র।)

বঙ্গদেশের ইতিহাসে নদীয়া জিলার নাম, চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। পশ্চিম বঙ্গে নদীয়া জিলা নানা কারণে প্রসিদ্ধ; নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন, স্মায়ের বিধানদান করিয়া সমগ্র বঙ্গে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন; যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়া ভগবৎপ্রেমের বিপুল তরঙ্গে সমগ্র বঙ্গের পাপতাপ ধৌত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। এমন কি, যে দস্যুরাজ বিশ্বনাথের নামে একদিন অর্দ্ধ বঙ্গ কম্পিত হইত, য়ুরোপে জন্মিলে যে য়ুরোপের ইতিহাসপ্রথিত দস্যুগণের সমশ্রেণীতে আসনলাভ করিয়া ইতিহাসে ও উপন্যাসে অমর হইয়া থাকিত, সেই বিশ্বনাথও নদীয়া জিলার লোক। ধর্ম্মে, সাহিত্যে রাজনীতিতে, কাব্যে,—যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহার সকল বিষয়েই নদীয়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নদীয়া জিলার ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাস নামক যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়া, মধুর রামায়ণ-কথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল বঙ্গের প্রতিগৃহে কাব্যামৃতস্রোত চির-প্রবাহিত রাখিয়াছেন, যতদিন বঙ্গভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর, বহুদিন পর্য্যন্ত নদীয়া জিলার নানা স্থানে নূতন নূতন ধর্ম্ম-সংস্থাপকের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সকল ধর্ম্ম-সংস্থাপকের বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের জীবন-কথা ও তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের ইতিহাস, আমাদের জাতীয় ভাষায় সযত্নে সংগৃহীত হইবার যোগ্য। কিন্তু এ জন্য এ পর্য্যন্ত প্রায় কোন লেখকই কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই; চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের সেই চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কেবল অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার প্রণীত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে সেই স্বনামধন্য সিদ্ধ পুরুষগণের কথার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তত্ত্বলিপ্সু পাঠকগণের তাহাতে তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা এই প্রবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ 'বলরামি সম্প্রদায়ের' প্রবর্ত্তক বলরামচন্দ্রের জীবন-চরিত ও তাঁহার ধর্ম্মমতসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বাঙ্গালা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নদীয়া জিলার অন্যতম উপবিভাগ মেহের-

পুরে বলরামচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। তিনি সমাজের অতি নিম্নস্তরের লোক ছিলেন,—জাতিতে হাড়ী ছিলেন। কিন্তু প্রেম ও পবিত্রতার অগ্নিতে জাতিভেদের ক্ষুদ্র গণ্ডী দগ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং অতি হীন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও বলরামচন্দ্র চরিত্রগুণে, ভগবদ্ভক্তিতে ও উদার মানব-প্রেমের বলে, সমাজের অনেক উর্দ্ধে আসনলাভ করিয়াছেন, ভগবানের অবতার বোধে সহস্র সহস্র লোক ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে তাঁহার পূজার্চ্চনা করিতেছে,—তাঁহার দেবায়তনে দাঁড়াইয়া, গললগ্নীকৃতবাসে "মামসা" করিতেছে, তাঁহার আখড়ার ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে।

বাঙ্গালা ১১৯০ বা ১১৯১ সালে,—কোন মাসে ঠিক জানিতে পারা যায় নাই—মেহেরপুরের প্রান্তবাহী ভৈরব নদের অদূরবর্ত্তী মালোপাড়ায় বলরামের জন্ম হয়। পিতা গোবিন্দ হাড়ী স্থানীয় জমীদারের গৃহে বরকন্দাজের কায করিত বলিয়া গ্রামবাসিগণের নিকট গোবিন্দ সর্দ্দার নামে পরিচিত ছিল। গোবিন্দ সর্দ্দার সুদক্ষ লাঠিয়াল ও প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী বরকন্দাজ বলিয়া প্রভুগৃহে যথেষ্ট প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল।

বলরামের বাল্যজীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন; কারণ, তাঁহার সমসাময়িক লোক, মেহেরপুরে এখন কেহই জীবিত নাই; যাঁহারা বলরামকে দেখিয়াছিলেন, বা তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতেন, তাঁহারাও একে একে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। আমাদের দেশের লোক পূর্ব্বে, স্ব স্ব গ্রামের অনেক প্রাচীন কথা জানিতেন, গ্রাম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কিংবদন্তী সযত্নে সংগ্রহ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের তাহা লিখিয়া রাখিবার অভ্যাস ছিল না। বর্ত্তমান কালে আমরা বিদেশের সংবাদ রাখিতেছি, পৃথিবীর কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা লইয়া নিত্য আলোচনা করিতেছি, কিন্তু স্বগ্রামের প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বসংগ্রহে আমাদের রুচি নাই। এখন অল্পে অল্পে স্রোত ফিরিতেছে বটে, প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ, প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদের আবার আগ্রহ হইতেছে বটে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও আর 'থেই' খুজিয়া পাইতেছি না, যাহা বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, কালসাগরের অনন্ত লহরী ভেদ করিয়া আর তাহা উদ্ধার করিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, বলরামের বাল্যজীবনসম্বন্ধে এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, বলরাম শৈশব হইতেই চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ভোগসুখে তিনি উদাসীন ছিলেন; বালকবালিকাগণের মধ্যে এরূপ নিস্পৃহতা প্রায়

দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সময়ে ও যে সমাজে বলরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই সমাজে কোন প্রকার সুশিক্ষার প্রভাব যে তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য; বলরামের বর্ণজ্ঞান ছিল না, কিন্তু আমাদের এই পূণ্যভূমি ভারতে বর্ণজ্ঞানহীন, অসংখ্য "মূর্খের" মধ্যে প্রকৃত ধার্ম্মিকের সংখ্যা অল্প নহে। বলরাম বর্ণজ্ঞানশূন্য হইলেও, তাঁহার হৃদয় ধর্ম্ম-জ্ঞানে পূর্ণ ছিল; ভগবদ্ভক্তি ও মানবপ্রীতি তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ছিল।

যাহার পিতা বরকন্দাজের কার্য্যে, আজীবন কাল অতিবাহিত করিয়াছিল, সে যতই গুণবান হউক না কেন, তদপেক্ষা উচ্চতর কার্য্যে তাহার কি অধিকার আছে?—যৌবনকালে বলরাম, মেহেরপুরের বৈশ্যবংশীয় জমীদার মল্লিক বাবু-দিগের বাড়ীতে বরকন্দাজের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু সে কার্য্য তাঁহার তেমন প্রীতিপ্রদ ছিল না। সেই সময়ে মল্লিক বাবুদিগের বৈষয়িক অবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল, কমলার অনুগ্রহে, তাঁহাদের বৈভব ও মানসম্ভ্রমও যথেষ্ট ছিল; তখন তাঁহা-দিগের গৃহে অনেক ভোজপুরী, ও পুরুবিয়া ব্রাহ্মণ নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কেহ বরকন্দাজের কায করিত, কেহ প্রহরীর কায করিত, কেহ কেহ বা জমিদারী-সংক্রান্ত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। বলরাম অবসরকালে এই সকল ব্রাহ্মণের নিকটে তুলসীদাসের রামায়ণ, দোঁহা ও নানাবিধ ভক্তিবিষয়ক পদাবলী এবং ভজনসঙ্গীত শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেন; সেই সকল স্নিগ্ধ মধুর ধর্ম্মকথা, পুরাণ-কাহিনী, বলরামের কর্ণে যেন অমৃতবর্ষণ করিত, তিনি স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া একাগ্রচিত্তে সেই সকল পূত কথা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার একাগ্রতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া দোবে, চোবে, মিশির ঠাকুরেরা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। ক্রমে বলরামের প্রেমোন্মত্ত ভাব পরিস্ফুট ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বলরামচন্দ্র মল্লিক-ভবনে যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার দৈহিক সামর্থ্য সেই কার্য্যের উপযোগী হইলেও, তাঁহার প্রকৃতি তাহার উপযোগী ছিল না; তিনি অতি-দীর্ঘ-দেহ, মহাবলবান যুবক ছিলেন; তিনি কিরূপ ভীমকায় ছিলেন, তাহা এখনও তাঁহার আখড়ায় তদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত ও ভক্তিভরে পূজিত তাঁহার যষ্টির ও কাষ্ঠপাদুকার আকার দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত নিরীহ ছিল; ক্রোধ কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। ভক্তি ও প্রেমে, শ্রদ্ধা ও বিনয়ে যাঁহার হৃদয় প্লাবিত, রৌদ্র রসের অভিনয়ে তিনি কখন তৎপরতাপ্রদর্শন করিতে পারেন না; সুতরাং বরকন্দাজী বা লাঠিয়ালী

কার্য্যে বলরামচন্দ্র সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। একাল হইলে তাঁহার ন্যায় অকর্ম্মণ্য লাঠিয়ালের চাকরী বজায় থাকিত কি না সন্দেহ, কিন্তু সে কালে এ দেশের লোকের প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র ছিল। সে কালে ভৃত্যেরা সাধারণতঃ যেরূপ প্রভুভক্ত হইত, প্রভুরাও সেইরূপ আশ্রিতবৎসল হইতেন। বলরামের প্রভু বলরামকে বরকন্দাজের কার্য্যের অনুপযুক্ত দেখিয়া গৃহবিগ্রহ আনন্দবিহারী দেবের গৃহরক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। ভগবদ্ভক্ত, সাংসারিক কার্য্যে অমনোযোগী বলরামচন্দ্র এই কার্য্যেও তৎপরতাপ্রদর্শন করিতে পারেন নাই; তিনি আনন্দ-বিহারীর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকা সত্বেও একদিন রাত্রিকালে বিগ্রহের ঘরে চুরি হইয়া অনেকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার অন্তর্হিত হয়। গৃহস্বামী এই চৌর্য্যব্যাপারে বলরামকেই সন্দেহ করিলেন। বলরামের ন্যায় নির্লোভ, সংসারাসক্তিবর্জ্জিত, ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির দ্বারা যে এরূপ দুষ্কার্য্য সাধিত হইতে পারে না, জমীদার মহাশয়ের ইহা প্রত্যয় হইল না। তিনি মনে করিলেন, বলরাম যদি স্বয়ং চুরি না করিয়াও থাকে, তাহা হইলেও, এই চৌর্য্যব্যাপার বলরামের অজ্ঞাতসারে সঙ্ঘটিত হয় নাই। অবশ্য, এজন্য জমীদার মহাশয়কে দোষী করা যায় না। বলরাম অপরাধী হউন বা না হউন, দেবতার গৃহরক্ষার ভার যখন তাঁহার হস্তে সমর্পিত ছিল, তখন এই ক্ষতির জন্য তিনিই দায়ী। শুনিতে পাওয়া যায়, এই উপলক্ষে বলরামের উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন চলিয়াছিল। বলরাম এই ভাবে অপদস্থ হইয়া কলঙ্কভয়ে ক্ষুণ্ন হৃদয়ে চাকরী পরিত্যাগপূর্ব্বক উদাসীনবেশে বাসগ্রাম ত্যাগ করিলেন। তাহার পর তিনি বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কোন্ কোন্ তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই।

ইহার পর বলরাম বহুদিন পর্য্যন্ত স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই; গ্রামের লোক তাঁহার কথা বিস্মৃত হইয়াছিল, সংসারে তখন তাঁহার আপনার বলিতে কেহই ছিল না, সুতরাং তাঁহার কথা লইয়া কেহ আলোচনাও করিত না। অবশেষে সুদীর্ঘ কাল অজ্ঞাতবাসের পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে উদাসীনবেশে বলরাম যখন মেহেরপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া সাধারণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

বলরাম সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ও দৈবশক্তির নানা পরিচয় প্রদান করিতেছেন শুনিয়া মেহেরপুরের ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহের নিম্ন-শ্রেণীর বহু লোক তাঁহার নদীতীরবর্ত্তী কুটীরদ্বারে সমবেত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব

গ্রহণ করিতে লাগিল ; এই সকল শিষ্যের মধ্যে হাড়ী, চর্ম্মকার, ধীবর ও চণ্ডাল-জাতীয় লোকই অধিক ছিল। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর লোকও তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। বলরামচন্দ্র কোন অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে যে এই সকল শিষ্যকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এ কথা শুনিতে পাওয়া যায় না ; তাঁহার পরমার্থ-জ্ঞান, সমদর্শিতা, সাধুতা, ক্ষমাশীলতা ও হৃদয়ের মাধুর্য্যে এই সকল লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সংসারে আসিয়া মানবসমাজের নিকট যাহারা ঘৃণা ও অবজ্ঞা ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা বলরামচন্দ্রের চরণ-প্রান্তে শান্তি ও করুণার প্রস্রবণ উন্মুক্ত দেখিয়াছিল ; তাই তাহারা ভগবানের অবতারজ্ঞানে বলরামচন্দ্রের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বলরামচন্দ্র নিম্নশ্রেণীর কত দুর্দ্দান্ত হিংস্রপ্রকৃতি পশুতুল্য নারকীকে শিক্ষা ও সংস্কারগুণে মনুষ্যত্বের পথে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই ; তাঁহার উপদেশে তস্কর তস্করতা ছাড়িয়াছিল, অন্যের অনিষ্ট-চেষ্টা যাহাদের জীবনের ব্রত ছিল, তাহারা পরোপ-কার-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে বলরামের প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিষ্যসংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

বহুদিন পূর্ব্বে বলরামের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু এখনও বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁহার শিষ্যেরা দেশ-দেশান্তর হইতে মেহেরপুরে সমাগত হইয়া গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করে, "প্রসাদ" গ্রহণ করে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে বারুণীর দোলের সময় বলরামের আখড়ায় বাৎসরিক প্রধান উৎসব হইয়া থাকে ; এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসব বৎসরের অন্যান্য সময় আরও দুই তিন বার হয়। 'মচ্ছব' অর্থাৎ মহোৎসবের ব্যয় শিষ্যেরাই বহন করেন, এবং আখড়ার দৈনন্দিন ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য যে অর্থের আবশ্যক হয়, তাহাও শিষ্যবর্গ যথাশক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। বাৎসরিক উৎসবের সময় বিদেশী শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই নগদ টাকা ব্যতীত, চাউল, ডাউল, চিড়া, গুড় প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রীও বহন করিয়া আনেন ; আমরা দেখিয়াছি, দূরগ্রামবাসী উপবীতধারী অনেক লোক এই উৎসবে যোগদান করেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন।

বলরামচন্দ্র আপনার উপর ঈশ্বরত্বের আরোপ করিতেন কি না, তাহা জানা যায় না ; কারণ, তাঁহার সাম্প্রদায়িক মত সম্বন্ধে হস্তলিখিত কোন পুস্তকাদি নাই ; তবে তাঁহার আখড়াধারী শিষ্যবর্গ তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন ও বলেন, "বলরাম চন্দ্র যে, ঈশ্বরাবতার, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।" তাঁহার শিষ্যবর্গ ঈশ্বরবোধেই তাঁহার উপাসনা করে, কিন্তু তাঁহার

মূর্ত্তির পূজা করে না। আখড়ায় কোন মূর্ত্তিও নাই। "এত জাতি থাকিতে ঈশ্বর হাড়ীর ঘরে কেন জন্ম গ্রহণ করিলেন?" এ প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলে, "বলরাম স্বয়ং ইহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিয়া গিয়াছেন, তোমরা এ দেশে যে সকল হাড়ী দেখিতে পাও, আমি সে হাড়ী নহি, আমি গড়নদার হাড়ী, হাড়ের সৃষ্টি করি বলিয়াই আমি হাড়ী।" দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, বলরামি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়েরই অনুরূপ।

বলরাম অত্যন্ত তার্কিক ছিলেন; তাঁহার আধুনিক নিরক্ষর শিষ্যদল এ বিদ্যায় গুরুকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস, আদিকালে বলরামচন্দ্র স্বীয় দেহ ক্ষয় করিয়া তাঁহার অস্থি হইতে এই সংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব পৃথিবীর সকল লোক হাড়ী।

ইতর বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও, অশিক্ষিত বলরাম চন্দ্রের হৃদয়ে ইতরতার লেশমাত্র ছিল না। অনেক স্থলে তিনি যুক্তিতর্কের পরিবর্ত্তে দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন কোন সংস্কারের অসারতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিতেন। কথিত আছে, একদিন বলরাম চন্দ্র তাঁহার আখড়ার প্রান্তবর্ত্তী ভৈরবের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া নদীর জল অঞ্জলি পূরিয়া লইয়া তাহা তীরে ঢালিয়া দিতেছিলেন। অধিকারী-পাড়ার বাচস্পতি ঠাকুর আখড়ার ঘাটে স্নান করিতে নামিয়া ইহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলাই তুই কি একেবারে ক্ষেপিয়াছিস? অঞ্জলি ভরিয়া নদীর জল তুলিয়া ওখানে ঢালিতেছিস্ কেন?"—বলরাম অম্লানবদনে বলিলেন, "আমি আমার শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি।" তখন তর্পণের সময়, বাচস্পতি ঠাকুর তাঁহার কোশা নদীতীরে রাখিয়া জলে নামিতে নামিতে বলিলেন, "এখানে তোর শাকের ক্ষেত কোথায় যে, তাহাতে জল দিতেছিস্?" বলরাম বলিলেন, "আপনার পিতৃপুরুষেরা অনেক কাল আগে মরিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, ঐ কোশায় করিয়া জল তুলিয়া জল ঢালিলে যদি সেই জল তাঁহাদের নিকট পৌঁছে, তাহা হইলে আমার এই জল দুই রশি দূরে আখড়ার শাকের ক্ষেতে না পৌঁছিবে কেন?" বাচস্পতি ঠাকুর বলরামের সহিত আর তর্ক করিলেন না, বলাই সত্যই পাগল হইয়াছে স্থির করিয়া স্নান ও তর্পণাদির শেষে গৃহে প্রস্থান করিলেন।

বলরামচন্দ্র বিদ্রূপপ্রিয় ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিদ্রূপে তীব্রতা ছিল না, সুতরাং কেহ তাহাতে মনে আঘাত পাইত না। মেহেরপুরের অনতিদূরে ভৈরব নদের পশ্চিম পারে সুবল চৌধুরী নামক একজন চর্ম্মকার বাস করিত। কর্ম্মচারিগণের সহায়তায় সে চর্ম্মের ব্যবসায় করিত। দেব-দ্বিজে তাহার ভক্তি ছিল, এবং তাহার

অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল। সুবল চৌধুরী বৎসরান্তে কালীপূজা করিত; এই উপলক্ষে সে তাহার প্রতিবেশী কোন উচ্চ বর্ণের ভদ্রলোকের বাড়ীতে গ্রাম্য ভদ্র-লোকদিগের আহারাদির আয়োজন করিত; কিন্তু সে সময় সমাজের বন্ধন এ কাল অপেক্ষা দৃঢ়তর ছিল বলিয়া, ভদ্রলোকের বাড়ীতে ফলাহারের আয়োজন হইলেও, হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবান বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। একদিন বলরামচন্দ্র কালীপূজার পরে একজন ব্রাহ্মণবংশীয় প্রৌঢ়কে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুবল চৌধুরী এবার আপনাদের খাওয়াইল কেমন?" বল-রামের কথা শুনিয়া তিনি সরোষে বলিলেন, "বলাই, তুমি কোন্ সাহসে আমাকে এমন জাতিনাশা কথা বলিতেছ? তুমি কি মনে কর, চামারের নিমন্ত্রণ লইয়া আমি তথায় খাইতে যাইব?" বলরামচন্দ্র বলিলেন, "ঠাকুর, এত চটিলে চলিবে কেন? আপনার জাতি নষ্ট হইতে পারে, এমন কথা কি বলিয়াছি? আপনার মা, যাহার বাড়ীতে গিয়া অনায়াসে খাইয়া আসিতে পারেন, তাহার বাড়ীতে পাত পাড়িলে আপনার জাতি যাইবে, এ কিরূপ কথা? জাতি যাইবার ভয় যদি এত অধিক হয়, তাহা হইলে আগে মা কালীকে একঘরে করুন, তিনি যখন সুবল চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়া পূজা খাইয়াছেন, তখন আর তাঁহার পূজা করা আপ-নাদের উচিত নহে।"

বলরামের আখড়ায় উৎসবের সময় তাঁহার একজন দুর্দ্দশগ্রস্থ ব্রাহ্মণ শিষ্যকে নীচজাতীয় শিষ্যগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভাত ও "আমানি" খাইতে দেখিয়া একজন সেই ব্রাহ্মণনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাপ হে, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া কিরূপে হাড়ির ভাত খাইতেছ?"—বলরামের সেই শিষ্যটি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়াছিল, "ব্রাহ্মণের ভাত ও হাড়ির ভাত এক স্থানে থাকিলে কোন্ ভাত কাহার, পূর্ব্বে না জানিয়া যদি আপনি তাহা বলিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি স্বীকার করিব, অন্যায় করিয়াছি।"

ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রয়াণ।

ছায়া-সুশীতল দূর্ব্বাশ্যামল
এই পথখানি দিয়া
শূন্য করিয়া লতিকা বিতান
চলে গেছে মোর প্রিয়া!

সন্ধ্যা-কিরণ স্বর্ণ বরণ
পড়েছিল তা'র শিরে,
ঝরে পড়েছিল বিবশ বকুল
অরুণ চরণ ঘিরে।

বহেছিল ধীর সান্ধ্য সমীর
পুষ্পসুবাস মাখি',
পাতার আড়ালে মিলিত কণ্ঠে
গেয়ে উঠেছিল পাখী।

মোহিনী প্রকৃতি লয়ে শত স্মৃতি
রচি মায়াজাল কত,
ঘিরিয়া রাখিতে চেয়েছিল তা'রে;
ব্যর্থ যতন যত!

যেতে যেতে ধীরে পথপানে ফিরে
চাহে নি কি একবার,
কারো লাগি কিগো অশ্রুবিন্দু
ফুটে নি নয়নে তা'র!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু।*

অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যু বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি করিয়াছে, তেমন ক্ষতি বোধ হয় বহুদিন হয় নাই। মৃত্যুর নিবিড় ছায়া ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যসংসার অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে। 'রৈবতক,' 'কুরুক্ষেত্র,' ও 'প্রভাসের' নবীন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নবীনচন্দ্র, বঙ্গভাষার অকৃত্রিম ভক্ত শ্রীশচন্দ্র, ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ রমেশচন্দ্র—একে একে অস্তমিত হইয়াছেন।

হিন্দুত্বের গৌরব মস্তকে লইয়া, বঙ্গবাসীর জাতীয় চরিত্রের মহামহিমময় আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়া, বঙ্গভাষার উপাসক, চন্দ্রনাথও তাঁহাদিগের অনুগামী হইয়াছেন। আমাদের দরিদ্র-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে এই সকল রত্নরাজি আহরণ করিয়াও মৃত্যুর লুব্ধ করপুট নিবৃত্ত হইল না। আরও একটি উজ্জ্বল হীরক বঙ্গজননীর মুকুট হইতে অপহৃত হইয়াছে। এমনি করিয়া কালসমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ বঙ্গসাহিত্যের এক একটি সুন্দর স্তম্ভ ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং বঙ্গবাসীর প্রকৃতই শোক করিবার কারণ আছে—সাহিত্যজীবনের স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাতে নির্ম্মম কালমেঘ উঠিয়া আমাদের হৃদয় দারুণ নৈরাশ্যে ও দুঃখে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ যে মহাত্মার পুণ্য নাম লইবার জন্য আমি আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তিনি বঙ্গসাহিত্যের কতখানি স্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার মোহন স্পর্শে আমাদের সাহিত্য ও জীবন কতখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আমি চেষ্টা করিব। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু যে বঙ্গভাষার একজন কৃতী লেখক ছিলেন, এবং তিনি যে বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে একটি চিরগৌরবমণ্ডিত প্রাচীন আদর্শ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি আমাদের এবং আমাদের উত্তরপুরুষের কৃতজ্ঞতার ও অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। এখন যেমন বঙ্গীয় যুবক বঙ্গভাষাকে স্নেহের ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছেন, চন্দ্রনাথের যৌবনকালে ঠিক এমনটি ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি যাঁহাদিগের নামের পশ্চাতে রহস্যময় বীজমন্ত্রের মত থাকিয়া সে সময়ে পাশ্চাত্য-বিদ্যাকে আরও রহস্যময় করিয়া তুলিত, তাঁহারা প্রায়ই বঙ্গভাষাকে স্নেহ ও গৌরবের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। ইংরেজীতে দখল হওয়াই তখন কলেজী শিক্ষার

---

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

আদর্শ ছিল, ইংরেজীতে ভাল প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারা বঙ্গীয়যুবকের সুখের স্বপ্ন ছিল; যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার আলোকে ইংরেজী সংবাদপত্রের স্তম্ভে ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া বাহাদুরী লইতে পারিতেন, যাঁহারা ইংরেজীতে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া ইংরেজী গুণগ্রাহী শ্রোতার মন মুগ্ধ করিতে পারিতেন, এবং সময়ে সময়ে দুই একজন ইংরেজের নিকট হইতে পিঠচাপড়ানি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য যে ঈর্ষার বিষয় ছিল, সে সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? চন্দ্রনাথ বাবু ইঁহাদেরই একজন ছিলেন; Oriental Seminaryতে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ইংরেজীতে পারদর্শী ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া, ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণের রুচির অনুকূল পবনে তিনি যে অভীষ্ট যশের পরপারে উপনীত হইলেন তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু প্রতিভার স্বভাব এই যে, সে চিরভ্রমিত পথে ভ্রমণ করিয়া তৃপ্ত হয় না; স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংব্যক্তি প্রতিভার প্রাণ। প্রতিভাশালী চন্দ্রনাথ মাতৃভাষার সেবায়—অনাদৃতা কাঙ্গালিনী বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে মনোযোগ করিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, চিরস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্র, মনীষী অক্ষয়কুমার ও ভূদেবচন্দ্র, বাণীকণ্ঠহারের মধ্যমণি মধুসূদন, রসের সাগর দীনবন্ধু প্রভৃতি যে আলোক রশ্মিমালায় বঙ্গভাষার ক্ষুদ্র কুটীর আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, চন্দ্রনাথ তাহাদেরই সঙ্গে আর একটি আলোকরেখা মিশাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রখর কিরণ সে ক্ষীণরশ্মিটি নিবাইয়া দিতে পারিল না। তিনি অতি যত্নের সহিত, একান্ত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার মাতৃভাষার দিকে ফিরিয়া যাইলেন। বঙ্গসাহিত্যের সেই দীনতা ও অসম্পূর্ণতার দিনে যাঁহারা ইহাকে আশ্রয় দান করিয়া আদৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে আমাদের কতখানি কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহা কি বলিয়া শেষ করিতে পারা যায়? তিনি আমোদের জন্য, কৌতুহলের জন্য বা তাঁহার দুর্লভ অবসর-মুহূর্ত্তগুলি কোনপ্রকারে কাটাইয়া দিবার জন্য বঙ্গভাষার সেবা করেন নাই। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্য-সেবা-ব্রত আলোচনা করিলে মনে হয় যে, তিনি ইহাকে একটি কঠোর সাধনার মত, একটি প্রকৃত তপশ্চর্য্যার মত করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। এমন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবা অধিক লোকে করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের জন্য যে সাহিত্যসম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু তাঁহার একাগ্রতা ও আন্তরিকতা। তিনি অতীত সাহিত্যভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া

বিদেশীয় কাব্যসাগরে অবগাহন করিয়া যে অমূল্য রত্নরাশি আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে শ্রদ্ধার সহিত দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে কিছুই দিতে পারি নাই—বঙ্গসাহিত্যের পক্ষ হইতে বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎ তাই তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিয়া সেই ঋণ কিঞ্চিৎপরিমাণে শোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনচরিত আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহার বংশের বিবরণ এবং অন্যান্য বিশেষ ঘটনাবলীর বর্ণনা ইত্যাদির ধারাবাহিক একটি ইতিহাসের মধ্য দিয়া একটা কার্য্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। অসাধারণ ব্যক্তির জীবন-ব্যাপার প্রথম হইতেই অনন্যসাধারণ ইহাই আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। সাধারণতঃ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মাতা উন্নতমনা, কর্ত্তব্যপরায়ণা ও সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইয়া থাকেন; প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পিতা অথবা অন্য কোন পূর্ব্বপুরুষ যে প্রতিভা-সম্পন্ন ইহাও আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। "এরূপ না হইলে সেরূপ হইত না," ইহাই আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া জীবনচরিত লিখার উদ্দেশ্য সফল করিয়া থাকি। এরূপ চেষ্টাও যে স্বাভাবিক, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে, তাহার কার্য্যকারণ-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিতে হয়। মহৎ লোকের জীবনী সম্বন্ধেই বা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? কার্য্যকারণধারা ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ফেলিতেছে, তখন জীবনচরিতের বিষয়েও আমরা এই অবিসংবাদী নিয়মের অধীন। কিন্তু একটি কথা আমার মনে হয় যে, এই রহস্যপূর্ণ বিশ্বের মধ্যে মনুষ্যজীবনই সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময়। আকাশের নক্ষত্ররাজি গণনা করা সহজ হইতে পারে, সমুদ্রের বীচিমালা গণনার আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু বিচিত্র মনুষ্যজীবনের ঘটনাবলীর ইয়ত্তা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। মনুষ্যচরিত্র দেবতারাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, ইহা এতই জটিল ও সমস্যাপূর্ণ। মনুষ্যজীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি যদি জানিতে পারা যাইত, তাহা হইলে কার্য্যকারণসম্বদ্ধ জীবনের কোন্ অংশ কিরূপে গঠিত হইল, তাহা সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের মত গণিয়া বলা যাইত। কিন্তু ঐ "যদি" লইয়াই ত যত গোলযোগ। আমরা মনুষ্যজীবনের শত কি সহস্রাংশের একাংশ জানি কি না সন্দেহ; সুতরাং এস্থলে কার্য্যকারণ-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া অনেক সময়ে বিড়ম্বনামাত্র। এত বিচিত্র রকমের শক্তি; এত বিচিত্র ঘটনা মানুষের জীবনে ক্রিয়া করে, যে তাহা ভাবিলে

হতবুদ্ধি হইতে হয়। বালক রাস্কিন তাঁহার পিতার সহিত সৌন্দর্য্যের রম্য কানন স্কট্‌ল্যাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—সেই পর্ব্বতমালাশোভিত, সমুদ্রবিধৌত, সরোবর-খচিত, অরণ্যরাজিত, স্বভাবশোভার প্রমোদভবন—স্কট্‌ল্যাণ্ড রাস্কিনের সুকুমার-চিত্তে সুষমার বীজবপন করিয়াছিল, তাই তিনি বড় হইয়া সৌন্দর্য্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। জীবনচরিতলেখক এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, আমরাও বুঝিয়া তৃপ্ত হইলাম। কিন্তু একটি কথার মীমাংসা হইল না, বাল্যকালে সৌন্দর্য্যের শ্রী যাহাদের নয়নসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহা-দের মধ্যে কতজন রাস্কিনের মত হইতে পারে? অরণ্য জঙ্গলে ঘুরিয়া কতজনে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত বনদেবতার আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিয়াছে? এইজন্য আমার বোধ হয়, মানবজীবনের আলোচনায় কার্য্যকারণধারা আমাদিগকে বহুদূর লইয়া যাইতে পারে না। বিশ্বব্যাপিনী এই কার্য্যকারণধারা আমি উপেক্ষা করিতেছি না। অনেক চিরন্তন সত্যই আমরা কার্য্যাকারণ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। মানবজীবন তাহাদেরই মধ্যে একটি। কোন্ অজ্ঞাত প্রদোষে, স্বাতীনক্ষত্রের শিশিরবিন্দু পড়িয়া এই মানবসমাজের শুক্তিমধ্যে প্রতিভারূপ মুক্তা জন্মগ্রহণ করে, তাহা আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি না। আমরা কেবল প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে মূক ও মৌন হইয়া থাকি।

প্রতিভার রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব না হইলেও, প্রতিভাসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তি-দিগের জীবনচরিতের আলোচনায় যে প্রভূত উপকার সাধিত হয়, তাহা সভ্য-জগতের সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইতেছে। স্মৃতিসভা করিয়া, জীবনচরিতের ব্যাখ্যা করিয়া, আলেখ্য বা মর্ম্মরে প্রতিকৃতি রক্ষা করিয়া একটি জাতি তাহার উপদেষ্টা বা নেতার চরণে যে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে, তাহা সেই জাতীয়হৃদয়ের স্বাভাবিক স্পন্দনমাত্র। এরূপ না করিলে একটি গুরুতর জাতীয় কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইতে হয়। চন্দ্রনাথ বাবু নিজে কিন্তু জীবনবৃত্ত অনাবশ্যক মনে করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন; "ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতিরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যদি জীবনচরিত লেখা হয়, তাহা হইলে জীবনচরিত লিখিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। মৃত্যুর পরও থাকে, কোনও লোকের জীবনে এমন কিছু থাকিলে সে লোকের জীবনচরিত না লিখিলেও তাহা থাকিবে। মানুষের প্রাচীন গুরু-দিগের জীবনচরিত কেহ কখনও লিখে নাই, কিন্তু তাঁহারা সকলেই জীবিত আছেন। মৃত্যুর পর যাহা থাকিবার নয়, জীবনচরিত লিখিলেও তাহা

থাকে না।............কাল যাহা ডুবায় তাহা ডুবিবার জিনিস, মানুষ সহস্র চেষ্টায় তাহা ভাসাইয়া রাখিতে পারে না। তাহা ডুবিয়া যাওয়াই উচিত। কালের ন্যায় সুন্দর চমৎকার বিচক্ষণ জীবনচরিত-লেখক আর নাই।" (জীবনের কথা—ত্রিধারা)। কথাটি একদিক দিয়া দেখিলে ঠিক ; স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে কালই শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি। কিন্তু জীবনচরিত লেখার উদ্দেশ্য কেবল তাহাই নহে। যে সকল মহাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের দেশ, সমাজ বা সমাজের কোন অংশের উপর প্রভাব-বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিত উপদেশের আকরভূত। তাঁহাদের আশা ও নৈরাশ্য, ক্ষমতা ও অক্ষমতা, সফলতা ও বিফলতার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া একটি মহৎ উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে মানবসমাজকে উন্নতির আবর্ত্তনশীল পথে লইয়া গিয়াছে, ইহা সব সময়েই কৌতূহলজনক এবং শিক্ষাপ্রদ। সুতরাং জীবনচরিতের মূল্য সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত একমত না হইতে পারিলেও প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে না।

বড় বড় লোকের জীবন হইতে অনেক শিক্ষালাভ করা যায়, বিশেষ যখন সেই সকল লোক লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সমাজ অথবা সমগ্র মানব জাতির মঙ্গলের জন্য যখন ইঁহারা গম্ভীর উদাত্ত স্বরে সত্যেরস্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন মানবমণ্ডলী মুগ্ধ বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহাদের দিকে সাগ্রহে চাহিয়া রহিয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবুর গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে এই ধারণাই মনে আইসে, যেন তিনি একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের আহ্বানে, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার জন্যই তিনি লেখনী গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্যই তাঁহার গ্রন্থে নিষ্ফল রচনা একরূপ বিরল। তিনি দেখিলেন যে, পাশ্চাত্যশিক্ষার বন্যায় দেশের যাহা কিছু ভাল, বাঙ্গালীর যাহা নিজস্ব, তাহা ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে, সামঞ্জস্য (Homogeneity) বিহীন সমাজ আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ, বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া প্রাচীরের মত স্থির ও অটলভাবে সেই প্লাবনের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে প্লাবন যে কি ভয়ানক তাহা সেই সময়কার ইতিহাস পাঠ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না।

ইংরেজ বণিককোম্পানী যখন ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া, তাঁহাদের ন্যায়পরতায় ও অন্যান্য কতকগুলি সদ্‌গুণে এদেশীয় লোকদিগের মত এই নূতন জাতির আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী

হইয়া উঠিতেছিল। তাহার পর ইংরেজ যখন কলিকাতায় মাদ্রাসা, ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দুকলেজ খুলিয়া দেশীয় যুবকদিগের বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, তখন বঙ্গদেশ টলমল করিয়া উঠিল। ইংরেজীশিক্ষার বিস্তার করিয়া ইংরেজরাজ যে বিপ্লবের সূচনা করিলেন, তাহাতে সমাজদেহ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বহুদিন বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক অনুর্ব্বর ও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল; সংস্কৃতজ্ঞ কতিপয় পণ্ডিত আবহমানকালপ্রচলিত কাব্যের শ্লোক আওড়াইয়া, অথবা ন্যায়ের ফাঁকির চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন। অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতায় জীবন অতিবাহিত করিত। বহুদিন বাঙ্গালী নূতন তত্ত্বের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিল। এখন যেমনি এই বিদেশীয় বিপুল সভ্যতার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, অমনি দলে দলে লোক সেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল। লোকের মনে এই ধারণা হইতে লাগিল যে, বিদেশীয় কাব্য-দর্শন, বিদেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, বিদেশীয় আচার-ব্যবহার সকলই ভাল। দেশীয় যাহা কিছু, সে সমস্তই অসঙ্গত, অসভ্য, কুৎসিৎ। এইরূপে দেশীয় আচার-ব্যবহারকে বলিদান করিয়া দেশে স্বাধীন চিন্তার যুগ প্রবর্ত্তিত হইল।

কি প্রকারে এই স্বাধীন চিন্তার উদ্বোধন হইয়াছিল, তাহা এতদ্দেশের ইতিহাস-লেখকের পক্ষে একটি অনুসন্ধানযোগ্য ঘটনা। সেই সময় যে সকল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য শক্তিনিচয় কার্য্য করিয়াছিল, তাহা সবিশেষ বিবৃত হইলে—জাতীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করিবে। ইংরেজী শিক্ষা, ও ইংরেজী সভ্যতা যে এত সহজে এবং এমন গভীরভাবে এ দেশের লোকের মনে প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা কেবল কতকগুলি বাহ্যঘটনাপরম্পরার ক্রিয়া হইতে পারে না। ভারতবর্ষীয়দিগের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই শিক্ষা-বিস্তারের অনুকূল ছিল, নহিলে এমন বিপ্লব কখনও হইতে পারিত না। ফলটি যখন গাছে পাকিয়া উঠে এবং তাহার বোঁটাটি শিথিল হইয়া যায়, তখন তাহা সামান্য একটি পক্ষীর পদভরে খসিয়া পড়ে। এ দেশের আচার, অনুষ্ঠান, রীতি, নীতি এমনই অসঙ্গত, অনাবশ্যক ও বাহুল্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকের মন শিক্ষার প্রথম বাতাসেই পুরাতন আশ্রয় ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

যে সকল বাহ্য কারণ এই ইংরেজী-সভ্যতা-বিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমি কেবল কয়েকটির উল্লেখ করিব। সত্য থাকিলেই শুধু হয় না, তাহার প্রচারক চাহি; ধর্ম্ম থাকিলেই লোকে ধার্ম্মিক হয় না, তাহার পুরোহিত চাহি; এ দেশে ইরেজী-সভ্যতা-বিস্তারেরও তেমনি কয়েকজন প্রধান

পুরোহিত বা প্রচারক জুটিয়া গেলেন। কলিকাতায় ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও প্রভৃতির মত উন্নতমনা কয়েকজন এই নূতন সভ্যতার বর্ত্তিধারণ করিলেন। ইহাঁদের নিঃস্বার্থ পরহিতচেষ্টা, অমায়িক ব্যবহার, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি দেশীয় যুবক-বৃন্দের মন আকৃষ্ট করিল। সে আকর্ষণ এমন প্রবল যে, অনেক বাঙ্গালী ধর্ম্ম, কুল, আত্মীয়, স্বজন পরিত্যাগ করিয়া এই নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে যুক্তির খুব নিকট সম্বন্ধ। যে দেশে যখন স্বাধীন চিন্তার আরম্ভ হইয়াছে, সে দেশে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে যুক্তির উপর। সক্রেতিস্ যখন গ্রীকদিগের মন স্বাধীন চিন্তার বর্ত্মে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি যুক্তিকেই প্রধান আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং যুক্তির দ্বারা প্রাচীন মতের অসারতা দেখাইতে লাগিলেন। য়ুরোপের নবযুগে বেকন হইতে হিউম্ পর্য্যন্ত সকলেই যুক্তির উপর জ্ঞানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অবশ্য যুক্তি যে সকল সময়ে ধর্ম্মের অনুকূল হয়, তাহা নহে। যুক্তির সঙ্গে যখন ধর্ম্মের বিরোধ ঘটে, তখন নাস্তিক দর্শনের উৎপত্তি হয়; এবং তাহারই প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য আস্তিক দর্শনেরও সৃষ্টি হয়। সেই আস্তিক দর্শনের উদ্দেশ্য ধর্ম্মের মূল সত্যগুলিকে যুক্তির দ্বারা রক্ষা করা। ইংরেজীশিক্ষার ঘাতপ্রতিঘাতে যখন লোকের ধর্ম্ম-বুদ্ধির মূল শিথিল হইয়া উঠিল, তখন যে যুক্তিমূলক, আস্তিক-দর্শনের সৃষ্টি হইল, তাহাই "ব্রাহ্মধর্ম্ম।" ব্রাহ্মসমাজ যুক্তির উপরে হিন্দুধর্ম্মের সারস্বরূপ উপনিষদের সত্যগুলি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্মের সার ধর্ম্মকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবল হিন্দুধর্ম্মের বাহিরের আবরণকে এবং জাকজমকপূর্ণ বহুঈশ্বরপূজাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও বেদান্তের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন, এবং বেদান্তের ঈশ্বরবাদের উপরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে এখনও অনেকে ধর্ম্মতত্ত্বমাত্র বা Theology বলিয়া মনে করেন। ধর্ম্মে এবং ধর্ম্মতত্ত্বে অনেক প্রভেদ। সে আলোচনা এস্থানে প্রাসঙ্গিক হইবে না। এস্থলে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ইংরেজী-সভ্যতা-বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। এমন কি, এই ব্রাহ্মসমাজে, খৃষ্টানদিগের অনুকরণে সাপ্তাহিক উপাসনা, সঙ্গীত ও পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সময় বুঝিয়া খৃষ্টান মিশনরীগণও ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। চুঁচুড়া ও

শ্রীরামপুরের য়ুরোপীয়গণ ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশ করিয়া, দেশীয় লোকের আচার-ব্যবহারের প্রতি বিদ্রূপবর্ষণ করিয়া লোকের মন হইতে পুরাতনের প্রতি অনুরাগ দূর করিয়া দিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রকাশিত করিয়া সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত ইহাঁরা জ্ঞানের আলোক লইয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গ-ভাষায় পুস্তকপ্রণয়ণ করায় খৃষ্টধর্ম্মের কিছু উপকার হউক না হউক, বঙ্গভাষার যে প্রভূত উপকার হইয়াছিল তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। মিশনরীরা যে কেবল ধর্ম্মপ্রচার করিয়া শিক্ষাবিস্তারের স্থবিধা করিয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে। সময়ে সময়ে মিশনরীদের ভবনে যুবকগণের সান্ধ্য সমিতিও বসিত। নিষিদ্ধ খাদ্যে তাঁহাদের রুচিও সম্ভবতঃ এই স্থানেই অর্জ্জিত হইত।

শিক্ষাবিস্তারের আর একটি দ্বারস্বরূপ হইল সংবাদপত্র। বিলাতের এবং এই দেশের কোন কোন য়ুরোপীয় সংবাদপত্র-পরিচালন করিয়া শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ স্থবিধা করিলেন। পরিশেষে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইল, তখন স্বাধীনচিন্তার প্রকৃত উদ্বোধন হইল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এই নবযুগের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। (ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

জ্ঞানালোক।

—:০:—

জলদ সঞ্চিত বহ্নি ফেলে উগারিয়া,
বিদ্যুল্লতা লভে পরকাশ;
মানব গৃহীত সত্য দেয় বিলাইয়া
হয় তাহে জ্ঞানের বিকাশ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—:০:—

কুমার রাজার গড়।

—:০:—

১

সে দুই শত বৎসরের অধিক দিনের কথা। শাকখালির রাজেশ্বর মুখোপাধ্যায় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণ জমীদারের রামনগর পরগণার নায়েব ছিলেন। জমীদার রামতারণ ভট্টাচার্য্য বৃদ্ধ, ধর্ম্মপরায়ণ ও আশ্রিতবৎসল। তাঁহারা সে অঞ্চলে পুরাতন জমীদার। প্রজারা সাধারণতঃ তাঁহাকে 'রাজা' বলিত। তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহার দূরসম্পর্কীয় কুটুম্বপুত্র রাজেশ্বর প্রতিপালিত হইতেছিলেন।

লাভের উপাদান পাইলে লোভ-সম্বরণ অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য; ধনাগমের সুযোগে রাজেশ্বরের লোভ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষে তাঁহার অত্যাচারে প্রজারা পীড়িত হইতে লাগিল। তাহারা জমীদারের নিকট আবেদন করিল। রামতারণ কর্ম্মচারীকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে সুফল না না ফলিয়া কুফলই ফলিল। রাজেশ্বর প্রজাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইলেন। প্রজারা 'মরিয়া' হইয়া উঠিল। শেষে তাহারা এক দিন নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে কাছারীতে প্রত্যাবর্ত্তনপর রাজেশ্বরকে রাত্রির অন্ধকারে পাইয়া প্রহার করিল। তাঁহার সঙ্গীরা পলায়ন করিল। প্রজারা রাজেশ্বরকে একটি বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল। প্রভাতে কাছারীর ভৃত্যবর্গ আসিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করিল।

রাজেশ্বর আসিয়া রামতারণকে এ কথা জানাইলেন; গ্রামবাসীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজেশ্বরকে বলিলেন, যদিও তাঁহারই দোষে প্রজারা এ অত্যাচার করিয়াছে, তথাপি তিনি দোষীদিগের শাস্তিবিধান করিতেন। কিন্তু কাহারা এ কার্য্য করিয়াছিল, তাহা যখন জানা যায় না, তখন অপরাধীদিগের দোষে নিরপরাধদিগকেও দণ্ডিত করিলে অধর্ম্ম হইবে।

এই ব্যবস্থায় রাজেশ্বর আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। ফলে, কয়দিন পরে একদিন নিশীথে একখানি গোযান রাজেশ্বরকে তাঁহার পত্নী কাত্যায়নীকে ও তাঁহার শিশুপুত্র কমলেশকে লইয়া গ্রাম হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়া গ্রামের লোক দেখিল, রাজেশ্বরের গৃহ শূন্য। কেহ তাঁহার বুদ্ধির, কেহ বা রামতারণের বিচারের নিন্দা করিল। রাজেশ্বর কোথায় গমন করিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

২

দীর্ঘ সপ্তদশবর্ষকাল কাটিয়া গেল। রাজেশ্বরের ঘর কয়খানি বহুদিনপূর্ব্বেই ভূমিসাৎ হইয়াছিল; এখন তাঁহার শূন্য ভিটায় যদৃচ্ছাবর্দ্ধিত তরুলতাগুল্মবন শৃগালের ও ভুজঙ্গের লীলাভূমি হইয়া পড়িল; তাঁহার পুষ্করিণী মজিয়া উঠিল। কেহ বলিত, তিনি দিল্লীতে; কেহ বলিত, তিনি ঢাকায়। গ্রামে কেহই তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ জানিত না। এই সময় রামতারণের পুত্র শ্যামাচরণ সংবাদ পাইলেন, লাট শাঁকখালির জমীদারের জমীদারী ও তাঁহার জমীদারীর সমস্ত জলকর জমা বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। তিনি কখনও রাজস্ব দিতে বিলম্ব করেন নাই। তবে, এরূপ হইল কেন? তাহার পর তিনি যখন শুনিলেন, জমীদারী ও জলকর জমা রাজেশ্বর মুখোপাধ্যায় ক্রয় করিয়াছেন; তখন বুঝিলেন, কাযটা সরলভাবে হয় নাই।

ইহার কয়দিন পরেই অনেকগুলি অপরিচিত লোক শাঁকখালিতে আসিয়া রাজা রাজেশ্বরের নামে জমীদারীর ও জলকর জমার দখল লইল। তাহার পর রাজেশ্বরের ভিটা পরিস্কৃত হইল, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও কলেবরবৃদ্ধি হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টক পোড়াইয়া রাজেশ্বরের শূন্য ভিটায় প্রসাদ-নির্ম্মাণ আরব্ধ হইল। গ্রামের লোক বিস্মিতনেত্রে সেই বৃহৎ, কারুকার্য্যবহুল গৃহের দ্রুত সম্পূর্ণতাপ্রাপ্তি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

গৃহনির্ম্মাণ শেষ হইল।

তাহার পর একদিন মধ্যাহ্নে রাজা রাজেশ্বর গ্রামে প্রবেশ করিলেন। যাইবার সময় তিনি রজনীর অন্ধকারে গোযানে প্রস্থান করিয়াছিলেন; আজ তিনি হস্তী, অশ্ব ও অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া নরবাহ্য যানে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনে গ্রামে অসাধারণ চাঞ্চল্য দেখা গেল।

রাজেশ্বর এতদিন কোথায় ছিলেন; কি উপায়ে তিনি "রাজা" হইলেন, কি কৌশলে তিনি জমীদারী ও জলকর জমা হস্তগত করিলেন—সে সব কথা প্রকাশ পাইল না। কাত্যায়নীর দরিদ্রদশার সখীরা রাণী কাত্যায়নীর শুদ্ধান্তে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। রাজেশ্বরের পুত্র কমলেশ "কুমার রাজা" নামে পরিচিত হইল। নবীন রাজা গ্রামে আসিয়া রাজগিরিটা ভাল করিয়াই

করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যবহারে, বাক্যে, বিলাসে—তাঁহার পূর্ব্বের অবস্থার পরিচয়মাত্র পাইবার উপায় ছিল না।

৩

যেমন কোন কোন সংক্রামক রোগের শক্তি কতকগুলি লোককে আক্রমণ করিয়াই ব্যয়িত হইয়া যায় বা ব্যক্তিবিশেষের দেহে কার্য্যকরী হয় না—রাজেশ্বরের উদ্ধত গর্ব্ব তেমনই কাত্যায়নীতে সংক্রমিত হইয়াই নিঃশেষ হইয়াছিল—কমলেশের সরল, উদার, প্রফুল্ল হৃদয়ে তাহা আপনার দুষ্ট প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে নাই। কমলেশ গ্রামের ভদ্রলোকদিগের সহিত মিশিত,—যুবকদিগের সহিত ধনুর্ব্বাণ-ব্যবহারের প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইত,—অনেকের গৃহেই যাইত। এরূপ ব্যবহার যে তাহার পক্ষে সম্ভ্রমনাশক রাজেশ্বর তাহা তাহাকে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেন না। তাহার পর যখন একদিন সে শ্যামাচরণের গৃহে গমন করিল, তখন রাজেশ্বরের ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম হইল। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া তাহার এ কার্য্যের নিন্দা করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেশত্যাগের কারণ জানাইয়া বলিলেন, "প্রতিশোধ লইব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সে প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছি, কিন্তু আমার বড় দুঃখ, রামতারণ আজ জীবিত নাই।" পিতার এই কথায় তাঁহার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল না, বরং সে যেন হৃদয়ে একটা বেদনা অনুভব করিল।

কাত্যায়নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধসত্ত্বেও রাজেশ্বর এতদিন একমাত্র পুত্রের বিবাহ দেন নাই। কেন দেন নাই, তাহা কেবল তিনি জানিতেন। এখন তিনি শ্যামাচরণের একমাত্র সন্তান—দুহিতা রাধারাণীর সহিত পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গালার ভদ্রসমাজে অর্থ কৌলিন্য-মর্য্যাদার স্থান অধিকৃত করে নাই। তখন লোক "ঘর" দেখিত; অদৃষ্টে বিশ্বাস করিত। রাজেশ্বরের অতীত দারিদ্র্য যেমন শ্যামাচরণের পক্ষে তাঁহার পুত্রকে জামাতা করিবার পক্ষে অন্তরায় ছিল না, তাঁহার বর্ত্তমান সম্পদও তেমনই শ্যামাচরণের পক্ষে বিশেষ আগ্রহের উৎপাদন করে নাই। কিন্তু সম্পত্তি-সংগ্রহে রাজেশ্বরের ব্যবহার ও তাঁহার উদ্ধত গর্ব্ব শ্যামাচরণের নিকট নিন্দার্হ বিবেচিত হইয়াছিল। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মতিদান করিলেন না। রাজেশ্বর ইহাতে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "তোমার পিতা আমার অপমান করিয়াছিলেন; তাহার ফলে আজ আমি রাজা রাজেশ্বর আমি এ অপমানের প্রতিশোধ লইব। তখন বুঝিবে, আমি কি করিতে পারি।"

৪

তখন ঢাকায় অতি উৎকৃষ্ট নৌকা নির্ম্মিত হইত; প্রতি বৎসর ঢাকা হইতে দিল্লীতে সম্রাটের জন্য নৌকা প্রেরিত হইত। রাজেশ্বর ঢাকা হইতে দুইখানি সুসজ্জিত ও সুগঠিত নৌকা আনিয়াছিলেন। রাজেশ্বর দুইজন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া তাহারই একখানি নৌকায় ভ্রমণে বাহির হইলেন। কেহ বলিল, তিনি জমীদারী পরিদর্শনে বাহির হইলেন; কেহ বলিল, গ্রীষ্মে কাতর হইয়া তিনি জলভ্রমণে চলিলেন। শেষের কথাটি শুনিয়া গ্রামের লোক হাসিল; কেহ কেহ বিস্মৃতপ্রায় কথা তুলিয়া বলিল, রামনগর পরগণার প্রজারা এইরূপ গরমের অব্যর্থ ঔষধ জানে।

রাজেশ্বরের নৌকা তাঁহার জমীদারী ছাড়াইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িল। রাজেশ্বর মনোযোগসহকারে নদীতীরবর্ত্তী গ্রামগুলি লক্ষ্য করিতেন; স্থানে স্থানে নৌকা লাগাইয়া তীরে উঠিয়া গ্রামগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

মাসাধিককালপরে রাজেশ্বর স্বগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

৫

বর্ত্তমান কলিকাতা হইতে অনতিদূরে অবস্থিত—গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন গ্রামের অধিবাসীরা একদিন প্রভাতে দেখিল, গ্রামের ঘাটে কতকগুলি নৌকা বদ্ধ রহিয়াছে। মহিলারা স্নানের ঘাটে এই সকল নৌকা দেখিয়া অস্নাত অবস্থায় গৃহে ফিরিলেন; ধীবরগণ মৎস্য ধরিবার জন্য নৌকা ভাসাইতে আসিয়া এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়া ফিরিয়া গেল।

ক্রমে গ্রামের লোক শুনিল, শাকখালির নবীন ধনী রাজা রাজেশ্বর অত্যধিক মূল্যে তাহাদিগের জমীদারের নিকট হইতে গ্রামখানি ক্রয় করিয়াছেন। ইহার কারণ কেহই জানিত না, কেহ কল্পনাও করিতে পারিল না।

ইহার পর গ্রামবাসিগণের বিস্ময় বর্দ্ধিত করিয়া নদীতীরে পরিখাখননের ও সৌধনির্ম্মাণের আয়োজন হইতে লাগিল। কাযটা অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই নদীকূলে পরিখাবেষ্টিত—সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মিত হইল। সহসা এইরূপ স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণের কারণ-নির্ণয়-চেষ্টায় গ্রামবাসীদিগের মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার হইবার উপক্রম হইল।

৬

নিদাঘ নিশীথ। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে আকাশে মেঘসমাগম হইয়া সন্ধ্যার কিছু পরে মুষলধারে বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র অস্তগত; চারিদিকে

অন্ধকার। সহসা নৈশ নীরবতা নষ্ট করিয়া শ্যামাচরণের গৃহদ্বারে বহুলোকের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, অন্ধকার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া মশালের আলোক জ্বলিতে লাগিল; সেই বিকট আলোকে দেখা গেল, লাঠি, বর্শা ও তরবারি লইয়া সসজ্জ দস্যুদল গৃহ আক্রমণ করিয়াছে।

তখন বাঙ্গালায় এরূপ উপদ্রব অজ্ঞাত ছিল না; জমীদারগণই আত্মরক্ষার ও প্রজারক্ষার উপায় করিতেন। সেই জন্য শ্যামাচরণ একান্ত অসহায় ছিলেন না। তাঁহার গৃহেও কতকগুলি লাঠিয়াল ছিল। দুই দলে যুদ্ধ আরব্ধ হইল। শ্যামাচরণের লাঠিয়ালগণ যথাসাধ্য প্রভুর গৃহরক্ষার চেষ্টা করিল। কিন্তু দস্যুরা সংখ্যায় অধিক এবং অস্ত্রবিদ্যায় অধিক নিপুণ। শ্যামাচরণের লাঠিয়ালগণ পরাজিত হইল। নিশাশেষে দস্যুদল শ্যামাচরণের গৃহে প্রবেশ করিল।

দস্যুরা ছদ্মবেশে আসিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে শ্যামাচরণের গৃহের পথ জানিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া কয়জন দস্যু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তথায় আত্মীয় কুটুম্বিনীদল ও দাসীরা একস্থানে সমবেত হইয়া কেহ বা দেবতার নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, কেহ বা কেবল রোদন করিতেছিলেন, কেহ বা আশার কথা বলিতেছিলেন। শ্যামাচরণের মাতৃহীনা দুহিতা রাধারাণী সেই ভয়শঙ্কিতাদিগের মধ্যে ছিল। দস্যুদল সেই রোরুদ্যমানা বালিকাকে তাহার পিতৃগৃহ ও পিতৃবক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া গেল। তাহারা গৃহের ধনরত্নাদি কিছুরই সন্ধান করিল না!

দস্যুরা বালিকাকে লইয়া নদীকূলে আসিল। তথায় নৌকা প্রস্তুত ছিল। বালিকা সেই নৌকায় বন্দী হইল। নৌকা দ্রুতবেগে নদী বাহিয়া অগ্রসর হইল। নৌকার দাঁড়ী, মাঝি সকলেই বলিষ্ঠ; নৌকায় বহু সশস্ত্র প্রহরী অবস্থান করিতেছিল।

গ্রামের লোক এই ব্যাপারে একেবারে স্তম্ভিত হইল। শ্যামাচরণ এই অত্যাচারের কারণ বুঝিলেন, প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

৭

রাধারাণী রাজেশ্বরের নবনির্ম্মিত দুর্গে নীত হইল—বন্দী হইল। সাধারণতঃ যে বয়সে বালিকারা পরিণীতা হইত, রাধারাণী সে বয়স অতিক্রম করিয়াছিল। শ্যামাচরণ কিছুতেই মনোমত পাত্র পাইতেছিলেন না; কেবল বাছাই চলিতেছিল। রাধারাণীর আপনার অবস্থা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা হইয়াছিল। বিশেষ অতর্কিত বিষম বিপদ যেমন সময় সময় মানুষকে একান্ত দুঃখাভিভূত করিয়া

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করে, তেমনই আবার সময় সময় তাহার মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত করে—পরিণত করে। রাধারাণী আপনার অবস্থা বুঝিল। সে ভাবিল;—যে কক্ষে সে থাকিত, সে কক্ষ পরীক্ষা করিল। কক্ষের বাতায়ন-পথের নিম্নার্দ্ধে কপাট বন্ধ—উপরার্দ্ধের কপাট ইচ্ছামত মুক্ত বা বন্ধ করিতে পারা যায়; বাতায়ন-পথে অন্যরূপ বাধা নাই। নিম্নে পরিখা—গঙ্গার সহিত সংযুক্ত—গঙ্গাজলে পূর্ণ। রাধারাণী দেখিল, যখন ইচ্ছা সে মরিতে পারে—আর সে মৃত্যুও গঙ্গাজলে হইবে। সে নিশ্চিন্ত হইল। "তুকুড়ি সাত" থাকিলে লোক যেমন নিশ্চিন্ত হইয়া খেলার গতি লক্ষ্য করিতে পারে—আবশ্যক বুঝিয়া খেলিতে পারে, সেও তেমনই নিশ্চিন্ত হইয়া ঘটনার স্রোতের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

তবে পিতার জন্য তাহার হৃদয় সর্ব্বদাই ব্যথিত হইত। সে যখন দেখিত, আকাশে বিহগগণ উড়িয়া বেড়াইতেছে—তখনই সে ভাবিত, বিহগের পক্ষ পাইলে সে কত দ্রুত পিতৃসমীপে উপস্থিত হইত! সে যখন দেখিত, অদূরে জাহ্নবীবক্ষে নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে—তখনই সে ভাবিত একবার যদি মুক্তি পাইত, তবে সে ত্বরায় পিতৃসমীপে উপনীত হইবার জন্য নৌকার নাবিকদিগকে তাহার সমস্ত সম্পদ দিতে পারিত। সে পিতার কথা ভাবিত; ভাবিত, আর কাঁদিত।

মনোবেদনার উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে সে দুর্গমধ্যে জনগণের কার্য্য লক্ষ্য করিত। প্রহরীদিগের গতিবিধি, তাহাদের অস্ত্র-ব্যবহার সবই রাধারাণী লক্ষ্য করিত।

রাজেশ্বর দুর্গে ছিলেন না; তিনি শাঁকখালির গৃহে সতর্ক, প্রহরীবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। কাত্যায়নীও শাঁকখালিতেই ছিলেন। কিন্তু রাজেশ্বরের একমাত্র পুত্র কমলেশ দুর্গেই ছিল। দুর্গে সে-ই প্রধান।

৮

রাধারাণী দেখিত, কমলেশ মল্লযুদ্ধে কোন ভীমকায় প্রহরিকে পরাজিত করিতেছে বা শরে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতেছে। সে শুনিত, তাহার সরল উচ্ছ্বসিত হাস্য দুর্গমধ্যে ধ্বনিত হইতেছে। কমলেশের ব্যবহারে সরলতা ও সহৃদয়তা এমনই সপ্রকাশ ছিল যে, রাধারাণী কিছুতেই তাহাকে ঘৃণা করিতে পারিত না। কমলেশ সর্ব্বদাই রাধারাণীর সংবাদ লইত এবং তাহার যথাসম্ভব সুখবিধানে সচেষ্ট হইত। তাহার ব্যবহারে বোধ হইত, সে বন্দিনীর দুর্দ্দশায় দুঃখিত; বন্দিনীর প্রতি দুর্ব্যবহারে লজ্জিত। তাহার এইরূপ ব্যবহারে রাধারাণী বিস্মিতা হইত।

ইহার পর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। একদিন শাঁকখালি হইতে আগত পুরোহিত দাসীর সহিত রাধারাণীর কক্ষে উপস্থিত হইলেন; বলিলেন, দুইদিন পরে তাহার সহিত কমলেশের বিবাহ দিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। শুনিয়া রাধারাণী বলিল, "আমি বিবাহ করিব না।"

পুরোহিত বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ কি তোমার ইচ্ছায় হইবে?"

এই সময় কমলেশ কক্ষদ্বারে উপনীত হইয়া বলিল "কি, ঠাকুর মহাশয়, কি বলিতেছেন।"

পুরোহিত বলিলেন, "বালিকা বলিতেছে, বিবাহ করিবে না; যেন বিবাহ করা না করা ইহার ইচ্ছাধীন।"

রাধারাণী দৃঢ়স্বরে পুনরায় বলিল, "আমি বিবাহ করিব না।"

কমলেশ বলিল, "তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে না।"

পুরোহিত বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে কমলেশের দিকে চাহিলেন। কমলেশ হাসিয়া বলিল "শাস্ত্রে আছে—

'হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে।'

একে ব্রাহ্মণের পক্ষে রাক্ষসবিবাহ কোন কালেই প্রশস্ত নহে; তাহাতে কলিতে তাহা প্রচলিত নাই।"

পুরোহিত শুষ্ক হাসি হাসিলেন। তিনি বিবাহে ও শ্রাদ্ধে সংস্কৃত মন্ত্র পড়াইয়া থাকেন বটে; কিন্তু সংস্কৃতের সহিত তাঁহার অন্য সূত্রে পরিচয় ছিল না। তিনি কমলেশের কথা বুঝিতে পারিলেন না; কমলেশ তাহা বুঝিল, বুঝিয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয়, একটি কুলবালাকে পাশববলে অপহরণ করিয়া আনিয়া পশুর মত বন্দী করিয়া রাখিয়াছি, ইহাই কি যথেষ্ট নহে যে, আবার তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিব?"

পুরোহিত কিছুক্ষণ নির্ব্বাক রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "কর্ত্তাকে কি বলিব?"

কমলেশ বলিল, "বলিবেন, বিবাহে বালিকার অসম্মতি জানিয়া আমি বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছি।"

কমলেশ চলিয়া গেল। পুরোহিত তাহার অনুসরণ করিলেন।

রাধারাণী ভাবিতে লাগিল। কমলেশের ব্যবহারে তাহার মনে যে বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অনাবিল শ্রদ্ধায় পরিণত হইল। এ শ্রদ্ধার পরিণতি কিসে বালিকা তাহা জানিত না।

৯

কোন কায নাই; আছে কেবল ভাবনা। রাধারাণী ভাবিত। সে পিতার কথা ভাবিত, পিতৃগৃহের কথা ভাবিত, আপনার কথা ভাবিত। আর সেই ভাবনার মধ্যে তাহারও অজ্ঞাতে কেন যে সে কমলেশের কথা ভাবিত—তাহা সে আপনি জানিত না।

যত দিন যাইতে লাগিল, সে ভাবনা ততই বাড়িতে লাগিল। মধ্যাহ্নে মুক্ত-বাতায়ন-পথে অদূরে জাহ্নবীর বীচিবিক্ষোভ-চঞ্চল প্রবাহ লক্ষ্য করিতে করিতে, সায়াহ্নে সিন্দুরলিপ্ত মেঘমালা দেখিতে দেখিতে সে কমলেশের কথা ভাবিত। ক্রমে এমনই দাঁড়াইল যে, সে কমলেশের আগমনে আনন্দিত হইত, তাহার পদশব্দ শুনিলে বালিকার হৃদয়স্পন্দন দ্রুততর হইত।

তখনও সে চিন্তায় লজ্জাসঞ্চার হয় নাই; তখনও বালিকাহৃদয়কমল অনু-রাগের অরুণকিরণে বিকশিত হয় নাই। ক্রমে সে চিন্তায় লজ্জা আসিল। তখন কমলেশ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে আর পূর্ব্বের মত তাহার মুখে চাহিয়া উত্তর দিতে পারিত না; চেষ্টাসত্ত্বেও তাহার দৃষ্টি হর্ম্ম্যতলবদ্ধ হইত। তাহার উত্তর আর তেমন স্পষ্ট হইত না।

বালিকা আপনার এই পরিবর্ত্তনে আপনি বিস্মিত হইত; কিন্তু ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিত না।

১০

মানুষ স্বভাবতঃ আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করে। সে মনে করে, তাহার সযত্ন-সম্পাদিত কার্য্যে কোথাও কোন ত্রুটি থাকিতে পারে না। রাজেশ্বর মনে করিয়াছিলেন, তিনি যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে রাধারাণীর কারাগৃহ কিছুতেই শত্রুর হস্তগত হইবে না। এইরূপ মনে করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু যে বিশ্বাসঘাতকার সহায়তায় তিনি শ্যামাচরণের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতকতায় যে তাঁহারও সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

কন্যার কারাগৃহের সন্ধান পাইতে শ্যামাচরণের অধিক বিলম্ব হইল না। কিন্তু রাজেশ্বরের ব্যবস্থাহেতু তিনি বহু চেষ্টাতেও তাহাতে প্রবেশলাভের উপায়

করিতে পারিলেন না। তাহার পর শ্যামাচরণ দুর্গনির্ম্মাণকার স্থপতির সন্ধান পাইলেন এবং তাহাকে হস্তগত করিয়া দুর্গের নক্সা পাইলেন। তিনি দেখিলেন, পরিখা হইতে দুর্গমধ্যস্থ স্নানাগার জল পূর্ণ করিবার জন্য প্রাচীরে যে কয়টি রন্ধ্র বিদ্যমান, সে কয়টি রন্ধ্র দিয়া এক এক জন মানুষ অনায়াসে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। রন্ধ্র পরিখার জলতলে অবস্থিত; সুতরাং, রন্ধ্র-কপাট বন্ধ না করিলেও তাহা সহজে লক্ষিত হয় না। শ্যামাচরণ বহু অর্থ ব্যয়ে স্নানাগারের তত্ত্বাবধায়ককে হস্তগত করিলেন। সে নির্দ্দিষ্ট দিন রন্ধ্র-কপাটগুলি মুক্ত রাখিল। বহুদিন কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত না ঘটায় দুর্গ-রক্ষকের সতর্কতা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। রন্ধ্র-কপাটের বিষয় দুর্গ মধ্যে আর কেহ জানিতে পারিল না।

এ দিকে কোন্ পথে আসিয়া কিরূপভাবে আক্রমণ করিলে অতর্কিত আক্রমণে দুর্গ-প্রহরীরা সহজে পরাভূত হইতে পারে, শ্যামাচরণ সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত আবশ্যক পরামর্শ করিলেন।

১১

নিশীথের অন্ধকারে শতাধিক অনুচর লইয়া স্বয়ং শ্যামাচরণ রন্ধ্রপথে দুর্গে প্রবেশ করিলেন। সকলেই বারিসিক্ত। অনুচরবর্গকে সমবেত করিয়া শ্যামাচরণ দুর্গ আক্রমণের উপদেশ দিলেন।

অতর্কিত আক্রমণে দুর্গ-প্রহরীদিগের মধ্যে অনেকে বন্দী হইল। অবশিষ্ট প্রহরীরা অস্ত্রসংগ্রহ করিলে দুইদলে বিষম যুদ্ধ আরব্ধ হইল।

সংখ্যাধিক্য হেতু শ্যামাচরণের অনুচরবর্গের নিকট দুর্গ-প্রহরীরা পরাভূত হইল। দুর্গপ্রাঙ্গণে হতাহতের দেহ স্তূপীকৃত হইল; নৈশ সমীরণে বিজেতার জয়ধ্বনি ও আহতের আর্ত্তনাদ উঠিতে লাগিল।

বিজয়ীরা দুর্গদ্বার মুক্ত করিলে বহু মশালধারী আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিল। তাহারা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। সেই মশালের আলোকে দুর্গ-প্রাঙ্গণের ভীষণ দৃশ্য ভীষণতর দেখাইতে লাগিল।

১২

রাধারাণী দুর্গপ্রাঙ্গণে এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। সোপানে পদধ্বনি শুনা গেল। রাধারাণী অলিন্দ হইতে আসিয়া কক্ষের যে বাতায়নের নিম্নে পরিখা অবস্থিত সেই বাতায়নের বদ্ধ নিম্নার্দ্ধে ভর দিয়া দাঁড়াইল; যদি

আবশ্যক হয়, দেহের সামান্য সঞ্চালনে পরিখায় পড়িয়া আপনার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে।

শ্যামাচরণ কক্ষদ্বারে উপনীত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে যে অনুচর ছিল তাহার করধৃত মশালের আলোক রাধারাণীর মুখে পতিত হইল। কন্যাকে দেখিয়া শ্যামাচরণ উচ্ছ্বসিত স্নেহে ডাকিলেন—"রাধারাণী! মা!"

রাধারাণী পিতার নিকট আসিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় একজন লোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে বর্শা—তাহাতে একটি সদ্যবিচ্ছিন্ন নরমুণ্ড—মুণ্ড হইতে রক্ত ঝরিতেছে। রাধারাণী দেখিল, মুণ্ড কমলেশের।

রাধারাণীর মুখ যেন রক্তশূন্য হইয়া গেল। সে মূর্চ্ছিত অবস্থায় বাতায়নে পড়িয়া গেল।—নিম্নে পরিখা।

"কি হইল?"—বলিয়া শ্যামাচরণ উন্মাদের মত বাতায়নের দিকে অগ্রসর হইলেন। ততক্ষণে রাধারাণীর দেহ পরিখার জলে অদৃশ্য হইয়াছে। শ্যামাচরণ সেই বাতায়ন-পথে কন্যার অনুসরণের চেষ্টা করিলেন। অনুচর-গণ নিবারণ করিল। তাহার পর বহু সন্ধানেও রাধারাণীর দেহ পাওয়া গেল না।

শ্যামাচরণ আর গৃহে ফিরিলেন না। দেওয়ানকে সম্পত্তির ব্যবস্থার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া সন্তানহীন জীবনের সায়াহ্ন-যাপনের জন্য রাধারাণীর স্মৃতিপূত বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন।

১৩

রাজেশ্বর শাঁকথালিতে ছিলেন। যে দিন রাত্রিকালে কমলেশের ও রাধা-রাণীর জীবনের অবসান হইল, তাহার পরদিন তিনি সংবাদ পাইলেন, শ্যামাচরণ বহু অনুচরসহ কোথায় গিয়াছেন। তিনি কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন—গড়ের সংবাদের জন্য লোক পাঠাইলেন।

পরদিন প্রভাতে পুরবাসীদিগের কলরবে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ তাহাকে প্রকৃত কথা বলিতে সাহস করিল না। শেষে তিনি স্বয়ং যাইয়া দেখিলেন, কে তাঁহার সিংহদ্বারের সম্মুখে একটি বর্শা প্রোথিত করিয়া গিয়াছে—বর্শায় কমলেশের ছিন্ন মুণ্ড বিদ্ধ। দেখিয়া রাজেশ্বর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তাহার পর তিনি বর্ষাধিক কাল জীবিত ছিলেন; জীবিত—কিন্তু জীবন্মৃত।

নিদারুণ পক্ষাঘাত তাঁহার শারীরিক শক্তি হরণ করিয়া যেন কেবল যাতনা ভোগের জন্যই তাঁহার মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রখিয়া গেল।

*　　　*　　　*　　　*

শ্যামাচরণের ও রাজেশ্বরের বংশে আর কেহই ছিল না। এখন তাঁহাদের গৃহাদির চিহ্ন ও স্মৃতি বিলুপ্ত। কেবল, কোন্নগরের গঙ্গাতীরে পরিখার চিহ্ন ও প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। লোক এখনও সেই ভগ্নাবশেষকে "কুমার রাজার গড়"—নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

— —:০:— —

যমুনা-বক্ষে।

(মথুরায়।)

যমুনে! ভারতে তুমি সুর-তরঙ্গিনী ;
সতত জুড়াও প্রাণ সুনীল হিল্লোলে ;
তুমি এ ব্রজের মাঝে ব্রজ-বিলাসিনী,
হই আত্মহারা তব তরঙ্গের কোলে।
সন্ধ্যায় তোমার কণ্ঠে দীপমণিহার,
জাগায় নয়নে কোন্ ত্রিদিব-স্বপন!
মধুর উজ্জ্বল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে তোমার,
কি তৃপ্তি-জড়িত মোর উদ্‌ভ্রান্ত জীবন!
সেই দূর অতীতের স্মৃতিমহিমার,
চির মধুময় লীলা, প্রেম-প্রস্রবণ ;
ভূতলে ত্রিদিব সম দৃশ্য মথুরার,
কোলাহলে সাধনার শান্ত নিকেতন!—
এ ভবসংসারে গৃহ চির সান্ত্বনার,
রচেছে মথুরাবক্ষে প্রবাহ তোমার!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

———

বঙ্গ-লক্ষ্মী।

—:০:—

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্!

একদিন কমলা নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পৃথিবীতে আমার ঘর পাতিবার বড়ই বাসনা; এমন কোন্ দেশ আছে,—যেথায় আমি মনের মত করিয়া ঘর সাজাইতে পারি?"

নারায়ণ নিমীলিত নেত্রে নিখিলভুবন ভাবিয়াও লক্ষ্মীর মনোমত দেশ পাইলেন না। বলিলেন,—"অয়ি শোভিনি! তোমার মনের মত দেশ ত পাইলাম না; তবে যদি তুমি স্বয়ং দেশ গড়িয়া লইতে পার,—তবেই তোমার বাসনা পূর্ণ হয়।"

নারায়ণের কথা শুনিয়া কমলা অগাধ সাগর হইতে এক সোণার দেশ তুলিয়া তাহাকে আপনার মনোমত করিয়া গড়িলেন; তাহার পর কোথায় যে সে দেশ স্থাপন করেন—তাহা লইয়া বড়ই বিব্রত হইলেন; শেষে গিরিরাজ হিমালয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"গিরিরাজ! আমার এই সাধের খেলাঘর তোমার কাছে রাখিলাম; তুমি ইহাকে কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিও।" কমলার স্বকৃত—তাঁহার অতি সাধের সৌন্দর্য্য-প্রতিমার রূপ দেখিয়া পাষাণ গিরিরাজের উদ্বেল হৃদয়ের তরঙ্গরাশি তরল-ধারায় বেগে প্রধাবিত হইল। তাঁহার সেই স্নেহবিগলিত অশ্রুধারা—পীযূষ-পূরিত নীরধারা—জাহ্নবী-যমুনারূপে আকুল লহরী তুলিয়া বহিতেছে।

আমাদের বাঙ্গলাদেশের সহিত এইরূপ একটা প্রবাদ জড়িত আছে। কমলার হাতে-গড়া না হইলে এমন সৌন্দর্য্যময়ী—এমন ঢলঢল, চলচল রূপময়ী—প্রাণময়ী,—শান্তিময়ী ধরণী আর কে গড়িবে? এ বুঝি এক বিরাট স্বপ্নরাজ্য, এত সৌন্দর্য্য বুঝি কল্পনারও অতীত। বিদেশের ছেলে যাহার কথা শুনিয়া উৎসুক-মনে মাতাকে জিজ্ঞাসা করে—"মা! সে দেশ কোথায় where rivers

wander over sands of gold.—তরঙ্গিনী ব'য়ে যায় ধুয়ে সোণার বালি,—সে দেশ কোথায় মা ?"—সে দেশ আমাদেরই জন্মভূমি ! এমন কল্পনাময় রাজ্য বুঝি আর নাই !

বাঙ্গলার উত্তরে 'অম্বরচুম্বিত-ভাল হিমাচল' তুষার-ধবল শিরে অরুণ-কিরণ-হিরণ-কিরাট পরিধান করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে সৌন্দর্য্যের এক বিরাট হাট লইয়া দণ্ডায়মান ! সে হাট সৌন্দর্য্যের সমষ্টি-ক্ষেত্র,—সে হাটে সবই মিলে !—সে হাট নির্ঝরিণীর ঝরঝর-তরতর-রব-মুখরিত, পিক-শ্যামা-কণ্ঠ-স্বর-ঝঙ্কৃত, চামেলী-চম্পক-কুন্দ-কুসুম-সৌরভ-আকুলিত। সে বিরাট উদার হাট প্রকৃতির সাজান হাট, বিশ্বমেলার এক অব্যক্ত কল্পনাময় রাজ্য !—সে কঠোর-কোমল, বিকট-সুন্দর রাজ্যে ভেদ নাই ! "বিশাল ক্ষুদ্রকে আশ্রয় দিয়াছে, আলিঙ্গন করিয়াছে, মাথায় তুলিয়াছে ! কত শত বিশাল শাল্মলী-তরুর পাদদেশে সহস্র আয়তচক্ষু মেলিয়া ধুস্তূরা চাহিয়া আছে ; আর বন্য বেগনোনিয়া রাশি রাশি লাল ফুল বিছাইয়া, শাল্মলীর কাঁধে চড়িয়া, মাথায় ছাতি ধরিয়া আছে। উৎকটে-কোমলে, বিশালে-সুন্দরে—কি অপূর্ব্ব মাথামাখি ! সমুদ্র দেখিলে অনন্তের আভাস পাওয়া যায় ; সুনীল আকাশেও অনন্ত,—অনন্ত কোমলতা ; নক্ষত্র-পুঞ্জ-খচিত পরিষ্কার আকাশেও অনন্ত—অনন্ত সুন্দর ;—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দাম-স্ফূরিতা গভীরা মসীময়ী ত্রিযামার ঘোর বিকটশব্দে শব্দায়মানা নভস্থলীতেও অনন্ত ; সে অনন্ত কে যেন আর এক রূপ বিরাটতর অনন্তে সান্ত করিয়া রাখিয়াছে ; হিমালয়প্রদেশের বনভূমি সেইরূপ—যেন মহান্ অনন্তদেবের বিরাট মায়াময় খেলাঘর !" সে বিরাটতর অনন্তের মধ্যে গগনচুম্বী বিরাটতম হিমাচল—মহাযোগী হিমাচল—সৌদামিনী-জটাজাল বিস্তৃত করিয়া, শ্বেত মেঘরাশির উত্তরীয় উড়াইয়া গভীর-ধ্যানমগ্ন ! বুঝি অনন্তকালেও অনন্তের এই অনন্ত ধ্যান ভাঙ্গিবে না !

দক্ষিণে নীলসিন্ধুজল রাতুলচরণতল ধৌত করিয়া সগর্ব্বে বুঝি অনন্তের পানে ছুটিয়াছে ! বুঝি সাগর বঙ্গজননীর এমন সুন্দর মূর্ত্তি ভুলিতে না পারিয়া মুহুর্মুহু বিরাট হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় ভাবরাশি জননীর পাদদেশে উৎসর্গ করিতেছে ! বুঝি জলধি অনন্ততরঙ্গশীর্ষে অনন্ত-ফেন-নৈবেদ্যরাশি বহন করিয়া জননীর মহাপূজার জন্য নিয়ত নিরত রহিয়াছে ! এত ভক্তির—এত প্রেমের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ বুঝি অনন্ত সমুদ্র বাঙ্গলা-মায়ের 'তমালতালীবনরাজিনীলা' কোমলা বেলার মধুময়ী ছায়া বুকে বহন করিবার অধিকার পাইয়াছে ! তাই বুঝি

আনন্দে আত্মহারা হইয়া সে স্ফীতবক্ষে জননীর পাদমূলে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে!

বাঙ্গলা কমলার আশ্চর্য্য সৃষ্টি। বাঙ্গলার মাঠে মাঠে, বাঙ্গলার নির্জ্জন প্রান্তরে, বাঙ্গলার 'সারাদিন পাখী-ডাকা, ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটে,' বাঙ্গলার 'শালতালতমালসঙ্কুল,' বিহঙ্গকণ্ঠাকুল, ঘন, বিজন, কাননে, 'ধীরগভীর-প্রবাহ-ধার নদনদী'র ঘুমপাড়ানিয়া গানে মুখরিত বাঙ্গলার শ্যামল কোমল দূর্ব্বাময় উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, বাঙ্গলার 'আম্রবনঘেরা সহস্রকুটীরে, দোহনমুখর গোষ্ঠে', বাঙ্গলার ছায়া-বটমূলে যে নিত্যকল্যাণময়ী. সৌন্দর্য্যপূর্ণা মাতৃমূর্ত্তি সতত বিরাজমান,—তাহার উপমা বিশ্বে নাই! এ যে—'ত্রিভুবনে নিরুপমা; কি দিব উপমা!"

বাঙ্গলায় ষড়ঋতুর খেলা অনন্ত-সৌন্দর্য্যজড়িত। বাঙ্গলায় বসন্ত কি এক অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তিতে আপনার সৌন্দর্য্য-ভরা হৃদয়ের একখানি স্বপ্নময় ছবি বিকাশ করে। সে যেন কোন্ অজানা রাজ্যের মধুর মূর্চ্ছনাময়ী গীতি,—সে যেন আশার উল্লাসময়ী বাণী,—সে যেন অব্যক্ত ভাষায় প্রেমরাজ্যের দ্বার-উদ্ঘাটন। ধীরে ধীরে মধু আসিল; সতী প্রকৃতি—জীর্ণ-পত্রসারা ক্ষীণা প্রকৃতি নবীন অতিথিকে সাদরে আবাহন করিয়া, আপনার দীন উপহার অতিথির চরণমূলে অর্পণ করিলেন! অতিথির আশীষে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নীরস অঙ্গে কোমল কিশলয় রাজি মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল! বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায়, গুল্মে নবীন পেলবপল্লবরাশি থরে থরে সাজিয়া উঠিল! ক্রমে ক্রমে সেই লোহিত পল্লবরাশি শ্যামল সুন্দর ঘন পত্রাচ্ছাদন হইয়া উঠিল! শাখায় শাখায়, লতায় লতায় আর ফুল ধরে না! সারাদিন তরুমর্ম্মর পবনে সুনিভৃত ছায়া কত মনের কথা বলাবলি করিল! মুকুল-আকুল বকুলকুঞ্জভবনে সৌন্দর্য্য বিছাইয়া পড়িল! যখন তমালের কাল পাতাগুলি আরও কাল হইয়া উঠিল। যখন সে সৌন্দর্য্যরাশি শ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পল্লবে আর ধরে না;—পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের মত হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, ঢলিয়া ঢলিয়া উছলিয়া পড়িতেছে, যখন তাহার কোলের কুসুমের সৌরভে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে,—তখন সেই কাল পাতার ঘন-অন্তরালে কাল কোকিল আপনার কাল শরীর লুকাইয়া, সাধা গলায় গাহিল—কুহু-কুহু-কুহু! আবার যখন শুভ্র-শরীরা নব-মল্লিকা উষার শিশিরে স্নাত হইয়া মলয় বাতাসে মুখখানি খুলি-খুলি খুলিতেছে না—মুখ ফুটি-ফুটি ফুটিতেছে না;—যখন সেই অমল রূপরাশির লোভে মত্ত ভ্রমর ছুটাছুটি করিতেছে,—যখন লতা নূতন শাখায় নূতন দোলনা টাঙ্গাইয়া দুলিবার উপক্রম করিতেছে,—তখন তাহার সেই

দোলনির সহিত নিজের কাল অঙ্গ দোলাইয়া গন্ধরাজ-বেল-মল্লিকা-শিরীষ-মালতীর মুখে মুখে পিক গাহিল—কুহু-কুহু-কুহু! সে স্বরে, সে গীতের উচ্চ মূর্চ্ছনায় আশাবধূ সরম ত্যাগ করিয়া প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল,—কুহু-কুহু-কুহু! সে কায়-হীন ভাষা, কণ্ঠহীন স্বর ধীরে ধীরে হৃদয়ে গাঁথিয়া যায়! সে রহস্যময়ী লীলা অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে ধরণীকে আমোদিত করিয়া তুলে!

বাঙ্গলায় বর্ষা ঝরিতে ঝরিতে, ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উপস্থিত! খাল বিল, পল্বল, পুষ্করিণী, নদী, নালা সবই ভরিয়া উঠিল। নূতন জলে ভেকের মক-মকি প্রতিধ্বনিকে ক্লান্ত করিয়া তুলিল! নূতন জলে-ভরা নদী ভরা-যৌবনে বিধবা গৈরিক বাস পরিহিতা রমণীর ন্যায় চলিতে লাগিল! অত ভরা জলেও যেন কি এক অভাবের ক্রন্দন ঝর ঝর রবে জগতকে জানাইয়া গেল। তরু, লতা, পাতা সকলেই বর্ষাজলে ভিজিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বাঙ্গলায় যেন কি এক ভরা সৌন্দর্য্যের ভরা গান গীত হইল!

তাহার পর শরতে বিমল সুনীল আকাশে চাঁদিনী রাত্রিতে বিকীর্ণ শ্বেত মেঘরাশির ক্ষুদ্ররাজ্যে অসংখ্য তারকালোকের মধ্যে রাকাশশী হাসিয়া উঠিল! জ্যোৎস্নার উচ্ছ্বাসময়ী লীলা লতায় পাতায়, তরুশিরে, কুসুমকোলে, শ্যামল কোমল দূর্ব্বা ক্ষেত্রের উপর, নদীর জলে, শ্যামল সৈকতে হাসিয়া হাসিয়া, ফুটিয়া লুটিয়া ভাসিয়া উঠিল। মাঠে মাঠে শ্যামলতা ফুটিল; উপরে নৈশ নীলিমার নীচে অনন্ত শ্যামলতার উপর পূর্ণিমা রাকাপতির হাস্যস্রোত হিল্লোলিত হইয়া উঠিল! সে হিল্লোল প্রকাশের, সে আবেগ প্রকাশের, ভাষা নাই;—তাহা "অনির্ব্বচনীয়—যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ!" বর্ষার পর আর যেন নদী নীর-ধার বহিতে পারে না। অমল শোভায় শ্যামল অঙ্গ ঝলসিয়া উঠিতেছে। আর মাঠে মাঠে ধান ধরে না; কাননকুঞ্জে দোয়েলা-কোয়েলা কূজন করিয়া উঠি-তেছে! শ্যামল অঙ্গ শিশির-নিষিক্ত হইয়া যেন আরও শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে! হরিতে নীল আকাশ আসিয়া মিলিয়াছে; সে মিলনে সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য বিক-শিত হইয়া উঠিয়াছে!

তাহার পর সোণার হেমন্ত। মাঠে মাঠে সোণার ছড়াছড়ি—গড়াগড়ি! শ্যামল শরতের আশাময়ী বাণী হেমন্তে কর্ম্মময়ী, প্রত্যক্ষরূপিণী। শ্যামলা ধরণী হিরণ্ময়ীতরঙ্গায়িত হইতে লাগিল! সুদূর বিস্তৃত মাঠখানির প্রান্তে আকাশ আসিয়া মিলিয়াছে,—সোণার স্পর্শে সোণা হইয়া গিয়াছে। সোণার আকাশে সোণার ক্ষেত্রে এক হইয়া গিয়াছে! 'স্থলে জলে আর গগনে গগনে' মধুর লগ্নে

বাঁশী বাজিয়া উঠিল! কৃষকের বুকভরা ধন—বর্ষার জলে-ভেজা-ধন গ্রীষ্মের প্রখররৌদ্রতাপে তাপিতের ধন—তাহার কত নব আশার সৃষ্টি করিল! প্রথম শিশির-সমীর তাহার ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন দেহ জুড়াইবার জন্য ঝুরু ঝুরু বহিয়া গেল। হাসিভরা মুখের সরল ছবি দিগ্‌দিগন্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তখন—

'মাতার কণ্ঠে শেফালি মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত,
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ জড়িত-চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী!
আলোকে, শিশিরে, কুসুমে, ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী!'

উষাকালে যখন দিগ্বধূ অরুণ-চুম্বনচিহ্ন কপোলদেশে কুতূহলে মাখিয়া, লাজরক্তিম অঙ্গে ধীরে ধীরে গলিয়া যায়; যখন তুষার-আসার-কপোলে অরুণচুম্বনচিহ্ন ফুটে ফুটে ফুটে না,—যেন কোন্ অব্যক্ত স্বপ্নরাজ্যের সুখের সংবাদ বহিয়া ক্ষীণালোকে ভাসিতে থাকে, যখন উষার শিশির-শীকর-সিক্ত বায়ু চুপি চুপি আসিয়া চলিয়া যায়, যখন ঘুম-ঘোরা প্রকৃতির আদর-কলিকাগুলি স্বর্ণ-আঁখি মেলিয়া চাহিয়া উঠে, তখন—সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—সৌন্দর্য্যের এক বিরাট উদার অভিনয় হইয়া যায়। সে অভিনয়ে সকলেই যোগ দিয়া এক মহান্ অভিনয়ের সৃষ্টি করে।

বাঙ্গলার এ সৌন্দর্য্যসেবার অধিকারী সকলেই। যে যেমনভাবে লইবে—সে তেমনি পাইবে। এ সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, কোমলা, বঙ্গজননীর কোলে সকল সন্তানেরই সমান অধিকার। নিত্যকল্যাণী বঙ্গজননী সারাবেলা সন্তানের জন্য ব্যস্ত। প্রত্যূষে পূজার ফুল ফুটাইতেছেন, মধ্যাহ্নে শীতল পল্লবাঞ্চল প্রসারিত করিয়া রৌদ্র নিবারণ করিতেছেন, নিশাগমে চারিদিক হইতে যত নদনদী একত্র করিয়া, ক্লান্ত গ্রামগুলি ঘেরিয়া ঘুম পাড়ানিয়া গান গাওয়াইতেছেন;—ঝিল্লীমুখরিত দিগ্বধূ যেন প্রতিধ্বনিতে ক্লান্ত হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে;—আর হেমন্ত-মধ্যাহ্নে গৃহকাযে বিরাম দিয়া হিল্লোলিত হৈমান্তিক

মঞ্জরীর মাঝে, 'কপোত কূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে' সন্তানের জন্য হাসিমুখে জাগিয়া বসিয়া আছেন! স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয় ধৈর্য্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দ্দিকে ক্ষেম-পূর্ণ আশীর্ব্বাদ বিকীরণ করিতেছে! সেই স্নেহাপ্লুত আত্মবিস্মরণের মূর্ত্তি,—সেই মৌন আশীর্ব্বাদপূর্ণ মধুর মঙ্গল ছবি—সৌন্দর্য্যের অনন্ত নিলয় সেই মূর্ত্তি দেখিয়া যদি প্রাণে ভক্তির উদয় হয়,—তবেই বলিতে পারিব—"অয়ি শস্পশ্যামলা, কুন্দধবলা, অম্বুমেখলা জননি! পল্লীশোভনা, মল্লীভরণা, জননি! নিত্যনবীনা, চিত্তদ্রাবিণা, অশ্রুবিলোললোচনী, জননি! আমি যেন জন্মে জন্মে তোমার কোলে স্থান পাই; তোমার এ প্রাণভোলা, নিত্যসরসা মূর্ত্তি ছাড়িয়া আমি আর কোথাও থাকিতে পারিব না; তুমি আমায় তোমার এ মূর্ত্তি— এ চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল চরণ হইতে বঞ্চিত করিও না। নিত্যকুশলা, চিত্ত-বহুলা, চিত্তবেদনহারিণী, জননি! সন্তান-সুখদায়িনী, জ্যোৎস্নামধুরহাসিনী, ক্রমচামরধারিণী, জননি! আমায় তোমার কোল হইতে বিচ্যুত করিও না। আমি জানি না, মা! জপ,—তপ, ধ্যান, আরাধনা;—আমার কাছে তুমি ত দেবতা নও! তুমি যে আমার স্নেহময়ী জননী! তোমার স্নেহ-বিগলিত অশ্রুধার দেখিয়া আমি আর নয়ন ফিরাইতে পারি না; তোমার ছায়ায় আসিয়া আর ফিরিয়া যাইতে পারি না; তোমার পল্লীশোভা দেখিয়া মন স্থির রাখিতে পারি না; তোমার ধান-ভরা মাঠে গিয়া আর ফিরিতে পারি না; তোমার অমলা, অতুলা, সুজলা, সুফলা, সুস্মিতা, ভূষিতা মূর্ত্তি আমি আর ভুলিতে পারি না। তাই তুমি আজ জগৎপ্রাণদায়িনী, ধরণী ভরণী জননী! আমি হৃদয় খুলিয়া আজ এক কান্ত, অভিনব মূর্ত্তি দেখিতেছি;—যেন বিশ্বদেব তোমার প্রতি অণুতে মিশিয়া গিয়াছেন"—

"হে বিশ্বদেব! মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজি কি বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল,
বিমল আলোকে চির উজ্জ্বল,
নীরব আশীষ-সম হিমাচল
তব বরা-ভয় কর;—
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি তব করিছে হরণ;

জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ'পর!
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা,
মোর সনাতন স্বদেশে!"

হিন্দুসমিতি,
চুঁচড়া।

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

রামায়ণী সভ্যতা।

—ঃ•ঃ—

রামায়ণী যুগের ভাষা।

—০—

রামায়ণী যুগের পূর্ব্বে আর্য্যসমাজে দেবভাষা ও মনুষ্যভাষা প্রচলিত ছিল। বেদগুলি দুরূহ দেবভাষায় রচিত ছিল। এই দেবভাষাও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য দীর্ঘতমা ঋষির মন্ত্র * উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তৎকালে চারি প্রকারের ভাষা ব্যবহৃত হইত। ইহার তিন প্রকার ভাষা সাধারণের অবোধ্য দেব-ভাষা এবং চতুর্থ প্রচলিত মানুষ-ভাষা। সায়নের এই মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া যাজ্ঞিকেরা বলেন যে, ত্রিবিধ দুরূহ ভাষায় বেদ রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম মন্ত্রের ভাষা, দ্বিতীয় কল্পের ভাষা ও তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষা। চতুর্থ ভাষা প্রচলিত লৌকিক ভাষা। নৈরুক্তেরা বলেন, ঋক্ যজু ও সামের ভাষা পৃথক্ পৃথক্ তিন প্রকার, চতুর্থ ভাষা লৌকিক ভাষা। নৈরুক্তেরা যাজ্ঞিক-প্রদর্শিত কল্প ও ব্রাহ্মণকে বেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিচার করিয়াছেন।

---

* চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদু ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীণি নিহিতা নেংগয়ন্তি তুরিয়ং বাচঃ মনুষ্যা বদন্তি॥ ১। ১৬৪। ৪৫

নিরুক্ত-পরিশিষ্ট-ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে :—

ব্রাহ্মণা উভয়ীং বদন্তী যাচ দেবানাং যাচ মনুষ্যানাং। ১।৯

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা দেবভাষা ও মনুষ্যভাষা উভয় ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন।

এই উক্তি বেদের ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইবার সময়ে প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণ রামায়ণের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কেন না রামায়ণে ব্রাহ্মণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। †

রামায়ণের সময় দুরূহ দেবভাষার প্রচলন উঠিয়া গিয়া রামায়ণী বিশুদ্ধ ও সহজ সংস্কৃতের প্রচলন হয় এবং এই বিশুদ্ধ সরল ভাষায় রামায়ণের শ্লোকরচনা হয়। এই সময় ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও নাগরিক এবং স্ত্রীলোকেরা মিশ্রভাষায় কথোপকথন করিতেন। আমরা রামায়ণের আলোচনার দ্বারা এই বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

আরণ্যকাণ্ডের ১১শ সর্গে ইল্বল-বাতাপি উপাখ্যানে লিখিত হইয়াছে :—

ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ॥

ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক সংস্কৃতে কথা বলিয়া শ্রাদ্ধের ছলনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রিত করিত।

তখন অনার্য্যদিগের মধ্যে পৈশাচী ভাষা ব্যবহৃত হইত। এই পৈশাচী ভাষা অনার্য্যভাষা নামে অভিহিত হইত।* এই পৈশাচী বা অনার্য্যভাষার লক্ষণ

† ব্রাহ্মোহশ্বমেধ সত্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ।
চতুষ্টোম ম মহন্তস্য প্রথমং পরিকল্পিতম্॥ আদি। ১৪।৪০

* ডাক্তার মুইর তাঁহার Original Sanskrit Texts &c. নামক গ্রন্থে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কোন্ কোন্ স্থান পিশাচ-দেশ-অন্তর্গত ছিল তাহা অবগত হওয়া যায়। শ্লোকাংশ এইরূপঃ—

পাণ্ড-কেকয়-বাহ্লীক-সহ্য-নেপাল-কুন্তলা।
সুধেশ-ভোট-গান্ধার-হৈব-কনোজনা তথা॥
এতে পিশাচ দেশাঃ স্যুস্তদ্দেশ্য স্তদ্গুণো ভবেৎ॥ Vol. II. p. 48

Dr. W. W. Hunter বলেন "Paishachi loosely applied to out-lying Non-Aryan dialects from Nepal to Cape Comorin—(*Indian Empire*, P. 337)

যে সকল স্থানে অনার্য্যবসতি ছিল এই উভয় উক্তি সাধারণতঃ ঐ সকল স্থানকেই লক্ষ্য করিতেছে।

কি রামায়ণে তাহার আভাস পাওয়া যায় না। সে যাহাই হউক, অনার্য্যগণের এই পৈশাচী ভাষার ব্যবহার করিলে ইল্বল অনার্য্য প্রতিপন্ন হইবে এবং অনার্য্য ভাষানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না, ইহা চিন্তা করিয়াই সে ব্রাহ্মণ সাজিয়া সংস্কৃত কথা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মোহিত ও স্বকার্য্য সাধিত করিত।

অন্যত্র হনুমান্ অশোকবনে সীতাকে দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন "এখন কি ভাষায় সীতার সহিত আলাপ করিতে হইবে।" তাঁহার চিন্তা হইল :—

যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥ সুন্দরা। ৩০।১৮

যদি ব্রাহ্মণের ন্যায় সংস্কৃতে কথা বলি, তবে আমাকে নিশ্চয় মায়ারূপী রাবণ বলিয়া সীতা ভীতা হইবেন। সুতরাং অনেক চিন্তার পর হনুমান্ স্থির করিলেন :—

বাচঞ্চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাং॥ সুন্দরা। ৩০।১৭

মানুষী সংস্কৃতে সীতার সহিত কথোপকথন করিতে হইবে।

উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত নিরুক্ত-পরিশিষ্ট ভাষ্যের সমর্থন দ্বারা যে আমরা দেবভাষা ও মনুষ্য ভাষার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, তাহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। নিরুক্ত-পরিশিষ্ট ভাষ্যে যাহাকে দেবভাষা বলা হইয়াছে রামায়ণে তাহাকেই ব্রাহ্মণ কথিত সংস্কৃত ভাষা বলা হইয়াছে। নিরুক্তের মানুষভাষা রামায়ণেও মানুষভাষা নামেই পরিচিত রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।

এখন এই মানুষ ভাষা কি এবং তাহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক্।

যাঁহারা হনুমানকে লাঙ্গুলধারী মর্কট বলিয়া কল্পনা করেন তাঁহারা বলিবেন, সীতা বানরের কথা বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া হনুমান্ মানুষের ভাষায় কথা বলিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। এইরূপ কল্পনা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া আমরা প্রথমেই নিরুক্ত পরিশিষ্ট ভাষ্যের মত উদ্ধৃত করিয়া দেবভাষার ও মনুষ্যভাষার প্রচলন দেখাইয়া আসিয়াছি।

সাধারণের কথিত ভাষাই মানুষভাষা। এই মানুষভাষা ও প্রাকৃত ভাষা এক। অনেকে প্রাকৃত ভাষাকে বৌদ্ধ পালি ভাষার সহিত অভিন্ন মনে করেন।

কেহ বা মহারাষ্ট্রী, শূরসেনী প্রভৃতি ভাষাকেও প্রাকৃত বলেন। রামায়ণে মিশ্র-ভাষার উল্লেখ আছে। রামায়ণের টীকাকার রামানুজ সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত ভাষাকেই সেই মিশ্রভাষা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জর্ম্মণ পণ্ডিত বেবার প্রাকৃত ভাষাকে বৈদিক ভাষার সমসাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।*

মহারাষ্ট্রী ও পালী প্রভৃতি ভাষা যে প্রাকৃত ভাষারই রূপান্তর তাহা বলাই বাহুল্য।

রামের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গে লিখিত হইয়াছে:—

"শ্রৈষ্ঠং শাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তো ব্যামিশ্রকেষু চ।" ২৭

অর্থাৎ মিশ্রভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসমূহে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

মিশ্র-ভাষায় নাটক ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্র রচিত হইতে পারে না। কেন না, নাটকে যে প্রকৃতির লোক যে ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকে তাহাকে সেই ভাষাতেই কথা বলাইতে হইবে—"রাম প্রাকৃতাদি ভাষা সমন্বিত নাট্য শাস্ত্রাদিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন † আমাদের বিশ্বাস এই মিশ্র ভাষাই আর্য্য ভারতে সাধারণ কথিত ভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এই কথিত ভাষা-কেই হনুমান্ মানুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্যভাষা সম্বন্ধে রামায়ণে অন্য কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

বানর, নাগ, পক্ষী, রাক্ষস প্রভৃতি অনার্য্যজাতি পৈশাচীভাষা ব্যবহার করিত। রাম এই পৈশাচীভাষাও যে শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাও উপর্য্যুক্ত শ্লোক হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। নতুবা রামের পক্ষে বিরাধ ও শূর্পনখার সহিত কথোপকথন সম্ভবপর হইত না।

রাবণ উত্তম সংস্কৃত ভাষায় বাক্যালাপ করিতেন। সীতাহরণের পূর্ব্বভাগে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সীতার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। †

লঙ্কায় আর্য্য ভারতের মানুষী ভাষা অপ্রচলিত ছিল, তাই হনুমান্ সীতার সহিত মানুষী ভাষায় বাক্যালাপ করাই নিরাপদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

---

* 'উপাসক সম্প্রদায়,' দ্বিতীয় ভাগ পরিশিষ্ট।

† ব্যামিশ্রকেষু—প্রাকৃতাদি ভাষা মিশ্রিত নাটকাদীষু।—রামানুজ।

ব্যামিশ্রকেষু—অর্থে প্রাকৃতের সহিত ভারতবর্ষের সকল ভাষাই গননা করা যাইতে পারে।

† আরণ্য কাণ্ড ৪৬ সর্গ ১৪ শ্লোক।

নদীয়া জিলার সিদ্ধ যোগী।

—:*:—

(বলরামচন্দ্র।)

—:*:—

(২)

বর্ণজ্ঞানহীন, শিক্ষিত সমাজের সংস্পর্শবর্জ্জিত বলরামচন্দ্রের হৃদয় অতি উচ্চ ছিল। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবানদত্ত কোন বিশেষ শক্তির অধিকারী না হইলে কেহ একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় সংস্থাপিত করিতে পারে না। মানুষের আত্মাভিমান, অহঙ্কার, ও ভেদবুদ্ধি এত প্রবল যে, পাঁচজন লোককেও একমতাবলম্বী করা অতি কঠিন; অথচ বলরামের ন্যায় একজন সহায়সম্পদ-হীন নীচ জাতীয় অশিক্ষিত লোক সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে এক বিশ্বাস-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন,—সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সহস্র সহস্র ব্যক্তি লৌকিক মান সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া, জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়া, মতভেদ বিস্মৃত হইয়া এখনও বৎসরান্তে তাঁহার আখড়ায় সমাগত হয়, পরিত্রাতা বোধে তাঁহার অর্চ্চনা করে, নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত একত্র বসিয়া অন্নাহার করে। ইহা সমান্য শক্তি বা অল্প সাধনার ফল নহে।

মেহেরপুরের মালো পাড়ার নদীতীরবর্ত্তী নির্জ্জন ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া বলরাম-চন্দ্র যে সময় পরমার্থচিন্তায় রত ছিলেন, সেই সময় মেহেরপুরের কোন জমীদারের অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, সে সময় তাঁহার সদর দেউড়ীর সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া কোন ব্যক্তি অশ্বারোহণে বা পাল্কী চড়িয়া যাইতে সাহস করিত না। কথিত আছে, তিনি একে ব্রাহ্মণ তাহাতে জমীদার; সুতরাং কেহ তাঁহার সম্মুখে পড়িলে, সে অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইত না। তিনি প্রত্যহ প্রভাতে ও অপরাহ্নে তাঁহার অট্টালিকা-দেউড়ীর বাহিরে কাষ্ঠাসনে বসিয়া বায়ুসেবন করেতে করিতে পারিষদবর্গের সহিত নানাবিধ গল্প করিতেন। এক দিন প্রভাতে তিনি পারিষদবৃন্দে পরিবৃত হইয়া যথা-স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই সময় বলাই নামক বলরামের একজন শিষ্য আখড়া হইতে বাহির হইরা দেউড়ীর সম্মুখ দিয়া কার্য্যোপলক্ষে বাজারে যাইতে ছিল। বলাই জমীদার মহাশয়কে প্রণাম না করায় তাঁহার একজন পারিষদ তাঁহাকে বলিল

"হুজুর, বলাহাড়ীর চেলাদের আস্পর্দ্ধা বড় বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ দেখুন, তা'র একটা চেলা, আপনার সম্মুখ দিয়া গেল, অথচ আপনাকে দেখিয়া মাথাটা পর্য্যন্ত নোয়াইল না ; ঘোর কলি উপস্থিত!" জমীদার বাবুর আদেশে তাঁহার দুইজন বলবান পাইক বলাইকে ধরিল, এবং তাহার দুই কর্ণ ধরিয়া তাহাকে বাবুর নিকট উপস্থিত করিল। বলাই অত্যন্ত বলবান ছিল ; কিন্তু সে বিন্দুমাত্র বলপ্রয়োগ করিল না। সে পূর্ব্ববৎ উন্নত মস্তকে জমীদার বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সে কেন জমীদার বাবুকে প্রণাম করে নাই এই প্রশ্নের উত্তরে সে অত্যন্ত সংযত ভাবে বলিল "আপনি জমীদার, অন্যে আপনাকে প্রণাম করিতে পারে, কিন্তু আমি বলরামচন্দ্রের দাসানুদাস, তাঁহার পায়ে আমি মাথা রাখিয়াছি, তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি প্রণাম করি না, আর কাহারও চরণে এ মাথা নোয়াইব না।" বলরামের অনুচরের এই কথা শুনিয়া জমীদারবাবু ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইলেন, তাঁহার ইঙ্গিতে ভৃত্যগণ বলাইকে ধরাশায়ী করিয়া বংশদণ্ড দ্বারা তাহাকে এমন প্রহার করিল যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। তথাপি সে জমীদারবাবুকে প্রণাম করিল না। অনেক ক্ষণ পরে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলাই অতি কষ্টে বলরামের আখড়ায় ফিরিয়া গেল।

বলরামচন্দ্র তাঁহার প্রিয় শিষ্যের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ; ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলাই তোর কি হইয়াছে? সর্ব্বাঙ্গে ধুলা, শরীর ফুলিয়া উঠিয়াছে, তুই চলিতে পারিতেছিস না, এমন অবস্থা তোর কে করিল?"

বলাই বলরামের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল ; কাঁদিয়া সকল কথা বলিল। বলরামের বিস্ময় সমধিক বর্দ্ধিত হইল ; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি করিয়াছিস, যে তাহারা তোর প্রতি এমন অত্যাচার করিল?"

বলাই বলিল, "অন্যায় কিছু করি নাই, আমাকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া আমাকে প্রণাম করিতে বলিয়াছিল, আমি প্রণাম করি নাই। আমি ইচ্ছা করিলে তাহার মুণ্ড ছিঁড়িয়া আনিতে পারিতাম, কিন্তু আপনার আদেশ ভিন্ন আমি কিছুই করিতে পারি না। এখনও আপনার আদেশ পাইলে দলবল লইয়া তাহার বাড়ী লুট করিতে পারি। আপনার কি আদেশ বলুন ; আপনি প্রভু, আপনাকে ইহার বিচার করিতে হইবে।"

বলরামচন্দ্র বলাইকে শান্ত করিবার জন্য মধুর বাক্যে বলিলেন, "বলাই, তুমি আজ বড় যাতনা পাইয়াছ, তাই তোমার মনে কষ্ট হইয়াছে। জমীদার বড়ই

কুকর্ম্ম করিয়াছে। তুমি আমার কাছে এই অন্যায়ের বিচার প্রার্থনা করিতেছ; কিন্তু আমি কি বিচার করিব? মানুষ কি মানুষকে এমন করিয়া মারিতে পারে? এমন অত্যাচার কি মানুষের কায? আমি ত তোমাদের অনেকবার বলিয়াছি, মানুষ মানুষকে ভালবাসে, অন্যের দুঃখ কষ্ট দূর করে, সদ্ব্যবহারে অন্যের হৃদয় জয় করে। অন্যের দুঃখমোচন, অন্যের উপকারসাধন মানুষের ধর্ম্ম; মানুষের দেহ লইয়া যে সেই ধর্ম্ম পালন না করে, সে মানুষ নহে। তাহার বিচার কি করিব? আজ যদি তুমি কোন বনে গিয়া বাঘের হাতে পড়িতে, সেই বাঘ যদি তোমাকে কামড়াইয়া আঁচড়াইয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিত, তাহা হইলে কি তুমি, আমার কাছে সেই বাঘের নামে নালিশ করিতে আসিতে? তুমিও মনে কর, তোমাকে বাঘে ধরিয়াছিল। তুমিও সকল ক্ষোভ ত্যাগ কর, কখনও তাহার কোন ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিও না। অন্যের ক্ষতি করা মানুষের ধর্ম্ম নহে। আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম, তুমিও তাহাকে ক্ষমা কর।"

বলরামচন্দ্র সস্নেহে বলাইকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিলেন; বলাই মনঃক্ষোভ ত্যাগ করিল।

এই একটিমাত্র ঘটনায় বলরামচন্দ্রের হৃদয়ের মহত্ত্ব উপলব্ধ হয়; দুর্ব্বলের ক্ষমাশীলতার কোন মূল্য নাই, এ কথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সহস্র সহস্র শিষ্যের মুক্তিদাতা বলরামচন্দ্র দুর্ব্বল ছিলেন না, তাঁহার মালো, চাঁড়াল, হাড়ী, বাগ্‌দী প্রভৃতি শিষ্যেরা তাঁহার উপদেশে ও চরিত্রগুণে মেষবৎ শান্তভাবে কালযাপন করিলেও বলরামচন্দ্র যদি তাহাদিগকে একটু ইঙ্গিত করিতেন, তাহা হইলে তাহারা জমীদারবাবুকে বিপন্ন করিতে পারিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বলরামচন্দ্রের হৃদয় এই প্রকার বিনয়ে ও ক্ষমাশীলতায় পূর্ণ হইলেও তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় ও তেজস্বিতার পরিচয় পাইলে বিস্মিত হইতে হয়। মেহেরপুরের মালোপাড়ায় বলরাম আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে আরম্ভ করিলে, মেহেরপুর মিউনিসিপালিটির ক্ষুধাতুর দৃষ্টি তাঁহার আশ্রয়ের উপর নিপতিত হইয়াছিল। মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ট্যাক্স দিতে হইবে। বলরাম বলেন, তাঁহার আখড়া দেবতার স্থান, তিনি ট্যাক্স দিবেন না।—অনেকে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল, মিউনিসিপালিটির আইন বড় কড়া; ট্যাক্স না দিলে, মিউনিসিপালিটির পেয়াদা তাঁহার ঘটী, বাটী, লেপ, কাঁথা কাড়িয়া লইয়া যাইবে, তাহা বিক্রয় করিয়া ট্যাক্স আদায় করিবে। বলরামচন্দ্র বলিলেন, "তাহারা যাহা করিতে পারে করুক।"

যথাসময়ে কর অনাদায় হেতু মিউনিসিপালিটি বলরামের আখড়ায় জিনিস পত্র—ঘটী, বাটী প্রভৃতি তৈজসপত্র এমন কি বলরামের খাটখানি পর্য্যন্ত ক্রোক করিয়া লইয়া গেল কিন্তু বলরামের একজন ধনাঢ্য শিষ্য তাহা নীলামে ক্রয় করিয়া পুনর্ব্বার আখড়ায় পাঠাইয়া দিলেন। এইপ্রকার ঘটনা দুই তিনবার ঘটে। অবশেষে মিঃ উইলিয়মস্ নামক মেহেরপুরের একজন সিবিলিয়ান অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিউনিপালিটির চেয়ারম্যান হয়েন, তিনি আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা শুনিয়া বলরামের আখড়াটিকে করের দায় হইতে মুক্তিদান করেন। মিঃ উইলিয়মস্ একাধিকবার বলরামের আখড়ায় পদার্পণ করিয়াছিলেন; তিনি বলরামকে অসাধারণ মনুষ্য বলিয়াই মনে করিতেন।

মেহেরপুর অঞ্চলে বলরাম সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়; সেই সকল কথা সত্য কি না তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বর্ত্তমান নাই।

বাঙ্গলা ১২৫৭ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ বলরামচন্দ্র বহুসংখ্যক শিষ্যসেবক রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। বলরামের শিষ্যেরা তাঁহার মৃতদেহের সৎকার না করিয়া আখ্ড়ার প্রায় এক মাইল দক্ষিণে ভৈরব নদীর তীরে বংশ-মঞ্চের উপর শয্যা-রচনা করিয়া সেই শয্যায় রাখিয়া আইসে। কথিত আছে, তাঁহার মৃত দেহ তিন দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় ছিল, তাহার পর তাঁহার শব কেহ দেখিতে পায় নাই। বলরামের মৃত্যুকালে তাঁহার ক্ষুদ্র আশ্রমটি নানা জাতীয় বৃক্ষপরিবেষ্টিত কয়েকখানি পর্ণ কুটীরের সমষ্টিমাত্র ছিল, অল্পদিন পূর্ব্বে বলরামের শিষ্যমণ্ডলী সেই স্থানে একটি অট্টালিকা ও একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছে; এই অট্টালিকায় এখনও বলরামের শয্যা, কাষ্ঠ পাদুকা ও সুবৃহৎ বংশদণ্ড সংরক্ষিত আছে; কিন্তু খট্টাঙ্গ-সংস্থাপিত সুচিক্কণ শুভ্র মশারিবেষ্টিত দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যাটি দেখিলে তাহা সন্ন্যাসীর শয্যা বলিয়া কখনই মনে হয় না। বলরামের ভক্তবৃন্দ দেশ বিদেশ হইতে এই আখড়ায় সমাগত হইয়া সেই অট্টালিকার দ্বারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, ও বলরামের উদ্দেশে ভোগ প্রদান করিয়া থাকে। বঙ্গের অনেক জিলায় বলরামের নানা জাতীয় শিষ্য আছে; তাহারা স্ব স্ব সমাজভুক্ত থাকিলেও উৎসব উপলক্ষে বলরামের আশ্রমে আসিয়া স্থান-মাহাত্ম্যে জাতিভেদ ভুলিয়া যায়; এবং শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আব্রাহ্মণচণ্ডাল আহারাদি সম্বন্ধে যেরূপ আচরণ করে, তাহারাও সেইরূপ করিয়া থাকে। বৎসরান্তে বারুণীর যোগের সময় বলরামের আখড়ায় যে মহোৎসব হয়, সেই

মহোৎসব উপলক্ষে ভক্তবৃন্দ কয়েকদিন ধরিয়া মৃদঙ্গাদিযন্ত্রসহযোগে মহোৎসাহে বলরামের নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে আখড়ায় তিনদিন "মচ্ছব" হইয়া থকে, প্রথম দিন অন্ন মচ্ছব, দ্বিতীয়দিন চিড়ে মচ্ছব, শেষদিন লুছি মচ্ছবে মধুরেন সমাপয়েৎ হয়। এই আখড়ায় বহুকালের পুরাতন আমানি সঞ্চিত আছে, এই আমানি বলরামের প্রসাদ বলিয়া খ্যাত; নিম্ন শ্রেণীর অনেক লোক, দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া এই আমানি পানে নিরাময় হইয়াছে, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা ভাষায় প্রবচন আছে, "গেঁয়ে জুগী ভিক্ পায় না।"—স্থানীয় ভদ্রলোকের মধ্যে বলরামের প্রতিপত্তি নাই; তথাপি ভদ্রমহিলাসমাজ বলরামচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন; মৃতবৎসা প্রসূতিগণ বলরামের "মানত" করিয়া থাকেন। অনেকেই বলরামের নামানুসারে স্ব স্ব পুত্রের নামকরণ করিয়া থাকেন। বলরামের মানত করিয়া যাঁহারা সন্তান লাভ করেন, সন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাঁহারা পাচ সিকা বলরামের ভোগের জন্য আখড়ায় পাঠাইয়া দেন, অন্নপ্রাশনের সময় আখড়ার মৃত্তিকা শিশুর মুখে দেওয়া হয়।

বলরামের শিষ্যগণ দরবেশ নামে খ্যাত, এই সকল শিষ্যের মধ্যে উদাসীন ও গৃহী এই উভয় শ্রেণীর লোকই বর্ত্তমান, আশ্রমে হীন জাতীয়া অনেক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকও দেখা যায়; ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা, এই সম্প্রদায়ে পরিচ্ছদগত কোন বিশেষত্ব নাই, তবে বলরামি দরবেশগণ মস্তকে দীর্ঘকেশ ও দাড়ী গোঁপ রাখে, ভিক্ষা করে; এবং গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইয়া "জয় বলরামচন্দ্র" বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া থাকে।

বলরাম চিরকুমার ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটি সেবাদাসী ছিল। এই সেবাদাসীর নাম ব্রহ্ম মালোনী। বলরামের মৃত্যুর পর সে আশ্রমের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিল। নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক হইলেও, তাহার মুখে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিতে পাওয়া যাইত; বোধ হয়, দীর্ঘকাল বলরামের সহবাসে তাহার প্রজ্ঞানেত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। অনেকদিন পূর্ব্বে ব্রহ্ম মালোনীর মৃত্যু হইয়াছে; এখন জীবন দরবেশ নামক এক ব্যক্তি বলরামের আশ্রমের পরিচালক। কিন্তু এখন এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত পরিচালক কেহ আছে বলিয়া বোধ হয় না বলরামি সম্প্রদায়ের মধ্যেও মতভেদ প্রবেশ করিয়াছে; কতকগুলি ভক্ত আখড়ার সংস্রব ত্যাগ করিয়া আখড়ায় প্রায় এক মাইল দক্ষিণে নদীর পশ্চিম পারে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। এই নূতন আশ্রমটি বলরামের সমাধি-

ক্ষেত্রের অদূরে সংস্থাপিত। তাহাদের মতভেদের কারণ তেমন গুরুতর নহে, বলরামের কুটীর ভাঙ্গিয়া তথায় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাই তাহাদের মতভেদের প্রধান কারণ। যে কুটীরে বলরাম শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা ভগ্ন করা তাহাদের মতে গুরুতর অপরাধ।

বলরামি সম্প্রদায়ের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নাই বটে, কিন্তু তাহাদের অনেক সঙ্গীত আছে, এই সকল সঙ্গীত প্রধানতঃ বলরামচন্দ্রের মহিমা বিষয়ক, অবশিষ্টগুলি দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। আমরা এই স্থানে এই সম্প্রদায়ের একটি মাত্র সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম,—

"যেয়েও আছে, থেকেও নাই,
তেমনি তুমি আর আমি রে ভাই!
আমরা মরে বাঁচি, বেঁচে মরি,
বলাইয়ের একি বিষম চাতুরী!
এমন চাতুরীকে বলিহারি।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

——:০:——

নিরবচ্ছিন্নতা।

কর্ম্মহীন দিবানিশি করিলে যাপন,
অবসাদে সব অঙ্গ পড়ে আলসিয়া।
রাত্রি দিন জ্বলে যদি আকাশে তপন
আলোকে নয়নযুগ যায় ঝলসিয়া।
মধুপান করি শুধু, মধু-সরোবরে,
সন্তরণ নিরন্তর সে বড় যাতনা।
অবিমিশ্র-ভোগ-সুখ-প্রবাহ-প্রহারে
ক্লান্তিতে ইন্দ্রিয়কুল হারায় চেতনা।

শ্রীকালিদাস রায়।

পাষাণের কথা।

(৪)

উৎসবের পূর্ব্বদিন হইতে নবনির্ম্মিত স্তূপ পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইতে লাগিল। তোরণ, স্তম্ভ, আলম্বন হরিদ্বর্ণ পত্রে ও নানা বর্ণের পুষ্পে মণ্ডিত হইয়া গেল। তৎপূর্ব্বে সে ভাবে আমাদিগকে কেহ সজ্জিত করে নাই। পরে সদ্ধর্ম্মের প্রভাববৃদ্ধি হইয়া যখন স্তূপের যশ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল তখনও এবম্বিধ উৎসব আমি কখনও দেখি নাই; সদ্ধর্ম্মানুরাগী শক রাজগণের আগমনে হেমরজতখচিত আবরণে স্তূপের চতুষ্পার্শ্বস্থ বিশাল প্রান্তর পর্য্যন্ত আবৃত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু শ্যামল পল্লব ও শ্বেতপুষ্পমণ্ডিত হইয়া স্তূপের যে শোভা হইয়াছিল তাহা আর কখনই দেখি নাই। স্তূপের পূর্ব্ব তোরণ নগরাভিমুখে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার আবরণে চারিটি স্তম্ভ ছিল, প্রথম স্তম্ভে তিনটি দেব-মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছিল। প্রথম স্তম্ভের উত্তরদিকে নাগরাজ চক্রবাকের মূর্ত্তি। নাগরাজ পর্ব্বতশিখরে দণ্ডায়মান, তাঁহার পদতলে কন্দরে কন্দরে সিংহ, বৃক প্রভৃতি শ্বাপদগণ লক্ষিত হইতেছে। নাগরাজের মস্তকে পঞ্চশীর্ষ সর্প তাঁহার নাগত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। কেয়ুর, বলয়, হার প্রভৃতি রত্নালঙ্কারে শোভিত হইয়া নাগরাজ পূর্ব্বদ্বার রক্ষা করিতেছেন। নাগরাজের উপরে এবং স্তম্ভের শীর্ষদেশে যে অর্দ্ধবৃত্তের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা নানাবিধ পত্রের চিত্রে পূর্ণ ছিল। ধর্ম্মরক্ষিত নামক জনৈক প্রকৃত বিশ্বাসী এই স্তম্ভের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। প্রথম স্তম্ভের অপর দুই পার্শ্বে গঙ্গিত ও হয়গ্রীব নামক যক্ষ-দ্বয়ের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, কেবল চতুর্থ পার্শ্বে সূচীত্রয়ের ভেদের জন্য কোন চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। গঙ্গিত করিপৃষ্ঠে ও অজকালক শিলাসঞ্চয়ের উপরে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। গঙ্গিতের মস্তকের উপরে অর্দ্ধবৃত্তে পতাকাশোভিত একটি স্তূপ ও অজকালকের মস্তকের উপরে অর্দ্ধবৃত্তে পত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। উৎসবের পূর্ব্বে সজ্জার দিন আলম্বন হইতে যক্ষত্রয়ের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত শ্বেত পুষ্প-মালায় জড়িত হইয়াছিল, কেবল অর্দ্ধবৃত্তগুলি দৃশ্যমান ছিল। প্রত্যেক যক্ষের মস্তক ও বক্ষ বিবিধবর্ণের পুষ্পমালায় সজ্জিত হইয়াছিল, নবজাত পল্লবে মূর্ত্তি-ত্রয়ের বাহুমূল হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হইয়াছিল। এইরূপে আবরণ ও বেষ্টনের প্রত্যেক স্তম্ভ অঙ্কিত স্থান ব্যতীত পত্রপুষ্পে মণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল,

আলম্বনের শীর্ষদেশ আম্রপল্লবে ও পার্শ্বদেশ রক্তবর্ণ পুষ্পে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। আলম্বন হইতে প্রথম সূচী পর্য্যন্ত ফলের স্তবক লম্বিত হইয়াছিল। তোরণস্তম্ভদ্বয়ের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, পাদদেশ হইতে প্রথম তোরণ পর্য্যন্ত স্তম্ভদ্বয় শ্বেত, রক্ত, নীল ও হরিদ্রাভ পুষ্পের মালায় জড়িত হইয়া গোলাকার ধারণ করিয়াছিল। স্তম্ভশীর্ষের শীর্ষচতুষ্টয় নাগকেশর পুষ্পে ও তোরণত্রয় নানাবিধ চম্পকমাল্যে ভূষিত হইয়াছিল। সর্ব্ব নিম্নের তোরণ হইতে বহু আয়াসলব্ধ সহস্রদল শ্বেত পদ্মশ্রেণী লম্বিত হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি ছত্রবাহী অশ্বদ্বয় ও ধর্ম্মচক্র ত্রিরত্নের মর্য্যাদা জ্ঞাপনার্থ তিনবর্ণের পুষ্পে মণ্ডিত হইয়াছিল।

তোমরা স্তম্ভগাত্রে যেরূপ স্তূপের চিত্র দেখিয়া থাক, নবনির্ম্মিত স্তূপও আকারে তদনুরূপ ছিল। অর্দ্ধগোলকাকার স্তূপশীর্ষে একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ স্থাপিত ছিল। স্তম্ভের উপরিভাগে মধ্যদেশে মাল্যশোভিত ছত্র ও চারিকোণে পতাকাবাহী দণ্ডচতুষ্টয় স্থাপিত হইয়াছিল। উৎসবসজ্জার দিনে পতাকার দণ্ড হইতে তোরণশীর্ষ পর্য্যন্ত ও চতুষ্কোণ স্তম্ভ হইতে বৃত্তাকার আলম্বনশ্রেণী পর্য্যন্ত সুবৃহৎ মাল্য লম্বিত হইয়াছিল। স্তূপের ঊর্দ্ধদেশ মাল্যে আবৃত হওয়ায় বোধ হইতেছিল যেন, শ্বেতচন্দ্রাতপের পরিবর্ত্তে শ্বেতবর্ণ পুষ্পের আতপত্র আনিয়া স্তূপশীর্ষে স্থাপন করা হইয়াছে। পত্রপুষ্পগুলের উপরে উপাসক উপাসিকা ও দর্শকগণ আসিয়া যাহা দেখিল তাহা বলিতেছি। কোন স্থানে পুষ্পমালার মধ্য হইতে বৃত্তমধ্যে অঙ্কিত চিত্র যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃত্তের মধ্যভাগে উচ্চ আসনের উপরে সপুষ্প পাটলী বৃক্ষ, শাখায় ও কাণ্ডে স্তবকে স্তবকে পাটলীপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। চারিপার্শ্বে নতজানু হইয়া বা দণ্ডায়মান থাকিয়া উপাসক ও উপসিকাগণ পুষ্প ও মাল্যদ্বারা বৃক্ষের অর্চ্চনা করিতেছে, কারণ ইহা বুদ্ধ ও বিপশ্বীর বোধিদ্রুম। অন্য স্থানে স্রজশোভিত চতুষ্কোণ উচ্চাসনের উপরে দীর্ঘাকার শালবৃক্ষ, পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ অর্চ্চনায় ব্যাপৃত, কারণ ইহা বুদ্ধ বিশ্বভূর বোধিদ্রুম। অপর স্থানে স্তম্ভ চতুষ্টয়ের উপরে স্থাপিত চতুষ্কোণ আসনে সফল উডুম্বর বৃক্ষ, ইহার শাখাসমূহ হইতে মাল্যসমূহ লম্ববান; উভয় পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ, কারণ ইহা বুদ্ধ কনকমুনির বোধিদ্রুম। তোমরা যে স্তম্ভটিকে অসম্পূর্ণ বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছ, তাহার মধ্যভাগে বৃত্তের মধ্যে গোলাকার আসনে স্থাপিত শিরীষবৃক্ষ আছে, উৎসবের দিন উহা অপরাজিতার মালায় বেষ্টিত ছিল। ইহার উভয় পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ বিদ্যমান, কারণ ইহা বুদ্ধ ক্রকুচ্ছন্দের বোধিদ্রুম। অপর স্থানে দ্বাদশ স্তম্ভের উপর স্থাপিত

চতুকোণ আসনে অশ্বত্থবৃক্ষ; ইহার চতুষ্পার্শ্বে স্তম্ভশ্রেণী বিন্যস্ত। বৃক্ষকাণ্ডের উত্তর পার্শ্বে স্তম্ভশীর্ষে ধর্ম্মচক্র ও তদুপরি ত্রিরত্ন। বৃক্ষের শাখায় শাখায় অসংখ্য মাল্য লম্বিত। আকাশে গন্ধর্ব্বগণ বংশীনিনাদ করিতেছে ও সুপর্ণাগণ ইতস্ততঃ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। বৃক্ষকাণ্ডের চারিপার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ ও সঙ্ঘারামের গবাক্ষে অসংখ্য দর্শক চিত্রিত রহিয়াছে। স্তম্ভ-বেষ্টনের বহির্দ্দেশে একটি বৃহদাকার স্তম্ভ ও তচ্ছীর্ষে শুণ্ডে মাল্য লইয়া দণ্ডায়মান একটি হস্তীর মূর্ত্তি। ইহাই ভগবান শাক্য-মুনির বোধিদ্রুম। স্তম্ভ-বেষ্টন ও বহির্দ্দেশস্থ স্তম্ভ মহারাজ ধর্ম্মাশোক-বিনির্ম্মিত। অপর স্থানে স্তম্ভশ্রেণীর উপর বিন্যস্ত দ্বিতলগৃহ। স্তম্ভশ্রেণী-বিভাগের মধ্যে বেদী, উহার উপরিভাগে পুষ্পাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ও একপার্শ্বে ষোড়শটি মানবহস্তাঙ্ক। মহাবোধি ক্রমের পার্শ্বে ভগবান শাক্যমুনি সম্বোধিলাভের পর যে স্থানে সপ্তদিবসকাল মনুষ্যের হিতচিন্তায় মগ্ন হইয়া পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, পরে ধর্ম্মাশোক সেই স্থানে এই বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহাই ভগবানের সংক্রমণের স্থান। একটি সূচীগাত্রে এই চিত্রটি অঙ্কিত আছে। অপরস্থানে চারিটি স্তম্ভশীর্ষে সংন্যস্ত বিহারের মধ্যে, রত্নখচিত আসনে ভগবানের ধর্ম্মচক্র, চক্রের উপরে ছত্র ও মাল্য, পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাগণ। বিহারের দক্ষিণ পার্শ্বে বিশাল তোরণদ্বার, ইহা এত উচ্চ যে হস্তিপক আরোহী লইয়া ইহার অভ্যন্তরে আরোহীকে প্রবেশ করাইতেছে। তোরণের পশ্চাতে দ্বিতীয় হস্তিপক হস্তীর আহারের জন্য একটি বৃক্ষকে পল্লবশূন্য করিতেছে; বামপার্শ্বে অশ্বচতুষ্টয়-বাহিত রথ দুইটি আরোহী লইয়া দ্রুতবেগে বিহারাভিমুখে আগমন করিতেছে, ইহার পশ্চাতে একটি বৃক্ষে একটি ছত্র রহিয়াছে,—কোন দরিদ্র উপাসক স্থানাভাবে চক্ররাজের উদ্দিষ্টছত্র বৃক্ষে নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছে। অপর স্তম্ভে বৃত্তমধ্যে মায়াদেবীর গর্ভধারণের চিত্র। খট্টায় মায়াদেবী সুষুপ্তা, খট্টানিম্নে ভৃঙ্গার ও পাদদেশে প্রদীপ, নিম্নে আসনদ্বয়ে উপবিষ্ট পরিচারিকাদ্বয় ব্যজনে ও সেবায় নিযুক্তা, একজন সখী করযোড়ে মায়াদেবীর মস্তকের নিকটে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঊর্দ্ধে শ্বেতহস্তী। ভগবান শ্বেত হস্তীর আকার ধারণ করিয়া মায়াদেবীর গর্ভে আশ্রয় লইতেছেন। অপর স্তম্ভে বৃত্তমধ্যে পর্ব্বতশ্রেণী অঙ্কিত রহিয়াছে, পর্ব্বতের মধ্যদেশে বিশাল গুহা ও তন্মধ্যে রত্নখচিত আসন। আসনের ঊর্দ্ধে ছত্র। চতুষ্পার্শ্বে উপাসকগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। গুহার বহির্দ্দেশে সিংহ, শৃগাল, ময়ূর, বানর প্রভৃতি নানা জীব অঙ্কিত রহিয়াছে। গুহাদ্বারের সান্নিধ্যে সপ্ততন্ত্রী বীণা হস্তে লইয়া গন্ধর্ব্ব পঞ্চশিখ দণ্ডায়মান। ইহা ইন্দ্রশিলাগুহা। একদা

বর্ষাকালে ভগবান শাক্যমুনি যখন রাজগৃহ শৈলমালার সঙ্গিহীন শৈলশিখরে পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেছিলেন তখন বাসব জ্ঞানলিপ্সা-প্রণোদিত হইয়া গুহা-দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন ও বুদ্ধদেবকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভূমিতে অক্ষরপাত করিয়া বুদ্ধদেব দেবরাজের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। প্রকৃত বিশ্বাসীরা কহিয়া থাকেন যে, অশ্মখণ্ডের উপরে ভগবানের অঙ্গুলী-চালনের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, বৌদ্ধ জগতে ইহারই নাম ইন্দ্রশিলাগুহা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবান প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছিলেন ততক্ষণ পঞ্চশিখ বীণাসংযোগে সঙ্গীত-ধ্বনি করিতেছিলেন। অপর স্তম্ভে মৃগজাতকীয় চিত্র। বৃত্তমধ্যে তিনটি বৃক্ষ; দক্ষিণপার্শ্বে পলায়নপর মৃগযূথ, মধ্যদেশে গর্ত্তমধ্যে পতিত একটি বৃহৎ মৃগ ও গর্ত্তের পার্শ্বে স্তুতিশীল মনুষ্যত্রয়, বামপার্শ্বে জনৈক মনুষ্য মৃগযূথের প্রতি শরত্যাগ করিতেছে। কথিত আছে, কোন এক পূর্ব্বজন্মে ভগবান শাক্যমুনি মৃগযূথপতি ছিলেন। একদা জনৈক ব্যাধ মৃগকুলতাড়না করিলে একটি গর্ভবতী মৃগী পলা-য়নে অক্ষম হইয়া যূথপতিকে সম্বোধন করিয়া কহে' "আমি পলায়নে অক্ষম ও আমি নিহত হইলে, আমার গর্ভস্থ ভ্রূণ পর্য্যন্ত নিহত হইবে।" ইতিমধ্যে ধাবমান যূথের সম্মুখে একটি গর্ত্ত দেখিয়া হরিণী পলায়নে বিরত হইল। যূথপতি গর্ত্তের মধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া হরিণীকে কহিলেন "তুমি আমার পৃষ্ঠে পাদনিবেশ করিয়া গর্ত্ত পার হইয়া যাও।" তখন অপর সকলে লম্ফ প্রদানে গর্ত্ত পার হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই ব্যাধ-নিক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়া যূথপতি প্রাণত্যাগ করিলেন।

অপর স্তম্ভে নাগজাতক, একটি সরোবরতীরে তিনটি হস্তী দণ্ডায়মান। তন্মধ্যে একটি কুলীরক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। কথিত আছে, বনমধ্যে এক বিশাল সরোবরে একটি অতি বৃহৎ কুলীরক বাস করিত। হস্তিগণ জলপানের জন্য সরোবরে আসিলে দশরথরাজ কোন একটির পদ দৃঢ় রূপে আমরণকাল পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া থাকিতেন। হস্তীর মৃত্যু হইলে কিয়ৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি আহার পাইতেন। পরে বোধিসত্ত্ব হস্তিনীগর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়া কুলীরকের ব্যবহার শুনিলেন। একদা তিনি পিতার অনুমতি লইয়া সরোবরে গমন করিলেন। কুলীরক তাঁহাকে আক্রমণ করিল ও পরে তাঁহার পত্নীর অনুরোধে দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র তাঁহার পাদপেষণে কুলীরক বিনষ্ট হইল। অপর স্থানে ছদন্তজাতক অঙ্কিত আছে। কথিত আছে, হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী ছদন্তহ্রদের সান্নিধ্যে অষ্ট সহস্র ষড়দন্ত হস্তী বাস করিত। বোধিসত্ত্ব এক

সময়ে এই হস্তিযূথের অধিপতি ছিলেন ও তাঁহার মহাসুভদ্রা ও চুল্লসুভদ্রা নাম্নী দুইটি পত্নী ছিল। একদা যূথপতি একটি বৃক্ষ উৎপাটন করায় মহাসুভদ্রার নিকটে পত্রপুষ্প ও চুল্লসুভদ্রার নিকটে শুষ্ক পত্র ও শাখামাত্র পতিত হইল। এই সময় হইতে চুল্লসুভদ্রা যূথপতির প্রতি বিরক্ত হইল ও বিগত পঞ্চশত বুদ্ধদিগের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, সে যেন পরজন্মে রাজকন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ও ব্যাধ প্রেরণ করিয়া যূথপতিকে বিনষ্ট করিতে পারে। বুদ্ধগণ তাহার আশা সফল করিলেন। চুল্লসুভদ্রা অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিতা হইল ও কোন এক রাজার কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কাশীরাজের সহিত বিবাহিতা হইল। সে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া পূর্ব্বস্বামীর নিধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। তৎপ্রেরিত ব্যাধ তাহার নির্দ্দেশানুসারে ছদন্তহ্রদতীরে আসিয়া হস্তিযূথের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। ব্যাধ দেখিল, হস্তিযূথপতি হ্রদের একই স্থানে প্রতিদিন স্নান করিয়া থাকেন। সে সেই স্থানে একটি গর্ত্ত খনন করিয়া উপরে শরনিক্ষেপের স্থান মাত্র রাখিয়া কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার দ্বারা উপরিভাগ আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ং গর্ত্তমধ্যে লুকায়িত রহিল। পরদিবস যূথপতি স্নানার্থ আসিয়া শরাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদে অপর হস্তিগণ আসিয়া ব্যাধের অনুসন্ধান করিতে করিতে ভূগর্ভে কাষায় পরিহিত ব্যাধকে দেখিতে পাইল। ব্যাধের মুখে সকল কথা অবগত হইয়া যূথপতি তাহাকে হত্যা করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন "চুল্লসুভদ্রা সামান্য কারণে আমার প্রাণহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমার দন্তগুলির জন্য তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু আমার দন্ত লইয়া তাহার কোন উপকার হইবে না। তবে তুমি স্বচ্ছন্দে আমার দন্ত কর্ত্তন করিতে পার।" ব্যাধ দন্তগুলি স্পর্শ করিতে অক্ষম হওয়ায় যূথপতি তাহাকে শুণ্ডে উত্তোলন করিয়া ধারণ করিলে সে দন্ত ছেদন করিল; ইহার পর যূথপতির মৃত্যু হইল। চিত্রে বৃত্ত মধ্যে বৃক্ষতলে চারিটি হস্তী দণ্ডায়মান। ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দন্ত কর্ত্তন করিতেছে। কোন স্থানে স্তম্ভের মধ্যভাগে চতুষ্কোণ বেষ্টনের মধ্যে স্বর্গের বৈজয়ন্তপ্রাসাদ অঙ্কিত আছে। প্রাসাদ ত্রিতল, দ্বিতলে ও ত্রিতলে বাতায়নপথে অঙ্গনাগণের মুখ লক্ষিত হইতেছে, নিম্নতলে একটি গৃহে কতকগুলি দেব দেবী রহিয়াছেন। পার্শ্বে বিহারমধ্যে ভগবান শাক্যমুনির উষ্ণীষ রক্ষিত। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একজন পুরুষ চামর-ব্যজন করিতেছে ও বামপার্শ্বে একজন উপাসক করযোড়ে

দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিহার ও প্রাসাদের সম্মুখে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে ও ভূমিতে উপবিষ্ট পুরুষগণ বীণা প্রভৃতি যন্ত্র বাদন করিতেছে। শাক্যমুনির মহাপরিনির্ব্বাণের পর দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার উষ্ণীষ লইয়া স্বর্গে গমন করেন ও তথায় সদাসর্ব্বদা দেবগণ তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন, অপ্সরোগণ নৃত্যগীত করিয়া থাকে। ভিক্ষু ঋষিপালিত এই স্তূপনির্ম্মাণকালে এই স্তম্ভটি দান করিয়াছিলেন। ইহার দুই পার্শ্বে চতুষ্কোণ বেষ্টনীর মধ্যে ছয়টি চিত্র আছে ও ইহাতে বৃত্ত বা অর্দ্ধবৃত্ত নাই। অপর পার্শ্বদ্বয়ে সূচী স্থাপনের জন্য ছয়টি ছিদ্র আছে। ইহার একপার্শ্বে উপরিভাগে বৈজয়ন্ত প্রসাদ ও উষ্ণীষ-বিহারের চিত্র অঙ্কিত আছে। এই পার্শ্বে সর্ব্বনিম্নের চিত্রে মগধরাজ অজাতশত্রুর বুদ্ধ-বন্দনার চিত্র অঙ্কিত আছে। চিত্রটি দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। নিম্নে চারিটি হস্তী ও তৎপৃষ্ঠে দুইটি পুরুষ ও তিনটি স্ত্রীলোক। ইহার পরে বৃক্ষদ্বয়ব্যবধানে একটি চতুষ্কোণ বেদী ও তাহার সম্মুখে করযোড়ে নতজানু জনৈক পুরুষ। পশ্চাতে একজন পুরুষ ও চারিজন স্ত্রীলোক। কথিত আছে, রাজা অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিয়া বহুকাল যাবত অনায়াসে নিদ্রালাভ করিতে পারেন নাই। শেষে তিনি তাঁহার ভ্রাতা ও চিকিৎসক জীবকের উপদেশানুসারে বুদ্ধদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। রাজা পঞ্চশত স্ত্রী সমভিব্যাহারে হস্তিপৃষ্ঠে রাজগৃহনগরদ্বার হইতে নির্গত হইতেছেন। চিত্রের নিম্নদেশে হস্তিপৃষ্ঠে পুরুষদ্বয়ের মধ্যে একজন রাজা অজাতশত্রু ও অপরজন হস্তিপক। চিত্রের ঊর্দ্ধদেশে নতজানু পুরুষ রাজা অজাতশত্রু। অপরস্থানে বৃত্তের মধ্যে অনাথপিণ্ডদের জেতবনদানের চিত্র। বৃত্তের মধ্যে বামপার্শ্বে তিনটি বৃক্ষ, তিনটি মনুষ্য ভূমিতে চতুষ্কোণ সুবর্ণমুদ্রা বিস্তৃত করিতেছে, চতুর্থ ব্যক্তি শকট হইতে সুবর্ণমুদ্রা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। একব্যক্তি একটি বৃক্ষের পার্শ্বে শকটের সম্মুখে দণ্ডায়মান। বৃত্তের দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি স্বতন্ত্র গৃহ আছে। তাহাদিগের ব্যবধানে পূর্ণভৃঙ্গার হস্তে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন, ইনি শ্রাবস্তীনগরের প্রধান শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ। অনাথপিণ্ডদের সম্মুখে কতকগুলি পুরুষ দণ্ডায়মান। কথিত আছে, ভগবান শাক্যমুনির জীবনকালে শ্রেষ্ঠী অনাদপিণ্ডদ বুদ্ধদেবের জন্য একটি বিহার নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্রাবস্তীনগরোপকণ্ঠে উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করিতেছিলেন। নগরোপকণ্ঠে কুমারপাদ জেতের উদ্যানবাটীকা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি জেতের নিকট উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করেন। জেত বলিয়াছিলেন যে, সুবর্ণমুদ্রা কর্ত্তৃক ভূখণ্ড আচ্ছাদন করিয়া দিলে তিনি উদ্যান বিক্রয়ে প্রস্তুত আছেন।

তদনুসারে অনাথপিণ্ডদ কোটী সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া অধিকাংশ ভূমি আচ্ছাদন করিলে জেত অবশিষ্ট ভূমি বিনামূল্যে প্রদান করেন। অনাথপিণ্ডদ জলধারা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া উদ্যান বৌদ্ধ সঙ্ঘের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। চিত্রে যে দুইটি গৃহ আছে তাহা গন্ধকুটি ও কোশম্বকুটি নামে আখ্যাত। যতদিন সদ্ধর্ম্মের মহিমা অম্লান থাকিবে ততদিন জেতবানের নাম, অনাথপিণ্ডদের নাম ও কুটিদ্বয়ের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। শুনিয়াছি, কালে শ্রাবস্তীনগরী মৃৎস্তূপে পরিণত হইয়াছে; জেতবনবিহার ও গন্ধকুটি ধূলিরাশিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু তীর্থযাত্রিগণের পথপ্রদর্শক ভিক্ষু ও শ্রমণগণ অদ্যাপি জেতবন ও কোশম্ব-কুটির নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। কি দেখিয়া আসিয়াছ? রাপ্তীনদীতীরে কোশলরাজ প্রসেনজিতের উচ্চচূড় প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ চূর্ণীকৃত হইয়া রাজপথের ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। শ্রাবস্তী নগরীর সেই মহাশ্মশান দেখিতে গিয়াছিলে কি? যাহারা পর্ব্বতবাসী পরাক্রান্ত শাক্যজাতির ধ্বংস সাধন করিয়াছিল, তাহাদিগের বংশধরদিগকে দেখিয়াছ কি? শকরাজদিগের গুরু ত্রৈপিটক উপাধ্যায় ভিক্ষুবল ও পুষ্যবুদ্ধি যে মহাবিহার নির্ম্মিত করিয়াছিলেন শিলাসঙ্কুল, উদ্ভিদসমাবৃত তাহার ধ্বংসাবশেষও বোধ হয় দেখিয়াছ। গহড়বাল বংশীয় কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্র জেতবনে যে সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, যে সঙ্ঘারামের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ শ্রাবস্তীমণ্ডলে শ্রাবস্তীবিষয়ে শ্রাবস্তীভুক্তিতে অষ্টসংখ্যক গ্রামদান করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি তাহার ধ্বংসাবশেষ লইয়া নবরাজ্যের হিমকান্তি রাজপুরুষগণ রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মহাচীন হইতে কুরুবর্ষ পর্য্যন্ত সমগ্র মহাদেশের প্রকৃত বিশ্বাসিগণ যে নগরের পথের ধূলিমুষ্টি পবিত্র জ্ঞানে মহাযত্নে সুদূর পিতৃভূমিতে লইয়া যাইতেন, যে বিহার দর্শনে সহস্র সহস্র ক্রোশ-ব্যাপী পথাতিক্রমজনিত শ্রম বিস্মৃত হইতেন, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া প্রকৃত বিশ্বাসিগণ যেস্থানে কোটী কোটী সুবর্ণমুদ্রা মন্দিরবিহারাদির শোভনার্থ ব্যয়িত করিয়াছিলেন, সেস্থানে শ্রাবস্তীনগরের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিবার কিছুই নাই।

কোন স্তম্ভে মধ্যদেশে অর্দ্ধবৃত্ত নাই। পূর্ব্ববর্ণিত আবরণে প্রথমস্তম্ভের ন্যায় নাগ বা যক্ষমূর্ত্তি, কোন স্তম্ভে বা অশ্বারূঢ় পতাকাবাহী পুরুষ বা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা যাইত। এইরূপে চুলকোকদেবতা, সুদর্শনা যক্ষিণী, সিরিমাদেবতা, চন্দা যক্ষিণী, সূচীলোম যক্ষ, কুবের যক্ষ প্রভৃতি নানাবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। কোন স্তম্ভে বৃত্ত বা অর্দ্ধবৃত্তের মধ্যে নানাবিধ কৌতুকাবহ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। কোনস্থানে চারিটি বানর একটি হস্তীকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে। হস্তীর

আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য শুণ্ডে কাষ্ঠখণ্ড বন্ধন করিয়া দিয়াছে। একটি বানর বন্ধনরজ্জু ধরিয়া অঙ্কুশ হস্তে হস্তীকে পথপ্রদর্শন করিয়া চলিয়াছে ও অপর তিনটি নৌকাগুণবাহীদিগের ন্যায় রজ্জুদ্বারা বিশাল জীবটিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে বানরগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে, পূর্ব্ববর্ণিত পথ-প্রদর্শক হস্তীর স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে, একটি বানর দন্তে দণ্ডায়মান হইয়া চালককে কি বলিতেছে, নিম্নে তিনটি বানর বংশী, ঢক্কা ও ডমরু নিনাদিত করিতেছে। দৃশ্যান্তরে একটি রাক্ষস আসনে বসিয়া আছে—একটি বানর তাহার নাসিকারন্ধ্রে বক্র লৌহনিবেশ পূর্ব্বক লৌহের শেষভাগ ধরিয়া আছে, নিম্নে একটি ক্ষুদ্র বানর ক্ষুদ্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসের দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া আছে। নাসারন্ধ্র-সংন্যস্ত বক্রলৌহে রজ্জুখণ্ড আবদ্ধ করিয়া একটি হস্তীর গলদেশে বন্ধন করা হইয়াছে। হস্তী প্রাণপণ শক্তিতে টানিতেছে, হস্তিপক অঙ্কুশাঘাত করিতেছে, পশ্চাতে অপর বানর হস্তীর পদে দণ্ডাঘাত করিতেছে, ঊর্দ্ধে ও নিম্নে বানরদ্বয় শঙ্খ ও ঢক্কা নিনাদ করিয়া ভীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক হস্তীকে চালনা করিবার চেষ্টা করিতেছে। চিত্র দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এত চেষ্টা সত্ত্বেও রাক্ষসের নাসারন্ধ্রের লোম উৎ-পাটিত হইতেছে না। কোন স্তম্ভে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় স্ত্রী বা পুরুষ গরুড় বা কিন্নরধ্বজ হস্তে লইয়া ধীর পাদক্ষেপে গমন করিতেছে। গরুড় বা কিন্নরধ্বজ বিস্ময়ের বিষয় নহে। এখন যেমন কিরাতদেশের প্রান্তে বৌদ্ধতীর্থে অসংখ্য বংশ-দণ্ডাগ্রে শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, পীত, রক্ত নানাবর্ণের কেতন দেখিতে পাও, তেমনই প্রাচীন যুগে মন্দিরে বা বিহারে হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন নির্ব্বিশেষে নানাবিধ পতাকা-শোভিত ধ্বজ সমূহ পূণ্যার্থিগণ কর্তৃক স্থাপিত হইত। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মহারাজ ধর্ম্মাশোকস্থাপিত সিংহ, হস্তী, বৃষধারী শিলাস্তম্ভ দেখিয়াছ; উহাও ধ্বজামাত্র। সামান্য তীর্থযাত্রীর বংশদণ্ডের পরিবর্ত্তে আসমুদ্রক্ষিতীশ সুচিক্কণ, সমুজ্জ্বল, মসৃণ শিলাস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া পুণ্যস্থানে কাষায় কেতন উড্ডীন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মলিপি খোদিত হইবার পূর্ব্বে উপগুপ্তের দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া অশোক আর্য্যা-বর্ত্তে যে পুণ্যযাত্রা করিয়াছিলেন সেই সময়ে পুণ্যস্থানমাত্রেই ধর্ম্মাশোকের সিংহ, হস্তী বা বৃষধ্বজ স্থাপিত হইয়াছিল। কবে কোন্ যবন আসিয়া ব্রাহ্মণগণের উপাস্য কোন্ দেবতার পদপ্রান্তে, আর্য্যাবর্ত্তের কোন্ প্রান্তে গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল সহস্র সহস্র বর্ষ পরে তাঁহার পুণ্যকর্ম্মের লেখ সিন্দূরলেপনমুক্ত হইয়া পুনরায় নরলোচনের গোচরীভূত হইয়াছে! তাহা দেখিয়া বা শুনিয়া বিস্মিত হইও না। যদি ব্রাহ্মণের উপাস্য

বাসুদেবের উদ্দেশ্যে যবনতীর্থযাত্রী কর্ত্তৃক একটি অশ্মনির্ম্মিত গরুড়ধ্বজ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তে সর্দ্ধর্ম্মের সপ্তদশশতাব্দীব্যাপী জীবনে যে লক্ষ লক্ষ কেতনবাহী ধ্বজা স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইবে। পুণ্যস্থানে অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে রাজগৃহে, পাটলীপুত্রে, মহাবোধিতে বৈশালীতে, বারাণসীতে, শ্রাবস্তিতে, কুশীনগরীতে, কৌশাম্বীতে, সঙ্কাশ্যে, উজ্জয়িনীতে, মথুরায়, পৃথুদকে স্থান্বীশ্বরে, জালন্ধরে, তক্ষশিলায় নগরহারে, পুরুষপুরে, বাহ্লীকে, কপিশায়, কত সহস্র ধ্বজ স্থাপিত হইয়াছিল। সদ্ধর্ম্মের গৌরবের তুলনায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গৌরবও ক্ষীণ। সমস্বরে সর্দ্ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নামোচ্চারণ করা উচিত নহে।

প্রভাতে উৎসব। নববিবাহিতের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় দুর্দ্দমনীয় মনোবেগ লইয়া উষাগমের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, যাহা দেখিলাম, তাহা আর কখন দেখি নাই, আর কখনও দেখিব না। তাহার প্রত্যেক ঘটনা আমার মনে কে যেন ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরৎ।

—:০:—

সৌম্য শুভ্র শরৎ আবার
হরষে এসেছে ফিরে',
নির্ম্মলতর নব সুষমায়
ধরণী-অঙ্গ ঘিরে'।
রজত শুভ্র লঘু মেঘদল
ভাসে নীলাকাশে চিরচঞ্চল,
রাশি রাশি ফেনপুঞ্জ যেমন
সুনীল সাগরনীরে।
শান্ত শুভ্র শরৎ আবার
হরষে এসেছে ফিরে'।

সরসে ফুটিয়া উঠেছে গরবে
শত শত শতদল,
শিশিরলিপ্ত শেফালিপুষ্পে
আস্তৃত তরুতল।
প্রান্তর প'রে নবকাশবন
ছেয়ে ফুলরাশি শুভ্রবরণ ;
চঞ্চলা নদী কল্লোল রবে
বহে যায় অবিরল।
সরসে ফুটিয়া উঠেছে গরবে
অমল কমল দল।

স্বর্ণশীর্ষ ধান্য-ক্ষেত্র
হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
নিশীথে ইন্দু সিত করধারা
বরষে অমিয় মাখি'।
উজ্জ্বল মৃদু রবির কিরণ,
স্নিগ্ধ মধুর ধীর সমীরণ,
পুলক পরশে আকুল গাহিছে
মধুর কণ্ঠে পাখী।
স্বর্ণশীর্ষ ধান্য-ক্ষেত্র
নিমেষে জুড়ায় আঁখি।

কিরণে, বরণে, সৌরভে, গীতে,
পুলকে পূর্ণ ধরা,
আসিছে ভুবনে শারদ লক্ষ্মী
দুঃখদৈন্যহরা ;
তাই দিকে দিকে এত আয়োজন।
কে আছে প্রবাসে, কে সহে বেদন ?
আজিকে মিলন-উৎসব ভবে,
আয় ছুটে আয় ত্বরা।
কিরণে, বরণে, সৌরভে, গীতে
পূর্ণ আজি এ ধরা।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

সমালোচনা।

—:০:—

ভক্তের জয়।*

—০—

সাধক গাহিয়াছেন—"আমি ভক্তি দিতে পারি না হে মোক্ষ মুক্তি দিতে কাতর নই।" যে ভক্ত,—যে সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া ব্রজবল্লভের মুরলীরবে আহুতা গোপিকার ন্যায় আপনার স্বতন্ত্র সত্তা ভুলিয়া ভগবানকে পাইবার জন্য প্রধাবিত, সেই সাধককে মোক্ষ বা মুক্তি দিতে ভগবান কখনই কাতর নহেন। সে নিজ কর্ম্মবলেই মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, সাগরে যেমন বারিবিন্দু মিশিয়া যায়, ভক্তের মুক্ত, পূত আত্মা তেমনই পরমাত্মায় লীন হয়। গীতা বলিয়াছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" (গীতা ১১।৫৪)

হে পরন্তপ! আমি বিশ্বরূপ,—অনন্য ভক্তির দ্বারা, আমাকে (আমার বিশ্বরূপকে) জানা যায়, দেখা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করা যায়। অপিচ

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং॥" (গীতা ১৮।৫৫)

লোক ভক্তির দ্বারা আমি কে এবং কিরূপ তাহা জানিতে পারে; তাহার পর আমাকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারিয়া আমাতেই প্রবেশ করে। সুতরাং সাধক যদি প্রকৃত ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে মোক্ষমুক্তি লাভ করা কঠিন নহে। কিন্তু ভক্তিলাভ সহজ নহে। ভক্তি-লাভ করিতে হইলে জন্মজন্মান্তরের সাধনা আবশ্যক। সাধনা কর্ম্মসাপেক্ষ। শাস্ত্র বলেন, "চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম।" চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্ম করিতে হয়। একা-দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। কিন্তু সকল কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না। ঈশ্বরের উদ্দেশে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়। গীতা বলিয়াছেন,—

* ভক্তের জয়—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত; কলিকাতা, ৪০, মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" (গীতা ৩।৯)

যজ্ঞার্থ অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনার্থ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্ম্ম ভিন্ন আর সকল কর্ম্মই বন্ধনের কারণ অর্থাৎ সেইসকল কর্ম্মের দ্বারা লোক সংসারের মায়াজালে বদ্ধ হইয়া পড়ে! অপিচ

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।" (গীতা ১৪।২৬)

যিনি একান্ত ভক্তিযোগে (ভক্তি-সহকারে) আমার সেবা করেন, তিনি সমস্ত গুণের অতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন।

সহজে এ ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভক্তির ও ভক্তের স্বরূপ বর্ণিত। যে ব্যক্তি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানকে মন, বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছে,—যে ব্যক্তি আপনার পৃথক্ সত্তা হারাইয়া, আপনার আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব পরিহার করিয়া, আমি ও আমার ইত্যাকার জ্ঞান পাশরিয়া, জ্ঞানাগ্নিতে লোভ মোহ প্রভৃতি ভস্মীভূত করিয়া ভগদ্ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত। তাঁহারই ভক্তি পরাভক্তি। যে ভক্তির বলে প্রহ্লাদ জলে স্থলে অনলে অনিলে, আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে হরিকে দেখিয়াছিলেন,—যে ভক্তির প্রভাবে বালক ধ্রুব দুর্দ্দান্ত বনচর শার্দ্দূলকে 'এই আমার পদ্মপলাসলোচন হরি' বলিয়া আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন, সে ভক্তি সহজপ্রাপ্য নহে। সে ভক্তি কেবল ভাবপ্রবণতা নহে, তাহা সত্যজ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত। যাঁহারা ভক্তিকে কেবল Sick Sentimentality বুঝেন, তাঁহারা ভক্তিতত্ত্বের কিছুই বুঝেন না। সেই জন্য ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"যে ভক্তিতে আমার রাণী বন্ধন করে
সে ভক্তি কি দিতে পারি যা'রে তা'রে
ভক্তির কারণে মধুর বৃন্দাবনে
আহ্লাদিনী রাইয়ের ঋণে বদ্ধ রই॥"

ভক্তির সংক্রামক শক্তি আছে। ভক্তির কথা, ভক্তের চরিত আলোচনা করিলে হৃদয়ে ক্রমশঃ ভক্তিরস সংক্রামিত হয়। সেই জন্য ভগবানই বলিয়াছেন,— 'মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা' আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা অপেক্ষা অধিক। বৃন্দাবন দাস বাঙ্গলা ভাষাতে ঐ ভগবদ্বাক্যের অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়॥"

কিন্তু খাঁটি বাঙ্গলায় ভক্তের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ নাই। বাঙ্গালা পদ্যে যে ভক্তমাল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহা মৌলিক গ্রন্থ নহে—নাভাজী প্রণীত হিন্দী ভক্তমাল ও প্রিয়দাসের হিন্দী টীকার ভাবানুবাদমাত্র। এ দেশের ভক্তগণ উহাই পাঠ করিয়া থাকেন। ভক্তের চরিতপাঠ ভক্তি-উন্মেষের প্রধান সাধন। সেই জন্য সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীরাই তাঁহাদের আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তচরিত পাঠ করিয়া থাকেন। বাইবেল পাঠ করার পর Book of Martyrs পাঠ না করিলে খৃষ্টানগণের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ সাঙ্গ হয় না। ইহুদী, বৌদ্ধ প্রভৃতিরও এরূপ নিয়ম। উৎকল ভাষায় 'দার্ঢ্যভক্তি রসামৃত' নামে একখানি সুন্দর ভক্তমাল গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এ পর্য্যন্ত উহা বঙ্গভাষায় অনূদিত হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ঐ গ্রন্থখানিতে যে সমস্ত ভক্তচরিত্র কীর্ত্তিত আছে, সাধারণ লোকের মনে ভক্তিরসের উন্মেষণে তাহা সম্পূর্ণ উপযোগী। সম্প্রতি বৈষ্ণব-চূড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঐ গ্রন্থ হইতে আটটি ভক্তচরিত সুন্দর ও সুললিত ভাষায় প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে আটটি সন্দর্ভ আছে। এক একটি সন্দর্ভে এক এক জন ভক্তের চরিত কীর্ত্তিত। এই আটটি আখ্যায়িকা 'দার্ঢ্য ভক্তি রসামৃতের' যথাযথ অনুবাদ নহে। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"আমি উৎকল ভক্তচরিত্রের আক্ষরিক অনুবাদ করি নাই। আমাদের দেশের রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া—আমাদের ছাঁচে সে গুলিকে ঢালিয়া লইয়াছি। তজ্জন্য উৎকল চরিত্রের কিছু কিছু কাট ছাঁট অদল বদল করিতে হইয়াছে। চরিত্র-চিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ-সাধন এবং ভক্তিরসের পরিপোষণের জন্যও স্থানে স্থানে অনেক কথা জোড়া তাড়া দিতে হইয়াছে।" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মূলগ্রন্থবর্ণিত চরিত হইতে তাঁহার বর্ণিত চরিত একটু বিভিন্ন। মূল চরিত্র বজায় রাখিয়া যদি কেবল ভক্তিরসের পরিপোষণ ও অপূর্ণ ভাগের পূর্ণতাসাধনের জন্যই গোস্বামী মহাশয় মূল কাহিনী সাজাইয়া গুছাইয়া লইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বাস্তবিকই এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালী ভক্ত সমাজের অধিকতর আদরের জিনিষ করিয়া তুলিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা মূলগ্রন্থখানি দেখি নাই। সুতরাং পরিবর্ত্তনের ভাল মন্দ বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, পুস্তকখানি পাঠ করিতে

ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিমন্দাকিনী স্বতঃ তর তর তরঙ্গে প্রবাহিত হইবেই হইবে, ভক্তের নয়ন প্রেমাশ্রুতে ভাসিয়া যাইবে, ভক্তের শরীর প্রেমপুলকে কণ্টকিত হইবে। পুস্তকখানির লিখনভঙ্গী বড়ই মধুর। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচারে সমাজের যথেষ্ট উপকার আছে। সকলেই কিছু আর ইহকাল পরকাল, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ, কর্ম্মফল প্রভৃতি জটিল তত্ত্বের দার্শনিক বিচার করিতে সমর্থ নহেন। কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞানের সাহায্যে সাধারণ লোক নাস্তিক্যবুদ্ধির ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে নিস্তার পায় না। শুক, সনাতন, কণাদ, গৌতম, ব্যাস, পতঞ্জলি প্রভৃতির ন্যায় মনস্বী লোক জগতে দুর্ল্ভ। সুতরাং সাধারণ লোক সহজেই পাপের পথে প্রলুব্ধ হইয়া থাকে। ভক্তিই সাধারণ মানুষকে,—প্রবৃত্তি-তাড়িত অজ্ঞানতা-পীড়িত মানবকে—সেই পাপের পিচ্ছিল পথ হইতে সহজে দূরে রক্ষা করে। ভক্তচরিত্রই মানব-হৃদয়ে সহজে ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়া দেয়। ভক্তের চরিত সাধারণ লোকের আদর্শ। সেই আদর্শ অতি উচ্চ হইলে সাধারণ মানুষ সে আদর্শের সন্নিহিত হইতে পারে না, অনেকে সে আদর্শের সন্নিহিত হইতে চেষ্টা করিলেও নৈরাশ্যাশনি-প্রহৃত হইয়া পাপপঙ্কে প্রোথিত হইয়া যায়। সেইজন্য সাধারণ মানবকে পাপের হস্ত হইতে নিস্তার করিবার জন্য গণপতি ভট্ট, বলরাম দাস, বিশ্বম্ভর দাস, দীনবন্ধু দাস, বন্ধু মহান্তি প্রভৃতির ন্যায় ভক্তেরচরিত পাঠ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। বলরাম দাস পাপী হইয়াও ভগবদ্ভক্তির বলে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিল, বন্ধু মহান্তি বন্ধুভাবেই জগন্নাথকে ডাকিয়া ভগবানের শ্রীপদে স্থান পাইল, গণপতি ভট্ট গজেন্দ্রবদন গণেশরূপী ভগবানকে আরাধনা করিয়াছিল বলিয়া ভগবান জগন্নাথ সেই রূপেই তাহাকে দেখা দিলেন, এই সকল দেখিলে সাধারণ লোক ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত হয়। ভক্তির পথে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই কামনা, বাসনা প্রভৃতি কাটিয়া যায়, মানব-হৃদয় বিমলানন্দে বিভোর হইয়া উঠে, জ্ঞানের আলোক স্বতঃই হৃদয়ে সহস্র সূর্য্যের তেজে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। সুতরাং সামাজিক পাপদমনের উদ্দেশ্যে এরূপ গ্রন্থের প্রচার নিতান্ত আবশ্যক। আশা করি, গোস্বামী মহাশয়ের এই 'ভক্তের জয়' বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে।

গ্রন্থের ভাষা অতি সুন্দর, সরল ও ভাবময়। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি উত্তম। গ্রন্থকার একজন পরম ভক্ত; সুতরাং তাহার লেখনীমুখে ভক্তির পূতপ্রবাহ ছুটিয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

সংগ্রহ।

—:০:—

সাহিত্য।

মীরাবাই।

বৈশাখ মাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' চিতোর-ভ্রমণ বৃত্তান্তের লেখক লিখিয়াছেন, "মীরা ও পদ্মিনী রাজস্থানের দুইটি অতুলনীয় রমণী রত্ন। একজন রাজরাণী হইয়াও সন্ন্যাসিনী মহাবীর কুম্ভের সৈন্যকোলাহলের প্রতি কর্ণপাতমাত্র না করিয়া হরিনামামৃত পানে বিভোরা।" মীরার ভক্তি সম্বন্ধে কত কিম্বদন্তীই প্রচলিত আছে। তাঁহার কবিতায় সেই ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। সংপ্রতি 'ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট' পত্রে শ্রীযুত কানাইলাল মুন্সী মীরাবাই সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহারই সারসঙ্কলন।

মীরাবাই। গুজরাটী কবিকুঞ্জে মীরার আসন স্বতন্ত্র। তিনি কুম্ভের পত্নী, আদর্শ মানবদেবের প্রেমার্থিনী; তাঁহার কবিতার তুলনা নাই। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। ভারতবাসীর স্বভাবসিদ্ধ আত্মবিসর্জ্জনবশে তিনি যেন আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, তাঁহার স্বামী রাণাকুম্ভ অসাধারণ বীর ছিলেন; তাঁহার রাজত্বকালও নির্ণীত হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তী ও তাঁহার কবিতা হইতে তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করায় লাভ আছে।

কবিতা মীরার কবিতার সংখ্যা অধিক নহে। হয়ত তিনি অধিক কবিতা লিখেন নাই। তাঁহার জীবনই কবিতা। তিনি কবিযশঃপ্রার্থী হইয়া—সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশায় কবিতা রচনা করেন নাই। তাঁহার কবিতা নির্ঝরের বারির মত স্বতঃ প্রবাহিত। তিনি চেষ্টা করিয়া ভাবকে কবিতার ছন্দে প্রকাশ করিতেন না; তাঁহার কবিতা অনায়াসজাত। তাঁহার কবিতা ভাবের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। এইরূপ কবির কথায় টেনিসন বলিয়াছেন :—

আমি গাহি, গান মোর আপনি বিকাশে ;
বিহগের গীত যথা আপনা প্রকাশে।

কিন্তু যে কবিতা পাঁচশত বৎসরের পরও সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত, সে কবিতা সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষায় নষ্ট হইবার নহে। আজও রাজপুতানার ঊষর প্রান্তরে বা গুর্জ্জরের উর্ব্বর ভূমিতে কৃষিকার্য্যরত জ্ঞানহীন কৃষক মীরার ভজন গাহিতে গাহিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সে আর কোন গান জানে না; মীরার ভজনেই তাঁহার শ্রমশান্তি। যতদিন মানব হৃদয়ে প্রেমের প্রভাব থাকিবে, যতদিন কিশোরের বিরহে কিশোরীর হৃদয় ব্যথিত হইবে, যতদিন যুবককে দেখিয়া যুবতীর গণ্ড লজ্জারক্তরাগরঞ্জিত, হইবে ততদিন মীরার কবিতার আদর থাকিবে। মীরার কবিতায় প্রেম যেন মধুরতম বোধ হয়।

মীরা ভক্ত কবি। কবিচিত্ত ভাবপ্রবণ ; তাহাতে অতি সাধারণ অনুভূতি প্রবল হইয়া উঠে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির তুচ্ছ সম্পদে মুগ্ধ হইতেন ; শেলী বাঞ্ছিতার কেশগুচ্ছে কাব্যপাঠ করিতেন, হাফেজ প্রিয়তমার বরবপুর তিলের জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারিতেন। কবির ইহাই বিশেষত্ব। কবির কল্পনা বস্তু হইতে সত্বার উপলব্ধি করিতে পারে—সাধারণকে অসাধারণে পরিণত করিতে পারে। কবির এই অনুভূতি কবিতায় অভিব্যক্ত হয়। তাহা পাঠকের বা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করিয়া তাহাকেও কবির ভাবে অনুপ্রাণিত করে। কোন কবি স্বভাবের সৌন্দর্য্যে, পর্ব্বতের বিরাটত্বে, সিন্ধুর অসীমত্বে, কাননের গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কবিতার উৎস মুক্ত করেন, বেদনা, ঘৃণা, প্রেম প্রভৃতি কাহারও কবিতার উৎস মুক্ত করে। প্রেমই অধিকাংশ কবির কবিতার মূল। যে সকল কবির সংসার-জ্ঞান প্রবল, যাঁহাদের প্রতিভার 'গৃহিণীপনা' আছে, তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষের প্রেমে মত্ত। আর যাঁহাদের উদ্দাম কল্পনা ধরার ধূলা ত্যাগ করিয়া বিহঙ্গের মত আকাশে উড্ডীয়মান, তাঁহারা কল্পনাসৃষ্ট আদর্শের প্রেমে মুগ্ধ। তাঁহাদিগের নিকট সে আদর্শ বাস্তবরূপে উপনীত। তাঁহাদিগের কর্ণ সেই আদর্শের কথা শুনিতে পায়, তাঁহাদিগের নয়ন সেই আদর্শের দর্শনলাভে চরিতার্থতা-লাভ করে। ভারতের ভক্তগণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারতের বলিলাম, কেন না— য়ুরোপে ভক্ত উপাসনা, ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতিই যথেষ্ট বিবেচনা করেন, তিনি জগতের জীব। ভারতে ভক্ত দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে ভগবানের অংশ বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি জগতের নহেন—বাঞ্ছিতের। ভারত এই ভক্তের লীলাভূমি। আমাদের কল্পনা সহজেই বাঞ্ছিত আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিয়া থাকে। তাঁহাদিগের কবিতায় যে প্রেম সপ্রকাশ তাহার তুলনা নাই।

মীরা ভক্ত কবি। তাঁহার কবিকল্পনা ভারতের পুরাণ-বর্ণিত চিত্র সজীব করিয়া তুলিয়াছিল।

ভক্তকবি।

তিনি পুরাণ-বর্ণিত দেবতাদিগের মধ্যে আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের মত লোকপ্রিয় দেবতা আর নাই। ভারতবাসীর ভক্ত হৃদয় তাঁহাকে সর্ব্ববিধ মানবীয় ও দৈব গুণের আধার করিয়াছে। তাঁহার বাঁশরীর স্বরে জড় জগতেও চেতনার সঞ্চার হইত—যমুনার জলধারা উজান বহিত। সেই বাঁশরীর আহ্বানে গোপাঙ্গনা আত্মবিস্মৃতিহেতু লৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিস্মৃতা হইয়া তাঁহার সঙ্গসুখলাভকামনায় মত্ত হইত, তাহার বাহ্য জ্ঞান দূর হইত—সে কৃষ্ণের সহিত আপনার একত্ব অনুভব করিত। সেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ শ্রীরাধায়। শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত বহু কবিকে গীতরত করিয়াছে। তন্মধ্যে জয়দেবের কোমল—কান্ত পদাবলীর তুলনা নাই। জয়দেব বর্ণিত সেই—

"দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংস
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিদান
অমলকমলদললোচন ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিধান।"

তাঁহাকেই মীরা আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি আপনাকে কৃষ্ণের প্রণয়িনী মনে করিলেন। তাঁহার পিতা এবিষয়ে কন্যার কার্য্যের সমর্থন করিলেন। ক্রমে মীরা সংসারবিরাগিনী হইলেন—কৃষ্ণপ্রেমলালসাই তাঁহার সমগ্র হৃদয় অধিকৃত করিল। চিতোরের সিংহাসনে তাঁহার কোন আকর্ষণ রহিল না, বীরোত্তমের ভ্রূকুটিতে তাঁহার হৃদয়ে ভীতিসঞ্চারসম্ভাবনা থাকিল না, লোকের উপহাস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তিনি যে সংসারবিরাগিনী—"কৃষ্ণ কলঙ্ক সায়রে" ডুবিলে এমনই হয়। প্রেমোন্মাদের—দিব্যোন্মাদের ইহাই লক্ষণ। শ্রীরাধাও বলিয়াছিলেন—

"কায কি বাসে, কায কি বাসে
প্রাণ দেয় যে পীতবাসে?
সে যা'র হৃদয়ে বাসে
সে কি বাসে বাস করে?
কায কি গোকুল, কায কি গো কুল,
ব্রজবাসী হ'ক প্রতিকূল;
আমি ত সঁপেছি, সই, কূল
অকূলের কাণ্ডারীর করে।"

ক্রমে মীরার দিব্যোন্মাদ হইল। তিনি "অকূলের কাণ্ডারীর করে" আপনাকে সমর্পণ করিলেন।

কবিতা।

এই দিব্য প্রেম মীরার কবিতার কারণ। সে সকল কবিতার সরলতা ও সরসতা, তন্ময়তা ও গভীরতা, পবিত্রতা ও কোমলতা—সত্য সত্যই অতুলনীয়। কাযেই সে সকল কবিতা যে এতদিন সমান আদরলাভ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণমাত্র নাই। সে সকল কবিতার অমরতা অবশ্যম্ভাবী। আজও সেই সকল কবিতা সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয় নাই, ইহা একান্তই দুঃখের বিষয়। ভারতবাসী বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া মন্ত্রাদি কেবল স্মৃতির সাহায্যেই রক্ষা করিয়া আসিয়াছে সত্য; কিন্তু সাহিত্যের সংরক্ষণে স্মৃতি যে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় নহে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। মীরার কবিতার সংগ্রহ ও সম্পাদন ভারতবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

বাণিজ্য।

—:0:—

বাণিজ্য শিক্ষা।

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস" ইহা ভারতের চিরন্তনী কথা। বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে এই কথা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। বাণিজ্য-সেবাতেই এখন সমগ্র সভ্য জগত আত্মনিয়োগ করিয়াছে। বাণিজ্য শ্রী, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের নিদান, ইহা এখন সজীব জাতিমাত্রই বুঝিয়াছে। সেই জন্য য়ুরোপে বাণিজ্যসম্পর্কিত ব্যাপার শিক্ষা দিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয়িত করিয়া বিদ্যাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বাণিজ্যবিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুত সোরাব আর ডাবার এফ্, এস্, এস্, মহাশয় একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি লাহোরের শিল্প সমিতির জন্য লিখিত হয়। গত জুলাই মাসের 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' নামক পত্রে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে অনেক আবশ্যক ও আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

বাণিজ্য-শিক্ষার ফলে বর্ত্তমান সময়ের অনেক সুসভ্য জাতি উন্নতির পথে দ্রুতবেগে প্রধাবিত। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে ইংলণ্ড বাণিজ্য ব্যাপারে জগতের অন্যান্য জাতির

ইংলণ্ডের অনবধানতা।

অগ্রণী, সেই ইংলণ্ডেই অনতিপূর্ব্বে বাণিজ্য শিক্ষা বিশেষ অনাদৃত ও উপেক্ষিত ছিল। আণ্টওয়ার্প সহরেই ১৮৫২ খৃঃ অব্দে বাণিজ্য শিক্ষার উন্নত বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাণিজ্যসম্পর্কিত বিষয়ের আবশ্যক শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই ঐ বিদ্যাগার প্রথম পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাহার পর উহারই অনুকরণে ব্রুসেল্স্, বার্লিন, সুইজারল্যাণ্ড; লুভেঁ, লিজমন্স্ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-বিদ্যাগারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মার্কিণ ও জাপান এই আবশ্যক শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে কালব্যাজ করে নাই। উন্নতিপ্রয়াসী সজীব জাতিমাত্রই এই অত্যাবশ্যক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিল, কেবল বাণিজ্যগর্ব্বে গরীয়ান্ ইংলণ্ডই কিছুদিন এই বিষয়ে কতকটা অনবহিত রহিল।

বহু শতাব্দী ধরিয়া ইংলণ্ড বাণিজ্যজগতের অগ্রণী ছিলেন; ইংরেজগণ বহুপুরুষ ধরিয়া পণ্যশালায় ও পণ্যবীথিকায় বাণিজ্যসম্পর্কিত আবশ্যক জ্ঞানার্জ্জন করিতেন। ইংরেজগণ বহু

চৈতন্য সম্পাদন।

পুরুষ ধরিয়া পণ্যাজীব ছিলেন, সুতরাং পণ্যাজীবের কার্য্যে তাঁহাদের একটা কৌলিক দক্ষতা জন্মিয়াছিল। ইংরেজ বণিকগণ তখন মনে করিতেন, ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁহাদের অনন্যোপভোগ্য নিজস্ব সম্পত্তি; প্রকৃতি দেবী উহাতে তাঁহাদিগকে একাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন, যে সকল দেশে কেবল তাঁহাদিগেরই পণ্যবীথিকা সজ্জিত ছিল, যে সকল দেশে অন্য কেহ তাঁহাদের সহিত বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইতে পারিবে

এ কথা তাঁহারা কখন কল্পনাও করেন নাই—সেই সকল দেশে জর্ম্মন দেশীয় বণিকগণ শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশলাভ করিতেছেন এবং অল্পে অল্পে তাঁহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতেছে। নবাগত বণিকদিগের কার্য্যতৎপরতা ও বাণিজ্য-কৌশল দর্শনে ইংরেজ চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা ক্রমে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। বাণিজ্যসম্পর্কিত ব্যাপারে উন্নত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদানই যে আগন্তুকদিগের অভ্যুদয়ের কারণ, তাঁহাদিগের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহারা দেখিলেন এবং বুঝিলেন যে, বেলজিয়ামে, ফ্রান্সে, জর্ম্মণীতে, অষ্ট্রীয়ায় ও মার্কিণে জনসাধারণকে বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অগত্যা ইংরেজগণ বাণিজ্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। আজ পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যে মার্কিণ মুলুকে নগরে নগরে বাণিজ্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লক্ষ মার্কিণ ছাত্র ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে।

কার্য্যারম্ভ ও সাফল্যলাভ।

ইংরেজগণ বুঝিলেন, বাণিজ্য-শিক্ষার সুব্যবস্থা না করিলে অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব হইবে। সে আজ পঞ্চদশ বর্ষের কথা। তখন লণ্ডন চেম্বার অব কমার্স এ বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানকল্পে ও বাণিজ্য-শিক্ষার ব্যবস্থানির্দ্ধারণোদ্দেশ্যে একটি 'স্পেশাল্ কমিটী' নিযুক্ত করিলেন। সেই হইতে ইংলণ্ড এবিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন। এখন ম্যানচেষ্টার ও বার্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য-শিক্ষার্থী কৃতী ছাত্রদিগকে "ডিপ্লোমা" ও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতের সুবিধা ও অভাব।

ভারতে শিল্প-শিক্ষার ন্যায় বাণিজ্য-শিক্ষাও অনাদৃত ও উপেক্ষিত। আমাদের যে যৎকিঞ্চিৎ শিল্প অবশিষ্ট আছে, তাহাও সাহচর্য্য ও ব্যবসায়াভিজ্ঞতার অভাবে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমাদের দেশের লোকের স্বাভাবিক বাণিজ্য-বুদ্ধির অভাব নাই। বাণিজ্য ও অর্থসম্পৃক্ত ব্যাপারে আমাদিগের দেশের কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধাও আছে। কিন্তু তথাপি আমরা বাণিজ্যবিষয়ে অন্যান্য জাতির ন্যায় উন্নতি লাভ করিতে পারি নাই। ইহার কারণ, প্রথমতঃ আমাদের দেশের বণিকেরা চক্রবদ্ধ হইয়া কায করিতে জানে না, দ্বিতীয়তঃ কেবলমাত্র ব্যবসায়-শিক্ষার দ্বারা যে আত্মনির্ভর করিবার শক্তি জন্মে, আমাদের তাহারও অভাব।

উন্নতির অন্তরায়।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের শিল্পোন্নতির ও বাণিজ্যোন্নতির যে সমস্ত পরিপন্থী কারণ দৃষ্ট হইতেছে, য়ুরোপের ব্যবসায়োন্নতির প্রারম্ভকালেও ঠিক সেই সমস্ত পরিপন্থী কারণই বর্ত্তমান ছিল। কারণগুলি এই :—একজন বণিক আমরণ পরিশ্রম করিয়া একটি ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত করিলেন; কিন্তু তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চউপাধিভূষিত পুত্র সে কারবারের প্রতি আদৌ মনোযোগী হইলেন না। অনেক সময় শিক্ষিত বণিকপুত্রের পিতৃব্যবসায়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মে। শিক্ষিতের বৃত্তির প্রতি পূর্ব্বেই তাঁহার আসক্তি জন্মে, অথবা তিনি স্বাধীন ভদ্রলোকের মত জীবন-যাপন করিতে চাহেন। বণিকপুত্র যদি অশিক্ষিত হয়েন তাহা হইলে তিনি অনেক স্থলে পিতার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল সেই ব্যবসায়টি নষ্ট করিয়া ফেলেন। অনেক সময় পুত্র যদি পিতার কার্য্যে মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলেও

প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে সে কারবার বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে না; অনেক সময় তাহার উন্নতি অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

এরূপ ঘটনা স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে সমস্ত মনোবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দেয়, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাহা কোনও প্রয়োজনেই আইসে না। অশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশই হয় না। যদি বণিকপুত্রগণ বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ব্যবসায় শিক্ষার উন্নত বিদ্যামন্দিরে শিক্ষালাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সাধারণ বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত এবং ব্যবসায়-বুদ্ধি বিকশিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা পৈত্রিক কারবারের বিশেষ উন্নতিসাধন করিতেও সমর্থ হয়েন। ইহাতে কারবারের উন্নতির গতি ভঙ্গ হয় না; পরন্তু উন্নতি-চেষ্টার আবশ্যক পারম্পর্য্য রক্ষিত হয়। ইংরেজ-জাতির ব্যবসায়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, তাহাদের অতি বিস্তীর্ণ ও বিরাট কারবারগুলি শতবর্ষমাত্র পূর্ব্বে অতি সামান্য ছিল। পুরুষপরম্পরার চেষ্টায় তাহারা এরূপ বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতে কোন ব্যক্তি যদি জীবনব্যাপী শ্রমের ও অসামান্য প্রতিভার ফলে কোন কারবার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যায়েন, তাহা হইলে সে কারবার আর অধিক দিন স্থায়ী হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ব্যবসায়ের প্রতি অবজ্ঞা ও অশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের অকর্ম্মণ্যতাই তাহার কারণ।

নিদান কথা।

প্রতীচ্য ব্যবসায় ব্যাপার কিরূপ বিরাট হইয়া দাড়াইয়াছে যাঁহারা কেবল গৃহে বসিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহা বুঝিতে একান্ত অক্ষম। যাঁহারা বিদেশে যাইয়া কেবল উপর উপর ঐ সকল ব্যবসায় দেখিয়া আইসেন, তাঁহারাও উহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। য়ুরোপের এক একটি বড় কারবারে লক্ষ লক্ষ লোক কায করিতেছে; কলের সাহায্যে শত জনের কায এক জনে করিতেছে; এক একটি কারখানায় এইরূপ শত শত কল অবিশ্রাম চলিতেছে, শত দিকে শত প্রকারের কায হইতেছে, ইহা দেখিলে ঐ কারবারের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ কি উপায়ে তাঁহার বুদ্ধি স্থির রাখিয়াছেন, তাহা ভাবিয়াই অবাক হইতে হয়। ব্যবসায়-সম্পর্কে উচ্চশিক্ষালাভ না করিলে এরূপ কার্য্য পরিচালন করা সম্ভবে না; কেবল কারবারে "শিক্ষানবিশী" করিলে উহার শিক্ষা হয় না। আমাদের দেশের বড় বড় ব্যবসায়গুলি য়ুরোপীয় ম্যানেজারের পরিদর্শনাধীন। য়ুরোপীয় কারবারের তুলনায় দেশীয় অতি বৃহৎ কারখানাও অতি সামান্য, তুচ্ছ, নগণ্য। আর কতকগুলি দেশীয় আড়তে বা কারবারে দেশীয় পুরাতন ধরণের কার্য্যাধ্যক্ষ বা কর্ত্তা আছেন। এই কর্ত্তাকে সকল কাযই করিতে হয়। তিনি একাধারে খরিদদার, যাচনদার, বিক্রেতা, ধনরক্ষক, হিসাবরক্ষক, গুদাম সরকার ও প্রভুর খাস মুন্সি। দুই তিন জন মূর্খ সরকার লইয়া তাঁহাকে কাষ চালাইতে হয়। এরূপ লোকের পরিদর্শনাধীনে কিছু দিন বেশ কায চলে, কিন্তু হিসাবপত্রের যথারীতি পরিদর্শন হয় না। সুতরাং কিছু দিন কায চলিয়া কূলনাশা কূলঙ্কষার সিকতাময় তীরে নির্ম্মিত সৌধের মত, ভোজবাজীর তাসের ঘরের মত, আকাশে আতস বাজীর আসমান তারার মত, সে ক্ষণস্থায়ী কারবার কোথায় চলিয়া যায়, পরে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না। লেখক বলেন, এইরূপ ভাবে ব্যবসায় চালাইলে ভারতের বাণিজ্য কখনও সমুচ্ছ্রিত হইতে পারিবে না। এখন প্রতিদ্বন্দ্বির সমতুল্য প্রহরণ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামিতে হইবে। সুতরাং বাণিজ্য শিক্ষার সুব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

কর্ত্তব্য নির্ণয়

বিবিধ।

তাম্বূল।

আমাদের দেশে কোন্ সময় হইতে তাম্বূলের ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছে, তাহার স্থির নির্ণয় করা অসম্ভব। অতি প্রাচীনকালে হিন্দু নৃপতিগণ তাঁহাদের প্রাসাদে তাম্বূল প্রস্তুতের জন্ম একটি বিভাগ রাখিতেন, রমণীগণই সেই বিভাগের কর্ম্মচারিণী নিযুক্তা হইতেন। ঐ সকল কর্ম্মচারিণীগণের নাম ছিল তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী। সংস্কৃত সাহিত্যে বহুস্থানে ইঁহাদের উল্লেখ আছে। এই বিভাগটি বোধ হয় পাটরাণীরই কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। বাঙ্গালায় তাম্বূলের বহুল প্রচলন। কবিকঙ্কন খুল্লনাকে বাস-গৃহে গমনকালে "হাতে তাম্বূলের বাটা" দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ভারত রাজবাড়ীর কবি; তাঁহার মিঠা হাত। তাই তিনি "মিঠা পান মিঠা গুয়া"র কথা বলিয়াছেন। আর হেমচন্দ্র 'বাঙ্গালীর মেয়ের' বর্ণনায় "তাম্বূলে তামাকুরস—রাঙা রাঙা ঠোঁটের" কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক, পান কি প্রকারে জনসমাজে চর্ব্ব্যরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয় সে সম্বন্ধে শ্রীযুত এ, ই, আব্দুল আলি সাহেব 'জার্ণাল অব দি মস্লেম ইনষ্টিটিউট' নামক পত্রে একটি অতি কৌতুহলোদ্দীপক কিম্বদন্তী প্রকাশিত করিয়াছেন। সে কিম্বদন্তীটি এই:—

অতি প্রাচীনকালে ভারতের জনৈক রাজরাজেশ্বর চক্রবর্ত্তী দুরারোগ্য অজীর্ণরোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজাকে নিরাময় করিবার জন্য রাজবৈদ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। তখন খ্যাতনামা প্রথিতযশা ভিষকদিগকে আনিবার জন্য নানা দিগ্দেশে দূত ধাইল। দলে দলে চিকিৎসক সম্রাটের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সকলেই বচন আওড়াইলেন, আপনার চিকিৎসানৈপুণ্যের কথা আপনিই গাহিলেন, ঔষধ, অনুপান সহপান প্রভৃতির ফর্দ্দ করিলেন,—সকলেই বলিলেন "আমি এইরূপ সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছি।" ক্রমে একে একে সকলেই সম্রাটকে চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কেহই সম্রাটের রোগপ্রশমনে সমর্থ হইলেন না। সম্রাটের অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কট-সঙ্কুল হইয়া উঠিল। মন্ত্রিগণ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইলেন। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যে বৈদ্য সম্রাটকে আরোগ্য করিতে পারিবেন, তাঁহাকে বিপুল ধনের অধিকারী করা হইবে।

ঘোষণা-প্রচারের পর জনৈক অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিহিত চিকিৎসক রাজাকে চিকিৎসা করিবার জন্য রাজসভায় সমাগত হইলেন। এই নবাগত ভিষকের নামও অনেকে শুনেন নাই। অন্য চিকিৎসকগণ তাঁহাকে অবজ্ঞার ও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ প্রথমেই এইরূপ একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির হস্তে রাজার চিকিৎসাভার ন্যস্ত করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু তখন সকলের চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়াছে; সুতরাং অগত্যা তাঁহারা এই নবাগত চিকিৎসকের হস্তে সম্রাটের চিকিৎসাভার ন্যস্ত করিতে স্বীকার করিলেন। চিকিৎসক তখন একটি লতার পাতা, গুপারী চুণ ও খদিরের সহিত রাজাকে

ভোজনান্তে চর্ব্বণ করিতে দিলেন। প্রবাল, মতি, চূর্ণিভস্ম সংবলিত ঔষধে যাঁহার রোগ আরোগ্য হয় নাই, তাঁহাকে এই সামান্য ঔষধ ব্যবস্থা করা হইল দেখিয়া অন্যান্য চিকিৎসকগণ হাসিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সম্রাট অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিরাময় হইয়া উঠিলেন। অচিরে সেই রাজ্যমধ্যে পানের ব্যবহার প্রচলিত হইল। ক্রমে সমগ্র ভারত, লঙ্কা, মালয়দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্ম, পূর্ব্ব উপদ্বীপ সর্ব্বত্রই তাম্বূলের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে তাম্বূলের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। কেবল ওষ্ঠাধর রঞ্জনের জন্য পান ব্যবহৃত হয় না, ইহা ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকের সহায়তা করে বলিয়াও সমধিক আদৃত হইয়া থাকে। 'হিতোপদেশে' বিষ্ণু শর্ম্মা তাম্বূলের বহু গুণ বর্ণিত করিয়াছেন। দিল্লীর আমীর খসরু তাম্বূলের পঞ্চচত্বারিংশৎ গুণের বর্ণনা করিয়াছেন। আইন ই-আকবরীতেও আবুল ফজল নাগবল্লী পর্ণের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

তাম্বূলের ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বহুদিন ধরিয়া তাম্বূল ও গুপারীর ব্যবসা করিতেন। ইহা লতাবিশেষের পত্র, ঐ লতার সংস্কৃত নাম নাগবল্লী। উষ্ণ-প্রধান দেশেই পান জন্মে। পানের চাষ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ইহাতে জলসেকও অতি সাবধানে করিতে হয়। আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময় তাম্বূল-লতায় দুগ্ধ ও তিল-তৈল সেচন করা হইত। এখন য়ুরোপীয়গণ তাম্বূল ব্যবহার করেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের দরবারে আতর ও পান বিতরণের ব্যবস্থা আছে। ভারতীয় সমাজে পান সভ্যতার অঙ্গ ও লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

রজনীকান্ত সেন।

——:০:——

শান্ত গীত শ্রান্ত কণ্ঠে—নির্ব্বাণ বেদনা ;
বঙ্গে শুধু ভাসে তব সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা।
মৃত্যু আনিয়াছে মুক্তি, লভেছ বিশ্রাম।
তোমার সঙ্গীতে তব মৃত্যুঞ্জয়ী নাম।

——:*:——

গ্রন্থ-পরিচয়।

—:০:—

বসন্তে যেমন কুসুমের প্রাচুর্য্য—কোন কোন বিশেষ ঋতুতে তেমনই পুস্তকের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে—অবস্থাভেদে এই সময়ের বিভিন্নতা দেখা যায়। বঙ্গদেশে শারদীয়া পূজার পূর্ব্বেই বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়।

"শারদ-পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা"—

তখনই বাঙ্গালার উৎসব। নিদাঘের পর বর্ষার বর্ষণে স্নিগ্ধ ধরাবক্ষে শস্য-সম্পদসম্ভার বাঙ্গালীর হৃদয়ে অসীম আশার ও আনন্দের সঞ্চার করে। তখন নদী জলভারে পূর্ণ, প্রান্তর পক্ক ধান্যে শোভাময়, ভূমি কাশপুষ্পে শুক্লীকৃত, জলাশয় বিকশিত শতদলে সুন্দর, আকাশ বর্ষণলঘু সঞ্চরণশীল শুভ্র অভ্রে খচিত, প্রকৃতি শোভাময়ী। এই সময় বাঙ্গালী বর্ষব্যাপী শ্রমের পর উৎসবানন্দে শ্রমশ্রান্তি অপনোদিত করে। শরতে তাহার কর্ম্মক্লান্ত জীবনে বিশ্রাম—আনন্দ—সুখ।

এই শরতে বাঙ্গালী সাহিত্যের সাহচর্য্যে সুখসম্ভোগ করে। তাই এই সময় বাঙ্গালায় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কেহ নূতন,—কেহ পুরাতন—পরিচিত—প্রিয় নূতন পরিচ্ছদে উপনীত। যে সকল গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, সে সকলের সমালোচনার স্থান 'আর্য্যাবর্ত্তে' নাই। তাই আমরা প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির পরিচয় দিয়াই নিরস্ত হইলাম।

নবীনা।*

জীবনব্যাপী সাহিত্য-সেবার পর পরিণত বয়সে গ্রন্থকার পরলোকগত হইয়াছেন। এই পুস্তক তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত। তিনি প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে বন্ধন ছিলেন—দুই সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিলেন; তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার অনলস সাহিত্য-সেবা। তাঁহার রচনায়

* নবীনা—দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত; কলিকাতা, ১১৫।৪, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

অসাধারণ প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোকবিকাশ না থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে যে বহু রচনা-সম্পদ দান করিয়া-ছেন তাহা সাহিত্যানুরাগের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে সুন্দর। এ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত তদীয় গ্রন্থের সমালোচনা করিতে স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ হয়।

গ্রন্থের নায়ক জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেবোপমচরিত্র; রসিকা, সুন্দরী, পতিগতপ্রাণা ভার্য্যা পাইয়া সুখী। গ্রামের কুলবালা বিধবা—সুন্দরী নবীনা কুলোকের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার্থ জ্ঞানেন্দ্রনাথের সাহায্যপ্রার্থী হইল; তাঁহাকে দেখিয়া উদ্ভ্রান্তা হইল ও বহু কৌশলে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে পাপপথের পথিক করিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ এই ক্ষণিক অধঃপতনের জন্য আত্মগ্লানির তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, নবীনা তাঁহাকে না পাইয়া অন্যত্র সুখের সন্ধান করিল; কারণ, "যে মজিয়াছে, সে কোথাও স্থির থাকিতে পারে না।" কিন্তু পাপে সুখ নাই। সে শেষে ইহা বুঝিল, বুঝিয়া "ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিয়া এবং হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া অতি দীনভাবে" কাশীতে বাস করিতে লাগিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের "স্বর্ণ-হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইয়া 'বিশুদ্ধ স্বাদিকারূপে' পরিণত" হইল। তিনি পুনরায় পত্নীপ্রেমে সুখী হইলেন।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার বুঝাইয়াছেন, মানুষ পুরুষের নৈতিক শিথিলতা "উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করে, কিন্তু নারীচরিত্রে তাহার শতাংশের একাংশ অপূর্ণতা ঘটিলে মানবসমাজ সেই নারীকে চিরকলঙ্কিত জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিতে থাকে।" তিনি বুঝাইয়াছেন, "যাহাদিগের নিকট আমাদিগের পরম সমাদরের বস্তু সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, যাহাদিগের হস্তে আমাদিগের সমাজ-সংস্থিতির সার পদার্থ-স্বরূপ সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার ভার অর্পিত রহিয়াছে, তাহাদিগের চরিত্রগঠন ও বিহিত শিক্ষাপ্রদান বিষয়ে আমরা যথেষ্ট মনোযোগ দিই না। * * * * শৈশবকাল হইতে বালিকার হৃদয়ে সুনীতি সঞ্চার করিবার যথাবিহিত যত্ন করিলে, চরিত্র-সংগঠনের নিমিত্ত যেরূপ শক্তির প্রয়োজন, তত্তাবৎ কিশোরের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিলে, ত্যাগ-স্বীকার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ন্যায়পরতা প্রভৃতির বীজ সেই কোমল ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত করিয়া দিলে, বোধ হয়, তাহার আন্তরিক বল আরও সংবর্দ্ধিত হয় এবং অতিক্ষুদ্র কারণে বা অতি তুচ্ছ ঘটনায় আলোড়িত হইয়া, তাহাকে অধঃপতিত হইতে হয় না।" তিনি আরও বুঝাইয়াছেন,—

ঘৃতকুম্ভ সমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।
তস্মাদ্ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্ বুধঃ।

কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, "শিথিলতা ও ভঙ্গুরতা স্ত্রী-চরিত্রের এক প্রধান নিদর্শন" তাহা যে পুরুষচরিত্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য গ্রন্থে তাহা দেখা যায়। নায়কের ক্ষণস্থায়ী দৌর্ব্বল্যের কথায় তিনি বলিয়াছেন, "তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ উন্মাদ, তখন রূপের অনল তাঁহার সকল পবিত্রতা ভস্ম করিয়াছে, তখন ভোগ-বাসনার প্রবাহ তাঁহার বিবেক ও জ্ঞানকে ভাসাইয়া দিয়াছে, তখন পাশব আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সকল সতর্কতা উন্মূলিত করিয়া দিয়াছে।" আবার লাবণ্যের চরিত্রে তিনি রমণীর স্বভাবজ দেবীভাবই দেখাইয়াছেন।

গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকার বহুবিধ বিষয়ী মানবের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন, ইন্দ্রিয়দমনে চিত্তসংযমে, প্রলোভন পরিহারে মনুষ্যত্ব। তিনি দেখাইয়াছেন, স্বার্থ মানুষকে পশু করে। তিনি দেখাইয়াছেন, আপনার মানসিক শক্তিতে অত্যধিক বিশ্বাস অনেক সময় মানুষের সতর্কতা শিথিল করাইয়া তাহাকে অধঃপতিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ শৈবলিনীর বিষের ভয়ে বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাই তিনি আদর্শ মানব; আর দামোদর বাবুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ আত্মশক্তিতে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার অধঃপতন।

গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার গতি অতি দ্রুত—স্থানে স্থানে অনাবশ্যক দ্রুত। দ্রুতগামী বাষ্পীয়যানে যাত্রীর পক্ষে যেমন প্রকৃতির শোভা সম্যক্ উপভোগের সুযোগ হয় না, পরন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে না পারায় দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের পর প্রভূত পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইতে হয়—এ গ্রন্থেও তেমনই চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ঘটনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না, পরন্তু লক্ষিত পরিবর্ত্তন অসাধারণ বলিয়াই বোধ হয়। পথিমধ্যে নবীনার নিকট রঘুনাথের মনোভাব বিজ্ঞাপন, নবীনার লক্ষ্ণৌনগরে আগমন প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্যাকুলা ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের শরণাগতা নবীনার পক্ষে সহসা জ্ঞানেন্দ্রলাভলালসায় সর্ব্বস্বপণ ও প্রশংসাপ্রফুল্ল নেত্রে প্রেমময়ী পত্নীকে দেখিয়া ফিরিতে না ফিরিতে জ্ঞানেন্দ্রনাথের পক্ষে নবীনার মোহে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিস্মরণও উল্লেখযোগ্য। 'কণ্ঠমালার' নাপিতানীর সহিত 'নবীনার' নাপিত বৌর তুলনায় এ কথা বুঝা যাইবে। বোধ হয়, গ্রন্থকার গ্রন্থখানির সংশোধন ও প্রসাধন সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অনাহতগতি—স্বচ্ছ ভাষায় দুই এক স্থানে ত্রুটিও বোধ হয় সেই কারণেই লক্ষিত হইল। ১৩৮ পৃষ্ঠায় "কাশী"—"প্রয়াগ" হইবে কি?

গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে বর্ণনা যথাসম্ভব পরিহার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে বর্ণনাকুশল গ্রন্থ মধ্যে তাহার বহু প্রমাণ আছে।

গ্রন্থের দুইটি ত্রুটির উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। গ্রন্থকার "রুচিবাগীশ-দিগের" প্রতি বক্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য অনেক কথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তথাপি ঠাকুরদাদার সহিত জ্ঞানেন্দ্রনাথের কথোপ-কথনের, লাবণ্যের সহিত জ্ঞানেন্দ্রনাথের কথোপকথনের, বিপন্না নবীনাকে লইয়া লাবণ্যের রহস্যালাপের ও ভজহরির সহিত কৈবর্তের কথোপকথনের দুই এক অংশ পরিত্যাগ করিলে যে গ্রন্থখানি আরও সুন্দর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় ত্রুটির জন্য দায়ী প্রকাশক। ২০০ পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য দুই টাকা কিছু অধিক বোধ হয়।

গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা—বাহিরের সৌন্দর্য্য সর্ব্বতোভাবে গ্রন্থের উপযুক্ত।

কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক।*

মানবচরিত্রে অপরিসীম অভিজ্ঞতার অধীশ্বর সেক্সপীয়ারের মানসপুত্র কৃষ্ণ-কায় ওথেলো সুন্দরী ডেস্‌ডিমোনার নিকট—

"—Spake of most disastrous chances,
Of moving accidents by flood and field;
Of hair-breadth 'scapes i' the imminent deadly breach"

তাহাতে ডেস্‌ডিমোনা মুগ্ধা ও ওথেলোর প্রতি আকৃষ্টা হইতেন। সর্ব্বদেশে—সর্ব্বকালে একশ্রেণীর পাঠক এইরূপ বিস্ময়কর ঘটনাবহুল,—বিষম-বিপদ-বিজ-ড়িত, আশ্চর্য্য উদ্ধারকথায় পূর্ণ গল্প পাঠ করিতে ভালবাসেন। এইজন্য সকল দেশেই এইরূপ গল্প রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল উপন্যাসে চরিত্রবিশ্লেষণ বা চিত্রাঙ্কনে বিশেষত্ব না থাকিতে পারে, উপন্যাসের উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ না থাকিতে পারে—উপন্যাসের লোকহিতকর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ না হইতে পারে; কিন্তু লোকচিত্তরঞ্জন হইয়া থাকে। এই লোকচিত্তরঞ্জনও উপন্যাস-রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডে উইল্‌কি কলিন্স প্রভৃতি বহু প্রতিভাবান্ লেখক এইরূপ উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। আবার তাঁহাদিগের যথেষ্ট সমাদর হয় নাই বলিয়া সুইনবর্ণের মত প্রসিদ্ধ সাহিত্য রসিক পাঠক-সম্প্রদায়কে অকৃতজ্ঞ বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

* কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল, আলমগঞ্জ বাজার, কটক। মূল্য ১৲ টাকা।

বাঙ্গালায় এরূপ উপন্যাস নাই, এমন নহে; তবে সংখ্যায় অল্প। বর্ত্তমান পুস্তকখানি এই শ্রেণীর উপন্যাস। ইহাতে বাঙ্গালী যুবকের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে; বনমধ্যে ব্যাঘ্রের সহিত হস্তীর যুদ্ধ, পর্ব্বতপথে পতনশীল অশ্বের গতিরোধ, সম্মুখসংগ্রাম, বিশ্বাসঘাতকের করে বন্দিদশাপ্রাপ্তি, সুড়ঙ্গপথে পলায়ন, দস্যুহস্তে পতন প্রভৃতি বহু বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সমাবেশ আছে। লেখক যে এই সকল ঘটনাকে সম্ভবের সূত্রে বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বিশেষ সমস্ত গল্পের উপর প্রেমের সমুজ্জ্বল আলোকপাতে গল্পটি সুন্দর হইয়াছে। প্রেম অঘটনঘটনক্ষম—তাই গল্পের অসম্ভব ভাগও সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

এই পুস্তক যে বাঙ্গালার এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট আদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থের ভাষার প্রশংসা করা অসম্ভব। ইহা লেখকের প্রথম বাঙ্গালা রচনা কি না, আমরা অবগত নহি। কিন্তু তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও বর্ণনাকুশল। অথচ তাঁহার ভাষা একান্ত অসংস্কৃত, স্থানে স্থানে ভাষার দোষে বক্তব্য বিষয় দুর্ব্বোধ হইয়াছে। "রাত্রে", "চক্ষে" "হাঁস" প্রভৃতি বহুস্থানেই ব্যবহৃত হইয়াছে। "যে বিচ্ছেদ মৃত্যুর ছায়াস্বরূপ তাহার গভীরতা অভগ্ন থাকে,"—"স্বপ্নের ন্যায় সুমিষ্ট নূপুরের শব্দ,"—প্রভৃতি পদও প্রচুর। লেখক সংস্কৃত শব্দের সহিত প্রচলিত কথোপকথনে ব্যবহৃত শব্দ যেরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয় নহে। ভাষার নমুনা এইরূপ—"তাহার পর ছয়মাস, ঘটনাপূর্ণকাল, যাহা কি একটী জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, গত হইয়াছে।" (২০ পৃষ্ঠা)—"পথ এত দীর্ঘ এবং যাইতে এত দীর্ঘ সময় লাগিবে, আমি কল্পনা করিতে পারিলাম না আমরা এক সময়ে আমাদিগের গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারিব। (১৩ পৃষ্ঠা)

পুস্তকের কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

রামদাসগ্রন্থাবলী।*

যখন ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে য়ুরোপীয়দিগের ও সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও য়ুরোপীয় দীক্ষায় দীক্ষিত ভারতবাসী-

* রামদাস-গ্রন্থাবলী—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—৺রামদাস সেন প্রণীত। বহরমপুর হইতে শ্রীমণিমোহন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি টাকা।

দিগের ভ্রান্তধারণায় অবধি ছিল না, তখন দুইজন বাঙ্গালী সেই ভ্রান্তধারণার অপনোদন করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার, সাহিত্যের ও শিল্পের স্বরূপ-প্রকাশে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও শ্রীযুত রামদাস সেন এই দুইজন বাঙ্গালায় প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় পথপ্রদর্শক। এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে সঞ্চিত উপাদানের কেন্দ্রস্থলে বসিয়া রাজেন্দ্রলাল যখন ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতেছিলেন—বিদেশী পণ্ডিতদিগকে যুক্তি তর্কে পরাজিত করিয়া বিজয়শঙ্খপ্রণাদে দেশবাসীর হৃদয়ে সুপ্ত ইতিহাস চর্চ্চার বাসনা জাগরিত করিতেছিলেন, সেই সময় বাঙ্গালার মফঃস্বলে বহরমপুরে আপনার পুস্তকাগারে বসিয়া রামদাসও সেই কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ইংরাজীতে স্বীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সমগ্র সভ্য জগতকে যাহা জানাইয়াছিলেন, রামদাসের বাঙ্গলা রচনায় তাহা বাঙ্গালীর অন্তঃপুরেও ঘোষিত হইয়াছিল। এস্থলে তুলনায় সমালোচনা ধৃষ্টতামাত্র। উভয়েই কোবিদ, উভয়েই কর্ম্মী, উভয়েই বাঙ্গালীর অসীম শ্রদ্ধাভাজন। রামদাস বাবুর বহুপ্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনের' শোভাসংবর্দ্ধন করিয়াছিল।

রামদাস বাবুর 'ঐতিহাসিক রহস্য,' 'ভারত রহস্য' ও 'রত্নরহস্য' বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সমষ্টি। এই সকল প্রবন্ধে রামদাস বাবু সংস্কৃত-সাহিত্য-সাগর হইতে সযত্নে সংগৃহীত রত্নরাজি বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন। তাঁহার 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে গ্রন্থরচনাকাল পর্য্যন্ত উপহৃত উপাদানের সাহায্যে তিনি শাক্য- সিংহের জীবনী ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির, বিশ্লেষণ ও সংযোজন শক্তির ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। প্রত্নতত্ত্বে শেষ সিদ্ধান্ত নির্ণয় অসাধ্যসাধন। নূতন নূতন উপাদানের আবিষ্কারের ফলে পুরাতন মত পরিত্যক্ত হয়; সুতরাং পরবর্ত্তী আবিষ্কারের ফলে যদি রামদাস বাবুর কোন সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে না। যত দিন বাঙ্গলা সাহিত্য সমাদৃত হইবে ততদিন রামদাস বাবুর গ্রন্থের আদর অবশ্যম্ভাবী। তদীয় পুত্রগণ পিতৃদেবের গ্রন্থগুলির এই নূতন সংস্করণ করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সৃষ্টি-রহস্য।*

এই গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে—প্রাথমিক ত্রিতত্ত্ব :—আত্মস্থ, আত্মজ, আত্মানন্দ;

* সৃষ্টি-রহস্য—শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা, ৯১২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে এ,স্ সি, গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য এক টাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মৌলিক ত্রিতত্ত্ব :—সৎ-চিৎ-আনন্দ বা শব্দ-গতি-জ্যোতি; তৃতীয় অধ্যায়ে—জগতের দ্বিতীয়াবস্থা :—সত্ত্ব, রজ, তম; চতুর্থ অধ্যায়ে—জগতের তৃতীয় অবস্থা :—সত্ত্বা, শক্তি, বস্তু ও পঞ্চম অধ্যায়ে জগতের চতুর্থাবস্থা :—কারণ, কর্ম্ম ও আধার আলোচিত হইয়াছে।

বিষয় যে অত্যন্ত জটিল তাহা বলাই বাহুল্য। হিন্দুদর্শনে এই সকল বিষয় লইয়া যে আলোচনা আছে, তাহার অধ্যয়নই সময়সাপেক্ষ। বিশেষ এই সম্বন্ধে বহুবিধ মত ও মিমাংসাও বর্ত্তমান। এ অবস্থায় লেখিকা যেরূপ সরলভাবে এই জটিল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। অস্মদ্দেশে পূর্ব্বকালে বহু জ্ঞানানুরাগিণী মহিলা বিদ্যানুশীলনফলে অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও যে মহিলারা জ্ঞানতৃষ্ণা তৃপ্তির জন্য এরূপ আপাতত নীরস ও জটিল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। গ্রন্থশেষে লেখিকা বলিয়াছেন—"যাহা শ্রুতি, তাহাই স্মৃতি, তাহাই পুরাণ, তাহাই তন্ত্র। কাহাকেও উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। সমুদায়ই মহাবিজ্ঞানের মহান তত্ত্ব। কেবল দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থায় উহা রূপান্তরিত।" গ্রন্থে ইহা প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে।

নূতন।

——:০:——

(১)

কি সুন্দর ধরা—
অগণিত তরুলতা পত্রপুষ্প ভরা!
কি সুন্দর নীলাকাশ।
দিবালোকে সপ্রকাশ;
নিশায় জ্যোছনালোক, তারা হৃদিহরা।
বিহগের সুধাগানে
আনন্দ-হিল্লোল আনে;
শাখে শাখে ফুল কুল গাছ আলোকরা;
বিকশিত ফুলবাসে
মলয়ে মদিরা ভাসে;
বসন্তে শোভায় ঘুচে ধরণীর জরা।
চারিদিকে কি সৌন্দর্য্য—কি সুন্দর ধরা!

(২)

এরি মাঝখানে—
তৃষিত হৃদয় টানে হৃদয়ের পানে;
সুখতৃষ্ণা, শত আশা,
সীমাহীন ভালবাসা
পুলক-হিল্লোল আনে সুখালস প্রাণে;
কঠিন কঠোরে টুটি'
শোভারাশি উঠে ফুটি'
হৃদয় বিকশি' উঠে সুখে হৃদি-দানে;
আকুল-আহ্বানস্বর
প্লাবে দিগ্‌দিগন্তর,
সুখের আহ্বান ভাসে বিহগের গানে।
কি আনন্দ, সুখরাশি—এরি মাঝখানে!

(৩)

ধরা শোভা ঘর ;
অনন্ত সুষমা হেথা ফুটে নিরন্তর।
নব শ্যাম দূর্ব্বাদলে
নিশার শিশির ঝলে—
নিশা-শেষে ফুটে যবে নব রবিকর ;
দিবালোকে শত শোভা
মানস লোচন লোভা,
দীপ্ত রবিকরে শোভে সুনীল অম্বর ;
ফুটে ফুল, গাহে পাখী,
শোভাময় শোভে শাখী ;
সূর্য্যাস্তে বর্ণের খেলা মেঘমালা'পর।
অনন্তসুষমাময় ধরা শোভাঘর।

(৪)

ত্যজিতে কে চায়,
বিপুলপুলকভরা সুখের ধরায় ?
হেথা সুখ হৃদি ভরে,
সুখে সুখ নাহি ধরে ;
আশার উজল আলো হৃদি উজলায়
বিরহে ব্যাকুল ব্যথা
মিলনের আকুলতা !
জীবনে আঁধার কোথা ? সুখালোক ভায় !
হেথা অগণিত সুখ,
প্রেমে সুখে ভরা বুক ;
জীবনে আনন্দস্রোতঃ উছলিয়া যায়।
এমন সুখের ধরা ত্যজিতে কে চায় ?

মৃত্যু-মিলন।

—:০:—

দশম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শুভ যাত্রা।

—০—

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। রজনীর গাঢ় ছায়ায় প্রাসাদ আবৃত। এক পার্শ্বে একটি কক্ষে রাজা ও শঙ্কর সিংহ পরামর্শ করিতেছেন। রাজার আদেশে সে কক্ষের পার্শ্ববর্তী সকল কক্ষে আলোক নির্ব্বাপিত। কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ। প্রহরীর প্রতি আদেশ আছে,—সে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কাহাকেও রাজার সন্ধান না দেয়; আর কেহ কোন বিশেষ প্রয়োজনে আসিলে প্রহরী আগন্তুককে সোপানমুখে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আসিয়া সংবাদ দেয়। এত সতর্কতাতেও যেন উভয়ের আশঙ্কা দূর হয় নাই; উভয়ে অতি মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতেছিলেন।

পর দিন প্রত্যূষে শঙ্কর সিংহ দূতরূপে যাত্রা করিবেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজপুত-সঙ্ঘ-সংগঠনের প্রস্তাব করিবেন, উদ্দেশ্য—রাজপুতের বিপদে সাহায্য দান করা, বিপন্ন রাজপুত রাজ্যের সহায়তা করা, রাজপুতগৌরবের সমুজ্জ্বলতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

শঙ্করসিংহ কয়দিন পূর্ব্বেই যাত্রা করিতেন। কিন্তু রাজধানীতে বিসূচিকার ব্যাপ্তি-নিবারণ-চেষ্টায় রাজার অবকাশ ছিল না; তাই তাঁহার গমন ঘটে নাই। আজ কয় দিন ব্যাধির প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে। আর এই কয় দিন উভয়ে পরামর্শ করিতেছেন। গমন-পথ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রস্তাব-প্রণালী পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই বিশেষ বিবেচনা ও বিচার চলিতেছিল। যদি কেহ মোগল-শক্তির বিরোধী হইতে ভয় করেন,—কেহ নব-সংস্থাপিত কুটুম্বিতার বন্ধন শিথিল হইবে, আশঙ্কা করেন—সেইজন্য রাজা শঙ্কর সিংহকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, সকলকে বুঝাইতে হইবে,—মোগল-শক্তির বিরোধী হওয়া এ মিলনের উদ্দেশ্য নহে; রাজপুত-গৌরব, রাজপুত-রাজশক্তি অনাহত ও সমুজ্জ্বল রাখাই সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজা বুঝিয়াছিলেন, কোনরূপে সম্মিলন—রাজপুত-সঙ্ঘগঠন

সুসিদ্ধ করিতে পারিলে, ক্রমে প্রয়োজনানুসারে কার্য্যসিদ্ধি সম্ভব হইবে। প্রথম প্রবর্ত্তনই দুঃসাধ্য।

উভয়ে এই বিষয়ে কথা হইতেছিল। উভয়েরই মুখে চিন্তার প্রগাঢ় ছায়া; উভয়েরই হৃদয়ে আশায় ও আশঙ্কায় দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।

সহসা দ্বারে করাঘাতশব্দ শ্রুত হইল।

উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?

উত্তর আসিল, "আমি প্রহরী।"

বিশেষ প্রজোজন ব্যতীত প্রহরী আসিবে না, বুঝিয়া রাজা শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, "শঙ্করসিংহ, দেখ প্রহরী কি চাহে।"

শঙ্কর সিংহ দ্বার মুক্ত করিয়া প্রহরীকে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রহরী বলিল, "মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় রাজদর্শনপ্রার্থী। তিনি সোপান-মূলে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি বিশেষ আবশ্যক কার্য্যে রাজদর্শন করিতে চাহেন।"

শুনিয়া শঙ্কর সিংহ রাজার দিকে চাহিলেন।

রাজা বৃদ্ধ পুরোহিতের সহসা আগমনের সংবাদে বিস্মিত হইলেন, প্রহরীকে বলিলেন, "তাঁহাকে লইয়া আইস।"

প্রহরী চলিয়া গেল।

শঙ্কর সিংহ ও রাজা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধপুরোহিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

বৃদ্ধ স্থির স্বরে রাজাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "আপনার আগমন-বিষয় আমরা পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারি নাই।

"আমার এখন আসিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তাই আমাকে আসিতে হইয়াছে।"

পুরোহিত পুনরায় বলিলেন, "আমি কয়টি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অন্য তীর্থে যাইতেছিলাম। সীমান্ত-মধ্যবর্ত্তী পথে যাইতে শুনিলাম, তুমি প্রজাপালনে সচেষ্ট

হইয়াছ। প্রজারা সে কথা বলিতে আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অনেক দুঃখ ভুলিতেছে। কিন্তু সে কথা শুনিয়া আমার মনে যে আনন্দের উদয় হইল, তাহার তুলনায় তাহাদের আনন্দ প্রভাকর-কিরণের নিকট খদ্যোতের ক্ষণবিধ্বংসী দীপ্তিমাত্র। আমি তোমার জন্মের পর দিন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলাম। সে দিন মনে করিতে পারি নাই, এক দিন মনের দুঃখে তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে হইবে।"

রাজা বলিলেন, "কঠিন ব্যাধির জন্য তীব্র ভেষজ আবশ্যক। সে ভেষজের জন্য রোগীর চিকিৎসকের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। আপনি আমার জন্য সেইরূপ ভেষজ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তাহাতে আমি যদি ব্যাধিমুক্ত হইতে পারি, তবে আপনার আনন্দ যেরূপ স্বাভাবিক—আমার কৃতজ্ঞতাও সেইরূপ স্বাভাবিক।"

"আমি মনের কষ্টে সে সকল কথা বলিয়াছিলাম। আমি তোমার পুরোহিত; তোমার হিত-সাধনই আমার কর্ত্তব্য। আমি সেই কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি সে কষ্ট ভুলিতে পারি নাই; এখন তোমার প্রজারঞ্জনের কথা শুনিয়া সে ব্যথা অপনীত হইল; ভাবিলাম, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পুনরায় তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইব। তাহার পর রাজধানী অভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই তোমার নব নব কীর্ত্তিকথায় চিত্ত পুলকিত হইতে লাগিল। আজ নগরে নগরে—গ্রামে গ্রামে—প্রান্তরে প্রান্তরে তোমার কীর্ত্তি-কথার আলোচনা। আজ প্রজা উৎফুল্লচিত্তে তোমার জয়গান করিতেছে। বৎস, আজ এ রাজ্য তোমার পুণ্যে পুণ্যময় হইয়াছে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত আবেগে কোমল হইয়া আসিতে লাগিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আপনি পুনরায় তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইবেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সেই সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছিলাম। যদি ভগবান কোন বিঘ্ন না ঘটান, তবে আবার বাহির হইব।"

"শীঘ্রই কি যাত্রার সম্ভাবনা?"

"অতি শীঘ্র।"

তিনি কি প্রকারে পার্ব্বতীর কথার উত্থাপন করিবেন, রাজা তাহা ভাবিলেন। তিনি মনে করিলেন, বৃদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে অবশ্যই তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন। তথাপি তিনি বলিলেন, "কিছু বিলম্বে কি অসুবিধা হইবে?"

"কেন?"

"গৃহে শোকাতুরা কন্যা বোধ হয় আপনাকে নিকটে পাইলে অনেক সান্ত্বনা পাইবে।"

"সে শান্ত হইয়াছে। তোমার সাগ্রহ দয়ার কথা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তুমি দেখিয়া আসিয়াছ, শোকের প্রথম উচ্ছ্বাসের পর সে শান্ত হইয়াছে। আমি তাহার শিক্ষার ও সংযমের সার্থকতায় সুখী হইয়াছি। শোকের প্রথম প্রবল আঘাত কেবলতাহাকে বিচলিত করিয়াছিল।"

"তাহাকে কি একাকিনী রাখিয়া যাইবেন?"

"বৎস, কে কাহাকে রাখে? সে যে কত যত্নে মাতৃহীন ভ্রাতাকে নিকটে রাখিয়াছিল! রাখিতে পারিল কি? আমি তাহাকে স্বাবলম্বনই শিখাইয়াছি।"

রাজা আর কিছু বলিলেন না;

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "বিশেষ সে দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইতেছে। ব্যথিতদিগের জন্য আশ্রম-সংস্থাপন তাহার বহুদিনের স্বপ্ন। শুনিলাম, তোমারা অনুগ্রহে সে স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সে সেই আশ্রমে সেবাব্রত গ্রহণ করিতে চাহিতেছে। যে একা থাকিতে পারে না, সে কিরূপে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে?"

"পার্ব্বতী কি স্বয়ং সে আশ্রমের ভার লইতে চাহিতেছে?"

"হাঁ। আমি ভাবিয়াছিলাম, ফিরিয়া তাহার বিবাহ দিব। আমি পাত্রের সন্ধান করিতেছিলাম। এখন সে ব্যাপার আরও জটিল হইয়া উঠিল। পার্ব্বতী যদি এই কার্য্যে ব্রতী হয়, তবে এই কার্য্যে তাহাকে উৎসাহিত করিবে, সাহায্য করিবে—এমন পাত্রের সন্ধান করিতে হইবে।"

"এ ব্রত কি রমণীর উপযোগী হইবে?

"এ ব্রত রমণীরই উপযোগী।"

"কিন্তু রমণীর ক্ষুদ্র শক্তি কি এ কার্য্য সাধনে সমর্থ হইবে?"

"তোমার কথায় আমি বিস্মিত হইলাম। রমণী শক্তিরূপিণী—শক্তির আধার। কিন্তু যেমন জল যত গভীর তত স্থির—তত স্নিগ্ধ, তেমনই সে শক্তি প্রাচুর্য্যহেতু সহসা বিচলিত হয় না; তাই সাধারণ লোক—নরচরিত্রানভিজ্ঞগণ সহসা তাহার চরিত্র অনুভব করিতে পারে না। লোকশিক্ষক হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সে কথা বুঝাইয়াছেন। অসুরনাশ যখন দেবতার দ্বারা সম্ভব হয় নাই, তখন দেবীর

দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। অমঙ্গল-নিবারণ যখন পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য, তখনও রমণীর পক্ষে সহজসাধ্য।"

রাজা মুগ্ধনেত্রে পুরোহিতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পুরোহিত বলিতে লাগিলেন, "রমণীর শক্তি হইতে স্নেহ—প্রেম—ভালবাসা এ সকলের উৎস উৎসারিত হয়—জগত মঙ্গলময় হয়। প্রকৃতি শক্তিময়ী; রমণী তাহারই অংশ। প্রকৃতি যখন তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া উঠে তখনই জগতের ধ্বংসের বিষাণ বাজিয়া উঠে। কিন্তু চাহিয়া দেখ, প্রকৃতি স্নেহময়ী, কোমলা, সরলা, সুশীলা, সর্ব্বসৌন্দর্য্য-বিভূষিতা। কোন্ দুষ্কর কার্য্য রমণীর সাধ্যায়ত্ত নহে? মা জগজ্জননী—জগদ্ধাত্রীরূপে সংসারপালন করেন, আবার ছিন্নমস্তারূপে আপনি আপনাকে ধ্বংস করেন—সে ধ্বংস কেবল নূতন সৃষ্টির সূচনা। আজ রাজপুতগৌরব ধূল্যবলুণ্ঠিত—কারণ, রাজপুতরমণী মোগলের বিলাসের বশীভূতা হইয়া শক্তি হারাইতে বসিয়াছে। যতদিন সে শক্তি অনাহত ছিল, ততদিন রাজপুতের দুর্দ্দশা ঘটে নাই। যদি সে শক্তি আবার জাগিয়া উঠে, তবেই এ দুঃখনিশা পোহাইবে। সে দিন মঙ্গলময়ী—রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া মঙ্গলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন। মা, সে দিন আসিবে কি?"

পুরোহিতের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি যুক্তকরে ভক্তিভরে উদ্দেশে শক্তিকে প্রণাম করিলেন।

পুরোহিতের কথা শুনিয়া রাজার শিরায় শিরায় রক্ত-স্রোতঃ প্রবলবেগে বহিতে লাগিল; আর—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, রাজপুতরমণীর শক্তির সহায়তা পাইলে তিনি কি না করিতে পারিতেন? তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পুরোহিত বলিলেন, "বৎসগণ, আমি তোমাদের কার্য্যে বাধা দিয়াছি। আমি চলিলাম।"

রাজা বলিলেন, "আপনি আমার কর্ত্তব্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করাইয়াছেন। আপনার রোপিত বৃক্ষের ফলে আপনার আনন্দ হইবার কথা। আপনি আমাদের প্রস্তাব শ্রবণ করুন।"

পুরোহিত উঠিয়াছিলেন, পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন।

রাজা তখন তাঁহার প্রস্তাবের কথা, শঙ্কর সিংহের সঙ্কল্পিত দৌত্যের কথা—সব পুরোহিতকে বলিলেন।

বৃদ্ধ রাজার কার্য্য-প্রণালীর সমালোচনা করিয়া কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। যে সকল সম্ভাবনার কথা রাজার মনে হয়

নাই, বৃদ্ধ সেই সকলের আলোচনা করিলেন।

তাহার পর পুরোহিত, রাজা ও শঙ্কর সিংহ—তিন জনে পরামর্শ করিয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিলেন।

বৃদ্ধ গমনোদ্যোগী হইলেন। রাজা ও শঙ্কর সিংহ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, "বৎস, তুমি দুষ্করকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। বিধাতা তোমার সহায় হউন; আমি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি, এখন ভয়ই রাজপুতের প্রধান শত্রু; তাহাকে জয় করিতে পারিলে আর কিছুই অজেয় রহিবে না, তাহার স্পর্শ বিষবৎ কার্য্য করে; তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। রাজপুতের তাহাই হইতেছে।"

তিনি শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার যাত্রা শুভযাত্রা হউক।"

বিচ্ছেদে।

—:০:—

হে আমার জীবনের আরাধ্য দেবতা!
বুঝি নাই এতদিন কত ভালবাসি,—
আজি তব অদর্শনে চিনেছি হৃদয়
তাই ফুরায়েছে সাধ ফুরায়েছে হাসি।
স্মৃতি আসি লুটাইছে মনের দুয়ারে।
আমার এ প্রেমব্রত হবে কি বিফল?
অধীর উন্মাদ আমি তীব্র যাতনায়
সম্বল করেছি সুধু নয়নের জল!

শ্রীদেবীরাণী ঘোষ।

বেদ কি? *

একদিন এই ভারতের প্রতি নগর, প্রতি গ্রাম, প্রতি পল্লী, প্রতি গৃহ পবিত্র ঋষিগণের বদনসমীরিত উদাত্ত অনুদাত্ত, স্বরিত-রূপ স্বরগ্রামমূর্চ্ছনামূর্চ্ছিত সাম গীতির সুমধুর স্বরে মুখরিত হইত। ঋষিতনয়গণ গর্ভাষ্টম বয়সে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুগৃহে অবস্থান করতঃ সাঙ্গ সরহস্য সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করিয়া, সমাবর্ত্তনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। পরম পবিত্র ব্রাহ্মণ্যের পূর্ণ প্রভায় তাঁহাদিগের বদনমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইত। সরলতার ও বিলাসবিমুখতার একত্র সমাবেশ সেই আর্য্যতনয়দিগের হৃদয়েই লক্ষিত হইত। মৃগাজিন বা কুশশয্যায় শয়ন, বল্কল পরিধান, প্রকৃতিপরিত্যক্ত ফলমূল অশন, ইঙ্গুদী ফলরসে অভ্যঞ্জন, স্বহস্তলিখিত তালপত্রবিনির্ম্মিত পুস্তক অধ্যয়ন, বংশনির্ম্মিত লেখনী, হরিতকীরসাপ্লুত মসী, দর্ভময়ী মেখলা প্রভৃতির আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তাঁহারা আহার বিহার প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য পরাধীনতা-স্বীকার করিতে অতিশয় কুণ্ঠিত হইতেন।

তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, প্রকৃতি আমাদিগের জন্য যাহা দিয়াছেন, তাহাতেই আমরা পরিতৃপ্ত থাকিব। তদতিরিক্ত বস্তু-সংগ্রহে অভিনিবেশ করিলেই আমা-দিগের পরবশ্যতাগ্রহণ করিতে হইবে; অর্থের জন্য লালায়িত হইতে হইবে। বিলাসিতা-পরিতৃপ্তির জন্য পরগৃহে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন অপেক্ষা উহাকে দূরে রাখাই ভাল।

আর আধুনিক নব্যভারতের ব্রাহ্মণগণের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণতনয়ের, কি শোচনীয় পরিণতিই না ঘটিয়াছে! এখন তাঁহারা বলেন :—

"শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে!
এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি,
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে!
স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈ'তেখানা,
তেজহীন ব্রাহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলষ!"

তাই আজ বেদসম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিবার অভিলাষে এই প্রবন্ধের অব-

---

* বারাণসীস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

আলোচনা করিতেছি। বেদবিষয়ে আমরা অনভিজ্ঞ হইলেও তাহার আলোচনা করিবার বাসনা স্বাভাবিক। কারণ, আলোচনাই জ্ঞানবিকাশের প্রকৃষ্ট পন্থা।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বেদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়াছেন। তাঁহারা বেদের দুরূহার্থ ব্যাখ্যা করিতে জীবনের প্রায় সমস্ত অংশ অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি ছয়খানি দর্শনই তাহার সমুজ্জ্বল প্রমাণ। তন্মধ্যে কপিল, ব্যাস ও জৈমিনিই বেদ লইয়া অধিক আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আবার ব্যাস-দেব ও কপিল উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন। জৈমিনি কেবল মন্ত্র-ভাগের ব্যাখ্যায় সবিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন; ইহা তৎপ্রণীত মীমাংসা দর্শন পাঠ করিলেই অনুমিত হয়।

মহামতি জৈমিনি ব্রাহ্মণ ভাগের মীমাংসা করিতে গিয়া যে সূত্রাবলির রচনা করিয়া যায়েন, সবর স্বামী সেই সূত্রসমূহের ভাষ্য করিয়া সমগ্র মীমাংসা দর্শনটিকে এক মহাসাগরে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ অতি বৃহৎ এবং অত্যন্ত উপাদেয়, কিন্তু ইহার পঠনপাঠন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মীমাংসা শাস্ত্র যথারীতি গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিয়াছেন, এমন লোক সম্প্রতি বিরল হইয়া পড়িয়াছেন। জৈমিনি ব্রাহ্মণভাগের উপর যত দুর আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, উপনিষৎ ভাগের উপর সেরূপ আস্থা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি উপনিষদের অর্থবাদত্ব স্বীকার করিলেও বিধি-বাক্যের সহিত একবাক্যতা তাহার প্রামাণ্য ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ট রামায়ণে ঋষি বলিয়াছেন—

"উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জায়তে পরমং পদং॥"

পক্ষী যেমন উভয় পক্ষ বিস্তার করিয়াই গগনমার্গে বিচরণ করে, সেইরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম এই উভয়ই পরমপদ প্রাপ্তির কারণ। এই বাক্য অবলম্বন করিয়াই জৈমিনী কর্ম্ম মীমাংসা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাই মীমাংসা দর্শন নামে অভিহিত।

তিনি বলেন, কর্ম্ম অর্থাৎ যাগাদি দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে; কেন না, বেদ বলিয়াছেন, "স্বর্গকোমোঽশ্বমেধেন যজেত" অশ্বমেধ যাগ স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু। বৈদান্তিকেরা বলেন, তাহা নহে; কর্ম্ম সহকারী মাত্র, জ্ঞানই পরমপদ-প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। কেন না, বেদ বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, পরমপদ প্রাপ্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই। কর্ম্মযাগাদি করিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয়; অনন্তর জ্ঞান হইলেই মুক্তি। বৈদান্তিকের এই সমাধান অতি উত্তম, অতি

উপাদেয় যুক্তিপূর্ণ। কর্ম্ম না করিলে যে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

বেদ কি ? ইহা বলিবার পূর্ব্বে বেদের একটি লক্ষণ বলা আবশ্যক। কেন না, ন্যায়বিদ্ বলিয়াছেন, "লক্ষণ প্রমাণাভ্যামেব বস্তুসিদ্ধিঃ।" লক্ষণ ও প্রমাণ দ্বারাই বস্তু সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে বেদের লক্ষণ কি এবং প্রমাণই বা কি, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায়, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিনটি প্রমাণ কোন কোন দার্শনিক স্বীকার করিয়াছেন, (যেমন কপিল "দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থ পরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা, তৎ সাধকতমং যৎ, তৎ ত্রিবিধং প্রমাণং" সাংখ্য দর্শন। ১।৮৭।পতঞ্জলি "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি" যোগদর্শন, সমাধিপাদ।৭।) এবং সেই ত্রিবিধ প্রমাণের অস্তিত্বপ্রমাণই বেদ, তাহা হইলে মনু প্রভৃতি স্মৃতিও বেদ হইয়া দাঁড়ায়। বেদ ও স্মৃতি এক নহে। বেদ হইতে স্মৃতির আবির্ভাব। সম্যক্ প্রত্যক্ষানুভবের সাধনই আগম। ঈদৃশ আগমত্ব মনু প্রভৃতি স্মৃতিরও আছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে বেদের লক্ষণ হইল না। এখন যদি ঐ লক্ষণেই অপৌরুষেয়ত্ব বিশেষণাদি দেওয়া যায়, তাহা হইলেও অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। বেদ পরমেশ্বরপ্রসূত। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তস্যৈতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বাসিতমেতদ্ যদৃগ্ বেদ সাম বেদ যজুর্ব্বেদার্থবেদাঃ"। বলা যাইতে পারে, শরীরধারীজীবনির্ম্মিত হইলেই পৌরুষেয় হইবে, পরমেশ্বর শরীরী নহেন, অতএব অপৌরুষেয় বলিলে দোষ কি ? কিন্তু এই সমাধানও সমীচীন নহে। কেন না, বেদ বলিয়াছেন, "সহস্র শীর্ষ পুরুষঃ —সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" পরমেশ্বর সহস্র মস্তকে বিরাজিত হইয়া থাকেন, তাঁহার সহস্র নয়ন এবং সহস্র পদ। শরীরী না হইলে এ উক্তির কোন অর্থ থাকে না। বুঝিলাম, পরমেশ্বরেরও শরীর আছে, তাঁহারও হস্তপদাদি আছে। কিন্তু তাঁহার শরীর কর্ম্মফলরূপ শরীর নহে, তিনি আমাদের ন্যায় সৎ বা অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না। জীবগণ সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করে, সেই জন্য তাহাদিগকে কর্ম্মফলে শরীরধারণ করিতে হয়। আমি যে এই অর্থে অপৌরুষেয় বলিয়াছি, ইহাও বলা সঙ্গত নহে। তুমি যে শ্রুতি প্রমাণ দিয়া বেদের কর্ত্তা পরমেশ্বর বলিতেছ, সেইরূপ অন্যান্য শ্রুতি আবার অগ্নি, বায়ু, আদিত্য প্রভৃতি জীব বিশেষকেই বেদের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন; যেমন "ঋগ্বেদ এবাগ্নেরজায়ত, যজুর্ব্বেদোবায়োঃ, সামবেদ আদিত্যাৎ" অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং আদিত্য হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বলিতে হয়, মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিই বেদনামে অভিহিত। আপস্তম্ব বলিয়াছেন "মন্ত্র

ব্রাহ্মণয়োর্বেদ নাম," বৌধায়ন বলিয়াছেন "মন্ত্রব্রাহ্মণমিত্যাহুঃ" যৌমুনি বলিয়াছেন "মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মকঃ শব্দরাশির্বেদঃ।" এবং অন্যান্য স্থলেও বেদের এইরূপই লক্ষণ দেখা যায় যথা :—

"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োরাহু বেদশব্দং মহর্ষয়ঃ
বিনিয়োক্তব্য রূপঃ যঃ স মন্ত্র ইতি চক্ষতে।
বিধিস্তুতিকরং শেষং ব্রাহ্মণং কথয়াতিহি।" ইত্যাদি

ইহার ভাবার্থ এই যে, মহর্ষিগণ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে "বেদ" বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে যে অংশে বিনিযোক্তব্য রূপ অর্থাৎ যজেত, যাগ করিবে, (উপাসীত উপাসনা করিবে) ইত্যাদি বুঝায়, তাহাকে মন্ত্র এবং বিধির স্তুতিকর শেষ ভাগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে। যজেত, উপাসীত, কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিধিবোধক বাক্যই বিনিয়োগ রূপ এবং ইহাকেই জৈমিনি প্রেরণা অর্থে ব্যবহৃত করিয়াছেন। বেদের দুইটি ভাগ বা অংশ। এক মন্ত্র, অপর ব্রাহ্মণ। ঋগ্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা প্রভৃতি সংহিতাভাগ মন্ত্র এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভাগই ব্রাহ্মণ। এই উভয় ভাগই বেদ নামে আখ্যাত। কোন কোন উপনিষৎ ব্রাহ্মণের অন্ত বা শিরোভাগ, এবং কোন কোন উপনিষৎ মন্ত্র ভাগের অন্তর্গত। ঈশাবাস্যোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ প্রভৃতি মন্ত্র ভাগের অন্তর্গত; এবং ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষৎ ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্নিবিষ্ট।

মাধ্যন্দিনী সংহিতার এবং শ্বেতাশ্বতর সংহিতার শেষ অংশ ক্রমে ঈশাবাস্যোপনিষৎ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ নামে প্রখ্যাত। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের শেষ আটটি প্রপাঠক এবং কাণ্ব ব্রাহ্মণের শেষ ছয়টি অধ্যায় ক্রমে ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যকোপনিষৎ আখ্যা ধারণ করিয়াছে। এইরূপ সমস্ত উপনিষৎ বেদেরই অবসান ভাগ। কেহ কেহ উপনিষদের বেদত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু তাঁহারা যদি বেদান্ত শব্দের উৎপত্তিগত অর্থের প্রতি একটু মনোযোগসহকারে দৃষ্টি করেন, তবেই আপনাদের ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারে বলিয়াছেন, "বেদান্তোনাম উপনিষৎ প্রমাণং, তদুপকারীনি শারীরক সূত্রাদীনি।" বেদের অন্ত বেদান্ত, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপনিষৎ বেদান্ত শব্দের মুখ্য অর্থ। তদুপকারীনি অর্থাৎ উপনিষদের অর্থবোধের অনুকূল শারীরক সূত্র প্রভৃতি, এবং উপনিষদের অর্থসংগ্রাহক ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গৌণার্থ। এইরূপ মুখ্য ও গৌণ ভেদে বেদান্ত শব্দের দ্বিবিধ অর্থ সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উপনিষৎ শব্দের প্রধান অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থও উপনিষৎ নামে খ্যাত। "সদন্থ বিশরণ গত্যবসাদনেষু" অর্থাৎ সদ্‌ধাতু বিশরণ গতি অবসাদন অর্থে পঠিত। উপ, নি, পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ করিলে উপনিষৎ পদ সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মবিদ্যা সংসারবীজভূত অবিদ্যাদি দোষের বিশরণ অর্থাৎ বিনাশ করে; এই জন্য উপনিষৎ নামে আখ্যাত। অথবা পরব্রহ্মপ্রাপ্তি করায় কিম্বা সংসার-সারতা বুদ্ধিকে অবসন্ন অর্থাৎ শিথিল করে বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎবাচ্য। এই ব্রহ্ম বিদ্যাই পরা বিদ্যা বা শ্রেষ্ঠা বিদ্যা; কারণ, এই ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সংসারনিবৃত্তি অর্থাৎ অপবর্গ হইয়া থাকে। সুতরাং এই স্থানেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক দুঃখত্রিতয়ের নিবৃত্তি হয়। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, উপনিষৎ আখ্যায় আখ্যাত গ্রন্থ বা শব্দসমূহপ্রতিপাদিত ব্রহ্মবিষয়ক বিজ্ঞানই পরা বিদ্যা, এবং ঋগ্বেদাদি যাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, উহার জ্ঞান অপরাবিদ্যা। মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যৎ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৫) বেদার্থাভিজ্ঞ পরমার্থদর্শী পুরুষগণ বলিয়াছেন, পরা এবং অপরা এই দুই প্রকার বিদ্যাই জ্ঞাতব্য। তাহার মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, ও অথর্ব্ববেদ, এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষই হইল অপরা। অর্থাৎ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গযুক্ত চারি বেদ—তথাবিধ শব্দরাশির বিজ্ঞান এবং তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের বিজ্ঞান অপরা বিদ্যা। আর যাহার দ্বারা সেই অক্ষর অর্থাৎ পরমাত্মা অধিগত হয়, তাহাই পরাবিদ্যা। শ্রুতি স্থানান্তরে বলিয়াছেন "নাবেদ বিন্মনুতে তংবৃহন্তম" যিনি বেদ জানেন না, তিনি সেই বৃহৎ পরমাত্মাকে জানিতে পারেন না। এই উপনিষৎ অনেকগুলি; কিন্তু পরম পূজ্যপাদ ভগবান শঙ্করাচার্য্য ঈশ, কঠ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরিয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই দশখানি উপনিষৎ ভিন্ন শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, কৌষিতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ, মৈত্রেয্যুপনিষৎ, আরুণ্যেয্যুপনিষৎ প্রভৃতি আরও অনেকগুলি উপনিষৎ আছে। ইহারা সকলেই নির্গুণব্রাহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত করে। অথর্ব্ববেদের সৌভাগ্য-কাণ্ডেও অনেকগুলি উপনিষৎ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অধিকাংশই সগুণ ব্রাহ্মবিদ্যার উপদেশে পরিপূর্ণ। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাঁহার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম বেদান্তবক্তৃতায়

('কেনোপিপ লেক্‌চারে') উপনিষৎ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা উপনিষদের গূঢ় অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিকরিবেন। উপনিষদের মর্ম্ম বলিতে গেলে এই প্রবন্ধ একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

বেদের লক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং উপনিষৎ বেদ হইতে ভিন্ন নহে, তাহাও বলিলাম। এক্ষণে বেদের প্রমাণ কি, তাহার একটু আলোচনা করা যাউক। ছান্দোগ্যোপনিষদে "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থম্" (ছা উ।৭।১।২।) হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করি, এইরূপ শ্রুতি দেখা যায় এবং "বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ," বেদই দ্বিজাতিদের নিঃশ্রেয়সকারী এইরূপ স্মৃতিও আছে। অতএব বেদ নিষ্প্রমাণ নহে। বেদ প্রমাণগ্রাহী এই বচন বোধ হয় সমীচীন নহে। কারণ, ছান্দোগ্যের শ্রুতি বেদের অন্তর্গত। আপনি আপনার প্রমাণ হয় না; এবং বেদের প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইলে তদন্তর্গত বাক্যের প্রমাণতা, আর এই বাক্যের প্রমাণাভাব বেদের প্রামাণ্য; সুতরাং আত্মাশ্রয় দোষও হইবে। আর বেদমূলক বলিয়াই স্মৃতি প্রামাণ্য। যতক্ষণ বেদের প্রামাণ্য নিশ্চিত না হইল, ততক্ষণ স্মৃতি তাহার জনক বেদকে প্রমাণিত করিতে পারিবে কেন? কোন অজ্ঞাত বালক যদি বলে, আমি ব্রাহ্মণতনয়, তবে যতক্ষণ বালকের পিতা পরিজ্ঞাত না হয়েন, ততক্ষণ সেই বালক ব্রাহ্মণতনয়রূপে পরিগৃহীত হয় না। অগ্রে তাহার পিতা ব্রাহ্মণ কি না, তাহাই বিচার করিয়া পরে তাহার বিচার। বেদে প্রত্যক্ষ প্রভৃতির আশঙ্কাই হওয়া উচিত নহে। বেদবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধি সার্ব্বজনীন হইলেও, উহা "সুনীল গগনের" ন্যায় ভ্রান্তিবিলুণ্ঠিত, অর্থাৎ আকাশ স্বতঃসিদ্ধ নীরূপ হইলেও, যেমন আমরা ভ্রান্তিবশে উহাতে নীলত্বের আরোপ করিয়া সুনীল আকাশ প্রভৃতি বলিয়া থাকি, সেইরূপ বেদবিষয়ক প্রত্যক্ষও ভ্রান্তিমাত্র। প্রত্যক্ষই যদি ভ্রান্তিমাত্র হইল, তাহা হইলে প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের কথাই নাই। কারণ, অনুমানের কারণ ব্যাপ্তি জ্ঞান, ব্যাপ্তি জ্ঞান না হইলে অনুমিতি হয় না। যেমন আমরা পর্ব্বতে অবিচ্ছিন্নমূল ধূমরেখা দর্শন করিয়া পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করিয়া থাকি; এই অনুমান করিবার পূর্ব্বে আমরা মহানসাদিতে বহ্নি ও ধূমের একত্র অবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং এই প্রত্যক্ষ হইতে যেস্থানে যেস্থানে ধূম, সেই সেই স্থানে বহ্নি এই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে জাগরূক আছে; তাহাতেই আজ

সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিতেছি। এই যে যেস্থানে ধূম, সেইস্থানে বহ্নি এই জ্ঞান—ইহাকেই ব্যাপ্তি জ্ঞান কহে। অতএব অনুমান প্রত্যক্ষমূলক—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব বেদ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিষয় হইলে, অনুমানেরও অবিষয়; ইহা অনায়াসেই সিদ্ধ হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রধর কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

শোভন।

তরুনারুণকর নীহার-হারে পড়ি'
উষারে করে শোভাশালিনী।
সরস বরষণে জ্যোছনা-পরশনে
মধুর জাগে কিবা যামিনী।
তপোজ স্বেদ-কণা হোমের আলো মাখি'
ঋষির ভাল করে শোভন।
পুণ্যালোক ভাতে নয়নজলে যবে,
মানব আঁখি মনোমোহন।

শ্রীকালিদাস রায়।

পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু।

২

ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও এ দেশে জ্ঞানের যে বর্ত্তি জ্বালিলেন, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইল না। তাঁহাদের স্বনামধন্য শিষ্যগণ এই কার্য্যে প্রাণমন নিযুক্ত করিলেন। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি তাঁহাদের কার্য্য করিতে লাগিলেন। এস্থলে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা উচিত মনে করি; এই উন্নতি অথবা তথাকথিত উন্নতির দিনে আর একটি দিকে দেশীয় পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় সভ্যতার ভিত্তি দৃঢ় করা হইল। স্ত্রী-শিক্ষার কথা বলিতেছি। নূতন আদর্শের আলোকে স্ত্রীলোকের অজ্ঞতা বড়ই বিসদৃশ দেখাইতে লাগিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহামতি বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় দেশীয় পণ্ডিত এবং অন্যান্য অনেক গণ্যমান্য লোক যখন ইহাতে উৎসাহদান করিলেন, তখন কি আর বলিতে হইবে যে ইংরেজী শিক্ষার পাইলে কিরূপ জোরে হাওয়া লাগিয়াছিল?

এই সকল শক্তি সমাজদেহের উপর ক্রিয়া করিয়া সমাজকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। যুবকেরা দেশের আচারে বীতশ্রদ্ধ হইল। তাহারা শুধু দেশীয় আচার পরিত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, ভিন্ন দলের নিকট এই বিষয় লইয়া বড়াই করিয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। একবার কতক যুবক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বাজার হইতে মুসলমানের দোকানের মাংস কিনিয়া আনিয়া খাইতেছিল। তখন কৃষ্ণমোহন বাড়ী ছিলেন না। আহার শেষ হইলে মাংসের হাড়গুলি প্রতিবেশী হিন্দুদের বাড়ীতে ফেলিয়া দিয়া এই যুবকেরা চীৎকার করিতে লাগিল, "ওই গোহাড়, ওই গোহাড়।" এইরূপে উত্যক্ত হইয়া প্রতিবেশীরা কৃষ্ণমোহনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং কৃষ্ণমোহনের বাড়ীর লোকের উপর তর্জ্জনগর্জ্জন করিল। ততক্ষণে এই যুবকগণ চম্পট দিয়াছেন। রাত্রিতে যখন কৃষ্ণমোহন গৃহে ফিরিলেন, তখন সে গৃহে আর তাঁহার স্থান হইল না। তখনকার শিক্ষিতযুবকদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার এই স্থানেই শেষ নহে। "সাহেবেরা" মদ খায়, অতএব মদ খাওয়াই সভ্যতার লক্ষণ। অনেক যুবক গোলদিঘীতে বসিয়া, আড্ডা করিয়া, মদ খাইত। সে সময় সুরাপান সম্বন্ধে এতই স্বেচ্ছাচারিতা ছিল যে,

অনেক ভাল ভাল লোকও মদ্যপান করিতেন। রাজনারায়ণ বাবুর 'সেকাল ও একালে' এবং তাঁহার 'আত্মজীবনচরিতে' এই সময়ের একখানি উৎকৃষ্ট ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় নাকি নিয়মিত মদ্যপান করিতেন। রাজনারায়ণ বাবু ও সুরাপান অভ্যাস করিয়াছিলেন। অনেকে সুরাপান করাই কুসংস্কারবর্জ্জনের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন। এ দেশীয় লোকে সুরাপানকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং ঐ সুরাপান করিয়াই দেখাইতে হইবে যে, আমরা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীব নহি। এইরূপ ধারণা অনেক শিক্ষিত, সংস্কারার্থী লোকের মনে উদিত হইয়াছিল। এইরূপ করাকে অনেকে সৎসাহস-প্রদর্শন বলিয়া মনে করিতেন। আমি শুনিয়াছি, একজন শিক্ষাভিমানী নিজ পল্লীগ্রামে যাইবার সময় পাল্‌কীর উপরে মুরগী লইয়া যাইতেন। এইরূপ নির্ভীকতাকে লক্ষ্য করিয়াই ভূদেব বাবু লিখিয়াছিলেন :—"এখনকার দিনে দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। সাহস অর্থে নির্ভীকতা। ভয়ের পাত্র কে? যাহার ইষ্টানিষ্ট করিবার শক্তি আছে, সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন কোন ইষ্টানিষ্ট করিতে পারেন না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে.........সুতরাং সমাজকে অপমানিত করায় পুত্রবৎসল পিতাকে অপমানিত করার ন্যায় পাপেরই প্রমাণ হয়—উহা সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না।"

ভূদেব বাবু ইংরেজদের অনুকরণ করাকে নৈতিক ভীরুতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেশের আচার ব্যবহারকে উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া স্বাধীন চিন্তার নামে যখন যুবকগণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসারবৃদ্ধি হইতেছিল, তখন যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা সমাজবন্ধনকে পুনর্ব্বার দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভূদেব বাবু তাঁহাদের অন্যতম। মৃত মহাত্মা চন্দ্রনাথ বাবু এ বিষয়ে তাঁহার আচার্য্য দেব ভূদেব বাবুর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে মিশনারীদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, সুযুক্তির দ্বারা নিজ সম্প্রদায়ে টানিয়া লইয়াছিল, তখন কলিকাতার হিন্দুসমাজ নিশ্চিন্ত ছিল না। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দুগণ নানাপ্রকারে এই সংস্কারার্থীর দলকে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। যুক্তি অপেক্ষা ইট পাথরই বোধ হয় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

ভূদেব বাবু প্রমুখ হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন।

তাঁহারা যুক্তির বলে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে অভিলাষী হইলেন, যুক্তির দ্বারা যুক্তির উচ্ছেদসাধন করিতে লাগিলেন। হিন্দু ধর্ম্মে যাহা অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও অবান্তর, তাহা সমর্থন না করিয়া, ইঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মূল সত্য ও অনুষ্ঠানগুলিকে যুক্তির দ্বারা উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান করিতে লাগিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু এই কার্য্যকে একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি এই কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন:—"আমাদের সম্মুখে বিরাট কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। সে বিরাট কাজ সম্পন্ন না করিলে আমরা আমাদের প্রাচীন বৈভবের গর্ব্ব করিবার অধিকারী হইব না। কিন্তু সে বিরাট্ কাজ সম্পন্ন করিতে বিপুল শক্তি, বিষম সাধনা, ব্যাপক কাল আবশ্যক। আমাদের ইতিহাসে আমরা আজ বড় বিষম স্থানে উপনীত।" (হিন্দুত্ব—ভূমিকা।)

এই কর্ত্তব্যের ধারণা করিতে হইলে, আমাদিগকে একটি গোড়ার কথা বুঝিয়া রাখিতে হইবে। এদেশে যখন ইংরেজী সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব হইল, তখন আমাদের সমাজ বলিতে যে একটা একীভূত (Homogeneous) জনসমষ্টি ছিল, তাহা আমার মনে হয় না। জাতিভেদের শাসনে সমাজের যে কঙ্কালটি দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার ভিতরে সজীবতা ও স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ছিল না। সমাজের এক অংশে আঘাত করিলে, অন্য অংশ সাড়া দিত না। সমস্ত সমাজ এক স্পন্দনে স্পন্দিত হইত না। সমাজের বিশাল দেহ নিয়মের কঠোর গ্রন্থিতে এমনই হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, অতি তীব্র আঘাতেও সে প্রবুদ্ধ হইত না। সুতরাং এই সমাজের এক অংশ যখন ইংরেজী শিক্ষার আবর্ত্তে পড়িয়া বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন অপরাংশ পূর্ব্বেরই মত নিশ্চল ও অসাড় রহিল। নব্য সমাজ বলিতে যে বিদ্যাহিদলকে বুঝাইত, তাহার সংখ্যা অল্প হইলেও প্রভাব অধিক ছিল। ইহাদিগের ভিতর দিয়া সত্বরই হউক আর বিলম্বেই হউক, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব সমাজের সকল অংশে সংক্রমিত হইবে। সুতরাং এই শিক্ষিত দলকে উপেক্ষা করিলে চলে না। অনেক হিন্দু হয়ত মনে করিবেন যে, চন্দ্রনাথ বাবুর চেষ্টা ও নব্যসমাজের জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছিল, বৃহৎ হিন্দুসমাজের ইহাতে কোন লাভ বৃদ্ধি হয় নাই। এরূপ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যাহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া হিন্দু ও হিন্দুত্বকে কেবল ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, তাহাদিগের মনে ঘৃণার পরিবর্ত্তে অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দেওয়াও যেমন একটি কর্ত্তব্য, তেমনই আর একটি কর্ত্তব্য, হিন্দুধর্ম্মের

মধ্য হইতে স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুদিগের নিমিত্ত অনুরাগের ও শ্রদ্ধার সামগ্রী আহরণ করা। সমাজবন্ধন যেস্থানে শিথিল হইয়াছে, সেস্থানে সে বন্ধন দৃঢ় করা, এবং যেস্থানে দৃঢ় আছে, সেস্থানে তাহা চিরকাল দৃঢ় রাখিবার বন্দোবস্ত করা উভয়ই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। চন্দ্রনাথ বাবুর প্রতিভা এই কার্য্যে নিয়োজিত হইল।

কেহ কেহ এইরূপ চেষ্টাকে গোঁড়ামি বলিয়া মনে করিতে পারেন। হিন্দুয়ানীকে বাড়াইয়া তুলিবার বিপদ অনেক। হিন্দুধর্ম্ম এত পুরাতন এবং তাহাতে কালক্রমে এত বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্ব আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এত বিভিন্ন আচার পূজা-পদ্ধতি আসিয়া ইহার অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য-সঞ্চার করিতে প্রয়াস পাওয়াকে কেহ কেহ উপহাসের বিষয় বলিয়া মনে করেন। এরূপ গোঁড়ামি তাঁহাদের নিকট অমার্জ্জনীয়। কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্মে গোঁড়ামি না হইলে চলে না। সাহিত্যে, দর্শনে, বা বিজ্ঞানে গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতে রাজি নহি; সে স্থানে সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এবং মনের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, যদি আর কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, আবশ্যক হইলে সমস্ত বিশ্বাসের আমূল পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ গোঁড়ামি-বিবর্জ্জিত চিত্তই জ্ঞানলাভের বিশেষ অনুকূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম—যাহাতে জীবন মরণের সম্বন্ধ আছে—যাহা প্রাণের অপেক্ষাও অনেকের প্রিয়, তাহার সম্বন্ধে এরূপ উদারতা খাটে না। যাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস বদ্ধমূল হইবার অবকাশ পায় নাই, যাহারা ধর্ম্মের উপরের লহরীতে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ভিতরে অবগাহন করিয়া প্রকৃত সত্যের পরিচয় পায় নাই, তাহারাই উন্মুক্তচিত্ত, ও গোঁড়ামিশূন্য হইতে পারে, তাহাদের নিকট ধর্ম্মের আবেগমাত্রই গোঁড়ামি, সর্ব্বপ্রকার একাগ্রতাই তাহারা অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া মনে করে। যিনি ধর্ম্মের বিজয়-নিশান তুলিয়া তাহার মাহাত্ম্য-প্রচারে যত্নশীল, যিনি আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের জন্ম প্রাণপাত করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহার কার্য্যকলাপ সাধারণ পরিমাণের বিষয়ীভূত নহে। সেই স্থানেই বেশী গোঁড়ামি দেখিতে পাই, যে স্থানে পারকীয় ধর্ম্মের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ লক্ষিত হয়, যেস্থানে অকারণে বা অল্প কারণে কটূক্তি ও বিদ্রূপ বর্ষিত হয়। চন্দ্রনাথ বাবুর রচনায় সেরূপ কখনও দেখি নাই। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দুত্বের গৌরব। তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাই আজীবন শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যেন বলিতেছেন "তোমরা যাহা খুঁজিতেছ, আমি তোমাদিগকে তাহা মিলাইয়া

দিব। পরের কাছে কেন যাইবে? একবার ঘরের দিকে ফিরিয়া চাহ, একবার তোমার অতীতের দিকে নিরীক্ষণ কর, সবই আছে, ওগো সবই আছে। দেখ, এমন আর কোথায়ও আছে কি?"

"হিন্দুর সোঽহং বলিতেছে, হিন্দুর স্থায় ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মদর্শী, ব্রহ্মভক্ত, ব্রহ্মাণ্ড-গ্রাহী, অপরিমিতসাহসসম্পন্ন, বিরাটমনা মনুষ্য পৃথিবীতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।" (হিন্দুত্ব—সোঽহং)।

"হিন্দুর মন জগতের ছাঁচে ঢালা মন (Cosmically constituted), এমন বিরাট মন আর কি আছে?" (হিন্দুত্ব—ভূমিকা)।

এমনই করিয়া তিনি অতীতের গৌরব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যে জাতি অতীতের গৌরব করিতে জানে না, তাহার ভবিষ্যৎও কখনও আশাযুক্ত হয় না।

কিন্তু এ গৌরব যখন একটা বৃথা গৌরবের সামগ্রী হইত তখন তিনি তাহার প্রশ্রয় দিতেন না। এ গৌরব ততক্ষণ উন্নতির অনুকূল,যতক্ষণ আমরা এ গৌরবের অধিকারী হইবার চেষ্টা করিব। "প্রাচীন বৈভবের গর্ব্ব করা মনুষ্যত্ব নয়, প্রাচীন বৈভব পুনর্লাভ করাই মনুষ্যত্ব।"

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, বাঙ্গালীর যাহা নিজস্ব গৌরব, তাহার দিকে তিনি আলোকপাত করিয়াছিলেন। নূতনত্বের চাকচিক্যে মুগ্ধ, অনুকরণ-লুব্ধ সমাজকে তিনি ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাচীনত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া চিরন্তন সত্যের রূপ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক আগ্রহে ও সরলতায়, তাঁহার বর্ণনা-কৌশলে হিন্দুর জীবন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিও পরিত্যাগ করেন নাই, হিন্দু-জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে তিনি একটা যুক্তি ও মহৎ সত্য বাহির করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি কড়াক্রান্তিটি পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই। ভগবান লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম,পাপপুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে কড়াক্রান্তিটি ছাড়েন না। সেই জন্য "হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই। কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।"

(হিন্দুত্ব—কড়াক্রান্তি।)

চন্দ্রনাথ বাবু অবশ্য সমস্ত বিষয়ের সমর্থন করেন নাই। হিন্দুয়ানীর মধ্যে বাড়াবাড়ি আছে, ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলেও একান্ত ধর্ম্মানুরাগ যে তাঁহাকে পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিল, এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিকে চন্দ্রনাথ বাবু ধর্ম্মের দিক হইতে—কঠোর কর্ত্তব্যের দিক হইতে দেখিয়াছিলেন। শুধু তিনি যে, ইহাকে একটি তত্ত্ব বলিয়া মানিতেন, তাহা নহে, তাঁহার পারিবারিক ও বাহিরের জীবনেও তিনি এই সত্যের দ্বারা পরিচালিত হইতেন। বিধাতার কাজ করিতেছি এই মনে করিয়া তিনি গবমের্ণ্টের চাকরী করিতেন। কি অপত্যস্নেহে, কি বন্ধুবাৎসল্যে, কি দাম্পত্য প্রেমে তিনি সর্ব্বত্র বিধাতার হস্ত অনুভব করিতেন, ধর্ম্মের দিক দিয়া এই দৈনন্দিন ব্যাপারগুলিকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থায় সংসারে অবস্থান করিতেছিলেন। ধর্ম্মের সহিত আধ্যাত্মিক সূত্রে জীবন-ব্যাপারগুলি গ্রথিত করিয়া তিনি লোকশিক্ষার ও শিথিলতাগ্রস্ত সমাজ বন্ধনের যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাতে যুগপৎ আমাদের ভক্তির ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। কার্লাইল যেমন তাঁহার সমসাময়িক ইংরেজ সমাজকে ভৎর্সনা ও বিদ্রূপের দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ বাবু শুধু সেরূপ করেন নাই। তিনি প্রাচীন আদর্শের ভিত্তির উপর হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার এক বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু আচার ও সামাজিক প্রবন্ধে এবং চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার সংযম-শিক্ষায়, ত্রিধারা, কঃপন্থা এবং হিন্দুত্বে যে আদর্শ লোকের সমক্ষে ধারণ করিলেন, তাহাতে পরিবর্ত্তনের স্রোত যে অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, নূতনত্বের মোহ যে অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই।

অবশ্য চন্দ্রনাথ বাবুর এই সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর নাও হইতে পারে,—সেরূপ আশাই করা যায় না—কিন্তু সামাজিক বিপ্লবের সময় যে সকল বীর-হৃদয় মনস্বী মহাপুরুষ অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরণোপান্তে উন্নতিকাম মানবমাত্রই প্রণত হইবে।

আজ কাল আমরা প্রত্যেকেই এক এক জন ক্ষুদ্র বৃহৎ সমাজসংস্কারক। আমরা কোনও একটি বিষয়কে লইয়া তাহারই দোষগুণ দেখিতে প্রবৃত্ত হই; এবং বিদেশীয় সমাজের অনুকরণে তাহার একটা না একটা সংস্কার নিশ্চয়ই সাব্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারি। বাল্য বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই এক একটা মত আছে, এই সকল মত লইয়া সংস্কার করিতে হইলে সংস্কারের সংখ্যারই অন্ত থাকে না। ইহা আমাদের একদেশদর্শিতার ফল। আমরা সমাজকে পূর্ণ ভাবে প্রত্যক্ষ করি না, কেবল অংশমাত্র দেখিয়া তাহার

সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হই ; কাযেই সংস্কারও হয় না, সমাজও বিবাদ-বিতণ্ডায় অস্থির হয়। বাল্য বিবাহ সম্বন্ধেই ইহা দেখা যাইতে পারে। কোন একজন বা দশজন ডাক্তার বলিলেন যে, বাল্য বিবাহ দেশের অহিত করিতেছে, অমনই বাল্যবিবাহের সংস্কার আরব্ধ হইল। এমন কতবার হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু ফল বেশী কিছু হইয়াছে কি ? আমার মনে হয়, তাহার কারণ এই যে, বাল্য বিবাহ সমাজের অন্যান্য অংশের সহিত জড়িত বলিয়া সে সকল অংশের সংস্কার ব্যতিরেকে বাল্য বিবাহের সংস্কার কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। একান্নবর্ত্তী পরিবারযতদিন থাকিবে, ততদিন একটি ছোট মেয়েকে এক পরিবার হইতে অন্য পরিবারে লইয়া লালন পালন করিয়া তাহাকে সর্ব্বাংশে সেই পরিবারের কন্যার মত করিয়া লইবার চেষ্টা থাকিবে। একটি বড় মেয়েকে লইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পোষ্যপুত্র গ্রহণের বেলায়ও ঐরূপ ছোট ছেলেকে গ্রহণ করার রীতি আছে। তাহার পর, পিতা মাতা বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিবার রীতি যতদিন পর্য্যন্ত থাকিবে, স্ত্রীপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়া বিবাহ হইবার প্রথা যতদিন না চলিতেছে, ততদিন বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দেওয়া কঠিন হইবে। আমি একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম, এরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। হিন্দুসমাজ ধর্ম্মপ্রাণ, কাজেই ধর্ম্মের মধ্য দিয়া ইহার যে সংস্কার হইবে, তাহাই স্বাভাবিক ও স্থায়ী হইবে, এইরূপ ধারণায় প্রণোদিত হইয়া চন্দ্রনাথ বাবু এক বিরাট ধর্ম্মসমাজের কল্পনা করিয়াছিলেন। এরূপ সমাজ পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব্ব বস্তু, কামনার বস্তু, সমস্ত জগৎসমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

হিন্দুসমাজ অধঃপতিত, ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া তিনি কখনও নৈরাশ্য প্রকাশ করেন নাই। নৈরাশ্য উন্নতির অন্তরায়, তাই তিনি নৈরাশ্যকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, শুধু আশার বাণী আশ্বাসের বাণী। হিন্দুরা বড় বৈরাগ্যপ্রিয়। দুঃখের অংশটাই তাঁহারা বাড়াইয়া তুলিতেন ; য়ুরোপীয় দার্শনিকেরা পর্য্যন্ত হিন্দুদিগকে Pessimist বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এখনও এ বৈরাগ্য, এ দুঃখের একান্ত উপলব্ধি আমাদের আত্মাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের কর্ম্মের প্রস্রবণকে জমাইয়া ফেলিয়াছে। সেই জন্যই হিন্দু অসাড়, অলস, জড়তাপন্ন। কিন্তু হিন্দুদের এই মজ্জাগত Pessimismএর মধ্যে Optimism ও ছিল। এই Optimism এর প্রধান উপাদান পরকালে বিশ্বাস। পরকাল আছে বলিয়াই দুঃখ সহনযোগ্য। পরকাল আছে বলিয়াই শোক, জরা, মৃত্যুকে হিন্দু তুচ্ছ মনে করিতে পারিত। পরকালই দুঃখে সান্ত্বনা

সুখে ধৈর্য্য, ক্রোধে ক্ষমা, প্রতিহিংসায় মার্জ্জনা আনিয়া দেয়। চন্দ্রনাথ বাবুর Optimism এই পরকালবাদেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে এমন Optimism যে তাঁহাকে পুত্রশোক পর্য্যন্ত বিচলিত করিতে পারিত না। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু এই পরলোকের ছায়ায় চিরসান্ত্বনা লাভ করে। চন্দ্রনাথ বাবুর পরলোকে বিশ্বাস কিরূপ জীবন্ত ও আন্তরিকতাপূর্ণ, তাহা তাঁহার 'পৃথিবীর সুখ দুঃখের' ভূমিকা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। নিষ্ঠাবান হিন্দু তাঁহার পরলোকগত কন্যাকে সম্বোধন করিয়া যে কয়েক ছত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস কি সহজে মিলে? যে দিকে তিনি চাহিয়াছেন, সেই দিকে বিশ্ব তাহার সুষমাসম্ভার লইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছে। তিনি কোন জিনিষের ভাল দিক দেখিতে পাইলে কখনও তাহার মন্দ দিকটা দেখিতে চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর সবই ভালর জন্য করেন। তিনি এই আশায় ও বিশ্বাসে শেষ পর্য্যন্ত সুখী ছিলেন। 'পৃথিবীর সুখদুঃখের' প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার এই আত্মতৃপ্তির পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সমাজ পরলোককে দূর হইতে দূরে নির্ব্বাসিত করিতেছে, কাযেই ইহকাল লইয়া মত্ত হইয়া আছে। হিন্দু কখনও ইহকালের পার্থিব পন্থায় তৃপ্তিলাভ করিবে না। তিনি বলেন "যদি মরিতেই হয়, তবে পরকাল লইয়া মরা অপেক্ষা ইহকাল লইয়া মরায় মনুষ্যের অনিষ্ট, অপমান ও অগৌরব অনেক অধিক।" (কঃ পন্থা—১৩ পৃষ্ঠা)। হিন্দু পরকালের পন্থা ধরিয়া দরিদ্রভাবে চলিয়াছে, য়ুরোপ ও আমেরিকা ইহকালের পন্থা ধরিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, কিন্তু পরিণামে হিন্দুই জয়লাভ করিবে। এইস্থানেই চন্দ্রনাথ বাবুর Idealism এই কল্পনায় প্রতিভাত উন্নতি ও গৌরবের রাজ্য বাস্তব হইতে তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। তাই তিনি দোষানুসন্ধান না করিয়া বলিয়াছেন:—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্ নিবোধত। আমাদের যে সহস্র ত্রুটি, সহস্র অপরাধ তাহা মার্জ্জনা করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানগৌরব মণ্ডিত বাঙ্গালী জাতির একখানি সুস্পষ্ট সুন্দর মূর্ত্তি আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ধরিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বাবুর মূল কথাগুলির আলোচনা করিতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। আরও অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া যাইবে ভয়ে সে কথাগুলি বলা হইল না। চন্দ্রনাথ বাবুর পুস্তকগুলির সমালোচনা করিবার সময় আইসে নাই। ভাষার উপর তাঁহার কতখানি প্রভাব, এবং চন্দ্রনাথ বাবুর রচনা স্থায়িত্বলাভ করিবে কি না, এ সকল বিষয় এখন স্থির

করিয়া বলা কঠিন। তবে বঙ্গভাষার প্রতি, বাঙ্গালার প্রতি, বাঙ্গালা দেশের প্রতি তাঁহার যে একান্ত অকৃত্রিম অনুরাগ, যাহা তাঁহার লেখার নানাস্থানে নানাভাবে পরিস্ফুট ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা বিরল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সাবিত্রীচরিত্রের মাহাত্ম্য-বর্ণনা করিতে, অভিজ্ঞান শকুন্তলের মাধুর্য্য-বর্ণন করিতে, সংযমশিক্ষার বিভিন্ন স্তর-প্রদর্শন করিতে, তাঁহার সেই একই স্বদেশপ্রেম, একই ধর্ম্মবিশ্বাস, একই গৌরবের আশা আত্মবিকাশ করিয়াছে। 'শকুন্তলা-তত্ত্ব'ই অনেকের মতে চন্দ্রনাথ বাবুর শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। চন্দ্রনাথ বাবু 'হিন্দুত্বের' ভূমিকায় নিজেও সে অভাস দিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে' অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সমালোচনাই চন্দ্রনাথ বাবুর বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার প্রথম সোপান। তাঁহার আত্মজীবনচরিতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "শকুন্তলাতত্ত্ব লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরেজী লিখি নাই, লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই—এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃভাষায় লেখার ন্যায় অন্য কোন ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নহে।" 'শকুন্তলাতত্ত্ব' 'বঙ্গদর্শনে' লিখিবার পূর্ব্বে একখানি ইংরেজীপত্রে তিনি কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা করেন, তাহাই দেখিয়া বঙ্কিমবাবু চন্দ্রনাথ বাবুকে 'বঙ্গদর্শনে' লিখিবার জন্য "পীড়াপীড়ি" করেন। 'বঙ্গদর্শনের' সহিত তাঁহার এই যে একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল, এবং এই সূত্রে বঙ্গসাহিত্যের সহিত যে একটি প্রীতিকর বন্ধন গ্রথিত হইল, আজীবন সে পরিচয় তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই, সে স্নেহবন্ধন তিনি শিথিল হইতে দেন নাই। ভাষার পবিত্রতা ও গৌরব রক্ষা করিয়া তিনি একান্ত মনে তাহার সেবা করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবুর ভাষা প্রাঞ্জল, ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। সরল কথাকে অনর্থক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জটিল করিয়া তুলিবার প্রণালী তাঁহার ছিল না। যাহাতে সাধারণ লোকে সহজে বক্তব্য বিষয়ের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, এজন্য তিনি সমাসবাহুল্য এবং সংস্কৃতবাক্য-বিন্যাসের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার ভাষায় একটা সহজ প্রফুল্লতা ও বাধাহীন স্রোত ছিল। চন্দ্রনাথ বাবু সমালোচক বা Reviewer ভাবে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহার সমস্ত লেখায় তিনি এই সমালোচনার ভাবই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা, সমাজপ্রণালীর সমালোচনা, লোকচরিত্রের সমালোচনা, ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। সমালোচনায় তিনি অশেষ পাণ্ডিত্য ও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা কিন্তু সমালোচনামাত্র

নহে। একটি মহান্ আদর্শের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া তিনি সমস্ত বিষয় যাচাই করিয়া, পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। এই মহান্ আদর্শের জন্যই তাঁহার সমালোচনা এক জীবন্ত কাব্যের মত হইয়া উঠিয়াছে। রাস্কিনের ললিতকলার সমালোচনার মত চন্দ্রনাথ বাবুর সমালোচনা এক মহতী সৃষ্টিকরী কল্পনার আলোকে প্রতিভাত, পরিব্যাপ্ত, ব্যক্ত। উভয়ের সম্বন্ধেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, সে আদর্শ ছাড়িয়া দিলে সে সমালোচনা নিতান্তই নীরস ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে।

চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গসাহিত্যকে যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রচুর না হইলেও মূল্যবান্। রাজকার্য্যের অবসরে তিনি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত উপাদান সংগ্রহ করিতেন, এবং তাঁহার নূতন কিছু বলিবার থাকিলেই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। অনাবশ্যক রচনায় সময় কাটাইবার অবসর বা প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি 'পৃথিবীর সুখদুঃখের' পূর্ব্বাভাষে বলিয়াছেন :—"আমার বাঙ্গালা লিখিবার এই একটা রীতি বা নিয়ম আছে যে, বাঙ্গালায় যাহা কেহ কখনও লেখে নাই, এমন ভাল কথা বলিবার থাকিলেই আমি লিখি, নহিলে লিখি না। এইজন্য আমি লিখিয়া গেলাম বড় অল্প, কিন্তু যাহা লিখিয়া গেলাম, এদেশে তাহা আর কেহ লেখেন নাই।" ইহা স্পর্দ্ধার কথা নহে—স্পর্দ্ধা হইলেও এই শ্রেষ্ঠকবিজনোচিত স্পর্দ্ধা সাহিত্য চিরকাল মার্জ্জনা করিয়া থাকে।—কিন্তু ইহা গর্ব্ব নহে। এই কথা কয়েকটি একজন সাহিত্য-সেবা-ব্রতে ব্রতী, নিরহঙ্কার, কঠোর-সংকল্প-সাধন-প্রয়াসীর আত্মনিবেদন। এইরূপ করিয়াই চন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বাবু সাধারণকে যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত আমি তাহারই কথা বলিয়াছি, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের পূর্ণতা ইহাতে নহে। বস্তুতঃ পরিবারের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। তথায়ই তাঁহার গৌরব এবং তথায়ই তাঁহার চরম সার্থকতা। নিজ পরিবারের নানাবিধ সম্বন্ধের মধ্যেই এই সাধুপুরুষের জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বাহিরের আড়ম্বরের মধ্যে আসিতে চাহিতেন না। তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, আত্মপরিচয় দিবার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন না। অনেকের সহিত তিনি মিশিতেন না; যাঁহাদের সহিত মিশিতেন, তাঁহাদের সহিত তন্ময় হইয়া মিশিতেন—একটুও ফাঁক রাখিতেন না। ধনী লোকের সংসর্গে নিজের গর্ব্ব চরিতার্থ করিবার সুযোগ হইলেও, এই দরিদ্র সাহিত্যসেবী কখনও সে সুযোগ গ্রহণ করিতেন না, পাছে তাঁহার সাধনা শিথিল ও ব্যর্থ হইয়া যায়। তাঁহার

পারিবারিক জীবন এমন সরল ও অমৃতময় ছিল যে, তাহাতেই তিনি তাঁহার সমস্ত সাধের তৃপ্তি—সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা দেখিতে পাইতেন। এইরূপ পারিবারিক বন্ধনে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া তিনি নীরবে, নিভৃতে, ধর্ম্মসাধনা, সাহিত্যসাধনা, ও সংযমসাধনা করিতেন। এই সাধনায় তিনি কখনও বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে তিনি অন্তর্ম্মুখী করিয়া লইয়া তাহারই তৃপ্তিসাধনে তাঁহার সমস্ত কল্পনার পরিণতি—সমস্ত বাসনার পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাহিরের কোনও আকর্ষণই তাঁহার মনে রেখাপাত করিতে পারিত না। সেই জন্য দারিদ্র্যের ও সম্পদের মধ্যে তিনি তুল্যভাবে স্বাধীনচিত্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। বহুকাল সরকারী অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বাধীনচিত্ততার জন্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে যশ অর্জ্জন করা কি কম সৌভাগ্যের কথা ? সেই দুর্ল্লভ সৌভাগ্য চন্দ্রনাথবাবুর পক্ষে ঘটিয়াছিল ; কেন না, তিনি বাহিরের আকর্ষণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। যে ব্যক্তি সুখলব্ধ বিশ্রামের ভক্ত, যে বিলাসিতার বাধ্য, যে ধন ও তাহার আনুসাঙ্গিক উপকরণে মত্ত, সে কেমন করিয়া স্বাধীন থাকিবে ? চন্দ্রনাথ বাবু বাহিরের বস্তুকে অনিত্য বলিয়া মনে করিতেন, কাযেই অভাবকে তিনি কখনও অভাব বলিয়া গণ্য করিতেন না। বিলাসের মাদকতা তাঁহাকে কখনও মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি বলিতেন "বিলাসের ন্যায় মনোহর শত্রু আর নাই। (কঃ পন্থা)।" বিলাসকে সেই জন্য তিনি বর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রকৃত বেদান্তবাদীর ন্যায় তিনি নিত্যসত্যের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, কাযেই বেশভূষার দিকে একেবারে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। পারিবারিক দুর্ঘটনায়ও তিনি এই বেদান্তোচিত ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ছোট ছেলের মৃত্যুর সময়ে তিনি কি প্রকার মানসিক স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন একটি দুষ্টব্রণে অস্ত্র করিয়া দেওয়ায় তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রতিদিন তাঁহার পুত্রের সংবাদ লইতেন, এমন সময় পুত্রটির মৃত্যু হইল। ডাক্তার চন্দ্রনাথ বাবুর অন্য পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আর কয়েকদিন ছোট ছেলেটি না বাঁচিলে চন্দ্রনাথ বাবুর জীবন রক্ষা করা কঠিন হইবে। ছেলেটি চিররুগ্ন ছিলেন, এজন্য চন্দ্রবাবুর স্নেহ তিনিই অধিক পরিমাণে পাইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু রোগশয্যায় শুইয়া যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রটি অনন্তধামে চলিয়া গেল, তখন তিনি পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "আমার জন্য তোমরা ভাবিও না। আমি শোক সহ্য করিতে পারিব, সে বড় কষ্ট পাইতেছিল,

ভগবান তাহার কষ্টের অন্ত করিয়া দিয়াছেন, আমি আমার নিজের ক্ষতি সহিতে পারিব না! আমার জন্য ভাবিও না। তোমাদের মাতাকে শান্ত কর গিয়া।" কি অপূর্ব্ব সাধনার বলে তিনি এই আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ক্ষুদ্র মানব, আমরা ভাবিয়াও পাই না। ঈশ্বরের বিধানের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; অতি গুরুতর শোকেও তিনি এ বিশ্বাস তিলেকের জন্য টলিতে দেন নাই। এই অপূর্ব্ব ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরলোকে বিশ্বাস, হিন্দুত্বে বিশ্বাস, জাতীয় উন্নতিতে বিশ্বাস, চরিত্র-মহত্বে বিশ্বাস ও সাহিত্যের গৌরবে বিশ্বাস লইয়া তিনি সুখ ও শান্তির বিচিত্র আশ্রয় রচনা করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃ-স্নেহ, অপত্যস্নেহ, দাম্পত্যপ্রেম, বন্ধুস্বজনবাৎসল্যের আদর্শ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারকে প্রমোদ-উদ্যানে পরিণত করিয়াছিলেন। পরকালে যদি চরিত্রগৌরবের পুরস্কার থাকে, যদি সৌম্য, শান্ত, নির্ম্মল প্রকৃতির চরিতার্থতা থাকে, তাহা হইলে চন্দ্রনাথের অনন্ত জীবন জয়যুক্ত হইবে। আর ইহ-কালে যদি এই লুব্ধ, মুগ্ধ, বাসনাদগ্ধ সংসারে সত্যের আদর থাকে, যদি কঠোর সাধনার সফলতা থাকে, তবে চন্দ্রনাথের স্মৃতি গৌরবমণ্ডিত হইবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

প্রণয়।

—:•:—

গোলাপ সুন্দর নহে—নয়ন-রঞ্জন,
আদি বক্ষে নাহি ধরে নিশার শিশির;
প্রণয় মধুর নহে—চিত্ত-বিনোদন,
যদি তাহে নাহি থাকে নয়নের নীর।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিকের পরিচয়।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান জগতের জড় ও অসার পদার্থ লইয়াই ব্যস্ত, বৈজ্ঞানিক জড় জগতের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতেই জীবন কাটাইয়া দেন। এই ধারণা ভ্রমাত্মক :

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কাহাকে কহে এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের কি ধর্ম্ম, ইহাই প্রথমে বিবেচ্য। জগতে যাহা দেখা যায় বা অনুভব করা যায়, তাহার মূল-কারণানুসন্ধানই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ব। বৈজ্ঞানিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ ঘটনার কারণানুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে মৌলিক তত্বে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন, এবং ঐ সকল তত্ত্বের দ্বারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনাগুলি বুঝাইয়া দেন। জগতের সার সত্যে উপনীত হওয়াই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। ঐ জ্ঞানলাভ করিবার অন্ত উপায় থাকিতে পারে ; কিন্তু প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি যে একই মহৎ সত্যের নিয়মানুসারে চালিত হইতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়া সেই সত্যের ভিত্তি যেরূপ দৃঢ় করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায় দ্বারা সেরূপ করিতে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিক তাঁহার আবিষ্কৃত সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্ত সেরূপ যুক্তি দেখাইতে পারিবেন, অন্ত কোন উপায় দ্বারা সেরূপ যুক্তিপ্রদর্শন সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার পূর্ব্বে সত্যানুসন্ধানে বিজ্ঞান কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিলেই ঐ মহৎ সঙ্কল্প কার্য্যকরী করার পক্ষে বিজ্ঞানের বিশেষত্ব প্রমাণিত হইবে।

বৈজ্ঞানিকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জড় ও শক্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিতে পারে না। জড়পদার্থমাত্রই শক্তির আধার। একটা ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ডের মধ্যেও শক্তি নিহিত আছে। ঐ শক্তি সময় ও অবস্থাবিশেষে প্রকাশিত হইতে পারে, এবং বাহ্যবস্তুর উপর কার্য্য করিয়া আপনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে। এইরূপ একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই জড় ও শক্তি অভিন্ন ভাবে গ্রথিত। এই ব্রহ্মাণ্ড জড়ের ও শক্তির একটি বৃহৎ সমষ্টি।

এই অনুমান সম্বন্ধে আজকাল সকল বৈজ্ঞানিকই একমত হইয়াছেন। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কেবলমাত্র জড় ও শক্তির সুবৃহৎ সমষ্টি বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন। পরন্তু তাঁহারা দেখাইতে চাহেন যে, কয়েক শ্রেণীর জড়পদার্থের চৈতন্য আছে। আমাদের আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুই ঐ মতের প্রধান পরিপোষক। তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদাদির চৈতন্য আছে। হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে "প্রকৃতি ও পুরুষ" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের জড়, শক্তি ও চৈতন্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য দেখান যাইতে পারে।

Energy বা শক্তি নানা আকারে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্ববিধ বিকাশই যে সেই একমাত্র মহাশক্তির রূপান্তরমাত্র,বিজ্ঞান তাহা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে এবং সেই প্রয়াসে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছে। আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি। আধুনিক অনুমান অনুসারে এই বিভিন্ন শক্তিবিকাশ ইথর নামক এক সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম পদার্থের স্পন্দন হইতে সমুদ্ভূত। বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দনদ্বারা একই শক্তি কখন উত্তাপ, কখন আলোক কখন তড়িৎ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক, মনুষ্যের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াগুলিরও কারণনির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, পূর্ব্বকথিত ইথরের অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দনদ্বারা আমাদিগের মানসিক ক্রিয়াগুলি (যথা চিন্তাশক্তি, ধারণাশক্তি ইত্যাদি) সম্পন্ন হয়। এই মত এখনও সর্ব্বানুমোদিত হয় নাই। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ক্রিয়া (বাহ্যিক ও মানসিক) যে একমাত্র মহাশক্তির বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী বিকাশমাত্র, তাহা বিজ্ঞান একদিন সপ্রমাণ করিবে। আবার আধুনিক চৈতন্যবাদের যেদিন প্রতিষ্ঠা হইবে, সেদিন বিজ্ঞান চরমোৎকর্ষ লাভ করিবে। সমস্ত জগৎ তখন বৈজ্ঞানিকের চরণে প্রণিপাত করিবে।

পৃথিবীতে আমরা যে সকল জড়পদার্থ দেখিতে পাই, তাহা ৭৪ প্রকার বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে বিভক্ত। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাও অনুমান করেন যে, উক্ত ৭৪ প্রকার মৌলিক পদার্থ (Elements), একটিমাত্র মূল পদার্থের রূপান্তরমাত্র। এ সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানাপ্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার বিস্তারিত ভাবে আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। একাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের যতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান ও আশা করা যাইতে পারে

যে, ভবিষ্যতে কোন সময়ে বিজ্ঞানের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু ও ক্রিয়া একমাত্র মূল পদার্থের ও একমাত্র অনন্তব্যাপী মহাশক্তির রূপান্তর ও বিকাশমাত্র। আবার ইহার সহিত চৈতন্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইলে, বিজ্ঞান চরমোৎকর্ষ লাভ করিবে।

প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে হইলে মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে কিরূপে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যোমযান প্রস্তুত করা যাইতে পারে, অথবা যুদ্ধে বিপক্ষ-সৈন্য ধ্বংস করিবার জন্য কিরূপে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করা যাইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কালাতিপাত করেন না। ঐ সকল কার্য্য লইয়াও পৃথিবীর অনেক লোক ব্যস্ত। কিন্তু তাঁহারা "বৈজ্ঞানিক"-পদবাচ্য নহেন। তাঁহারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত কোন সত্যকে বিভিন্ন মার্গে পরিচালিত করিয়া, তাহার দ্বারা তাঁহাদের অভিপ্রেত কোন কার্য্য করাইয়া লইতে চাহেন। কিন্তু যাঁহারা ঐ মৌলিক সত্য আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক। ইঁহারা উপরোক্ত শ্রেণীর লোকের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সহিত জগতের বিলাসবৈভবের কোন সম্পর্ক নাই। সত্যানুসন্ধানই তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বন্ধ। লর্ড কেল্‌ভিন্, লর্ড রেম্‌সে, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মগণই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক-পদবাচ্য। সাধারণে যাহাকে Materialism বলিয়া ঘৃণা করে, ইঁহারা তাহার অপেক্ষা অনেক উচ্চ বিষয়ের বিচারে ব্যাপৃত।

বৈজ্ঞানিকের সহিত দার্শনিকের প্রভেদ অতি সামান্য। উভয়েরই লক্ষ্য সত্যানুসন্ধান। কিন্তু দুইজন দুই বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হইতেছেন। দার্শনিকগণ কেবলমাত্র যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত রহেন, বৈজ্ঞানিকগণ যুক্তিতর্কের সহিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া দেন। কিন্তু সাধারণ লোক বিজ্ঞানের প্রথম সোপানগুলি দেখিয়াই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা করিয়া রাখে এবং বৈজ্ঞানিকগণকে কেবলমাত্র জড়োপাসক ও জড়বাদী বলিয়া অপবাদ দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না; বিজ্ঞান কাহাকে বলে, না জানিয়াই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া তাহাদের একদেশদর্শিতার ও ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বৈজ্ঞানিক মনুষ্যের পার্থিব অবস্থার উন্নতির সাহায্যকল্পে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন নাই। তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প সত্যানুসন্ধান। সেই মৌলিক সত্য যদি কেবলমাত্র জড়ই হয়

তাহা হইলে তাঁহারা জড়বাদী, যদি কেবলমাত্র শক্তিই হয় তাহা হইলে তাঁহারা শক্তিবাদী, এবং যদি চৈতন্য হয় তাহা হইলে তাঁহারা চৈতন্য-বাদী; অথবা, জড়, শক্তি ও চৈতন্য ইহার মধ্যে দুইটির বা তিনটির সমষ্টি তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে পারে। মূল কথা যাহা "সত্য",—তাহাই তাঁহাদের ধর্ম্ম।

অকারণে।

—:—

(টেনিসনের অনুকরণ)

—*:০:*—

কে জানে নয়নে কেন অশ্রু বহে যায়!
নিভৃত মরমতলে নিগূঢ় বেদনাছলে
জনম লভিয়া কেন চোকে উথলায়?
শারদ প্রসন্ন শোভা নেহারি নয়নে
অতীত দিনের কথা ভাবি আন মনে।

জীবন বহিয়া গেছে বৃথা দুরাশায়;
মরীচিকা হেরি' দূরে মুগ্ধ মন ঘুরে ঘুরে
শ্রান্ত হয়ে পড়িয়াছে গোধূলি-বেলায়।
আকুল বেদনা সেই ভাসিছে পবনে
শেফালি-সৌরভে আর বিহগ-কূজনে।

প্রথম প্রেমের মত—তেমনি মধুর;
তেমনি আবেগভরা প্রাণ-মন-মুগ্ধ-করা;
তাহারি স্মৃতিতে এই হৃদয় বিধুর,—
উন্মুখ আছিল যবে হৃদয় নবীন
আত্মহারা মন ছিল সুখে উদাসীন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

ইচ্ছামৃত্যু।

তখনও উষার আলোক ফুটিয়া উঠে নাই—বিহগ-কুজনবিরহিত। রোগিনীর পাংশু মুখে মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। শয্যাপার্শ্বে বর্ষীয়ান পিতা সমস্ত রজনী অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। কাতর কণ্ঠে কন্যা ডাকিল"বাবা" ; "কি মা" বলিয়া পিতা মুমূর্ষু কন্যার ললাট স্পর্শ করিলেন। কন্যা যেন বিকার-ঘোরে বলিল—"একবার সুরেশ—" ; আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। মৃত্যু শেষ নিশ্বাস অপহরণ করিয়া চলিয়া গেল। মত্ত বায়ু যেমন প্রবল ঝটিকার সময় পক্ষি-শাবককে মাতার পক্ষচ্যুত করিয়া কোন অজানিত স্থানে লইয়া যায় ; নিষ্ঠুর মৃত্যু তেমনই বৃদ্ধ সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায়ে হৃদয়পঞ্জর ভগ্ন করিয়া তাঁহার বড় আদরে—বড় সোহাগের কন্যা শান্তশীলার প্রাণবায়ু লইয়া পলায়ন করিল। হায়, মানব জীবন !

কৈশোরে মাতৃহীনা, পিতৃস্নেহে পালিতা, শিশিরসিক্ত শেফালি পুষ্পের ন্যায় স্নিগ্ধ শান্তশীলা যখন দশ দিনের শিশু তখন এমনই এক অশুভ মুহূর্ত্তে তাহার জননী সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর-শোভা লইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সে আজ সপ্তদশ বর্ষ পূর্ব্বের কথা। ঐ যে নিস্পন্দ জড় দেহ—ঐ যে অর্দ্ধোন্মিলিত জ্যোতিহীন, দৃষ্টিহীন চক্ষু, যাহার প্রতি স্পন্দনে স্ত্রীর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া সাতকড়ি বাবু হৃদয়ে বল পাইতেন, দুঃখকষ্ট তুচ্ছ করিয়া জীবনে সার্থকতা আছে মনে করিতেন—উহারা আজ তাঁহার নিকট বিশ্ব-সংসারের একটি বিরাট শূন্যতার আবরণ উন্মোচিত করিয়া যেন সপ্তদশ বর্ষের নিস্ফল ব্রত উদ্‌যাপন করাইল। দশ দিনের শিশু কন্যা বুকে করিয়া সাতকড়ি স্ত্রীর শোক ভুলিয়াছিলেন ;—আজ তাঁহার শোক সংবরণ করিবার কিছুই নাই। শান্তশীলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্ত্রীর প্রতিবিম্ব হারাইলেন।

শোকের আকস্মিক আঘাত অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া যখন বাহ্য বিকাশ বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তখন তাহার গভীরতা যত বৃদ্ধি পায় স্মৃতি তত প্রবল হইয়া উঠে। কেমন করিয়া দশ দিনের শিশু "মানুষ" করিয়াছিলেন, স্তন্যদায়িনী ধাত্রী যখন শান্তকে সামান্য অবহেলা করিত, তখন স্ত্রীর অভাব তাঁহার হৃদয়ে

কিরূপ বাজিত, সাত বৎসর পূর্ব্বে একবার শান্তকে কত কষ্টে মৃত্যুর কবল হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন, তিনি কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিবার সময় শান্ত কিরূপ সাগ্রহে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিত;—এক এক করিয়া বৃদ্ধের সকল কথা মনে হইত, এবং শোকে—ক্ষোভে হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর নিষ্পেষিত করিয়া ক্ষীণ দৃষ্টি নয়নে অশ্রু ফুটিয়া উঠিত। সময় সময় বৃদ্ধের শোকাবেগ এত তীক্ষ্ণ হইত যে, তিনি ভূমিতে লুটাইয়া অশ্রুজলে হৃদয়ভার লঘু করিতেন।

২

এমনই করিয়া তিনটি মাস কাটিয়া গেল। একদিন অপরাহ্নে সুরেশ নামক একটি যুবক বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সুরেশ দিব্যকান্তি, উচ্চ-শিক্ষিত যুবক। তিনি "দেশের এবং দশের জন্য" জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাই সংবাদপত্র-সম্পাদনের গুরু ভার স্কন্ধে লইয়া শিক্ষার এবং সংযমের সমন্বয়ে যে মানবত্ব দেবত্বে পরিণত করা যায় তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইতে প্রয়াস পাইতেছেন। হঠকারিতায় আত্মোৎসর্গ হয় না;—তাহার ইন্ধন যত্নে আহরণ করিতে হয়; অধ্যবসায় তাহার বেদী, সংযম তাহার মূলমন্ত্র এবং প্রতীক্ষা অথবা যোগ তাহার আহুতি, তাহার উদ্‌যাপনের জন্য উৎকণ্ঠা নিন্দনীয় এবং নিষ্ফল—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। সুধী সম্পাদক সাতকড়ি ত্রিশ বৎসর কর্ণধাররূপে সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন—তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রচুর। পুরাতন ইতিকথা শুনিবার নিমিত্ত, ব্যক্তিগত জীবনের আলোক ও আঁধারের বিষম সমন্বয়তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য এবং রাজনীতির জটিল রহস্য শুনিবার জন্য সুরেশ মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আসিতেন—আজও আসিয়াছিলেন। উপযুক্ত শিষ্যলাভ করিয়া সাতকড়ি সাদরে স্বীয় আয়াসলব্ধ অভিজ্ঞতার ফল তাঁহাকে অকপটে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতেন। আজ—"সুরেশ বাবু আসিয়াছেন" শুনিয়া অতর্কিতে বৃদ্ধের হৃদয়ে যেন বিপ্লব ঝটিকা বহিয়া গেল। এই কি সেই সুরেশ—যে সুরেশের নাম শান্তের শেষ নিশ্বাসে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল? সাতকড়ি স্মৃতিমন্থন করিয়া আর কোনও সুরেশের কথা মনে করিতে পারিলেন না। সুরেশ আসিলেন—প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার পর চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ কন্যা-বিয়োগের কথা সুরেশকে জানাইলেন, কিন্তু এমন কোন বিশেষ লক্ষণ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না যাহাতে এই দুই সুরেশের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারেন। বৃদ্ধের প্রচ্ছন্ন শোক উথলিয়া উঠিল।

৩

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধের আহ্নিকাদি হইল না। তিনি সান্ত্বনার আশায় শয্যায় আশ্রয় লইলেন। বৃদ্ধ কি এক অনির্দ্দিষ্ট শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রেতাত্মার ন্যায় ধীরে ধীরে শান্তের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিন মাস ঐ গৃহের দ্বার কেহ উন্মুক্ত করে নাই; আজ কাহার অদৃষ্ট ইঙ্গিতে সাতকড়ি কম্পিত হস্তে অর্গল উন্মোচন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন! সে গৃহ তেমনই সজ্জিত,—প্রতি দ্রব্যে শান্তের ছায়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ বসিয়া পড়িলেন; দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া আকুল ভাবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বৃদ্ধ গৃহের প্রতি দ্রব্য স্পর্শ করিয়া যেন শান্তের অস্তিত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন; ঝাড়িয়া পুছিয়া যে স্থানের যে দ্রব্য সেই স্থানে তাহা সযত্নে রাখিয়া দিলেন। যেন শান্ত প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সযত্ন-সজ্জিত গৃহ দেখিয়া পিতৃস্নেহের গভীরতা উপলব্ধি করিবে। হায় অন্ধ স্নেহ!

৪

যখন গৃহের সকল দ্রব্য সংস্কৃত হইয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল, তখন সাতকড়ি শান্তের পোর্টমেণ্ট খুলিয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন। শান্তের জামা, কাপড়—শান্তের খাতা যাহাতে তাঁহার নিকট চাণক্যের শ্লোক শিখিয়া শান্ত লিখিয়া রাখিয়াছিল; তাহার পুতুল, বই, ফিতা—প্রতি দ্রব্য অশ্রুজলে বৃদ্ধের বক্ষ ভাসাইয়া দিল। তখনও তৃপ্ত হয় নাই—তখনও শক্তিশেল অনাবিষ্কৃত। বৃদ্ধ বাক্সের মধ্য হইতে একখানি সুন্দর বাঁধান খাতা বাহির করিলেন। এই খাতা বৃদ্ধ উদ্ভট কবিতা সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া রাখিবার জন্য বাঁধাইয়া আনিয়াছিলেন—তাহার পর খাতা খুজিয়া পায়েন নাই—কবিতা-গুলিও মানসপট হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খাতার উপরে বড় বড় অক্ষরে লিখিত—"আত্ম নিবেদন"! বাহ্য সৌম্যের অভ্যন্তরে শান্ত যে তাহার "আত্ম নিবেদন" হৃদয়ের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহা সে সাতকড়িকে স্বপ্নেও অনুমান করিতে দেয় নাই। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বৃদ্ধ পড়িতে লাগিলেন—

"আত্ম-নিবেদন"

"আমার অবস্থায় স্ত্রীলোকের এক দেবতার উদ্দেশে আত্ম-নিবেদন করা উচিত। আমি চিরহতভাগিনী, তাই বিপথগামিনী;—মানবে আত্ম-নিবেদন করিয়াছি। যিনি আমার আত্ম-নিবেদনের অধিকারী বিধাতা আমাকে তাঁহা-

হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ভালবাসার অঙ্কুর উদ্গত না হইতে যাঁহাকে আমি স্বামী বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, আলেয়ার মত আমাকে একবার দেখা দিয়া তিনি কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে লুকাইয়া গেলেন, আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না,—হৃদয়েও তাঁহার চিহ্ন রহিল না। মনে কেবল একটি সংস্কার আছে, আমার বিবাহ হইয়াছিল। পিতৃ-নির্দ্দেশে একজনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম—তিনি নাই ; সুতরাং আমি বিধবা। আমার কর্ম্ম নিষ্ফল—জন্ম নিষ্ফল!

"শুধু কি তাহাই ? আমি শৈশবে মাতৃহীনা। দশ দিনমাত্র মাতৃ-স্নেহ ভোগ করিয়া—আমি সে সৌভাগ্যেও বঞ্চিতা। জ্ঞান হইয়া কতবার "মা, মা" বলিয়া ডাকিয়াছি ; কিন্তু পিতার অশ্রুসিক্ত মলিন মুখ দেখিয়া নীরব হইয়াছি। এক সৌভাগ্যে আমি সৌভাগ্যবতী। অসীম পিতৃস্নেহ আমাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আমি তাহাতেই সুখী,—আবার তাহাতেই অসুখী। যখন পিতার স্নেহ-গৌরবে হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, তখন পিতার ব্যর্থ জীবনের তাপ অনুভব করিয়া দুঃখে মরিয়া যাই। আমার জন্য পিতা কত না কষ্ট সহ্য করিয়াছেন—করিতেছেন ; আর হতভাগিনী আমি—দগ্ধ অদৃষ্টের অঙ্গারে তাঁহাকে দিন দিন পুড়াইয়া মারিতেছি ?

"বৈধব্য কঠোর ; বিড়ম্বনা তদপেক্ষা অনেক অধিক কষ্টের। বৈধব্য অভ্যাস করা যায় ; বিড়ম্বনার তাহা হয় না। পিতার বড় আদরের সোহাগের কন্যা, তাই পিতা বাল্যে আমার বিবাহ দেন নাই। যখন আমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর—যৌবনের প্রথম উন্মেষে পৃথিবীর সব যখন সুন্দর বোধ হইত, যখন অনির্দ্দিষ্ট প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় আপনা আপনি চঞ্চল হইয়া উঠিত, যখন সমবয়স্কা বালিকারা স্বামী-স্নেহ-সম্পদে সংসারের সুখ-তরঙ্গে ভাসিতে থাকিত—সেই সন্ধিক্ষণে এক পূর্ণিমা রজনীতে আমার বিবাহ হইয়াছিল। তখন জানিতাম না যে, বিবাহ আমার পক্ষে মরীচিকা হইবে! শুভ-দৃষ্টির সময় একবার সলজ্জ-শঙ্কিত নয়নে স্বামীর মুখ দেখিয়াছিলাম। কিন্তু বস্ত্রাবরণের মধ্যে অনুজ্জ্বল আলোকে সে মুখ স্পষ্ট দেখিতে পারি নাই। তবু তাঁহার উদ্দেশে হৃদয় অর্পণ করিয়াছিলাম। কে জানিত, দেবতার ইচ্ছা নহে—আমার দান সফল হয়। মনে করিয়াছিলাম, পিতৃ-স্নেহে, স্বামী-প্রেমে মাতৃশোক ভুলিয়া যাইব ; পিতার হৃদয়ে শান্তি আনিয়া দিব। কুহকিনী আশা আমাকে স্বর্গের ছবি আঁকিতে দিয়া তুলি কাড়িয়া লইয়াছিল।

"বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর পিতা আমাকে শ্বশুর-গৃহে যাইতে দিতে পারেন নাই; জামাতাকে নিজ গৃহে রাখিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বিবাহের একমাস পরে যখন আমি স্বামি-সন্দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আবেগ অনুভব করিতেছিলাম তখন শুভদিনে স্বামী আসিলেন। লজ্জার—শঙ্কার সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বামিসম্ভাষণের জন্য মনকে দৃঢ় করিলাম। পিতার স্বভাবতঃ মলিন মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। নিশাসমাগমে—পূর্ণিমার পূর্ণালোকে, কি এক আকাঙ্ক্ষাউদ্বেল হৃদয়ে এই গৃহে—এই শয্যার পার্শ্বে স্বামী-সন্দর্শনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। অশ্রু প্রবোধ মানে না—আর লিখিতে পারি না"—

পৃষ্ঠাটি অশ্রু কলুষিত। পর পৃষ্ঠায় শান্ত লিখিয়াছে :—

"কাঁদিয়া হৃদয় শান্ত হইয়াছে। এমন সঙ্গী নাই—সখী নাই যে, হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিয়া শান্তি লাভ করিব। কাহাকেই বা বলিব, কেমন করিয়া বলিব,—আমার দগ্ধ অদৃষ্টের অদ্ভুৎ রহস্য কেমন করিয়া জানাইব? যখন শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম তখন হৃদয়ের সমস্ত দৃঢ়তা কোথায় চলিয়া গেল; এক হাত ঘোমটা টানিয়া পলাইবার উপক্রম করিলাম। স্বামী আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমার হাত ধরিলেন এবং আমাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইলেন। তাঁহার শরীর ঈষৎ কম্পিত হইল, এবং পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার বাহু-বেষ্টন শিথিল হইয়া গেল। মুক্তিলাভ করিয়া আমি একেবারে শয্যার নিম্নে নামিয়া আসিলাম। কতক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম! স্বামীর আর কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না! মনে করিলাম, তিনি আমার সঙ্কোচের প্রশ্রয় দিতেছেন, অথবা তাঁহার অভিমান হইয়াছে। ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হইল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন মুক্ত বাতায়নপথে গৃহের মধ্যে রৌদ্র আসিয়াছে। লজ্জায়—সঙ্কোচে মরিয়া গেলাম। তখনও স্বামী শয্যায় নিদ্রিত। দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। হায়, কাল লজ্জা! তখনও যদি একবার চাহিয়া দেখিতাম,—তাহা হইলে এখন যাহা স্বপ্ন—যাহা কল্পনায় আনিতে পারি না, তাহার ছবি হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আজীবন ইষ্ট দেবতার পূজা করিতে পারিতাম।

"কিন্তু সে কি কাল রাত্রি পোহাইয়া ছিল! বেলা হইল, ক্রমে দশটা—এগারটা বাজিয়া গেল। স্বামী তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। পিতা উৎকণ্ঠিত হইলেন; ধাত্রীকে জামাতাকে ডাকিতে বলিলেন। ধাত্রী আসিয়া আমাকে রহস্য করিয়া বলিল 'যাও' না, মা, জামাই বাবুকে ডাকিয়া দাও।' আমি

ভ্রুকুটি করিলাম। সে হাসিতে হাসিতে আমার গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। আমি রান্নাঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। রান্নাঘরে কেবল পৌঁছিয়াছি এমন সময় ধাত্রী কাঁদিয়া উঠিল, 'ওগো বাবু, গো।' 'কি হয়েছে—কি হয়েছে' বলিয়া পিতা উপরে ছুটিয়া যাইলেন। আমি এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িলাম।

"ক্রমে কোলাহল বাড়িয়া উঠিল। ধাত্রী এবং পাচিকা কাঁদিতে লাগিল। পিতা দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর যখন ডাক্তার চলিয়া গেলেন, ধাত্রী আসিয়া আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং শুনিলাম, পিতার মূর্চ্ছা হইয়াছে। তখন বুঝিলাম, যাহা আমার সুখ-শয্যা বলিয়া রচিত হইয়াছিল তাহা স্বামীর অনন্ত শয্যায় পরিণত হইয়াছে। এই আমার নিয়তি! ধাত্রীর অশ্রু দেখিয়া আমার নয়নেও জল আসিয়াছিল, কিন্তু তখনও আমার সর্ব্বনাশ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি নাই। সন্ধ্যার সময় বিবর্ণ মুখে পিতা শ্মশান হইতে গৃহে ফিরিলেন, ধাত্রী আমার হাতের 'নোয়া' খুলিয়া লইল। আমি বিধবা।

"বিধবা!—কেন বিধবা হইলাম তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না? বিবাহ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে যে একটা স্বপ্ন! তথাপি আমি বিধবা! হায়, ভগবান! কোন্ পাপে আমার ভাগ্যে এমন অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল? শুনিয়াছি, ডাক্তার বলিয়াছিলেন, স্বামীর হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল ছিল; অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের গতিরুদ্ধ হইয়া সহসা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। আমাকে হৃদয়ে লইতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিকল হইয়াছিল, সুতরাং আমিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। জগতে কে এমন সহৃদয় আছেন যে তিনি বুঝিতে পারিবেন, যখন এই কথা মনে হয় তখন আত্মগ্লানিতে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বে এমন হইত না, কিন্তু যখন বৈধব্যের বিড়ম্বনা বুঝিতে পারিলাম—যখন কুহেলিকা অপসৃত হইয়া এক জাগ্রত স্বপ্ন হৃদয় জুড়িয়া বসিল, তখন বুঝিতে পারিলাম, আমার সর্ব্বনাশ কত ভয়ানক। তখন মৃত্যুর বিনিময়ে মৃত্যু-ব্রত গ্রহণ করিয়া আত্মবলি দিতে বাধ্য হইলাম।

"লিখিতে বুক ফাটিয়া যায়; লজ্জায়, ক্ষোভে, রোষে হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা অনুভব করি; কিন্তু যখন সংকল্প করিয়া লিখিতে বসিয়াছি' তখন আত্ম-গোপন করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বাবা, আমি বাঁচিয়া থাকিতে

আমার এই কলঙ্ককাহিনী কখনও তোমার হস্তগত হইবে না। তবে আমার মৃত্যুর পর যদি কখনও ইহা তোমার হস্তগত হয়—জানি না তুমি তখন হৃদয়ে কত ব্যথা অনুভব করিবে। কিন্তু, বাবা, হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনকে জয় করিতে দিই নাই।

"আমার বৈধব্যের একবৎসর পরে একদিন ক্ষান্তবর্ষণ প্রাবৃটের মধ্যাহ্নে সুরেশ বাবু নামক একজন সুকান্তি যুবা পুরুষ বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। দ্বারন্তরাল হইতে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, সেই দিন তাঁহার সহিত প্রথম পিতার পরিচয় হইল। তিনি মধ্যে মধ্যে পিতার নিকট জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার নিমিত্ত এবং বিষয়বিশেষের উপদেশ লইবার জন্য আমাদের বাটীতে আসিতেন। সেই প্রথম দিন পিতার জন্য পান লইয়া উপরে আসিতেছি, এমন সময় সুরেশ বাবু নিম্নতলে নামিয়া যাইতেছেন। পরস্পর সম্মুখীন হওয়াতে উভয়ের চক্ষু দৃষ্টিবিনিময় করিল। তাঁহার সেই উজ্জ্বল, সহাস্য, সৌম্য মূর্ত্তিতে কেমন এক আকর্ষণী শক্তি ছিল যাহাতে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি, সুতরাং তাঁহাকে উপরে উঠিয়া যাইতে হইল। তাহার পর আমি পিতার গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি নামিয়া গেলেন।

"সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত কথা পিতা আমার সহিত আলোচনা করিতেন, সেদিনও গল্পচ্ছলে বলিলেন, 'এইমাত্র যে যুবক আসিয়াছিল, উহার শিক্ষা যেমন উচ্চ, হৃদয় তেমনই মহৎ। মুগ্ধ যুবা লোক-সেবায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে ; কিন্তু জানে না যে, গন্তব্য পথ কত পিচ্ছিল—কত অশুভ আশঙ্কায় পরিপূর্ণ।' কথাপ্রসঙ্গে পিতা তাঁহার বিদ্যার এবং বিনয়ের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। পিতার প্রশংসা আমার দুর্ব্বল হৃদয়কে তাঁহার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত করিল।

"তাহার পর সুরেশ বাবু মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটীতে আসিতেন এবং তাঁহার চরিত্রগুণে অল্প দিনে পিতার বিশেষ প্রিয় এবং বিশ্বাস-ভাজন হইয়া উঠেন। এমন কি তিনি উপস্থিত থাকিতে পিতা তাঁহার অভ্যাসবশতঃ আমাকে কক্ষমধ্যে ডাকিতে সঙ্কোচবোধ করিতেন না এবং আমি সঙ্কোচবোধ করিলে বলিতেন, 'লজ্জা কি, মা, ঘরে সুরেশ আছে। সুরেশ আমার ছেলের মত।' এমনই করিয়া কতদিন কাটিয়া গেল। সুরেশ বাবু তাঁহার সংযত শিষ্টাচরণে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। বাহিক ঘনিষ্ঠতার সহিত হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতাও বাড়িতে লাগিল। তাহার পর যখন নির্দ্দিষ্ট দিনে কোন কারণে তিনি না আসিতে পারিলে মন উচাটন হইত, আসিলে হৃদয় প্রফুল্ল হইত,—তখন একদিন শুনিলাম, তাঁহার পত্রে 'প্রেরিত

পত্রে' অনবধাবনতা বশতঃ তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তখন হৃদয়ে যে সহানুভূতির বেদনা বাজিয়া উঠিল, তাহা যে গভীরতায় কর্ত্তব্যের সীমা অতিক্রান্ত করিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম; এবং যখন তাঁহার একবৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইল তখন বুঝিলাম, স্ত্রী-হৃদয় নির্লিপ্ত উপাসনায় সন্তুষ্ট থাকে না—একদিন না একদিন তাহা ঈপ্সিতের ছবি আঁকিয়া হৃদয়ের পুণ্য-পবিত্রতা মলিন করে। অভাগিনী বিধবা!

"সে দিন হৃদয়ে যে বেদনা পাইয়াছিলাম লোক চক্ষুর অন্তরালে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তাহা লঘু হইল না। পরন্তু যে কঠোর সত্য এত দিন অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহার অনুশোচনা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। যখন হৃদয় যুক্তির বাঁধ অতিক্রান্ত করিত,তখন দুই হাতে বুক চাপিয়া,চক্ষু মুদিয়া মনে করিতাম, আমার স্বামী আমাকে হৃদয়ে টানিয়া লইতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। সে কি কঠোর সংগ্রাম তাহা কে বুঝিবে? কাতর প্রাণে ডাকিতাম, প্রভু, আমায় রক্ষা কর। দুর্ব্বল হৃদয় অদৃষ্ট—অজ্ঞেয় অন্ধকারে আস্থা স্থাপন করিতে পারিত না। তাই মনকে দৃঢ় করিয়া মৃত্যু-সংকল্প করিলাম, হৃদয়ের বিনিময়ের পরিবর্ত্তে মরণের বিনিময় গ্রহণ করিলাম। বোধ হয়, ভগবান আমার সহায় হইয়াছিলেন তাই এই ইচ্ছা-মৃত্যুর উদ্‌যাপন আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। এতদিন বৈধব্যের যে সকল কঠোরতা অবলম্বন করি নাই, এক এক করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিলাম। পর-লোকের প্রেতাত্মার জন্য যেমন হৃদয় বলি দিয়াছিলাম, ইহলোকের অন্তরাত্মার জন্য তেমনই কারাগারের কঠোরতা গ্রহণ করিলাম। পিতা আমার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু, বোধ হয়, আমার বুদ্ধির পরিপক্বতা অনুভব করিয়া কোন আপত্তি করেন নাই। দিন দিন আমি মলিন হইয়া যাইতেছি লক্ষ্য করিয়া পিতা আমাকে মধ্যে মধ্যে শরীরের প্রতি যত্ন করিতে বলিতেন; কিন্তু সুরেশ বাবুর দুর্ভাগ্যে তাঁহার হৃদয়ে এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাঁহার সংসারের বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়াছিল। তাঁহাকেও বিপদাশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত।

"যখন এক বৎসর পরে সুরেশ বাবু মুক্তাকাশের স্বাধীন বায়ুতে আসিলেন তখন আমি মরণের পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি; প্রত্যহ অল্প অল্প জ্বর হয় এবং বক্ষে কেমন একটু বেদনা অনুভব করি। পিতা মধ্যে মধ্যে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। আমি ছলনা করিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতাম। পিতা জেলখানা হইতে সুরেশ বাবুকে

আনিয়া আহারাদি করাইলেন। বন্ধুগণ চলিয়া গেলে সুরেশ বাবু পিতার সহিত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং আমার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন। কারামুক্ত হইয়া শারীরিক স্বাধীনতার সহিত তাঁহার মনও অনেকটা স্বাধীন হইয়াছিল, তাই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শান্ত, তোমার শরীর এত দুর্ব্বল কেন ; কোন অসুখ হইয়াছিল ?' কিন্তু তিনি যতক্ষণ আমার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার মুখে প্রথম উচ্চারিত আমার নাম শুনিয়া আমি ততক্ষণ আরক্তিম মুখে অন্তরের অস্থিরতা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। পিতা আমার শঙ্কট সহায় হইলেন। তিনি বলিলেন, 'প্রায় একবৎসর শান্তের শরীর কেমন কৃশ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দেয়।' সুরেশ বাবু বলিলেন, 'কেন ?' এবং আমার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া যেন আমার হৃদয়ের কোন গোপন কথা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। এ দৃষ্টি তাঁহার জেলের অভ্যাস। কারাগারে কথায় যাহা জানা যায় না, দৃষ্টিতে তাহা জানিতে হয়।

"আমার উত্তরের আবশ্যক হইল না। বাহিরে আরও লোক আসিয়াছিলেন ; তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইতে হইল। যাইবার সময় যে করুণ দৃষ্টি বিদায়-সূচনা করিল তাহাতে যেন তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, আমি যদি তাঁহার কথা ভাবিয়া থাকি, তিনিও আমার কথা বিস্মৃত হয়েন নাই। হায়, মূঢ় কল্পনা !

"আজ কয়দিন 'শয্যাশায়ী' হইয়াছি—পিতা দিনরাত্রি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন আর আমি তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেমন পিকদানিতে ঔষধ জমা হইতেছে, আমার আয়ু তেমনই ফুরাইয়া আসিতেছে। আজ অবসর পাইয়া খাতা লইয়া বসিয়াছি ; কিন্তু শ্রান্তির মাত্রায় বুঝিতেছি, বোধ হয় আর কোন দিন এ খাতা ছুঁইতে পারিব না। আমার অসুখের পর সুরেশ বাবুর আমাদের বাটীতে আসিবার অবসর হয় নাই। বাবার নিকট শুনিয়াছি, বাঙ্গালার রাজনৈতিক আকাশ এখন ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি একদিন ও আসিতে পারিতেন না ? অথবা তাঁহার না আসিবার কোন গূঢ় কারণ আছে ? মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার যদি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম ! পিতাকেই বা কেমন করিয়া বলি, তাঁহাকে একবার আসিতে অনুরোধ করেন। পিতা, অধম সন্তানের এ দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিও। আজ মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া তোমাকে ফেলিয়া যাইতে হৃদয় বড় কাঁদিতেছে। কিন্তু জীবনে আমার বিপদ—মরণে আমার মঙ্গল। আর লিখিতে পারি না—চক্ষুতে যেন সব অন্ধকার দেখিতেছি। পিতা—পিতা"—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি রজনীকান্ত। *

—:০:—

বিগত ২৮এ ভাদ্র মঙ্গলবার কবি রজনীকান্ত সেন অসহ্য রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন।

কবির পরিচয় কাব্যে। রজনীকান্ত কোন বৃহৎ কাব্য রচনা করেন নাই। কিন্তু কতিপয় সঙ্গীতরচনা করিয়া তিনি কয়েক বৎসরমধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে যে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। রজনীকান্তের সঙ্গীতের সহিত পরিচিত নহেন, শিক্ষিত সমাজে বোধ হয় আজ এমন কেহই নাই। শুধু কবিতা অপেক্ষা সুরতাললয়সমন্বিত গান সহজেই লোকচিত্ত আকৃষ্ট করিয়া থাকে। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অদ্ভুত। একদিন সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদের গানে দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক কালেও, ৺হরিনাথ মজুমদারের বাউল সঙ্গীত অল্পকালমধ্যে বঙ্গদেশে যেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, কোন প্রসিদ্ধ কবির রচনাই সেরূপ পরিচিত হইতে পারে নাই।

রজনীকান্তের কোমলকান্ত পদাবলীর বিশেষত্ব—তাহাদের খাঁটি স্বদেশীয়ত্ব। সেগুলি বিদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত নহে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় রজনীকান্ত নিতান্তই বাঙ্গালীর ঘরের কবি। আধুনিক অধিকাংশ কবিতায় যে একটা অস্পষ্টতা ও অবসাদের ভাব পরিলক্ষিত হয়, রজনীকান্তের রচনায় তাহার ছায়ামাত্র নাই। প্রাঞ্জলতা তাঁহার রচনার প্রধান গুণ। সম্প্রতি বঙ্গভাষায় স্বদেশানুরাগ-প্রণোদিত সঙ্গীতের অভাব নাই; কিন্তু রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" এবং "ভাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত"—এই সরল গান দুইটি দরিদ্র বাঙ্গালীর মর্ম্ম যেরূপে স্পর্শ করিয়াছে, অন্য কোন গানই তাহা পারে নাই।

রজনীকান্তের রচিত অধিকাংশ গানই 'বাণী' ও 'কল্যাণী' নামক দুইখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'কল্যাণী' ১৩১২ সালে, ও 'বাণী' তাহার ২ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তক দুইখানি

* রাণাঘাট আলোচনা সমিতিতে পঠিত।

পাঠ করিয়া প্রথমেই মনে আক্ষেপ হয় যে, যিনি এই দুর্লভ কবি-প্রতিভা লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তিনি দীন বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে আরও রত্নরাজি দান করিয়া যাইতে পারিলেন না। ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।"—রজনীকান্তের প্রতিও এই উক্তি প্রযোজ্য। সকলেই অবগত আছেন, উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া রজনীকান্ত বিগত ৮ মাস কাল মেডিক্যাল কলেজ হাস্পাতালে ছিলেন, তাঁহার বাক্‌শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাঁহার বাণী-আরাধনার বিরাম ছিল না। এই রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও তিনি তিনখানি কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহার দুই খানি এখনও যন্ত্রস্থ। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনে সাহিত্য-সেবার উপযুক্ত অবসর থাকিলে, অথবা তাঁহার জীবন-প্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত না হইলে, তিনি 'বাণী' ও 'কল্যাণীর' ন্যায় আরও অমূল্য কাব্যগ্রন্থ রচনা করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ ৪৪ বৎসরমাত্র বয়সেই রজনীকান্ত সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

রজনীকান্তের কাব্যের সমালোচনার উপযুক্ত সময় এখন নহে। আজ তাঁহার অতি শোচনীয় অকাল মৃত্যুর স্মৃতি আমাদিগের হৃদয় পীড়িত করিতেছে। কাব্য অপেক্ষা কবির কথাই আজ আমাদের সমধিক মনে পড়িতেছে। তাঁহার চির-নীরব কণ্ঠস্বর এখনও আমাদের কাণে বাজিতেছে।

রজনীকান্তের হাসির গানে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহাকে "রাজসাহীর ডি. এল্. রায়" বলিতেন। বস্তুতঃ বঙ্গ সাহিত্যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ব্যতীত অন্য কোন কবি হাসির গান রচনায় তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু রজনীকান্তের কোন কোন হাসির গান রায়-কবির অনুসরণে রচিত হইয়া থাকিলেও ঐ সকল রচনায় তাঁহার নিজস্ব যথেষ্ট আছে। তাঁহার রচনা ছায়া অথবা প্রতি-ধ্বনিমাত্র নহে। একজন প্রবীণ সমালোচক লিখিয়াছেন—"পরবর্ত্তী লেখকদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিভাশালী লেখকদের কতকটা অনুবর্ত্তী হইতেই হইবে; ইহা অপরিহার্য্য। তাহাতে ক্ষমতার অভাব বুঝায় না; পৌর্ব্বাপর্য্যমাত্র বুঝায়।"—রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্ত্তী এই হিসাবেই তাঁহাকে হাস্য রসের রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবর্ত্তী বলা যাইতে পারে।

কিন্তু রজনীকান্তের হাসির গানে ও দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে প্রভেদও বিস্তর। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সভায়, মজ্‌লিসে, হাস্যতরঙ্গ উত্থিত করে সত্য, কিন্তু হৃদয়ে স্থায়ী হয় না। মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে এইরূপ অনাবিল হাস্য যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু রজনীকান্তের হাসির গান ও কৌতুক-রচনার অন্তরালে দেশের ও সমাজের জন্য গভীর মর্ম্মবেদনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

বাস্তবিক, আমাদের বেশভূষা, কথাবার্ত্তা ও আচারব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যই হাস্যরসের আকর। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে চারিদিকেই হাস্যরসের প্রচুর উপাদান বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সুসঙ্গতির সীমারেখা ঠিক কোন স্থানটিতে অতিক্রান্ত হইলে হাস্যরসের উদ্ভব হয়, অনেকে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা যিনি উহা নির্ণয় করিতে পারেন, তিনি হাস্যরসরসিক।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি পীড়ন, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অধঃপতন ইত্যাদি সুপরিচিত বিষয়ে রজনীকান্ত যে সকল ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র হাস্য-অবতারণার উদ্দেশ্যে রচিত—কেহ এরূপ মনে করিতে পারিবেন না। কপটাচার, ধর্ম্মাভাব ও স্বার্থান্ধতার প্রতি তীব্র শ্লেষের বাণ নিক্ষিপ্ত করিতে কবি কোথাও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। হাসির গানের ব্যপদেশে রজনীকান্ত সমাজের ক্ষতস্থানগুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে ঔষধপ্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মুখে "বরের দর" সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া এক বিবাহ-সভায় বরকর্ত্তা যৌতুকের ফর্দ্দ সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এইরূপ শুনিয়াছি।

"বরের দর" কবিতাটির শেষ পংক্তি এই—"দেশের দশা হেরে কান্ত করে অশ্রু বরিষণ।"—এই স্থানে কবি নিজের হৃদয় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাস্য রসের আবরণ দিয়া রজনীকান্ত তাঁহার মর্ম্ম-বেদনাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কৌতুক হাসির সঙ্গে বেদনার অশ্রু মিশ্রিত।—কমলাকান্তের ভাষা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া রজনীকান্ত বলিতে পারিতেন !

"হাসির ছলনা করি কাঁদি।"

ভাবিয়া দেখিলে, তাপ ও আলোক যেমন একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ; এক ঈথরের কম্পনমাত্রার প্রকারভেদ—হাসি এবং অশ্রুও সেইরূপ হৃদয়ের উত্তেজনার মাত্রাভেদমাত্র। আমাদের অন্তরে একটা সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য-

বোধবৃত্তি আছে, লঘু আঘাতে তাহা হইতে হাসির আলোক বিচ্ছুরিত হয়, গভীরতর ভাবে বিচলিত হইলে তাহা অশ্রুর উৎস মুক্ত করিয়া দেয়। হৃদয়-বৃত্তির প্রভেদ-হেতু যে পীড়ন একজনের মনে কৌতুক আনয়ন করে, তাহাই অন্যের চিত্তে বেদনা-সঞ্চার করিয়া থাকে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ও রজনীকান্তের হাসির গানের স্বাতন্ত্র্য দেখাইবার জন্য, দুইটি গান এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। কবি দ্বিজেন্দ্র লাল লিখিয়াছেন—

খাও দাও নৃত্য কর মনের সুখে
কে কবে যাবি রে ভাই শিঙে ফুঁকে।
আছিস্ তুই প্যাঁচার মতন বসে' কেটা
যাচ্ছিস্ কে উড়িয়ে ধূলি, যা' না বেটা;
দুদিনে ভবের খেলা ভবের ল্যাঠা যাবে চুকে।
ইত্যাদি।

ইহার অনুরূপ রজনী কান্তের গান :—

আছ ত' বেশ মনের সুখে।
আঁধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও বুকটি ঠুকে।
* *
সমাজের নাইক মাথা কেউত আর দেয়না বাধা.
সবি টের পাবে দাদা সে রাখ্‌ছে'বেবাক টুকে;
কে কারে করবে মানা? অমনি প্রায় ষোল আনা
ভিজে বেড়ালের ছানা, ভাল মানুষ মুখে;
যত খুন ডাকাতি প্রবঞ্চনা * * *
এর মজা বুঝবে সেদিন যে দিন যাবে শিঙে ফুঁকে।
('কল্যাণী'—৬৬ পৃঃ)

ইহাকে হাসির গান বলিব, না পারমার্থিক সঙ্গীত বলিব?

রজনীকান্ত হাস্য রসকে কেবলমাত্র ক্ষণিক চিত্তরঞ্জনের উপায় মনে করেন নাই, উঁহাকে যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য বিদূষকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া না দিয়া, শিক্ষক, সুহৃদ, উপদেষ্টা সকলেরই যে উঁহাতে অকুণ্ঠিত অধিকার আছে, দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে, বঙ্গ সাহিত্যে হাস্য রসের প্রসার সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি;
"নির্ম্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ সাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গ সাহিত্যে হাস্য রসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভা-

জনের মনোরঞ্জন করিত। আদি রসেরই সহিত যেন তাহার কোন একটি সর্ব্বউপদ্রবসহ বিশেষ কুটুম্বিতা ছিল। * * * যেখানে গম্ভীর ভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা হইত, সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

"বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে। উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। * * * এই হাস্য-জ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়।"

রজনীকান্ত সর্ব্বত্র হাস্যরসের এই গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু রজনীকান্ত যে কেবল হাসির গানের কবি, তাহা নহে। হাসির গান সম্পর্কেই তিনি সাহিত্য-সমাজে প্রথম পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তি-রসাত্মক সঙ্গীতের জন্যই তিনি অমরত্ব লাভ করিবেন—ইহা সাহসপূর্ব্বক বলা যায়।—অসাধারণ প্রতিভা-বলে, মধুর, প্রগাঢ়, ভক্তি রসের সহিত "নির্ম্মল উজ্জ্বল শুভ্র" হাস্য রসের একত্র সমাবেশে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অন্য কোন আধুনিক কবি এরূপ সফলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সৃষ্টির রহস্য, সৃষ্টির বিশালত্ব, সৃষ্টির বৈচিত্র্য, সৃষ্টির চিরশৃঙ্খলা, ইত্যাদি বিষয় তিনি এমন কৌতুকমিশ্রিত সরলভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাঠ করিলেই মুগ্ধ হইতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি গানের উল্লেখ করিতেছি :—

ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে ;
দেখ্‌ব সে উপাধি নিলে,
ক'টা "কেন"র জবাব শিখে।
ধরা কেন কেন্দ্র পানে, ছোট বড় সবকে টানে,
বোঁটা-ছেঁড়া ফলটি কেন দেয় না যেতে অন্য দিকে।

* * * * *

কান্ত বলে, আছে জেনো, "কেন"র "কেন," তস্য "কেন,"
যাও, নিখিল "কেন"র মূল কারণে,
সে রেখেছে কালের খাতায় লিখে।—

("নিরুত্তর"—'বাণী' ৫৪ পৃঃ)

* * * * *

কে পুরে দিলে রে,—
আলোকের গোলক দিয়ে, এই অন্তশূন্য ফাঁক
কি বিরাট বন্দোবস্ত ভাবতে লাগে তাক্।
কে ধরে আছে তুলে, কি ধরে আছে ঝুলে
পড়েনা সুতো খুলে বছর কোটী লাখ।

*　　*　　*　　*　　*

'জ্ঞান' দেখে বুঝবি, পাছে 'জ্ঞানী,' এক বসে আছে,
কান্ত তুই বুঝবি যদি, সেই জগদ্ গুরুকে ডাক।"—

("গ্রহরহস্য"—'কল্যাণী' ৭৫ পৃঃ)

*　　*　　*　　*

সে কিরে মন মুড়কি মুড়ি, মণ্ডা জিলিপি কচুরী
যে তাম্রখণ্ডে খরিদ হবে উদরস্থ হয়ে যাবে?
সেতো হাঠ বাজারে বিকোয় না রে, থাকে নাতো গাছে ক'লে,
দিল্লীলাহোর নয়, যে রাস্তা করীম চাচা দেবে বলে'।
মামলাতে চলে না দাওয়া, ওয়ারিস সূত্রে যায় না পাওয়া,
সে যে নয় মলয়া হাওয়া, যে বাহার দিয়ে বেড়িয়ে খাবে।
সে যে যোগী ঋষির সাধনের ধন, ভক্তি মূলে বিকিয়ে থাকে,
সে পায়, "সর্ব্বং সমর্পিতমস্তু" বলে যে জন ডাকে।

*　　*　　*　　*

("সাধনার ধন"—'কল্যাণী,' ৬১ পৃঃ)

রজনীকান্তের অনেকগুলি ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত ভাষা, ভাব ও ছন্দের পবিত্র ত্রিবেণী-সঙ্গম। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে হইলে 'বাণী' ও 'কল্যাণীর' অধিকাংশ কবিতাই উদ্ধৃত করিতে হয়। রচনা-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অধিক কিছু না বলিয়া রজনী-কান্তের ভক্তি-সাধন প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তব্য সংক্ষেপে শেষ করিব।

রজনীকান্তের সাধনা সরল ভক্তির সাধনা। তাঁহার উপাসনা—সাম্প্রদায়িকতা-বর্জ্জিত। তিনি জটিল দার্শনিক তর্কের অরণ্যে যাইয়া পথহারা হয়েন নাই; বিশ্বাসের প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তিতত্ত্বপ্রহেলিকা নহে।

তিনি বলিতেছেন :—

না রাখি জটিল ন্যায়ের বারতা,
বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা,
আমি জানি তুমি আমারই দেবতা,
তাই আমি হৃদে বসি' হে;

তাই বলে ডাকি, প্রাণ যাহা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়,
যখন যে রূপে প্রাণ ভরে' যায়,
তাই দেখি প্রাণ ভরি' হে!
('কল্যাণী'—৪৭ পৃঃ)

তাঁহার ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতবলীর মধ্যে সাধনার একটা সূত্র পরিলক্ষিত হয়। সাধনার বিভিন্ন অবস্থা তাঁহার গীতাবলীতে কিরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।—

(১) প্রথমে, অতৃপ্তি। সংসারকে আমরা খুবই ভালবাসি, কিন্তু তথাপি সংসার লইয়া কেহই সন্তুষ্ট নহি। যতই সংসারের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে, ততই এই অসন্তোষেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই অতৃপ্তিই আত্মোন্নতির মূল। অতৃপ্তি আমাদের দৃষ্টি অন্তর্মুখী করে। এই অতৃপ্তির উদয়ে রজনীকান্ত গাহিয়াছেন—

এ কি বিভীষিকাময় অন্ধকার।

*　　*　　*　　*

হীন স্বার্থময় ধরা নিষ্ঠুরতা ভরা
শুধু প্রবঞ্চনা, অবিচার। ('বাণী'—৯ পৃঃ)

(২) অতৃপ্তি হইতে অনুশোচনা। অসার বিষয়-সুখে মগ্ন হইয়া জীবন যে ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে কাহার না মনে আক্ষেপের উদয় হয়?

যৌবনে, হরি, ছাইল ভীষণ অবিশ্বাস ঘন মেঘে,
বহিল প্রবল পাপ-পবন ডুবাইল ঘোর অন্ধ তিমিরে।
('বাণী'—৩২ পৃঃ)

(মম) সুপ্ত হৃদয় করি নয়ন-নিমীলন
না করিব তব করুণা অনুশীলন,
মোহ ঘিরিল মোরে রহি চির ঘুম ঘোরে
ব্যর্থ জীবন গেল ফুরাইয়ে, হায়। (ঐ—৩৪ পৃঃ)
যেমনটি তুমি দিয়াছিলে মোরে,
তেমনটি আর নাই হে সখা;
(তুমি) দিয়াছিলে কত অমূল্য রতন—
(আমি) ফিরায়ে এনেছি ছাই, হে সখা।
('কল্যাণী'—৩১ পৃঃ)

(৩) তাহার পর, ব্যাকুলতা। প্রেমের কৃপালাভ করিবার জন্য প্রার্থনা—

ওই বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু
দেখাও তব চির-আলোক-লোক।
দেবতা গো দয়া করি' কর পরিত্রাণ। ('বাণী'—১৩পৃঃ)

* * * * *

হৃদয়ে বহ্নি জ্বালা নয়নে অন্ধ তম;
কোথা শান্তি নিদান, কর শান্তি বিধান ('বাণী'—১৪ পৃঃ)

(৪) সাধনার পরবর্ত্তী স্তর প্রেমানন্দ। ব্যাকুল প্রার্থনায় দয়াময় কখনই বধির থাকিতে পারেন না। শুদ্ধচিত্তে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে অপূর্ব্ব আনন্দরসে ভক্তের হৃদয় সিক্ত হয়:—

যে দিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,—

* * * * *

যেন তোমার পুণ্যপরশ, করে' তোলে এই চিত্ত সরস;
উথলিয়া উঠে বক্ষে হরষ বিবশ হইয়া থাকি!—
('বাণী'—২৮ পৃঃ)

(৫) এই অবস্থার পর, ভগবানের কৃপালাভ। প্রথমে, বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায় ভক্ত-হৃদয়ে ভক্ত-বৎসলের ক্ষণিক বিকাশ—এই অবস্থা রবীন্দ্র বাবু একটি গানে অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।"

রজনীকান্ত গাহিয়াছেন:—

কোন্ শুভ গ্রহালোকে, কি মঙ্গল-যোগে
চকিতে যেন গো, পাই দরশন।
সেই ক্ষুদ্র এক পল, কৃতার্থ, সফল,
রোমাঞ্চিত তনু, ঝরে দুনয়ন।

* * * * * *

আঁখি মুদি,' আমার নিখিল উজল,
আঁখি মেলে,—আমার আঁধার সকল;
কোন্ পুণ্যে পাই, কি পাপে হারাই
তুমি জান গো, সাধক-শরণ!
('বাণী'—৩০ পৃঃ)

(৬) ভগবৎ প্রেম প্রগাঢ় হইলে, অন্তরে বাহিরে সেই চিরসুন্দর, চির-স্বপ্রকাশ, চির মঙ্গালয়ের উপলব্ধি। ইহাই ভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন। ভক্ত কবি এই অবস্থায় আসিয়া গাহিতেছেন:—

পূর্ণজ্যোতিঃ তুমি, ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি
চন্দ্রমা কহিছে, তুমি সুশীতল ।
('কল্যাণী'—৩৭ পৃঃ)

তুমি সুন্দর, তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর, শোভাময় ;
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দনপ্রভাময় !
তুমি অমৃত-বারিধি হরি হে, তাই তোমারি ভুবন ভরি হে,—
পূর্ণ চন্দ্রে, পুষ্পগন্ধে, সুধার লহরী বয়,
ঝরে সুধাজল, ধরে সুধাফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয় ।
('কল্যাণী'—৫৩ পৃঃ)

চন্দ্রালোকিত 'নিশীথে' তিনি গাহিতেছেন—

নিভৃত হৃদয়-কন্দরে,—হের পরম সুন্দরে
হওরে মধুর-প্রেমময়-উৎসব-মাতোয়ারা ।
(ঐ —৫৪ পৃঃ)

(৭) সাধনের চরম অবস্থা আত্ম-সমর্পণ ।—তখন আর কোন দুঃখ নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই—

(আমি) দেখেছি জীবন ভরে চাহিয়া কত,
(তুমি) আমারে যা দাও, সবই তোমারি মত ।

* * * * *

কিসে মোর ভাল হয় ; তুমি জান, দয়াময়,

* * * * *

চাহিব না কিছু আর, দিব শ্রীচরণে ভার
হে দয়াল, সদা মম কুশল-রত ।
('বাণী'—২৬ পৃঃ)

তখন সর্ব্বস্ব ভগবান্‌কে অর্পণ করিয়া তন্ময়চিত্ত সাধক গাহিতেছেন—

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব ।
তোমারি দুনয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হাহা রব ।
(ঐ—২০ পৃঃ)

(৮) সাধনের শেষ ফল, ভগবানের সহিত মিলন। এই 'মিলনানন্দ' কেহ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন নাই, উহা অনির্ব্বচনীয়। ভক্ত কবি গাহিতেছেন :—

বিভল প্রাণ মন, রূপ নেহারি,
তাত! জননী! সখে! হে গুরো! হে বিভো!
নাথ! পরাৎপর! চিত্তবিহারি!

*　　*　　*　　*　　*

নিত্য! নিরাময়! হে প্রভো! হে প্রিয়!
সফল আজি মম অন্তরেন্দ্রিয়!
মনোমোহন! সুন্দর! মরি বলিহারি!

('কল্যাণী'—৪৫ পৃঃ)

আমরা এ স্থলে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারি—

"ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন তুই যোড় কর করি
কর্ তাহা দরশন।—"

ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রজনীকান্তের কত দৃঢ় ছিল, তাহা আমরা তাঁহার রোগশয্যায় রচিত সঙ্গীতগুলি পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। আসন্ন মৃত্যুচ্ছায়ায় বসিয়া তিনি 'অমৃত' নামক একখানি নীতিগর্ভ কবিতাপুস্তক এবং 'অভয়া' ও 'আনন্দময়ী' নামক দুইখানি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। হাস্যরসিক কবি সত্য সত্যই রোগ ও মৃত্যুকে পরিহাস করিয়া আনন্দময়ীর অভয় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাণান্তকর রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া বাগ্দেবীর এইরূপ একনিষ্ঠ উপাসনার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল। যখন আরোগ্যের আশা অস্তমিত, বাক্‌শক্তি অন্তর্হিত, তখনও রজনীকান্ত লিখিয়াছেন—

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব্ব করিতে দূর
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য সকলি করেছ দূর।
ঐগুলো সব মায়াময়রূপে, ফেলেছিল মোরে অহমিকাকূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে, দয়াল, করেছ দীন আতুর।—

*　　*　　*　　*　　*

('প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩১৭)

কেড়ে লহ নয়নের আলো, পাপ নয়ন কর অন্ধ,
চির যবনিকা পড়ে যাক্ হে, নিভে যাক্ রবি তারা চন্দ্র।

*　　*　　*　　*　　*

তুমি, মূর্ত্তিমান্ হয়ে এস প্রাণে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ,
এনে দাও অভিনব চিত্ত—তৃপ্তিতে সে মিলনানন্দ।
('বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ)

একদিন রজনীকান্ত গাহিয়াছিলেন :—

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে,
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল
তোমারি করুণা-চন্দনে।

*   *   *   *   *

কবে ভবের সুখ দুঃখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না
কাহারো আকুল ক্রন্দনে!
('কল্যাণী'—১০ পৃঃ)

২৮শে ভাদ্র রজনীতে রজনীকান্তের বান্ধবগণ এই গানটি গাহিতে গাহিতে তাঁহার দেহ ভাগীরথী তীরে লইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

প্রবাহ।

—:—

প্রণয়ের স্বপনের মত
হাসে আলো কিরীটে উষার ;
প্রকৃতির হৃদে শত শত
উঠে যেন লহরী আশার।
বাড়ে বেলা—আলোক-লহরী,
শোভে বিশ্ব উজ্জ্বল কিরণে ;
মর্ম্ম-দ্বার যেন মুক্ত করি'
ভাসে ধরা প্রণয়-প্লাবনে।

মহিমায় বিশ্ব আলোকিয়া
গরিমায় হেসে চলে যায়,
আঁধারে দুয়ারে আসিয়া
চাহে আলো লইতে বিদায়।
অই চিতা গোধূলীর গায় ;
শেষ আশা গেল যেন ছলি' ;
উষা—সন্ধ্যা কত আসে যায়—
নাহি ফিরে, যায় যাহা চলি'।

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

মৃত্যু-মিলন।

—:•:—

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:•:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

প্রেমিকা।

দিবাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই। সূর্য্য অস্ত যায় যায়। পশ্চিম গগনে মেঘের ক্রীড়া,—যেন দিগঙ্গনার চঞ্চল অঞ্চল পবনে আন্দোলিত হইয়া নানা আকার ধারণ করিতেছে—নানাবর্ণের বিকাশ দেখাইতেছে। পাখীরা কলরব করিতে করিতে নীড়ে ফিরিতেছে। শক্ত সিংহের উদ্যানে রজনীগন্ধা ফুটিব ফুটিব করিতেছে, বেল-কলি ফুটিবে কি না ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিতেছে; আর উদ্যানের এক প্রান্তে—বৃক্ষ-মূলে সৈনিক যে প্রস্তরখানি গড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই শিলাখণ্ডের উপর সেই দুই জন যুবতী—শক্ত সিংহের কন্যা রেবা ও তাহার সহচরী ভদ্রা উপবিষ্টা। রেবার মুখে সন্ধ্যার অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তী স্বচ্ছান্ধকারের মত চিন্তার ভাব, সেই সরলহাস্যে সদাপ্রফুল্ল মুখে সে ভাব যেমন নূতন, তেমনই অশোভন; প্রস্ফুটিত কমলবনে শরতের রবিকরই শোভা পায়—অকালজলদোদয় নহে। আজ আর রেবার নয়নে সে কৌতুকদীপ্তি নাই—কণ্ঠে সে কলহাস্য আর তটিনী-গীতের মত ধ্বনিত হইতেছে না।

ভদ্রা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "সত্য বল, তুমি কি ভাবিতেছ?"

রেবা চেষ্টা করিয়া অধরপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল, বলিল, "আমার ভাবনা! আমি ভাবিতেছি, কবে ভদ্রার বিবাহ হইবে।"

"সে জন্য তোমার অত চিন্তা কেন? কিন্তু মনের ভাব কথায় ফুটে—তুমি যে বিবাহের চিন্তায় বড় ব্যস্ত হইয়াছ! সে জন্য অত ভাবিও না। ঠাকুরাণী বলিতেছিলেন, নিহারণের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির হইতেছে—"

সহসা রেবার রক্তাভ গণ্ড রক্তশূন্য—সন্ধ্যার আকাশের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। ভদ্রা বুঝিতে পারিল, তাহাকে না ধরিলে রেবা পড়িয়া যাইত। ভদ্রা বিস্ময়াবিষ্ট নিস্পন্দনেত্রে রেবার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে রেবা লজ্জিতা হইল।

লজ্জায় তাহার পাণ্ডু গণ্ড আবার রক্তাভ হইয়া উঠিল—যেন নিদাঘ-দিগন্ত হইতে সহসা মেঘ সরিয়া গেল—দিনান্ত-শোভা আবার প্রকট হইল।

ভদ্রা বলিল, "তোমার কি হইয়াছে, আমাকে বল।"

রেবা ততক্ষণে আত্মস্থা হইয়াছে। সে বুঝিয়াছিল, ভদ্রা তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল,—তাই তাহাকে ভুলাইবার জন্য সে প্রফুল্লতার ভাণ করিল, হাসিয়া বলিল, "আমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে।" রমণী সহজে মনোভাব গোপন করিতে পারে; প্রয়োজনসঞ্জাত অভ্যাস হইতে সে ক্ষমতা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু 'রতনে রতন চিনে'; রমণীর মনোভাব রমণীর নিকট গোপন থাকে না। ভদ্রা বলিল, "কথাটা সত্য। সত্য সত্যই তোমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু সহসা আজ এ ইচ্ছা কেন?"

রেবা যেন কিছু বিপদে পড়িল। ভদ্রাকে সে কি বলিয়া বুঝাইবে?

শেষে রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রা, কোন দিকে কেহ নাই ত?"

ভদ্রা বলিল, "কেন?"

"দেখ।"

ভদ্রা দেখিয়া বলিল, "না।"

তখন রেবা গীতের উদ্যোগ করিল। প্রথমে যেন প্রথমমলয়বিকম্পিত কুঞ্জ-কুটীরে প্রথম-বিকশিত মালতী-মুকুলে ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া উঠিল:—

"আপনি উথলে নয়নের জল;
কে জানিত, প্রেম যাতনা-ভার?
আকুল হৃদয় সে গেছে লইয়া,
কেমনে তাহারে ফিরা'ব আর?"

ভদ্রা বলিল, "সে কে? তাহাই ত আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

রেবা সে কথার উত্তর দিল না। এবার তাহার কণ্ঠস্বর আরও সুস্পষ্ট—আরও মধুর—আরও দূরগামী—যেন বসন্তের প্রথম কোকিল পল্লবের অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে গাহিয়া উঠিল:—

"পবনে তাহার কোমল পরশ;
তারকায় ফুটে নয়ন তা'র;
কুসুমে তাহার মৃদু মধু হাসি;
ভুবনে নাহিক সে বিনা আর।"

ভদ্রা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সখি, পুরুষের মধ্যে কে সেই তিলোত্তমা—বিশ্বের সৌন্দর্য্যসার যাহাতে সন্নিবিষ্ট—যে তোমার হৃদয় হরণ করিয়াছে ?"

এবারও রেবা উত্তর দিল না। আবার গীতধ্বনি ধ্বনিত হইল। এবার স্বর-লহরী যেন পবনে হিল্লোলিত হইয়া গেল,—যেন পরিপূর্ণ বসন্তের বিকশিত শোভার কেন্দ্র হইতে পিকের উচ্ছ্বসিত স্বর ধ্বনিত হইল :—

"যদি একবার আসে সে আবার,
লুটায়ে পড়িব চরণে তা'র ;
চরণের ধূলি ধুয়ে দিবে তা'র
অবিরল মোর নয়ন-ধার।"

স্বর গগনে মিলাইয়া গেল। রেবা মুহূর্ত্তের জন্য ঈষন্মুক্ত-ওষ্ঠাধরে বসিয়া রহিল, যেন গানের সঙ্গে তাহার মনের কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, সে তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইবে।

ভদ্রা তাহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মুহূর্ত্ত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "সখি, সে কে ?"

রেবা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এ গান কাহার রচনা জান ?"

ভদ্রা বলিল, "জানি, এ গান প্রেমিক কবি অজয় সিংহের রচনা। তিনি নহিলে এমন গান আর কে রচনা করিতে পারে ?"

"অজয় সিংহ কে ?"

"তিনি রাজভ্রাতা। তিনি যেমন কবি—তেমনই বীর।"

"কবি কি বীর হয় ? অস্ত্রের ঝলকে কি কল্পনা-কুসুম বিকশিত হয় ?"

"ঠাকুর বলেন, কবি নহিলে বীর হয় না। কল্পনা নহিলে রণ-নিপুণতা জন্মে না ; রণ-কৌশল কল্পনা-সাপেক্ষ। শুনিয়াছি, অজয় সিংহ অসাধারণ বীর। তিনি অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ,—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের মত অস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন—আবার তাঁহারই মত অকৃতদার।"

"অকৃতদার !"

"তিনি নাকি বলেন, 'আমার সম্পদকে অনেক রমণী বিবাহ করিতে উৎসুক হইবে, কিন্তু সে ত আমাকে নহে। যদি কখনও বুঝিতে পারি, কোন রমণী আমাকেই বিবাহ করিতে সমুৎসুক, তবে তাঁহাকে বিবাহ করিব ; নতুবা নহে।' রাজা তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন ; তিনি কিছুতেই সম্মত হয়েন নাই।"

"একথা প্রেমিক কবির উপযুক্তই বটে!"

ভদ্রা কিন্তু এ সকল কথায় মূল প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয় নাই। সে বলিল, "রাজার বা রাজ-ভ্রাতার সংবাদে আমাদের কায কি? তাঁহাদের সব সাজে। তুমি বল, তোমার কি হইয়াছে।"

রেবা হাসিল—ঈষদুদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়া মুক্তাফলতুল্য দশন দেখা দিল। সে বলিল, "আমার আবার কি হইবে?"

ভদ্রা বলিল, "তুমি আমার কাছে মনের কথা গোপন করিতেছ। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না?" বলিতে বলিতে উচ্ছ্বসিত অভিমানে ভদ্রার নয়নদ্বয় অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল।

রেবা এবার আর স্থির থাকিতে পারিল না; সযত্নে অঞ্চলে ভদ্রার নয়ন মুছিয়া দিল; বলিল, "তোমার নিকট কি আমি কোন কথা গোপন করিতে পারি?"

"যে দিন সেই সৈনিক যুবক এই প্রস্তরখানি সরাইয়া দিয়াছিল—সেই দিন হইতে আমি তোমার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছি কেন?"

"সে দিন আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে; আমি বুঝিয়াছি, রাজপুতের বাহু আজও বলহীন হয় নাই।"

"অশুভক্ষণে সে সৈনিক তোমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে,—তোমার প্রফুল্লমুখে বিষাদের ছায়া আনিয়াছে—সোণার কমল মলিন করিয়াছে।"

"অশুভক্ষণে, না শুভক্ষণে?"

"অশুভক্ষণে।"

"না।"

রেবা এমন দৃঢ়স্বরে এই "না" বলিল যে, ভদ্রা বিস্মিতা হইল।

ভদ্রা বলিল, "তবে তুমি তাহাকে ভালবাসিয়াছ?"

রেবা কোন উত্তর করিল না। তাহার মস্তক ভদ্রার স্কন্ধন্যস্ত হইল। এত দিন যে কথা প্রকাশ পায় নাই—মনেই বদ্ধ ছিল, আজ তাহা ব্যথার ব্যথী সখীর কথায় প্রকাশের সুযোগ পাইল। তাই রেবা কাঁদিতে লাগিল।

ভদ্রা বহুক্ষণ কিছু বলিল না; বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

এদিকে সূর্য্যরশ্মি মেঘে মিলাইবার উপক্রম হইল।

তখন ভদ্রা বলিল, "তুমি ভাবিও না। আমি ঠাকুরাণীকে এ কথা জানাইব। যদি অসম্ভব না হয়, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কেহই বিলম্ব করিবেন না।"

সহসা রেবা মুখ তুলিল,—তখনও তাহার গণ্ডে অশ্রুপাতচিহ্ন—নয়ন অশ্রু-সজল—যেন রজনীতে ঝঞ্ঝাবাতের—বারিপাতের পর প্রভাতের তপনকিরণে প্রস্ফুটিত কুসুম মুখ তুলিয়া চাহিল।

ভদ্রা বলিল, "আমি আজই ঠাকুরাণীকে বলিব।"

রেবা উঠিয়া দাঁড়াইল—যেন ধূল্যবলুণ্ঠিতা ফণিনী সহসা ফণা তুলিল। ব্যথিতা প্রেমিকামূর্ত্তি ঘুচিয়া গেল;—দর্পদর্পিতা রাজপুতবালা সদর্পে বলিল, "না। কে সে সৈনিক? তাহার পরিচয় জানি না। অপরিচিত সৈনিকের জন্য আমি কি পিতার নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ককালিমা লেপন করিব?"

ভদ্রা বিস্মিতা হইল, বলিল, "এ কথা অপ্রকাশ রাখিলে যদি ঠাকুর নিহারণের সহিত তোমার বিবাহ স্থির করেন?"

রেবার চক্ষুর সম্মুখে সব অন্ধকার বোধ হইল; সে বসিয়া পড়িল। তাহার পর সে বলিল, "রাজপুতবালা মরিতে ভয় করে না। তাহার ভয় কলঙ্কে।"

ভদ্রা নীরবে ভাবিতে লাগিল।

যখন দুই সখীতে এইরূপ কথা হইতেছিল—তখন তাহাদের উদ্দিষ্ট সৈনিক তাহাদের নিকটেই ছিলেন। তাহারা দুইজন যে স্থানে বসিয়াছিল—তাহার পশ্চাতে—অদূরে বৃতিকূলে একটি তরুণ তমাল ছায়া ও অন্তরাল রচনা করিতেছিল। সৈনিক তাহারই পশ্চাতে ছিলেন। তিনি আরও দুই দিন এই পথে গিয়াছেন; এই স্থানে বিশ্রামের বাসনা নিবৃত্ত করিয়াছেন। কিন্তু পতঙ্গ কতক্ষণ বহ্নির আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারে? আজ মৃগয়ার পর তিনি এই স্থানে বিশ্রাম করিতে-ছিলেন। অশ্ব কিছু দূরে এক বৃক্ষে বদ্ধ ছিল।

সৈনিক যাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই রেবা যখন আসিল, তখন একবার তাঁহার মনে হইল, এমন করিয়া চোরের মত ভদ্রনারীকে লক্ষ্য করা অশোভন। কিন্তু মন আপনাকে আপনি বুঝাইল, এখন কেমন করিয়া ফিরিব? অপরিচিতারা দেখিলে কি মনে করিবেন? এখন এই স্থানে অবস্থান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

তাই সৈনিক তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। রেবার কণ্ঠে পরিচিত সঙ্গীত শুনিয়া সৈনিকের নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল,—বিবাহ-বিষয়ে অজয় সিংহের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তাঁহার অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—রেবার কথায় তাঁহার হৃদয় বেগে আঘাত করিতেছিল। শেষে অবসর বুঝিয়া সৈনিক সখীদ্বয়ের অলক্ষিত অবস্থায় প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে অদূরবর্ত্তী রাজপথে অশ্বপদধ্বনি শুনিয়া সখীদ্বয় চাহিয়া দেখিলেন, সৈনিক যাইতেছেন!

ভদ্রা ও রেবা বিস্মিত নয়নে এ উঁহার দিকে চাহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অতিথি।

সৈনিক যুবক শক্ত সিংহের গৃহদ্বারে আসিয়া অশ্বকে স্থির করাইয়া অবতরণ করিলেন। গৃহস্বামী গৃহের সম্মুখে অলিন্দে বসিয়া ছিলেন। গৃহদ্বারে সৈনিককে উপস্থিত দেখিয়া তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

তিনি নিকটে আসিলে সৈনিক নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি এই পথে দূরে গিয়াছিলাম; অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি; আজ রাত্রির জন্ত এই গ্রামে আশ্রয় সন্ধান করিতেছি। আশ্রয়ের কোন স্থান পাইতে পারি কি?"

শক্ত সিংহ বলিলেন, "গৃহে অতিথি আসিলে আমরা তাহা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি। আমার গৃহে যখন আসিয়াছ, তখন অনুগ্রহ করিয়া আমার আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে।"

সৈনিক কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শক্ত সিংহ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "অতিথির অশ্ব অশ্বশালায় লইয়া যাও।"

পুত্র সৈনিকের হস্ত হইতে অশ্ববল্গা গ্রহণ করিল। শক্ত সিংহ অতিথিকে লইয়া গৃহে চলিলেন।

সন্ধ্যার পর শক্তসিংহ ও সৈনিক আসিয়া অলিন্দে উপবেশন করিলেন। শক্ত সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের শ্বশুর সে দিন বৈবাহিকের গৃহে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও অলিন্দে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সৈনিকের পরিচয় লইতে লাগিলেন। সৈনিক বলিলেন, তিনি শতসেনার নায়ক।

সৈনিকের পরিচয় লইবার পর শক্ত সিংহের বৈবাহিক শক্ত সিংহকে বলিলেন, "তোমার রাজার সৈনিকে প্রয়োজন কি? রাজ্যরক্ষা ও প্রজারক্ষা ব্যতীত সৈনিক পোষণের অন্ত উদ্দেশ্য কেবল প্রজার রক্তশোষণ। তোমাদের রাজার সৈন্তপোষণে কেবল শেষোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।"

শুনিয়া সৈনিকের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অভ্যাসবশে অসির সন্ধান করিলেন।

শক্তসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

বৈবাহিক বলিলেন, "তোমাদের রাজা কেবল মুসলমানের বিলাস-ব্যসনের অনুকরণ করিতেছেন। তিনি রাজপুতকলঙ্ক,—প্রজারক্ষায় তাঁহার মনোযোগ নাই।

সৈনিকের ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই শক্ত সিংহ বলিলেন, "বৈবাহিক, তুমি পাঁচ বৎসর পরে আমার গৃহে পদধূলি দিতেছ। পাঁচ বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

বৈবাহিক বলিলেন, "আমি কিছুই শুনি নাই,—কিছুই দেখিতেছি না।"

"তুমি যে বনে বাস কর, সে বনে বুঝি মানুষের বাস নাই ? থাকিলে তুমি অবশ্যই রাজার সুখ্যাতির কথা শুনিতে পাইতে।"

"সত্য সত্যই কি তোমাদের রাজা প্রজারক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন ?"

"তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সেই কার্য্যই করিতেছেন।"

এই কথা বলিয়া শক্ত সিংহ রাজার কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। চকে অগ্নি নির্ব্বাপণের কথা,—ব্যাধিতের গৃহে গমনের কথা,—নগরপালের শাস্তির কথা, শক্ত সিংহ সব বলিতে লাগিলেন। সে সব কথা শেষ করিয়া শক্ত সিংহ বলিলেন, "এখন আমাদের রাজার মত রাজগুণে বিভূষিত রাজা রাজপুতানায় দুর্ল্লভ।"

তখন বৈবাহিক বলিলেন, "আমি এ সব কথা শুনিয়াছি; সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য ওরূপ কহিতেছিলাম।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "তোমাদের রাজার এই পরিবর্ত্তন অত্যন্ত সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুতের গৃহ আজ শতছিদ্র; তাহার এক ছিদ্র রুদ্ধ হইলেই বা কি হইবে ?"

শক্ত সিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এই সময় একজন চারণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

শক্ত সিংহ তাহাকে সযত্নে বসাইলেন। তিনি চারণের গীত শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। রাজপুতের গৌরবগাথা কোন্ রাজপুতের শ্রুতিসুখকর নহে ?

চারণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর শক্ত সিংহ তাহাকে গান করিতে অনুরোধ করিলেন। চারণ গাহিতে লাগিল। রাজপুতের গৌরবের গান গাহিতে গাহিতে চারণ যেন তন্ময় হইয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে উচ্ছ্বসিত—দ্বিধায় বিচলিত—ভীতিতে বিকম্পিত—ক্রোধে উচ্ছলিত—ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সে গান শ্রোতৃদিগের হৃদয় স্পর্শ করিল; তথায় যেন তাহার প্রতিধ্বনি হইতে

লাগিল। গাহিতে গাহিতে চারণের নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গীত অবসানে চারণ যেন শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। গৃহে নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সৈনিক চারণকে গীতের একটি পদের পুনরাবৃত্তি করিতে বলিলেন।

চারণ কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

সৈনিক বলিলেন, তিনি গানটি শিখিবেন।

শক্তসিংহের বৈবাহিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে একটিমাত্র পদের আবৃত্তি করিতে বলিতেছ কেন?"

সৈনিক বলিলেন, "আর সমস্ত পদ আমার শিক্ষা হইয়াছে।"

চারণ বিস্ময় প্রকাশ করিল।

তখন সৈনিক গানের আর সমস্ত পদের আবৃত্তি করিলেন।

শক্তসিংহের বৈবাহিক বলিলেন, "তুমি কি শ্রুতিধর?"

সৈনিক বলিলেন, "আমি গান ভালবাসি। গান সহজেই আমার স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া যায়।"

শক্ত সিংহ বলিলেন, "যখন গীতে তোমার এমন অসক্তি, তখন তুমি গাহিতে পার। আমাদিগকে একটি গান শুনাও।"

সৈনিক বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমার কণ্ঠ কর্কশ,—আমার গান আপনাদের শ্রবণযোগ্য নহে।"

কিন্তু চারণ ও শক্ত সিংহের বৈবাহিক উভয়েই সৈনিককে গাহিতে অনুরোধ করিলেন। শেষে শক্ত সিংহও সেই অনুরোধে যোগ দিলেন।

তখন সৈনিক অনন্যোপায় হইয়া গাহিতে স্বীকৃত হইলেন।

সৈনিক একটি বাদ্যযন্ত্র যাচ্ঞা করিলেন। "কক্ষমধ্যে একটি বীণা আছে; আনিয়া দিতেছি" বলিয়া শক্ত সিংহ উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। সৈনিক ব্যস্ত হইয়া স্বয়ং তাহা আনিতে গমন করিলেন।

সৈনিক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেই কে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। সৈনিক তাহার বসনাগ্রমাত্র দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সে বসনাগ্রও যে তাঁহার পরিচিত! তিনি বুঝিলেন, রেবা সেই কক্ষে ছিল।

সৈনিক বীণা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি অল্পক্ষণমধ্যেই বীণায় সুর বাঁধিয়া লইলেন, তাহার পর কয়বার তারে ঝঙ্কার দিয়া গান আরম্ভ করিলেন।

সে সঙ্গীত যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইতে লাগিল,—সে যেন সৈনিকের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রবাহিত স্বরলহরী :—

কুসুম-কাননে হেরেছিনু তা'রে,
কুসুমের মাঝে কুসুমরাণী ;
নয়ন-আলোকে বিজলী ঝলকে,
ভ্রমরগুঞ্জন অমিয়-বাণী ।
সে অবধি মোর মরু এ জীবনে
সুখের নিঝরে অমৃত ঝরে ;
পোহায় আঁধার অমানিশা ঘোর
তরুণ-অরুণ-মধুর-করে ।
স'পেছি হৃদয় চরণে তাহার,
দেখিবে কি তা'র নলিন আঁখি,
করুণা-কোমল সুখ-সিঞ্চিত
প্রেমের অকুল পুলক মাখি' ?

যুবক নীরব হইলেন। সুমধুর স্বরলহরী যেন ধীরে ধীরে গৃহসংলগ্ন কুসুম-কাননে মিলাইয়া গেল। যুবক গীতবিদ্যাবিশারদ বটে।

শক্ত সিংহ বলিলেন, "তুমি বলিতেছিলে, তোমাব কণ্ঠ কর্কশ !"

শক্ত সিংহের বৈবাহিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গান কাহার রচনা ?"

সৈনিক উত্তর করিলেন, "রাজভ্রাতা অজয়সিংহের ।"

শক্ত সিংহের বৈবাহিক শক্ত সিংহকে বলিলেন, "বৈবাহিক, তুমি বলিতেছিলে, এখন তোমাদের রাজার মত রাজগুণে বিভূষিত রাজা রাজপুতানায় দুর্ল্লভ। কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তন হইলেও তাঁহার দুষ্ট আদর্শের প্রভাব আজও দূর হয় নাই ।"

শক্ত সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

"রাজভ্রাতা কোমল মধুর প্রেমগীত রচনা করিতেছেন, আর সৈনিক যুদ্ধ না করিয়া সেই গীত গাহিতেছে ।"

এই কথা শুনিয়া সৈনিকের নয়নে যেন রোষদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। প্রেমিক কবি অপমানিত সৈনিকরূপে দেখা দিল। তিনি আবার বীণা তুলিয়া লইলেন—তারে ঝঙ্কার দিলেন। এবার আর সুর করুণ—কোমল—মধুর নহে ; এবার সুর গভীর—গভীর—উদাত্ত, যেন বীণায় অপমানিত হৃদয় প্রতিহিংসা-প্রদীপ্ত হইয়াছে ।

তাহার পর সৈনিকের কণ্ঠ বীণার স্বরে স্বর মিশাইল। সৈনিক গাহিতে লাগিলেন :—

কে চাহ জীবন ? এস মোর সাথে ;
তূণীরে সাজাও বাণ।
বাঁচিয়া কে চাহে মরিয়া থাকিতে ?
লহ অসি খরশান।
অপমান-নত ও শির তোমার
গর্ব্বে দাঁড়াও তুলি' ;
শত্রুশোণিতে প্রক্ষালি' ফেল
লুণ্ঠিত-লাজ-ধূলি।
স্মর, হৃত তব পূর্ব্বগৌরব,
স্মর, বীর বীরাঙ্গনা।
ভীরু, তব দেহে বহে না কি আর
তাঁ'দের রুধির-কণা ?
গৌরব-তরে কে ডরে সমরে,
ঢালিতে শোণিতধার ?
ভীরুজন মরে শত শত বার,
বীর মরে একবার।

সে গীত যেন গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিল। কিছুক্ষণ সকলে নীরব—মন্ত্রমুগ্ধবৎ রহিলেন।

তাহার পর শক্ত সিংহের বৈবাহিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গীত কাহার রচনা ?"

সৈনিক বলিলেন, "রাজভ্রাতা অজয়সিংহের। প্রেম কেবল কুসুমকাননে কিশলয়শয়নে সুখসহচর নহে। প্রেম বীরের হৃদয়ে শক্তি—বাহুতে বল।"

সমালোচনা।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা। *

ভূমিকার সমালোচনায় সাধারণতঃ বিশেষ লাভ হয় না। কারণ, সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপনীতে অনেকে আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় দিয়া উঠিতে পারেন না, দিলেও তাহা বিষয়ের তুলনায় নীরস ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। কাযেই তাহার সমালোচনা ফলোপধায়িনী হয় না। আমাদের সমালোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সে ধরণের ভূমিকা নহে। ইহা একটি অতি প্রকাণ্ড বিষয়ের পূর্ব্বাভাস বা অবতরণিকা। ইহাতে গ্রন্থকার তাঁহার আকাঙ্ক্ষার ও উদ্যমের সহিত বঙ্গীয় পাঠককে পরিচিত করিয়া দিতে চাহিতেছেন। তিনি যে জীবনব্যাপী মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহারই উদ্বোধন হইয়াছে। এই ভূমিকায় তিনি একখানি বিস্তৃত শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন ভাষায়, শিক্ষা-বিজ্ঞানের এমন বিপুল আয়োজন একজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না, সন্দেহ। স্পেন্সার তাঁহার ক্রমনৈতিক দর্শনে, কোমৎ তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণীবিভাগে যে একটি ভাব-সমগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও এ শ্রেণীর সমগ্রতা নহে। 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা'-প্রণেতা যে সমগ্রতাকে আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন,তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও জীবনব্যাপিনী সাধনার প্রয়োজন ;—জীবনব্যাপিনী সাধনায়ও সিদ্ধি লাভ করা যায় কি না,সন্দেহ। ভূমিকার ভূমিকা-লেখক হীরেন্দ্রবাবুও সে আভাস দিয়াছেন। অবশ্য 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের' গ্রন্থকারের এই বিপুলতার জন্য সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই। কৃষক সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে আগ্রহদৃষ্টিতে ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে ভাবে যে, সে সমস্ত ক্ষেত্রটাই এক দিনমানে কর্ষণ করিয়া ফেলিবে ; কিন্তু প্রখর মধ্যাহ্নের উত্তাপে তাহার ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু কর্ষিত ভূমি আর্দ্র করিয়া জানাইয়া দেয় যে, তাহার আশার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র পূর্ণ করিয়াই তাহাকে ফিরিতে হইবে ; তথাপি দিনশেষে কর্ত্তব্য-সাধনের তৃপ্তি তাহার শ্রান্ত, ক্লান্ত,অবসন্ন হৃদয়কে শান্তির সুধায় নিষিক্ত করে। এ ক্ষেত্রে যদি এই বিপুল অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা নবীন উৎসাহদৃপ্ত লেখকের ভাগ্যে নাও ঘটে, তাহা হইলেও যে এ উত্তম পুরস্কৃত ও সম্মানিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

---

* শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার, এম, এ, প্রণীত। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সংসারে মানুষ এক বিচিত্র জীব। সে যে প্রকাণ্ড জাতির একটি উপবিভাগ মাত্র তাহার অন্যান্য অংশের সহিত জড়িত থাকিয়াও সে বিচ্ছিন্ন। জন্তুবিভাগের নিম্নস্তরে মানবের যে সকল জ্ঞাতি আছে, তাহাদের সহিত মানবের সাদৃশ্য থাকিয়াও যেন নাই। আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে মনুষ্য জন্তুবিভাগের অন্তর্গত হইলেও, তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও স্মৃতি, বুদ্ধি ও বাক্‌শক্তি তাহাকে জীবজগতের বহু ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিয়াছে। এ সকল বিষয়ে মানব দেবত্বের অভিলাষী। যে চিৎশক্তি ঈশ্বরে আরোপিত করিয়া মানুষ তৃপ্তি অনুভব করে, তাহারই কণা মনুষ্যহৃদয়ে বিরাজিত থাকিয়া মানবকে সাধারণ জীবজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের পদতলে পৃথিবী, মস্তকোপরি আকাশ বা স্বর্গ। পৃথিবীর জীব—মানুষ, স্বর্গের আভাসোদ্দীপ্ত মানুষ—নরদেবতা। এই পশুত্ব ও দেবত্ব-সম্পন্ন মানবের মানবত্ব এক বিস্ময়ের বস্তু। দেবত্বের দ্বারা পশুত্বের বিজয়-চেষ্টাই মানব-সভ্যতার নিগূঢ় ইতিহাস। মানবীয় মনোবিকাশের ইতিহাস উন্নতির কি অবনতির দিকে চলিয়াছে, তাহা স্থির করিতে হইলে, অগ্রে দেখিতে হইবে যে, বহুযুগব্যাপী সাধনায় মানুষ পশুত্বকে দেবত্বের দ্বারা সঙ্কুচিত করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না; প্রকৃতিগত পশুধর্ম্মকে মানুষ উচ্চ প্রবৃত্তির সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছে কি না। মানবজীবনের অন্ধকারে যাহা আলোকরশ্মিপাত করিয়া সৌন্দর্য্যে ও গৌরবে উদ্ভাসিত করে, যাহা স্পর্শমণির ন্যায় মানবের নীচ ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করে, তাহাই শিক্ষা।* উন্নতিকাম, সভ্যতাদৃপ্ত, জ্ঞানালোকিত বর্ত্তমান যুগের মানবের পক্ষে শিক্ষার ন্যায় প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। একমাত্র অতীত সভ্যতার গৌরবে অভিমানী মুক্তি-প্রয়াণের পথিক ভারতবাসীর পক্ষে শিক্ষা-বিজ্ঞানের লেখক একটি অতি সময়োপযোগী, সমীচীন ও গভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

মানব শিক্ষার দ্বারা তাহার মানবতার পূর্ণত্ব সম্পাদন করিয়া লয়। এই পূর্ণত্ব কল্পনার বস্তু, সাধনার বস্তু, আরাধনার বস্তু। এই পূর্ণত্বের আদর্শ সম্মুখে না রাখিতে পারিলে, শিক্ষা কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থায়, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর জন্য এই সমগ্রতার আকাঙ্ক্ষা দুরাশামাত্র মনে

* "The purpose of Education is to give to the body and to the soul all the beauty and all the perfection of which they are capable." Plato. "Education is the harmonious and equable evolution of the human faculties"—Stein.

হইতে পারে; কিন্তু তাহা বলিয়া আদর্শকে সঙ্কীর্ণ ও খর্ব্ব করিলে মানবের ভবিষ্যৎ ভাগ্যগঠনের আশা সুদূরপরাহতা হইবে। আদর্শকে পরিম্লান করা কর্ত্তব্য নহে। এই স্থানেই Realism অপেক্ষা Idealismএর প্রয়োজন অধিকতর বলিয়া বোধ হয়।

মানুষ সমস্ত সৃষ্টির সারভূত। পৃথিবী তাহার যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার লইয়া মানব-প্রয়োজনে অর্ঘ্যদান করিতেছে। সামান্ত কীটাণু হইতে পরিভ্রাম্যমাণ গ্রহ-উপগ্রহ পর্য্যন্ত, কঙ্কর হইতে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই মানবের জ্ঞানের অঙ্গীভূত। ইহারা কোন না কোন প্রকারে মানব-মনের সংসর্গে আসিয়া তাহার জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণতর, এবং তাহার কর্ম্মক্ষেত্রকে বিশালতর করিয়া দিতেছে। সুতরাং মানবমনের পূর্ণবিকাশ দেখিতে হইলে, প্রকৃতির সমস্ত বস্তুর মধ্য দিয়া দেখিতে হইবে। শিক্ষাকে যদি মানবত্ববিকাশের উপায়ভূত বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত প্রকৃতি— চেতন এবং জড়—কি প্রকারে সেই মনোবিকাশে সহায়তা করে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে, এবং প্রকৃতির কোন্ অংশ ঠিক কোন্ স্থানে এবং কি ভাবে মনের অভিব্যক্তিতে সহায়তা করে, তাহা সবিশেষ প্রণিধান করিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডে মানবের স্থান কোথায়, জড়জগৎ কি ভাবে মানবমনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং মানব-চরিত্রকে প্রভাবিত ও সঙ্কুচিত করে, সমাজ ভাষার বন্ধনে এবং বিবিধ প্রভাব বিস্তার করিয়া কিরূপে মানস-প্রণালী ও চরিত্রের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া দেয়, ইহা শিক্ষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর পক্ষে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়। শিক্ষা-তত্ত্বের এইরূপ বিশালতা যে কেবল কল্পনাপ্রসূত, এ কথা আজকাল আর বলা যায় না। কেন না পাশ্চাত্য শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, মনস্তত্ত্ব, চরিত্রনীতি প্রভৃতির মধ্য দিয়া শিক্ষাকে সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ মানবমনের পূর্ণবিকাশ বিধান করিতে হইলে এ সকলেরই প্রয়োজন আছে। সাহিত্য ও কাব্য জীবনের কতখানি স্থান অধিকার করে, সমাজের সহিত মনের কি সম্বন্ধ, অতীতের ইতিহাস চরিত্রগঠনের পক্ষে এবং মনোবৃত্তি-স্ফুরণের পক্ষে কতখানি সহায়তা করে, ধর্ম্মের প্রভাব কি ভাবে সঞ্চারিত হইয়া আত্মাকে উন্নত হইতে উন্নততর মার্গে লইয়া যায়, এই সকল তত্ত্ব প্রকৃত শিক্ষার অঙ্গীভূত। এগুলিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, কোন ব্যক্তিবিশেষের, বা ব্যক্তিসঙ্ঘবিশেষের খেয়ালের দ্বারা পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনে শিক্ষার অবিঘ্ন পরিসমাপ্তির আশা করা

যাইতে পারে না। পণ্ডিতপ্রবর Bunsen এ স্থানে শারীরতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—If man is the apex of the creation it seems to be right on the one side, that an historical inquiry into his origin and development should never be allowed to sever itself from the general body of natural science, and in particular from physiology. But on the other hand, if man is the apex of the creation, if man is the end to which all organic formations tend from the very beginning, if man is at once the mystery and the key of natural science; if that is the only view of natural science worthy of our age, then ethnological philology is the highest branch of that science for the advancement of which this Association (the British Association at Oxford) is instituted." * ভাষাতত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে এস্থানে যাহা বলা হইয়াছে, অন্যান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাহা প্রয়োজ্য। মনুষ্য যদি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিণাম হয়, তবে সমস্ত সৃষ্টির বিজ্ঞানই, ব্যস্ত ও সমস্ত ভাবে, মনুষ্য-বিজ্ঞান। "The science of man therefore or as it is sometimes called, Anthropology, must form the crown of all the natural sciences" † এই স্থানেই শেষ নহে। সমস্ত জড় বিজ্ঞান ও সমস্ত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই মানব-মনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। বর্ত্তমান যুগে মানবের শিক্ষায় এই সমস্ত বিজ্ঞানেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই কথাটি বিস্মৃত হইলে শিক্ষার সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভবপর হয় না। শিক্ষা-বিজ্ঞান-আলোচনা-প্রয়াসী অধ্যাপক মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া, এই পূর্ণ আদর্শটি সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়া বড় ভাল কায করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার পরিধি এখনও সঙ্কীর্ণ, আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী এখনও অতীতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারে নাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এমন সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার অনুকূল নহে; কিন্তু তাহা হইলেও এ আদর্শটি মহান্, সুন্দর এবং সার্থক। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা নবীন লেখকের উদ্যমের সফলতা কামনা করি।

---

* Maxmuller's Science of Language vol II. p. 8.

† Do Do Do p. 7.

এই বিরাট আয়োজনের সূচনায় আমরা যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, আমাদের একমাত্র আশঙ্কা যে লেখক অন্ত পথে গিয়া পাছে আমাদের সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত করেন। এই আড়ম্বরপূর্ণ পূর্ব্বাভাসের পরে আমরা যদি দেখিতে পাই যে, তিনি শিক্ষা-বিজ্ঞানের নামে পাটীগণিতের একখানি জীর্ণ সংস্করণ বাহির করিতেছেন, অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণের একখানি নিতান্ত সাধারণ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই দুঃখিত হইব। এমন সুন্দর ভিত্তির উপরে যদি একটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কিছু নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে আর নৈরাশ্যের অবধি থাকে না। সে জন্য আমরা লেখক মহাশয়কে প্রথম হইতে সাবধান হইতে বলিতেছি।

বিষয়ের গুরুত্ব-তুলনায় ভূমিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র। তাহা হইলেও লেখক যেরূপ ভাবে তাঁহার বক্ষ্যমান বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, তাহা হইতেই তদীয় আরব্ধ ব্যাপারটির ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি শিক্ষা-বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন প্রথম—শিক্ষা-পদ্ধতি; দ্বিতীয়—শিক্ষা-তত্ত্ব। প্রথম বিভাগ ঐতিহাসিক প্রণালীতে স্থির করিতে হইবে। "প্রথম বিভাগে দেশ কাল ও অবস্থানুসারে মানবসমাজের আদর্শের বিভিন্নতানুযায়ী যত প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির বিবরণ থাকিবে।* * মানব সভ্যতার ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়, বিচিত্র আদর্শের বিকাশ, মানব সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও লক্ষণ আলোচিত হইবে। মিসর, গ্রীস, ভারত প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতাসমূহ, বিভিন্ন আদর্শে পরিচালিত মধ্য যুগের শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ এবং বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে যে আদর্শ, যে ভাব অন্তর্নিহিত আছে, এই শিক্ষার ইতিহাসে সেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজপ্রকৃতি ও আদর্শ সমূহের চিত্র প্রদান করা হইবে।" (শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা—৮ পৃঃ)

"দ্বিতীয় বিভাগে দার্শনিক প্রণালীতে শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। শিক্ষা কাহাকে বলে, মানব চরিত্রের উপর শিক্ষার কিরূপ প্রভাব, মানব সমাজের কোন এক আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি আছে কি না, শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত এবং অবস্থাভেদে শিক্ষাপদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন বিধেয়, এই সকল বিষয় বিচার করিয়া শিক্ষাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে। ঐতিহাসিক প্রণালীর দ্বারা শিক্ষা বৈচিত্র্যের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, দার্শনিক প্রণালীর দ্বারা তাহার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবে।" আলোচ্য গ্রন্থ হইতে যে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছি,

তাহা হইতেই 'শিক্ষাবিজ্ঞানের' বিস্তৃত পরিধি সম্বন্ধে একটা ধারণা হইতে পারে। এই বিশালতার কথা মনে হইলে, লেখক মহাশয়কে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, তিনি এ ভূমিকাটি না ছাপিলেই ভাল করিতেন। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে যে "পায়সের আস্বাদ ভক্ষণে।" আমরা তাঁহার সঙ্কল্পের সহিত পরিচয় লাভ করা অপেক্ষা তাঁহার কার্য্যের সহিত পরিচয় লাভ করিতেই বেশী উৎসুক ছিলাম। তাঁহার সঙ্কল্পের পরিচয় পাইয়া কেবল আতঙ্ক হইতেছে, পাছে তিনি এ সঙ্কল্পের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারেন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, ভূমিকা আগে না ছাপিলেই ভাল হইত।

তবে গ্রন্থকারের উপর আমাদের নির্ভর ও বিশ্বাস আছে। তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একজন উৎসাহী, কর্ম্মনিষ্ঠ শিক্ষক। অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতার ও আমরা পরিচয় পাইয়াছি। তিনি শিক্ষা-ব্রতের "সন্ন্যাসী"কল্প প্রচারক। আমাদের কামনা, তিনি নিজ ব্রতে সফলতা লাভ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় শিক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করুন।

ভাষা সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া এই বিস্তৃত সমালোচনার উপসংহার করিব। 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা'র ভাষা যেন ইংরেজী পদসংস্থান-রীতির ভারে প্রপীড়িত। "এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সত্যের একীকরণে মানব বিষয়সমূহে জ্ঞান সম্পূর্ণতা ও প্রণালী-বদ্ধতার দিকে অগ্রসর হইয়া 'বিজ্ঞান' পদবাচ্য হয়।" "সুতরাং জীবন্ত ও ধারা-বাহিক রূপে চলন্ত এবং ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য ও বিভিন্নতাবিশিষ্ট মানব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে" ইত্যাদি পড়িলে ইংরেজির অনুকরণ বলিয়া মনে হয়। "বহমান স্রোতস্বতী" অমার্জ্জনীয়। "এই পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য ইতিহাসেরও কখনই পুনরাবৃত্তি হয় না।" "History repeats itself" এই কথাটিই প্রবাদের মত চলিয়া আসিতেছে। যদি সেই প্রবাদটির অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে কথা অন্য ভাবে বলা উচিত ছিল। যে ভাবে তিনি কথাটি বলিয়াছেন, তাহাতে যেন মনে হয়, যে ঐটিই প্রবাদ।

যাহা হউক এ সকল সামান্য ত্রুটি; গ্রন্থকার ভবিষ্যতে একটু সতর্ক হইয়া লিখিবেন, এই জন্যই এ অপ্রিয় বিষয়ের অবতারণা করিলাম।

সংগ্রহ।

—:০:—

সাহিত্য।

—:০:—

বার্ণস।

—:০:—

বার্ণস স্কটলণ্ডের জাতীয় কবি; তাঁহার কবিতা স্কটলণ্ডবাসীর হৃদয় যেরূপ স্পর্শ করিয়াছে, তেমন আর কাহারও কবিতা করে নাই। আবার জগতের ইতিহাসেও বার্ণসের সমাদরের তুলনা বিরল। বার্ণস কৃষক ছিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবন দারিদ্র্যের সহিত—প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে অতিবাহিত। তাঁহার অনেক কবিতা শস্যক্ষেত্রে কায়িকশ্রমের বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে বিরচিত। অথচ তিনি একটি জাতির জাতীয় কবি।

সমাদর।

বার্ণসের সমাদরের কারণ টেন বুঝাইয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের মানসক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন ও চাঞ্চল্য সপ্রকাশ হয়। ভাষার লালিত্যহেতু সাহিত্যের মতামত ও বিজ্ঞানের অবিষ্কারকথা সহজবোধ্য হইয়াছিল। অস্তগতমহিম রাজতন্ত্রে ও সংস্কৃত শাসনপ্রণালীতে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্নদিগের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। শতাব্দীর শেষভাগে প্রজাতন্ত্রের বিষাণ বাজিয়া উঠে। তখন বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে ইংলণ্ডে পল্লীর উচ্ছেদ ও নগরের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। সাধারণ লোক আহারে, বিহারে, আচারে, ব্যবহারে, সমাজের উচ্চস্তরস্থদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠে। ফ্রান্সে ব্যবহারের ও জার্ম্মাণীতে মতের বিপ্লবতূর্য্য ধ্বনিত হয়। এক দিকে প্রজাসাধারণের ক্ষমতাভিলাষ অপর দিকে দার্শনিক মতের প্রচার—এই দুই স্রোতের যুক্ত বেণী য়ুরোপের সমাজকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ফ্রান্স ও জর্ম্মাণী হইতে দুই প্রবাহ রক্ষণশীল ইংলণ্ডের সমাজে প্রবেশ করিতেছিল। এই নব ভাব সর্ব্বপ্রথম বার্ণসের রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং, তাঁহার সমাদর অবশ্যম্ভাবী।

সংপ্রতি লর্ড রোজবেরী বার্ণসের সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। লর্ড রোজবেরী বার্ণসের পরম ভক্ত। তিনি এই বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি।

দারিদ্র্য।

লর্ড রোজবেরী বলেন, কবি ব্ল্যাকলকের নিকট স্কটলণ্ডের কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হইবার নহে। তিনি বার্ণসের কবিতার প্রশংসা করিয়া পত্র না লিখিলে বার্ণস জ্যামেকায় যাইতেন। তথায় দাসত্বের হীনতার মধ্যে তাঁহার কবিতার সর্ব্বনাশ হইত। হয়ত সেই দেশের জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইত না। যদিও তাঁহার

জীবনান্ত না হইত—তাঁহার প্রতিভার প্রাণান্ত যে হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, যদি বার্ণস সেই প্রবাসে অর্থসঞ্চয়ে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার কবিতার উৎস শুষ্ক হইয়া যাইত। দারিদ্র্য প্রতিভাকে প্রদীপ্ত করে, অর্থ তাহার জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত করে। জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে ধনীর লিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তকের একান্ত অভাব। সকল উৎকৃষ্ট রচনাই দারিদ্র্যের তাপে বিকশিত। এই দারিদ্র্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, তুষারপাতে শীতল হিম ঋতুতে জীর্ণ কুটীরে বার্ণসের জন্ম, তাঁহার জন্মের কয় দিন পরে কুটীরের এক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়াতে প্রসূতি প্রসূতকে লইয়া ঝটিকার মধ্যে প্রতিবেশীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। গৃহে শ্রমের অন্ত ছিল না, কিন্তু পর্য্যাপ্ত আহার্য্য মিলিত না। ফলে বার্ণস শিরঃপীড়াগ্রস্ত হয়েন, উত্তরকালে ইহা হইতেই তাঁহার শ্বাসকষ্ট হইত। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে শ্রান্ত হইয়া তিনি বিদেশে যাইতেছিলেন। অপর্য্যাপ্ত আহার—অত্যধিক পরিশ্রম—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই তিন বহ্নির তাপে বার্ণসের দেহে অকালজরার চিহ্ন সপ্রকাশ হয়।

কবি-প্রতিভা।

প্রকৃত কবি-প্রতিভার প্রাচুর্য্য বার্ণসকে অমর করিয়াছে। এই প্রতিভার প্রাচুর্য্যের প্রমাণ এই যে,কৃষক কবির যে কবিতা অনেকের মতে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা, সে কবিতা লিখিয়া তিনি ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। অসাধারণ সম্পদ না থাকিলে কেহ এমন করিতে পারে না।

পবিত্রতা।

বার্ণসের নৈতিক পদস্খলন যে হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু তিনি সে কথা গোপন করিতেন না, পরন্তু প্রকাশ করিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহার স্বাভাবিক পবিত্রতার বিষয় বুঝিতে পারেন না। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ পুণ্যচরিত্র ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল, তাহাতে করুণার পূতধারা সদা-প্রবাহিত ছিল। একবার একখানি চিত্রে মৃত সৈনিকের পার্শ্বে তাহার পত্নী, পুত্র, ও কুক্কুরের প্রতিকৃতি দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। সয়তানের জন্যও তাঁহার দুঃখ।

প্রেম।

বার্ণসের প্রগাঢ় প্রেম অনেকে বুঝিতে পারেন না। বার্ণস কল্পনার আলোকে রমণীদিগকে দেখিতেন, দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাই তিনি বহু রমণীকে ভালবাসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কল্পনায় রমণীমাত্রকেই প্রেমাস্পদ মনে করিতেন। তাই তাঁহার প্রেমের কবিতা মাধুর্য্যে মনোহর। তাঁহার মতে, প্রেমই জীবনের উদ্দেশ্য। তাই তিনি যে সমিতি সংস্থাপিত করেন, তাহার সভ্যমাত্রকেই বলিতে হইত যে, তিনি এক বা একাধিক রমণীর প্রেমার্থী। তাঁহার প্রেমগীত মাধুর্য্যে মনোহর, কোমলতায় কমনীয়, অশ্রুতে অভিষিক্ত, উচ্ছ্বাসে উদ্ভাবিত।

নির্ভীকতা।

বার্ণস অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন। তিনি যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তখন প্রচলিত ধর্ম্মাচারে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি সে সকলের উপর তীব্র

বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি ভণ্ডামির ও অন্তঃসারশূন্য আচারের বিরোধী ছিলেন। মনুষ্যত্বই তাঁহার নিকট সমাদরযোগ্য, আভিজাত্য বা উপাধি ধূলির ন্যায় তুচ্ছ। বেশভূষায় মানুষকে বড় করিতে পারে না। তিনি বলিতেন, উপাধি বেশভূষারই মত। তিনি ইংলণ্ডে জনসাধারণের ক্ষমতার প্রচারক। তিনি যে ভাবের অগ্রদূতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে ভাব তাঁহার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ইংলণ্ডে সুপরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু বার্ণস যখন সেই ভাব স্বীয় কবিতায় ব্যক্তকরিয়াছিলেন তখন তাহা বিপন্ন ও নিষ্পিষ্ট, দারিদ্র্যদুঃখপীড়িত—জনসাধারণের হৃদয়ে আশার আলোক প্রদীপ্ত করিয়াছিল। সমাজের উচ্চস্তরে--বিরামবিলাসী ধনবান্‌দিগের নিকট সে ভাব তখন সমাদৃত হওয়া দূরে থাকুক্—ঘৃণিত ছিল।

অমরতা।

এ সকল কবিতার কথা—এই নবভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও বার্ণসের কবিতায় অমরতার অক্ষয় ভাণ্ডার বিদ্যমান। প্রেমের কবিতাই তাঁহাকে অমর করিতে সক্ষম —যথেষ্ট, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সকল প্রেমগীতির রচনা করিয়াছিলেন, আজও স্কট্‌লণ্ডের কঙ্করকণ্টকাকীর্ণ পার্ব্বত্য পথে বা উবর পর্ব্বতে কৃষকের কণ্ঠে সেই সকল প্রেমগীত নিত্য গীত হয়। লর্ড রোজবেরি বলিয়াছেন, বার্ণস যে মৃত, এ কথা তিনি মনেই করিতে পারেন না। তাঁহার মনে হয়, বার্ণস জীবিত। স্বজাতির হৃদয়ে বার্ণস যেরূপ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তেমন আর কেহই পারেন নাই। স্কট্‌লণ্ডের শিরায় আজও বার্ণসের শোণিত প্রবাহিত। সমগ্র দেশে তাঁহার প্রভাব। সে প্রভাব স্কট্‌লণ্ড হইতে ক্রমে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সত্যই প্রকৃত কবি-প্রতিভার অধীশ্বরগণ কোন বিশেষ দেশের—কোন বিশেষ জাতির বা কোন বিশেষ কালের নহেন। তাঁহারা পৃথিবীর। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সমগ্র মানবজাতির উপভোগের সামগ্রী। সে কীর্ত্তি কালজয়ী। তাই স্কট্‌লণ্ডের জাতীয় কবি আজ সমস্ত জগতে সমাদৃত

শিল্প।

শিল্প-বিদ্যালয়।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে উন্নত শিল্প শিক্ষা দিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান স্থানে শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রদান-প্রণালী সন্তোষজনক, এ কথা বলা যায় না। কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করিলে ফল সন্তোষজনক হয়, সে বিষয় লইয়া অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি আলোচনা করিতেছেন। সম্প্রতি মান্দ্রাজ আর্ট স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডবলিউ এস্. হাভাওয়ে ভারতীয় আর্ট স্কুলের শিক্ষাপ্রদান-সম্পর্কিত ব্যাপারের আলোচনা করিয়া 'ইণ্ডিয়ান

রিভিউ' নামক সুবিখ্যাত মাসিক পত্রে একটি সুন্দর সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছেন। লাহোরের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ কন্‌ফারেন্স বা শিল্প-সমিতিতে পাঠ করিবার জন্য এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে অনেক আবশ্যক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। আমরা নিম্নে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধটির মর্ম্মাভাস প্রদান করিলাম।

ভারতের সুবিধা

শিল্প-বিদ্যালয়সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে ভারত অন্য দেশ অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যশালী। প্রথমতঃ ভারতে শিল্প-বিদ্যালয়ের সংখ্যা অধিক নহে; সুতরাং ঐ সকল বিদ্যালয়ে ভারতীয় প্রতিভাসম্পন্ন ও মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্য গ্রহণ করা সহজসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় শিল্প-বিদ্যালয়সমূহ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইতে পারেন। তৃতীয়তঃ অন্য দেশে যে প্রকার 'হাতে কলমে' শিক্ষা-প্রদান অসম্ভব, ভারতে সে প্রকার শিক্ষাপ্রদানে পূর্ণমাত্রায় সাফল্যলাভ করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন বিদ্যালয়।

অতঃপর হাডাওয়ে মহাশয় অন্যান্য দেশের শিক্ষা-প্রণালীর সহিত ভারতীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের কার্য্যের তুলনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, প্রতীচ্য দেশে তিন প্রকারের শিল্প-শিক্ষাগার আছে। প্রথম চিত্রবিদ্যালয়; ঐ বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা, অঙ্কনবিদ্যা (drawing) ও মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থে আদর্শ-গঠন-শিক্ষা প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয়, আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স্ স্কুল বা শিল্প ও বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয়; এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রায় সকল প্রকার শিল্পবিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কাষ্ঠ ক্ষোদাই, ধাতুশিল্প, বুটাদারের কায, কলাই, নক্সা প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হয়। তৃতীয়, সান্ধ্য বিদ্যালয়; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যাহা যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, শেষোক্ত বিদ্যালয়ে অল্পবিস্তর তাহা প্রায় সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

চিত্রবিদ্যালয়ের শিক্ষা।

প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ নিজে দেখিয়া ও অপর ছাত্রগণের অঙ্কন ও চিত্রের সহিত আপনাদের অঙ্কনের ও চিত্রের তুলনা করিয়া যাহা পারে, তাহাই শিক্ষা করে। শিক্ষকগণ ছাত্রগণের অঙ্কনের দোষ প্রদর্শন করেন না, কি উপায়ে সেই দোষের পরিহার করা যাইতে পারে, তাহাও ছাত্রদিগকে প্রায় বলিয়া বা বুঝাইয়া দেন না। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ শিল্পী; তাঁহারা সপ্তাহে দুই দিন এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা করিয়া বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের প্রকোষ্ঠে আসিয়া থাকেন। ঐ সময় তাঁহারা ছাত্রদিগের চিত্রের ও অঙ্কনের সমালোচনামাত্র করিয়া থাকেন। যে সকল ছাত্র অসাধারণ চিত্র-কৌশল প্রদর্শন করে, শিক্ষকগণ তাহাদিগের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়া থাকেন। অল্পে অল্পে যাহাদের শিল্প-কৌশল বিকাশপ্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র চেষ্টার ও পরিশ্রমের দ্বারা যাহারা শিল্প-কৌশল শিক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, শিক্ষকগণের প্রদত্ত উৎসাহের অভাবে তাহারা সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ প্রত্যহ সাত আট ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া চারি হইতে সাত বৎসরে শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত করে। ছাত্রগণ সাধারণতঃ

চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও উপদেশই প্রাপ্ত হয় না। তাহারা কেবল রেখাঙ্কন ও বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে উপদেশ পায়। বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ছাত্রগণ গ্রীক ও রোমক প্রতিমূর্ত্তির অনুকরণ করিতে শিখে; তাহার পর জীবন্ত আদর্শ দেখিয়া রেখাঙ্কন ও চিত্রণ শিক্ষা করিয়া থাকে। ছুটীর সময় ছাত্রবর্গ প্রাকৃতিক পদার্থ অঙ্কিত করিতে শিক্ষা করিয়া থাকে। ছুটীর সময় ছাত্রগণ যে সমস্ত শিল্পকার্য্য করে, তাহার একটি প্রদর্শনী হয়। সেই প্রদর্শনীতে ছাত্রগণ ঐরূপ কার্য্যে উৎসাহ পায়। যে সকল ছাত্র এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে, তাহারা জীবের প্রতিকৃতি অঙ্কনে পারদর্শী হয়; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রই সাপ্তাহিক পত্র, মাসিক পত্র প্রভৃতিতে ও পুস্তকের ছবি আঁকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই প্রকৃত আলেখ্য অঙ্কিত করিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকে। শিক্ষা-প্রদান-পদ্ধতিই এ অবস্থার প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে অনেক আবশ্যক বিষয় সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ শিল্পিগণ উপযুক্ত সহকারীদিগের সাহায্যে ছাত্রদিগকে পুস্তক বাঁধাই, কাষ্ঠ ক্ষোদাই, নকাশী, সোণারূপার কায প্রভৃতি শিখাইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অনেক লোক স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করে।

তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়।

তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি প্রথম দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মিশ্রণমাত্র। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যাহা যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, শেষোক্ত শ্রেণীর বিদ্যালয়ে তাহার প্রায় সকল বিষয়ই অল্পবিস্তর শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষানবীশদিগকে ভাল করিয়া তাহাদের কায শিখাইবার জন্য প্রধানতঃ এই সকল বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। অনেকে কলকারখানায় শিক্ষানবীশি করে। কিন্তু কলকারখানার সকল কায সহজে শিক্ষা করা সম্ভবে না, সেইজন্য তাহাদিগকে সেই সকল কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দানের জন্য এই শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। কারখানার মজুরগণ একই প্রকার কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হয়। তাহারা যে কায করে, তাহা ভিন্ন অন্যপ্রকার কায করিবার ও শিখিবার অবকাশ তাহাদের প্রায় হয় না। সেই জন্য সান্ধ্য বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। বলা বাহুল্য, এই তিন প্রকার বিদ্যালয়েরই প্রয়োজন আছে।

প্রতীচ্য খণ্ডে শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকেই নূতন নূতন শিল্পকার্য্য করিবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। শিক্ষকগণ সে বিষয়ে ছাত্রদিগকে বিশেষ সাহায্য করেন না। য়ুরোপীয় শিল্প-বিদ্যালয়গুলিতে যে যে বিষয়ের শিক্ষা প্রদান ও যে যে পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাপ্রদান আবশ্যক, ভারতীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন সহরে শিল্প-শিক্ষকগণের একটি সমিতি হইয়াছিল। সেই

সমিতিতে অনেকে অনেক সুন্দর সন্দর্ভ পাঠ করেন। তন্মধ্যে এক জন মণিকার (Jeweller) একটি অতি আবশ্যক কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে প্রণালীতে কারখানার কার্য্য পরিচালিত হয়, ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসারে শিল্প-বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। সে পদ্ধতিটি এইরূপ,—ছাত্রগণ এক জন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিল্পীর সহিত একত্র শিল্পকার্য্য করিবে। সেই অভিজ্ঞ শিল্পী কি ভাবে কার্য্য করেন, কি ভাবে সুন্দর ও অভিনব কারুকার্য্যের মতলব বাহির করেন, তাহারা তাহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিবে। শিল্পীও ছাত্রগণকে কারুকার্য্য বুঝাইয়া দিবেন। ছাত্রগণ এক দিনেই সেই সুদক্ষ শিল্পীর শিল্প-কৌশল শিখিতে সমর্থ হইবে না সত্য, কিন্তু যে উপায়ে সুদক্ষ শিল্পী ঐ কার্য্য করিতে পারেন, তাহারা ক্রমশঃ সেই উপায় জানিবে। কিরূপে স্বয়ং কারুকার্য্য করিতে হয়, তাহা অনেক সুদক্ষ শিল্পী জানেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অনেকের শিল্প সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধি ও অন্যকে বুঝাইবার শক্তি না থাকিতে পারে; এরূপ স্থলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। পূর্ব্বে এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। এখনও ইহার প্রবর্ত্তনা করা আবশ্যক।

মিঃ হাডাওয়ে শিল্প-বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। ইনি বলেন, শিল্প-বিদ্যালয়কে শিল্পের পরীক্ষাগারে পরিণত করা বিধেয় নহে। শিল্প-বিদ্যালয়ে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিততা বিশেষভাবে প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ একাদিক্রমে অধিকক্ষণ একবিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখিতে পারে না,—সেই জন্য দুই ঘণ্টাকাল কায করিবার পর তাহাদিগকে কিছু ক্ষণ অবকাশ দেওয়া আবশ্যক। ইহা ভিন্ন ছাত্রগণকে রেখাঙ্কনে ও রেখাবিজ্ঞান বা জ্যামিতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া বিধেয়।

বিবিধ।

খাইবারে পাঠান।

ইংরাজাধিকৃত ভারতে খণ্ডরাজ্যের স্থানে বিশাল সাম্রাজ্য সংগঠনের ফলে ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ধ্বংসসহচর ঘূর্ণাবর্ত্তের অবসানে যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্নিগ্ধ ছায়া সাহিত্যের, শিল্পের ও বিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এখন ভারতে :—

"শুভ্র গঙ্গা বহি যায়, রক্তবিন্দু নাহি তায়,
শ্যামল যমুনা নিরমল,
দেখিলে জুড়ায় নেত্র, স্বর্ণ-কান্তি শস্য-ক্ষেত্র,
আগে যেথা ছিল রণস্থল।"

কেবল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুরন্ত পার্ব্বত্য জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুসিত গিরিগাত্রে

মধ্যে মধ্যে অশান্তির ধূমপুঞ্জ গগন মলিন করিয়া অন্তর্নিহিত বহ্নির পরিচয় প্রদান করে। কিছুদিন পূর্ব্বে কর্ণেল হানা দেখাইয়াছিলেন, সীমান্ত-সংগ্রামে তৎকাল পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের ৭১৪, ৫৮০, ৪৮০, টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। সংপ্রতি মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকৃডোনাল্ড 'ডেলি ক্রনিকেল' পত্রে খাইবারে পঠানদিগের সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থান এই দুই দেশের মধ্যবর্ত্তী গিরিমালায় পাঠানের বাস। সে অভিবাদনে অভ্যস্ত নহে—সাক্ষাতে সেলাম করে না—নিঃসঙ্কোচ-নেত্রে আগন্তুকের মুখপানে চাহে। তাহার মুখশ্রী রমণীমুখশ্রীর মত সুন্দর; তাহার হাসি মধুর। বিপদের মধ্যে বাস করিয়া সে মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাই সে ভাবে "হেসে নাও, দু'দিন বই ত নয়।"

পরিচয়।

সে গোঁড়া মুসলমান। অভিনব ধর্ম্মমত বা রাজনৈতিক ধারণা তাহার নিকট অসহনীয়। সে বন্দুক ভালবাসে, বোমা ঘৃণা করে, তাই বাঙ্গালী তাহার নিকট ঘৃণিত। লুণ্ঠনাভিযানে তাহার পরম আনন্দ; হত হইলে সে বীরের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। লেখকের শরীররক্ষকদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, তাহার কোন বন্ধু সেনাদল হইতে কয়দিনের ছুটীতে যাইয়া তাহার কোন শত্রুর দুর্গ ভাঙ্গিয়া দিয়া, দুইজন লোককে হত্যা করিয়া ও একখানি গ্রাম জ্বালাইয়া যথাকালে পল্টনে ফিরিয়া আসিয়াছিল—যেন কিছুই হয় নাই। কাহারও সহিত তাহার বিবাদ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, একজন শরীররক্ষক বলিয়াছিল, "না। আমার বাসভূমি ইংরাজাধিকারের অতি নিকটে।" যেন ইহাতে সে বড় দুঃখিত। যুদ্ধে তাহাদের পরম আনন্দ পাঠানদিগের বাসগ্রামমাত্রই দুর্গ। চারিদিকে প্রাচীর, মধ্যস্থলে দুর্গ। গ্রামটি নদীর বা সাধারণ রাজপথের অদূরবর্ত্তী হইলে প্রায়ই পরিখা-বেষ্টিত হয়।

যোদ্ধা।

খাইবারে পাঠান গৃহস্থ। খাইবারের রাজপথ ইংরাজের অধিকৃত। এ পথে যুদ্ধ করিলে ইংরাজ যোদ্ধার শাস্তি-বিধান করেন। সেই জন্য এ পথে পাঠানগণ যুদ্ধ করে না—শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কলহে বিরত থাকে। এই শান্তি অবশ্য অস্ত্রের দ্বারা সংস্থাপিত ও সংরক্ষিত; ইংরাজের ভয় ব্যতীত ইহার অস্তিত্ব অসম্ভব। মঙ্গলবারে ও শুক্রবারে আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে গতায়াতকারী বণিকদিগের রক্ষার জন্য ইংরাজ সরকার হইতে সেনাদল প্রেরিত হয়। এই সেনাদলে সংরক্ষিত হইয়া—উষ্ট্র, গর্দ্দভ বা মহিষপৃষ্ঠে মাল বোঝাই দিয়া বণিকগণ অগ্রসর হয়। উপরে পর্ব্বত শিরে রক্ষিদল দণ্ডায়মান থাকে। পথে দুর্গের বাহুল্য। দেখিতে পাওয়া যায়, পৃষ্ঠে বন্দুক বাঁধিয়া পাঠানগণ পশু চরাইতেছে বা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা এই যাত্রীদিগের দিকে চাহিয়া থাকে। বোধ হয়, সে কালের সেই লুণ্ঠনসুযোগের অন্তর্ধানে তাহারা দুঃখিত। ক্রমে শান্তির স্নিগ্ধ ছায়ার প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। এখন চারিজনমাত্র রক্ষী লইয়া লেখক ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; পূর্ব্বে শতজন রক্ষীও যথেষ্ট বিবেচিত হইত না।

গৃহস্থ।

কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে, বলা দুষ্কর। মস্কট হইতে বন্দুক আমদানী চলিতেছে; পাঠানের অস্ত্রের অভাব নাই। ভয় কাহাকে বলে, তাহা সে জানে না। রণোন্মাদনার সময় তাহার জ্ঞান থাকে না। বিশেষ ইংরাজ-শাসনে পর্ব্বতের ক্ষুদ্র পরিসরে বদ্ধ হইয়া পাঠান অধীর হইয়া উঠিতেছে। হয়ত একদিন সে সকল বাধা ভাঙ্গিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইবে। তখন উপত্যকা নরশোণিতে রঞ্জিত হইবে; গিরিগহ্বর আগ্নেয়াস্ত্রের ভীমরবে প্রতিধ্বনিত হইবে। সেরূপ ঘটনা যে ভারতবাসীর পক্ষে দুর্ঘটনা তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

ভবিষ্যৎ।

মশক।

দিবাবসানে ধরাবক্ষ যখন অন্ধকারে আবৃত হইতে থাকে, সেই সময় বাঙ্গালার বহু জিলায় তিমিরাবগুণ্ঠিত বায়ুমণ্ডল মশকের সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। রুদ্ধপবনগতি ভাদ্রপদের সায়াহ্নে মশক-দংশনে অঙ্গ জ্বলিয়া যায়। এই দংশনকারী জীব অতি ক্ষুদ্র,—নিতান্ত উপেক্ষিত। লোক মশা মারিবার জন্য কামান সাজাইতে চাহে না; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, যে সকল শত্রুর বিনাশ-সাধনে মানুষ কামান সাজাইতে ব্যস্ত, সেই সকল শত্রু অপেক্ষা এই অতিশয় অবজ্ঞাত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, মৃদুগুঞ্জনকারী জীব সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর। সিংহ,শার্দ্দূল প্রভৃতি শ্বাপদগণ মানবসমাজের যত ক্ষতি করে, ভীষণ বিষধর মানব-জাতির যত শক্তিক্ষয় করে, তাহা এই ক্ষুদ্রশত্রুকৃত ক্ষতির তুলনায় নিতান্তই উপেক্ষার যোগ্য। প্রতিবৎসর মশকদংশনে অখণ্ড বঙ্গে ষোল হইতে আঠার লক্ষ লোক শমনভবনে নীত হয়। সমগ্র পৃথিবীতে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক এত লোক দশ বৎসরেও নিহত হয় না। এই ক্ষুদ্র শত্রুকে আমরা এতই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখি যে, এই ক্ষুদ্র শত্রুই যে আমাদের ঘরে ঘরে পতিপুত্রবিয়োগবিধুরা রমণীগণের কাতর ক্রন্দনের উদ্ভব করিতেছে,—একথা আমরা সহজে বিশ্বাস করি না। কথাটি কিন্তু হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য নহে।

আজ কয়েক বৎসর হইল, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ সাবধানে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মশকই জনপদবিধ্বংসী ম্যালেরিয়া রোগের বিসর্পক বা বাহক। সে পরীক্ষা এত সাবধানে অনুষ্ঠিত যে, আপাততঃ তাহাতে সন্দেহের ছায়াপাতও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রোনল্ড রস ও তাঁহার পরে কয়েক জন ইতালীয় ডাক্তার সিদ্ধান্ত করেন যে, অ্যানোফিলিস-জাতীয় মশকের দংশনে লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক-সমাজ সে সিদ্ধান্ত অবিসংবাদিত বলিয়া

স্বীকার করেন নাই। সে সিদ্ধান্তের উপর অনেক বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইয়াছিল। তখন London School of Tropical Medicinesএর পক্ষ হইতে ডাক্তার স্যাম্বন ও ডাক্তার লো এই বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। পরীক্ষার ফলে মশকই ম্যালেরিয়ার বিসর্পক এই সত্য নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ হয়। ইঁহারা দুই জন এবং সিনোর টোজ নামক আর এক ব্যক্তি, ও ভৃত্যাদি সমভিব্যাহারে রোমের ক্যাম্পেনা অষ্টিয়া নামক স্থানে এক কুটীরে অবস্থিতি করেন। ঐ স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্য অত্যন্ত অধিক। কিন্তু তাঁহারা যে কুটীরে বাসা লইয়াছিলেন, সেই কুটীর লৌহের জালৃতী (wire gauze) দ্বারা এমন ভাবে আবদ্ধ করা হইয়াছিল যে, মশকগণ কিছুতেই তাহার ভিতর প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর হইতে সমস্ত দিবাভাগে ঐ স্থানের সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন, শীত রৌদ্র বৃষ্টি সকলই অবাধে সহ্য করিতেন, মাঠে মাঠে পরিশ্রম করিতেন, ঐ স্থানের ও উহার সন্নিহিত স্থানের জল যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতেন, কিন্তু সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই সেই রুদ্ধ-মশক-প্রবেশ কুটীরে প্রবেশ করিতেন। এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, ম্যালেরিয়াবাহী মশক দিবাভাগে বাহির হয় না। এই পরীক্ষকমণ্ডলী কোনও প্রকার ঔষধ ব্যবহার করেন নাই। ফলে দেখা গেল যে, ঐ স্থানের ইটালীয় কৃষকগণ বারংবার ম্যালেরিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জ্বরে পড়িয়াছিল, আর সেই মশকহীন কুটীরবাসী ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনও ঐ রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন নাই।

এদিকে কতকগুলি এনোফেলি-জাতীয় মশককে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত খাওয়াইয়া একটি খাঁচার মধ্যে প্রবিষ্ট করান হয় এবং তাহাদিগকে "লণ্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যাল ডিজিজেস্"এর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। তাঁহারা ডাক্তার পি. থার্ব্বার্ণ ম্যানসনকে ও মিঃ জর্জ্জ ওয়ারেণকে ঐ মশক কর্ত্তৃক বিলক্ষণরূপে দষ্ট করান। বলা বাহুল্য, ইঁহারা দুই জন পূর্ব্বে কখনই ম্যালেরিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন নাই। স্বাস্থ্যবান বলিয়াই ইঁহারা পরীক্ষার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু দংশনের পক্ষকাল মধ্যেই ইঁহারা দুই জনেই যুগপৎ ম্যালেরিয়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। ইঁহাদের শোণিতকণিকায় ম্যালেরিয়ার পররুহ দেখা গেল। ইঁহারা উভয়েই বারংবার ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। শেষে কুইনাইন সেবনে ইঁহারা উভয়েই সে রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পায়েন।

এই পরীক্ষার পর মশকই যে ম্যালেরিয়ার কারণ, ইহা সত্য বলিয়া অনেকের বিশ্বাস জন্মিল। তাহার পর বহুবিধ পরীক্ষার দ্বারা অ্যানোফিলিস্-জাতীয় মশকের সহিত ম্যালেরিয়া জ্বরের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহার পর হংকং, কেপ কোষ্ট, ক্লাং, ইস্মেলিয়া প্রভৃতি স্থানে মশকের উৎপত্তির কারণ নিবারিত করিয়া এবং মশকের ডিম্ব ধ্বংস করিয়া দেখা গিয়াছে, মশকের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই ম্যালেরিয়া উচ্ছিন্ন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে মশকই যে মানবদেহে ম্যালেরিয়া-বিষ বিসর্পিত করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই শত্রুর সকল সন্ধানই আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। ইহার জীবনকথা অতিশয় বিস্ময়জনক। এক একটি স্ত্রী-মশক আড়াই শত হইতে তিন শত পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্ব অবস্থা হইতে পরিণত মশকাবস্থা প্রাপ্ত হইবার মধ্যে ইহার পর পর চারি বার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই অবস্থা-চতুষ্টয়ের নাম এই ;—(১) ডিম্ব (egg), (২) অর্ভক বা শুক কীট (larva), (৩) কোষস্থ বা মূক কীট (pupa) ও (৪) মশক (imago)। নিম্নে সেই অবস্থা-চতুষ্টয়ের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

মশকজাতি নানা ভাগে বিভক্ত। একজাতীয় মশার নাম কুলেক্স (Culex), আর এক জাতির নাম ষ্টেগোমাইয়া (Stegomyia), আর এক জাতির নাম অ্যানোফেলিস (Anopheles) ; এইরূপ আরও অনেকজাতীয় মশক আছে। ইহার মধ্যে অ্যানো-ফেলিস্-জাতীয় মশাই ম্যালেরিয়ার বাহক। এই জাতীয় মশকই এই সন্দর্ভের সর্ব্ব-প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সকল জাতীয় মশাই এই অবস্থা-চতুষ্টয়ের অধীন ; সেই জন্য সাধারণতঃ সকল মশকেরই এই দশা-বিপর্য্যয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। মশকজাতি পতঙ্গ (Insecta) জাতির মধ্যেই গণ্য। তাহারা দ্বিপক্ষ (diptera) পতঙ্গ। তন্মধ্যে ইহারা মশক সম্প্রদায় (Culicidiæ)-ভুক্ত।

ভ্রূণ বা ডিম্ব অবস্থা। স্ত্রী-মশক জলের উপরই ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি জলে নিমগ্ন হইলেই মরিয়া যায় ; সেই জন্য মশকজননী সেগুলিকে নৌকাকারে সজ্জিত করিয়া জলে ভাসাইয়া দেয় ; সকল জাতীয় মশক এক প্রকার জলে ডিম্ব প্রসব করে না। কুলেক্স ও অ্যানোফিলি-জাতীয় মশক মৃত্তিকাসংলগ্ন জলে ডিম্ব প্রসব করে। তন্মধ্যে কুলেক্স বদ্ধ, স্রোতহীন জলে এবং অ্যানোফিলিস স্বল্পস্রোত জলে ডিম্ব পাড়ে। শেষোক্তজাতীয় মশক সময় সময় বদ্ধ জলেও ডিম পাড়িয়া থাকে। ষ্টেগোমাইয়া-জাতীয় মশক মৃত্তিকাসংলগ্ন জলে আদৌ ডিম পাড়ে না। টব, নল, ভাঙ্গা তৈজস প্রভৃতিতে সঞ্চিত জলে ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে। প্রাতঃকালই মশকদিগের ডিম্ব প্রসবের সময় প্রসবের পর দুই তিন দিনের মধ্যেই সেই ডিম্ব ফুটিয়া অর্ভক বাহির হয়। ডিম্বাবস্থাতে ইহারা কোন্ জাতিভুক্ত তাহা বুঝিবার উপায় আছে। কুলেক্স-জাতীয় মশার ডিম্বগুলি পরস্পর সংলিপ্ত, যেন একখানা নৌকাকারে সম্বদ্ধ। কিন্তু অ্যানেফিলি-জাতীয় মশার ডিম্বগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত থাকিলেও যেন পরস্পর পৃথক্। অণুবীক্ষণ-সাহায্যে দেখিলে এই পার্থক্য বিলক্ষণ উপলব্ধি করা যায়।

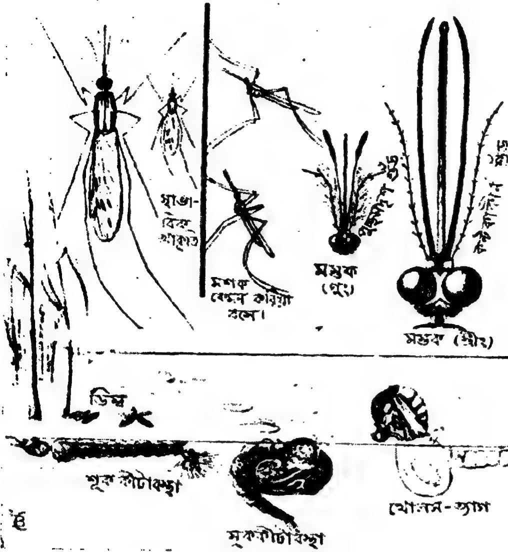
(২) অর্ভক বা শুক কীট (larva) অবস্থা। এই অবস্থায় ইহারা সূতার মত পাকান পাকান অতি ক্ষুদ্র চঞ্চল জীব। স্থির বদ্ধ জলে ইহা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কোনরূপে জলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে ইহারা জলের তলে ডুবিয়া যায়। স্থির জলে ইহারা উপরে ভাসিয়া থাকে। অ্যানোফিলিস্ মশকের অর্ভক সহজে ডুবিতে চাহে না। ইহারা নাড়া পাইলে সরিয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহাদের মস্তক, ধড় ও পুচ্ছ দৃষ্ট হয়। মস্তকটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ইহারা শ্বাসপ্রশ্বাসার্থ বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে। অর্ভকাবস্থায়

ইহাদের পুচ্ছদেশ হইতে একটি বায়ুবাহী নল বিস্তৃত দেখা যায়। যখন ইহারা স্থির হইয়া জলের উপরিভাগে অবস্থিতি করে, তখন এই নলটি জলের উপরে ভাসমান থাকে। ইহার দ্বারা বায়ু লইয়া ইহারা শ্বাসপ্রশ্বাস করে। কুলেক্স জাতীয় মশকার্ভকের বায়ুবাহী নল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। ইহা যখন জলের উপরিভাগে অবস্থিতি করে, তখন পুচ্ছদেশটি ঊর্দ্ধ দিকে রাখিয়া মস্তকটি নিম্নদিকে জলের ভিতর নিমজ্জিত করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে অ্যানোফিলি-জাতীয় মশকার্ভকের শ্বাসনলটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহারা জলের উপরিভাগের সহিত সমান্তরালভাবে জলের উপরিভাগের ঠিক নিম্নেই অবস্থিতি করে। এই অবস্থায় মশকার্ভকগণ বারংবার খোলস পরিত্যাগ করে এবং দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পায়। শীতে ইহাদের বৃদ্ধি মন্থর এবং তাপে দ্রুত হয়। এইরূপে তিন চারি সপ্তাহ কাল ইহারা বারংবার নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিয়া পরে তৃতীয় দশায় উপনীত হয়। অভর্ক অবস্থায় ইহাদের বুভুক্ষা ও চাঞ্চল্য অত্যন্ত তীব্র থাকে।

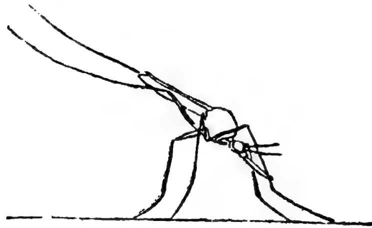
(৩) কোষস্থ বা মুককীট অবস্থা (Pupa stage)। ইহাকে সম্প্রার্ভাবস্থা বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই সময় ইহাদের দেহ কোষমধ্যে আবদ্ধ থাকে। এই অবস্থায় ইহাদের শরীরে দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, কিন্তু ইহারা যেন নিদ্রিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থিতি করে। এই সময় ইহাদের দেহ কৃষ্ণ বর্ণ, ধড় দীর্ঘ, পুচ্ছ বক্র ও মস্তক একটু বৃহৎ হয়। ইহারা তখন যেন একটা বড় রকমের কমার (,) মত বোধ হয়। এই সময় ইহাদের মস্তকের দিকে দুইটি শ্বাসবাহী নল দেখা দেয়। ইহারা এই সময় জলের উপরিভাগেই ভাসিতে থাকে। কিন্তু কোনও রূপে উত্যক্ত হইলে সরিয়া যায় বা জলের তলে ডুবিয়া যায়। এই সময় ইহাদের বুভুক্ষা একেবারেই থাকে না। প্রায় সপ্তাহকাল এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া ইহারা কোষ ছিন্ন করিয়া পূর্ণাঙ্গ মশকরূপে বাহির হয়।

(৪) মশকাবস্থা (Imago stage)। চতুর্থাবস্থায় এই ক্ষুদ্র জীব পূর্ণাঙ্গ মশকে পরিণত হয়। ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। বিভিন্নজাতীয় মশকের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য বর্ত্তমান। কুলেক্স-জাতীয় মশায় বর্ণবৈচিত্র নাই, ইহারা কুব্জপৃষ্ঠ হইয়া বসে। ইহাদের শুঁয়াগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহাদের পুরুষজাতির শুঁয়া (Palpi) গুলি স্ত্রীজাতির শুঁয়া অপেক্ষা দীর্ঘতর। পক্ষান্তরে অ্যানোফিলি-জাতীয় মশকগুলির সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ এই যে, ইহারা যখন বসে, তখন ইহাদের ধড়, মস্তক ও হুল ঠিক সোজা,—যেন সরল রেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। ইহাদের পালকে বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে। ইহাদের শুঁয়া-গুলিও দীর্ঘ। পুরুষ ও স্ত্রীজাতির শুঁয়াগুলি সমান। সকল শ্রেণীর পুংজাতীয় মশকের শৃঙ্গের (antenœ) উপর লম্বা লম্বা লোম বা পালক জন্মে।

সকল শ্রেণীর মশকই বৃক্ষপত্রের রস পান করে। স্ত্রী মশক সুবিধা পাইলেই জীবের রক্ত শোষণ করে। পুরুষ মশা একেবারেই শোণিত পান করে না। স্ত্রী মশক অগ্রে জীবের চর্ম্মমধ্য দিয়া জীবদেহে হুলটি প্রবিষ্ট করাইয়া দেয় এবং সেই হুলের ভিতর দিয়া জীবদেহে তাহার লালা ঢালিয়া দেয়। ঐ লালা শরীরের যে স্থানে প্রবিষ্ট হয়,

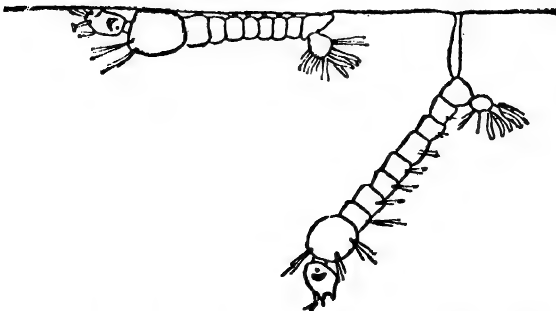


ছবির নিম্নার্দ্ধে তৃণযুক্ত একটি জলাশয়ে, বাম দিক হইতে ম্যালেরিয়াবাহী মশকের শৈশবাবস্থার যথাক্রমে ডিম্বাবস্থা (egg), শূককীটাবস্থা (Larva), মূককীটাবস্থা (Pupa) ও খোলসত্যাগ (Imago) দেখান হইয়াছে।





গৃহস্থ গৃহের সাধারণ মশক ও ম্যালেরিয়া মশক।



মশকের শাবক। জলের সমান্তর রেখায় ম্যালেরিয়াবাহী মশকের শাবক।

সেই স্থানটি জ্বালা করে। ফলে ঐ স্থানে অনেক রক্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। লালার সহিত মিশ্রিত হইলে রক্ত তরল থাকে, জমাট বাঁধে না। সুতরাং মশকের পক্ষে রক্ত পান করা সহজ হয়। কেহ কেহ বলেন, মশকের রক্ত-মিশ্রণে স্থানীয় রক্ত একটু পাতলা হইয়া যায়।

সুস্থ মশকের দংশন কেবল দষ্ট স্থানে জ্বালা উৎপন্ন করে। রোগাক্রান্ত মশকের দংশনই জীবদেহে ব্যাধিবীজ সংক্রমিত করিয়া দেয়। সকল শ্রেণীর মশকই মানবদেহে একই প্রকার ব্যাধিবীজ বিসর্পিত করিয়া দেয় না। অ্যানোফিলি-জাতীয় মশা মানবদেহে ম্যালেরিয়ার বীজ প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। কুলেক্স-জাতীয় মশা শ্লীপদ রোগের বসর্পক। ষ্টেগোমাইয়া-জাতীয় মশা পীতজ্বরের বীজ মানবদেহে সঞ্চারিত করে। কেহ কেহ বলেন যে, ডেঙ্গু জ্বরও মশক দ্বারা বিসর্পিত হইয়া থাকে।

মশক কি ভাবে মানবদেহে রোগবীজ প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়, তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রোগাক্রান্ত মশকের দংশনই মানবকে রোগাক্রান্ত করে। একটা সুস্থ অ্যানোফিলি-জাতীয় স্ত্রী মশক কোন এক ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত পান করিলে শোণিতের সহিত তাহার উদরে ম্যালেরিয়া রোগবীজ প্রবিষ্ট হয়। এই রোগবীজ এক প্রকার পররুহ জীবাণু। উহারা অ্যানোফিলিস্ মশকের উদর-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মশকের উদরে অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইলে উহারা মশকের লালার সহিত বাহির হয়। এই সময় সেই স্ত্রীজাতীয় অ্যানোফিলিস্ যদি মানুষকে দংশন করে, তাহা হইলে সেই লালার সহিত ঐ রোগবীজ মানবদেহে প্রবেশ করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই রোগবীজ পররুহ জীবাণু। ইহা একটি পদার্থকে আশ্রয় করিয়া তাহাকেই গ্রাস করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মশকের হুলের ভিতর দিয়া মশকের লালার সহিত মিশিয়া ইহারা জীবশরীরে প্রবেশ করে, এবং ক্রমে ক্রমে আক্রান্ত রক্তকণিকাটিকে জীর্ণ ও শীর্ণ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহা এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, অল্পকালের মধ্যে ইহা সমস্ত লোহিত কণিকায় বংশবৃদ্ধি করিয়া ফেলে। ইহারা রক্তকণিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে সেই রক্তকণায় একটি কৃষ্ণবর্ণ দাগ দেখা দেয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিলে এই দাগ স্পষ্টই দেখা যায়।

ম্যালেরিয়ার এই বীজ মশকশরীরে ও মানবশরীরে কি ভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। মশক ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের বিস্তারে কি ভাবে সহায়তা করে, তাহা এখন সাধারণের বোধগম্য করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। কিছু কাল পূর্ব্বে ঢাকা নর্থব্রুক হলে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল হল এ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ও সরল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আরও কয়েক জন সুপণ্ডিত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক এ কথা প্রকৃষ্টভাবে সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অ্যানাফিলিস যে ভাবে ম্যালেরিয়া বিসর্পিত করে, কুলেক্স, ষ্টেগোমাইয়া প্রভৃতি জাতীয় মশকও সেই ভাবে

শীর্ণ ও পীতবর্ণ বিকৃত করিয়া থাকে। সুতরাং সে কথা আর স্বতন্ত্র করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

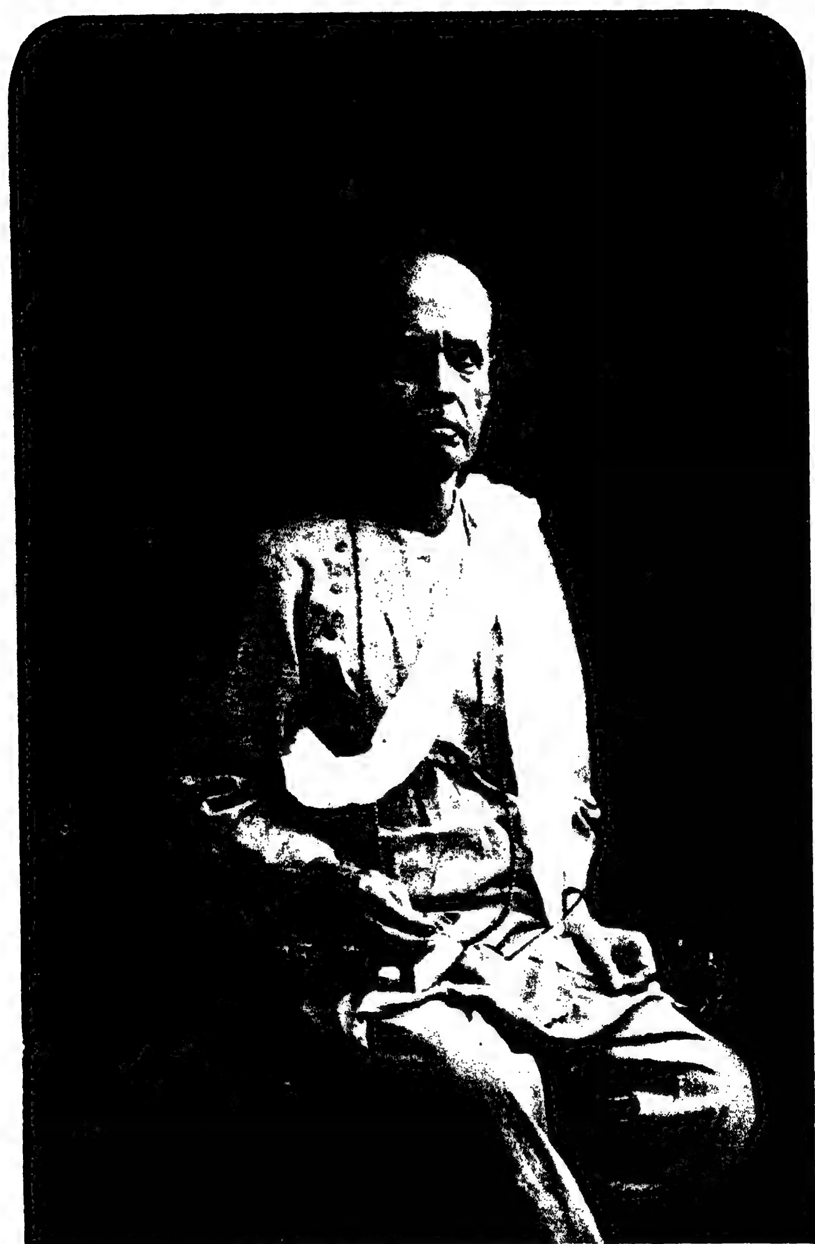
জনপদবিধ্বংসী ব্যাধির সহিত মশকগণের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রাচীন ভারতেও পরিজ্ঞাত ছিল। কম্পিল্য নগর দেখিয়া পুনর্ব্বসু ঋষি যখন অগ্নিবেশ প্রভৃতিকে জনপদবিধ্বংস ব্যাধির কথা বুঝাইয়া দেন, তখন তিনি ভূতবিকৃতিই জনপদবিধ্বংসী ব্যাধির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মরুত বিকৃতির ফলে মশকাদি জন্মে, তাহার ফলে নানা জনপদবিধ্বংসী ব্যাধি প্রাদুর্ভূত হয়। অনেক প্রাচীন বৈদ্যক শাস্ত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে এ সম্বন্ধে প্রাচীন বিস্তৃত মত পাওয়া অসম্ভব হইয়া হইয়া পড়িয়াছে।

একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মশকগণ বৃক্ষপত্রের রস পান করে। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, যে সময় ম্যালেরিয়া জ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ হয়, সে সময় অ্যানোফিলি-জাতীয় মশকগণ "ভাঁট" পাতার রস পান করিয়া থাকে। ঐ সকল মশক ম্যালেরিয়াক্রান্ত কি না, তাহা দেখিবার আমার সুবিধা হয় নাই; কারণ, উহা দেখিবার উপযুক্ত উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য আমি তখন পাই নাই। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, ম্যালেরিয়াক্রান্ত মশকগণ সহজাত সংস্কারবশে রোগপ্রশমনার্থ ভাটপাতার রস পান করে। দেখা গিয়াছে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অবস্থায় "ভাঁট" পাতার রস ও ভাঁটাপাতা সিদ্ধ জল পান করিলে ম্যালেরিয়া রোগ দ্রুত প্রশমিত হয়। ম্যালেরিয়ার সময় এই ক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আমার পরীক্ষার ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ, সম্যক্ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও অভাব; সুতরাং আমার এই সিদ্ধান্তের কোন মূল্যই নাই। কিন্তু যদি কোন বৈজ্ঞানিক এই বিষয়টি একটু মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি একটি মহৎ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়া জগতের বিশেষ উপকার করিয়া যাইতে পারিবেন। সেই জন্য কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি বৈজ্ঞানিক সমাজকে এই বিষয়টি জানাইলাম। *

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

---

* চিত্রগুলি ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 'স্বাস্থ্যরক্ষা' হইতে গৃহীত।



শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা।*

যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান, ইউক্লিডের এই প্রতিজ্ঞার চেয়ে নিরীহ প্রস্তাব বোধ করি সংসারে আর কিছুই হইতে পারে না। ইহা এত সহজবোধ্য এবং সর্ব্বজনবোধ্য, যে ইহার প্রমাণের জন্য অনুসন্ধান কেহ কর্ত্তব্য মনে করেন না; এই জন্য ইহা ইউক্লিড-প্রণীত শাস্ত্রের আরম্ভেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। ইউক্লিডের শাস্ত্র সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আকৃতি এবং আয়তন মাত্র লইয়াই ইউক্লিডের কারবার। তিনি যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, তাহাদিগকে খরিদ করিতে দাম লাগে না, ডাকে পাঠাইতে মাশুলও লাগে না, তাহাদের আছে কেবল দৈর্ঘ্য অথবা বিস্তার অথবা আয়তন মাত্র। দুইটা দ্রব্য দৈর্ঘ্যে, বিস্তারে বা আয়তনে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে উহারাও পরস্পর সমান বলিয়া গৃহীত হয়, যে ছাত্র ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বা চতুর্থ প্রতিজ্ঞা কোন রকমে পার হইয়া আসিয়া আটকাইয়া যায়, সেও এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিতে কিঞ্চিৎমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। ইউক্লিডের সীমানা ছাড়াইয়া যখন অন্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তখনও এই স্বতঃসিদ্ধে দ্বিধাবোধের কোন সম্যক্ হেতু পাওয়া যায় না। রামু আর দামু উভয়ে যদি ঠিক্ হরির সঙ্গে একবয়সী হয়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর সমানবয়সী হইবে; উভয়ের গায়ের রঙ যদি ঠিক্ কেদারের মত ঘন কৃষ্ণ হয়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর সবর্ণ হইবে; এই সকল তথ্য স্বীকার করাইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হয় না। ইহাও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য; ইহার অন্যথাভাব কল্পনাতেও বোধ করি আসে না।

যে সকল বিষয়ের অন্যথাভাব কল্পনাতে আসে, যাহা মনে আনিতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আঘাত পায় না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নহে; তাহার সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ বা অন্যরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয়। আকাশের বর্ণ নীল, চিনি খাইতে মিষ্ট, কেদারের বয়স সতের বৎসর তিন মাস, বৃন্তচ্যুত নারিকেল ফল বেলুনের মত উধাও না উঠিয়া ভূমিতে পড়ে, নেপোলিয়ন খুব বীর ছিলেন,

* ৭ই ভাদ্র শনিবার, দেবালয়ে মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ইত্যাদি সত্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ লব্ধ সত্য ; ইহা অন্যরূপ হইতে পারিত। ইহার অন্যথাভাব আমরা স্বচ্ছন্দে কল্পনা করিতে পারি। সেইরূপ চাপ পাইলে বায়ু সঙ্কুচিত হয়, গরমে বরফ গলিয়া জল হয়, চুম্বকে লোহা টানে ইত্যাদি প্রাকৃতিক ব্যাপার সত্য হইলেও স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে ; প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর এই সকল সত্য প্রতিষ্ঠিত। চুম্বক যদি লোহাকে না টানিয়া ঠেলিয়া দিত, শোলা যদি জলে না ভাসিয়া ডুবিয়া যাইত, তাহা হইলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কিছুতেই আহত হইত না ; আমরা ঐ সকল বিপরীত ঘটনাকেই প্রাকৃতিক সত্য করিয়া স্বীকার করিয়া লইতাম।

অতএব সত্যের শ্রেণিভেদ রহিয়াছে।

কতকগুলি সত্য আমরা মানিতে বাধ্য, না মানিলে বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্রোহাচারণ করিবে; যদি কেহ উহাতে দ্বিধা বোধ করে, পাগলা গারদে তাহার স্থান। আবার কতকগুলি সত্য আছে, তাহা মানিতে আমরা বাধ্য নহি ; তাহা না মানিলে বুদ্ধিবৃত্তি অবজ্ঞাত হয় না, তাহার উল্টা মানিলেও কেহ পাগল বলিতে পারিবে না, তবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতে হইবে।

যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান তাহারা পরস্পর সমান, এই সত্যটি কোন্ শ্রেণীর সত্য ? ইউক্লিডের শাস্ত্রে ইহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ-নিরপেক্ষ সত্য হইতে পারে ; কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রেও কি তাহাই ? পদার্থবিদ্যা হইতে একটা দৃষ্টান্ত লইব। একটা সোণার গিনি খানিকটা জলের সমান গরম, একটা রূপার টাকাও সেই জলের সমান গরম ; গিনি ও টাকা সমান গরম হইবে কি না ? যে কোন ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিবে,—হাঁ, সমান উষ্ণ হইবে বৈকি ? এই উত্তর সত্য, কিন্তু কিরূপ সত্য ? ইহা কি ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধের মত স্বতঃসিদ্ধ সত্য ?

যাঁহারা পদার্থবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে। উভয়ে জলের সমান উষ্ণ হইয়াও পরস্পর সমোষ্ণ না হইতেও পারিত। হয় নাই যে, তাহা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে।

আমরা হাতে ছুঁইয়া স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন্ জিনিষটা গরম, কোন্টা ঠাণ্ডা মোটামুটি স্থির করিয়া থাকি, কিন্তু পদার্থবিদ্যা শাস্ত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর বিশ্বাস করিতে একেবারে নারাজ।

পদার্থবিদ্যামতে উত্তাপ নামে এমন একটা কিছু আছে, যাহা কোন দ্রব্যে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, তাহা সর্ব্বদা দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে চলাফেরা করে। যে দ্রব্য হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা বলেন, সেই দ্রব্যের উষ্ণতা

অধিক, আর যে দ্রব্যে উত্তাপ প্রবেশ করে, পদার্থবিদ্যামতে সেই দ্রব্যের উষ্ণতা অল্প। কোথায় উষ্ণতা অধিক, কোথায় অল্প, তাহা জানিবার ইহাই পদার্থবিদ্যা-মতে একমাত্র উপায়; এবং উষ্ণতার তারতম্যের ইহাই একমাত্র লক্ষণ। যদি দুই দ্রব্য পাশাপাশি রাখিলে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে উত্তাপের বিনিময় হইতেছে না, অর্থাৎ এটার উত্তাপ ওটায় অথবা ওটার উত্তাপ এটায় আসিতেছে না, তখনই বুঝিতে হইবে, উভয় দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। উষ্ণতা আর উত্তাপ এক জিনিষ নহে। উত্তাপ চলাফেরা করে, উষ্ণতর দ্রব্য হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া শীতলতর দ্রব্যে প্রবেশ করে। যেখানে দেখিবে, দুই দ্রব্যের মধ্যে উত্তাপের যাতায়াত নাই, সেইখানে বুঝিতে হইবে, উষ্ণতারও প্রভেদ নাই; উভয় দ্রব্য সমান উষ্ণ; কাজেই উত্তাপের চলাফেরা বন্ধ। উত্তাপের এই আচরণ দেখিয়া উষ্ণতার তারতম্য নিরূপণ করিতে হয়। জল যেমন উচু হইতে নীচে গড়াইয়া আসে, উত্তাপ তেমনই গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে আসে; জলের সহিত উচ্চতার যে সম্বন্ধ, উত্তাপের সহিত উষ্ণতার সম্বন্ধ অনেকটা সেইরূপ। ঘরের মেজের কোন্ দিক্‌টা উচু স্থির করিতে হইলে জল ঢালিয়া দিলেই বুঝা যায়, উচু দিক্ হইতে নীচু দিকে জল গড়াইয়া আসে। সেইরূপ উত্তাপ কোথা হইতে কোথায় আসিতেছে নিরূপণ করিলেই উষ্ণতা কোথায় অধিক, কোথায় অল্প, তাহা বুঝা যাইবে।

উষ্ণতার যদি এই লক্ষণ হয়, তাহা হইলে গিনিটা জলের সমান উষ্ণ বলিলে কি বুঝাইবে? বুঝাইবে এই যে, গিনিটা জলে ফেলিলে গিনির উত্তাপ জলে বা জলের উত্তাপ গিনিতে যাইবে না। সেইরূপ টাকাটা জলের সমান উষ্ণ বলিলে বুঝাইবে যে, টাকাটা জলে ফেলিলেও টাকার উত্তাপ জলে বা জলের উত্তাপ টাকায় যাইবে না। বেশ কথা—তাহা না যাক্। ধরিয়া লইলাম, গিনি ও জলের মধ্যে উত্তাপের চলাচল হইতেছে না; উহাদের পরস্পর আচরণ এইরূপ। টাকা ও জলের মধ্যেও উত্তাপের চলাচল হইতেছে না; উহাদেরও পরস্পর আচরণ এইরূপ। এখন গিনি ও টাকা যদি কাছাকাছি পাশাপাশি রাখা যায়, উহাদের পরস্পর আচরণ কিরূপ হইবে? উহাদের মধ্যে পরস্পর উত্তাপের বিনিময় হইবে কি না? কে বলিতে পারে, হইবে কি না? গিনি সোণার জিনিষ—অবস্থাভেদে সে জলের উত্তাপ লয় না, জলকে উত্তাপ দেয় না। টাকা রূপার জিনিষ—অবস্থা ভেদে সেও জলের উত্তাপ লয় না, জলকে উত্তাপ দেয় না। কিন্তু এমন কি বাধ্যবাধকতা আছে যে, গিনি ও টাকা—অর্থাৎ এক টুকরা সোণা ও এক টুকরা রূপা—সেই অবস্থাতে পরস্পরের মধ্যেও উত্তাপের

লেনাদেনা করিবে না? করিতেও পারে, নাও করিতে পারে। লজিক শাস্ত্র ইহার কোন উত্তর দিতে অক্ষম। তবে পর্য্যবেক্ষণে উত্তর পাওয়া যাইবে, হাঁ কি না?

আর একটু স্পষ্ট করা আবশ্যক। সোণার গিনি যে জলের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে, রূপার টাকাও সেই জলের প্রতি সেই ব্যবহার করিতেছে, অতএব সোণা ও রূপা পরস্পরও সেইরূপ ব্যবহার করিবে এরূপ বাধ্যবাধকতা আছে কি না? গদাধরের সঙ্গে রামের যে ব্যবহার, গদাধরের সঙ্গে শ্যামেরও সেই ব্যবহার, তাহা বলিয়া কি রাম শ্যামের পরস্পর ব্যবহারও কি ঠিক সেইরূপই হইবে? গদাধর রামকে দেখিলে ঘুষি তুলে, গদাধর শ্যামকে দেখিলেও ঘুষি তুলে অতএব রামও শ্যামকে দেখিলে ঘুষি তুলিবে, ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ সত্য? যদি বল, রাম-শ্যামের দৃষ্টান্ত লইলে এখানে চলিবে না, ইহা পদার্থবিদ্যার ব্যাপার;—আচ্ছা, পদার্থবিদ্যা হইতেই একটা দৃষ্টান্ত লইব। খানিকটা চা খড়িতে সল্‌ফুরিক এসিড ঢালিলেও ফ্যাঁস করে, নাইট্রিক এসিড ঢালিলেও ফ্যাঁস করে, তাই বলিয়া সলফুরিক এসিডে নাইট্রিক এসিড ঢালিলেও কি ফ্যাঁস করিবে? কখনই না? চা খড়ির প্রতি সলফুরিক এসিডের আচরণ ঐ উভয় দ্রব্যের স্বভাবের উপর নির্ভর করে; আবার চা খড়ির প্রতি নাইট্রিক এসিডের আচরণ এই উভয় দ্রব্যের স্বভাবের উপর নির্ভর করে। চা খড়ির প্রতি এসিডদ্বয়ের দুইটার আচরণ দেখিয়া উহাদের পরস্পরের আচরণ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

সেইরূপ সোনার গিনি ও রূপার টাকা পরস্পর উত্তাপ বিনিময় করিবে কি না তাহা সোনা ও রূপা উভয়ের ধাতুগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সোণা কিংবা রূপা তৃতীয় দ্রব্য জলের প্রতি কিরূপ আচরণ করে, তাহা দেখিয়া পরস্পরের আচরণ কিছুতেই স্থির করা যায় না। লজিকের ভাষায় বলা যাইতে পারে, ঐ দুই premise হইতে কোনরূপ conclusion অর্থাৎ সিদ্ধান্ত টানা চলে না।

লজিকে পারে না বটে, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণে পারে। প্রকৃতপক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, গিনি যখন জলের উত্তাপ লয় না, টাকাও যখন জলের উত্তাপ লয় না, গিনি ও টাকা তখন,—কেন জানি না, উত্তাপের লেনা দেনা করে না, প্রকৃতির এই বিধান। ইহা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্য—ইহা পরীক্ষিত সত্য; স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে। প্রকৃতির ব্যবস্থা এইরূপ। কাজেই আমরা উহা মানিয়া লই। ব্যবস্থা অন্যরূপ হইতে পারিত; গিনির উষ্ণতা জলের সমান, টাকার উষ্ণতাও সেই জলের সমান, হইয়াও গিনি ও টাকা সমোষ্ণ না হইতেও

পারিত। না হইলে তাহাই আমাদিগকে মানিতে হইত, প্রকৃতির উপর আমাদের কোনরূপ হুকুম চলিত না।

দুই দ্রব্য প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে উহারা পরস্পর সমান হইবে, ইউক্লিডের শাস্ত্রে ইহা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও সকল শাস্ত্রে ও সকল ক্ষেত্রে উহা স্বতঃসিদ্ধ হইবে না, ইহা দেখা গেল; কিন্তু দুই দ্রব্যকে কখন্ কোন্ গুণ দেখিয়া সমান বলিব, তাহাও একটা উৎকট সমস্যা।

শরীরী জড় দ্রব্যের বেলায় সমস্যা ত বটেই; ইউক্লিডের শাস্ত্রের মত যে সকল শাস্ত্র অশরীরী দ্রব্য লইয়া বিচার করেন, সেখানেও সমস্যা নিতান্ত সহজ নহে।

মনে কর দুই গাছা লাঠি সমান দীর্ঘ কি না, স্থির করিতে হইবে। এক গাছা লাঠি শ্যামবাজারে রামের নিকট, আর এক গাছা বৌবাজারে শ্যামের নিকট আছে। দৈর্ঘ্যের তুলনা দুই উপায়ে হইতে পারে। শ্যামবাজারের লাঠি বৌবাজারে আনিয়া দুই গাছা লাঠি পাশাপাশি রাখিয়া মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে, দৈর্ঘ্য সমান কি না? একটার উপর আর একটাকে চাপাইয়া উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান কি না তাহার নিরূপণের প্রথা ইউক্লিড বহুস্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় উপায়— অন্য একটা মাপকাঠি বা গজকাঠি শ্যামবাজারে আনিয়া শ্যামবাজারের লাঠির ও বৌবাজারে আনিয়া বৌবাজারের লাঠির দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা চলিতে পারে।

যদি এই গজকাঠির মাপে দেখা যায়, উভয় লাঠিই দৈর্ঘ্যে সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চি, তাহা হইলে উভয়কেই সমান দীর্ঘ বলিয়া ধরা হয়। বলা বাহুল্য, কার্য্যতঃ এই রীতি অবলম্বন করাই সুবিধা; এবং ইহার মূলই হইল ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু এইখানে কোন ব্যক্তি যদি বিদ্রোহী হইয়া পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বসেন, দৈর্ঘ্য তুলনায় এই রীতি দুষ্ট, আমি ইহা মানিব না, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরুত্তর করা কঠিন হইয়া পড়ে। উষ্ণতার ইতরবিশেষ প্রভৃতি কতিপয় কারণে একই দ্রব্যের দৈর্ঘ্যের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বজনসম্মত; একই জিনিষ গরম হইলে দৈর্ঘ্যে বাড়ে, ঠাণ্ডায় দৈর্ঘ্যে কমে; শ্যামবাজার ও বৌবাজারে যদি উষ্ণতার কোন তারতম্য না থাকে, তাহা হইলে এ তর্ক উঠিবে না। কিন্তু যিনি বাদী, তিনি একবারে মূলে টান ধরিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন, কেবল স্থানভেদেই কি দৈর্ঘ্যের ইতরবিশেষ হইতে পারে না? যে আকাশে বা যে দেশে আমাদের এই জগৎ অবস্থান করিতেছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের এমন ধর্ম্ম কি থাকিতে পারে না, এক স্থানের দ্রব্যকে কেবল অন্য স্থানে লইয়া যাইবামাত্র

অন্ত কারণ অসত্ত্বেও তাহার দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়? ইহা অসম্ভবও নহে, অকল্পনীয়ও নহে।

তুমি শ্যামবাজারের লাঠিকে বৌবাজারের লাঠির সহিত মিলাইয়া উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান বলিতেছ; কিন্তু আমি বলিতেছি, একের দৈর্ঘ্য অন্তের দ্বিগুণ। তবে শ্যামবাজারের লাঠি বৌবাজারে আনিবামাত্র তাহার দৈর্ঘ্য কমিয়া অর্দ্ধেক হয়; আবার বৌবাজারের লাঠি শ্যামবাজারে আনিবামাত্র উহার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যতক্ষণ এক লাঠি শ্যামবাজারে, অন্য লাঠি বৌবাজারে, ততক্ষণ তাহাদের দৈর্ঘ্য সমান নহে। গজকাঠি দিয়া মাপিলেও ইহার মীমাংসা হইবে না। সকল দ্রব্যেরই দৈর্ঘ্য যদি স্থানসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ঐ গজকাঠিরও দৈর্ঘ্য স্থানসাপেক্ষ হইবে। উহা শ্যামবাজারে আনিবামাত্র উহার ইঞ্চির দাগগুলা বড় বড় হইবে, এবং বৌবাজারে আনিবামাত্র দাগগুলা খাট হইয়া পড়িবে। কাজেই শ্যামবাজারের সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চি বৌবাজারের সাতফুট পাঁচইঞ্চির সমান না হইলেও এই প্রভেদ ধরিবার কোন উপায় পাওয়া যাইবে না।

ফলে আমাদের বিশ্বজগৎ যে দেশে অবস্থিত, সেই দেশের যদি এইরূপই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে স্থানভেদে দৈর্ঘ্য বিচারের ব্যত্যয় হইলেও আমরা কোনরূপ পরিমাপের দ্বারা তাহা ধরিতে পারিব না; কেন না যে গজকাঠি লইয়া পরিমাপ করিতে যাইব, সেই গজকাঠিই যখন স্থানভেদে ছোট বড় হইয়া যাইবে, তখন এই প্রচলিত পরিমাপ-পদ্ধতি সেখানে খাটিবে না।

অপর পক্ষ বলিবেন, মানুষের কাণ্ডজ্ঞান যখন বলিতেছে, স্থানভেদে ঐরূপ দৈর্ঘ্যভেদের কোন প্রমাণ নাই, এবং প্রচলিত পরিমাপ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কাহাকেও কখন জীবন যাত্রায় ঠকিতে হয় নাই, তখন এ সকল নিষ্ফল ন্যায়-শাস্ত্রের কচকচি তুলিয়া লাভ কি? সমুদায় ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যা প্রচলিত পরিমাণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যার যাবতীয় সম্পাদ্য ও উপপাদ্যে কেহ কখনও কোন ভুল বাহির করিতে পারেন নাই; তখন ইহার গোড়ার কথা লইয়া এরূপ টানাটানি করিয়া উপহাস্য হইবার দরকার কি?

ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, জীবন যাত্রার জন্য যে কাণ্ডজ্ঞানটুকু আবশ্যক, সেই কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে জীবন যাত্রা এক রকম নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়। প্রকৃতি দেবী যিনি মনুষ্যকে জীবন যাত্রায় প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যকে যে ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেই হইবে, এরূপ তাঁহার আদেশ নাই। গোপশু হইতে মনুষ্য পশু পর্য্যন্ত কাহাকেও তিনি জীবন যাত্রা

বিষয়ে ন্যায়-শাস্ত্রের অধীন করিয়া ছাড়িয়া দেন নাই। ঘাসজলের ব্যবস্থা হইলেই গরুর গোজীবন চলে; আবার ডালরুটির ব্যবস্থা হইলেই মানুষেরও জীবন যাত্রা নির্বিঘ্নে চলিয়া যায়; এবং পৃথিবীর উপর যে দেড়শত কোটি মনুষ্য পশু বিচরণ করিতেছে, তাহাদের পৌনে ষোল আনার অধিক লোক এই ডাল রুটির অধিক কিছু চাহে না; ইহাতেই তাহারা সম্পূর্ণ তৃপ্ত আছে। আজিকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা যে কল কারখানা বসাইয়া পৃথিবীতে একটা তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছি, ভূপৃষ্ঠের উপর ছুটাছুটি করিবার জন্য নিরেট ভূমির উপর রেলগাড়ী চালাইয়া, সাগর-পৃষ্ঠের উপর কলের জাহাজ চালাইয়া, আর হাওয়ার ভিতরে হাওয়ায় উড়িবার জন্য হাওয়ার জাহাজ চালাইয়া লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করিয়াছি, ইহাও সেই ডালরুটির জন্য। ডালরুটির অন্বেষণ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উদ্দেশ্য এই সমস্ত মহৎ কার্য্যের অভ্যন্তরে আবিষ্কার করা যায় না। এই ডালরুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইলেও উহাকে একবারে পরম পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কতকগুলি লোক চাহে না ও চাহিবে না। তাহাদের মতে ঐ ডালরুটি-বিষয়ক কাণ্ড-জ্ঞানই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব নহে; তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু নহিলে তাহাদের প্রাণের পিয়াসা কিছুতেই মিটে না। এই পিয়াসা মিটাইবার জন্যই নৈয়ায়িকেরা তৈলের আধার পাত্র বা পাত্রের আধার তৈল এই বিচারে জীবন কাটাইতেন; এবং এই পিয়াসা মিটাইবার জন্য এই সেদিনও শেফীল্ড সহরে ব্রিটিশ আসো-শিয়েশনের অধিবেশনে গণিত-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি বার আর পাঁচে সতের এই তথ্যের তাৎপর্য্য অন্বেষণের জন্য মাথা কুটিতে পণ্ডিতদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন।

ক্ষেত্রতত্ত্বের ন্যায় ব্যাবহারিক শাস্ত্র কতকগুলি সংজ্ঞা ও কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইয়া তাহার ভিত্তির উপর বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে; এবং সেই অট্টালিকার মধ্যে আমাদের ব্যাবহারিক জীবন যাত্রা অবাধে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু মূল আকর্ষণ করিয়া যুক্তির অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে সেই স্বতঃসিদ্ধগুলির সারবত্তা সম্বন্ধে বিচার চলিতে পারে। একটামাত্র গজকাঠি লইয়া যখন আমরা শ্যামবাজারে ও বৌবাজারে, হুগলিতে ও দিল্লিতে, ভূমণ্ডলে ও সূর্য্যমণ্ডলে ও সপ্তর্ষিমণ্ডলে দীর্ঘতা মাপিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা ধরিয়া লই যে, উষ্ণতাদির তারতম্যে ঐ দৈর্ঘ্যের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র দেশভেদে বা স্থানভেদে সেরূপ কোন তারতম্য হয় না। ইহা আমরা ধরিয়া লই, এবং মানিয়া লই মাত্র; কিন্তু মানা উচিত কি না তাহা ভাবিয়া দেখি না। মানা উচিত হউক আর অনুচিতই হউক, আমাদের জীবনযাত্রায় ইহাতে কোনরূপে

ঠকিতে হয় না। ঠকিতে হয় না, কেন না কোন দুই দ্রব্যকে যখন আমরা কোন বিষয়ে সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করি, ঐ সমানতা আমাদের মনঃকল্পিত একটা সংজ্ঞা মাত্র; আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ মনগড়া পারিভাষিক অর্থে 'সমান' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, উহার মধ্যে কোন পরমার্থ তত্ত্ব নিহিত থাকে না। ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্বের ভিত্তি লইয়া আজকাল যে টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে, তাহার ইতি-হাসের যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের নিকট আমার বাচালতা মার্জ্জিত হইবে।

দুইটা জিনিষকে আমরা সমান বলি কখন্? দূরে হইতে নিকটে আনিয়া এটার পাশে ওটা রাখিয়া, অথবা এটার উপর ওটা চাপাইয়া যদি দেখিতে পাই, দুইটার দৈর্ঘ্য মিলিয়া গিয়াছে, তখন আমরা তাহাদিগকে সমান বলি। নিকটে থাকিলেও সমান বলি, দূরে থাকিলেও সমান বলি। উপস্থিত ক্ষেত্রে 'সমান' এই শব্দটির সংজ্ঞাই এই। দূরে থাকিতে উহাদের দৈর্ঘ্যের কোন প্রভেদ ছিল কি না, সে প্রশ্নই আমরা তুলি না। সমান শব্দটিকে যদি ঐ সঙ্কীর্ণ অর্থ দেওয়া যায়, এবং এই অর্থেই আমরা যদি সর্ব্বদা ঐ শব্দ ব্যবহার করি, তাহা হইলে সেই প্রশ্ন তুলিবার কোন প্রয়োজনই হয় না। এবং সেই সংজ্ঞা অবলম্বন করিয়া যদি কোন শাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করি, সেই শাস্ত্রেও কোন ভুল আসে না।

সোণা, রূপা ও জল ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই প্রথমে নজরে পড়ে। ঔজ্জ্বল্যে, বর্ণে, স্পর্শে, শব্দে কোন বিষয়েই ইহারা সদৃশ নহে; অথচ উহাদের পরস্পর একটা সাদৃশ্য আছে, যাহা আছে বলিয়া ঐ তিন দ্রব্যকেই আমরা জড় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। প্রশ্ন হইতে পারে, সেই সাধারণ ধর্ম্ম কি, যাহা স্বর্ণখণ্ডে, রৌপ্যখণ্ডে এবং খানিকটা জলেও বর্ত্তমান রহিয়াছে? যাহা আছে বলিয়া ঐ তিন পদার্থই জড়ত্ব লাভ করিয়াছে?

তিনটা দ্রব্যের একটা সাধারণ ধর্ম্ম অতি সহজেই ধরা পড়ে; উহার নাম ভার বা ওজন। সোণা, রূপা, জল, তিনেরই ওজন আছে; এবং যে সকল দ্রব্যকে আমরা জড় দ্রব্য বলি, তাহাদের সকলেরই ওজন আছে; অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ওজনই তাহা হইলে জড়ত্ব। কিন্তু যাঁহারা পদার্থ বিদ্যার একটু চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ওজন জড়ত্ব নহে। উহা জড় দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম্ম হইলেও স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; উহা আগন্তুক ধর্ম্ম, আকস্মিক কারণে উহার উৎপত্তি। আমাদের এই পৃথিবীর এমন একটা গুণ আছে, যাহাতে সকল দ্রব্যই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পতনোন্মুখ; এবং এই পতনোন্মুখতা আছে বলিয়াই ভূপৃষ্ঠে সকল দ্রব্যের ওজন আছে। সোণা-

রূপার যে ভার, তাহা সোণারূপার নিজগুণে নহে, তাহা পৃথিবীর নিকট অবস্থিতি-সাপেক্ষ। পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, ভূপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে যাইবে, ভার ততই কমিবে; আবার ভূপৃষ্ঠে কূপ খুঁড়িয়া নীচে নামিলে ভার তাহাতেও কমিবে। কলিকাতার কোন দ্রব্য দার্জিলিঙে লইয়া গেলে তাহার ওজন একটু কমে; ধবলগিরির মাথায় তুলিলে আরও একটু কমে; ভূপৃষ্ঠে যে দ্রব্যের ওজন নব্বই মণের ওজনের সমান, চাঁদ যত দূরে আছে, তত দূরে লইয়া যাইতে পারিলে তাহার ওজন এক সেরের ওজনের সমান দেখা যাইবে। আবার ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া যদি ভূকেন্দ্রে যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে সেখানে গিয়া ঐ নব্বই মণের ওজন এক কাঁচ্চার ওজনও হইত না, একবারে লোপ পাইত। অতএব সোণা রূপা বা যে কোন জড় দ্রব্যের ওজনকে সেই দ্রব্যের স্বাভাবিক নিজস্ব ধর্ম্ম বলিতে পারি না; উহা পৃথিবীর সন্নিধানে অবস্থিতি হইতে উৎপন্ন ধর্ম্ম; উহা একটা আকস্মিক ঘটনা বা আগন্তুক ঘটনা হইতে লব্ধ ধর্ম্ম; পৃথিবী বা তদ্বিধ কোন প্রকাণ্ড জিনিষ নিকটে না থাকিলে কোন জিনিষেরই ওজন থাকিত না।

কাজেই ওজন দেখিয়া জড়ত্বের নিরূপণ হয় না। এক মণ চাউলের ওজন যদি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে উহার ভার-বহনের ক্লেশ কাহাকেও সহিতে হইত না; কিন্তু উহার তণ্ডুলত্ব, যাহার উপর উহার উদর-পূরণের শক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহার কিছুই লাঘব হইত না। কলিকাতার চাউল দার্জিলিঙে লইয়া গেলে তাহার ওজন কিছু কমে, কিন্তু উদর-পূরণের শক্তি কিছুই কমে না। ফলে চাউলের ওজন না থাকিলে দোকানদার উহার পূরা দাম দাবি করিত; তবে ঘরে আনিবার সময় মুটে ভাড়াটা হয়ত লাগিত না। সেইরূপ সোণার ওজন না থাকিলেও উহার সুবর্ণত্ব কিছুই কমিত না;—যে সুবর্ণত্বের উপর ভামিনী-সমাজে উহার সমাদর প্রতিষ্ঠিত; বরং ভামিনীদের মধ্যে যাঁহারা একশ ভরিতেই এখন সন্তুষ্ট হন, তাঁহারা তখন একশ মণের দাবি করিয়া বসিতেন।

জড়ের জড়ত্ব যদি ওজনে না হয়, তবে জড়ের জড়ত্ব কিসে? ইংরেজিতে mass বলিয়া একটি শব্দ আছে, উহাই জড়ের জড়ত্ব-বিজ্ঞাপক। কথায় কথায় বলা হয় এই massএর অর্থ quantity of matter। বাঙ্গালা ভাষায় ঐ mass শব্দের ভাল প্রতিশব্দ নাই; গ্রন্থলেখকেরা অনুবাদে যাঁহার যাহা ইচ্ছা ব্যবহার করেন। আমিও একটা নূতন প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব; mass অর্থে দ্রব্য শব্দ প্রয়োগ করিব। আমাদের দর্শন শাস্ত্রে পারিভাষিক অর্থে দ্রব্য শব্দের প্রয়োগ

আছে; সেই শব্দটিকে আমরা mass অর্থে ব্যবহার করিতে পারি। এই দ্রব্যটা massive—ইহার mass বেশী—এই অর্থে আমি বলিব, ইহাতে দ্রব্য আছে অনেকখানি। এই দ্রব্য শব্দকেই জড়ত্ব-বিজ্ঞাপক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

এই দ্রব্য-পরিমাণ নিরূপণের উপায় কি? পদার্থবিদ্যা এই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতাই জড়ত্ব; এই ক্ষমতা দেখিয়া দ্রব্যের মাত্রা নিরূপিত হয়। যে কোন দ্রব্যে ধাক্কা দিলে উহা বিচলিত হয় অর্থাৎ কতকটা বেগ অর্জ্জন করিয়া সেই বেগে চলিতে থাকে। দুইটা দ্রব্যে সমান ধাক্কা দিলে দুইটাই বেগ অর্জ্জন করে। যদি সমান ধাক্কা পাইয়া সমান বেগে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে উহাদের উভয়ের দ্রব্য সমান বলিয়া গৃহীত হয়। যদি সমান বেগ অর্জ্জন না করে, তাহা হইলে দ্রব্য অসমান বলিয়া গণ্য হয়। যেটার বেগ অধিক হইবে, সেটার দ্রব্য অল্প, যেটার বেগ অল্প হইবে সেটার দ্রব্য অধিক। শূন্য কুম্ভে ধাক্কা দিলে উহা হটমট করিয়া ছুটিয়া পড়ে; পূর্ণ কুম্ভে ধাক্কা দিলে উহা কিঞ্চিৎ মাত্র বিচলিত হয়। পূর্ণ কুম্ভের দ্রব্য-পরিমাণ অধিক, শূন্য কুম্ভের অল্প। দুইটা হাতীর দাঁতের ভাঁটা পরস্পরের অভিমুখে সমান বেগে ছুটিয়া আসিলে পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া ও পরস্পরের ধাক্কা খাইয়া বিপরীত মুখে ফিরিয়া যায়। যদি সমান বেগে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাদের দ্রব্য সমান বলা হয়; আর যদি অসমান বেগে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে যেটার বেগ অধিক সেটার দ্রব্য অল্প, যেটার বেগ অল্প সেটার দ্রব্য অধিক বলিয়া গৃহীত হয়।

পরস্পরের ধাক্কা পাইয়া যাহা অধিক বিচলিত হয়, তাহাতে অল্প দ্রব্য ও যাহা অল্প বিচলিত হয়, তাহাতে অধিক দ্রব্য আছে। দুই সমান দ্রব্য সমান ধাক্কা খাইয়া সমান বেগই অর্জ্জন করে। দ্রব্য-পরিমাণের ইহাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়। ওজন করিয়া দ্রব্য নির্দ্দেশের চেষ্টা অনুচিত; কেন না, স্থানভেদে ওজনের তারতম্য হয়; কিন্তু যাহাকে দ্রব্য বলিতেছি, যাহা জড়ের জড়ত্ব, স্থানভেদে তাহার কোন তারতম্য হয় না। এক সের চা'লের বা দশ ভরি সোণার ওজন সর্ব্বত্র সমান নহে, কিন্তু এক সের চাল সর্ব্বত্রই এক সের চা'ল, আর দশ ভরি সোণা সর্ব্বত্রই দশ ভরি সোণা। সের আর ভরি প্রকৃত পক্ষে দ্রব্য-পরিমাণ নির্দ্দেশ করে, ওজনের পরিমাণ নির্দ্দেশ করে না। এক ভরি সোণা আর এক ভরি রূপা, উভয়ে অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়েরই দ্রব্য-পরিমাণ সমান; কেন না, সমান ধাক্কায় উহারা সমান বলে বিচলিত হয়। হুগলিতেও হয় আবার দিল্লীতেও হয়, ভূমণ্ডলেও হয় আবার চন্দ্রমণ্ডলেও হয়। কাজেই এই ভরি-পরিমিত দ্রব্য সোণা-রূপার খাতা-

বিক ধর্ম, নিজস্ব ধর্ম ; এই ধর্ম পৃথিবীর সান্নিধ্যের কোন অপেক্ষা রাখে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এক ভরি সোণা আর এক ভরি রূপার দ্রব্য সমান হইল, কিন্তু উহাদের ওজন সমান হইবে কি না? যুক্তি শাস্ত্র এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। কোন নৈয়ায়িক পণ্ডিত শত বৎসর মাথা ঘামাইয়াও এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবেন না। দ্রব্য আর ওজন এক নহে ; দ্রব্য সমান হইলেই ওজন সমান হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। জড় পদার্থের ওজন উহার স্বাভাবিক গুণ নহে ; কিন্তু যাহাকে দ্রব্য বলিয়াছি, তাহা জড় দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ। কাজেই এক ভরি সোণা ও এক ভরি রূপার দ্রব্য-পরিমাণ সমান হইলেও উহার ওজন সমান হইতেও পারে, হইতে নাও পারে। সমান বটে কি না উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

ওজনের হেতু পৃথিবীর সান্নিধ্য—পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টান। পৃথিবীর টান কোন্ জিনিষের উপর অধিক তাহা পৃথিবীকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি আমাদের গৃহকর্ত্রীদিগের মত পৃথিবী সোণাকেই বেশী পছন্দ করেন, সোণার প্রতিই বেশী টান দেন, তাহা হইলে এক ভরি সোণার ওজন এক ভরি রূপার ওজনের চেয়ে অধিক হইবে ; আর যদি পৃথিবীর সেরূপ কোন পক্ষপাত না থাকে, তাহা হইলে এক ভরি সোণা ও এক ভরি রূপা ওজনে সমান হইবে।

পৃথিবীর এইরূপ পক্ষপাত আছে কি না, তাহা পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণের যিনি শীর্ষস্থানীয়, সেই নিউ-টন পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর এরূপ কোন পক্ষপাত নাই। এ বিষয়ে পৃথিবী একবারে উদাসীন। পৃথিবীর কাছে মুড়িমিছরির এক দর, কাচকাঞ্চন তুল্যমূল্য, লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমান আদর। নিউটন পেণ্ডুলমের সাহায্যে এই তত্ত্বনির্ণয় করেন ; যিনি পদার্থবিদ্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই ইহা জানেন ; ইহা লইয়া সময়ক্ষেপের প্রয়োজন নাই।

নিউটনের পূর্ব্বে কাহারও বলিবার অধিকার ছিল না যে, এক ভরি সোণার ওজন ঠিক এক ভরি রূপার ওজনের সমান হইবে ; পাঁচ সের চাউলের ওজন পাঁচ সের লোহার বাটখারার ওজনের সমান হইবে ; দ্রব্য সমান হইলেই যে ওজন সমান হইবে, ইহা নিউটনের পূর্ব্বে কাহারও বলিবার অধিকার ছিল না। অথচ অদ্ভুত এই যে, নিউটনের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই মহাপণ্ডিত হইতে মহামূর্খ পর্য্যন্ত ওজনের সমতা দেখিয়া দ্রব্যের সমতা মানিয়া লইয়া আসিতেছে।

তুলাযন্ত্রের এক পাল্লায় চাউল আর পাল্লায় লোহার বাটখারা রাখিয়া, নিক্তির এক ধারে সোণা আর এক ধারে রূপা রাখিয়া, আমরা ওজনের সমতা দেখিয়া লই। উহা ওজনের যন্ত্র, দ্রব্য নিরূপণের যন্ত্র নহে। দেখি আমরা ওজন, কিন্তু চাই আমরা দ্রব্য। চাউলের যদি ওজন না-ই থাকিত,তাহাতে আমাদের কিছুই ক্ষতি হইত না; ক্ষুধা নিবৃত্তি সমান হইত, উপরন্তু মুটে ভাড়া লাগিত না। সোণার ওজন না থাকিলে গৃহিণীদের লাভ বিনা লোকসান হইত না। কাজেই চাই আমরা দ্রব্য, কিন্তু দেখিয়া লই ওজন। নিক্তির দুই পাল্লায় দ্রব্য সমান হইলে ওজনও সমান হয়, কেন না পৃথিবী অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে দুই ধারেই সমান টান দেন, সোণা আছে কি রূপা আছে তাহা দেখেন না। পৃথিবী যদি সোণারূপার সমান আদর না করিতেন, তাহা হইলে দুই পাল্লায় সমান দ্রব্য রাখিলেও ওজন সমান হইত না। সোণার প্রতি টান অধিক হইলে সোণার দিকটাই পৃথিবীর দিকে ঢলিয়া পড়িত। অতএব দ্রব্যসামান্যে ভারসামান্য হয়, ইহাও পরীক্ষালব্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে।

রসায়নবেত্তা পণ্ডিতের হাতে এই নিক্তি যন্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ করে। এই যন্ত্রটি কাড়িয়া লইলে তিনি একবারে ঢালতলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দ্দারে পরিণত হন। কিন্তু নিক্তি যতক্ষণ হাতে থাকে,ততক্ষণ তিনি গাণ্ডীবধারী সব্যসাচী ধনঞ্জয়।

এই নিক্তির সাহায্যে তিনি এক অদ্ভুত তথ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। লোহা আর গন্ধক একত্র তপ্ত করিলে উহা এক নূতন জিনিষে পরিণত হয়, তাহা না লোহা না গন্ধক। এই অভিনব জিনিষে লোহার লৌহত্ব বা গন্ধকের গন্ধকত্ব কিছুই থাকে না। রূপ রস গন্ধ স্বাদ সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া উভয়ের যোগে এক নূতন জিনিষ তৈয়ার হয়।

রসায়নবিৎ পণ্ডিত কিন্তু নিক্তির ওজনে দেখাইবেন, পুরাতন দ্রব্য সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু উহার ওজনটুকু যায় না। লোহা আর গন্ধক ওজন করিয়া লও, যে নূতন দ্রব্য উভয়ের সম্মিলনে উৎপন্ন হইল, তাহার ওজন নিক্তির ওজনে লোহার ওজন আর গন্ধকের ওজনের ঠিক যোগ-ফল।

ফলে জিনিষের রূপান্তর হয়, কিন্তু নূতন জিনিষে সাবেক জিনিষের ওজনটুকু বাহাল থাকে। আবার যখন পৃথিবীর নিরপেক্ষতার ফলে ওজন সমান হইলে দ্রব্যও সমান বলিতে হয়, তখন মানিতে হইবে, এই রাসায়নিক সম্মিলনে দ্রব্যেরও কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না।

রাসায়নিক ক্রিয়ার অন্ত নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের পরীক্ষাগারে সহস্রবিধ রাসায়নিক কাণ্ড অহরহঃ সম্পাদিত হইতেছে। আবার প্রকৃতির বৃহত্তর পরীক্ষা-

পারে কত রকমের রাসায়নিক কাণ্ড নিত্য ঘটিতেছে, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। কিন্তু নিক্তিধারী রসায়নবিৎ জোরের সহিত বলিতে চাহেন, এই সকল কাণ্ড-কারখানায় জড় পদার্থের দ্রব্য-পরিমাণের কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। এক কণিকাও নূতন জন্মে না, এক কণিকারও ধ্বংস হয় না। দ্রব্যের যখন হ্রাসবৃদ্ধি নাই, অর্থাৎ জড়ের জড়ত্ব যখন কমেও না বাড়েও না, তখন জড়পদার্থ অবিনাশী, হয় ত অনাদি। অতএব লাবোয়াসিয়ার সময় হইতে শতাধিক বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা জড় পদার্থকে অমরত্ব দিয়া তাহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ধূপদীপাদি উপচার দ্বারা তাহার পূজা আরম্ভ করিয়াছেন।

জড় পদার্থের উৎপত্তি নাই বা ধ্বংস নাই, ইহা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য; নিক্তির ওজনে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। অথচ এমন পণ্ডিত অনেকে আছেন, যাঁহারা ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি বা অবস্তুতে বস্তুর পরিণতি, উভয়ই মানব মনের কল্পনাতীত; অতএব ঐ তথ্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অনেক বড় বড় দার্শনিক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া এই স্বতঃসিদ্ধের সমর্থনে প্রয়াস পাইয়াছেন। সে দিনও দেখিলাম আমষ্টার্ডম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলমানের কেমিষ্ট্রী গ্রন্থের ইংরেজি তর্জমায় এই প্রসঙ্গে ছোট হরপে মুদ্রিত হইয়াছে যে, জড় পদার্থের অবিনাশিতা কেবল পর্য্যবেক্ষণলব্ধ বা পরীক্ষালব্ধ সত্য নহে। উহার অন্যথাভাব কল্পনাতীত, অতএব উহা স্বতঃসিদ্ধ।

দ্রব্যহীন জড় পদার্থ যে কল্পনার অগোচর নহে, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। ঈথর নামে যে বিশ্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্ব আজকাল সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহাকে জড় পদার্থ বলিব কি না তাহা জানি না। অন্য জড় পদার্থের মত তাহার দেশব্যাপকতা আছে, অন্য জড়ের মত তাহার শক্তিমত্তা আছে, অথচ তাহার ভার বা ওজন নাই এবং যে ধর্ম্মকে আমরা দ্রব্য বলিয়াছি, সেই দ্রব্যবত্তা তাহার আছে কিনা তাহাও সংশয়ের বিষয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রেনেল, যিনি ঈথরের তরঙ্গ-স্বরূপে আলোক-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি ঈথরের দ্রব্যবত্তা স্বীকার করিয়া লইয়া ছিলেন, কিন্তু আজকাল দ্রব্যবত্তার কোন সম্পর্ক না রাখিয়াও আলোক তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা হইয়াছে।

দ্রব্যহীন জড় পদার্থের কল্পনা যে হইতে পারে না, ইহা বলা চলে না, তবে যদি ঐ সকল দ্রব্যহীন পদার্থকে জড় পদার্থ নাম না দাও, সে স্বতন্ত্র কথা। লর্ড কেলবিন কল্পনা করিয়াছিলেন যে, ঈথর নিজে দ্রব্যহীন পদার্থ, তবে ঈথরে ছোট

ঘোড় যুদ্ধ জন্মিয়া উঁহাকে দ্রব্যবান্ জড় পদার্থে পরিণত করে। যাক্ এই সকল হেঁয়ালির আলোচনায় এখন ক্ষান্ত থাকা যাক্। কিন্তু আজকাল একটা নূতন তত্ত্বের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেটাকে একবারে ফেলিতে পারা যায় না। তাড়িত নামক পদার্থ এতকাল সম্পূর্ণ হেঁয়ালির মধ্যে ছিল। সেই হেঁয়ালি এখনও আছে; কিন্তু তাড়িতের কণিকা লইয়া এখন আমরা খেলাধুলা আরম্ভ করিয়াছি। রেডিয়ম নামক ধাতুর কথা খবরের কাগজের প্রসাদে আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন; এই রেডিয়ম হইতে সর্ব্বদা তাড়িতের কণিকা ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কেবল রেডিয়াম কেন, আরও নানাবিধ জিনিষ হইতে তাড়িতের কণা ছুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহাও আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। এই তাড়িত কণিকাগুলি কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ, ইহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। এই তাড়িত কণিকাগুলি অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া চলে; কোথায় কত বেগে ছুটিতেছে, তাহা নিরূপিত হইয়া গিয়াছে। কাচে রেশম ঘষিয়া বা গালায় পশম ঘষিয়া যখন ঐ ঐ বস্তুতে তাড়িতের সঞ্চার করা যায়, তখন তাড়িতের কণিকাগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া সরিয়া আসে, এবং নিশ্চল ভাবে স্থির থাকে। টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া তাড়িতের কণিকাগুলি ধীরে চলে; কিন্তু রেডিয়ম ধাতু হইতে কণিকাগুলি অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া বাহির হয়। এই তাড়িত কণিকাগুলি জড় পদার্থ বটে কি না এই সমস্যা। কণিকাগুলির ওজন আছে কি না কেহ জানে না, কিন্তু তাহাদের দ্রব্য আছে, সে বিষয়ে এখন বড় একটা সংশয় নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ধাক্কা দিবার এবং ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা দেখিয়া দ্রব্যের নিরূপণ হয়, জড়ের জড়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। ঘোড়া হঠাৎ ছুটিলে সওয়ার পিছনে ঝুঁকিয়া পড়েন, ঘোড়া হঠাৎ থামিলে সওয়ার সম্মুখে টলেন, ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, ঘোড়া এবং সওয়ার উভয়েরই দেহ জড়ত্বযুক্ত; উভয়েরই ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা আছে। তাড়িতেরও সেইরূপ ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই আজ আমরা তাড়িতের ধাক্কায় টানাপাখা হইতে ট্রামগাড়া পর্য্যন্ত চালাইতে সমর্থ হইয়াছি এবং বিজলি বাতি জ্বালাইয়া আঁধার ঘর আলো করিতেছি। মাইকেল ফারাডে, যাঁহার প্রসাদে আজ আমরা বিজলি বাতির আলো ও টানাপাখার হাওয়া ভোগ করিতেছি, তাড়িতের এই ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার প্রবৃত্তি তাঁহারই আবিষ্কৃত। তাঁহার পূর্ব্বে এই তথ্য গুহায় নিহিত ছিল।

তাড়িতে যখন এই প্রবৃত্তি আছে, তখন উহা দ্রব্যবিশিষ্ট জিনিষ এবং উহাতে

জড়ত্ব বর্ত্তমান। তাড়িত-কণিকার আবিষ্কারের পর দেখা গিয়াছে, তাড়িতের কণিকাগুলিতেও এই জড়ত্ব নিহিত আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাড়িতের কণিকাগুলি যতক্ষণ স্থির থাকে, অচল থাকে, ততক্ষণ উহাদের জড়ত্ব থাকে না; যখন বেগে চলে, তখনই উহাদের জড়ত্ব জন্মে; এবং যখন বেগ খুব বাড়ে, তখন জড়ত্বও বাড়িয়া যায়। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের নিকট এই সকল কথা নিতান্তই হেঁয়ালি ঠেকিবে; কিন্তু উপায় নাই। এই সকল বাক্যের তৎপরতা বুঝাইবার এ সময় নহে। সোণা রূপা জল বাতাস প্রভৃতি আমাদের চিরপরিচিত জড় পদার্থের সহিত এই অভিনব জড় পদার্থের এইখানে প্রভেদ। পাঁচ ভরি সোণার দ্রব্য-পরিমাণ সর্ব্বদাই পাঁচ ভরি; উহা বাক্‌সে বন্ধ থাকিলেও পাঁচ ভরি, আর বেগে ছুটিলেও পাঁচ ভরি। কিন্তু তাড়িত কণিকাগুলি যখন ধাতু পদার্থের গায়ে নিশ্চলভাবে জমিয়া থাকে, তখন উহার দ্রব্য পরিমাণ নাস্তি; যখন টেলিগ্রাফের তার বাহিয়া চলিতে থাকে, তখন অস্তি; আর যখন রেডিয়ম হইতে ছুটিয়া বাহির হয়, তখন অত্যন্ত অধিক মাত্রায় অস্তি। সেকণ্ডে দশ বিশ হাজার ক্রোশ বেগে ছুটিতেছে, এমন তাড়িত কণিকা আজকাল বৈজ্ঞানিকদের হাতের মুঠায়; ঐ সকল কণিকার দ্রব্যপরিমাণ প্রচুর। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়াছেন যে, যে কণিকার বেগ সেকণ্ডে লক্ষ ক্রোশের কাছাকাছি, তাহার জড়ত্ব একবারে অপরিমেয়— পরিমাণের অতীত হইবার সম্ভাবনা হয়। সোণা রূপা জল বাতাসের দ্রব্য-পরিমাণ বেগ বাড়িলে বাড়ে না, কিন্তু তাড়িত কণিকার বেগ বৃদ্ধির সহকারে দ্রব্যের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। এই সকল দেখিয়া তাড়িত কণিকাকে জড় পদার্থ বলিতে কাহারও আপত্তি ঘটিতে পারে। কিন্তু জড় পদার্থ—সোণা রূপার মত জড় পদার্থ—বহুসংখ্যক তাড়িত কণিকার সমবায়ে উৎপন্ন, এইরূপ একটা নূতন কথা উঠিয়াছে। রেডিয়ম প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের পরমাণুগুলি আপনা হইতে ভাঙ্গিতেছে এবং সেই ভঙ্গুর পরমাণুর মধ্য হইতে তাড়িত কণিকা ছুটিয়া বাহির হইতেছে, ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড় পদার্থের পরমাণুগুলি তাড়িত কণিকাদ্বারাই নির্ম্মিত। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে শ দরুনে বা হাজার দরুনে তাড়িত কণিকা আটকান আছে; আটকান আছে বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে তাহারা বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক একটা পরমাণু যেন এক একটা ঘূর্ণী—বহুসংখ্যক তাড়িত কণিকার ঘূর্ণী। লর্ড কেলবিন ঈথরের ঘূর্ণী কল্পনা করিয়াছিলেন; এখন অনুমান হইতেছে, জড় পরমাণু তাড়িত কণিকার ঘূর্ণী। ঘূর্ণীর মাঝে পড়িয়া কণিকাগুলি বেগে ঘুরিতেছে, এই জন্যই উহাদের দ্রব্যবত্তা; এবং কণিকাগুলির দ্রব্যবত্তার

জড় পরমাণুটিরও দ্রব্যবত্তা। এই দ্রব্যবত্তা যখন বেগসাপেক্ষ, তখন জড় পদার্থের উৎপত্তি নাই বা ধ্বংস নাই বলিয়া শান্তি উপভোগ আর চলিবে না। বেগ বাড়িলে যদি দ্রব্য বাড়ে, তখন দ্রব্যের উৎপত্তি নাই, এ কথা টিকিবে কেমন করিয়া?

জড় পদার্থের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে জড় পদার্থকে একবারে নির্ব্বাসন করিতে চাহেন এবং জড়ের স্থানে শক্তি নামক পদার্থকে বসাইয়া তাঁহারই শ্রীচরণে পুষ্পচন্দন অর্পণ করিতে চাহেন। জড় পদার্থের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিতে ইহাঁরা যেন অনিচ্ছুক; আমাদের জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে কারবার করে না; শক্তির সহিতই ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষাৎ সম্পর্ক; শক্তির আঘাত পাইয়া শক্তির বাহনস্বরূপ জড়ের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। এই হেতু শক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারবার দেখিয়া জড় পদার্থের কল্পনা হইতে বিজ্ঞান শাস্ত্রকে অব্যাহতি দিতে এই দলের পণ্ডিতেরা উৎসুক। আগে বলা হইত, জড় শক্তি-দেবতার বাহন; শক্তির আধার জড়। ইহাঁরা বলিতেছেন, শক্তিই সর্ব্বময়ী; জড়ের অস্তিত্ব একবারে অস্বীকার করিলেও বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোন ক্ষতি হইবে না।

বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত এই শক্তির তাৎপর্য্য কি? কাব্যের ভাষা ছাড়িয়া বিজ্ঞানের গণ্ডে উপস্থিত হইলে দেখা যায়, এই শক্তি কাজ করিবার শক্তি। এই কাজ শব্দটি আবার বিজ্ঞানশাস্ত্রে অতি সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। কোন ভারী জিনিষ যখন নীচে নামে, তখন সে কাজ করে; আর যত উর্দ্ধে উঠে, তত কাজ করিবার ক্ষমতা পায়। পৃথিবীর টানে সকল বস্তুরই ভূকেন্দ্রাভিমুখে চলিবার প্রবৃত্তি আছে; সেই প্রবৃত্তির অনুসরণে ভূমির অভিমুখে যাহা পড়ে, তাহা কাজ করে। প্রোফেসর রামমূর্ত্তির মত বুকের উপর চব্বিশ ঘণ্টাকাল হাতী চড়াইয়া রাখিলে কোন কাজ হয় না, কিন্তু এক কাঁচ্চা দ্রব্য হাত খানেক নীচে নামিলেই খানিকটা কাজ হয়। দুই হাত নামিলে দ্বিগুণ কাজ হয়। যেখানে যত রকম শক্তি আছে, সমস্তই এই কাজ করিবার শক্তি। বেগে চলন্ত বস্তুর শক্তি আছে, কেন না চলন্ত বস্তু যন্ত্রযোগে বোঝা তুলিয়া সেই বোঝাকে কাজ করিবার শক্তি দেয়। তপ্ত দ্রব্যের শক্তি আছে; কেন না উহার উত্তাপ দ্বারা যন্ত্রযোগে বোঝা তুলিতে পারা যায়। তাড়িতযুক্ত দ্রব্যের শক্তি আছে; কেন না তাড়িত প্রয়োগেও আমরা বোঝা তুলিতে পারি। কয়লাতে শক্তি আছে;

কেন না ঐ কয়লা পোড়াইয়া আমরা বোঝা তুলিতে পারি। এঞ্জিনে আমরা কয়লা পোড়াইয়া কয়লার অন্তর্নিহিত শক্তি বাহির করিয়া লই এবং সেই শক্তির প্রয়োগে বড় বড় বোঝা ঊর্দ্ধে তুলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্র জড়কে অবিনাশী বলিয়াছিল,—আর ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্র শক্তির অবিনাশিতা প্রতিপন্ন করিয়া জয়ধ্বজা তুলিয়াছে। শক্তির অবিনাশিতা অর্থে এই বুঝায় যে, শক্তি নানাবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার পরিমাণের কখনও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। এই তত্ত্বটি স্পষ্ট বুঝিতে হইলে দুই একটা দৃষ্টান্ত আবশ্যক হইবে।

চলন্ত দ্রব্যের শক্তিমত্তা প্রসিদ্ধ। কিন্তু চলন্ত দ্রব্যের শক্তি অতি সহজে উত্তাপে পরিণত করা যায়। নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ঘা মারিলে হাতুড়ি ও নেহাই উভয়ই গরম হইয়া উঠে। চলন্ত রেল গাড়ীর এঞ্জিন ব্রেক দিয়া থামাইবার সময় এঞ্জিনে গাড়ীতে আরোহীতে ও লগেজে যে শক্তিরাশি সঞ্চিত ছিল, তাহার সমস্তটা উত্তাপে পরিণত হইয়া ব্রেকের পিঠ হইতে ঝর ঝর করিয়া অগ্নিকণা নিকলিতে থাকে। চলন্ত দ্রব্য থামিয়া যায়, তাহার শক্তির তিরোধান ঘটে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে খানিকটা উত্তাপের আবির্ভাব হয়। এখানে হইল চলন্ত দ্রব্যের শক্তির উত্তাপে পরিণতি। আবার উত্তাপের পরিণতিতে নিশ্চল দ্রব্য চলচ্ছক্তি পাইয়া বেগে চলিতে থাকে। উদাহরণ এঞ্জিন; এখানে কয়লা পোড়াইলে উত্তাপ জন্মে, সেই উত্তাপের কিয়দংশের তিরোভাব ঘটে; তৎপরিবর্ত্তে এঞ্জিনযুক্ত রেলগাড়ি মায় আরোহী ও লগেজ চলিতে আরম্ভ করে—অর্থাৎ চলচ্ছক্তি অর্জ্জন করে। উত্তাপের স্থানে শক্তি অন্যরূপে আবির্ভূত হয়। বলা হয়, এই সকল দৃষ্টান্তে শক্তির ধ্বংস বা উৎপত্তি দেখা যায় না। দেখা যায় যে, শক্তি এক মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু শক্তির পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে নাই। দেখা যায় যে, জগতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শক্তির আনাগোনা চলাফেরা চলিতেছে; সেই অবসরে শক্তি এক মূর্ত্তি ছাড়িয়া অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু শক্তির পরিমাণের ইতরবিশেষ ঘটিতেছে না। জগতে ক্রিয়াশীল শক্তির যাবতীয় রূপ কুড়াইয়া স্তূপাকার করিলে দেখা যাইবে, শক্তির পরিমাণে ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধিও নাই। শক্তির এক কণিকা কেহ নূতন উৎপাদন করিতে পারে না বা ধ্বংস করিতে পারে না।

বিশ্ববিখ্যাত জুল সাহেব এইরূপ হিসাব দিয়াছেন। এক সের জলকে এক ডিগ্রি গরম করিতে যে উত্তাপ লাগে, সেই উত্তাপকে যদি এঞ্জিন যোগে রূপান্-

মিত করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা এক সের জল পৌনে আট শত ফুট উর্দ্ধে তোলা চলিবে। পক্ষান্তরে পৌনে আট শত ফুট উচু হইতে এক সের জল ঢালিয়া দিলে যে উত্তাপ জন্মে, তাহা যদি ছড়াইয়া না পড়িয়া সেই এক সের জলেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ঐ জল এক ডিগ্রি গরম হইবে। অর্থাৎ এক সের জলকে পৌনে আট শত ফুট উপরে তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি উত্তাপে পরিণত হইলে সেই জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি মাত্র বাড়াইয়া দিবে।

সর্ব্বত্র এইরূপ হিসাব বাঁধা আছে। এতটা চলচ্ছক্তি খরচ করিয়া আমরা এত উত্তাপ পাই, আবার এতটা উত্তাপ খরচ করিয়া আমরা এতটা চলচ্ছক্তি পাই। এক রকমের শক্তি খরচ না করিলে অন্য রকমের শক্তি পাওয়া যায় না। কোন স্থানে কোন রকমের শক্তির তিরোভাব ঘটিলে অন্বেষণ করিলেই দেখা যাইবে, কোন না কোন স্থানে অন্য কোন রকমের শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাই দেখিয়া পণ্ডিতেরা বলেন, শক্তির রূপ পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না। শক্তি অবিনাশী, হয় ত অনাদি।

বলা হয়, এক সের জল এক ডিগ্রি গরম করিতে যে উত্তাপ লাগে, আর এক সের জল পৌনে আট শত ফুট উচ্চে তুলিতে যে শক্তি লাগে, উভয়েরই পরিমাণ সমান। কিন্তু এই সমানতা কিরূপ? এই প্রবন্ধের আরম্ভেই এই সমান শব্দটির অর্থ লইয়া কিছু গোলে পড়া গিয়াছিল। এখানেও সেই গোল আছে কি না?

একটা টাকা দুইটা আধুলির সমান—কিরূপ সমান? টাকা যে জিনিষে অর্থাৎ যে রূপাতে নির্ম্মিত, আধুলিও সেই রূপাতে নির্ম্মিত। এখানে টাকায় ও আধুলিতে সমানতা আছে। নিক্তির এক পাল্লায় টাকা আর পাল্লায় দুটা আধুলি রাখিলে দেখা যাইবে, উভয়েরই ওজন সমান। তুলা যন্ত্রে তুলনা করিয়া সমান দেখা যায়, অতএব এক টাকা দুই আধুলির তুল্য। আবার ওজন সমান হইলে দ্রব্যপরিমাণ সমান হয়, এই হেতু দ্রব্যপরিমাণেও উহারা তুল্য। পরন্তু এক টাকার বদলে দুই আধুলি এবং দুই আধুলির বদলে এক টাকা সর্ব্বদা পাওয়া যায়; উহাদের মূল্য সমান; অতএব উহারা তুল্যমূল্য। অতএব একটা টাকা ও দুইটা আধুলি উপাদানে সমান, ওজনে ও দ্রব্যে সমান এবং মূল্যেও সমান।

আবার আমরা বলি, একটা টাকা ষোল আনা পয়সার সমান। এবার কিরূপ সমান? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এখানে উপাদান এক নয়; ওজনও এক নয়; একটা টাকায় যে দ্রব্য আছে, ষোল আনা পয়সায় দ্রব্য তার চেয়ে

প্রচুর অধিক আছে ; তবে কিসে সমান ? উত্তর,—উভয়ের মূল্য সমান ; এক টাকার বদলে সর্ব্বদা ষোল গণ্ডা পয়সা ও ষোল গণ্ডা পয়সার বদলে সর্ব্বদা একটা টাকা পাওয়া যায়, এই বলিয়া উহারা তুল্যমূল্য। এখানে সমান অর্থে তুল্য-মূল্য ; তুল্য নহে।

অতএব টাকাকে আমরা যে অর্থে দুই আধুলির সমান বলি, ঠিক্ সে অর্থে উহাকে ষোল আনা পয়সার সমান বলিতে পারি না। ইংরেজি ভাষায় এক টাকা ও ষোল আনা পয়সাকে equal না করিয়া equivalent বলা হয়।

এখন এক রকমের শক্তি খরচ করিয়া যখন আমরা তাহার বিনিময়ে অন্যরূপ শক্তি পাই এবং সেই বিনিময়ের হার যখন বাঁধা আছে, কতটার বদলে কতটা পাওয়া যাইবে, তাহা বাঁধা আছে, তখন ইহার ঐ দুই মূর্ত্তিভেদকে তুল্য না বলিয়া তুল্যমূল্য বলাই উচিত ; equal না বলিয়া equivalent বলাই উচিত। খানিকটা উত্তাপের বিনিময়ে যতটা গতিশক্তি পাওয়া যায়, তাহাকে উত্তাপের equal না বলিয়া উত্তাপের equivalent বলাই হইয়া থাকে। জুল সাহেব heatএর mechanical equivalentই বাহির করিয়াছিলেন।

বস্তুতই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদের মধ্যে আর কোনরূপ সাদৃশ্য বা স্বজাতীয়তা দৃষ্ট হয় না। এক মাত্র দৃষ্ট হয় তুল্যমূল্যতা। তাড়িত শক্তির সহিত তাপ-শক্তির কোথায় কোন গূঢ় সাদৃশ্য আছে কি না তাহা বৈজ্ঞানিকেরা এখনও বলিতে পারেন না, কিন্তু এতটা তাড়িত শক্তির বদলে এতটা তাপশক্তি পাওয়া যাইবে,তাহা তাঁহারা অক্লেশে নিরূপণ করিয়া দিতে পারেন। একটা টাকা বদল দিয়া কত পয়সা পাওয়া যাইবে, অথবা এক খানা নোটের বদলে কত টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা গবর্মেণ্ট বাঁধিয়া দিয়াছেন। যতদিন গবর্মেণ্টের সেই বাঁধাবাঁধি আইন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন ঐরূপ বিনিময়ে কাহাকে ঠকিতে হইবে না। হাজার টাকার বদলে একখানা চোতা কাগজ পাইয়াও আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব, যে আমার এক পয়সা কমে নাই ; আমার ধনের পরিমাণে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। প্রকৃতি রাণীর গবর্ণ-মেণ্টেও ঐরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। এখানেও তাড়িত শক্তির পরিবর্ত্তে উত্তাপ ও উত্তাপের পরিবর্ত্তে তাড়িতশক্তি পাওয়া যায় এবং বিনিময়ের হারও নির্দ্দিষ্ট আছে। হার নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়াই হাজার মণ বোঝা নামাইতে বা তুলিতে কত মণ কয়লা পোড়াইতে হইবে, এবং চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া এত বাতির সমান বিজলি বাতি জ্বালাইতে কত আউন্স কয়লা বা দস্তা পোড়াইতে হইবে, তাহার হিসাবেও কখনও ঠকিতে হয় না। দুই গবর্ণমেণ্টে প্রভেদ এই যে,

প্রকৃতি রাণীর এলাকা বিশ্বব্যাপী; আর তাঁহার আইনকানুনে বিধিব্যবস্থায় কখনও খামখেয়ালি নাই। তদ্ভিন্ন আর কোন ভেদ নাই।

একটা গরুর বদলে দশটা ভেড়া ও দশটা ভেড়ার বদলে একটা গরু যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই গো-স্বামী, সমস্ত গরুকে ভেড়ায় পরিণত করিয়া মনে মনে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন,—আমার গোশালায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই এবং বিনিময়ের ঐ হার যদি চিরকাল বজায় থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ অদল বদল করিয়া কখনও তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। একটা গরু দশটা ভেড়ার তুল্যমূল্য হইবে; এমন কি এই অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে দশটা গরু একটা ভেড়ার সমান বলিয়া গণ্য হইবে। এই বৃহত্তর বিশ্বশালায় শক্তির কখনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, ইহাও একটা সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে সত্য। সেই সঙ্কীর্ণ অর্থেও ইহা পরীক্ষালব্ধ সত্য; কিন্তু ইহার ভিতর কোনরূপ স্বতঃসিদ্ধতা নাই। এই যে পারিভাষিক অর্থ, তাহা আমরাই অর্পণ করিয়াছি। কাজ করিবার ক্ষমতাকেই আমরা শক্তি বলি; এই পারিভাষিক অর্থ সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনগড়া। এই শক্তির কোন ধর্ম্ম আমরা যদি পর্য্যবেক্ষণে আবিষ্কার করি, তাহাতে স্বতঃসিদ্ধতা কিছুই থাকিতে পারে না।

ফলে যে সকল তথাকথিত সত্য লইয়া আমরা স্পর্দ্ধা করি ও তাহাদিগকে সনাতন সার্ব্বভৌমিক সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি, মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে, ইহারা সর্ব্বত্রই আমাদের মনঃকল্পিত সত্য। পরম দেবতা কোথায় কি ভাবে আছেন আমরা জানি না; আমরা তাঁহার মনগড়া পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এবং পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিতেছি।

ফলতঃ আমরা পাঁচটিমাত্র সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয় লইয়া এই বিশ্বজগতের কিয়দংশমাত্র প্রত্যক্ষ করি; এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোথায় কি আছে তাহার কোন সন্ধান রাখি না। অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ আছে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যদি কোন কালে না পাই, তাহা হইলে এই সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে আমরা কখনও যাইতে পারিব না। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় যেরূপে যে ভাবে আমাদিগকে জানায়, তেমনি ভাবে আমরা জানি। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উপযোগী বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় না থাকিয়া অন্য কোনরূপ অনুষ্ঠানের উপযোগী অন্য কোনরূপ ইন্দ্রিয় যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইত। বর্ত্তমান প্রাকৃতিক বিধানে অভিব্যক্তির পরিণামে আমরা বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বর্ত্তমান মনোবৃত্তি পাইয়াছি। বিশ্বজগৎ আমাদিগকে যেভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে, আমরা সেইরূপেই গড়িয়া উঠিতেছি এবং এই সঙ্কীর্ণ গঠন প্রণালীর

ফলে ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশকে আমরা যে ভাবে দেখিবার অধিকারপাইয়াছি,সে অংশকে সেইভাবেই দেখিতেছি। আমাদের ইন্দ্রিয় অন্যরূপ হইলে জগতের মূর্ত্তিও অন্যরূপ হইত ; এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় সেই একই জগতের মূর্ত্তিরও অন্যরূপ বিবরণ দিত। যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বিকৃত বা সর্ব্বসাধারণের তুল্য নহে, তাহার নিকট জগতের মূর্ত্তিও অন্যরূপ ; এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের বর্ত্তমান ভাষা তাহার নিকট অর্থহীন। আমরা অধিকাংশ লোকে যাহা দেখিতেছি, তাহা বিশ্বজগতের একটা বিশেষরূপ সঙ্কীর্ণ মূর্ত্তিমাত্র ;—আমরাই বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যলব্ধ এই মূর্ত্তি আমাদের মতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছি, এবং ইহার বিশেষ বিশেষ অংশের বিশেষ বিশেষ নাম দিয়াছি। জড় ও শক্তি আমাদেরই মনঃকল্পিত মূর্ত্তির প্রকারভেদমাত্র। একটা সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে উহাদের অবিনাশিতা আমরা কল্পনা করিয়া লইয়াছি। অন্যরূপ পারিভাষিক অর্থ দিলে এই জড়ের এবং এই শক্তির অবিনাশিতা থাকিত না ; অথচ তাহাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভাষা অন্যরূপ হইলেও ফল অন্যরূপ হইত না। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা কর্ম্ম সেই সঙ্কীর্ণ মনগড়ামূর্ত্তি কল্পনার প্রধান উপায়। যেরূপে যে ভাবে দেখিলে আমাদের জীবনযাত্রা সুসাধ্য হয়, বিশ্বজগৎ আমাদিগকে তেমনি করিয়া গড়িয়াছেন ও আমরা তেমনি ভাবে দেখিতেছি। বিশ্বজগৎ আর আত্মজগৎ পরস্পরকে পরস্পরের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইয়াছে ; অন্যভাবেও গড়িতে পারিত না, এমন নহে। পরস্পর উপযোগিতা না থাকিলে আমরা ক্ষণমাত্র টিকিতে পারিতাম না। উপযোগিতা আছে বলিয়াই আমাদিগকে জীবনযাত্রায় ঠকিতে হয় না। প্রকৃতির বিধানই এইরূপ। ঠকিতে হইলে আমরা টিকিতে পারিতাম না। কিছু গোড়ার কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল পরীক্ষালব্ধ বা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের মধ্যে পরমার্থ কিছুই নাই। সমস্তই ব্যবহার মাত্র; আমরা দেবতাকে না পাইয়া কতকগুলি পুতুল কল্পনা করিয়াছি এবং এক একটি পুতুলের এক একটি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছি। বিজ্ঞান যে এই মনগড়া মূর্ত্তিগুলির জন্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞানের কোন দোষ বা হীনতা নাই ; কেন না যাহাকে বিজ্ঞান বলি, তাহা মানুষেরই বিজ্ঞান এবং প্রকৃতি তাহার সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার অনুকূল সঙ্কীর্ণ ভাবে মানুষকে গড়িয়াছেন বলিয়াই মানুষের বিজ্ঞানকেও সঙ্কীর্ণ দেবালয়ের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ।

নর্ত্তকীর কূপ।

—•::•—

১

রামরাজা বিদার বেজনগর আক্রমণ করিয়াছেন। নগর সুরক্ষিত—সহজে শত্রুহস্তগত হয় নাই; কিন্তু অবরুদ্ধ নগরে নগরবাসীদিগের দুর্দ্দশার আর সীমা নাই। নগরে খাদ্য-দ্রব্য ফুরাইয়া আসিয়াছে, কূপে জল শুকাইয়া উঠিয়াছে। ধনীরা অতি কষ্টে কিছু খাদ্যসংগ্রহ করিতে পারিতেছেন। দরিদ্রগণ অখাদ্য ও কুখাদ্য খাইয়া পীড়িত হইতেছে; নগরে ব্যাধির বিস্তার বাড়িতেছে। সকলেই চিন্তিত, সকলেই বিজাপুরের সম্রাট ইস্‌মাইল আবদুল শাহার প্রতিশ্রুত সাহায্যের আশায় পথ চাহিয়া আছেন। কিন্তু বিলম্বহেতু আশার আলোক নিরাশার অন্ধকারে বিলয়োন্মুখ হইতেছে। তথাপি পুরবাসীরা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণে সম্মত নহে। সকলেই সকল কষ্ট সানন্দে সহ্য করিতেছে। শুদ্ধান্তে পুরাঙ্গনারাও পুরুষদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন; আপনারা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া যোদ্ধৃবর্গের আহার যোগাইতেছেন। কিন্তু এমন করিয়া আর কয় দিন কাটিবে? জল ফুরাইলে আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত উপায় থাকিবে না। অবরুদ্ধ নগরীর অধিকারী আমীরের নয়নে নিদ্রা নাই, মনে সুখ নাই। প্রজার কষ্টে, ভবিষ্যতের চিন্তায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে প্রাসাদ-চূড়ায় উঠিয়া পথের দিকে চাহিতেছেন,—শাহার সৈন্যদল আসিতেছে কি না। শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্র পুরমধ্যে গোলাবর্ষণ করিতেছে—গৃহাদি ভগ্ন হইতেছে; কত বীরের জীবনান্ত হইতেছে। নগরের উপর আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা যেন নিদাঘদিনান্তের প্রলয়মূর্ত্ত—বজ্রগর্ভ—কৃষ্ণ মেঘের মত অবস্থান করিতেছে।

২

আলমা বিদারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী। তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য ও অনন্যসাধারণ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তাহার খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত করিয়াছিল। শাণিত হইলে অস্ত্রের ধার যেমন তীক্ষ্ণতর হয়, শিক্ষার ফলে তাহার কণ্ঠস্বর তেমনই মিষ্টতর হইয়াছিল। আলমার গান না হইলে নবাবের প্রাসাদে ও আমীর ওমরাহদিগের গৃহে উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত না। অনেক সময় তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির দরবারে গাহিতে যাইতে হইত। সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী ছিল। এই বিপদের সময় সে আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া পুররক্ষার সঙ্কল্প করিল। সে দরিদ্রদিগের

গৃহে গৃহে খাদ্য ও ঔষধ বিতরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। সে যেন মূর্ত্তিমতী করুণা। শ্রান্তি নাই—ক্লান্তি নাই—সে ক্ষুধিতের ও ব্যাধিতের সেবায় আত্মসমর্পণ করিল। আপনার কষ্ট সে কষ্ট বলিয়াই মনে করিল না। অজস্র সুখে অভ্যস্তা নর্ত্তকীর এই দৃষ্টান্তে পুরবাসীরা ও সৈনিকদল দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইল। কিন্তু বিধাতা বুঝি বিমুখ! আলমার গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রসন্নসলিল কূপের জল ও তাহার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় উভয়ই ফুরাইয়া উঠিল। তথাপি অবরোধ শেষ হইল না—শাহার সাহায্য আসিল না।

৩

রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতা; রাজপথ সূচিভেদ্য অন্ধকারে আবৃত। দুই জন সহচর সঙ্গে লইয়া আলমা নগরের প্রান্তস্থিত দরিদ্রপল্লী হইতে ফিরিতেছে। গুরু শ্রমে তাহার দেহ শীর্ণ হইয়াছে; রক্তাভ গণ্ডে অস্থি দেখা দিয়াছে; তপ্তকাঞ্চন বর্ণ মলিন হইয়াছে। শ্রান্তদেহে সে গৃহে ফিরিতেছে।

পথিপার্শ্বে ভগ্ন দেবালয় হইতে আগত শিশুর কাতর ক্রন্দন শুনিয়া আলমা সেই দিকে চলিল। আলোকধারী সহচর সে দিকে যাইতে ইতস্ততঃ করিল। সে ভগ্ন দেবালয়ে দিবসে বিষধরগণ বিশ্রাম করে। সে মৃত্যু-মন্দিরে নিশায় প্রবেশ করা দুঃসাহসিকের কার্য্য। কিন্তু আলমার আদেশে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইল।

মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিচারককরধৃতআলোকবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে যে দৃশ্য আলমার নয়নে পতিত হইল তাহা নরকেরই উপযুক্ত। মন্দিরের পাষাণ হর্ম্মতলে—শূন্যবেদীমূলে একটি শীর্ণকায় পুরুষের শব পড়িয়া আছে—তাহার পার্শ্বে একজন কঙ্কালসার রমণী একখানি শাণিত ছুরিকা লইয়া একটি শিশুকে হত্যা করিতে উদ্যতা! রমণীর নয়নে কি পৈশাচিক দীপ্তি! আলমা বলিল, "তুমি কে? এ ভীষণ স্থানে কেন আসিয়াছ?"

রমণী উত্তর করিল, "আমি ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছি। অনন্যোপায় হইয়া আমি ও আমার স্বামী এই দেবমন্দিরে পুত্রকে নিহত করিয়া তাহার শোণিত পান করিব, স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এই স্থানে আসিয়া স্বামীর শেষ শ্বাস বায়ুতে মিশাইয়াছে। আমি—আমি—"

আলমা বালককে বক্ষে তুলিয়া লইল। সহচরদিগকে রমণীকে আনিবার জন্য আবশ্যক উপদেশ দিয়া শিশুকে বক্ষে লইয়া অত্যন্ত মন্থর গতি পরিহার করিয়া দ্রুত পদে সেই অন্ধকারাবৃত পথে গৃহাভিমুখগামিনী হইল।

৪

আলমা গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পদতলে তোরণের হর্ম্যতলস্থ একখানি প্রস্তর নিম্নে পড়িয়া গেল। আলমার মনে হইল যেন প্রস্তর খানি গড়াইয়া কোন তরল পদার্থে ডুবিয়া গেল। সে বালককে উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইয়া শয্যায় রাখিয়া আসিয়া ভৃত্যদিগের দ্বারা সেই স্থানে কয়খানি প্রস্তর উঠাইল। নিম্নে অন্ধকার গর্ত্ত। বর্ত্তিকার আলোকে সোপান দেখা গেল। ভৃত্যগণ সাহস করিয়া সেই অজ্ঞাত অতলে যাইতে স্বীকৃত হইল না। তখন আলমা বলিল, "আমি জলের শব্দ শুনিয়াছি। আমি যাইব।" ভৃত্যগণ বলিল—"এমন কায করিবেন না। এ শয়তানের ছলনা।" আলমা বলিল, "যদি সহস্র লোকের জীবনোপায় করিতে যাইয়া আমার এ তুচ্ছ জীবন যায় তাহাতে দুঃখ কি ?" ভৃত্যের হস্ত হইতে বর্ত্তিকা লইয়া আলমা দ্রুতপদে সোপানে অবতরণ করিতে লাগিল। সে কিছু দূর যাইলে বর্ত্তিকা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। ঝপ করিয়া শব্দ হইল।

চারিদিক অন্ধকার। উপরে ভৃত্যবর্গ ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল।

আলমা প্রকোষ্ঠ হইতে হীরক-খচিত বলয় মুক্ত করিল—অন্ধকারে হীরক জলিয়া উঠিল; সেই আলোকে আলমার পদতলে জল দেখা গেল। সে বলয় অমূল্য, আলমা তাহা জলে নিক্ষিপ্ত করিল। বলয়-পতন-শব্দে নিম্নে জলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। আলমা জানু পাতিয়া বসিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিল।

এ কথা নগরে প্রচারিত হইল। এই দৈব কৃপায় নগরবাসীদিগের হতাশ হৃদয়ে নূতন আশা সঞ্চারিত হইল। ভগবান তাহাদের সহায়।

কয় দিন পরে শাহার সেনাদল আসিল। বিদার শত্রুকবলমুক্ত হইল।

বহুদিন আলমার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আজও নর্ত্তকীর কূপের কিম্বদন্তী তাহার পুণ্যস্মৃতি সযত্নে রক্ষা করিতেছে।

———

রামায়ণী সভ্যতা ।

শিক্ষা-প্রণালী ।

রামায়ণী যুগে ভারতে শিক্ষাদানের কিরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, রামায়ণ-পাঠে তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায় না। তৎকালীন আচারব্যবহার ও রীতি-নীতি হইতে শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

আদিকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, পুত্রগণ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাজা দশরথ তাঁহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। রাজকুমারগণও শিক্ষাগুণে অল্পকাল-মধ্যেই সর্ব্ববিষয়ে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন।

সর্ব্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে লোকহিতে রতাঃ ॥ ২৫
সর্ব্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ।

*　　*　　*　　*　　*

গজস্কন্ধেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্য্যাসু সম্মতঃ ॥ ২৭
ধনুর্ব্বেদে চ নিরতঃ পিতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ।

১৮শঃ সর্গঃ।

উপর্যুক্ত শ্লোক হইতে বিশেষ ভাবেই অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে রাজ-কুমারদিগের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল; এবং বেদ অধ্যয়ন, অস্ত্র পরিচালন, নীতি শিক্ষা, গজারোহণ, অশ্বারোহণ, রথারোহণ ও পিতৃসেবাদিই শিক্ষনীয় বিষয় ছিল।

এই শিক্ষা গুরুগৃহে সম্পন্ন হইত, কি ছাত্রগৃহে গুরুর দ্বারা সম্পাদিত হইত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।*

তখন বেদ-পাঠে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার ছিল না। প্রত্যেক গৃহস্থই বেদ পাঠ করিতে পারিতেন, এবং বেদ-পাঠ প্রত্যেক গৃহস্থের প্রত্যাহিক অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

রামের বনগমনের দিন অযোধ্যা এক অভাবনীয় বিষাদময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

* দশরথ এবং রাবণ গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন তদীয় রামায়ণের অনুবাদে প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু মূল রামায়ণে তাহা দৃষ্ট হয় না।

ন চাহৃষ্যন্ন চামোদন্ বণিজো ন প্রসারয়ন্।
ন চাশোভন্ত পণ্যানি না পঠন্ গৃহমেধিনঃ ॥২।৪৮।৪

"সে দিন অযোধ্যানগরের কেহই আমোদআহ্লাদ করিল না—বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ পণ্যদ্রব্য সজ্জিত করিল না এবং গৃহস্থেরা বেদ পাঠ করিল না।"

তখন বেদ-পাঠ প্রত্যেক গৃহস্থের দৈনিক কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ছিল। বেদ পাঠ না করিয়া কেহই অন্ন গ্রহণ করিতেন না। রামের বনগমনে লোকের মনে এত আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাহারা সে দিন আহার করা দূরে থাকুক—বেদ-পাঠ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিল।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন বেদ-পাঠে কাল অতিবাহিত করিতেন।

তে চাপি মনুজব্যাঘ্রা বৈদিকাধ্যয়নে রতাঃ ॥১।১৮।৩৬

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "না পঠন গৃহমেধিনঃ" পাঠ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে আর্য্যসমাজে আধুনিক য়ুরোপীয় সমাজের Mass Educationএর ন্যায় সাধারণ শিক্ষা-প্রথা প্রচলিত ছিল।

বেদ যে তখন আর্য্যসমাজের চাতুর্ব্বর্ণের মধ্যেই কেবল আবদ্ধ ছিল, তাহাও নহে। তখন অনার্য্যগণও বেদ পাঠের অধিকারী ছিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের তৃতীয় সর্গে দেখা যায়, হনুমানের মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন,—

নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্ব্বেদধারিণঃ।
না সামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্ ॥ ২৮
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্ ॥ ২৯

"লক্ষ্মণ, ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ বা সামবেদজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহ এইরূপ উৎকৃষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু একটি অপ শব্দ ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং বোধ হইতেছে, ব্যাকরণ প্রভৃতিও ইনি বহুবার শ্রবণ করিয়াছেন।"

অন্যত্র রাবণ সম্বন্ধে বিভীষণ রামকে বলিতেছেন—

এষো হিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ
বেদান্তগঃ কর্ম্মসু চাগ্রশূরঃ ॥৬।১১১।২৩

"রাবণ আহিতাগ্নি, মহাতেজস্বী, এবং বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।" এতদ্ব্যতীত সুপার্শ্বও রাবণকে "বেদ বিদ্যাব্রত স্নাত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(লঙ্কা। ৯৩) সুতরাং বেদ যে আর্য্যসমাজের ব্রাহ্মণগণেরই কেবল সম্পত্তি ছিল তাহা নহে। তখন আর্য্য অনার্য্য সকলেই বেদ-পাঠে অধিকারী ছিলেন।

তখন মহামহোপাধ্যায় বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ছিল। ঋক্‌বেদজ্ঞগণ হোতা, যজুর্ব্বেদজ্ঞগণ, অধ্বর্য্যু ও সামগায়কগণ উদ্গাত উপাধিতে ভূষিত হইতেন। ত্রিবেদজ্ঞগণ ব্রহ্মা উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

তখন ঋষিগৃহে শিষ্যগণ অধ্যয়ন করিতেন। ঋষিগণও স্বস্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা করিতেন। অধ্যাপনার বিষয়গুলি "শাস্ত্র" নামে অভিহিত হইত। প্রত্যেক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরই শত সেবক রাখিবার প্রথা ছিল।* এই শত সেবকের ভরণপোষণের ব্যয় অধ্যাপককেই বহন করিতে হইত। অধ্যাপকগণ ধনবান ও রাজাদিগের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। রাজা দশরথ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত ধন ও দেশাদি দানে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (অ—১৪)

কিরূপে "শাস্ত্রে"র অধ্যাপনা হইত, লিখিত গ্রন্থাদির সাহায্যে হইত কি মৌখিক শিক্ষাদান প্রণালী তখন প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহার সম্বন্ধে রামায়ণে সবিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

রামায়ণের সময় ভারতে লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া রামায়ণে কোন আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভারতবর্ষে বর্ণমালা উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই রচনা-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই সকল রচনা মহর্ষিগণের স্বাভাবিক মনোভাব হইতে স্ফুরিত ও জনগণের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হইত। বেদ প্রভৃতি যে সকল সুপ্রাচীন মন্ত্র পরবর্ত্তী কালে সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থাবদ্ধ হইয়াছে সে সকল রচনাকালেই লিখিত ও গ্রন্থাকারে পরিণত হয় নাই। বেদ মন্ত্র ও অনুশাসনগুলি রচিত হইয়া শ্রুতি স্মৃতির সাহায্যে প্রচারিত হইত বলিয়া সেগুলি যথাক্রমে শ্রুতি ও স্মৃতি নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে।

ইহার পর ক্রমে ব্যাকরণ, বর্ণমালা পরিকল্পিত হইয়া বেদাঙ্গের উদ্ভব হইয়াছে। রামায়ণে ব্যাকরণের উল্লেখ আছে। সুতরাং রামায়ণের সময় বর্ণমালার অবয়ব কল্পিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যায়। ইহার পর ক্রমে ক্রমে মুদ্রা লিপি, ধাতুলিপি, প্রস্তরলিপি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়া, লেখনিসম্ভবা লিপি আরম্ভ হইয়াছে—ইহাই লিপিপ্রবর্ত্তনের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস বলিয়া মনে

* না বিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্নাশতানুচরস্তথা ॥১।১৪।১১

[illegible]। রামায়ণে এতৎ সম্বন্ধে কিরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় এস্থলে তাহার আলোচনা করা গেল।

রামায়ণের কোন স্থানেই পত্র, লেখনী, মসী, গ্রন্থপ্রভৃতি বা এইরূপ লিপ্যানুমোদক কোন শব্দের উল্লেখ নাই। পরন্তু যে সকল স্থানে ঐ রূপ কোন আভাস পাইবার আশা করা যাইতে পারে, সেই সকল স্থানে লিপি-প্রবর্ত্তনের অভাবই পরিলক্ষিত হয়।

রাম হনুমানের মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় বাক্যালাপ শুনিয়া লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম।"

"বোধ হইতেছে ইনি বহুবার ব্যাকরণ শুনিয়াছেন।"

অন্যত্র সুমন্ত্র রাজা দশরথকে বলিতেছেন—

শ্রূয়তাং তৎ পুরাবৃত্তং পুরাণেচ যথা শ্রুতম॥ ১। ৯। ১

"পুরাণে যাহা শুনিয়াছি তাহা শ্রবণ করুণ।"

এইরূপ "শুনিয়াছেন," "শুনিয়াছি" প্রভৃতি শব্দগুলি শ্রুতি ও স্মৃতির প্রাধান্যের সমর্থক। এই সকল বাক্যের ব্যবহারবাহুল্য দেখিয়াই অনুমিত হয় যে, লিখন-প্রণালী রামায়ণের পরবর্ত্তী সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

রামায়ণে 'অধ্যয়ন' ও 'পঠন' শব্দের উল্লেখ আছে। 'পাঠ' ও 'অধ্যয়ন' দ্বারা কেবল যে লিখিত গ্রন্থ পাঠই বুঝায় তাহা নহে। স্মৃতি আবৃত্তিকেও পাঠ এবং অধ্যয়ন বলা হইয়া থাকে। তৎকালে বেদ-বেদাঙ্গের আলোচনাই অধ্যয়ন ও মন্ত্র উচ্চারণ 'পাঠ' বাচ্যে অবিহিত হইত। মুনি ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় স্মৃতি হইতে শিষ্যদিগকে বলিয়া যাইতেন ও শিষ্যগণ একাগ্র মনে তাহা উচ্চারণ করিয়া কণ্ঠস্থ করিতেন। আশ্রমসমূহে এইরূপে শিষ্যগণ অধ্যয়ন করিতেন।

তৎকালে লিপি-প্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকিলে গুরুতর কার্য্যাদিতে চিঠি পত্রের উল্লেখ থাকিত। রামায়ণে এইরূপ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষণকে লইয়া মিথিলায় উপনীত হইলেন। রাম হরধনু ভগ্ন করিলে মিথিলাপতি রামকে কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। এইরূপ গুরুতর কার্য্য পিতার (দশরথের) বিনা অনুমতিতে ও বিনা অবগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে না, সুতরাং বিশ্বামিত্রের অনুমতি লইয়া মিথিলাপতি অযোধ্যায় লোক প্রেরণ করিলেন।

কৌশিকস্তু তথেত্যাহ রাজা চাভাষ্য মন্ত্রিণঃ ।
অযোধ্যাং প্রেষয়ামাস ধর্ম্মাত্মা কৃতশাসনান্ ॥ ২৭
যথাবৃত্তং সমাখ্যাতুমানেতুঞ্চ নৃপং তথা ॥ ২৮

বাল—৬৭ সর্গ ।

"কৌশিক বিশ্বামিত্র 'তাহাই হউক' বলিলে রাজা (জনক) মন্ত্রীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক রাজা দশরথকে যাহা যাহা বলিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া নরপতি দশরথকে যথাযথ বিবরণ নিবেদনপূর্ব্বক আনয়ন করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন।"

এ স্থলে লিপি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। লিপিপ্রথা প্রচলিত থাকিলে এইরূপ স্থানেই লিপির আভাস আশা করা যাইত।

রাজা দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে যে সকল লোক প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট বশিষ্ঠ বলিতেছেন :—

"শ্রূয়তামিতি কর্ত্তব্যং সর্ব্বানেব ব্রবীমি বঃ ॥ ২।৬৮।৫

এখানেও লিপির উল্লেখ নাই। *

এ তাবত আমাদের মনে হয়, রামায়ণী যুগে ভারতে লেখনিসম্ভবা লিপির প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

স্মৃতিশাস্ত্রে পঞ্চ প্রকারের লিপির কথা উক্ত হইয়াছে।

"মুদ্রালিপি শিল্পলিপি লিপির্লেখনিসম্ভবা।
গুণ্ডিকা ঘুণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চ স্মৃতাঃ ॥"

রামায়ণে 'লেখনিসম্ভবা' লিপির কোন আভাস পাওয়া না যাইলেও মুদ্রালিপি (ধাতুলিপি) ও শিল্পলিপির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুদ্রালিপি ও শিল্প (চিত্র) লিপি ভারতের অতি প্রাচীন সম্পদ।

ঋগ্বেদে স্বর্ণমুদ্রা ও হিরণ্যপিণ্ডের উল্লেখ আছে। রামায়ণী যুগে 'নিষ্ক' ও 'সুবর্ণ' নামক মুদ্রার প্রচলন ছিল। রামায়ণের বহুস্থানে তাহার উল্লেখ আছে। এই মুদ্রা কোন নামাঙ্কিত ছিল কি না রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু তৎকালে অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতিতে যে নামাঙ্কিত করা হইত তাহার আভাস রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

* লিপিবিজ্ঞান প্রচলিত থাকা কালের যে কোন গ্রন্থেই যে এইরূপ স্থানে লিপির উল্লেখ থাকিবে এবং তাহা না থাকিলে তৎকালে লিপি-প্রণালী ছিল না বলিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, এইরূপ মত আমরা পোষণ করিতেছি না। লিপিবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক মতে আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করা যাইবে।

হনুমান রামের যে অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞানস্বরূপ সীতার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে রামের নাম অঙ্কিত ছিল। সেই অঙ্গুরীয়ক দেখাইয়া হনুমান সীতাকে বলিতেছেন :—

"রামনামাঙ্কিতঞ্চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুরীয়কম্। ৫।৩৬।২

বেদে যে "ক্ষুরভ্রজ" শব্দের উল্লেখ আছে, ঐ সকল "ক্ষুরভ্রজ" সাহায্যেই এই সকল ধাতুলিপির কার্য্য সম্পাদিত হইত।

ইহার পর ক্রমে লেখনিসম্ভবা লিপির প্রয়োজনানুসারে তাহার উপকরণাদির (লেখনি, মসী ইত্যাদি) উদ্ভব হইয়াছে ও গ্রন্থাদি লিখিত ও রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং রামায়ণী যুগে মৌখিক শিক্ষাদান প্রণালী প্রচলিত ছিল ইহা অনুমান করা যায়।

তৎকালে যে সকল সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পাদির বিষয় আলোচিত হইত, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

তুমি।

তুমি স্নিগ্ধ প্রভাতে রবির কিরণ রক্ত আকাশ-গায়;
তুমি সান্ধ্যললাটে জ্যোতির তিলক উজলি' জলদ-কায়।
তুমি নৈশ আকাশে বিমল চাঁদিমা জ্যোছনার হাশিরাশি;
তুমি কুঞ্জ কুটীরে কোকিল-কূজন নৈশ সমীরে ভাসি'।
তুমি নন্দনবনে স্ফুট পারিজাত সুরভি পীযুষমাখা
তুমি কিশোরীহৃদয়ে বাঞ্ছিত-ছবি প্রেমের তুলিতে আঁকা।
তুমি কামিনী-কণ্ঠে কমনীয় হার, ফণীর মাণিক যথা;
তুমি প্রেমিক-নয়নে স্নিগ্ধ সলিল ঘুচাতে বিরহ-ব্যথা।
তুমি আমার বিশ্ব উজল করেছ দিব্য প্রেমের ছবি;
তুমি অন্ধনয়ন ফুটায়ে আমার দেখাও তোমারি ছবি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

পাষাণের কথা।

(৫)

প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে নগরের দিক হইতে কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল। তখন শিশির কাল। হিমকরসিক্ত প্রান্তরে শুভ্র তুষারের ক্ষীণাবরণ শুক্ল উত্তরচ্ছদের ন্যায় দেখাইতেছিল। হিমকণসিক্ত পত্রপল্লবে তুষারখণ্ড আবদ্ধ থাকায় মনে হইতেছিল যেন বনস্পতিগণ পুণ্যাহে লাজ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। নৈশ তমোভেদ করিয়া যখন পূর্ব্বপ্রান্তে বাহ্লীকাঙ্গনার সীমন্তে সিন্দূরছটার ন্যায় অরুণরাগ লক্ষিত হইল, তখন জনসঙ্ঘের পাদপেষণে প্রান্তরের তুষারাবরণ কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছে, অসাধারণ কোলাহলে বিহগকুল কুলায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, নানারাগরঞ্জিত উষ্ণীষে ও শিরস্ত্রাণে সমগ্র প্রান্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জনতার মধ্যদেশে রজ্জু-রক্ষিত কোষ্ঠপালগুপ্তপথ, স্তূপবেষ্টনী হইতে নগরদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যেন একটি বিশাল কালব্যাল অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণায় লম্বমান হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের ঈষৎ পূর্ব্বে পুরাঙ্গণাগণ এই পথ পরিষ্কৃত করিয়া গেল, তাহাদিগের পরে কুমারীগণ দলে দলে অঞ্চল ভরিয়া নানাবিধ পুষ্প লইয়া আসিয়া সুগন্ধি কুসুমে পথ আচ্ছন্ন করিয়া গেল। সুগন্ধজলপূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে সদ্যঃস্নাত বালকগণ আসিয়া পুষ্পরাশি অভিবৃষ্ট করিয়া গেল। ইতোমধ্যে স্তূপের চারি তোরণের আবরণ-পার্শ্বে উপবিষ্ট বাদকগণ যন্ত্রসংযোগে স্তুতিগান আরম্ভ করিল। আমরা যে পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলাম তাহা প্রফুল্ল রাখিবার জন্য পরিচারকগণ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপর্য্যুপরি গন্ধবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নগরদ্বারে তূর্য্যনিনাদ শ্রুত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নগরতোরণ হইতে দেবযাত্রা নির্গত হইল। দেবযাত্রার পুরোভাগে পংক্তির পর পংক্তি চীবরধারী ভিক্ষু ও শ্রমণ। প্রতি পংক্তিতে পাঁচ জন, এইরূপ শতাধিক পংক্তি নির্গত হইল। পরে বাদিকা ও নর্ত্তকীদল পুণ্যসঙ্গীত ও যন্ত্রবাদন করিতে করিতে ভিক্ষুগণের পদানুসরণ করিল। তাহাদিগের পরে বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া নগরের দেবদাসী, গণিকা, লেনাশোভিকাগণ আসিল। ইহারা নগরদ্বার হইতে নির্গত হইলে অত্যুচ্চ শ্বেতবর্ণ সপ্তচ্ছত্র পরিলক্ষিত হইল। শ্বেতচ্ছত্র দর্শনে জনতা হইতে বিশাল কলরব উত্থিত হইল, কোষ্ঠপালগণের রজ্জুবন্ধন উল্লঙ্ঘিত করিয়া জনসঙ্ঘ নগরাভিমুখে প্রতিগমনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বহু চেষ্টায় যাত্রার পথ অবাধ রহিল, কিন্তু সে কলরব আর মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে

প্রশমিত হইল না। শ্বেতচ্ছত্র ক্রমে নিকটে আসিলে দৃষ্ট হইল যে, উহার নিম্নে সুবর্ণদণ্ডযুক্ত মুক্তা ও হীরকখচিত চন্দ্রাতপ। রাজা অগরাজু ও তাঁহার মহিষীগণ নিজহস্তে চন্দ্রাতপের স্বর্ণদণ্ড ধারণ করিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রাতপের নিম্নে স্বর্ণ-নির্ম্মিত ছত্রদণ্ডধারী পাটলীপুত্রের সেই লোলচর্ম্ম মহাস্থবির। তাঁহার পার্শ্বে শ্বেতাঙ্গ, দীর্ঘকায়, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তি দক্ষিণহস্তে একটি স্ফটিকাধার লইয়া আসিতেছেন। মহাস্থবির সেই স্ফটিকাধারের উপরে স্বর্ণছত্র ধারণ করিয়া আছেন। হিমক্লিষ্ট প্রভাতে নগ্নপদে স্বল্পাচ্ছাদন সত্বেও বোধ হইতেছিল যেন, তাঁহার বয়সের অর্দ্ধশতাব্দী কালের হ্রাস হইয়া গিয়াছে, লোলচর্ম্ম পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কালভারাবনত দেহযষ্টি দণ্ডের ন্যায় তুঙ্গ হইয়াছে, বোধ হয় নির্ব্বাণলাভ হইলেও তাঁহার আকারের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইত না। তাঁহার পার্শ্বচর প্রৌঢ়কে দেখিয়া জনসঙ্ঘের মধ্যস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রই তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিলেন, অন্যান্য সকলে বিস্ময়স্তিমিতনয়নে চাহিয়া রহিল। অদ্য দেবযাত্রায় তথাগতের শরীর-ভার বহনের সৌভাগ্য কাহার হইল তাহা বুঝিতে পারা গেল না। চন্দ্রাতপের পশ্চাতে রাজ-কর্ম্মচারিগণ ও তাঁহাদিগের পশ্চাতে নগরের যে কেহ অবশিষ্ট ছিল সকলে বাহির হইয়া আসিল। দেবযাত্রা সম্পূর্ণরূপে তোরণদ্বার অতিক্রম করিল। আজিকার দিনে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, রথ ব্যবহৃত হইল না—রাজা হইতে সামান্য নাগরিক পর্য্যন্ত সকলেই নগ্নপদে দেবযাত্রায় যোগদান করিলেন। ক্রমে যাত্রার পুরোভাগ স্তূপের তোরণের সম্মুখীন হইল। সদ্যঃস্নাত কৌশেয় বস্ত্র পরিহিত যবন শিল্পিচতুষ্টয় জলধারা, অর্ঘ্য ও পুষ্প প্রদানে দেবযাত্রার পূজা করিলেন; পরে যথাক্রমে সমগ্র দেবযাত্রা তিন বার স্তূপবেষ্টনী পরিক্রমণ করিল ও পরে পূর্ব্বতোরণ দিয়া বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরি-ক্রমণের পথে সপ্তবার স্তূপ প্রদক্ষিণ করিল। দেবযাত্রার পুরোভাগ দক্ষিণ তোরণের সম্মুখীন হইলে আর্ত্তিমিদোর পরিক্রমণের পথে আসিয়া বর্ত্তুলাকার স্তূপগাত্র স্পর্শ করিবামাত্র দুই খণ্ড বিশাল প্রস্তর অন্তর্হিত হইল; দৃষ্ট হইল, মানব দেহ পরিমিত স্থান উন্মুক্ত হইয়াছে। যবন শিল্পীর আহ্বানে রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত দশজন উল্কাধারী উন্মুক্ত পথে অগ্রসর হইল। অগরাজু, পাটলীপুত্রবাসী মহাস্থবির ও তথাগতের শরীরভারবাহী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ব্যতীত অপর সকলেই বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। চামরহস্তে অগরাজু, স্বর্ণচ্ছত্রহস্তে মহাস্থবির ও শরীরভারহস্তে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ উল্কাধারিগণের পশ্চাতে গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিয়াছি, ৭২ গহ্বরমধ্যে বিস্তৃত চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কক্ষের মধ্যভাগে

বিশাল পাষাণনির্ম্মিত আধারে সুবর্ণপাত্রে তথাগতের শরীরসহ স্ফাটিক নিধান নিহিত হইয়াছিল। ক্রমে রাজা,—মহিষীগণ পরে যথাযোগ্য অনুক্রমানুসারে রাজপুরুষ ও নগরবাসিগণ গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তথাগতের শরীর দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনক্রিয়া সমাধা করিলেন। শেষ নাগরিক যখন গর্ভগৃহ হইতে নির্গত হইল, তখন সূর্য্যোদয়ের পর দ্বিপ্রহর কাল অতীত হইয়াছে! ক্রমে প্রান্তর ও নগরোপকণ্ঠ পটমণ্ডপে ও হরিদ্বর্ণ পল্লবাচ্ছাদিত কুটীরে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। নাগরিকগণের কথোপকথনে জানিতে পারিলাম যে, দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে জনসঙ্ঘের একপ্রাণীও নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। দেখিলাম, প্রান্তরে নূতন নগর বসিয়াছে, রাজপুরুষগণ রাজপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, পথিপার্শ্বে—পটমণ্ডপে বা সামান্য বস্ত্রাচ্ছাদনে অসংখ্য বিপণি বসিয়াছে, ক্রেতারও অভাব নাই। নানাস্থান হইতে রন্ধনের ধূম উত্থিত হইতে লাগিল। জনসঙ্ঘ দেব-দর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়া উৎসবানন্দে উন্মত্ত হইল। বেষ্টনের বহির্দ্দেশে পুষ্পবিক্রেতৃগণের বিপণি। দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যে তাহাদিগের সঞ্চিত পুষ্পরাশি বিক্রীত হইয়া গেল, দিবাবসানের পূর্ব্বে আর তাহাদিগের পণ্য-সংগ্রহ হইল না। স্তূপের পূর্ব্ব তোরণ হইতে নগরদ্বার পর্য্যন্ত প্রধান রাজপথ। এই পথে পুষ্পবিক্রেতাদিগের, পরে সুরা ও তাম্বূল বিক্রেতাদিগের বিপণি। দেবার্চ্চন সমাপ্ত হইলে নগরবাসিগণ যেন মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক হইয়া উঠিল; স্তূপবেষ্টনী হইতে বহির্গত হইয়াই দলে দলে আসব পানে ধাবমান হইল। পণ্য-শালায় প্রবেশ করিয়া পূর্ণ পাত্র পান, বাহিরে আসিয়া তাম্বূল ক্রয় ও তাম্বূল বিক্রেত্রীর সহিত হাস্যপরিহাস, কণ্ঠ শুষ্ক বোধ হইলে পুনরায় আসবের বিপণিতে প্রবেশ, এই কর্ম্মেই বোধ হয় অধিকাংশ নাগরিক দিনযাপন করিয়াছিল। নাগরিকগণ উৎসবের দিন যে পরিমান সুরা গলাধঃকরণ করিয়াছিল, তাহাতে সপ্ত শত বর্ষ পরে হইলে তাহাদিগকে হূণজাতির সহিত তুলনা করিতাম। বৃক্ষতলে কোন স্থানে বারনারীগণ যন্ত্র-সংযোগে নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়াছে; তাহাদিগের কম্পিত কলেবর ও রক্তনেত্র কাদম্বের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। উৎসবের জন্য শৌণ্ডিকগণ বোধ হয় কদম্ববৃক্ষের কাণ্ড পর্য্যন্ত বকযন্ত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। কোন স্থানে কোন বিলাসী নাগরিকের বিশাল পটমণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। উৎসবের দিবসে নৃত্যগীত ও হাস্যকোলাহলে বস্ত্রাবাস পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছে, সুরার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। পথে দলে দলে নাগরিক ও নাগরিকাগণ অর্চ্চনান্তে স্নানার্থ নদীতীরে চলিয়াছে। নদী-

বক্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ জলযান, নানাভরণ ভূষিত হইয়া মহোৎসবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নদীবক্ষে উৎসবের স্রোত সমভাবে প্রবাহিত, নদী-তীরের পথ নাগরিকগণের পাদপেষণে কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষুদ্র নদীর জল বহু লোকের সমাগমে মলিন হইয়া উঠিয়াছে। নদীবক্ষেও ক্ষেপণী হস্তে উৎসব-বিহ্বল তরুণ ও তরুণী, বৃদ্ধ ও বালক। নদীর সান্নিধ্যে বৃক্ষতলে কোন স্থানে চীবরধারী ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা প্রদান করিতেছেন, মুণ্ডিতশীর্ষ উপাসক ও উপাসিকাগণ "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আজীবনসঞ্চিত কলুষরাশি ক্ষয়ের চেষ্টা করিতেছেন। কোন স্থানে স্থবির ও ত্রৈপিটকোপাধ্যায়গণ অভিধর্ম্ম কোশ ব্যাখ্যা ও অভিধর্ম্ম বিভাষা শাস্ত্রের কূটতর্ক লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন। এইরূপে দিবসের তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রহরের মধ্যে উৎসব ক্ষণেকের জন্ত স্থগিত হইল, সকলেই আহারের চেষ্টায় ব্যস্ত হইল। সুবৃহৎ পটমণ্ডপে রাজা ও রাজ্ঞীগণ সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘের আহারের আয়োজন করিয়াছেন। মর্য্যাদা-নির্ব্বিশেষে ভিক্ষু ও স্থবিরগণ ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, রাজা, বৃদ্ধ মহাস্থবির ও নবাগত শ্বেতাঙ্গপুরুষ তখনও অভুক্ত অবস্থায় আছেন, তাঁহারা ভোজন-ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ভিক্ষুগণের আহার শেষ হইলে সকলে পুনরায় স্তূপ-বেষ্টনীর মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তখন দিবাকর অস্তমিতপ্রায়। ইতোমধ্যে পরিচারকগণ আমাদিগের পুষ্পসজ্জা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, নানাবিধ কাচ ও স্ফটিকনির্ম্মিত দীপ ও পাত্র আনীত হইয়াছে, কারণ সন্ধ্যাসমাগমে স্তূপে দীপোৎসব হইবে। ক্রমে সমগ্র স্তূপ-বেষ্টনী ক্ষুদ্র প্রদীপমালায় সজ্জিত হইল, স্থানে স্থানে উল্কাশ্রেণী সন্নিবিষ্ট হইল, বেষ্টনীর চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবার জন্ত স্তূপীকৃত ইন্ধন সংগৃহীত হইল। একে একে সপরিবারে সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ সুসজ্জিত হইয়া বেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; নানারত্ন-খচিত, সর্ব্বাভরণভূষিতা, বিচিত্রবেশধারিণী পুরাঙ্গনাগণের একত্র সমাবেশে ভীষণাকার পাষাণবেষ্টনী পুনরায় যেন কুসুমসজ্জায় সজ্জিত হইল।

সন্ধ্যাসমাগমে সমগ্র প্রান্তর আলোকমালায় ভূষিত হইল, প্রতি পটমণ্ডপে, স্কন্ধাবারে, প্রতি পর্ণকুটীরে প্রদীপশ্রেণী প্রজ্জ্বালিত হইয়া উঠিল। প্রান্তরের স্থানে স্থানে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বালিত হইল। রাজপুরুষগণের আদেশে প্রান্তরের বৃক্ষগুলি পর্য্যন্ত আলোকমালায় সজ্জিত করা হইয়াছিল,স্তূপের ও বেষ্টনীর আলোক গুলি প্রজ্জ্বালিত হইলে মনে হইল, যেন চক্রাকারে ঘূর্ণ্যমান জ্যোতিষ্কমণ্ডল

ইতস্ততঃ উল্কানিক্ষেপ করিতে করিতে নগরপ্রান্তে প্রান্তরমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দীপোৎসবের সহিত উৎসবের স্রোত প্রবল হইয়া উঠিল, সুরা ও তাম্বুলের বিপণিতে প্রবেশলাভ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। রজনী-কালে আলোকমালা ও জনসঙ্ঘের কোলাহলের ভয়ে নিশাচরগণ বহুদূরে পলায়ন করিল। সন্ধ্যা অতীত হইলে রাজা অগরাজু মহিষীসমভিব্যাহারে স্তুপের গর্ভ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। গর্ভমধ্যে মহাস্থবির ও নবাগত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ পূর্ব্ব হইতে আসীন ছিলেন। রাজা ও রাজ্ঞীগণ আসনগ্রহণ করিলে নবাগত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সকলকে সম্বোধন করিয়া যাহা কহিলেন তাহা হইতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল।

তিনি বলিলেন, মহারাজ প্রিয়দর্শী ত্রিংশদ্বর্ষকাল চেষ্টা করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে যত স্থানে ভগবান শাক্যের শরীর ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া পাটলীপুত্রে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রিয়দর্শীর দেহাবসানের পর তথাগতের শরীর-দর্শন মগধবাসী ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। আমরা বহু চেষ্টায় উদ্যান প্রদেশে একটি শরীর-নিধান হইতে কিয়দংশমাত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। মৌর্য্য রাজবংশের অধঃপতনের পর যখন বন্যার স্রোতের ন্যায় শকতাড়িত যবনজাতি বাহ্লীক হইতে আসিয়া কপিশা ও উদ্যান অধিকার করিয়াছিল, তখনও শরীর-গর্ভ অনেক চৈত্য স্তূপাদি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কারণ যবনগণ তখনও সদ্ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হয় নাই বা এতদ্দেশবাসিগণের সহিত সহানুভূতি করিতে শিক্ষা করে নাই। অধুনা যবনগণ এতদ্দেশীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিতে শিখিয়াছে, সুতরাং বিদেশীয়গণের অধিকারে সদ্ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সদ্ধর্ম্মের উন্নতি অতিঅল্পকালমাত্র আরব্ধ হওয়ায় তাহার বাহ্য লক্ষণ এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। সদ্ধর্ম্মের অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হইলে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, হয়ত তাহাও সংগ্রহ করিতে পারিতাম না। তক্ষশিলা মহা বিহারের অধিকারে ত্রিংশদ্বর্ষ যাপন করিয়া প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছি, তক্ষদত্তের পুত্র সিংহদত্তকে শতদ্রুনদীতীর হইতে সুবস্তুনদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত সকলেই কৃপা দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন ও বিশ্বাস করিয়া থাকেন। মৈত্রেয়নাথের অনুকম্পাবলে আমি গৌতমের শরীরাংশ লাভে সমর্থ হইয়াছি। মহারাজ, যিনি আপনার নগরে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি আর্য্যাবর্ত্তে মহাস্থবিরগণের স্থবির অর্হৎ পাদ ও বোধিসত্বপাদ।

অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী অবনতির পরে সদ্ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

যাঁহার অঙ্গুলি-হেলনে আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মের প্রতি, বুদ্ধের প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি বিশ্বাসিগণের সুযুপ্ত মমতা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি মৌর্য্যাধিকারকালে মহাসঙ্ঘের প্রকৃত গৌরব দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারই চেষ্টায় এই মহানুষ্ঠান সফল হইয়াছে। তিনি সমগ্র বৌদ্ধ জগতের প্রণম্য। তাঁহারই আদেশে আমি তক্ষশিলা হইতে তথাগতের শরীরাংশ লইয়া শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্তে আগরাজুর রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহারই আদেশে যবন রাজ্য হইতে যবন শিল্পী প্রেরিত হইয়াছে এবং তাঁহারই আদেশে সত্য ধর্ম্মে বিশ্বাসিগণ প্রাণপণ শক্তিতে স্তূপ-নির্ম্মাণকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। মহাস্থবির নবাগত শ্বেতাঙ্গ পুরুষের বাক্যে লজ্জিত হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা অগরাজুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনি তক্ষদত্তপুত্র সঙ্ঘস্থবির সিংহদত্তের প্রকৃত পরিচয় অবগত নহেন। অদ্য যিনি তথাগতের শরীরভার বহন করিয়া তক্ষশিলা হইতে আটবিক মহাকোশলে আসিয়াছেন, তিনি এককালে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যভাগের অধিকারী ছিলেন। বিতস্তানদীতটে ইঁহারই পূর্ব্বপুরুষ নবাগত যবনরাজের অব্যাহত গতি প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিজিত হইয়াও যিনি পুরুবংশের গৌরবরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি সিংহদত্তের পূর্ব্বপুরুষ। শকতাড়িত যবনপ্লাবনে যখন সমগ্র পঞ্চনদে আর্য্যাধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখন স্বাধিকারচ্যুত হইয়া সিংহদত্ত প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর ত্রিংশদ্বর্ষকাল অতীত হইয়াছে, এখন সিংহদত্ত তক্ষশিলা সঙ্ঘারামের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমি যখন তীর্থ-পর্য্যটনে টক্কদেশে গিয়াছিলাম, তখন সিংহদত্ত শিশু; তিনি পৌরবজাতির অগ্রণী তক্ষদত্তের একমাত্র পুত্র। কুমারপাদ সিংহদত্তের বয়ঃক্রম এখন ষষ্টি বর্ষের অধিক হইবে। সঙ্ঘে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি যবনরক্তে শতদ্রুতীর হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত প্লাবিত করেন নাই বটে, তিনি পৌরবজাতির সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপী অধিকারচ্যুত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সমগ্র পঞ্চনদ আজ তাঁহার যশঃসৌরভে পরিপূর্ণ। সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহাকে অন্যবিধ বিজয়গৌরবের জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আসুরিক বলে যবনের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি মানসিক বলে সমগ্র যবনজাতিকে পদানত রাখিয়াছেন। যাহারা সাকেত ও মাধ্যমিক পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছে, তাহারা অবশেষে তক্ষশিলায় সিংহদত্তের পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। কপিশা হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত, গান্ধার হইতে শতদ্রুতীর পর্য্যন্ত এই

তরুণ মহাস্থবিরের মানসিক বলে বিজিত হইয়াছে। আজ সদ্ধর্ম্মের উন্নতির অঙ্কুর-মাত্র দেখা দিয়াছে, আমি শতাধিক বর্ষকালব্যাপী ঘটনাসমূহ লক্ষ্য করিয়াছি। অধিকতর উন্নতির সময় অদূরবর্ত্তী। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সূচনায় আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমপ্রান্তে যে মেঘ দৃষ্ট হইয়াছিল, মৌর্য্যরাজ্যের অবসানে সেই মেঘোৎসৃষ্ট প্লাবনে মুমূর্ষু সঙ্ঘে পুনরায় বলসঞ্চার হইয়াছে। পুনরায় পশ্চিমপ্রান্তে মেঘ দেখা দিয়াছে, কুরুবর্ষে আর্য্যজাতির ও বাহ্লীকে যবনজাতির অধিকার লুপ্ত হইয়াছে, উত্তরমরু হইতে সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় শকজাতি আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরখণ্ড আচ্ছন্ন করিয়াছে। ক্ষণেকের জন্য মহানদী শকপ্লাবন রুদ্ধ করিয়াছে। বাধাপ্রাপ্ত হইয়া স্রোতের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, যেদিন এই স্রোতোবেগ বন্ধনমুক্ত হইবে, সেই দিন ইহা অবাধগতিতে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থান প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। বন্যার গতি যবনপ্লাবনের ন্যায় শতদ্রুতীরে রুদ্ধ থাকিবে না, ইহার বেগ প্রবলতর ; প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা প্লাবনে ভাসিয়া যাইলেও যাইতে পারে ; যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে মহদুপকার সাধিত হইবে। কারণ, মরুবাসী এই সকল জাতি যখন প্রাচীন আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন তদ্দেশের আদিম অধিবাসিগণ যদি একেবারে অভিভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই পুনরায় আধিপত্যের কিয়দংশ লাভ করিতে সমর্থ হয়। মরুবাসী বর্ব্বরগণ সত্বরই নূতন দেশের প্রাচীন সভ্যতার নিকট নতশীর্ষ হইয়া থাকে। যদি সদ্ধর্ম্মের অঙ্কুরমাত্রও পঞ্চনদে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে কালে সমগ্র শকজাতি ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছি, মানবজীবনের পরিমাণ অতিক্রম করিয়াছি, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কিন্তু আমি অনুভব করিতে পারিতেছি যে, সদ্ধর্ম্মের উন্নতির দিন আসিতেছে। সে দিন সুদূর নহে, সদ্ধর্ম্মের নবীন গৌরব মৌর্য্যাধিকারকালের লুপ্তপ্রায় গৌরবাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইবে। আমার জীবনের কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, আমার জন্ম অদ্যাপি শেষ হয় নাই, সুতরাং আমাকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, আমার দেহ-পরিবর্ত্তনের সময় আসন্নপ্রায়। কিন্তু যাহারা থাকিবে তাহারা দেখিবে, সদ্ধর্ম্মের পুনরুত্থানকাল সমাগতপ্রায়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও সদ্ধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাতে আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, আর্য্যাবর্ত্তে এমন বল নাই যে, তৎকর্ত্তৃক শকজাতির আক্রমণের দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রতিরুদ্ধ হয়। শিক্ষার ও দূরদর্শিতার অভাবে আর্য্যাবর্ত্তের রাজগণ আসন্ন বিপৎপাতসম্বন্ধে চিন্তাশূন্য। যখন শকজাতি আক্রমণ করিবে, তখন রাজন্যবর্গ একে একে সকলেই বিনষ্ট

রহিলেন। ইহার পর মহাস্থবির তুষ্ণীভাব ধারণ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সিংহদত্ত কহিলেন, মহারাজ, সযত্নরক্ষিত তথাগতের শরীরাংশ আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। যদি কোন দিন রাজ্যের দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, যদি আপনার রাজ্যে আপনার রাজ্যবাসিগণ তথাগতের ধর্ম্মে বীতরাগ হয়, তাহা হইলে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে,আপনি বা আপনার উত্তরাধিকারিগণ আমাদিগের শরীরাংশ আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন। তক্ষশিলা মহানগরীর মহাবিহারের অধ্যক্ষ যিনি থাকিবেন, তিনি সাদরে ইহা গ্রহণ করিবেন। সিংহদত্ত কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, যেদিন নগরবাসিগণ তথাগতের ধর্ম্ম বিস্মৃত হইবে, তাহার বহুপূর্ব্বে হূণগণের পরশুর আঘাতে তক্ষশিলার ভিক্ষুগণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, বিশাল মহাবিহারের অগ্নিদগ্ধ ভস্মাবশেষ বায়ুভরে সিন্ধুতীরে উপনীত হইবে; যেদিন শরীরনিধানের উপরে মহাভার স্তূপ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সেদিন তক্ষশিলা নগরীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিবে না; খস, হূণ দরদবংশজাত মেষপাল মহাবিহারের ধ্বংসবিশেষের উপরে সানন্দে মেষচারণ করিবে; তক্ষশিলা নগরীর নাম পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে শ্রুত হইবে না।

রাজা, সিংহদত্ত, মহাস্থবির ও রাজ্ঞীগণ গর্ভগৃহের বাহিরে আসিলে সশব্দে শিলাখণ্ডের স্বস্থানে আসিল। তখন উৎসবামোদ থামিয়া আসিয়াছে, দীপমালা নির্ব্বাণোন্মুখ, হিমকণস্পৃষ্ট শীতল বায়ু নিদ্রালস নাগরিকগণকে স্পর্শ করিতেছে, অধিকাংশ ব্যক্তি নগরাভিমুখে ফিরিয়া চলিয়াছে; বিপণিশ্রেণী যেন ইন্দ্রজালবলে অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল সুরাপাতোন্মত্ত নাগরিক ও বারাঙ্গনাগণের দেহ মৃতদেহের ন্যায় পথে পথে লুণ্ঠিত হইতেছে। চিন্তাভারাবনতদেহে নিঃশব্দে সকলে রথারোহণে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবশিষ্ট প্রদীপগুলি পরিচারকগণ নির্ব্বাপিত করিল, যে সকল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইতে লাগিল। রক্ষিগণ ব্যতীত বিশাল প্রান্তর জনশূন্য হইয়া গেল। ক্রমশঃ বেগে বায়ু বহিতে লাগিল, অল্পক্ষণ পরে বৃষ্টি আরব্ধ হইল, পথে শয়ন করিয়া যাহারা তখনও উৎসবামোদ ভোগ করিতেছিল,তাহারা আশ্রয়ানুসন্ধান করিতে বাধ্য হইল। ঝটিকা ও বৃষ্টির মধ্যে আর্ত্তিমিদোর অনাবৃতদেহে স্তূপবেষ্টনীর দক্ষিণ তোরণে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল, মুষলধারে বৃষ্টিপতিত হইতে লাগিল। কাহার প্রতীক্ষায় যবনশিল্পী নিদ্রা ও আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহা আর বুঝা গেল না।

——— শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু-মিলন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবক-যুবতী।

সৈনিক পরদিবস প্রত্যুষে যাত্রা করিবেন বলিয়া গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি অশ্বশালায় গমন করিলেন। তাঁহার অশ্ব প্রভুর পদশব্দ শুনিয়া আনন্দে হ্রেষারব করিয়া উঠিল। সৈনিক তাহার গ্রীবায় করতল সংস্থাপিত করিয়া তাহাকে আদর করিলেন; অশ্ব সম্মুখের দক্ষিণ পদে ভূমি খননের চেষ্টা করিতে লাগিল।

অশ্ব সজ্জিত করিয়া গৃহ ত্যাগ করিবার সময় সৈনিক দেখিলেন, গৃহস্বামী দ্বারে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সৈনিক তাঁহার নিকট আবার বিদায় লইয়া অশ্বারোহণ করিলেন। অশ্ব রাজধানীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

গ্রামের ও রাজধানীর মধ্যে একটি বৃহৎ প্রান্তর ব্যবধান। রাজপথ সেই প্রান্তরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে অশ্ব গ্রাম অতিক্রান্ত করিয়া প্রান্তরে উপনীত হইল। তখন কেবল দিবালোক ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বসূচনা হইতেছে। পথের দুই পার্শ্বে তরুশ্রেণী। মধ্যে মধ্যে দুই পার্শ্বের বৃক্ষে বদ্ধ উর্ণনাভের বিস্তৃত জাল—রজনীর মধ্যে রচিত; তাহাতে শিশির বিন্দু বদ্ধ হইয়া আছে। জাল অশ্বারোহীর উষ্ণীষে ও মস্তকে বাধিতে লাগিল—জড়াইয়া যাইতে লাগিল। প্রকৃতির মূর্ত্তি স্নিগ্ধ—শান্ত। তখনও প্রান্তর-দৃশ্যে রজনীর স্নিগ্ধ প্রশান্তি-চিহ্ন বিদ্যমান। তখনও প্রান্তরে লোক দেখা। দেয় নাই,—পথ জন-শূন্য। সেই পথে অশ্বচালনা করিয়া সৈনিক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিশায় উরগ পথ পার হইয়া গিয়াছে;—ধূলির উপর তাহার গমনচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিহগ আহার সন্ধানে ফিরিয়া ধূলির উপর চরণ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগন রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তাহার পর সে রক্তাভা গাঢ় হইতে ফিকা হইয়া আসিল;—সূর্য্যোদয় হইল।

সৈনিক প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-রাজ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের দিকে তাঁহার মনোযোগ ছিল না। তিনি হৃদয়মধ্যে অন্তর্বিধ সৌন্দর্য্যের চিন্তায় বিভোর ছিলেন।

সৈনিক গত রজনীতে কথায় কথায় অবগত হইয়াছিলেন, শক্ত সিংহ দুহিতা রেবার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার তিন পুত্র—এক কন্যা; কন্যা বড় আদরের। তিনি কন্যার বিবাহের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছেন; কিন্তু মনোমত পাত্র পাইয়া উঠিতেছেন না। তিনি স্থির করিয়াছেন, কন্যার বিবাহ দিয়া কোন তীর্থে যাইয়া ধর্ম্মালোচনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু কন্যার বিবাহ না দিয়া তিনি বাহির হইতে পারিতেছেন না।

সৈনিক যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই ভাবনা বাড়িতে লাগিল,—চিত্ত ততই চঞ্চল হইতে লাগিল। সৈনিক মনে করিতেছিলেন, এই রমণীরত্নলাভ ব্যতীত জীবন ব্যর্থ হইবে। তাঁহার হৃদয়ের সকল বাসনা সেই একই কামনায় পর্য্যবসিত হইতেছিল। সৈনিক ভাবিতে ভাবিতে একান্ত অন্যমনস্ক ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন।

সহসা সৈনিকের সুশিক্ষিত অশ্বের দ্রুত গতি মন্দীভূত হইল। অশ্বের গতি পরিবর্ত্তন সৈনিক যেন চমকিয়া উঠিলেন। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অশ্ব প্রান্তর, নগরোপকণ্ঠ অতিক্রান্ত করিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছে। পথ আর জনশূন্য নহে; তাই অশ্ব মন্দ গমনে অগ্রসর হইতেছে। সৈনিক দেখিলেন, নাগরিকগণ কেহ কেহ তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে। তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া নগরের পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে সৈনিক গৃহে আতিথ্য-স্বীকার করা অবধি ভদ্রার আর বিশ্রাম ছিল না। সে কেবল সৈনিককে লক্ষ্য করিতেছিল। রেবার ভাব লক্ষ্য করিয়া সে কেবল কিসে সৈনিকের সহিত তাহার বিবাহ সম্ভব হইবে, তাহাই ভাবিতেছিল।

শক্তসিংহের বৈবাহিক যখন সৈনিকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তখন ভদ্রা দ্বারান্তরাল হইতে শুনিতেছিল। পরদিন প্রভাতে সে পুরোহিতের গৃহে গমন করিল। পুরোহিতের কন্যা তাহার সমবয়স্কা, উভয়ে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও ছিল। সে মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট যাইত। আজ কথায় কথায় সে রেবার কথা উত্থাপিত করিল; বলিল, শক্ত সিংহ তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া পুরোহিতপত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুপাত্রের সন্ধান পাইয়াছেন কি ?"

তখন ভদ্রা বলিল, "একটি সম্বন্ধ উপস্থিত। কিন্তু তথায় বিবাহ হইতে পারে কি না, জানা হয় নাই।" এই কথা বলিয়া সে সৈনিক আপনার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই পরিচয়ের কথা বলিল।

শুনিয়া পুরোহিতকন্যা বলিলেন, "সেজন্য চিন্তা কি ? বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে।"

ভদ্রা এই জন্যই আসিয়াছিল। সে বলিল, "বটেই ত।"

পুরোহিতকন্যা ভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া পিতার নিকট গমন করিলেন। পুরোহিত তখন 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ করিতেছিলেন।

কন্যা পিতাকে বলিলেন, "বাবা, ভদ্রা তোমার কাছে আসিয়াছে।"

পুরোহিত মুখ তুলিলেন। ভদ্রা তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি মনে করিয়া আসিয়াছ ?"

ভদ্রা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কন্যা পিতাকে বলিলেন, "এক স্থান হইতে রেবার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে। সেস্থানে বিবাহ হইতে পারে কি না, ভদ্রা তাহাই জানিতে আসিয়াছে।"

তখন ভদ্রা সৈনিক আপনার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, পাত্রের সেই পরিচয় দিল।

পুরোহিত মনোযোগসহকারে ভদ্রার কথা শুনিলেন।

অল্পক্ষণ বিবেচনার পর তিনি বলিলেন, "এ সম্বন্ধ অতি উত্তম। অন্য বিষয়ে অভিপ্রেত হইলে এ পাত্রে কন্যাসমর্পণ বাঞ্ছনীয়।"

তাহার পর পুরোহিত শক্ত সিংহের ভবনে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন, "অদ্য ও কল্য দুই দিন আমি ব্যস্ত আছি। পরে যাইয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব। তুমি এ সম্বন্ধে আমার মত সকলকে জানাইও।"

পুরোহিতকে পুনরায় প্রণাম করিয়া ভদ্রা বিদায় হইল।

কিন্তু ভদ্রা তখনই গৃহে ফিরিতে পারিল না। পুরোহিতকন্যা নানা কথায় তাহাকে আবদ্ধ রাখিলেন। ভদ্রা তখন গৃহে ফিরিতে বড় ব্যস্ত। তাহার মনের উল্লাসে যাহার উল্লাস, তাহাকে এ সংবাদ না দিয়া কি থাকা যায় ?

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রা গৃহে ফিরিল; ফিরিয়াই সে রেবাকে বলিল, "আজ সুসংবাদ আনিয়াছি।"

রেবা চাহিয়া দেখিল, ভদ্রার মুখে ও চক্ষুতে আনন্দ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সে বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

ভদ্রা বলিল, "আমি পুরোহিত মহাশয়ের গৃহ হইতে আসিতেছি।"

রেবা অধিকতর বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"সৈনিকের পরিচয় দিয়া—সৈনিক তোমার যোগ্য পাত্র কি না, তাহাই জানিতে গিয়াছিলাম।"

বলিয়া ভদ্রা হাসিতে লাগিল। রেবা তাহার ভাব দেখিয়া পুরোহিতের মত উপলব্ধি করিল বটে, কিন্তু সন্দেহ মিটিল না। আবার মুখ ফুটিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা করে।

ভদ্রা তাহা বুঝিল, বলিল, "সংবাদ ভাল। তিনি বলিলেন, এ সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয়।"

রেবা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

ভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "শুভ সংবাদে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলে যে ?"

রেবা বলিল, "তুমি ত ব্যবস্থা আনিলে। তাহার পর ?"

"সে জন্য তোমায় ভাবিতে হইবে না। ব্যবস্থা আনিবার পূর্ব্বেও যে সব করিয়াছে, পরেও সে-ই সব করিবে।"

এই কথা বলিয়াই ভদ্রা চলিয়া গেল ; রেবা ডাকিল—সে ফিরিল না।

রেবার জননী রন্ধনশালায় রন্ধনে ব্যাপৃতা ছিলেন। ভদ্রা সোৎসাহে তাঁহার কার্য্যে সহকারিতা করিতে লাগিল। সে সেই সময় কায করিতে করিতে সৈনিকের সহিত রেবার বিবাহের প্রস্তাব করিল। রেবার জননী প্রথমে তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। তখন কথায় কথায় সে রেবার অভিপ্রায়ের আভাস দিল। জননীর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ; তিনি তখনই মনে করিলেন, যেরূপেই হউক, এ বিবাহের সংঘটন করিতে হইবে। কন্যার সুখের অপেক্ষা আর কিছুই বড় নহে।

সেই দিন মধ্যাহ্নে আহারের পর শক্ত সিংহ যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন রেবার জননী তাঁহার নিকট যাইয়া এই প্রস্তাবের উত্থাপন করিলেন।

শক্ত সিংহ হাসিয়া বলিয়া বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ ? কে সে সৈনিক ? তাহার পরিচয় কে জানে ?"

রেবার জননী বলিলেন, "সে ত আত্মপরিচয় দিয়াছে। সে ত বাঞ্ছনীয় পাত্র।"

শক্ত সিংহ বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন, বলিলেন, "সে ত বংশপরিচয়। অন্য পরিচয় কে জানে? সৈনিক বালক নহে; কন্যা কি সপত্নী-সম্ভাষণে যাইবে?"

এ কথা ত কাহারও মনে হয় নাই! রেবার জননী নির্ব্বাক্ হইলেন। ভদ্রা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে ছিল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে যেন দিবসের আলোক নিবিয়া গেল।

তখন—কিছুক্ষণ চিন্তার পর—রেবার জননী ভদ্রার নিকট রেবার অভিপ্রায়ের কথা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন।

শক্ত সিংহ শয়ান ছিলেন; উঠিয়া বসিলেন। ইহাই আদরের কন্যার অভিপ্রায়? তিনি ভাবিতে লাগিলেন। যেন বিষম চিন্তায় তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি বলিলেন, "তবে আমি সব সন্ধান লইব। রেবা যদি পতিপ্রেমে আবশ্যক হইলে সব দুঃখ ভুলিতে পারে, তবেই ভাল।"

সে সন্ধানের জন্য শক্ত সিংহকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইল না। তিন দিন পরে সৈনিক আবার তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। এ তিন দিন সৈনিক মন সংযত করিতে পারেন নাই,—কেবল আশঙ্কা-সহচর চিন্তায় চঞ্চল হইয়াছেন। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আজ শক্ত সিংহের নিকট কন্যাকর প্রার্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনিও জানিয়াছিলেন, শক্ত সিংহের কন্যাকে বিবাহ সামাজিক হিসাবে তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে।

শক্ত সিংহ বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর আবশ্যক কথা জানিবার জন্য তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সৈনিক পূর্ব্ব বারের মত আত্মপরিচয় দিলেন। তাহার পর শক্ত সিংহ তাঁহার সন্তানদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সৈনিক বলিলেন, "আমার কোন সন্তান নাই।"

"আজও সন্তান জন্মে নাই?"

"আমি অকৃতদার।"

"বিবাহে কি কোন বাধা আছে?"

"না।"

"তবে বিবাহ কর নাই কেন?"

"উপযুক্ত পাত্রীর অভাব। আমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত; আমার সন্ধানের সময় নাই।"

"উপযুক্ত পাত্রী পাইলে কি তুমি বিবাহ করিবে ?"

সৈনিক লজ্জা-নম্র ভাবে সম্মতি জানাইলেন।

তখন শক্ত সিংহ আপনার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

সৈনিক যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•:‡:•—

দুই ভ্রাতা।

রজনী কেবল পোহাইয়াছে ;—পশ্চিম গগনে হৃতকিরণ চন্দ্রের শ্বেত গোলক ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতেছে। রাজা একাকী অশ্বপৃষ্ঠে যাইতেছিলেন। গত রজনীতে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে অনতিবেগে ঝড়ও বহিয়া গিয়াছে। পার্ব্বতীর সঙ্কল্পিত অনাথ-আশ্রম নির্ম্মিত হইতেছিল। ঝড়বৃষ্টিতে তাহার কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না, রাজা তাহাই দেখিতে যাইতেছিলেন।

আজ পবন ধৌতধূলি—সুখ-স্পর্শ। পথিপার্শ্বে তরুরাজির পত্র হইতে সঞ্চিত ধূলি ধৌত হইয়া গিয়াছে—তাহাদের চিক্কণ শ্যামবর্ণ দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে গৃহগুলি ধূলিধূসর—বিবর্ণ দেখাইতেছিল, আজ তাহাদের মূর্ত্তি স্নিগ্ধ ও সুন্দর।

প্রকৃতির স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে রাজা অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি যখন নগর ছাড়াইয়া নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইলেন, তখন অদূরে অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অজয় সিংহ আসিতেছেন। তিনি অশ্ব নিশ্চল করাইলেন।

দেখিতে দেখিতে অজয় সিংহ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—সম্মুখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিয়া বিস্মিত ও সঙ্কুচিত হইলেন।

রাজা স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজয়, প্রত্যূষে কোথায় গিয়াছিলে ?"

অজয় সিংহের উত্তর দিতে সামান্য বিলম্ব হইল। সেই অত্যল্পকালমধ্যে তাঁহার হৃদয়ে যেন প্রবল ঝটিকা বহিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, ভ্রমণে গিয়াছিলেন বলিলে জ্যেষ্ঠ আর প্রশ্ন করিবেন না ; অসত্য বলিবেন কি ? জ্যেষ্ঠের নিকট মিথ্যা কহিতে অজয় সিংহের প্রবৃত্তি হইল না। মিথ্যা ভীরুর বড় সহজে

আইলে, বীরের ভক্ত সহজে আইসে না। তিনি বলিলেন, "গত রাত্রিতে প্রাসাদে ফিরিতে পারি নাই।"

রাজা বলিলেন, "রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; কোথায় আশ্রয় লইয়াছিলে?"

অজয়সিংহ প্রান্তরের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ প্রান্তরের পরপারস্থ গ্রামে শক্তসিংহ নামক একজন গৃহস্থের গৃহে।"

"প্রাসাদে যাও", বলিয়া রাজা অশ্বচালনা করিলেন।

অজয় সিংহ প্রাসাদাভিমুখগামী হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, অল্পদিনের ব্যবধানে তিন রাত্রি প্রাসাদ হইতে তাঁহার অনুপস্থিতির কথা রাজা অবগত ছিলেন।

রাজা কি ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার কথার উত্তর দিতে অজয় সিংহের ক্ষণস্থায়ী সঙ্কোচ তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

দেখিতে দেখিতে রাজার অশ্ব অনাথ-আশ্রমের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। রাজা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া চারিদিক্ পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত হইলেন। একজন ভৃত্য আসিয়া অশ্বটিকে লইয়া গেল।

যে স্থানে নগরোপকণ্ঠের সীমায় খরস্রোতা তরঙ্গিণী পর্ব্বতস্থ শিলায় শিলায় আঘাত করিয়া ফেনময় কলহাস্যে বহিয়া যাইতেছে, সেই স্থানে শিলাসঙ্কুল মনোরম স্থান বাছিয়া যুবরাজ অবস্থায় রাজা বিরাম-বাটিকা রচনার উদ্যোগ ও আয়োজন করিয়াছিলেন। গৃহের ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন হয়; যেন আর কোন কার্য্যেই তাঁহার আকর্ষণ ছিল না। লোকে তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইল; কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত কারণ জানিত না।

গৃহনির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত রহিল—প্রাচীরের প্রস্তরখণ্ড,—কারুকার্য্য-বহুল কার্ণিস,—ক্ষোদিত স্তম্ভ,—সব উপাদান পড়িয়া রহিল। অর্দ্ধগঠিত ভিত্তির উপর তৃণ জন্মিতে লাগিল—উপাদানসমূহ লতাগুল্মে আবৃত হইয়া গেল। লোক সেই লতাগুল্মবন দেখাইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিত—"এই রাজার বিরাম-বাটিকা।"

রাজা যখন পার্ব্বতীর নিকট অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তখন প্রথমেই এই স্থানের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। এই স্থানের কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। এই বিরাম-বাটিকা-নির্ম্মাণ-কল্পনা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া—অনেক ভাঙ্গা গড়ার পর গৃহের ও গৃহবেষ্টন উদ্যানের আদর্শ স্থির করিয়াছিলেন। সে গৃহ ও সে উদ্যান কল্পনানুযায়ী

সম্পন্ন করিতে তিনি কোন বিষয়ে ব্যয়কুণ্ঠ হয়েন নাই। ভাস্করকীর্ত্তি [illegible]; নানাবর্ণের মর্ম্মর প্রস্তর—কারুকার্য্যকমনীয় শিলাখণ্ড—সবই সংগৃহীত হইয়াছিল। উদ্যানের জন্য বহুবিধ তরু, লতা ও পক্ষী সংগ্রহ করিতে লোক বাহির হইয়াছিল। জলাশয়খননকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। যুবরাজের ইচ্ছা ছিল, রাজকার্য্যের পরিশ্রম ও রাজধানীর কোলাহল হইতে মধ্যে মধ্যে অবসর লইয়া এই বিরাম-বাটিকায় বিশ্রাম ভোগ করিবেন; পত্নীর সাহচর্য্যে—প্রেমচর্চ্চায় সুখলাভ করিবেন। সেই বাসনার উত্তেজনায় তিনি আপনার অনিন্দ্য সুন্দরী পত্নীর উপযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন।

এই সময় পত্নীর ব্যবহারে যুবকের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার ঊর্দ্ধগামী বাসনা ধূলায় লুটাইল; কঠোর বাস্তবের চাপে কোমল কল্পনা নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। যুবরাজ প্রতিদিন দুই তিন বার বিরামবাটিকার নির্ম্মাণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতেন। সেই গৃহের কল্পনা যেন তাঁহাকে ফণিনীর দৃঢ়পাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। এক দিন তিনি আর সেদিকে গমন করিলেন না; সকলে ভাবিল, তিনি হয় ত অসুস্থ—নহে ত কোন গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। যুবরাজ আর সে দিকে গমন করিলেন না—সে গৃহের সংবাদও লইলেন না।

কয় দিন পরে স্থপতি কয়টি বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইল। শুনিয়া তিনি যেন বিরক্ত হইলেন। শেষে সে আসিয়া কয়টি বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, "গৃহনির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ রাখ।"

স্থপতি বিস্মিত ও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

সেই দিন যুবরাজ আদেশ প্রচার করিলেন, বিরাম-বাটিকার নির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ থাকিবে। যাহারা সেই সুখকল্পনার সাফল্য-চেষ্টায় দিকে দিকে গিয়াছিল—তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে লোক প্রেরিত হইল।

লোক বলাবলি করিতে লাগিল, রাজারাজড়ার খেয়াল—এই আছে, এই নাই। যাহাদের অবসর অনন্ত, অর্থ অজস্র, জনবল অসাধারণ, তাহাদের কল্পনাও উদ্দাম—চিত্তও চঞ্চল।

যুবরাজের কর্ণেও সে সকল কথা উঠিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। হায়—তাঁহার দুঃখ কে বুঝিবে, তাঁহার হতাশার কে পরিমাণ করিবে, তাঁহার মর্ম্মবেদনার অংশ কে লইবে? তাঁহার এ অরুন্তুদ বেদনা জুড়াইবার স্থান নাই। এ বেদনার কথা তিনি কাহাকে বলিবেন? কে এই মরুভূমিতে স্নিগ্ধ সরসতার

সঞ্চার করিতে সমর্থ? তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ জ্বালা জুড়াইবার নহে— এ বেদনার ঔষধ নাই। সম্মুখে যদি আলোকলাভের আশা থাকে, তবে মানুষ সেই আশায় দূরপথ অন্ধকারে অতিবাহিত করিতে পারে। কিন্তু যাহার সে আশা নাই,—যাহার সম্মুখে,—নিকটে ও দূরে কেবল অন্ধকার সে কোন্ আশায় সেই চতুর্দ্দিকব্যাপী অন্ধকারে পথ অতিক্রান্ত করিবে? কিন্তু তাঁহাকে ত তাহাই করিতে হইতেছিল! সে চিন্তাও কি বেদনার কারণ!

রাজপুত্রের কর্ত্তব্যের অন্ত নাই। লোক দেখে, তাঁহার কায নাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অবসর ও নাই। লোক-সংসর্গ যখন ক্লেশের কারণ—আর্ত্ত আশা যখন নির্জ্জনে—গোপনে নয়ন-ধারায় কিছু শান্তি লাভ করিবার জন্ত ব্যাকুল হয় তখনও তাঁহার সকল কার্য্যেই লোক-সমাগম-বাহুল্য তাঁহাকে পীড়িত করে। সে সময় তাঁহার মনে হইত,—অতি দীন দুঃখীও তাঁহার অপেক্ষা সুখী,—সে নির্জ্জনে শান্তি লাভের চেষ্টা করিতে পারে, সে আপনি আপনার কার্য্যের নিয়ন্তা।

বিশ্রাম-বাটিকার নির্ম্মাণ-কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু সে ব্যথা রাজা ভুলিতে পারেন নাই। যে কণ্টক অহরহঃ বক্ষ ক্ষতবিক্ষত করে তাহাকে বিস্মৃত হওয়া কি সম্ভব? তাই সে দিন প্রথমেই তাঁহার সেই অসমাপ্ত কল্পনার কথা রাজার মনে হইয়াছিল।

এখন রাজাদেশে আবার সেই অসমাপ্ত কার্য্যের সমাপ্তির চেষ্টা হইতেছে। লতাগুল্মবন পরিষ্কৃত হইয়াছে; শৈবাল-সমাচ্ছন্ন স্তম্ভ—বালুকাবৃত মর্ম্মর— মৃত্তিকামলিন শিথাখণ্ড বাহির হইয়াছে। আবার শ্রমজীবিগণের কলরবে— যন্ত্রাদির শব্দে সেই স্থান মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার সৌধ নির্ম্মিত হইতেছে—জলাশয় খনিত হইতেছে—উদ্যান রচিত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে রাজা আবার তেমনই যত্নে কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

উদ্যানের এক পার্শ্বে—তরুরাজির শ্যাম পল্লবের অন্তরালে রুগ্ন, ব্যথিত ও অনাথদিগের জন্ত গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। আর পুরাতন ভিত্তির উপর সেই কল্পিত আদর্শে আশ্রমবাসিনীর বাস-গৃহ রচিত হইতেছে।

আশ্রমবাসিনীর জন্ত সেরূপ গৃহের প্রয়োজন কি? লোক বলাবলি করিতে লাগিল, রাজা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতেছেন না। তিনি আপনার সে কল্পনা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—তাহাই সফল করিতেছেন।

সত্য সত্যই রাজা অসীম যত্নে গৃহ-রচনা-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। যে কল্পনা যৌবনে একবার তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল,—প্রৌঢ়ে যেন সেই কল্পনা

আবার তাঁহাকে তেমনই ভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন আর তাঁহার পূর্ব্বের মত অবসর নাই; তিনি রাজকার্য্যে ব্যস্ত। তথাপি তিনি গৃহ-পর্য্যবেক্ষণের সময় করিয়া লয়েন। যাহার কায যত অধিক, সে ইচ্ছা করিলে তত অধিক কার্য্যের অবসর করিয়া লইতে পারে। বিশেষ সে সকল কার্য্যে যদি তাহার সত্য সত্যই অনুরাগ থাকে, তবে কখন তাহার অবসরের অভাব হয় না।

আজ রাজা যে সময় পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে আসিয়াছিলেন, সে সময় শ্রমজীবীরা কার্য্য আরম্ভ করে নাই; চারিদিক নিস্তব্ধ—কেবল বৃক্ষশাখায় বিহগকূজন—কেবল অদূরবর্ত্তী তটিনীর কলকল ধ্বনি।

রাজা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি তটিনীতীর-বর্ত্তী উদ্যানসীমায় উপনীত হইলেন। সেই স্থানে এক বৃহৎ শিলাখণ্ড নিপতিত ছিল। কোন্ দূর অতীত কালে কোন্ তুষারবাহ এই শিলা দৈত্যকে বহন করিয়া আনিয়াছিল? তখন আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর রূপ কিরূপ ছিল? তখনও ভূমি নরবাসের যোগ্য নহে। তখন এ ভূমি কোন্ জাতীয় জীব কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল—তাহা কে বলিতে পারে? এই শিলাখণ্ড সেই অতীত যুগের নিদর্শন।

রাজা সেই শিলাখণ্ডের উপর উঠিলেন। সম্মুখে নদী—তাহার পরপারে উচ্চাবচ ভূমি ক্রমে দূরে চক্রবালে বিলীন হইয়াছে। রাজা সেই শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন; নির্জ্জনে পূর্ব্বকথা ভাবিতে লাগিলেন। মানুষের জীবন কি কেবল হতাশার ভারমাত্র?

রাজা ভাবিতে লাগিলেন,—এই বিশ্রাম-বাটিকা এত দিন তাঁহারই প্রেমসুখ-কল্পনার মত অসমাপ্ত—অব্যবহৃত উপাদানের সমষ্টিমাত্র ছিল। আজ সে গৃহ সম্পূর্ণ হইতেছে। আর তাঁহার সেই প্রেমসুখকল্পনা!—

রাজা আপনার হৃদয়ের দিকে চাহিলেন; চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন—এ কি? তিনি ভীতি-তাড়িত জনের মত সত্বর সেই স্থান হইতে আসিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন; দ্রুত অশ্ব-চালনা করিয়া প্রাসাদে ফিরিলেন।

সেই দিন রাজা মন্ত্রীকে অজয় সিংহের প্রাসাদে অনুপস্থিতির কথা বলিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, রাজভ্রাতার মৃগয়াপ্রিয়তা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "বহুদিন অতিক্রান্ত-যৌবন হইয়া আপনি যুবক চরিত্রের অভিজ্ঞতার বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন। মৃগয়াপ্রিয়তার মানুষকে নিত্য একই পথে লয় না—একদিকে কি প্রতিদিনই মৃগয়া করিতে রাজি হইয়া যায়?"

তাহার পর রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে কি পরামর্শ হইল।

সমালোচনা।

বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?*

"অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ"—ম্যালেরিয়ায় প্রপীড়িত,—প্লেগ, বিসূচিকা প্রভৃতি বহু ব্যাধিবিষে জর্জ্জরিত বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ ভাবনা বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাভাবিক। সম্প্রতি সরকারী কাগজপত্রের, বিশেষতঃ আদমসুমারীর বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ের বিচারে অনেকের চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় কেহ কেহ আপনাদের পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারের বর্ণে সত্যকে রঞ্জিত দেখিয়া তাহার স্বরূপনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছেন, এবং আপনাদের ঈপ্সিত সংস্কারকেই কল্পিত ব্যাধির অমোঘ ভেষজ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এই আগ্রহের আতিশয্যে কেহ কেহ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা প্রভৃতির প্রতি অধিক দৃষ্টি না দিয়া সমাজ-সংস্কারকেই প্রধান্য দিতেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের আরম্ভে দেউস্কর মহাশয় বলিয়াছেন,—"একটা রব উঠিয়াছে—বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের আসন্ন কাল উপস্থিত। বঙ্গে দিন দিন মুসলমানের যেরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি ও হিন্দুর যেরূপ বংশক্ষয় ঘটিতেছে, তাহাতে বাঙ্গালা দেশ হইতে হিন্দুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে অধিক দিন লাগিবে না; বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ মুমূর্ষু জাতিতে পরিণত হইয়াছে।"—ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল) এই মতের সমর্থক। তিনি প্রবন্ধে ও পুস্তিকায় এই মত ঘোষিত করিয়া সমাজে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার কারণ-নির্ণয়ের চেষ্টা ও ব্যাধির ঔষধ বিষয়ে ইঙ্গিতও করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুপণ্ডিত, শ্রমশীল, বহুদর্শী। কিন্তু তিনি পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারবশে ও আদমসুমারীর বিবরণ হইতে তথ্যসংগ্রহে অনবধানতাহেতু যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, সেই সকল ভ্রমনির্দ্দেশই দেউস্কর মহাশয়ের পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাঁহাকে যে জটিল সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই আলোচ্য। তাঁহার পুস্তকের প্রতিবাদভাগ অকিঞ্চিৎকর—এমন কি, অনাবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার রচনায় বাঙ্গালী হিন্দু

* বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?—শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত—কলিকাতা, ৭১।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য পাঁচ আনা।

জাতির যে চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই মনোযোগ-সহকারে দেখা কর্ত্তব্য।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত এই যে, সামাজিক ব্যবস্থার দোষে—জাতিভেদ প্রভৃতির জন্য বাঙ্গালী হিন্দু ধ্বংসোন্মুখ। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ জাতিভেদ প্রভৃতি কতকগুলি ব্যবস্থার উপরই প্রতিষ্ঠিত। সেগুলির বিলোপ করিয়া হিন্দুসমাজের উন্নতি-সাধন-চেষ্টা শকুন্তলাকে বাদ দিয়া 'শকুন্তলা'র কাহিনী-কথন-চেষ্টারই মত হইবে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সকল বিষয়ে হিন্দু মুসলমানে তুলনায় সমালোচনা করিয়া মুসলমানকে জয়মাল্য-দান করিয়াছেন, সে সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেকের মতভেদ অনিবার্য্য। বিধবা-বিবাহের উপযোগিতা সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, যে দেশে বালিকামাত্রেরই বিবাহ অত্যাবশ্যক সংস্কার, সে দেশে বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন বা অল্পপ্রচলনকে জাতীয় ধ্বংসের কারণ-মধ্যে গণ্য করা সমীচীন নহে। বিধবা-বিবাহের বহুল প্রচলনে কুমারীর সংখ্যাবৃদ্ধি অনিবার্য্য। কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতের কৌলীন্য প্রথা-সম্বন্ধীয় আলোচনায় বিখ্যাত 'টাইম্‌স' পত্রে সাহিত্য-রসিক মিষ্টার বার্ণার্ড শ: য়ুরোপের কুমারীদিগের কথায় wasted mothers of a nation সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে বিধবা-বিবাহের বহুল প্রচলনে জন-সংখ্যা-বৃদ্ধি-সম্বন্ধে মনে স্বতঃই সন্দেহের সঞ্চার হয়।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরবর্ত্তী "অনাচরণীয়" জাতি-সমূহকে "আচরণীয়" করিয়া না হইলে হিন্দুর বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাঁহার এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। এক শ্রেণীর লোককে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত করিলে কিরূপে জাতীয় বল-বৃদ্ধি হয়, তাহা বুঝা যায় না। এই প্রসঙ্গে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অবগতির জন্য আর একটি কথা বলিতে পারি। হিন্দু-ধর্ম্মকে বিদেশীয় অজ্ঞ লেখকগণ যেরূপ অসহিষ্ণু, রক্ষণশীল ও পরধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, প্রকৃত পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ নহে। পরন্তু হিন্দুধর্ম্মের মত উদার ধর্ম্ম জগতে বিরল। গত আষাঢ় মাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 'আসামে আহোম' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'চুকাফার সহচর ধর্ম্মহীন শানেরা (আহোমেরা) হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছে। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জিলার অন্তঃপাতি শান্তিপুর-সন্নিহিত মালিপোতা নামক গ্রামের কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য রাজা চূড়ানফাকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কৃষ্ণরামের বংশ-ধরেরা আসামে 'পার্ব্বতীয়া গোস্বামী' "নামে খ্যাত।" মিষ্টার অ্যাণ্ডারসন প্রভৃতি

লিখিয়াছেন, আসামে গোস্বামীদিগের দ্বারা বর্ব্বর জাতিরা হিন্দুধর্ম্মের বিশাল বক্ষে আশ্রয় লাভ করিতেছে।* এই রূপে হিন্দুসমাজে যে বললাভ হইতেছে, সে বিষয়ে অন্ধ হইলে চলিবে না। তাহাতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদনের সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু সত্যের উদ্ধার হয় না।

দেউস্কর মহাশয় দেখাইয়াছেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন। তিনি প্রমাণ-প্রয়োগের পর বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিতেছে, এ কথা যথার্থ নহে। আধিদৈবিক বিপদের জন্য মধ্যে কিছু দিন বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছিল। সেই বিপদের অবসানের সহিত আবার হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুর ভয়ের কোন কারণ নাই।"

দেউস্কর মহাশয়ের সহিত আমরাও বলি,—"কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী—স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে সবিশেষ অভিজ্ঞ। সুতরাং হিন্দুর বংশক্ষয় বা সংখ্যাল্পতার কারণালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গের হিন্দু প্রধান জেলাসমূহের জলবায়ুর অস্বাস্থ্যকরতা, নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব, ম্যালেরিয়াদি রোগের প্রকোপ ও তন্নিবারণের উপায় প্রভৃতির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন বলিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি স্বীয় পুস্তিকায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রসঙ্গাবতারণ করিয়া দেশবাসীকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতিলাভের বিজ্ঞান-সম্মত উপায়াবলী জ্ঞাপন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই।" অথচ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির উপায়বিধান একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আর আমরা সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া রোগজীর্ণ জাতির জন্য ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে ব্যগ্র। সার ফ্রেডারক লেলি সত্যই বলিয়াছেন, বোম্বাইয়ের বণিক মানচিত্রে রেখা টানিয়া জাহাজে মাল তুলিবার সুবিধার জন্য রেলপথ সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া মনে করেন, তিনি ভারতবাসীর উপকার করিলেন। কিন্তু রেলপথ-বিস্তারে দেশের পরিবর্ত্তনের কথা—বাঁধে জল আটকাইয়া শস্যহানির ও জ্বরোৎপত্তির বিষয় কেহ বিবেচনা করেন না। রাজা দিগম্বর মিত্র যখন রেলপথের ও রাজপথের বিস্তারই বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া-বিস্তারের কারণ বলিয়াছিলেন, তখন কেহ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। পূর্ব্বে দেশের স্বাস্থ্য এতই উৎকৃষ্ট ছিল যে, তখন কেহ আজিকার এই দুর্দ্দশার কথা কল্পনাও করিতে পারে নাই; জনসাধারণ গড়ভাতের

* বর্ত্তমান সংখ্যায় 'সংগ্রহ' দ্রষ্টব্য।

স্বদেশ দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিল। ক্রমে ভূমি আর্দ্র হইয়া, নদীবহুল বাঙ্গালায় নদী মজিয়া, আজ বাঙ্গালাকে ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি করিয়াছে।

ম্যালেরিয়া কেবল যে লোকের মৃত্যুর কারণ তাহা নহে। রোগভোগের পর যাহারা জীবিত থাকে তাহারা জীবন্মৃত হইয়া থাকে। মিষ্টার জোন্সের ম্যালেরিয়া বিষয়ক পুস্তকের আলোচনা কালে 'পাইওনিয়ার' বলিয়াছিলেন, ম্যালেরিয়া রোগীকে বলহীন, অসহায়,—এমন কি চরিত্রহীন করে। আসামের ইন্দ্রজালাদি সম্ভবতঃ ম্যালেরিয়া-জীর্ণ জাতির বিকৃত চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল। মেজর রস দেখাইয়াছেন, চেষ্টা করিলে এ দেশে অটুটস্বাস্থ্য-সম্ভোগ অসম্ভব নহে। প্যানামায় ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা—উপদেশ ও আদর্শ উভয়ের দ্বারা লোককে অবশ্যক ব্যবস্থার বিষয় বুঝান—গ্রামের উন্নতিসাধন কর্ত্তব্য হইয়াছে। জলকষ্ট-সম্বন্ধীয় মন্তব্যে বাঙ্গালা গভর্মেণ্ট ও ম্যালেরিয়া কন্‌ফারেন্সে সার হার্বার্ট রিস্‌লি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, এ সকল বিষয়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহকারিতা ব্যতীত সরকারের কর্ত্তব্য-সাধন দুঃসাধ্য। আশা করি, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই দিকে দৃষ্টি দিয়া শিক্ষার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবেন।

দেউস্কর মহাশয় এই সকল কথার আলোচনা করিয়া আমাদের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে যে শ্রমশীলতার ও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন, বাঙ্গালী হিন্দুর কৃতজ্ঞতায় তিনি তাহার পুরস্কার পাইবেন।

রূপ।

চন্দ্রের কলার ন্যায় লভি বৃদ্ধি দিন দিন
পূর্ণ ইন্দু সম পায় যৌবনে বিকাশ,—
ক্ষয়-প্রাপ্ত ছায়ামাখা হ'য়ে ক্রমে জ্যোতিহীন
মৃত্যু অমা অন্ধকারে লভে সে বিনাশ।

—o—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সংগ্রহ।

—:০:—

সাহিত্য।

—:০:—

কুমারী ঔপন্যাসিক।

—:০:—

ইংলণ্ডে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় নাটকের যেমন প্রচুর প্রচলন ও অসাধারণ আদর ছিল, রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সময় উপন্যাসের সেইরূপ প্রচলন ও আদর হইয়াছিল। আবার সেই সমাদর ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। কেবল ইংলণ্ড নহে, য়ুরোপের সর্ব্বত্র, আমেরিকায়, এমন কি বাঙ্গালায়ও উপন্যাস, সাহিত্যের অন্য সকল শাখা অপেক্ষা, অধিক পুষ্টিলাভ করিতেছে। য়ুরোপে বহু কুমারী উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। মেরী করেলি-প্রমুখ অনেকের উপন্যাস অসাধারণ আদরলাভ করিয়া লেখিকাকে সম্মানে ও সম্পদে ভূষিত করিয়াছে। সম্প্রতি ডাক্তার এমিল রিস কুমারী ঔপন্যাসিকদিগের রচনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, কুমারীদিগকে উপন্যাস রচনা করিতে দেওয়া উচিত নহে।

অভিজ্ঞতার অভাব।

জীবন বহু ব্যক্তির ও বহুবিধ ঘটনার সহিত পরিচয়ে ও বিরোধে ব্যয়িত হইলেই মানুষ প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করে। কুমারীদিগের ভাগ্যে সেরূপ পরিচয় বা বিরোধ কিছুই ঘটে না। তাঁহারা অনেক সময় সে সকল পরিহার করেন; অধিকাংশ স্থলে সে সকল তাঁহাদের জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমার বহির্ভূত। এ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে জীবনের প্রকৃত আস্বাদ না পাইয়া জীবনের বিচিত্র সমস্যার সমাধানচেষ্টা একান্তই হাস্যোদ্দীপক।

কুমারীর প্রেম।

কুমারীদিগের পক্ষে কুমারীর প্রেমের কোন কোন দিকে আলোক-পাত-ফলে ছায়ালোকে তাহার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব নহে, সত্য। কিন্তু কেবল কুমারীদিগকে লইয়াই উপন্যাস রচিত হয় না। বিষয়ী পুরুষ, বিজয়ী বীর, হতাশ প্রেমিক—উপন্যাসে ইহাদিগের স্থান আছে। আবার কুমারীদিগের প্রেমও উজ্জ্বল মণির মত নানা দিকে আলোকপাতে নানাবর্ণের বিকাশ করে। কুমারীর পক্ষে সে সকলের অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার অসাধারণ অভাব। এ অবস্থায় কুমারীদিগের পক্ষে মানবচরিত্র-চিত্রণে—উপন্যাসরচনায় সাফল্য-লাভের সম্ভাবনা স্বভাবতঃই সুদূরপরাহত।

সত্য বটে কুমারীর রচিত অনেকগুলি উপন্যাস ইংলণ্ডে আদৃত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ আদর সর্ব্বত্র ছায়ীত্বের—উৎকর্ষের প্রমাণ নহে। গার্হাড বলিয়াছেন, যিনি একটিমাত্র শিল্পকীর্ত্তি দেখিয়াছেন, তিনি একটিও দেখেন নাই; যিনি সহস্র সহস্র শিল্পকীর্ত্তি দেখিয়াছেন, তিনিই একটি দেখিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। সংসারে ও সমাজে মানবজীবনের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। এই বহুদর্শনের সুযোগ কুমারীদিগের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহারা কূপমণ্ডূক। তাঁহাদের বিশ্ব সেই সঙ্কীর্ণসীমায় বদ্ধ। জীবনের তাঁহারা কি জানেন?

কূপমণ্ডূক।

কুমারী ঔপন্যাসিকদিগের আর এক দোষ—অত্যুক্তি। তাঁহারা অভিজ্ঞতার অভাবে কল্পনাবলে চরিত্র-সৃজনে ব্যাপৃত হয়েন। ফলে তাঁহারা দেবতা-চরিত্র অঙ্কিত করেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই স্বার্থ-সঞ্জাত-তাড়িত, পাপতাপপূর্ণ পৃথিবী দেবতার বাসভূমি নহে। এই দেব-চরিত্র-অঙ্কন ক্ষমতার অল্পতার পরিচায়ক। হোমার নহিলে কেহ বীরকে তাঁহার শূকরপালের কুটীরে অভ্যর্থনা করিতে সাহস করিতেন না; মুরিলো নহিলে কেহ ভিক্ষুক বালকের কলভক্ষণের চিত্র চিত্রিত করিতেন না। এ সাহস যে ক্ষমতার পরিচায়ক, সে ক্ষমতা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই দিব্য সৌন্দর্য্যে সুন্দর করিয়া তুলে। আবার এই কথা মনে করিয়া যে সকল কুমারী ঔপন্যাসিক পাপের চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্তা হয়েন, তাঁহারা স্বর্গ হইতে একেবারে নরকের চিত্র চিত্রিত করেন। মধ্যপন্থা তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত। পাপের যে তারতম্য থাকিতে পারে—কৃষ্ণবর্ণের যে বহু রূপ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির অগোচর—কল্পনার অতীত। অভিজ্ঞতার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা অত্যুক্তির আশ্রয় লইয়া যুবতীদিগের অনিষ্ট করেন।

অত্যুক্তি।

যে সকল যুবতী উপন্যাস হইতে আদর্শ-সংগ্রহ করে, এই সকল উপন্যাস তাহাদিগকে বিবাহ ও সংসার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দান করিয়া তাহাদের অপকার করে। ঘটনাচক্রে তাহাদের অনেকের ভাগ্যে সংসারধর্ম্মপালন ও সন্তানলাভ ঘটে না। যাহাদের ভাগ্যে ঘটিতে পারে, তাহাদিগকে এই সকল উপন্যাস বিবাহের ও সংসারধর্ম্মপালনের অযোগ্য করিয়া দেয়। ইহাতে সমাজের বিশেষ অপকার সংঘটিত হয়।

অনিষ্ট।

এ অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি? লেখক বলেন, এই সকল উপন্যাসের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য সমিতি-গঠন আবশ্যক। আর কোন কুমারী উপন্যাস প্রচার করিলে তাঁহার ছয়মাস কারাদণ্ডের বিধান হওয়া আবশ্যক। আমাদের মনে হয়, কুমারী ঔপন্যাসিকদিগের রচনায় বিপদ কোন দেশেই এরূপ কঠোর দণ্ডবিধানের মত "সঙ্গীন" হইয়া উঠে নাই। এ ক্ষেত্রে লেখক মহাশয় ও বিপদের ব্যাপ্তি না বুঝিয়া অত্যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। তবে উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ সমালোচনার অগ্নি-পরীক্ষায় অন্য সকল উপন্যাসের মত এ সকল উপন্যাসও পরীক্ষিত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

উপায় কি?

ইতিহাস।

—:(•):—

চার্ণকের হিন্দু পত্নী।

—•:•—

এদেশে মুসলমান শাসনের শেষ দশায় ও ইংরাজের প্রাধান্য সূচনার সময় কোন কোন য়ুরোপীয় ভারতবর্ষীয় মহিলাকে বিবাহ করিতেন। কলিকাতার স্থাপয়িতা জব চার্ণক ইঁহাদিগের অন্যতম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরিচরণ বিশ্বাস 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে চার্ণকের হিন্দু পত্নীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। চার্ণকের বংশ-পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তিনি ১৬৫৫ বা ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে আইসেন এবং কাশিমবাজারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। ইহার পর তিনি পাটনার কুঠীর প্রধান কর্ম্মচারিপদে বৃত হয়েন। পাটনায় তিনি পার্শী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়েন, ভারতীয় আচার ব্যবহার অবলম্বন করেন ও সর্ব্বদা নবাবের দরবারে যাতায়াত করিতে থাকেন। জনরব, তিনি প্রচলিত বহু "কুসংস্কারের" বশবর্ত্তী ছিলেন, এবং মোরগ জবাই করিয়া পাঁচ পীরের পূজা দিতেন।

পরিচয়।

হেজেস চার্ণকের সহযোগী ছিলেন। উভয়ে বন্ধুত্ব ছিল না; পরন্তু শত্রুতা ছিল। হেজেস লিখিয়াছেন, হুগলী ও কাশিমবাজারের শাসনকর্ত্তা ভুল চাঁদের উপদেশ মত একজন হিন্দু তাঁহার নিকট অভিযোগ করে যে, চার্ণক একজন হিন্দুর পত্নীকে আপনার শুদ্ধান্তশোভিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি পাটনায় অবস্থানকালে না কি পতি-গৃহ হইতে ধনরত্নাদিসহ পলায়িতা কোন মহিলাকে আত্মসাৎ করিলে নবাব তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে দ্বাদশজন সৈনিক প্রেরণ করেন। তাহারা তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহার উকীলকে ধরিয়া লইয়া যায় ও দুইমাস কারারুদ্ধ রাখে। পরে চার্ণক নগদ ৩০০০৲ টাকা, ৫ খানি বনাত ও কয়খানি তরবার দিয়া মামলা মিটাইয়া ফেলেন। হেজেসের সহিত চার্ণকের সম্বন্ধ বিবেচনা করিলে এ কথায় বিশ্বাস করা সমীচীন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।

কলঙ্ক-কথা।

শুনা যায়, ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে নদীকূলে ভ্রমণকালে চার্ণক স্বামীর শবের সহিত সহমরণের যাত্রী কোন ব্রাহ্মণ যুবতীকে আনিয়া বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে চার্ণকের কয়টি সন্তান জন্মে; ইহাঁদিগের মধ্যে তিনটি কন্যা তিনজন ইংরাজের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। প্রকাশ, এই হিন্দু রমণী স্বয়ং খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিতা না হইয়া স্বামীকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কবে তাঁহার মৃত্যু হয়, জানা যায় না; তবে প্রচলিত মত এই যে, তিনি স্বামীর পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিতা হয়েন। চার্ণক কলিকাতার সেণ্ট জন্‌স গির্জ্জার প্রাঙ্গণে তাঁহাকে গোর দেন ও প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যু দিনে

হিন্দু পত্নী।

পাষাণের উপর একটি করিয়া মোরগ বলি দিতেন। এই সমাধিস্থানে—সম্ভবতঃ একই সমাধিতে চার্ণকের দেহাবশেষও সমাহিত হইয়াছিল।

বিবিধ।

—•—

আসামের সীমান্তপ্রদেশ।

—•—

কিছুদিন পূর্ব্বে মিষ্টার গেট আসামের যে ইতিহাস রচিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আসামের ইতিহাসের বিচিত্র বিবরণ জানিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয়,—এতদিন কেহ এই বিচিত্র বিবরণ বিবৃত করেন নাই কেন? মানুষের অনুসন্ধিৎসা আফ্রিকার অজ্ঞাত বনভূমিতে যে আলোকপাত করিয়াছে, আসামের বনভূমি সে আলোকপাত হইতে কেন বঞ্চিত হইয়াছে। সম্প্রতি মিষ্টার অ্যাণ্ডারসন 'ট্রাভল এণ্ড্ একস্প্লোরেসন' পত্রে আসামের সীমান্তপ্রদেশ-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনিও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জাতির ও দেশের ইতিহাস-রচনা লোকের খেয়ালের উপর নির্ভর করে। তাহা না হইলে সেমিটিক জাতিকর্ত্তৃক অধ্যুষিত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুপরিচিত, আর ইণ্ডো-চাইনিস বা টিবেটো-বার্ম্মিস জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত –প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রকৃত মিলন-স্থান ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত অপরিজ্ঞাত রহিত না। এই প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বৃতিরূপে দণ্ডায়মান, নীল পর্ব্বতমালা বসন্তে বিকশিত কুসুমগন্ধামোদিত বনে আবৃত—আর তাহার পশ্চাতে গিরিশৃঙ্গে তুষারের শ্বেত শোভা। এই প্রদেশের অধিবাসীরা বিরক্ত বা উত্তেজিত না হইলে কানন-কুসুমেরই মত প্রফুল্ল। এ যেন কবিতার রাজ্য। তিনি এই প্রবন্ধে দেশের ও দেশবাসী-দিগের পরিচয় দিয়াছেন।

আসামের অধিবাসীরা মনোজ্ঞ জাতি। তাহারা মুসলমানের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে নাই বলিয়া এ প্রদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই—অবরোধ-প্রথা প্রচলিত নাই। রাজ-পথে অনবগুণ্ঠিতা, অকুণ্ঠিতা অঙ্গনাগণের গতায়াত সাধারণ দৃশ্য।

প্রেমলীলা।

আসামের রমণীগণ সুন্দরী। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যখ্যাতি ও আসামের ইন্দ্রজালের কথা "বঙ্গে যথা তথা।" আসামে বাল্য-বিবাহ নাই; পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত প্রেম-পরিচয় বা কোর্টসিপ প্রচলিত আছে। প্রতি বৎসর বাসন্তী পূর্ণিমায় বীহু উৎসবের সময় যুবকযুবতী—প্রেমিকপ্রেমিকা গৃহত্যাগ করে। ইহার পর আদালতে বহু মোকর্দ্দমা হয়। কুমারীর স্বজনগণ লোকাচাররক্ষার্থ প্রেমিকের নামে নালিশ রুজু করে; কুমারীও বলে, সে স্বেচ্ছায় । শতঃ কুমারীর স্বজনগণ কিছু অর্থদণ্ডে সন্তুষ্ট হইয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া ফেলে; কারণ, প্রকৃত ব্যাপার-বিষয়ে তাহারা অজ্ঞ

ছিল না। তবে এইরূপ ব্যাপারে সময় সময় প্রকৃত দোষী বিনা দণ্ডে বা লঘু দণ্ডে অব্যাহতি পাইতে পারে। কিন্তু তাহা প্রায়ই হয় না ; কারণ, আসামের রমণীদিগের নিকট সতীত্ব সমাদৃত। এই কৃষিজীবীদিগের মধ্যে জনাকীর্ণ নগরীর পথে সুলভ পাপ দুর্ল্লভ।

জাতিবৈচিত্র্য।

জাতিতত্ত্বের হিসাবে, ঐতিহাসিক হিসাবে, ভাষাতত্ত্বের হিসাবে—আসামের মত বৈচিত্র্যবহুল দেশ দুর্ল্লভ। সার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জীর বিবরণে ও মিষ্টার গেটের পুস্তকে আসামের বহু জাতির পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু জাতিনির্ণয় কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই—অল্পকালে শেষ হইবার নহে ; কারণ, আসামে বহু জাতি আশ্রয় লইয়াছে এবং স্ব স্ব আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রচনাদ্বয়ে বহুদিন আসামের কাম্যকাননে নিবাসহেতু বিলাসবিলাসী অধঃপতিত শাসদিগের শিথিলমুষ্টিচ্যুত রাজদণ্ড ইংরাজের হস্তগত হইবার কৌতূহলোদ্দীপক কথাও অবগত হওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য।

বিদেশী ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে দিল্লী, আগ্রা, রাজপুতানা প্রভৃতির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য দেখিয়া আসামের শান্ত সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ মাধুরী উপভোগ করাই ভাল। নদীপথে গতায়াতই প্রশস্ত। যাঁহার অবসর আছে, তাঁহার পক্ষে ডাক জাহাজে না যাইয়া মাল জাহাজে যাওয়াই ভাল ; তাহাতে অবসর মত স্থান দেখিবার সুবিধা হয়। জাহাজের অধ্যক্ষ সাধারণতঃ বহুদিন ঐ কার্য্যে করিয়া আসিতেছেন, নদীতীরবর্ত্তী বহুস্থানই তাঁহার পরিচিত। তিনিই সেই সকল স্থানের বিবরণ বিবৃত করিয়া যাত্রীর অবকাশরঞ্জনের সহায়তা করিতে পারেন। ধুবড়ী হইতে কিছু দূর পর্য্যন্ত বৈচিত্র্যের অভাব। কেবল কর্দ্দমাক্ত নদীকূলে কুম্ভীর শয়ান; পশ্চাতে ঘাসের বন ; আর দূরে উত্তরে হিমালয়ের চূড়া কোথাও নীল—কোথাও রবিকরে স্বর্ণাভ, দক্ষিণে গারো গিরিমালা। কিছু দূর অগ্রসর হইলে দেখিবে, প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের রাজধানী গৌহাটীর নিকটে গিরিমালা নদীকূল স্পর্শ করিয়াছে। এখন গৌহাটী হৃতগৌরব, কেবল শত-কিম্বদন্তীজড়িত কামাখ্যা-মন্দির তাহার অতীত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান। নদীগর্ভে কামাখ্যা শৈলে মন্দির সুদৃশ্য—শোভন, সুন্দর। এই মন্দিরে ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে হিন্দুযাত্রীর সমাগম হয়। গৌহাটী হইতে শিলং যাইতে হয়। পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। দিলীপ-সুদক্ষিণার মত বন্য মার্গণাথীর নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এই পথে অগ্রসর হইতে কত আনন্দ। বনপথের দৃশ্য গম্ভীর—স্নিগ্ধ—সুন্দর।

শোণিতপুর।

কিছু দূর অগ্রসর হইলেই তেজপুর—বর্ত্তমান সময়ে এইদিকে চা-বাগানের বাহুল্য। এই স্থানে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বহু উল্লেখযোগ্য সামগ্রীর সন্ধান পাইবেন। চারিদিকে ভূমিকম্পে ভূপতিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ—এই সকল ভগ্নাবশেষে স্বচ্ছন্দবনজাত লতার মত বহুবিধ কিম্বদন্তী বিজড়িত। ইহাই বাণ রাজার রাজধানী। বাণপুত্রী ঊষা স্বপ্নে কোন অনিন্দ্যসুন্দর যুবককে দেখিয়া তাঁহাকে তরুণ হৃদয় দান করেন। সখী চিত্রলেখার চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের মনোজ্ঞ মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি তাঁহাকেই ঈপ্সিত বলিয়া চিনিতে পারেন। উত্তরে

সাক্ষাৎ হয়। বাণ জানিতে পারিয়া অনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। তখন বাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম হয়। সেই সংগ্রামে ভূমি শোণিত-রঞ্জিত হয়, তাই এ স্থানের নাম তেজপুর বা শোণিতপুর। কিম্বদন্তী, তেজপুরের নিকটস্থ পর্ব্বতমালা—এই যুদ্ধে ভক্তরক্ষার জন্ত বাণের আরাধ্য দেবতা মহাদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। লেখকের মতে এই কিম্বদন্তী আসামের এই অঞ্চলে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মমতে দ্বন্দ্বের রূপকমাত্র। অদূরে বিশ্বনাথে একটি পর্ব্বত সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—মহাদেব ইহাকে উপাধানরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। আর কিছু দূর অগ্রসর হইলে, নদীগর্ভে মাজুলী দ্বীপ। এই দ্বীপে গোস্বামিগণের মঠ আছে। এই গোস্বামিগণের চেষ্টায় আসামের বর্ব্বর জাতিরা ক্রমে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে।

আসামের বনভূমি শিকারীর সুখস্বর্গ। এই বনভূমিতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি বহুবিধ জন্তুর প্রাচুর্য্য। আর বহুবিধ পক্ষীর অন্ত নাই। জাতিবৈচিত্র্যের কথা

নানা কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংরাজ-রাজ্য-বিস্তারের ফলে ও খৃষ্টানধর্ম্মযাজকদিগের চেষ্টায় এই প্রদেশে অসভ্যজাতি সমূহের মধ্যে সভ্যতার বিস্তার হইতেছে অজ্ঞানতার অন্ধ তিমির ভেদ করিয়া জ্ঞানালোক বিকশিত হইতেছে। পূর্ব্বে এই প্রদেশে জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না; নরহত্যা নিত্য সংঘটিত হইত। এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভরসা করা যায়, জনাকীর্ণ বঙ্গদেশ হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা অদূর ভবিষ্যতে আসামের অরণ্যকে শ্রমজীবীর কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত করিয়া দেশের দারিদ্র্য-সমস্তার সমাধানে সহায়তা করিবেন।

নারী-হৃদয়।

যে মেঘ সুশীততোয়ঃ করে বরিষণ,
বজ্র-বহ্নি হৃদয়ে সে ধরে!
নারী-হৃদে—কোমলতা মাধুর্য্য-আধার—
অগ্নিময় তেজ বাস করে!

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার

পুরাতন প্রসঙ্গ।

—•::•—

[বাঙ্গালায় ইংরাজী-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে—দেশে যে নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, কয়জন মনীষীর মানসক্ষেত্রে সেই ভাব পরিপুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে নবীন আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিল। আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগের অন্যতম। সেই সময় বঙ্গদেশে যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের সহযোগী। তিনি এক্ষণে কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে বিশ্রাম-ভোগ করিতেছেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের ও ঘটনাবলীর যে বিবরণ বিবৃত করিতেছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গুপ্ত মহাশয় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া গুপ্ত মহাশয়ের রচনা দেখিয়া আবশ্যক সংশোধনও করিয়া দিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ধারাবাহিক রূপে 'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রকাশিত হইবে। ইহা হইতে পাঠক তৎকালের বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের ইতিহাস জানিতে পারিবেন।—'আর্য্যাবর্ত্ত'-সম্পাদক।]

২৪শে আশ্বিন, ১৩১৭।

তখনও সন্ধ্যা ঘনাইয়া আইসে নাই, সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভা পশ্চিমাকাশের লঘু ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ভিতর দিয়া তখনও ঝিকিমিকি করিতেছিল; অদূরে সান্ধ্য আরতির বাজনা বাজিতেছিল।

পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার একবার Controversy হইয়াছিল বটে; সে আজ অনেক দিনের কথা। 'ভারতী' পত্রিকার পুরাতন ফাইল্ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলে আমার প্রবন্ধগুলি দেখিতে পাইবে; যতদূর স্মরণ হয়, প্রত্যেক প্রবন্ধের নিম্নে আমার নাম দেওয়া আছে। তর্ক উঠিয়াছিল, কোম্‌তের ধ্রুবদর্শন (Positivism) লইয়া, 'সুপ্রভাতের' যে সংখ্যায় উক্ত বাদানুবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সংখ্যাখানি আমাকে দেখাইও। আমি তখন কলেজে অধ্যাপনা করিতাম না; ওকালতি করিতাম। রাজনারায়ণ বাবু তখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন।

"সম্প্রতি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সমস্ত চিঠিপত্রগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সেগুলি পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়াছি। অনেকদিন পূর্ব্বে যখন কোম্‌তের চিঠিপত্রগুলি ফরাসি ভাষায় পড়িয়াছিলাম, তখন মনে একটা বড় আকাঙ্ক্ষা হইত যে, ষ্টুয়ার্ট মিলের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, তিনি কোম্‌তের চিঠিগুলির উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, সেইগুলি যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সেগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করা যাইত। কিন্তু এই পত্রগুলির মধ্যে সে সম্বন্ধে কিছুই পাইলাম না। উক্ত দার্শনিকদ্বয়ের সম্বন্ধ কেমন রহস্যময় ও জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! যিনি কোম্‌তের Synthetic Philosophy আলোচনার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই, তিনিই আবার সেই প্রবন্ধেই কঠোর সমালোচক হইয়া কোম্‌ৎকে বিদ্রূপ করিয়াছেন! কোম্‌তের শিষ্য কন্‌গ্রিভ্‌ মিল্‌কে একখানি পত্র লিখেন; তিনি জানিতে চাহেন, কেন ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ কোম্‌তের এমন কঠোর ও বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করিতেছেন; তদুত্তরে মিল্‌ লিখেন—"আমি কোম্‌ৎকে খুব শ্রদ্ধা করি; আমার ভয় হয় তাঁহার মন্দ ও ভ্রান্ত ভাবগুলি তাঁহার দর্শন-শাস্ত্রের ভাল অংশটিকে বা নষ্ট করিয়া ফেলে; অথবা তিনি যে সুন্দর সত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা মানবচক্ষুকে এমন করিয়া ধাঁধাঁ দিবে যে, লোকে তাঁহার ভ্রমগুলির প্রতি একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। সত্য মিথ্যা সকলগুলিই তাহারা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে।

"তোমরা জান, ঐ ঝগড়ার সূত্রপাত কি লইয়া। ষ্টুয়ার্ট্‌মিল্‌ চাহেন Representative Government এবং Enfranchisement of Women; কোম্‌ৎ ঠিক তাঁহার বিরুদ্ধমতের পরিপোষক। তাঁহার মতে ও দু'টা ফাঁকা, অসার বস্তু। উভয়ে অনেক চিঠি লেখালিখি করিলেন; উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হইল। কোম্‌ৎ হতাশ হইয়া বলিলেন যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, মিল্‌ তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ধ্রুবদর্শন শাস্ত্রের প্রধান উপদেষ্টা হইতে পারিবেন, এখন দেখিতেছেন, তাহা হইল না। কিন্তু যখন তাঁহার দর্শন শাস্ত্র কোম্‌তের জীবিকা-র্জনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল, তাঁহার মাষ্টারি চাকরিটি গেল, তাঁহাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করাও হইল না, তাঁহার অত্যন্ত অর্থকষ্ট হইল, তখন ষ্টুয়ার্টমিল্‌ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মোল্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রোট্‌ এবং অন্যান্য বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া কোম্‌তের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগি-লেন। এইরূপে কয়েক বৎসর তাঁহাকে অর্থসাহায্য করা হইলে পর, কোম্‌তের স্বদেশবাসীরা দরিদ্র দার্শনিককে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল।

"কোমতের এই অর্থকষ্টজনিত দারিদ্র্যের জন্ত তিনি নিজে অনেকটা দায়ী। যখন তিনি তাঁহার পুস্তকের এক এক খণ্ড মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন, প্রায় প্রত্যেক খণ্ডের মুখবন্ধে তিনি Polytechnic School এর কর্তৃপক্ষীয় কোনও না কোনও ব্যক্তির তীব্র সমালোচনা করিতেন। একবার তাহা লইয়া তাঁহাকে আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষের মধ্যে অ্যারাগো নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা, বেশী মাহিনার একটি পদ খালি হইলে, কোম্‌ৎকে তাহা না দিয়া অন্ত এক ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কোম্‌ৎ তাঁহার পুস্তকের মুখবন্ধে এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। সেই প্রতিবাদ মুদ্রণকালে মুদ্রাকর প্রমাদ গণিল; সে দেখিল যে, একজন দরিদ্র ইস্কুল মাষ্টার্ অ্যারাগোর স্তায় একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির যে কড়া সমালোচনা করিতেছে, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে মুদ্রাকরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ভয়ে ভয়ে সে প্রতিবাদের কথা অ্যারাগোকে জ্ঞাপন করিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, উহা মুদ্রিত হইলে তিনি মুদ্রাকরের উপর বিরক্ত হইবেন কি? অ্যারাগো বলিলেন, 'আমি বিরক্ত হইব কেন? অঙ্কশাস্ত্রে যাহার কিছুই ব্যুৎপত্তি নাই,—না সামান্ত, না বিশিষ্ট, কোনও প্রকার ব্যুৎপত্তি নাই, এমন একটা লোককে ঐ পদে উন্নীত না করিয়া যদি আমি গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্ট ব্যুৎপন্ন একজনকে গণিতশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকি, তজ্জন্ত লজ্জিত হইবার কোনও কারণ দেখি না। দর্শনকার মহাশয় আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে মুদ্রিত করিতে পার।' মুদ্রাকর ও প্রকাশক কোম্‌ৎকে না জানাইয়া তাঁহার পুস্তকের গোড়ায় অ্যারাগোর চিঠিখানি সন্নিবেশিত করিয়া দিল। কোম্‌ৎ তাহা দেখিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেলেন; তিনি মুদ্রাকরের নামে নালিশ করিয়া আদালত হইতে খেসারৎ পাইলেন।

"এই সব ঝগড়া বিবাদের জন্ত স্ত্রীর সহিত তাঁহার বনিবনাও হইল না। স্ত্রী প্রায়ই তাঁহাকে এই দ্বন্দ্ব কলহ হইতে বিরত হইতে বলিতেন। কাপ্তেনের সহিত কোম্‌তের স্ত্রীর পলায়ন-ব্যাপারটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি সঠিক অবগত নহি; তবে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কোম্‌ৎ তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন নাই; কিন্তু ১৮৪৪ সালে চিরন্তন বিবাদ কলহ উপলক্ষে স্ত্রীপুরুষে আপোষে পৃথক্ হইলেন। সেই অবধি স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত তিনি নিজের আয় হইতে বাৎসরিক দুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক তাঁহার স্ত্রীকে দিতেন; তাঁহার যতই অর্থকষ্ট হউক, ঠিক নিয়মমত এই দুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক স্ত্রীকে বরাবর দিতেন।

"এই সময়ে তাঁহার জীবনে একটি বিয়েট্রিচি (Beatrice) দেখা দিয়া-

ছিলেন ; যুবতীর নাম ক্লোটিল্‌ডি (Clotilde) ; তাঁহার স্বামী কোনও গুরুতর অপরাধের জন্য যাবজ্জীবনস্থায়ী নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যুবতী বিশেষ গুণবতী ছিলেন ; দার্শনিক কোম্‌ৎ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়া বলিলেন, 'এস আমরা বিবাহ করি ; আমাদের উভয়ের সাংসারিক জীবনে যে দারুণ tragedy হইয়া গিয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখ, তাহার পর এ বিবাহে কোনও দোষ আছে কি না। ক্লোটিল্‌ডি তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ এই বিবাহে সম্মত হইলেন না। অতি অল্পদিন পরেই ক্লোটিল্‌ডি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন কোম্‌ৎ তাঁহারPositive Politics বা ধ্রুব রাজনীতি নামক প্রকাণ্ড পুস্তকখানি ক্লোটিল্‌ডির উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার নিজের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ক্লোটিল্‌ডির সহিত দেখা সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার জীবন কেবল দর্শনশাস্ত্রসৃষ্টি কার্য্যেই পর্য্যবসিত হইত ; তিনি যে এক নূতন ধর্ম্মের প্রচারক হইতে পারিয়াছেন তাহা শুধু এক বৎসর কাল ক্লোটিল্‌ডির সহিত আলাপ পরিচয় কথাবার্ত্তার ফলে।

"বোধ হয়, এই প্রসঙ্গে আমার একটি নিজের কথা বলিয়া লইলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ক্লোটিল্‌ডি-কোম্‌ৎ-ব্যাপার অবলম্বন করিয়া ক্লোটিল্‌ডির বিরচিত Lucie নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ দৃষ্টে আমি একটি গল্প রচনা করিয়াছিলাম। আমার পরম আত্মীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও আমাকে বলিয়াছিলেন—'আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ কর।' পুস্তকের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইলে আমার মতের পরিবর্ত্তন হইল ; আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার নাম দিয়া এই গল্প প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে ; তখন আমার জীবনে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে, আমার স্বাক্ষরিত গল্পটি প্রকাশিত হইলে লোকে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিবে। আমি কালবিলম্ব না করিয়া ছাপাখানায় উপস্থিত হইলাম ; সমস্ত টাইপ্‌গুলি ওলোট্‌ পালোট্‌ করিয়া দিয়া গল্পটি নষ্ট করিয়া ফেলিলাম ; তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না। পরে বিহারীবাবুর নিকট আমি অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। আর কখনও এরূপে আমার লেখা নষ্ট হয় নাই। ফরাসী ভাষা হইতে Paul and Virginia বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলাম ; বোনাপার্টে'র জীবন-চরিত অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, বোধ হয় লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত। কবিতাও লিখিতাম।

"ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ ও মিসেস্‌ টেলরের প্রণয় সম্বন্ধে সাধারণতঃ কতকগুলি বিষয়

জানা আছে ; এই যে মিলের চিঠিপত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে অনেক বিষয় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী টেলরও মিলের ন্যায় নাস্তিক ছিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার নারী-হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, পূজারিণীর ন্যায় মিলের চরণে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। একস্থানে তিনি লিখিতেছেন,—মানুষ যে কতদূর perfectionএ পৌঁছিতে পারে, তাহা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্‌কে দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। শ্রীমতী তাঁহার হৃদয়ের ভাব স্বামীর নিকট গোপন করেন নাই। সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিতেন। স্বামী বলিলেন,—'তাইত ইহার একটা বিধান করিতে পারা যায় না কি? ব্যাপারটা ত' ভাল নয়। একটা কায করা যা'ক্, তুমি এখন প্যারিসে গিয়া থাক না কেন? দিন কতক ছাড়াছাড়ি হইলে এ নেশা কাটিয়া যাইতে পারে।' অনেক বিবেচনা করিয়া প্যারিসে যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। কয়েক মাস তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীমতী টেলর তাঁহার স্বামীকে লিখিলেন—'আমার পক্ষে এখানে থাকা নিরর্থক, ইহাতে কোনও ফল দর্শিবে না, অনুমতি কর ত ফিরিয়া যাই।' তাহাই হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সামাজিক হিসাবে অবৈধ সম্বন্ধ লইয়া কোনও scandal, কোনও লোকাপবাদ হইবার কোনও কথাই ছিল না। তবে মিলের পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, পরস্ত্রীর প্রতি এই আসক্তি অতীব গর্হিত।

"হাঁ, তাহাই বটে ; তুমি ঠিক বলিয়াছ, এই সম্বন্ধে পাশবতা ছিল কি না সন্দেহ ; intellectual fascination অত্যন্ত প্রবল ছিল। ক্লোটিল্‌ডি ও কোম্‌ৎ ঠিক ঐ রকম ভাবেই কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছিল। মিষ্টার টেলর উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার স্ত্রীকে দান করিয়া যায়েন। বিধবা হইবার প্রায় আড়াই বৎসর পরে মিসেস্ টেলর মিল্‌কে বিবাহ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিবাহের পর বেশি দিন মিসেস্ টেলর জীবিতা ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা হেলেন টেলর মিলের মৃত্যু পর্য্যন্ত কন্যার ন্যায় তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। হেলেন সেই জন্য আজীবন কুমারীব্রত পালন করিলেন। অ্যাভিনিয়নের (Avignon) নিকটবর্ত্তী যে স্থানে মিসেস্ টেলরের সমাধি হইয়াছিল, মিল্ তাহারই অতি নিকটে একটি বাগানবাড়ীতে শেষজীবন অতিবাহিত করিলেন ; যেস্থানে বসিয়া তিনি চিঠিপত্র লেখা ও পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, ঠিক সেস্থান হইতে তাঁহার স্ত্রীর গোর দেখা যাইত। হেলেনও বিদুষী ছিলেন ; মিলের অনেক চিঠি পত্র তিনি লিখিয়া দিতেন, মিল্ কেবল দেখিয়া দিতেন এবং স্বহস্তে নকল করিয়া স্বাক্ষর করিতেন।

"এক একবার আমার সন্দেহ হয় যে, পিতাপুত্রের মধ্যে কাহার প্রতিভা অধিক, জেম্‌স্ মিলের না জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের? কেমন করিয়া যে তিনি তিন বৎসরের শিশুকে গ্রীক্ শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। তুমি যে অক্সফোর্ডে গ্রীক ভাষার অধ্যয়ন polite education এর প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, তাহার সহিত জেম্‌স্ মিলের এ শিশু পুত্রের অধ্যাপনার কোনও বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতেছি না। বিশেষতঃ জেম্‌স্ মিল্ নিজে একজন মুচির ছেলে; সেই মুচী কিন্তু নিজের ছেলেটিকে নিজের ব্যবসায় হইতে দূরে রাখিয়া ভদ্রলোকের ছেলের মত তাহার লেখা পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়াও জেম্‌স্‌কে অনেকদিন অর্থকষ্ট ভোগ করিতেই হইয়াছিল। বেন্থামের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ পয়সা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তবুও তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিল না; পরে যখন তাঁহার India House চাকরি হইল, সেই সময় হইতে তাঁহার আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝা গেল।

"এত কষ্টের মধ্যে তিনি তাঁহার জীবনের দুইটি বড় কায করিয়া ফেলিয়াছিলেন;—ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিলেন, এবং তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনাকার্য্য শেষ করিলেন। দেখ, আমার একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল; আমার বিশ্বাস ছিল যে, জেমস্ মিল্ ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি করার পর তাঁহার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্র দেখিবার তাঁহার খুব সুযোগ হইয়াছিল। এখন আমার সে ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে; এখন দেখিতেছি যে, ইণ্ডিয়া হাউসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ইতিহাস-রচনা শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি ছেলেটিকে লইয়া যখন পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন, তখন মুখে মুখে তাহাকে অর্থশাস্ত্র (Economics) সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন; বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে বালক পিতার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পিতাকে দেখাইত; মনের মত না হইলে বালকের উপর আবার লিখিবার আদেশ হইত। এমনই করিয়া তিনি পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স্ মিলের মৃত্যু হয়; মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুত্রকে ইণ্ডিয়া হাউসে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শেষ পর্য্যন্ত মিল্ চাকরি করিয়া বাৎসরিক পনের শত পাউণ্ড পেন্সন্ লইয়া কার্য্য হইতে অবসর-গ্রহণ করেন।

"পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য যখন মিল্‌কে অনুরোধ করা হয়, তিনি

বলিলেন আমি candidate হইতে রাজি আছি, কিন্তু এক পয়সা ও খরচ করিব না। কেহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নাই। একবার তিনি মেম্বর হইয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বারের সময় লোকে সন্দেহ করিল যে, তিনি Bradlaugh কে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, তখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিল। মিল্ কিন্তু নিজে বলিতেন যে, ব্র্যাডল-ঘটিত ব্যাপারে তাঁহার কোনও অনিষ্ট হয় নাই; তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের Organisation ভাল ছিল না। তাই তিনি হটিয়া গেলেন।

"কার্লাইলের সম্বন্ধে মিলের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু তবু ও তিনি লিখিয়াছেন যে, মানবের মানোবিকাশের খানিক দূর পর্য্যন্ত কার্লাইলকে পাঠ করিলে উপকার হইতে পারে; একটু উপরে উঠিলে আর চলিবে না। তবে তখনও কার্লাইলের রচনা পাঠে অনেক আনন্দ অনুভব করা যায়। যখন তিনি কার্লাইলের হস্তলিখিত পুথি French Revolution খানি হারাইয়া ফেলিলেন, তখন তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া কার্লাইল্‌কে পুনশ্চ ঐ গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করিলেন; এবং কার্লাইলের অবস্থা ভাল ছিল না, তাই তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে জোর করিয়া টাকা দিলেন। কার্লাইল্ তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ সম্বন্ধে মিল্ এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, যদি তিনি যথার্থই বড় লোক হইতেন তাহা হইলে কখনই Franco-Prussian যুদ্ধ হইতে দিতেন না; তিনি যদি বলিতেন যে, ফরাসি ও প্রুসিয়ার মধ্যে যে প্রথমে সৈন্য-চালনা পূর্ব্বক বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে, তাহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সমস্ত নৌবাহিনীর অভিযান হইবে, তাহা হইলে কি ঐ যুদ্ধ বাধিতে পারিত?

"দেখ কার্লাইলের স্ত্রীর সহিত যে মতের অনৈক্য ও বিরোধের কথা ফ্রুড প্রচার করিয়াছেন, সেটা না কি ঠিক নয়। দম্পতীর মধ্যে না কি প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। মিলের পত্রে কিন্তু এ বিষয়ের উল্লেখ নাই।

"তাঁহার কয়েকখানা পত্রে হার্বাট স্পেন্সরের দার্শনিক মত লইয়া অনেক তীব্র সমালোচনা আছে; পাঠ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করিতে পারিবে না। স্পেন্সরের Relativity ও Conservation of Energy এ দুটির কোনটিই তিনি পছন্দ করেন না। তাঁহার Universal Postulate মিলের একবারেই অসহ্য।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদপ্রার্থী Dr. Mertineau তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি;

কিন্তু আপনার পক্ষ সমর্থন করিলে আর এক জনকে ত্যাগ করিতে হয়; তিনি অনেকটা আমার দার্শনিক মতের পরিপোষক। আমার মতাবলম্বী লোক অল্প; আশা করি, আপনি দুঃখিত হইবেন না।"

বীডন্ উদ্যানে একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত এইরূপ আলাপ করিতে করিতে লক্ষ্য করি নাই যে, একে একে প্রায় সকল ভদ্রলোকই উদ্যান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। একজন হিন্দুস্থানি দ্বারবান পণ্ডিত মহাশয়কে সেলাম করিয়া বলিল, "বাবুজি, বহুৎ রাৎ হুয়া।"

পণ্ডিত মহাশয় উঠিলেন। আমিও উঠিলাম। একটু দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন— "যে পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্র বাবুর চিঠিখানি প্রকাশিত হইয়াছে, সে পত্রিকাখানা আমাকে একবার দেখাইও। আমার মনে হয়, ভগবানকে লইয়া তর্ক হইয়াছিল; আমি বোধ হয় বলিয়াছিলাম, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ (omnipotent) ও সর্ব্বজ্ঞ (omniscient) তাঁহাকে all meciful বলা কিছুতেই যায় না; এই কথাতেই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্র বাবু আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সহিত আমার ঐকমত্য দেখিতে পাইবে। মিল্ বলিতেন, ঔ তিনটি attributes একত্র করিয়া এক পরমপুরুষ কল্পনা করা যাইতেই পারে না; জোর এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটা ভালর দিকে ঝোঁক—a tendecy towards the good—কল্পনা করা যাইতে পারে; তেমনই একটা মন্দের দিকে ঝোঁক ও কি কল্পনা করা যাইতে পারে না? কোম্‌ৎ বলেন যে, ভগবানকে একবারে বাদ দিতে হইবে; যাহা বিজ্ঞানের অজ্ঞেয় তাহাকে সম্মুখে খাড়া করিয়া জ্ঞানের পথ রোধ করিও না। অবশ্যই Theology জগতের কতকটা উপকার-সাধন করিয়াছে,—সমাজের কল্যাণ-কার্য্যে অনেকটা পুলিশপ্রহরীর মত কায করিয়া আসিতেছে, কিন্তু Theologyর দিন চলিয়া গিয়াছে।

গৃহে ফিরিবার সময় 'সুপ্রভাতে' মুদ্রিত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্রের একটি ছত্র আমার মনে হইতে লাগিল" "he can write, and he can fight, and he can slight all things divine."

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

গ্রন্থ-পরিচয়।

রাজা রামকৃষ্ণ। *

কিছুদিন পূর্ব্বে একজন প্রৌঢ় সাহিত্যরসিক একজন নবীন সাহিত্য-সেবককে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর জীবন বৈচিত্র্যবর্জ্জিত, তাহাতে বহু উপন্যাসের উপাদানের অভাব। দুর্গাদাস বাবু তাঁহার 'রাণী ভবানী' ও 'রাজা রামকৃষ্ণ' উপন্যাস-দ্বয়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন, বাঙ্গালীর ঘরে উপন্যাসের উপাদানের অভাব নাই; পরন্তু বাঙ্গালায় যে উপাদান বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিলে ঔপন্যাসিক যে উপন্যাস রচনা করিতে পারিবেন, তাহাতে আমাদের জাতীয় ও নৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা। মহারাজ রামকৃষ্ণের নাম বঙ্গে সুপরিচিত; তাঁহার সাধন-সঙ্গীতে এক সময় বঙ্গের পল্লী মুখরিত ছিল। সেই রামকৃষ্ণের জীবনকথা লইয়া এই উপন্যাস বিরচিত।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "প্রায় দুই মাসের মধ্যে এই উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ—একরূপ অসমসাহসিক কার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই গ্রন্থ সাধারণের কিরূপ প্রীতিপ্রদ হইবে—তাহা সহজেই বুঝা যায়। * * * * এ গ্রন্থ উপন্যাসও নহে, ইতিহাসও নহে;—আমার নির্ব্বুদ্ধিতারই এক পরিচয়-চিহ্ন।" দুর্গাদাস বাবু প্রবীণ সাহিত্যসেবক হইয়া কেন এরূপ অনাবশ্যক ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাস্তবিক এই ব্যস্ততা হেতু পুস্তকখানিতে বহু ক্রটি রহিয়াগিয়াছে। ৩য় পৃষ্ঠায় "প্রস্তুত করিয়েছি" ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় "প্রস্তুত ক'রে রেখেছি" তে পরিণত হইয়াছে। ১২শ পৃষ্ঠায় "সড়ক" ও "সরক" উভয়ই দেখিলাম। ৩০ পৃষ্ঠায় "চতুঃপার্শ্বে," ৬৩১ পৃষ্ঠায় "মহারাষ্ট্রগণ" পাইলাম। ৩৪ পৃষ্ঠায় "কথোপকথনে গাঢ়-নিমগ্ন" ও ৪২ পৃষ্ঠায় এবং ১৫৩ পৃষ্ঠায় "নয়নে নয়নে উজ্জ্বল হইয়া আছে"—দুর্ব্বোধ। ৪২ পৃষ্ঠায় দেখিলাম, "ফৌজ-পল্টন আসিতেছে শুনিলে, এখনও অনেক গ্রামের সুন্দরী রমণীরা পোড়া হাঁড়ীতে মস্তক বাঁধিয়া জলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে।"—"মস্তক বাঁধিয়া" কি "মস্তক ঢাকিবার" পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে? ৪৩ পৃষ্ঠায় "সুর সুর ক'রে" ব্যবহৃত হইয়াছে। ৬৪ পৃষ্ঠায় "মার্ত্তণ্ডদেব যেন সারাদিন অগ্নি-বর্ষণ করিলেন"—"মার্ত্তণ্ড দেব সারাদিন যেন অগ্নি-বর্ষণ করিলেন"—হইবে। ৬৭ পৃষ্ঠায় "ক্রমশঃ মেঘ

* রাজা রামকৃষ্ণ। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

অপসৃত হয়"—"ক্রমশঃ মেঘ অপসৃত হইল"—হইবে। ৭৩ পৃষ্ঠায় "গোপাল"—"রঘুনাথ" হইবে। ৭৬ পৃষ্ঠায় দেখিলাম, "রঘুনাথের পীড়ার বিষয় কবিরাজ মহাশয় সকলই বুঝিতে পারিলেন। কৃষ্ণনাথ রায়ও অবস্থা কিছু কিছু বিবৃত করিলেন।" রোগীর অবস্থা না শুনিয়াই পীড়ার বিষয় সকলই বুঝিতে পারা কি সম্ভব? ১৫৭ পৃষ্ঠায় "গতকল্য" "আজ" হইবে।

১৫৩ পৃষ্ঠায় লেখক মণিবেগমকে "পূর্ণযৌবনা" বলিয়া তাঁহার গাত্রে অঙ্গরাখা ও মসলিনের মসৃণ বসন থাকা সত্ত্বেও বলিয়াছেন—"বসনাঞ্চল ভেদ করিয়া, সুন্দরীর রূপের ফোয়ারা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।" কিন্তু মণি তখন প্রৌঢ়া। ১৭৬ পৃষ্ঠায় "আয়ুঃ কাল" দেখিলাম, ১৯৭ পৃষ্ঠায় "চারু মনোহর" দেখিলাম। ৩২২ পৃষ্ঠায় "আজ"—"কাল" হইবে। ৪২৬ পৃষ্ঠায় "কেতকী-কুমুদ-কহ্লারের ফেনিল বীচিবল্লরীর" অর্থ কি? ২৭১ পৃষ্ঠায় দেখা গেল, "যে ব্রাহ্মণ যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন প্রভৃতি আত্মবৃত্তি পরিহারপূর্ব্বক চাকুরি বৃত্তি গ্রহণ করে, ব্রাহ্মণসমাজে তিনি কখনই শ্লাঘনীয় নহেন।" ৩৪৪ পৃষ্ঠায় লেখক বলিয়াছেন, রামকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন, সুতরাং পত্নীর "প্রেমপাশ ছিন্ন করিলেন।" পত্নীর প্রেমপাশ ছিন্ন না করিলে কি পত্নীকে রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করা যায় না? এ সকল ত্রুটি অনবধানতার চিহ্ন। এই সকলের জন্য লেখকের সাহিত আমাদের মতান্তর হইতে পারে না। মতান্তরের অন্য কারণ আছে।

তিনি বর্ত্তমান পুস্তকেও "চক্ষে" ও "রাত্রে" ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? ইংরাজীতে cannot যেমন যুক্ত হয় তিনি তেমনই "করি-নি", করিস্-নি" "যায়-নি" প্রভৃতির ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা ইহার কারণ বুঝিতে অক্ষম। তিনি সংস্কৃত ভাষা ও কথোপকথনের চলিত ভাষা মিশাইয়াছেন; যথা—"তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস। তুমি মুখাগ্নি করিয়াই চলিয়া আসিও।" (৩৩৩ পৃষ্ঠা) "একবার মনে কর দেখি,—তোমার অভাবে বৌমার আমার কি দশা হয়েছে! আহা! স্বর্ণলতিকা যে শুকাইয়া গেল!" (৩৩৯ পৃষ্ঠা) দুর্গাদাস বাবুর মত প্রবীণ লেখকও যদি ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা বিষয়ে অনবহিত রহেন, তবে ভাষায় মলিনতাসঞ্চার ও আবর্জ্জনাসঞ্চয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। আবার তিনি স্থানে স্থানে "যখনের" পর "তখনের" ব্যবহারে ও কর্ত্তার ব্যবহারে অকারণ কার্পণ্যপ্রকাশ করিয়াছেন।

শেষ কথা, তাঁহার উপন্যাসে সাধুব্যক্তির বাহুল্য—দুষ্টগণ যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়—গ্রন্থকারের আদেশে বাধ্য হইয়া কুকর্ম্ম করে। জন ব্রাইট বলিতেন,

জগতে যথেষ্ট পাপ আছে, উপন্যাসে আবার তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক—উপন্যাস পাপীচরিত্রবর্জ্জিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সে মত সমীচীন কি না সে তর্ক করিব না। কিন্তু গ্রন্থকার যখন সেই মতানুসারে কার্য্য করেন নাই, পরন্তু গ্রন্থমধ্যে পাপীর চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তখন সে সকল চরিত্র স্বভাবানুগ হইলেই ভাল হইত।

দুর্গাদাস বাবুর নিকট আমাদের অনেক আশা—তাই এত কথা বলিলাম।

মূর্ত্তিপূজা। *

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে গ্রন্থকার নানাশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যুক্তির সাহায্যে মূর্ত্তিপূজা সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী; তিনি ইচ্ছা করিলে আরও বিশদভাবে এই জটিল বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিতেন। বিষয়ের গুরুত্বের তুলনায় প্রবন্ধটি বড় সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও, লেখক মহাশয়ের ভাষা প্রাঞ্জল, রচনা যুক্তিপূর্ণ এবং বক্তব্য বিষয় গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতাও যথেষ্ট। পুস্তিকাখানির আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে, মূর্ত্তিপূজার ন্যায় এমন একটি সাম্প্রদায়িক বিষয়ের আলোচনায় ও গ্রন্থকার সঙ্কীর্ণতা হইতে আপনাকে অনেকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। হিন্দুধর্ম্মের এই সকল তত্ত্ব দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনা করিতে পারিলে হিন্দুসমাজের পক্ষে শুভপ্রদ হইবে বলিয়া আশা হয়। সাম্প্রদায়িকতার জন্য এ সকল বিষয়ের আলোচনাই একরূপ নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। লেখক যুক্তির সাহায্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের অমূর্ত্ত (abstract) নিত্যতত্ত্বগুলি সকলে বুঝিতে পারে না। তাহাদের কল্পনার পক্ষে মূর্ত্ত (concrete) অবলম্বনের প্রয়োজন। এই হেতু সকল ধর্ম্মেই নিম্নাধিকারীর পক্ষে মূর্ত্তির কল্পনা অপরিহার্য্য। ধর্ম্মজীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন মূর্ত্তির আবশ্যকতা কমিয়া আইসে তখনই নির্ব্বিকল্প, অনন্ত, অনির্ব্বচনীয় এক সমগ্র বিশ্বসত্ত্বার উপলব্ধি সম্ভবপর হয়।

---

* মূর্ত্তিপূজা।—শ্রীহরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা, ৫৭, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ঢাকার বিবরণ।*

ঢাকা জিলার "সাধারণ ও ভৌগলিক বৃত্তান্ত" লইয়া এই পুস্তকখানি রচিত। ইহাকে গেজেটিয়ার শ্রেণীর পুস্তক বলা যাইতে পারে। পুস্তকখানি একাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে প্রাকৃতিক অবস্থা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগের বিষয়, তৃতীয় অধ্যায়ে আদমসুমারীর ফল, চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষার বিষয়, পঞ্চম অধ্যায়ে সাহিত্যকথা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক বিবরণ, সপ্তম অধ্যায়ে উৎপন্ন দ্রব্যাদির ও বাণিজ্যের বিষয়, অষ্টম অধ্যায়ে ভূমিকর ও রাজস্ব সংক্রান্ত কথা, নবম অধ্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়, দশম অধ্যায়ে দেশের অবস্থা ও একাদশ অধ্যায়ে রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তকের উপযোগিতা যথেষ্ট। কিন্তু 'ময়মনসিংহের ইতিহাসলেখকের নিকট' আমরা উৎকৃষ্টতর পুস্তক রচনার আশা করি। সে আশা পূর্ণ করিবার সম্বল যে তাঁহার আছে, তাহা আলোচ্য পুস্তকের পঞ্চম, অষ্টম ও দশম অধ্যায়ত্রয়ে দেখা যাইবে। আশা করি, তিনি এখনও অসমাপ্ত 'ঢাকার ইতিহাসে' আমাদিগের সে আশা পূর্ণ করিবেন। ঢাকার ইতিহাস স্মরণযোগ্য-ঘটনা-বিরল নহে। একদিন পূর্ব্ববঙ্গে অশান্তি-নিবারণের জন্য ঢাকার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন হইয়াছিল। ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। এক সময় ঢাকার কার্পাসবস্ত্র য়ুরোপে নৃপতিদিগের পরিধেয় রূপে সমাদরপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ঢাকার স্বর্ণ রৌপ্যের কার্য্যে ও শঙ্খের দ্রব্যে বিশেষত্ব বর্ত্তমান। আজও বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ঢাকার স্বর্ণ রৌপ্যের দ্রব্যের আদর আছে। আজও বাঙ্গালার কুললক্ষ্মীরা ঢাকার শঙ্খ সাদরে পরিধান করিয়া থাকেন। বহুদিনের পর—ভাগ্যবিপর্য্যয়ান্তে ঢাকা আবার পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী। আশা করি 'ঢাকার ইতিহাসে' এই সকল কথার সম্যক আলোচনা দেখিতে পাইব। আলোচ্য গ্রন্থে যে মানচিত্রখানি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

* ঢাকার বিবরণ—শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। ময়মনসিংহ রিসার্চ্চ হাউস হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

স্মৃতি-সাথী।*

'স্মৃতি-সাথী' কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। গ্রন্থকার তরুণবয়স্ক। আলোচ্য পুস্তক তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা। কবিতাগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ভাবসূত্র সংরক্ষের চেষ্টা আছে। তাহা প্রশংসনীয়। কারণ, তাহাতে ভাব-বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে নাই। স্থানে স্থানে ভাবের দামিনীদীপ্তি দৃষ্ট হইবে। তরুণ লেখকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। আমরা আশা করি, নবীন কবি ভারতীর সেবায় রত থাকিয়া যশ অর্জ্জন করিবেন। পুস্তকের ছাপা অত্যন্ত সুন্দর।

কবিতা ও কবিপ্রিয়া।

(১)

অতিক্রান্ত অর্দ্ধ রাতি, নিবাইনি তবু বাতি,
লিখিতেছি,—কবিতা মিলায়ে ;
পিছু হ'তে কে ফুৎকারে, মূঢ় করি' অন্ধকারে,
দিল মোর দীপটি নিবায়ে !
না বলিতে কোন কথা, কা'র দুটি বাহুলতা,
কণ্ঠ মোর করিল বেষ্টন ;
তার পর উচ্চ হাসি সব রোষ গেল ভাসি',
বরষিল অজস্র চুম্বন।

(২)

"বসিয়া নির্জ্জনে, একা, পাই কবিতার দেখা,
এ কেমন তব ব্যবহার ?
উদ্দাম অনিল মত, তুমি এলে, কাব্য গত,
আর তাঁ'রে খুঁজে পাওয়া ভার !"

(৩)

কহিল কবির প্রিয়া,— "শুধু কবিতারে নিয়া
চাহ তুমি যাপিতে জীবন ?
ল'য়ে ভাব, ভাষা, মিল, অবসর নাহি তিল,
চাহ না ত আমার মিলন !"

---

* স্মৃতি-সাথী শ্রীদীননাথ দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ১২, কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(৪)

কহিলাম—"সে কি কথা, কানু বিনা গীত কোথা ?
যা' লিখি, তা' তব প্রতিধ্বনি ;
তুমি কায়া, সে ত ছায়া, তুমি প্রেম, সে ত মায়া,
সে তটিনী, তুমি যে তরণী ।"

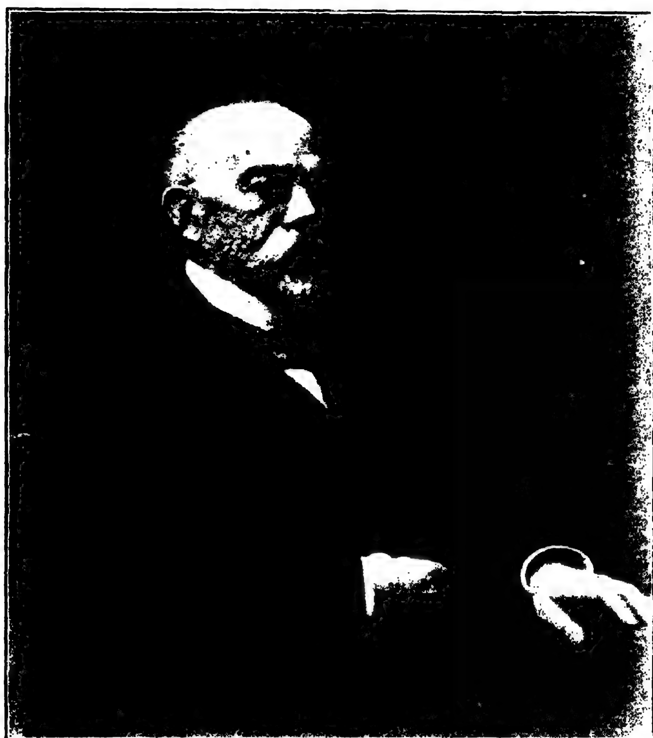
(৫)

উত্তরিল হাসি প্রিয়া— কণ্ঠে মোর লতাইয়া—
"তোমরা যে স্তাবকের জাতি !
তোমরা পাতিলে ফাঁদ, পড়ে আকাশের চাঁদ,
রবি উঠে না পোহা'তে রাতি ।
"ছোটয়ে করিতে বড় কবির কল্পনা দড়,
তৃণ তরু করেছ সমান ;
শিশিরে মুক্তার ভুল, তোমাদের কি না ভুল,
তাই বুঝি বাড়াইলে মান ?
দিনরাত মাথা কুটি', কবিতার পায়ে লুটি',
দেখা তাঁ'র পাও কি না পাও ;
কিসে তবে আমি উচ্চ, সে আমার কাছে তুচ্ছ
বুঝি না ত বুঝাইয়া দাও ।"

(৬)

কহিনু ফাঁপরে পড়ি', "বুঝাব কেমন করি',
চিত্তপটে তুমি দীপ্ত ছবি ;
তোমার প্রেমের মূর্ত্তি দিয়েছে কল্পনা-স্ফূর্ত্তি,
প্রিয়তমে, তাই আমি কবি ।"

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।



অধ্যাপক রবার্ট ক

L. P. Works,—Calcutta.

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(২)

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩১৭।

আজ পূজ্যপাদ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলাম, "রামানন্দ বাবুর বিশেষ অনুরোধ যে, আমি আপনার পুরাতন কাহিনী শুনিয়া কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করি। আপনি স্বয়ং লিখিতে পারিবেন না; আপনার নিকট শুনিয়া আমি আপনার কথাগুলি যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাকে শুনাইব; পরে আপনার কথামত আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিব। Modern Review পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় Men I have seen প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিতেছেন; আপনার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আশৈশব ঘনিষ্ঠতা ছিল; আমরা মনে করি, আপনি তাঁহার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিতে পারিবেন যে অন্যে তাহা পারিবেন না। ৺জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র সম্বন্ধে আপনার কাছে অনেক দিন অনেক কথা শুনিয়াছি; আজ সেই গুলি ভাল করিয়া শুনিয়া কাগজে প্রকাশ করিয়া আরও দশ জনকে শুনাইবার ইচ্ছা করিয়াছি।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "আমি ঠিক ধারাবাহিক একটানা বলিতে পারিব কি? কথাবার্ত্তার মাঝখানে প্রসঙ্গক্রমে দু'টা কথা বলিয়া যাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কিরূপে হয়?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬।৭ বৎসর। বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'আয় তোকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দি।' তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না, কাজেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার কোনও প্রতিবন্ধক হইল না।

"তখনও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, একটা Council of Education ছিল। সেই কাউন্সিলের অধীনতায় সংস্কৃত কলেজের একজন সেক্রেটারি ছিলেন,—তাঁহার নাম, রসময় দত্ত। রসময় বাবু Small Cause Court এর জজ ছিলেন; তিনি প্রত্যহ বেলা ৩টার সময় কলেজে আসিতেন ও ঘণ্টাখানেক সব কাগজ-পত্র ও ক্লাসগুলি দেখিতেন। তাঁহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়; তিনি সমস্ত দিনই কলেজে থাকিতেন। সেক্রেটারি হিসাবে রসময় বাবুর মাসিক বেতন ছিল—এক শত টাকা; বিদ্যাসাগর মহাশয় পাইতেন--পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

"ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই আমার 'মুগ্ধবোধ' পড়া আরম্ভ হইল। প্রথম দুই বৎসর ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করিলাম। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ পণ্ডিতের পিতৃব্য। তৃতীয় বৎসর ৺গোবিন্দ শিরোমণি মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুর্থ বৎসর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে 'মুগ্ধবোধ' অধ্যয়ন করিলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'সোমপ্রকাশ' কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এই চারি বৎসরে 'মুগ্ধবোধ' পড়া শেষ হইল। ইস্কুলে যাইবার সময় ও ইস্কুল হইতে আসিবার সময় পথে দাদার কাছে ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতাম।

"ইতোমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকরী ত্যাগ করিলেন। রসময় বাবুর সঙ্গে তাঁহার কি একটা বিষয় লইয়া ঝগড়ার মত একটা কিছু হইয়াছিল। অনেক দিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে এই ব্যাপার সম্বন্ধে-একটা কথা শুনিয়াছিলাম;—রসময় বাবু যখন শুনিলেন যে, তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়াছেন, তখন না কি বলিয়াছিলেন,—'ঈশ্বর ত চাকরী ছেড়ে দিলে,—এখন খা'বে কি করে?' কথাটা যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাণে পৌঁছিল, তখন তিনি বলিলেন—'বোলো, মুদির দোকান কোরে খাবে।'"

"সেই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই চাকরী পাইলেন। মাসিক বেতন,—আশী টাকা। এই সময়ে তিনি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বহিখানা লিখেন। এই বহি তাঁহার প্রথম রচনা।

"কিছুদিনের মধ্যে বীটন্ সাহেবের (J. Drinkwater Bethune) সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচয় হইল। বীটন্ সাহেব তখন কাউন্সিল অভ এডুকেশনের প্রেসিডেণ্ট। তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিচালনের নূতন ব্যবস্থা

করিলেন; সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ লুপ্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে একজন প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করাই স্থির হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হইলেন; মাসিক বেতন তিন শত টাকা হইল। তাঁহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পরেও পাঁচ ছয় বৎসর আমি সংস্কৃত কলেজে পড়িয়াছিলাম।

"এখন তিনি সংস্কৃত কলেজের একরকম আমূল সংস্কার করিলেন। মোটামুটি এই কয়টা কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবেঃ—

১। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। তিনি ব্যবস্থা করিলেন, বর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দুর ছেলেমাত্রই কলেজে পড়িতে পারিবে।

২। ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া আরম্ভ হইল।

৩। ব্যাকরণ পড়ানর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল; 'মুগ্ধবোধ' উঠাইয়া দিয়া 'উপক্রমণিকা' পড়ান আরম্ভ হইল।

৪। অধিক ইংরাজি পড়াইবার ব্যবস্থা হইল। এত দিন ছাত্রেরা ইচ্ছামত ইংরাজি মাষ্টারের কাছে অধ্যয়ন করিত। দুইজন ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন; ছেলেদের ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের কাছে অধ্যয়ন করিত। এখন হইতে ইংরাজি পড়া কয়েক ক্লাস উপর হইতে Compulsory হইল।

৫। সংস্কৃত গণিতশাস্ত্র—লীলাবতী, বীজগণিত ইত্যাদি পড়া উঠিয়া গেল; ইংরাজিতে অঙ্কশাস্ত্র পড়া আরম্ভ হইল। অঙ্কের অধ্যাপক হইলেন—শ্রীনাথ দাস; ইংরাজির অধ্যাপক—প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। আমি তাঁহাদের উভয়ের কাছেই পড়িয়াছি।

"এই সকল পরিবর্ত্তন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং করিলেন, ইহাতে তাঁহার উপরওয়ালাদের কোনও হাত ছিল না, এমন কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি না থাকিলে তখনকার হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির দিনে সংস্কৃত কলেজে এত পরিবর্ত্তন হইতে পারিত না।

"নূতন নিয়মে পড়ান হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের Education Despatch এর ফলে, গভর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগের ভাঙ্গা গড়া হইল। শিক্ষাবিভাগের একজন ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। অনেক বাঙ্গালা ইস্কুল স্থাপিত হইল, ইস্কুলের ইন্‌স্পেক্টরও নিযুক্ত হইলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রহিলেন, এবং ইস্কুলের পরিদর্শক হইলেন। এখন তাঁহার মাসিক বেতন হইল, পাঁচ শত টাকা। সেই সময় সংস্কৃত কলেজে একজন সহকারী প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইলেন।

"এই সময়ে ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মন বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের বনিয়াদ প্রস্তুত করা আরম্ভ হইল। প্রসন্ন বাবু বাঙ্গালায় পাটিগণিত লিখিলেন।—আমার দাদা তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রসন্ন বাবুর সংস্কৃত অঙ্কশাস্ত্র পড়া ছিল না, তাই তাঁহার পাটিগণিতের সমস্ত terminology (যথা,—বর্গ, ঘন, বর্গমূল, ঘনমূল, করণী, ত্রৈরাশিক, ভগ্নাংশ, গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক, লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক ইত্যাদি) আমার দাদা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পাটিগণিতের প্রথম সংস্করণে তাঁহার প্রিয় ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্য্যের নাম এই জন্য সবিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের তারিণীকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালায় ভূগোল লিখিলেন; আজ পর্য্যন্ত তাঁহারই terminology প্রচলিত। সকলের অপেক্ষা অধিক লিখিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়,—

(১) জীবন চরিত—Chamber's Biographyর অনুবাদ।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—Marshmanএর অনুবাদ।

(৩) মহাভারতের উপক্রমণিকা।

(৪) বোধোদয়।

(৫) ব্যাকরণকৌমুদী।

(৬) ঋজুপাঠ।

(৭) Expurgated রঘু, কুমার, ভারবী, মাঘ।

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইলে, ঐ বৎসরই আমি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন, যে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইতেছি; তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; আমাকে বলিলেন,—'তুমি ষোল টাকা বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যা'চ্ছ; আমি বলি, তুমি মেডিক্যাল কলেজে যাও, ডাক্তারি পড়, আমি তোমার আটাশ টাকা বৃত্তি ক'রে দোবো।' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি, আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না; প্রেসিডেন্সি কলেজেই ভর্ত্তি হইলাম। এই রকম একগুঁয়েপনা আমার বরাবর রহিয়া গেল। ভবিষ্যতে এমন অনেক বার আমি শুধু যে তাঁহার কথা অমান্য করিয়াছি তাহাই নহে, তাঁহার উপর

অভিমান করিয়া, রাগ করিয়া তাঁহাকে অনেক কড়া কথা লিখিয়াছি। অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি আমার 'বিচিত্রবীর্য্যে'র প্রশংসা করিয়াছিলেন; তাই আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমার বহিখানি পড়িতে অনুরোধ করি। মাস তিনেক পরে বহিখানি আমাকে ফিরাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন,—'ওহে, আমার এমন সময় হচ্চে না যে, তোমার বইখানা পড়ি।' আমার বড় রাগ হইল। আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া একেবারে Byronএর English Bards and Scotch Reviewersএর মত চারি পাঁচ শত লাইন পয়ার লিখিয়া ফেলিলাম। রাগ হইল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর, কিন্তু আমি রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেককে জড়াইয়া ফেলিলাম। একটু একটু এখনও মনে আছে—বায়রণকে স্মরণ করিয়া বলিলাম—

তাদৃশ ক্ষমতা-বল যদিও না ধরি।
তথাপি, রাজেন্দ্র, তুমি মম যোগ্য অরি॥
কখনও মাছের মত মারহ ঠোক্কর।
দু' এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থের উপর॥
গাধারে পিটিলে কভু হয় নাকি ঘোড়া।
লুই কি ধোয়ালে হয় গঙ্গাজলে জোড়া॥
হাজার সাধনা কিম্বা করিলে প্রয়াস।
মূর্খ কভু নাহি পায় লিখিয়া সাবাস॥

"ঐ পয়ারটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আরও কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিলাম। 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় কিন্তু প্রকাশ করি নাই।

"আমি সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার বৎসর খানেক পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকরী ত্যাগ করিলেন। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর গর্ডন ইয়ং সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বনিবনাও হইল না। কাউয়েল সাহেব সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইলেন।

"এক বৎসর পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমে যাইলাম। পরে ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ দিলাম। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমার দাদা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। সুতরাং আমাকে চাকরী করিতে হইল। ইস্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হইলাম। ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব আমায় বড় ভাল বাসিতেন; তাঁহার স্ত্রীও বিদুষী ছিলেন। ফরাসী ভাষায় লেখা বহি আমি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি আমার উচ্চারণের বড়

প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের কাছে কখনও মাথা হেঁট করিতাম না; সেটা যে চাকরীর পক্ষে ভাল, তাহা বলিতেছি না; অনেক সময় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতাম। এই যে ভাব, এটা আমার মনে হয় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অত নিবিড় ভাবে ছেলেবেলা হইতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় হইয়াছিল। উড্রো সাহেব এক দিন আমায় বলিলেন,—'এস আমার গাড়ীতে এস। তোমার বাড়ি অনেক দূর, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি যাব।' আমি বলিলাম,—'No, thank you I shall walk home' তিনি আমাকে তাঁহার নিজের খরচে বিলেত পাঠাইবার মৎলব করিয়াছিলেন; তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমি সিভিল সার্ব্বিশ পরীক্ষা পাশ করিয়া আসি; কিন্তু তাহা হয় নাই,—গ্রহের দোষ।

"১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের Junior Professor of Vernacular পদে নিযুক্ত হইলাম। ছয় মাস পরে রামচন্দ্র মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট Sir Cecil Beadon কে বলিয়া আমাকে Senior Professorএর পদে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন, আর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে Junior Professor করাইয়া দিলেন। আমি বাঙ্গালা পড়াইতাম। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস লইয়া আরম্ভ করা হইল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পুস্তক যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল—অমনি আমি কলেজে পড়াইতে লাগিলাম। কৃষ্ণ বন্দ্যোর 'ষড়্দর্শন,' হেম বন্দ্যোর 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রভৃতি ধরাইলাম। হেমবাবুকে জনসাধারণের কাছে, বোধ হয়, আমিই পরিচিত করি। একখানা পত্রিকায় আমি 'চিন্তাতরঙ্গিণীর' সমালোচনা করিয়া—তাহার ভাল মন্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলাম। Byronএর Don Juan হইতে যে অংশ তিনি ছাঁকা তর্জ্জমা করিয়াছেন, অনুবাদ হিসাবে তাহা মন্দ হয় নাই। আমার দাদার 'বেকনের সন্দর্ভ'ও কলেজে পড়ান হইত। রাসবিহারী (Dr. Ghose) শুধু এই বইখানা পড়িয়া বি. এ. পাস হইয়াছিলেন। অনেক দিন পরে একদিন রাসবিহারী আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—'কেমন আপনাকে ঠকিয়েছিলুম, রামকমল বাবুর 'বেকনের সন্দর্ভ' খানি আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেলেছিলুম, আপনি টের পান নি, আমায় পাস করে দিয়েছিলেন।' আমি উত্তর দিয়াছিলাম, -'তা' নয়, তোমার মত মেধাবী ছেলে কি একখানা বই মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে?'

"শুধু বাঙ্গালা পড়াইয়া আমার তৃপ্তি হইত না। কাউয়েল্ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটু একটু সংস্কৃত পড়ান আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, একবারেই 'কাদম্বরী' আরম্ভ করি; সাহেব বলিলেন, 'ওটা too ambitious'; কাযেই ঋজুপাঠ তৃতীয় ভাগ লইয়া সংস্কৃত ক্লাস আরম্ভ হইল। ক্রমে 'কুমার' 'বেণীসংহার' ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত হইল।

"বাঙ্গালা পড়ুয়ার শেষ দলের মধ্যে ছিলেন, রাসবিহারী; সংস্কৃত পড়ুয়ার প্রথম দলের মধ্যে ছিলেন, সারদাচরণ মিত্র।

"সারদা খুব ভাল সংস্কৃত শিখিয়াছিল; ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতির 'আশুবোধ ব্যাকরণ' একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। সংস্কৃত ক্লাসের অধিকাংশ ছেলেই প্রায় পলাইত, সারদার পড়ার আগ্রহ দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতাম। যেমন ইংরাজি সাহিত্যে, তেমনই সংস্কৃতে।

"আমার ছাত্রদিগের আমি পরীক্ষক হই, এটা ভাল নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি স্বেচ্ছায় পরীক্ষক হইলাম না। সেইবার হইতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু আমার ছাত্রেরা খুব উচ্চস্থান অধিকার করিত; সারদা সকলের অপেক্ষা ভাল ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা পারিয়া উঠিত না।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

জন্ম ও মৃত্যু।

কহে মৃত্যু—ওগো জন্ম জীবন-মঙ্গল
তুমি আমি আছি দূরে মাঝে ব্যবধান;
তুমি এলে হাসে জীব, মোরে করে ভয়,
বল দেখি, উভয়ের মাঝে কে প্রধান?
জন্ম কহে, উচ্চ নীচ করহ বিচার;
দুজনার আত্মকথা শুন বলি তাই,—
মম আগমনে মৃত্যু তব আগমন;
আছি বলে আছ তুমি, না থাকিলে নাই।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

অধ্যাপক রবার্ট ক।



আর্য্যাবর্ত্তের' কয়েক সংখ্যায় কীটাণুতত্ত্বের যে ইতিহাসের আলোচনা করা গিয়াছে, সেই সম্পর্কে অধ্যাপক কএর আবিষ্কার ও জীবন-কথা সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা না করিলে কীটাণুতত্ত্বের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই জন্য আজ 'আর্য্যাবর্ত্তের' পাঠকগণকে অধ্যাপক কএর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত উপহার দিতেছি।

এই অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক কীটাণুতত্ত্বের নূতন নূতন আবিষ্কারফলে চিকিৎসাশাস্ত্র উচ্চতর ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গত ২৭শে মে বেডেন বেডেনে হৃদরোগে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ভীরকাউ-এর মৃত্যুর পরে আর কাহারও মৃত্যুতে বিজ্ঞান জগতে এরূপ ক্ষতি হয় নাই। কীটাণুতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিবার জন্যই যেন তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে হার্জ পর্ব্বতের সান্নিধ্যে ক্ল্যানস্থালে বরার্ট ক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বহুপরিবারভুক্ত ও সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৮৬২-৬৬ খৃঃ অঃ বরার্ট ক গটিন্‌জেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে উপাধি-লাভ করিয়া কিছুকালের জন্য হামবার্গ জেনারল হাঁসপাতালে হাউস সার্জ্জেনের কার্য্য করেন ও তৎপরে হানোভরের সান্নিধ্যে ল্যান্‌জেন হেগেন গ্রামে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পোশেন প্রদেশে গমন করেন।

পরে সরকারী চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করিয়া তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পোশেন প্রদেশস্থ ওয়ালিষ্টিন নামক স্থানের প্রধান স্বাস্থ্যকর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। এই স্থানে তিনি প্রায় ৮ বৎসর কাল ছিলেন। এই ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামে—বৈজ্ঞানিক জগতের বহু দূরে অবস্থিত হইয়াও, কীটাণুতত্ত্বে মনোনিবেশ করিয়া তিনি এক নবযুগের সূচনা করেন। তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না—এমন কি অর্থাভাবহেতু তিনি একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র কিনিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী মিতব্যয়ে সংসার চালাইয়া স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহাকে একটি অণুবীক্ষণ উপহার দিয়াছিলেন। এই স্থানেই

তিনি অদ্বিতীয় ফরাসী কীটাণুবিদ্ পাস্তুরের পথাবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কীটাণুর উৎপাদনের জন্য "Solid Media" প্রস্তুত করিয়া তিনি এই বিজ্ঞান-চর্চ্চার পথ অনেক পরিমাণে প্রশস্ত করিয়া দেন। ঐ সময়ে পাস্তুর Anthrax নামক সংক্রামক ব্যাধির পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। পাস্তুর অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই ব্যাধি কীটাণুকর্তৃক উৎপাদিত,—অধ্যাপক ক পরীক্ষা দ্বারা উহা সপ্রমাণ করেন। এই সময়েই তিনি কীটাণু-তত্ত্বে চারিটি স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ করেন। * অধ্যাপক ক তাঁহার গবেষণা শেষ করিয়া ব্রেসলান নগরে বিখ্যাত অধ্যাপক ফার্ডিনাণ্ড কৌনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়েন। অধ্যাপক কৌন এই অপরিচিত চিকিৎসকের আবিক্রিয়ার ও গবেষণার গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করেন। তিনি স্থানীয় নিদানের অধ্যাপককে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট আসিতে অনুরোধ করেন এবং তৎসঙ্গে বলিয়া পাঠান যে, পোশেন প্রদেশ হইতে একজন চিকিৎসক আসিয়াছেন, তাঁহার আবিষ্কার প্রাণি-তত্ত্বে এক নূতন যুগ আনয়ন করিবে। অধ্যাপক কৌনের পরিচালিত প্রাণি-তত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকায় অধ্যাপক কএর প্রথম গবেষণার ফল বাহির হয়। ইহাতে তিনি কৃত্রিম Media তে কীটাণু উৎপাদনের প্রক্রিয়া সন্নিবেশিত করেন এবং সপ্রমাণ করেন যে, কীটাণু অপেক্ষা তাহার বীজসকল অধিক ক্ষমতাশালী। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'Wound Infection' নামক এক পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া বিখ্যাত লিষ্টারের "Antiseptic" অস্ত্র-চিকিৎসা প্রণালীর সমর্থন করেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবনে এক নূতন ঘটনা ঘটিল। তিনি বার্লিনে Imperial Health Office এ সদস্য পদের জন্য আহুত হইলেন। Disinfection এর গবেষণা করা তাঁহার কার্য্যের মধ্যে নিরূপিত হইল। এই স্থানে তিনি অনুবীক্ষণে Abbe condenser ব্যবহার করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে উপদেশ দেন। এই স্থানেই তিনি যক্ষ্মা রোগের মৃত্যু-তালিকা দেখিয়া তাহার প্রতিবিধানের উপায় নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হয়েন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কএর প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ। তিনি যক্ষ্মারোগের নিদান ও কীটাণু আবিষ্কৃত করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন, এবং চারিটি স্বতঃসিদ্ধদ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি

* 'আর্য্যাবর্ত্ত'—ভাদ্র, ৩৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে, তিনি তাঁহার প্রথম গবেষণার ফল একখানি প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়িণী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু এখনও তিনি তাঁহার অসাধারণ আবিষ্কারের কথা কোন চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ না করিয়া বার্লিনের বিখ্যাত প্রাণি-শরীরতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক রেমণ্ড পরিচালিত এক বৈজ্ঞানিক সভায় তৎসম্বন্ধে এক সন্দর্ভ পাঠ করেন। ইহাতে জর্ম্মাণী কেন সমস্ত সভ্যজগতে তাঁহার যশঃসৌরভ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। Anthrax এর কীটাণুর গবেষণা কেবল ব্যবসায়ীর উপকার করিয়াছিল। এখন মনুষ্যের এইরূপ সংক্রামক ব্যাধির কীটাণু আবিষ্কার করিয়া তিনি সমগ্র মানবজাতির উপকার সাধন করিলেন। তিনি এই সময়ে প্রিভি কাউন্‌সেলারের পদে উন্নীত হয়েন। কিন্তু এই উচ্চ পদ লাভ করিয়াও তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চায় বিরত হইলেন না।

১৮৮৩—৮৪ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণ গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি বিসূচিকার কারণ নির্ণয়ের জন্য মিসরে ও ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি তাঁহার দুইজন সহকারী Dr. Gaffry Dr. Fischer সমভিব্যাহারে মিসরে উক্ত সংক্রামক ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে মনোযোগী হয়েন। তথায় কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া তিনি এই রোগের আদিস্থান ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। ভারত গভর্মেণ্ট তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাঁহাকে যথাসম্ভব সাহায্য-প্রদান করেন। কলিকাতায় কিছুদিন কার্য্য করিয়া তিনি সপ্রমাণ করেন যে, এই ব্যাধি—"কমা" র মত আকৃতি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণুর দ্বারা উৎপাদিত। কলিকাতার এক পুষ্করিণীর পানীয় জলে ও বিসূচিকা রোগগ্রস্ত কিংবা বিসূচিকায় মৃত ব্যক্তির অন্ত্রে এই সকল কীটাণু লক্ষিত হয়। তাঁহার এই আবিষ্কারের জন্য জর্ম্মাণ গভর্মেণ্ট তাঁহাকে ৭৫০০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। এই আবিষ্কারের পর বার্লিনে সংক্রামক ব্যাধির নিবারণ-কল্পে এক মহাসভার অধিবেশন হয়। কয়েক বৎসর পরে অধ্যাপক ক হামবার্গে এই ব্যাধির প্রকোপকালে তাঁহার পূর্ব্বের মত সপ্রমাণ করেন।

তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর জর্ম্মাণ গভর্মেণ্ট অধ্যাপক ককে তাঁহার বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য প্রচুর সাহায্য করেন। Imperial Health Office এ সদস্যের কার্য্যে তাঁহাকে অনেক সময় লিখন পঠনে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। ইহাতে বিজ্ঞান-চর্চ্চার অসুবিধা হইত।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের Hygenic Institute

এর অধ্যক্ষ ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের অধ্যাপক হয়েন। কিন্তু শিক্ষা ও তত্ত্বাবধান কার্য্যে অত্যধিক সময় অতিবাহিত করিতে হইত বলিয়া তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া Royal Institute for Infectious Diseases এ যোগদান করেন। ইহার সংলগ্ন একটি উত্তম গবেষণা গৃহ ও হাঁসপাতাল ছিল। এই স্থানেই তিনি যক্ষ্মারোগের কীটাণু বিনাশের উপায় উদ্ভাবনের জন্য অদম্য উদ্যম সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি Berlin Medical Congress এ যক্ষ্মারোগের তৎকর্তৃক আবিষ্কৃত Tuberculin নামক ঔষধ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি প্রকাশ করেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা তখনও শেষ হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুবর্গের ও অনেক স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের অনুরোধে তিনি যাহাতে যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হইতে পারে সেইরূপ উপায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ কোন জর্ম্মাণ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ইহাতে সমস্ত বিজ্ঞান জগতে আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাঁহার ঔষধ কোন কোন হাঁসপাতালে পরীক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু ভীরকাউ প্রথম হইতে ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্রমে সমস্ত হাঁসপাতালে চিকিৎসকগণ গ্রহণ করাতে ঐ ঔষধ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে দলে দলে যক্ষ্মারোগী বার্লিনে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু অনেককেই হতাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগের উপশম না হইয়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কাহারও কোন উপকার হইল না। কোন কোন হতভাগ্য ইহলীলা সংবরণ করিল। ইহাতে অনেক চিকিৎসকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সম্বন্ধে Berlin Medical Society তে ভীরকাউ কএর ঔষধে চিকিৎসিত একটি যক্ষ্মারোগীর ফুস ফুস প্রদর্শিত করেন এবং বলেন যে, এই ঔষধে কোন উপকার হয় নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার Tuberculin প্রস্তুত করেন। ইহাই এখন যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা ও রোগনির্ণয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যাপারে অধ্যাপক কএর যশের কিছুমাত্র হানি হয় নাই।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গভর্মেণ্ট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি গোবসন্তের তত্ত্বানুসন্ধানজন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। তথায় তিনি সপ্রমাণ করেন, গোবসন্ত হইতে যে গরু আরোগ্য লাভ করিয়াছে তাহার রক্ত অন্য গরুর রক্তে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে সেই গরু উক্ত ব্যাধির হস্ত হইতে

নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে এবং ব্যাধিও বিশেষ সংক্রামক হইতে পারে না। ইহাতে গোজাতির রক্ষা হইতে পারে। সেই বৎসরই তিনি প্লেগের তত্ত্বানুসন্ধানজন্য—দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন।

ভারত গভর্মেণ্ট অধ্যাপক কএর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার অনুসৃত গোবসন্তের প্রতিষেধক চিকিৎসা-প্রণালী এই দেশে প্রচলিত করিবার জন্য যত্নবান হইলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কীটাণুবিদ্‌গণকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য আয়োজন করিলেন। অধ্যাপক ক তাঁহার সহকারী ডাক্তার পিফারের সমভিব্যাহারে ডাক্তার লিংগার্ড পরিচালিত মুক্তেশ্বর শৈলে Imperial Bactriological Laboratoryতে তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালী প্রদর্শিত করেন। সে সভায় নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিকগণের সমাগম হইয়াছিল--ডাক্তার লিংগার্ড, ডাক্তার ষ্টিফেন্‌স্, কর্ণেল পিস, কর্ণেল রেমণ্ড, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল এভান্স ও মেজর ব্যালড্রি। বাবু সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ও বাবু মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় সে সময় কর্ণেল রেমণ্ডের সহকারিরূপে তথায় গমন করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইটালীয়ান গভর্মেন্টের অনুরোধে ইটালীতে ম্যালেরিয়ার তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ক পুনরায় জর্ম্মাণী পরিত্যাগ করিয়া ইটালীতে গমন করেন এবং সেই বৎসরেই জর্ম্মাণ গভর্মেণ্টের অনুরোধে পুনরায় আফ্রিকায় গমন করিয়া তথায় এই ব্যাধির গবেষণায় নিযুক্ত হয়েন। তিনি এই গবেষণায় কোনও নূতন তথ্যের আবিষ্কার করেন নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কীটাণুবিদ্‌গণের মত প্রমাণিত করিয়াছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ক British Tuberculosis Congressএ মনুষ্য এবং গোজাতির যক্ষ্মাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাধি উল্লেখ করিয়া এক সন্দর্ভ পাঠ করেন। বহু চিকিৎসক তাঁহার মতের প্রতিবাদ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি যক্ষ্মা-নিদান সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধে মনুষ্য ও গো-যক্ষ্মা একই বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। Tuberculin সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ কালেও তিনি উক্ত মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। International Tuberculosis Congress এ গো-যক্ষ্মা ও মনুষ্য-যক্ষ্মা পৃথক ব্যাধি বলিয়া প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব মতেরই প্রতিবাদ করিলেন। উক্ত সভার সভাপতি লর্ড লিষ্টার অধ্যাপক কএর অসাধারণ প্রতিভার প্রশংসা করিয়া পরে বলেন যে, মনুষ্য-ও গো-যক্ষ্মার কীটাণুর কোন পার্থক্য নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিদেহে প্রবেশ করিয়া তাহারা কেবল কিয়ৎ পরিমাণে রূপান্তর প্রাপ্ত

হইতে পারে। এই মত প্রমাণের নিমিত্ত একটি নূতন Royal Commission on Tuberculosis এর সৃষ্টি হইল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এই সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মাণী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে উক্ত Commissionএ মত প্রেরিত হইল। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, উভয় প্রকার যক্ষ্মা একই কীটাণু হইতে উৎপাদিত; তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিদেহে কীটাণুর রূপান্তর হয়। British Commission এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে,মনুষ্য-যক্ষ্মার কীটাণু অত্যন্ত বিষাক্ত, কিন্তু উহা গোজাতির দেহে প্রবিষ্ট করাইলে রোগ জন্মিতে অনেক সময় লাগে এবং জন্মিলেও ব্যাধি মারাত্মক হয় না—পরন্ত আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু গো-যক্ষ্মার কীটাণু মনুষ্য দেহে প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে না।

মনুষ্য-যক্ষ্মাতে কোন কোন ক্ষেত্রে গো-যক্ষ্মার অনুরূপ কীটাণু পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে এখনও মতবাদ চলিতেছে এবং কোনরূপ সিদ্ধান্ত হয় নাই। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক কএর একটু ভ্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ ভ্রমের জন্য তাঁহাকে নিন্দা করা যায় না; কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কীটাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিদেহে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়।

অধ্যাপক ক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ষ্টকহল্‌মে How to fight against Tuberculosis নামক বক্তৃতা পাঠ করেন এবং ঐ বৎসরেই Nobel Paize প্রাপ্ত হয়েন। অধ্যাপক ক কখনও সহজে মত পরিবর্ত্তন করিতেন না। এমন কি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটনের Congress এ তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছিলেন। তবে দুই এক স্থানে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কীটাণু বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে জীবনব্যাপী চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। গত বৎসর শীত ঋতুতে তাঁহার হৃদ্‌রোগের লক্ষণ দেখা যায়। অধ্যাপক ফ্রান্স তাঁহাকে বিজ্ঞানচর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। তিনি সমুদায় কাষ বন্ধ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। শেষে বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বেডেনবেডেনে যাইয়া তথায় গত ২৭শে মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই অসাধারণ বৈজ্ঞানিকের Anthrax, বিসূচিকা, যক্ষ্মা, গো-বসন্ত, Sleeping Sickness, Black-water Fever, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি

স্বকীয় গবেষণা বিজ্ঞান জগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বিজ্ঞান জগত তাঁহার নাম চিরকাল স্মরণ রাখিবে।

ক এর অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও কার্য্যতৎপরতা অতি অসাধারণ ছিল। তিনি আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে যে সকল সম্মান ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার জন্য কখনও লালায়িত ছিলেন না। তিনি দুই বার বিবাহ করেন। ৫০ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার স্ত্রী ও একটি কন্যা বর্ত্তমান। সমগ্র শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক জগত আজ এই শোকসন্তপ্ত, বিয়োগ-কাতর ক্ষুদ্র পরিবারের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। *

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।

হরিদ্বার।

স্বভাবের শোভাতীর্থ তুমি হরিদ্বার,
বিরাজ কি স্নিগ্ধরূপে হিমাদ্রি-তোরণে!
নিবিড় বনানী ঘিরে আছে চারিধার;
খেলে শোভা-সৌদামিনী ভূতলে গগনে!
ঊর্দ্ধে শৈল শিবালিক শত শৃঙ্গ তুলি',
কি বাহু বেষ্টনে তোমা রেখেছে বেড়িয়া;
অতুল সৌন্দর্য্য হেরি 'স্বর্গরাজ্য ভুলি',
দেবতা নিবসে তোমা প্রেমেতে মজিয়া।
চিররম্য হিমাদ্রির তুষার-মুকুটে,
বিচিত্র মেঘের লীলা বিচিত্র বরণ;
কি মহা মহিমা হেরি' চিত্ত পড়ে লুঠে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সংযোগের সেতু সুশোভন!
অপূর্ব্ব গঙ্গার দৃশ্য! আজি হিমাচলে,
বহে পুণ্য প্রবাহিনী প্রখর হিল্লোলে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

---

* এই সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলনে আমি Lancet পত্রিকা হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ক এর প্রতিকৃতিটি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মণ্ডল কর্ত্তৃক British Medical Journal এ প্রকাশিত চিত্র হইতে গৃহীত।

মৃত্যু-মিলন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দম্পতী।

—*—

রজনীর দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। ত্রয়োদশীর অসম্পূর্ণ চন্দ্রগোলক গগনে সমুদিত। চন্দ্রকে বেষ্টিত করিয়া অগণিত তারকা মেঘহীন গগনে প্রদীপ্ত।

শক্ত সিংহের গৃহ সুপ্তিশান্ত। নিদ্রিত গৃহের উপর চন্দ্রকর লুটাইয়া পড়িয়াছে। গৃহসংলগ্ন উদ্যানে রজনীগন্ধার ও বেলার বিকশিত শ্বেত শোভা হরিতের রাজ্যে বৈচিত্র্য দান করিতেছে। পবনে ঘন সৌরভ যেন পবনকে ভারাক্রান্ত—অলস করিয়া তুলিয়াছে। দিবসের দারুণ তাপের হ্রাস হইয়াছে।

গৃহের পার্শ্বস্থ একটি দ্বার উন্মুক্ত হইল। কক্ষ হইতে দুইজন লোক নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানে উপনীত হইলেন। উভয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুইজনের মুখে চন্দ্রকর পতিত হইল;—একজন সৈনিক যুবক—আর একজন রেবা। সৈনিকের বাহু রেবার ক্ষীণ মধ্যদেশ বেষ্টিত করিয়া আছে; উভয়েই যেন একই স্বপ্নে বিভোর।

রেবার নয়নে যে প্রেমদীপ্তি তাহার তুলনায় আলোকসম্পাতসমুদ্ভুত হীরকের দীপ্ত দীপ্তি তুচ্ছ। রেবা অনিমেষ নয়নে বাঞ্ছিতের মুখপানে চাহিয়া ছিল। তাহার হৃদয় ঐ গগনেরই মত দীপ্তদীপ্তি-সমুজ্জ্বল। তথায় মেঘান্ধকারলেশ নাই। সে বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়াছে, তাই সে আপনাকে সকল সুখে সুখী মনে করিতেছে। প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকাকে আপনার সুখে সম্পূর্ণ সুখী করে—ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম।

দুই জনেরই মুখ প্রফুল্ল—যেন আনন্দ উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেছে।

দুইজনে আসিয়া উদ্যান-সীমায় সেই শিলাখণ্ডের উপর বসিলেন। সৈনিক বলিলেন, "এই স্থানে আমাদের প্রথম পরিচয়।"

রেবা বলিল, "সেই প্রথম পরিচয় হইতে এ স্থান আমার নিকট পুণ্য তীর্থ।"

"সে কথা আমার পক্ষেই সত্য। আমি এই পুণ্যতীর্থে জীবনসাধনধন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।"

"ও কথা বলিয়া আমাকে লজ্জা দিও না। তোমার জন্য কত নারী যুগে যুগে সাধনা করিতে উৎসুক হইবে।"

সৈনিক হাসিয়া রেবার ফুল্ল অধরে আবেগভরা চুম্বন দান করিলেন,—বলিলেন, "তবে বলিতে হয়, আমি এই স্থানে চোরের মত অমূল্য রত্ন চুরি করিয়াছি।"

"ছিঃ! আমার হৃদয় কি অমূল্য রত্ন? তুমি সেই অসার বস্তু গ্রহণ করিয়াই তাহাকে ধন্য করিয়াছ।"

রেবা দুই বাহু দিয়া সৈনিকের গলদেশ বেষ্টিত করিয়া উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত আননে—মুগ্ধ নয়নে সৈনিককে দেখিতে লাগিল; তাহার পিপাসিত দৃষ্টি যেন অমৃতপানে তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল।

সৈনিক তাঁহার নিকট সকল সৌন্দর্য্যের সার সেই কনককমলকান্তি আনন চুম্বন করিলেন। রেবার তৃষিত অধর সৈনিকের অধর স্পর্শ করিল,—সে যেন দীর্ঘ চুম্বনে প্রেমসুখ-তৃষ্ণা মিটাইয়া লইল।

যুবক রেবাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কালিদাস কখনও রেবা দেখেন নাই।"

রেবা সহসা এই প্রসঙ্গে বিস্মিতা হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"দেখিলে তিনি রেবার অন্যরূপ বর্ণনা করিতেন।"

রেবা তখনও কিছু বুঝিতে পারিল না; বরং তাহার বিস্ময় বর্দ্ধিত হইল। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সৈনিক বলিলেন, "কালিদাস মেঘকে বলিয়াছেন,—'রেবাংদ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং।' রেবা কি কখনও বিশীর্ণা হইতে পারে?" সৈনিকের অধর রেবার বিম্বোৎপলপ্রভ কপোল স্পর্শ করিল।

রেবা হাসিয়া বলিল, "কেন? বিরাটবপু বিন্ধ্যের চরণতলে তুচ্ছ রেবা তুচ্ছতরা। পুরুষের সবল সম্পূর্ণতার নিকট রমণীর ক্ষীণতা—দীনতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কবি তাহাই বুঝাইয়াছেন।"

সৈনিক বলিলেন, "বরং বল, বিন্ধ্যের উপলবিষম চরণে পড়িয়াই রেবার

দুর্দশা। শিলাসার পুরুষ রমণীর আদর কি বুঝিবে? সে আপনার উন্নত গর্ব্বে আপনি অন্ধ—আত্মসুখেই তাহার তৃপ্তি। তাই কবি বলিয়াছেন,—"অস্থানে পততামতীব—"

"তাহা নহে। রেবা দীনা—ক্ষীণা—শীর্ণা। তবু বিন্ধ্য তাহাকে চরণ-চ্যুত করে নাই, বরং সাদরে প্রেমধারাদানে তাহার দীনতা দূর করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট।"

"বিন্ধ্যের সে কার্য্য স্বার্থসঞ্জাত। রেবা নহিলে কে তাহার নীরসতা সরস করিবে; শুষ্ক, কঠোর, ধূসর শিলাদেহ স্নিগ্ধশ্যামে সুশোভিত করিবে?"

"রেবাকে সেই অধিকার দানেই বিন্ধ্যের দয়ার পরিচয়।"

"না। কালিদাস পরবর্ত্তী শ্লোকেই তাহা বুঝাইয়াছেন। যে পূর্ণতা গৌরব-জনক—যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে মেঘকে অনিলও বিচলিত করিতে পারে না—সে পূর্ণতা রেবার দান। নারীই পুরুষের সম্পূর্ণতার কারণ। যত দিন সে সম্পূর্ণতালাভ না ঘটে, তত দিন তুচ্ছ ঘটনার আঘাতে পুরুষের হৃদয় চঞ্চল ও ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান হয়। রমণী পুরুষকে সম্পূর্ণ করে—তাহাকে গৌরব-গর্ব্বলাভে সমর্থ করে।"

প্রেমিকপ্রেমিকার প্রণয়পূর্ণ—প্রণয়োদ্ভূত কথোপকথন; কথায় কথায় কথা বাড়িয়া যায়। যখন এ উহার বাক্যসুধাপান-পিয়াসী তখন কি কথার শেষ হয়? তখন দেখিতে দেখিতে সময় কাটিয়া যায়, সে দিকে কাহারও লক্ষ্য থাকে না।

দম্পতীরও তাহাই হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে যে সময় যাইতেছিল, সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর কাহারও ছিল না। উভয়ে উভয়ের সংসর্গ-সুখে তন্ময়। হায়—প্রেম জগতে যদি তুমি ব্যতীত আর কিছু না থাকিত, তবে জগৎ কি সুখেরই হইত!

রেবা জিজ্ঞাসা করিল. "কবে আমাকে তোমার গৃহে লইয়া যাইবে?"

সৈনিক হাসিয়া বলিলেন, "আমার গৃহ বুঝি তোমার গৃহ নহে?"

রেবা লজ্জিতা হইল,—বলিল, "কবে আমাদের গৃহে যাইব?"

রেবা স্বামীর গৃহ ও স্বামীর স্বজনগণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়াছিল। সে নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, তাই সে সেই জীবনে যাহারা সঙ্গী তাহাদের সন্ধান করিতেছিল।

সৈনিক বলিলেন, "আমি অবসর পাইলেই তোমাকে লইয়া যাইব।"

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, কবে অবসর পাইবে?"

"তাহা ত বলিতে পারি না।"

"সৈনিকের কার্য্যে কি অবসর নাই ?"

"আছে ; কিন্তু অল্প। রাজ্য-রক্ষার কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা যাহাদের প্রয়োজন, তাহাদের অধিক অবসরলাভ ঘটে না।"

"তুমি সৈনিকের কার্য্য ছাড়িয়া দাও না কেন ?"

"তাহাতে কি লাভ হইবে ?"

"আমরা সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকিতে পারিব।"

"কিন্তু সকল সৈনিক যদি কার্য্য-ত্যাগ করিয়া আইসে, তবে কে রাজ্য রক্ষা করিবে ?"

"সকলে আসিবে কেন ?"

"আর সকলেও ত বিবাহ করিতে পারে।"

রেবা লজ্জিতা হইল। এ কথা ত সে ভাবিয়া দেখে নাই! সে কেবল আপনার কথাই ভাবিয়াছে। তাহার লজ্জারক্তগণ্ডযুগ লোধ্রপুষ্পযুগলের শোভা ধারণ করিল। সেই শোভা দেখিতে দেখিতে সৈনিক বাহুপাশবদ্ধা প্রণয়িণীকে আরও নিকটে টানিয়া লইলেন ; তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "আর আমি যদি সৈনিকের কার্য্য-ত্যাগ করিয়া আসি, তবে তুমি আর আমাকে ভাল বাসিবে না।"

রেবা যেন চমকিয়া উঠিল। সে যে তাহার পতিকে ভালবাসিবে না, এ কল্পনাও তাহার পক্ষে অসহনীয়। সে বলিল, "কেন ?"

সৈনিক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তখন তুমি আমাকে অকর্ম্মণ্য জীব মনে করিবে ; মনে করিবে,—আমি অসার, তাই অলস জীবন যাপন করিতেছি। কর্ম্মই মানবজীবনের লক্ষণ, কর্ম্মহীনতা জড়ের প্রকৃতি। তাই আমি কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিলে তুমি বিরক্ত হইবে।"

রেবা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, "কখনও না। তুমি যাহাই কর, আমি তোমাকে ভালবাসিব। বরং তোমার কর্ম্মই তোমাকে আমার নিকট হইতে দূরে লইয়া যায়।"

"অর্থাৎ আমার কর্ম্মই তোমার সপত্নী।"—সৈনিক হাসিতে লাগিলেন, আবার রেবার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি থাকিলেই আমার যথেষ্ট কর্ম্ম। কিন্তু এখন বিরল-প্রাপ্ত মিলনে আনন্দ পাইতেছ ; মিলন চিরস্থায়ী হইলে তাহাতে বিরক্ত হইবে না ত ?"

"তোমার কি তাহাই হইবে?"

অভিমানে রেবার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সৈনিক ব্যস্ত হইয়া সে অশ্রু মুছাইয়া দিলেন; বলিলেন, "রহস্তে ব্যথিতা হইতে আছে?"

তাহার পর সৈনিক বলিলেন, "আমি যত সত্বর পারি অবকাশ লইয়া তোমাকে লইয়া যাইব।"

"তুমি রাজার নিকট অবকাশ প্রার্থনা কর না কেন?"

"তাহাই করিব।"

"রাজা কি অবকাশ দিবেন না? তিনি কি নিষ্ঠুর?"

"তিনি পরম দয়ালু। তিনি অবশ্যই অবকাশ দিবেন।"

"গৃহে কে কে আছেন?"

"আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া আছেন।"

"আমি তাঁহাদিগকে কত ভক্তি করিব। তাঁহারা আমাকে স্নেহ করিবেন?"

সৈনিক বলিলেন, "হাঁ।" কিন্তু তিনি কেমন অন্যমনস্ক হইলেন। রেবার প্রশ্নে তাঁহার মনে যে প্রশ্ন উঠিল, তিনি কয়দিন চেষ্টা করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। জ্যেষ্ঠ এ বিবাহের কথা শুনিলে কি বলিবেন? তিনি সাহস করিয়া ভ্রাতাকে এ কথা বলেন নাই। সে জন্য তিনি অনুতপ্ত; কারণ, তিনি জানিতেন, জ্যেষ্ঠের সৌভ্রাত্র অতুলনীয়। তিনি, অসম্ভব না হইলে, কখনও ভ্রাতার সুখে বাধা দিবেন না। আর—যদি অসম্ভব হয়?—তাহা হইলে—তাহা হইলে তিনি কি ভ্রাতার জন্য আপনার সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারিতেন না? কিন্তু—রেবা! রেবা ব্যতীত জীবন যে ব্যর্থ হইত! আর যদি ভ্রাতার জন্য হইত, তিনি সব করিতে পারিতেন,—নন্দন-কানন শ্মশানে পরিণত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এ ত তাঁহার জন্য নহে। এ যে কেবল অসার—অর্থশূন্য—যাতনার কারণ—শূন্যগর্ভ সম্মানের জন্য। সম্ভ্রম কিসে? ব্রাহ্মণের সম্ভ্রম বিদ্যায়, ক্ষত্রিয়ের সম্ভ্রম বীরত্বে বৈশ্যের সম্ভ্রম ব্যবসায়-নিপুণতায়, সকলেরই সম্ভ্রম কর্ত্তব্যপালনে। তিনি ত সে কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ নহেন। তবে কি জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে এ বিবাহ হইতে বিরত করিতেন? বোধ হয় না। তবে কেন তিনি তাঁহাকে এ কথা বলেন নাই?

সৈনিক এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে কলনাদিনী তরঙ্গিনীর অবিরাম কলনাদের মত রেবা বলিতে লাগিল, "আমি তাঁহাদের সন্তানদিগকে কত ভালবাসিব! তাহারা আমাকে পাইয়া কি করিবেন?"

সৈনিক চাহিয়া দেখিলেন, রজনীর শেষ প্রহর। তিনি রেবাকে বলিলেন, "চল গৃহে যাই।"

সেই সময় পশ্চাতে তমাল তরুর অন্তরাল হইতে যেন কে সরিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। এখনও মহী প্রচণ্ড সূর্য্যতাপতাপিতা। কিন্তু কয়দিন বৃষ্টিতে পবন ধূলিমুক্ত,—ধরাতল সরস; তাই পবনোত্থাত-রেণুমণ্ডল আর পথিককে ক্লিষ্ট করিতেছে না। রাজা কক্ষমধ্যে বসিয়া ছিলেন—সম্মুখে উদ্যান। উদ্যানে তরুলতা তপনতাপে মলিনশ্রী;—কেবল উদ্যানসরসীকূলে কয়টি পাটল তরু পুষ্পশোভাসম্পন্ন—দুই চারিটি করিয়া পুষ্পদল বৃক্ষশাখা হইতে বৃক্ষ-মূলে পতিত হইতেছে। সরসী-সলিলে কয়টি রাজহংস বিচরণ করিতেছে; তাহাদের অমল ধবল দেহ রবিকরে সুন্দরতর দেখাইতেছে। সরসীসলিল জলচরসঞ্চারচঞ্চলিত। দূরে গগনে অদৃশ্যপ্রায়দেহ বৃষ্টিবিন্দুগ্রহণ-চতুর চাতক থাকিয়া থাকিয়া মেঘের নিকট বারি-প্রার্থনা করিতেছে। আর-রাজপথে মধ্যে মধ্যে সারমেয়ের ভষণ শ্রুত হইতেছে। অলিন্দে রাজার পালিত পক্ষীরা নীরব।

রাজা বসিয়া ভাবিতেছিলেন।

সেদিন বিশ্রাম বাটিকায় তিনি যে কথা মনে করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, এ কয়দিন তিনি সে কথা ভুলিতে পারেন নাই। ইচ্ছায় হউক—অনিচ্ছায় হউক, তিনি সেই কথাই ভাবিয়াছেন। মেঘান্ধকার অমাবস্যা রজনীতে সহসা বিদ্যুদ্বিকাশ যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য ও অদৃষ্ট, ছায়ালোকচিত্রিত প্রকৃতিমূর্ত্তি দেখাইয়া দেয়—সে দিন তেমনই তাঁহার চিন্তালোকে সহসা তাঁহার হৃদয়ের অদৃশ্য ও অদৃষ্ট ভাব দেখা দিয়াছিল। তাই তিনি চমকিয়া উঠিয়াছিলেন; যেন সম্মুখে বিষধর সর্প দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি তন্ন তন্ন করিয়া হৃদয় সন্ধান করিয়াছেন;—কিন্তু আশঙ্কার কারণ নাই—এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই তিনি আপনার নিকট হইতে আপনাকে দূরে লইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন—মুক্তির জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। এ কি নূতন অনুভূতি!

তিনি স্বয়ং ইহার দুর্ব্বল প্রারম্ভ লক্ষ্যও করিতে পারেন নাই। এখন তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত—শঙ্কিত। হায় কর্ত্তব্য, তুমি কত সময় মানুষকে তাহার নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট—অপ্রত্যাশিত পথের পথিক কর! হায় দয়া, তুমিও কত সময় মানুষকে অজানিত অকুলে আনিয়া বিপন্ন কর! তিনি কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রণোদনে পুরোহিতের গৃহে শোকাতুরা বালিকাকে দেখিতে গিয়াছিলেন; দয়ার প্রণোদনে অসহায়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন সেই সংযমের প্রতিমাকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, যেমন কোরক একবারমাত্র বিকশিত হয় ও বিকশিত কুসুম একবারমাত্র—মুহূর্ত্ত-মাত্রের জন্য সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা লাভ করে, তেমনই মানুষও বুঝি একবার—মুহূর্ত্তের জন্য মানসিক সৌন্দর্য্যের সমুজ্জ্বল আভায় দিব্য লাবণ্য লাভ করে। সে মানসিক সৌন্দর্য্য কাহারও পক্ষে প্রেমপ্রসূত, কাহারও পক্ষে সংযমসম্ভূত, কাহারও পক্ষে স্নেহসঞ্জাত। বুঝি সেইরূপ সৌন্দর্য্যসম্পূর্ণ অবস্থায় তিনি বালিকাকে দেখিয়াছিলেন। তাই তাহার সেই সংযমস্নিগ্ধ—কোমল মূর্ত্তি তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই।

তাহার পর তিনি তাহাকে যতই জানিয়াছেন, ততই তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি শোকাতুরার শোকপ্রশমনকল্পে কিছু করিতে চাহিলে সে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতার পরিচয় দিয়াছে। সে আপনার কথা মনেও করে নাই; আপনার জন্য কিছুই চাহে নাই। সে রাজ্যের রুগ্ন, অনাথ, নিরাশ্রয়—ইহাদিগের জন্য আশ্রমসংস্থাপনের ইচ্ছামাত্র জানাইয়াছে,—রাজাকে তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। সে পিতার আদেশ দেববাক্যবৎ জ্ঞান করে, তাই ভ্রাতৃশোকশেল হৃদয়ে লইয়াও পিতার অনুমতি ব্যতীত শূন্য গৃহ ত্যাগ করিতে অস্বীকৃতা হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি তাহার সংযমের সৌন্দর্য্য! তেমন সংযম—তেমন চিত্তবৃত্তিদমনক্ষমতা পুরুষের কোথায়? তাই রাজা তাহার গুণপরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছেন।

কিন্তু—তাহাই কি সব? বিরামবাটিকার নির্ম্মাণকার্য্যে তাঁহার অসাধারণ আকর্ষণ সে কি কেবল তাহার অসম্পূর্ণ কল্পনার সম্পূর্ণকরণাভিলাষের ফল? সে কি সেই পূর্ব্বমোহ আবার তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে? হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে—বহু আপাতরম্য কারণের অন্তরালে কি আর কোন কারণ বিদ্যমান নাই? অন্তঃসলিলা ফল্গুর অদৃশ্য প্রবাহের মত আর কোন বাসনার উত্তেজনা কি তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছিল না?

তিনি কি অসাধারণ যত্নে সে গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য—সে উদ্যানের রচনাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন—কার্য্যের নির্দ্দেশ করিতেছিলেন! সে কি কেবল তাঁহার আপনার সৌন্দর্য্য-কল্পনা চরিতার্থ করণাভিপ্রায়ে? সেই সৌধের—সেই আশ্রমের কল্পনার মধ্যে কি তিনি সেই আশ্রমবাসিনীর কল্পনা বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন? যদি না পারিয়া থাকেন—তবে সেই আশ্রমবাসিনীর কল্পনা কি ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে সেই আশ্রমের কল্পনার অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল—অধিক প্রস্ফুট—অধিক প্রবল হইয়া উঠিতেছিল না?

রাজা ভাবিতে লাগিলেন।

তাঁহার হতাশাদাবানলদগ্ধ হৃদয়ে কি কর্ত্তব্যানুরাগ ব্যতীত আর কোন নূতন অনুভূতি অনুভূত হয় নাই? মরুভূমির মধ্যে কি সহসা কোন স্নিগ্ধসলিলোদ্গারী প্রস্রবণ দেখা দিয়াছে?

সময় সময় দীর্ঘ দিন রাজকার্য্যের অবিরত শ্রমের পর নিশীথে শ্রান্ত দেহে—ক্লান্তমনে বিশ্রামলাভজন্য শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কি মনে হয় নাই,—জীবনের সুখস্বপ্ন যদি সফল হইত—যদি প্রেম তাঁহার হৃদয় মধুর করিত তবে কঙ্করকঠোর কর্ত্তব্যপথ কোমলকুসুমাস্তৃত হইত। সেই সময়—যখন তাঁহার হৃদয়োত্থিত দীর্ঘশ্বাস পবনে মিলাইয়াছে—তখন কি পার্ব্বতীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কথা কখন তাঁহার মনে পড়ে নাই; মনে হয় নাই,—সে মুকুটধারী রাজার হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিতে পারিত? রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সত্য সত্যই তাঁহার জীবন মরুময়। সেই তাপতপ্ত হৃদয়ে স্নিগ্ধশান্তি-সুখলাভের কোন উপায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর সেই ঔদাস্যব্যঞ্জক মুখভাব—সেই শ্রান্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি মনে পড়িল। হায়, জীবনের—যৌবনের সুখস্বপ্ন! কিন্তু তখনই যেন তাঁহার মনে হইল, সেই পরিচিত—পরিস্ফুট মূর্ত্তির পশ্চাতে আর একটি মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। সে মূর্ত্তি এখনও অস্পষ্ট—অস্ফুট; কিন্তু তাহারই মধ্যে অপগতমেঘাবরোধ গগনে চন্দ্রের মত তাহার স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল দৃষ্টি লক্ষিত হইতেছে। তাহার মুখভাব দৃঢ়তাব্যঞ্জক—কর্ত্তব্যপথ-নির্দ্দেশক।

রাজা আবার চমকিয়া উঠিলেন।

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ যেমন পিঞ্জরমধ্যে পাদচারণ করিয়া ফিরে, রাজা উঠিয়া তেমনই কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের দারুণ

চাঞ্চল্য যেন শারীরিক চাঞ্চল্যে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা ভাবিতে লাগিলেন,—একি? এখন কি করা কর্ত্তব্য? এই বাসনাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিবার পূর্ব্বে তাহাকে নির্ব্বাপিত করিতেই হইবে—নহিলে, সে একবার তাহার রক্তজিহ্বা সঞ্চালিত করিবার সুযোগ পাইলে, সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইবে—ধ্বংসের আর বিলম্ব হইবে না। তিনি আপনার মন আপনি বুঝিতে পারেন নাই! তিনি যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বহুবার পার্ব্বতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, সে আকর্ষণ কখন্ আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতেও পারেন নাই! আশ্রমের বিষয়ে পরামর্শ, সে কি তবে কেবল আবরণমাত্র? না। তিনি ত কখনও তাহা মনে করেন নাই। তবে কি তিনি মনের গতি ও প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই?

কিন্তু অতীত কথায় আর কায কি? এখন কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণই প্রয়োজন। তিনি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সে কার্য্যে উভয়ের সাক্ষাৎ,—ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য্য; আশ্রম-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য শেষ না হইলে সে ঘনিষ্ঠতার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং, এখনই কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ প্রয়োজন। সংযমবন্ধন যাহাতে বিন্দুমাত্র শিথিল হইতে না পারে সেই জন্য তাহাকে দৃঢ়তর করা আবশ্যক। তিনি তাহাই করিবেন—যদি প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারেন, তবে তাঁহাতে আর পশুতে প্রভেদ কি?

রাজা এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ঘনগর্জ্জনে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অপরাহ্ণ উপস্থিত; পশ্চিম গগনে মেঘ-সঞ্চার হইয়াছে—বিদ্যুদ্বিকাশ হইতেছে। সহসা প্রবল বেগে পবন প্রবাহিত হইল। পরুষপবনবেগোৎক্ষিপ্ত কয়টি শুষ্ক পত্র তাঁহার কক্ষ মধ্যে আসিয়া পড়িল। ক্রমে বর্দ্ধনশীল মেঘমালা আসন্ন বারিপাত সূচিত করিতে লাগিল।

রাজা কক্ষ হইতে অলিন্দে আসিলেন। প্রহরী এক পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল; তিনি তাহাকে অজয় সিংহকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই অজয়সিংহ ভ্রাতৃসমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে ডাকিয়াছেন?" রাজা মুক্তগবাক্ষপথে চাহিয়া ছিলেন; সেই ভাবে থাকিয়াই বলিলেন, "হাঁ। যে দিন প্রভাতে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাহার পর আরও এক রাত্রি তুমি প্রাসাদে অনুপস্থিত ছিলে?" অজয়সিংহের নতদৃষ্টি চরণসংলগ্ন হইল; তিনি কোন কথা বলিলেন না।

রাজা আবার বলিলেন, “একদিনও তুমি মৃগয়ান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বাধ্য হইয়া শক্তসিংহের আতিথ্য গ্রহণ কর নাই ; তাহা তোমার ইচ্ছাকৃত।’

অজয়সিংহ নির্ব্বাক।

রাজা বলিলেন, “তুমি শক্তসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছ। তুমি কি এ কথা অস্বীকার করিবে?” অজয় সিংহ সলজ্জভাবে বলিলেন, “না।”

অজয়সিংহ আর কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় রাজা বলিলেন, “আমি সে সংবাদ অবগত হইয়াছি। একথা অধিক দিন গোপন থাকিবে না। তাহার পূর্ব্বেই আমি এ সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য স্থির করিতে চাহি। সে জন্য শক্তসিংহের কন্যার প্রাসাদে আগমন প্রয়োজন। আমি পুরোহিত মহাশয়ের নিকট জানিয়াছি, আগামী পরশ্ব মধ্যাহ্নের পর হইতে সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত তাঁহার আগমনের প্রশস্ত সময়। সেই সময়ের মধ্যে তুমি যাইয়া তাঁহাকে প্রাসাদে আনিবে।”

অজয়সিংহ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, “তুমি এখন যাইতে পার।”

অজয়সিংহ প্রস্থান করিলেন।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফিরিলেন। তিনি যে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা দূর হইয়া গেল। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন,—অজয় সিংহের অপরাধ কি? সে যে পরিবারে বিবাহ করিয়াছে সে পরিবারে বিবাহে সামাজিক কলঙ্ক নাই। সে রাজপরিবারে বিবাহ করিতে পারিত, সত্য ; কিন্তু রাজপরিবারে বিবাহ কি সর্ব্বদা সুখের? তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় আজ বেদনার আগার হইত না।

রাজা আবার ভাবিতে লাগিলেন,—অজয় তাঁহাকে একবার জানাইল না কেন? সে চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। কিন্তু স্নেহ স্নেহাস্পদের অপরাধ লইতে চাহে না। তাই তিনি ভাবিলেন,—অজয় যাহাই করুক, তাহার সুখই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। সে যদি এ বিবাহে সুখী হয়, তবে তাহাই তাঁহার পরম সুখ।

তিনি স্থির করিলেন,—একবার ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধূর মনোভাব জানিয়া দেখিবেন। তিনি এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

যুঅন্-চুয়ং বা হিউয়েন্-সিয়াং। *

(১)

যে প্রসিদ্ধ চিন পরিব্রাজক হিউয়েনসিয়াং নামে এতদিন ঐতিহাসিক জগতে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহার প্রকৃত নাম যুঅন্-চুয়ং। চীনভাষাভিজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা এতদিন তাঁহার নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ অবগত ছিলেন না বলিয়া প্রকৃত যুঅন-চুয়ং নাম ভ্রমক্রমে হিউয়েন-সিয়াঙ্গে পরিণত হইয়াছিল।

যুঅন-চুয়ঙ্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহার বর্ণিত ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করাই, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমরা অগ্রে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছি।

চীন সম্রাজ্যের অন্তর্গত হো-নান্ উপবিভাগের চিনলিউ নামক নগরে ৬০৩ খৃঃ অব্দে যুঅন-চুয়ং জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সামান্য রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র; তন্মধ্যে যুঅন-চুয়ং সর্ব্বকনিষ্ঠ। স্বীয় সন্তানগণকে সুশিক্ষা প্রদান করিবার মানসে, যুঅন-চুয়ঙ্গের পিতা কিছু-দিন পরে চাকরী ছাড়িয়া দেন এবং তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় সন্তান-গণকে শিক্ষাদান করিতে অতিবাহিত করেন।

যুঅন-চুয়ং প্রথমে একটি বৌদ্ধমঠে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা একজন বৌদ্ধ যতি ছিলেন। তিনি বালক যুঅন-চুয়ংকে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী লো-য়াং নগরে লইয়া যায়েন। তথায় ত্রয়োদশবর্ষ বয়ক্রম কালে যুঅন-চুয়ং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শ্রমণ বা যতি শ্রেণীভুক্ত হয়েন। এই সময়ে, সুই রাজবংশের রাজত্বের শেষভাগে চীন সাম্রাজ্যে অন্ত-র্বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া দেশে যুদ্ধবিগ্রহজনিত অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল। ঐ সকল অশান্তি প্রযুক্ত যুঅন-চুয়ং ও তাঁহার ভ্রাতা লো-য়াং নগর পরিত্যাগ করিয়া সিঙ্গ-টু নামক নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই নগরেই যুঅন-চুয়ং বৌদ্ধ ভিক্ষু অথবা পুরোহিতের পদে আরূঢ় হয়েন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ মাত্র। অতঃপর বিবিধ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিবার মানসে তিনি ছয় বৎসর কাল সাম্রাজ্যের বহুতর

* চুঁচুড়া হিন্দু সমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

শাস্ত্রালোচনার স্থানে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে চঙ্গে-য়ননগরে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপে স্বদেশীয় তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটে ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সকল সন্দেহ বিদূরিত হইল না। যে সকল কূট প্রশ্ন অহোরাত্র তাঁহার মনে জাগরূক ছিল, সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিতে তাঁহার স্বদেশীয় পণ্ডিতগণ অসমর্থ হইলেন। ফা-হিয়ান্ প্রমুখ যে সকল বৌদ্ধ পর্য্যাটকগণ তৎপূর্ব্বেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের লিখিত ও সংগৃহীত পুস্তকাবলী এই সময়ে য়ুঅন-চুয়ঙ্গের নয়নগোচর হইল। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আগমন করিতে তাঁহারও বাসনা হইল। তথায় গমনপূর্ব্বক মূল ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিয়া আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে এবং বুদ্ধদেবের লীলাস্থলগুলি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য ভক্তের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, য়ুঅন-চুয়ং ৬২৯ খৃঃ অব্দে, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে চঙ্গে-অন নগর পরিত্যাগ করিয়া বিদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চীন হইতে ভারতবর্ষে স্থলপথে আসিতে হইলে বহু তৃণলতাশূন্য বিস্তীর্ণ মরুভূমি, তুষারমণ্ডিত দুর্গম পর্ব্বত, জীবন-সঙ্কট সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কট, হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী প্রতি মুহূর্ত্তে পথিকের পদে পদে বাধা প্রদান করে। অদম্য-অধ্যবসায়-সম্পন্ন, ধর্ম্মোন্মত্ত, বুদ্ধচিন্তায় বিভোর, নবীন সন্ন্যাসী য়ুঅন-চুয়ং কিরূপে এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভারতে আগমন করিয়া ছিলেন, তাহা আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করিব না,—তবে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহাকে পথিমধ্যে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।—তখন চীন সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত। তজ্জন্য সীমান্ত-প্রদেশের রক্ষকগণ কাহাকেও সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইতে দিতেছেন না,—সুতরাং রক্ষকগণের অজ্ঞাতসারে কোন গতিকে ঘাটি হইতে নিষ্ক্রমণ, পথিমধ্যে বন্ধুগণের মৃত্যু, সময়ে সময়ে পথ-প্রদর্শক-বিহীনতা প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট তাঁহাকে প্রতিদিন প্রপীড়িত করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন মৃগতৃষ্ণিকায় বিভ্রান্ত, তৃণশূন্য মরুদেশে পথভ্রষ্ট, অনশনে ক্লিষ্ট, তৃষ্ণায় তৃষিত ইত্যাদি নানারূপে বিপদগ্রস্ত হইয়া, অশেষ যমযন্ত্রণা সহ্য করিয়া য়ুঅন-চুয়ং তাঁহার উপাস্য দেবতা বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতবর্ষে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-যাত্রার এই ভয়াবহ দুঃখ-কষ্টপূর্ণ

ঘটনাবলী পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণেই এই নবীন ধর্ম্মবীরের অসাধারণ অধ্যবসায়, অদম্য উৎসাহ এবং অসীম ধর্ম্মপ্রাণতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, দুই বিন্দু ভক্তিভরা আনন্দাশ্রু অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে নয়ন হইতে পতিত হয়।

য়ুঅন-চুয়ং মধ্য এসিয়ার নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কাবুল হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। অতঃপর তিনি একে একে ভারতের সমুদায় প্রধান জনপদই ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল স্থানের বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনায় কালযাপন করিয়া এবং অসংখ্য সংস্কৃত ও বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিয়া অশেষ জ্ঞান ও বহুদর্শিতা-লাভ করিয়াছিলেন।

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্‌ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"—বিদ্যানের গৌরব সকল দেশেই। ভারতবর্ষবাসী তখনও গুণের গৌরব করিতে ভুলেন নাই। তাই, য়ুঅন-চুয়ং যখন বুদ্ধগয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় নালন্দার * প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তৎকালে নালন্দা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিদ্যামন্দির, তখন নানা দিগ্‌দেশে উহার যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হইতেছিল। নানাশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ, বহুদর্শী, প্রবীণ শীলভদ্র সেই সময়ে নালন্দার প্রধান অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করিয়া, উহার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিলেন। য়ুঅন্‌-চুয়ং তাঁহার নিমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করিলেন; মহা সমারোহে নালন্দার কর্ত্তৃপক্ষ-গণ তাঁহাকে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল তথায় অবস্থানপূর্ব্বক শিক্ষাগুরু আচার্য্য শীলভদ্রের পদপ্রান্তে বসিয়া পাণিনির ব্যাকরণ, বৌদ্ধগ্রন্থ ত্রিপিটক এবং হিন্দুশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি দ্বিতীয় শিলাদিত্য দানশৌণ্ড মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন গুণের গৌরব বুঝিতেন,—নালন্দায় অবস্থান কালে য়ুঅন্‌-চুয়ঙ্গের সকল ব্যয়ভার তিনি বহন করিলেন। শুধু নালন্দা নহে, সকল সুধিসমাজই য়ুঅন্‌-চুয়ংকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের অধিবাসীরাই তাঁহাকে সম্যকরূপে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল।

* প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ কানিংহামের মতে, বর্ত্তমান রাজগিরের সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত বড়গাওন নামক গ্রাম পূর্ব্বে নালন্দা নামে পরিচিত ছিল। এই স্থানেই নালন্দার সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অনন্তর পঞ্জাব, কাবুল, তুর্কীস্থান, কাসগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান প্রভৃতি স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক, ষোল বৎসর কাল বিদেশভ্রমণ করিয়া, ৬৪৫ খৃঃ অব্দে য়ুঅন্-চুয়ং স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে প্রবেশকালে, তথায় মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল; সম্রাট স্বয়ং তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিতে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে সাম্রাজ্যের একটি প্রধান রাজকর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ধর্ম্মবীর য়ুঅন্-চুয়ং তাঁহার সাধু সঙ্কল্পে বিনীতভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন যে, তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ বুদ্ধের পবিত্র জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ অনুশীলনে অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সম্রাট তাঁহার সদুদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রীত হইলেন। অতঃপর সম্রাট য়ুঅন্-চুয়ঙ্গের বাসস্থানের নিমিত্ত একটি সুরম্য মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁহারই আদেশানুসারে য়ুয়ন্-চুয়ং আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে বুদ্ধদেবের কয়েকটি স্বর্ণ, রৌপ্য ও চন্দন-কাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি, বুদ্ধের কিঞ্চিৎ শরীর-ধাতু, বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তকসূত্র সম্বন্ধে ১২৪ খানি গ্রন্থ এবং ২২টি অশ্বপৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া ৫২০ খানি অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ২৩ বৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন। এই সময় তিনি ধর্ম্মচিন্তায় এবং গ্রন্থাদির প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রচার কার্য্যে সদাসর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। কথিত আছে, এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার সহকারিগণের সাহায্যে ৭৫০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন; এই সকল গ্রন্থ ১,৩৩৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া, ৬৬৮ খৃঃ অব্দে, ৬৫ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক বৌদ্ধ-ভিক্ষু-লিখিত ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণীর অনুবাদ এইবার পাঠক-বর্গকে উপহার দিব।

১। ভারতবর্ষের বিভিন্ন নাম।

আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ভারতবর্ষের (টিয়েন্-চু) অনেকগুলি নাম আছে এবং সেগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে

বড়ই গোলমাল। পুরাকালে ইহাকে সিন্‌-টু (সিন্ধু) ও হিয়েন্‌-টউ (হিন্দু) বলা হইত, কিন্তু এক্ষণে বিশুদ্ধ উচ্চারনানুসারে ইহাকে ইন্‌-টু বলা হইয়া থাকে। ইন্‌-টুর অধিবাসিগণ বিভিন্ন প্রাদেশিক রীতি অনুসারে তাহাদের দেশকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকে। প্রত্যেক দেশের রীতি-নীতি বিভিন্ন। যে নামটি বিশুদ্ধ উচ্চারণ-সম্মত সেইটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা এই দেশকে ইন্‌-টু নামেই উল্লেখ করিব। চীন ভাষায় এই নামের অর্থ ইন্দু বা চন্দ্র। চন্দ্রের বহুতর নাম আছে, ইহা তাহাদিগের অন্যতম। এইরূপ কথিত আছে যে, পরিচালক-নক্ষত্রবিহীন জীবগণ দীর্ঘ অজ্ঞানতা-রজনী মধ্যে (জন্মমৃত্যু) চক্রে যখন অনবরত ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদিগের অবস্থা, সূর্য্য অস্ত যাইলে পৃথিবীর অবস্থার ন্যায়; তৎকালে নক্ষত্রালোক বিদ্যমান থাকিলেও উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চন্দ্র যেমন তাঁহার সংযত কিরণ পৃথিবীতে বিতরণ করেন, সেইরূপ পবিত্র ব্যক্তি ও জ্ঞানিগণের উজ্জ্বল সংযত ধর্ম্মজ্যোতিঃ ইন্দু-কিরণের ন্যায় পৃথিবীকে পরিচালিত করিতেছে বলিয়া এই দেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং তজ্জন্য ইহার নাম ইন্‌-টু *।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ নানাজাতিতে বিভক্ত; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণ পবিত্রতা ও ভদ্রতার জন্য বিশেষরূপ প্রসিদ্ধ। এই শ্রেণীর নাম এতাদৃশ পবিত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে যে, সকল স্থানের লোকেই বলিয়া থাকে— ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণগণের (পোলো-মেন) দেশ।

২। ভূপরিমাণ, জলবায়ু প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ বলিলে যে সকল দেশকে বুঝায়, সেই সকল দেশ সাধারণতঃ পঞ্চভারত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই দেশ চক্রকারে ৯০,০০০ লি বিস্তৃত। ইহার তিনদিক সমুদ্র-বেষ্টিত এবং উত্তরে তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত বিরাজিত। ইহার উত্তরাংশ প্রশস্ত এবং দক্ষিণাংশ সঙ্কীর্ণ। ইহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়। সমগ্র ভূখণ্ড কমবেশী ৭০টি রাজ্যে বিভক্ত। ঋতুগুলি বিশেষরূপে উষ্ণ। জমি বেশ জল-সম্পোষ্য এবং আর্দ্র। উত্তরে ক্রমাগত

* ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, য়ুঅন্‌-চুয়ঙের ধারণা ছিল, ইন্দু হইতে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি। সেই জন্য তিনি ভারতবর্ষকে হিন্দু নামে উল্লেখ না করিয়া তাঁহার মতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ-সঙ্গত ইন্দু নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক হিন্দু শব্দের অর্থ বড়ই জটিল।

পর্ব্বত ও ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী, এবং জমি শুষ্ক ও লবণপূর্ণ। পূর্ব্বদিকে উপত্যকাসকল ও সমতল ভূমি বর্ত্তমান; এই জমিগুলি জল-সম্পোষ্য ও কর্ষিত বলিয়া উর্ব্বর এবং সুজন্মা। দক্ষিণ প্রদেশসকল বন ও বৃক্ষ-লতাদিতে পূর্ণ; পশ্চিমাংশ প্রস্তরময় এবং অনুর্ব্বর। ইহাই এই দেশের সাধারণ পরিচয়।

৩। দৈর্ঘ্য-পরিমাণ।

এই বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল। দৈর্ঘ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে যোজন সর্ব্বপ্রথম। একদল সৈন্যের দৈনিক অভিযান এক যোজন বলিয়া, পুরাকালের পবিত্র রাজগণের সময় হইতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন হিসাবে ইহা ৪০ লির সমান। ভারতবর্ষের সাধারণ গণনানুসারে ইহা ৩০ লি; কিন্তু পবিত্র (বৌদ্ধ) গ্রন্থে যোজন ১৬ লি পরিমাণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

দূরত্বের বিভাগানুসারে এক যোজনে আট ক্রোশ (কেউ-লু-সে); যতদূর হইতে একটি গোরুর রব শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই এক ক্রোশ। একটি ক্রোশ আবার ৫০০ ধনুতে বিভক্ত; চারি হস্তে এক ধনু; ২৪ অঙ্গুলিতে এক হস্ত; ৭ যবে এক অঙ্গুলি, তৎপরে এইরূপ ভাবে ৭ ভাগে বিভক্ত হইয়া যূক, যূক-ডিম্ব (লিক্ষা) ধূলি, গোলোম, শশলোম, তাম্রজল (ছিদ্র) * প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম-পরিমাণ-জ্ঞাপক। এইরূপে পরিমাণ-তালিকা ধূলিকণাতে উপনীত হইয়াছে। ইহাও পুনরায় ৭ ভাগে বিভক্ত হইয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম কণা বা অণুতে পরিণত হয়; অতঃপর শূন্যে উপনীত না হইয়া এই অণুকে আর অধিক ভাগে বিভক্ত করা যায় না,—সেই জন্য ইহাকে অত্যতি ক্ষুদ্র অথবা পরমাণু বলে।

৪। জ্যোতিষ, পঞ্জিকা প্রভৃতি।

যদিও যিং ও যঙ্গ নিয়মের আবর্ত্তন এবং চন্দ্রসূর্য্যের গৃহগণকে আমরা যে নামে অভিহিত করিয়া থাকি, ভারতে তাহারা সেই নামে কথিত হয় না, তথাপি ঋতুগুলি ঠিক একরূপ। চন্দ্র (পূর্ণ) যে মাসে যে নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন, সেই নক্ষত্রের নামানুসারে সেই মাসের নামকরণ হইয়া থাকে।

সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা অল্প অংশকে ক্ষণ (ত' স-ন) বলে। ১২০ ক্ষণে এক

* সময়-নির্দেশক জলপূর্ণ ক্ষুদ্রছিদ্রযুক্ত তাম্র পাত্রকে তাম্রী বলে। তাম্রীর যে ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া জল পাত্রমধ্যে প্রবেশ করে, তাহাকে তাম্রজল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

তক্ষণ হয়। এই রূপ ৬০ তক্ষণে এক লব (ল-ফো)। ৩০ লবে এক মুহূর্ত (মৌ-হু-লি-তো)। ৫ মুহূর্ত্তে সময়ের একাংশ বা কাল; ৬ কালে এক দিবারাত্র বা অহোরাত্র; কিন্তু সাধারণতঃ দিবারাত্র ৮ কালে বিভক্ত হইয়া থাকে।

প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময়কে শ্বেত ভাগ (শুক্লপক্ষ) এবং পূর্ণিমা হইতে চন্দ্র অদৃশ্য হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ অমাবস্যা পর্য্যন্ত কালকে কৃষ্ণ ভাগ (কৃষ্ণপক্ষ) বলে। ১৪ অথবা ১৫ দিনে কৃষ্ণপক্ষ হইয়া থাকে, কারণ মাসগুলি কথন বড় এবং কথন ছোট হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী অন্ধকার ভাগ এবং পরবর্ত্তী অলোকভাগ লইয়া একটি মাস। ছয়মাসে একটি হিং বা অয়ণ হয়। সূর্য্য যখন (বিষুবরেখার) মধ্যে * ভ্রমণ করেন, তখন ইহা তাঁহার উত্তর ভ্রমণ (উত্তরায়ণ) এবং যখন (বিষুবরেখার) বাহিরে ভ্রমণ করেন, তখন ইহা তাঁহার দক্ষিণ ভ্রমণ (দক্ষিণায়ণ)। এই দুই কালের সমষ্টি একটি বৎসর।

প্রত্যেক বৎসর আবার ছয় ঋতুতে বিভক্ত। প্রথম মাসের (১) ১৬ তারিখ হইতে তৃতীয় মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত ক্রমশঃই গরম বাড়িতে থাকে। তৃতীয় মাসের ১৬ তারিখ হইতে পঞ্চম মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ণ গ্রীষ্ম। পঞ্চম মাসের ১৬ তারিখ হইতে সপ্তম মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত বর্ষা ঋতু। সপ্তম মাসের ১৭ তারিখ হইতে নবম মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত কাল, শস্যোৎপাদনের সময়। নবম মাসের ১৬ তারিখ হইতে একাদশ মাসের ১৫শ দিবস পর্য্যন্ত শীত ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, এবং একাদশ মাসের ১৬শ দিবস হইতে প্রথম মাসের ১৫শ দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত শীত।

তথাগতের পবিত্র মতানুসারে প্রতি বৎসর তিনটি ঋতুতে বিভক্ত। প্রথম মাসের ১৬শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের ১৫শ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম; পঞ্চম মাসের

* অর্থাৎ বিষুব রেখা ও উত্তর মেরুর মধ্যে। য়ুঅন্-চুয়ং ভূমণ্ডলের উত্তরাংশবাসী বলিয়া লিখিয়াছেন যে, যখন সূর্য্য বিষুবরেখার মধ্যে অর্থাৎ ঐ রেখা ছাড়াইয়া তাঁহার স্বদেশের দিকে ভ্রমণ করেন, তখনই উত্তরায়ণ এবং যখন সূর্য্য ঐ রেখার বাহিরে অর্থাৎ ঐ রেখা ছাড়াইয়া তাঁহার স্বদেশের বিপরীতদিকে দক্ষিণ-মেরু অভিমুখে ভ্রমণ করেন, তখনই দক্ষিণায়ণ।

(১) চীন দেশের মাস অনুসারে লিখিত হইয়াছে। সেই স্থানের প্রথম মাসের ১৬ তারিখ ভারতবর্ষের চৈত্র মাসের প্রথম দিন।

১৬শ দিবস হইতে নবম মাসের ১৫শ দিবস পর্য্যন্ত বর্ষা; নবম মাসের ১৬শ দিন হইতে প্রথম মাসের ১৫শ দিন পর্য্যন্ত শীত ঋতু। আবার বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত—এই চারি ঋতুও কথিত হইয়া থাকে। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ -বসন্ত ঋতু অর্থাৎ প্রথম মাসের ১৬ই হইতে চতুর্থ মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত বসন্ত ঋতু। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র—এই তিনটি গ্রীষ্ম ঋতুর মাস অর্থাৎ চতুর্থ মাসের ১৬ই হইতে সপ্তম মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত—গ্রীষ্ম। অশ্বযুজ, কার্ত্তিক, মার্গশীর্ষ—তিনটি শরৎকালের মাস, অর্থাৎ সপ্তম মাসের ১৬ই হইতে দশম মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত শরৎকাল এবং পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন—এই তিন মাস শীত ঋতু—অর্থাৎ চীনদেশের দশম মাসের ১৬শ দিবস হইতে প্রথম মাসের ১৫শ দিবস পর্য্যন্ত শীতকাল। পুরাকালে ভারতবর্ষের যাজক সম্প্রদায় বুদ্ধের পবিত্র উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া, বর্ষাঋতু সময়ে পুরোহিতগণের গৃহবাসের দুইটি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন,—হয় প্রথমোক্ত তিন মাসের, নতুবা শেষোক্ত তিন মাসের মধ্যে, পঞ্চম মাসের ১৬শ দিবস হইতে অষ্টম মাসের ১৫শ দিবস অথবা ষষ্ঠ মাসের ১৬শ দিবস হইতে নবম মাসের ১৫শ দিবস পর্য্যন্ত সময়।

সূত্র ও বিনয়ের অনুবাদকগণ উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া 'স্তোহিয়' ও 'স্তোলহিয়'—এই দুই শব্দ বর্ষাকালে গৃহবাস অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। হয় সীমান্ত প্রদেশের সাধারণ লোক মধ্যদেশের (ভারতবর্ষের) ভাষার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিত না, অথবা স্থানীয় বাক্যের অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা অনুবাদ করিয়াছিলেন—ইহাই এই ভ্রমের কারণ। এবং সেই একই কারণে তথাগতের মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ, ভূমণ্ডলে আবির্ভাব, গৃহ-নিক্রমণ, বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি এবং নির্ব্বাণের কাল সম্বন্ধে ভ্রম ঘটিয়াছে। *

৫। নগর ও বাসগৃহ।

নগর ও পল্লীগ্রাম সকলের ভিতর-দ্বার আছে; চারিদিকের প্রাচীর প্রশস্ত ও উচ্চ। রাস্তা ও গলিগুলি আঁকা বাঁকা এবং রাজপথ সকল ঘূর্ণিত। দীর্ঘ পথগুলি অপরিষ্কার এবং ইহাদিগের দুই পার্শ্বে যথোপযুক্ত চিহ্নসংলগ্ন বিপণি-শ্রেণী সজ্জিত। কসাই, মৎস্য বিক্রেতা, নর্ত্তক, ঘাতক ও ঝাড়ুদার-

* ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও নির্ব্বাণকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এমন কি উত্তর সাম্প্রদায়িকদিগের মধ্যেই ১৪টি বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

দিগের বাসস্থান সহরের বাহিরে। গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনকালে ইহারা রাস্তার বামপার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করিতে বাধ্য। ইহাদিগের বাসভবনগুলি অনুচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টিত এবং সেইগুলিই নগরের বহির্ভাগস্থ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। মাটি সচরাচর কোমল ও কর্দ্দমাক্ত বলিয়া, নগরের প্রাচীর সকল প্রায়ই ইট অথবা টালি দিয়া নির্ম্মিত। প্রাচীরের উপরিস্থ গম্বুজগুলি কাষ্ঠ কিম্বা বংশ দিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অট্টালিকা-সমূহের সম্মুখে বারান্দা এবং প্রমোদগৃহ বিদ্যমান। সেগুলি চুণ কিম্বা সুরকি দিয়া আবৃত, কাষ্ঠদ্বারা গঠিত এবং টালিদ্বারা আচ্ছাদিত। অন্য প্রকারের বাড়ীগুলির আকার চীন দেশের বাড়ীর ন্যায়। এই সকল বাড়ীর আচ্ছাদনার্থ শুষ্ক ডালপালা, টালি অথবা তক্তা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং দেওয়ালগুলির পবিত্রতা রক্ষার জন্য গোময় মিশ্রিত চূর্ণ ও কর্দ্দম দ্বারা লেপিত। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে তাহারা চারিকে ফুল ছড়াইয়া রাখে। ইহাই তাহাদিগের কতিপয় বিভিন্ন রীতি।

সঙ্ঘারামসকল অসাধারণ নিপুণতাসহকারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। চারিকোণের প্রত্যেকটিতে এক একটি তিনতালা প্রকোষ্ঠ গঠিত আছে। কড়িকাঠ এবং বহির্গত কাষ্ঠফলক সকল নিপুণ হস্তে বিভিন্ন আকৃতিতে ক্ষোদিত হইয়া থাকে। দ্বার, গবাক্ষ এবং অনুচ্চ প্রাচীর সকল আগাগোড়া চিত্রিত। যতিগণের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সকল ভিতর দিকে সুসজ্জিত কিন্তু বহির্দ্দেশে সজ্জাবিহীন। অট্টালিকার ঠিক মধ্যস্থলে একটি উচ্চ ও প্রশস্ত (উপাসনা) প্রকোষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন আকারের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতাযুক্ত ভূমি বহুতর গৃহ ও চূড়া সঙ্ঘারামে বিদ্যমান থাকে। দ্বারগুলি পূর্ব্বদিকে উন্মুক্ত হয়; রাজসিংহাসনও পূর্ব্বমুখে বসান থাকে।

৬। আসন প্রভৃতি।

তাহারা উপবেশন অথবা বিশ্রাম করিবার জন্য মাদুর ব্যবহার করিয়া থাকে। রাজপরিবারবর্গ, ধনী ব্যক্তি এবং কর্ম্মচারিগণ নানাবিধ চিত্রপূর্ণ মাদুর ব্যবহার করেন কিন্তু সেগুলি আকারে পূর্ব্বোক্ত প্রকার। রাজার আসনখানি বৃহৎ ও উচ্চ এবং বহুমূল্যরত্নবিভূষিত। ইহাকে সিংহাসন বলে। ইহা অতি সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত এবং ইহার পা-দানখানিও রত্নখচিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের রুচি অনুসারে সুচিত্রিত মূল্যবান আসন ব্যবহার করেন।

৭। পোষাক-পরিচ্ছদ।

তাহাদিগের পরিধেয় বস্ত্রের আড়ম্বর নাই; তাহারা প্রধানতঃ শ্বেতবর্ণ পোষাক পরিধান করিতে ভালবাসে; মিশ্রবর্ণের আবা কারুকার্য্যপূর্ণ পরিচ্ছদ বড় একটা পসন্দ করে না। পুরুষগণ কোমরের চারিদিকে বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া, সেই বস্ত্রের দুই প্রান্ত বগলের ভিতর দিয়া লইয়া দেহের উপর দক্ষিণ পার্শ্বে ফেলিয়া রাখে। স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্র মাটি স্পর্শ করে এবং তাহারা স্কন্ধদেশ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখে। তাহারা মস্তকের মধ্যস্থলের চুলে একটি গ্রন্থি দেয় এবং অপর কেশগুলি আলুলায়িত রাখে। (পুরুষদিগের মধ্যে) কতক লোক গোঁফ কামাইয়া ফেলে এবং তাহাদিগের মধ্যে অন্যান্য অদ্ভুত আচরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। লোক মস্তকোপরি রত্নমালা-যুক্ত মুকুট ধারণ করে। তাহাদের বস্ত্রসকল কৌষেয় ও কার্পাস হইতে প্রস্তুত হয়। বন্য গুটিপোকা হইতে কৌষেয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা ক্ষৌম বস্ত্রও পরিধান করে; ক্ষৌম এক প্রকার গাছের ছাল। ছাগের সূক্ষ্ম লোম লইয়া যে কম্বল তৈয়ার হয়, তাহারও পোষাক হইয়া থাকে। হো-ল-লি (করাল) হইতেও বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ইহা এক প্রকার আরণ্য পশুর সূক্ষ্ম লোম হইতে তৈয়ার হয়। কদাচিৎ এই বস্ত্র বয়ন হয় বলিয়া ইহা অতি মূল্যবান এবং সূক্ষ্মবস্ত্র রূপে পরিচিত।

উত্তর ভারতে, যে স্থানের বায়ু শীতল, সেই স্থানের লোকরা হু-দিগের ন্যায় ছোট আঁটা পোষাক পরিধান করে। অপধর্ম্মিগণের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার বহুবিধ। কতক লোক ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করে, কতকলোক অলঙ্কার স্বরূপ কপাল-মালা কণ্ঠে ধারণ করে (কপালধারী); কেহ বা বৃক্ষপত্র বা বৃক্ষের পরিচ্ছদ পরিধান করে; অনেকে চুল উপড়াইয়া ফেলে এবং গোঁফ কামাইয়া থাকে। আবার কাহার কাহার ঘন গোঁফ থাকে এবং তাহারা মাথার উপর খোঁপা বাঁধে। সকলের পরিচ্ছদ সমান নহে এবং তাহাদের বর্ণও বিভিন্ন—কখন লাল, কখন বা সাদা।

শ্রমণগণের পরিচ্ছদ তিন *প্রকার,—সং-কিও-কি (সঙ্কক্ষিকা), ও নি-কো-সি-ন (নিবাসন)। এই তিন প্রকার পরিচ্ছদের কাট-ছাঁট একরূপ নহে,—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পোষাকের কাট-ছাঁট বিভিন্ন। অনেক

* প্রথম প্রকার পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় নামোল্লেখ হয় নাই।

গুলির পাড় প্রশস্ত অথবা সঙ্কীর্ণ, আবার অনেক পোষাকের উপরের লম্বমান অংশসকল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ। সঙ্কক্ষিকা পোষাক বাম স্কন্ধ ও কক্ষদ্বয় আবৃত করে এবং ইহার বামদিক উন্মুক্ত ও দক্ষিণদিক বন্ধ করিয়া পরিধান করা হয়। এই পরিচ্ছদ লম্বে কোমর ছাড়াইয়া যায়। নিবাসনের কটিবন্ধ ও থোব্না নাই। পরিধানকালে, ইহাকে পাটে পাটে ভাঁজ করিয়া কোমরের চারিদিকে জড়াইয়া দেওয়া হয় এবং এক গাছি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুসারে পরিচ্ছদের বর্ণ—বিভিন্ন। হরিদ্রা ও লাল—উভয় বর্ণই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। তাঁহারা সাদাসিদা ধরণে এবং মিতব্যয়িতাসহকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। দেশের রাজা ও প্রধান সচিবগণ বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করেন। তাঁহারা কেশসজ্জার জন্য রত্নবিভূষিত মুকুট ও পুষ্পসকল ব্যবহার করেন এবং বলয় ও কণ্ঠমালা দ্বারা আপনাদিগের শরীর ভূষিত করেন।

ধনী ব্যবসায়িগণ কেবলমাত্র সুবর্ণময় ক্ষুদ্র অলঙ্কারাদি ব্যবহার করে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নগ্নপদে গমনাগমন করিয়া থাকে; অতি অল্প লোকই খড়ম ব্যবহার করে। তাহারা দাঁত লাল অথবা কাল বর্ণে রঞ্জিত করে; চুল বাঁধে এবং কর্ণভেধ করিয়া থাকে। তাহাদিগের নাসিকা সুশ্রী এবং চক্ষু বৃহৎ।

৮। পরিচ্ছন্নতা, স্নান প্রভৃতি।

তাহারা শারীরিক পরিচ্ছন্নতার জন্য বিশেষ যত্নবান, এবং এই বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি হইতে দেয় না। সকলেই আহারের পূর্ব্বে স্নান করে। ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য তাহারা পুনরায় কখন ভোজন করে না এবং (ভোজনকালে) খাদ্যপূর্ণ পাত্রসকল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করে না। কাষ্ঠ বা প্রস্তরময় পাত্র (ভোজনার্থ) ব্যবহৃত হইলে, সেগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়; প্রত্যেক ভোজনের পর, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা লৌহের পাত্র সকল নিশ্চয়ই মাজিয়া চক্‌চকে করিতে হইবে। আহারান্তে তাহারা এক প্রকার গাছের ডাল দিয়া † দাঁত পরিষ্কার করিয়া, হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া থাকে।

† তৎকালে প্রধানতঃ খদির বৃক্ষের ডালেই দাঁতন প্রস্তুত হইত।

এই সকল ধৌতকার্য্য সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করে না। তাহারা মলমূত্র ত্যাগ করিয়া প্রতিবার শরীর ধৌত করে এবং সুগন্ধ দ্রব্যস্বরূপ চন্দন অথবা হরিদ্রা ব্যবহার করে।

যখন রাজা স্নান করেন, তখন ঢাক বাজিতে থাকে এবং বাদ্যযন্ত্রের সহিত স্তোত্র সকল আবৃত্ত হয়। পূজার্চ্চনা করিবার পূর্ব্বে তাহারা স্নান করিয়া থাকে।

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার।

আক্ষেপ।

১

বহে মধুবাস মলয় বাতাস,
কি কথা কহিয়া ফুলের কাণে?
শিশির-অন্তে নব বসন্তে
জাগে কি হরষ বিহগ-গানে?

২

মুকুল-আকুল বকুলে কোকিল
কহে কি ব্যাকুল সুখের ব্যথা!
তটিনী দু'কূলে ঢেউ তুলে তুলে
কহে কি গোপন মরম-কথা।

৩

পূরব গগনে অরুণ-কিরণে
কি আশা জাগায় কমল-বুকে!
চন্দ্র-আলোকে বিপুল পুলকে
চকোর গাহে কি আকুল সুখে!

৪

প্রেমে-সুখেভরা আকুলা এ ধরা,
মিলন-কাকলি, হরষ-কল;
বিরহ-শয়নে শূন্য জীবনে
আমারি কেবল নয়ন-জল।

মক্ষিকা।

মক্ষিকা জাতির বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। মানবজাতির বিরক্তিকর এমন জীব আর জগতে আছে কি না সন্দেহ। এই জীব উষ্ণ কটিবন্ধে কিছু অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। ইহা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নানা জাতীয় মাছির রূপবর্ণনা অনাবশ্যক। সাধারণতঃ যে সকল পক্ষযুক্ত কীটের 'ভন্‌ভনানিতে' লোক গৃহে "অতিষ্ঠ" হইয়া উঠে, আহার্য্য বস্তুর উপর বসিয়া যাহারা উহাকে অপবিত্র করিয়া তুলে, সেই সকল মক্ষিকাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতেও উহারা দুই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম শ্রেণী-বিভাগ লইয়া আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবর ভারাক্রান্ত করিব না। সকল জাতীয় মক্ষিকার সহিত আমাদের প্রায় সমান সম্বন্ধ। যাহারা আমাদের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধী, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করাতে কেবল কচ্‌কচি বৃদ্ধি পায়।

তথাপি ইহাদের কুল ও গোত্রের সামান্য পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইহারা কশেরুমজ্জাহীন জীবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের তিন যোড়া পদ ও দুই যোড়া পক্ষ আছে। তিন যোড়া চরণের বলে ইহারা ষট্‌পদত্বে দাবী রাখে। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদিগের দুই যোড়া পক্ষের অধিক সম্মান রাখিয়াছেন। ইহারা দ্বিপক্ষ পতঙ্গ (Diptera) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ভ্রমরের সহিত ইহাদের সুদূর জ্ঞাতিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই।

সকল দ্বিপক্ষযুক্ত পতঙ্গের পাখা সমান নহে। এক শ্রেণীর দ্বিপক্ষযুক্ত পতঙ্গের সম্মুখের ডানা যোড়াটা খুব মোটা ও কঠিন। ঐ পক্ষদ্বয়দ্বারা উড়িবার কিছুমাত্র সাহায্য হয় না। উহা ঐ শ্রেণীর জীবের কোমল দেহে কঠিন বর্ম্মের কার্য্যমাত্র করিয়া থাকে। এই বর্ম্মসম কঠিন পক্ষ যোড়ার পর অতি পাত্‌লা আর এক যোড়া ডানা আছে। এই ডানা যোড়াটির সাহায্যে ইহারা উড়িয়া বেড়ায়। গুবরে পোকা এই জাতীয়। ইহাদিগকে বর্ম্মপক্ষ (Coleoptera) জাতীয় পতঙ্গ বলা হয়।

আর এক জাতীয় দ্বিপক্ষযুক্ত পতঙ্গের দুই যোড়া ডানাই পাতলা ও উড়নের সাহায্যকারী। ইহাদের পাখা অতি সূক্ষ্ম আঁইসে আবৃত। সেই জন্য ইহারা আঁইসপক্ষ (Lepidoptera) শ্রেণীভুক্ত। প্রজাপতি প্রভৃতি

এই শ্রেণীভুক্ত। প্রজাপতির পালকে যে সূক্ষ্ম রেণুবৎ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাই ঐ আঁইস।

আর এক শ্রেণীর পতঙ্গের সম্মুখের পক্ষদ্বয় পাতলা, কিন্তু পশ্চাদ্দিকের পক্ষ যোড়াটি কঠিন ও স্থূলাগ্র। ইহার দ্বারা উড্ডীন হইবার কার্য্যের কোন সাহায্যই হয় না। তবে উড়িবার সময় ইহা বায়ুমণ্ডলে এই কীটের দেহ সমান ভাবে রক্ষা করিতে অনেকটা সাহায্য করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পতঙ্গই দ্বিপক্ষ (Diptera) পতঙ্গ নামে জীবতত্ত্ববিদ্ সমাজে পরিচিত। মশক, মক্ষিকা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইতঃপূর্ব্বে মশক সম্বন্ধে কয়েকটি আবশ্যক কথা লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে মক্ষিকা সম্বন্ধে কয়েকটি আবশ্যক কথা বলিব। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের কাপ্তেন সি. এ. গুর্লে মহাশয় মক্ষিকার সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে মশক কিরূপ ভাবে মানুষের স্বাস্থ্যহানি করে, তাহা তিনি বিশদ ভাবে সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছিলেন। এ বিষয়টি অত্যন্ত আবশ্যক। সেই জন্য আমরা সাধারণের অবগতির জন্য উহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম।

স্ত্রী মক্ষিকা বা মাছিনী একবারে এককালে প্রায় দেড়শত ডিম পাড়ে। জীবনে এক একটি মক্ষিকাভামিনী ছয়বার ডিম পাড়িয়া থাকে। সুতরাং এক একটি মক্ষিকা-মহিলার আট নয় শত ডিম হইয়া থাক। মক্ষিকা-মহিলা সরল ভাবে ডিমগুলি সজ্জিত করিয়া রাখে। ডিমগুলি দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির ষোড়শ ভাগের এক ভাগ। মশকের জীবনে যেমন চারিটি বিভিন্ন অবস্থা আছে, মক্ষিকার জীবনেও ঠিক সেইরূপ চারিটি বিভিন্ন অবস্থা; আছে। যথা (১) ডিম্বাবস্থা (egg); (২) অর্ভক বা শূক অবস্থা। (larva); (৩ কোষস্থ বা মূককীট (Pupa) অবস্থা; এবং (৪) মক্ষিকা (imago) অবস্থা। মশক নামক প্রবন্ধে আমি এই চারিটি অবস্থার কথা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। সুতরাং এস্থানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ডিম্বাবস্থায় মক্ষিকা অধিকক্ষণ থাকে না। অনুকূল অবস্থায় পড়িলে আড়াই প্রহরেই ইহারা ডিম হইতে পোকাকারে বাহির হইতে পারে। প্রতিকূল অবস্থায় ডিম ফুটিতে প্রায় আট প্রহর সময় লাগে। ডিম হইতে ইহা অতি সামান্য পোকার আকারে (maggots) বাহির হয়। এই অবস্থায়

ইহার বুভুক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। ইহা দণ্ডে দণ্ডে বৃদ্ধি পায়। ছাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইহার মেদ এত বৃদ্ধি পায় যে, শরীরের বহিরাবরণটি ফাটিয়া যায়; ইহা তখন পুরাতন আবরণ পরিত্যাগ করে। ক্রমে ইহার দেহে নূতন আবরণ জন্মে; উহাও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিদীর্ণ হইয়া যায়। মক্ষিকার্ভক আবার খোলস ত্যাগ করে। তৃতীয়বার ইহার দেহে যে খোলস জন্মে, তাহা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ও নমনীয়। এই আবরণের ভিতর ইহা তিন হইতে চারি দিন থাকে। এই চারিদিন ইহা ক্রমাগত খাইতে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সর্ব্বসমেত পাঁচ দিন ইহা এইরূপ শূক কীট larval stage) অবস্থায় থাকে। তাহার পর ইহা ইহার দেহের উপর একটি রক্তাভ আবরণ প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে। ইহাই তৃতীয় বা মূক কীট (pupal stage) অবস্থা। এই অবস্থাতেও ইহা প্রায় তিন চারি দিন থাকে। তৎপরে ইহা সেই বহিরাবরণ ভিন্ন করিয়া পূর্ণাঙ্গ মক্ষিকা রূপে বহির্গত হয়। ইহাই মক্ষিকা জীবনের চতুর্থ অবস্থা (imago stage)।

মশকের ন্যায় মক্ষিকাও মানবদেহে নানাবিধ রোগ বিসর্পিত করে। মশকদিগের ন্যায় মক্ষিকার হুল বা শুঁড় আছে। কোন কোন জাতীয় মক্ষিকা ঐ শুণ্ড দ্বারা তাহাদের আহার্য্য টানিয়া লয়। আবার কোন কোন জাতীয় মক্ষিকা উহার তীক্ষ্ণাগ্র মনুষ্যদেহে বিদ্ধ করিয়া দেয়। মশার ন্যায় মাছির কামড়ও বোধ হয় অনেককে সহিতে হইয়াছে। এই শেষোক্ত প্রকারের মক্ষিকা ঠিক মশকের ন্যায় এক জনের দেহ হইতে অন্য জনের দেহে রোগ বিসর্পিত করে। আফ্রিকায় নিদ্রারোগ এক শ্রেণীর মক্ষিকা (Tse Tse fly) কর্তৃকই বিসর্পিত হইয়া থাকে। শ্লীপদ, গলগণ্ড প্রভৃতি রোগও এক প্রকার মক্ষিকা বা ডাঁসের দংশনদ্বারা মানব সমাজে বিসর্পিত হয়। প্লেগ বিসর্পণেও মক্ষিকার কতকটা দায়িত্ব আছে, কেহ কেহ এরূপও অনুমান করেন। কিন্তু তাহা এখনও অনুমানমাত্র।

গার্হস্থ্য মক্ষিকা লোককে দংশন করে না। কিন্তু উহারা রোগ-বিসর্পণে বিলক্ষণ সহায়তা করে। উহাদিগকে সহজ দৃষ্টিতে নিতান্ত "ভালমানুষ" বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু উহারা মানবসমাজের ঘোর অনিষ্টকারী। উহারা যাহার উপর ক্ষণকাল অবস্থিতি করে তাহার উপরেই ডিম পাড়ে। ফল, মূল, অন্ন, ব্যঞ্জন, মাংস, মৎস্য, দুগ্ধ প্রভৃতির উপর ইহারা ডিম পাড়িতে দ্বিধা

বোধ করে না। আহার্য্য পদার্থের সহিত এই ডিম্ব যদি উদর-বিবরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই ডিম্ব সহজে উদরমধ্যে মরিয়া যায় না। উদরের ভিতরই ঐ ডিম্ব ফুটিয়া যায়। তাহা হইলে মানুষের উদরমধ্যেই মক্ষিকার শূক কীট ও মূক কীট পর্য্যন্ত জন্মে। মূক কীট অবস্থাতেই উহা বিষ্ঠার সহিত বাহিরে আইসে; উহা কোষ ভাঙ্গিয়া পূর্ণাঙ্গ মক্ষিকারূপে বাহির হয়। মানুষের উদর মধ্যে যদি মক্ষিকার শূক কীট জন্মে, তাহা হইলে তাহার কঠিন উদরাময় পীড়া জন্মে। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সমাজে এখন অনুসন্ধান চলিতেছে। কিন্তু মক্ষিকার ডিম্ব যে মানব উদরে প্রবিষ্ট হইয়াও তথায় পর পর তিনটি অবস্থা ভোগ করে,—এ তথ্য নিসংদিগ্ধভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে। কোনও আহার্য্য বস্তুর উপর মাছি বসিলে তাহা আহার করিতে নাই,—আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে এইরূপ একটা সংস্কার আছে; তাহাকে কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

সকলেই দেখিয়াছেন যে, পচা দুর্গন্ধযুক্ত গলিত পদার্থেই মাছির ভন্‌ভনানি অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। ইহার কারণ গলিত জান্তব ও গলিত ঔদ্ভিদ পদার্থই মক্ষিকাদিগের প্রিয় আহার্য্য ও ডিম্ব প্রসবের স্থান। গলিত জান্তব ও ঔদ্ভিদ পদার্থে ইহাদের অর্ভকগণ (larva) দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য ইহারা মানব ও জন্তুগণের মল ও বমনে ঝাঁকে ঝাঁকে বসিয়া থাকে; আবার তথা হইতে মানবের গাত্রে, বস্ত্রে ও আহার্য্য উড়িয়া আসিয়া বসে। ইহাতে মানবের যে কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহা সহজে বুঝা যায় না। বিজ্ঞগন জানেন যে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণার ও অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছেন যে, অতি ক্ষুদ্র লোকচক্ষুর অগোচর জীবাণু (Microbe) ও উদ্ভিজ্জাণু (Bacteria) হইতে নানারোগের উৎপত্তি হয়। কলেরা, টাইফয়েড, আন্ত্রিক জ্বর, প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগসমূহের মূল কারণ ঐ সকল রোগবীজাণু (Germ) মানব দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অচিরকালমধ্যে মানবকে কঠিন পীড়াগ্রস্ত করিয়া ফেলে। কলেরা রোগের বীজাণু যদি কোন রূপে কোন লোকের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা তাহার দেহমধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র সন্তান প্রসব করিতে থাকে। যখন এই বীজাণু তাহার উদর-গহ্বর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন সেই ব্যক্তি কলেরারোগগ্রস্ত হয়। প্রকৃতি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার দেহ হইতে ঐ বীজাণু

দূর করিতে চেষ্টা করে। সেইজন্য তাহার ভেদ ও বমন হয়। ভেদ ও বমির সহিত লক্ষ লক্ষ জীবাণু উৎক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। মক্ষিকাগণও দলে দলে ঐ সকল ভেদ ও বমির উপর বসিয়া থাকে। ভ্রমরের চরণে যেমন পুষ্পরেণু সকল সংশ্লিষ্ট হয় মক্ষিকার চরণেও সেইরূপ শত শত রোগ-বীজাণু জড়িত হয়। তৎপরে ঐ মক্ষিকা যেমন মানুষের আহার্য্য পদার্থে, দোকানের লুচি সন্দেশ, কচুরী প্রভৃতিতে, গৃহস্থের অন্ন, ব্যঞ্জন, দুগ্ধ, ক্ষীর, মাখন প্রভৃতিতে উড়িয়া আসিয়া বসে, অমনই ঐ সকল রোগ বীজাণু মক্ষিকার চরণ ছাড়িয়া ঐ সকল জিনিসে আশ্রয় লয়। মানব যখন ঐ সকল খাদ্য আহার করে, তখনই অলক্ষ্যে আপনার প্রাণহারী ঐ বিষ আপনিই খাইয়া ফেলে। ঐরূপ বিষ-ভোজনের কিছুকাল পরেই সেই লোক পীড়িত হইয়া পড়ে। কলেরা, টাইফয়েড, আন্ত্রিক জ্বর, প্রভৃতি রোগ মক্ষিকা কর্ত্তৃক এইরূপে বিসর্পিত হয়।

আর এক কথা সকলেই জানেন, "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি।" ঘা, পাঁচড়া, দুষ্টক্ষত প্রভৃতিতে মক্ষিকা বসিয়া থাকে। ঐ সকল ক্ষতের উপর বসিয়া উহারা ডিম পাড়ে। ইহাতে ক্ষতের নানা উপসর্গ জন্মে; আবার তাহারা যখন সুস্থ লোকের অনাবৃত গাত্রে উড়িয়া বসে, তখন সেই ক্ষতের পূঁজ, রক্ত ও বীজাণু সমস্ত শেষোক্ত ব্যক্তির গাত্রে সংক্রমিত করিয়া দেয়। এই প্রকারে মক্ষিকারা বসন্ত প্রভৃতি রোগ বিসর্পিত করিয়া থাকে। এখন দেখুন সামান্য মাছি মানুষের কি বিষম শত্রু!

এখন উপায়? কি উপায়ে এই দুরন্ত মক্ষিকার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া সম্ভবে? ব্যাপারটা বিশেষ কঠিন নহে। প্রথমতঃ খাদ্যদ্রব্য সমস্ত সূক্ষ্ম লৌহ জালৃতি নির্ম্মিত ঢাকা দ্বারা আবৃত করা আবশ্যক। গৃহলক্ষ্মীগণ যদি তাঁহাদের সন্তানগণের দুগ্ধ ও আহার্য্য দ্রব্য এইরূপে ঢাকিয়া রাখেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনেক সময় দুর্ব্বিসহ শোকের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন। গৃহে ও গৃহের ত্রিসীমানায় যেন কোনওরূপ ময়লা, আবর্জ্জনা বা জঙ্গল না থাকে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। গোশালা যেন দুর্গন্ধময় গোময়ে, গোমূত্রে ও পচা খইল-বিচালিতে পূর্ণ না থাকে। মিউনিসিপালিটি যাহাতে গ্রামের বন জঙ্গল উচ্ছিন্ন করে, ও জলনিকাশের সুব্যবস্থা করে, সে বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। গৃহের সান্নিধ্যে যাহাতে মলমূত্র না থাকে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। ধূপ, ধূনা, গুগ্গুল, কর্পূর, ও গন্ধক পোড়াইলে মশক ও মক্ষিকার উপদ্রব অল্প হয়।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কৃতজ্ঞতার বিনিময়।

(১)

ব্যর্থমনোরথ হইয়া চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে উকীল বন্ধুর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যেমন রাজপথের জনস্রোতে পড়িলাম, অমনই একজন মান্দ্রাজ প্রদেশাধিবাসী ভদ্রলোক আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবু, আপনার জন্ত আমি বহুক্ষণ এইস্থানে অপেক্ষা করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমার ঐ বাসায় আসিবেন কি?" আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আমাকে বলিতেছেন?" ভদ্রলোক স্মিত মুখে উত্তর করিলেন, "আপনাকেই বলিতেছি। আমার স্ত্রী একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।" বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! অপরিচিতা বিদেশিনী আমার সাক্ষাতাভিলাষিণী! কৌতুহলবশে ভদ্রলোকটির অনুসরণ করিলাম।

সদ্যসমাপ্ত সুন্দর দ্বিতল গৃহে ভদ্রলোকটির বাস। বাহিরের প্রকোষ্ঠগুলি ইংরাজী ধরণে সজ্জিত। আমাকে একখানি আসনে বসিতে বলিয়া ভদ্রলোকটি অন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বৈকালে বোধ হয় চা পান করেন; তাই একটু চা প্রস্তুত করিতে বলিয়া আসিলাম।" ইংরাজী রীতিঅনুসারে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। আসন গ্রহণ করিয়া তিনি আমাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং বঙ্গের রাজনীতিক, সামাজিক এবং কৃষি বিষয়ক অনেক তথ্য সংগ্রহ করিলেন। তিনি রীতিমত সংবাদপত্র পাঠ করেন, কিন্তু সংবাদপত্রে সকল সময় ঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। কর্ম্মব্যপদেশে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন; কিছু দিন পরে তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তিনি ভারত গবর্মেণ্টের রাজস্ব-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী—শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং সদ্বংশোদ্ভব। পরস্পরের পরিচয়ে এবং কথোপকথনে যত সময় অতীত হইতে লাগিল আমার কৌতুহল ততই বাড়িতে লাগিল। তাঁহার হাস্যোজ্জল মুখ-কান্তি দেখিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল যে, তিনি আমার উৎকণ্ঠা বেশ উপভোগ করিতেছেন। এই সময় সংবাদ আসিল, চা প্রস্তুত। আমরা অন্দরে প্রবেশ করিলাম।

বলা বাহুল্য মান্দ্রাজ প্রদেশে অবরোধ-প্রথা নাই এবং ব্রাহ্মণ-বিধবা ব্যতীত সকল স্ত্রীলোকই মস্তক অনাবৃত রাখেন। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে সকলের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে পারেন এবং অকুণ্ঠিত ভাবে অতিথি-সৎকার করেন।

বহির্ব্বাটী যেরূপ পরিপাটী, অন্দরমহলও তদ্রূপ পরিচ্ছন্ন, উচ্চবংশসম্ভূত, উচ্চশিক্ষিত ভদ্র গৃহস্থের উপযুক্ত। একখানি গোল টেব্‌লের উপর দুই পেয়ালা চা এবং প্রচুর ফল ও মিষ্টান্ন ছিল। আমরা উপবেশন করিলে, ভদ্রলোকটি তাহার স্ত্রীকে ডাকিলেন আমি এক অনিশ্চিতের উত্তেজনায় চঞ্চল হৃদয়ে গৃহকর্ত্রীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে উত্তম বসনে ভূষিতা চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্কা রমণী তাঁহার পাঁচ বৎসরের শিশু কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে ইংরাজী রীতির অনুকরণ করিতে নিষেধ করিয়া ভদ্রলোকটি আমার হস্ত ধরিয়া বসাইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, স্ত্রীলোককে সম্মান-প্রদর্শন ইংরাজদের একচেটিয়া অধিকার নহে; হিন্দু স্ত্রীলোকের যেরূপ সম্ভ্রম করিতে জানে, পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য জাতি সেরূপ করিতে জানে কি না সন্দেহ। আমাদের কথোপকথন ইংরাজীতে হইতেছিল, সুতরাং আমার এই স্ত্রীভক্তি সেই সুশোভনা ললনার হৃদয়ঙ্গম হইল কি না আমি বুঝিতে পারিলাম না।

স্ত্রীকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া ভদ্রলোকটি আমার সহিত নানা কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। চা পান করিতে করিতে তিনি আমাদের অবরোধ-প্রথা যে অপ্রশংসনীয়, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার অবান্তর প্রসঙ্গের প্রশ্রয় না দিয়া, ভবভূতির রামের মুখে সীতার প্রতি উক্তি "আজ্ঞাপয়" উদ্ধৃত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলাম। ভদ্রলোক তখন তেলেগু ভাষায় আমাদের কথোপকথনের সারাংশ তাঁহার স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিলেন। আমি ইতোমধ্যে দুইটি সুপক্ক ফল প্রদান করিয়া তাঁহাদের কন্যার সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিয়া লইলাম।

অমি তাহাকে যেমন জিজ্ঞাসা করিলাম "নি পেরু আমি" অর্থাৎ "তোমার নাম কি?" অমনই গৃহকর্ত্রী তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি স্বামীর মুখের প্রতি ন্যস্ত করিয়া স্বদেশীয় ভাষায় কি বলিলেন। তাহার মধ্যে আমি কেবল ঐ "নি পেরু আমি" টুকুই বুঝিতে পারিলাম। ভদ্রলোকটি

উচ্চহাস্য করিয়া আমার মুখপানে চাহিলেন। আমি অপ্রতিভ হইয়া আমার বহুদিন পূর্ব্বে সংগৃহীত তেলেগু কথা কয়টির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলাম। আমি কুণ্ঠিত ভাবে ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার প্রশ্নে কিছু প্রমাদ ঘটিয়াছে কি? আমি বহুদিন পূর্ব্বে ঐ কথা কয়টি শিখিয়াছিলাম, ভুল হওয়াই সম্ভব।" ভদ্রলোক ত হাসিয়াই আকুল। তাঁহার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনিও হাসিতেছেন। আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। আমার ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ভদ্রলোকটি ব্যস্তভাবে বলিলেন—"না, না; আপনার প্রশ্ন ঠিক হইয়াছে। তবে ঐ প্রশ্ন বহুদিন পূর্ব্বে আপনি আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বলিয়া কি মনে হয়?"

আমি বলিলাম, "দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার ওয়ালটেয়ারে গিয়াছিলাম। সেই সময় আমি ঐরূপ অনেক কথা শিখিয়াছিলাম; সম্ভবতঃ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারি।"

"ভাল। আমার স্ত্রীকে আপনি পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছেন, মনে হয় কি?"

"না। কিন্তু, আপনার স্ত্রীকে দেখিবামাত্রই আমার মনে হইয়াছিল যে, পূর্ব্বে যেন আমি ঐরূপ মুখ কোথাও দেখিয়াছি।"

দ্বাদশবৎসর পূর্ব্বে আপনি এক দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন এবং এক দিন আপনি সমুদ্র-সমাধি হইতে তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এই বালিকা সেই বালিকার কন্যা। আজ সে দেখাইতে চাহে যে, আপনি যে ঘটনা তুচ্ছ মনে করিয়া বিস্মৃত হইয়াছেন—যে উপকৃত, সে তাহা বিস্মৃত হয় নাই। আজ বার বৎসর পরে রাজপথে একবারমাত্র তাহার সেই জীবন-রক্ষককে দেখিয়া সে চিনিতে পারিয়াছে এবং তাহার চিরকৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ আজ আপনাকে আপনার কন্যার জন্য এই অকিঞ্চিৎকর উপঢৌকন প্রদান করিতেছে।"

রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে একটি সোণার "নেকলেস্" প্রদান করিয়া অভিবাদন করিলেন। আমি বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

(২)

দ্বাদশ বৎসর—এক যুগ! সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন আমি কেবল বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি।

পিতার অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও অল্প বয়সে আমাকে কঠোর জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। আমি আমার জননীর নিকট উচ্চাভিলাষ লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু অদৃষ্টচক্রে বাসনানুরূপ শিক্ষালাভ হয় নাই। তাই কর্ত্তব্য কর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়া আমি আত্মোৎকর্ষের প্রয়াস পাইতাম। কয়েক বৎসর অনিয়মিত পরিশ্রম করিয়া আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল; অবশেষে আত্মীয় স্বজন এবং চিকিৎসকের অনুরোধে আমাকে ওয়ালটেয়ারে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে যাইতে হইয়াছিল।

প্রকৃতির লীলাভূমি, মান্দ্রাজ প্রদেশান্তর্গত ওয়ালটেয়ার ভারতবর্ষের এক রমণীয় স্বাস্থ্য-তীর্থ। নীলাম্বরতলে নিলাম্বুধৌতচরণা, পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিতা, গৌরিকাম্বরা বসুধা সুন্দরী নিসর্গের নয়নতৃপ্তিকর লীলা-নিকেতন। সূর্য্যাস্তের এবং সূর্য্যোদয়ের সময় দৃশ্যের রমণীয়তা প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝা যায় না। প্রভাতে এবং সায়াহ্নে সমুদ্র-সৈকতে বালুকা-স্তরের উপর শয়ন করিয়া শীকর-শীতল-বায়ুস্নাত হইয়া সেই বিরাট দৃশ্যের বিচিত্রতা উপভোগ করা যে কত আনন্দজনক এবং আরামদায়ক তাহা কল্পনায় আনয়ন যায় না। উর্দ্ধে সুনীল গগন, নিম্নে ক্রমোচ্চ তীরভূমির উপর বনরাজি, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়—আর সেই গভীর গম্ভীর বারিরাশির অবিশ্রান্ত গর্জ্জন। ঢেউয়ের উপর ঢেউ—তার পর ঢেউ; দূরে—বহুদূরে দিগন্ত স্পর্শ করিতেছে। এক দিকে জড় প্রকৃতি যেমন নীরব, নিস্তব্ধ; অন্য দিকে জলরাশি তেমনই উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল।

রাজপথে স্থানে স্থানে সংযোজিত অশ্বযানে বসিয়া য়ুরোপীয়া মহিলাগণ নিসর্গের বিচিত্র চিত্র চিত্রপটে রঞ্জিত করিতেছেন। সমুদ্রবক্ষে উলঙ্গপ্রায় ধীবরগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় ভাসমান হইয়া মৎস্য ধরিতেছে; নৌকাগুলি সেই উত্তাল তরঙ্গে নাচিতেছে—হেলিতেছে—দুলিতেছে। এক এক বার মনে হয়, এইবার বুঝি দুঃসাহসিক ধীবর নৌকার সহিত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই আকণ্ঠস্নাত হইয়া সে জাল নিক্ষেপ করে। মধ্যে মধ্যে দুই একখানি জাহাজ ক্ষুদ্র কপোতের ন্যায় আকাশ এবং সলিলের সন্ধিস্থল ভেদ করিয়া বন্দরাভিমুখে যাইতেছে দেখা যায়। কোথাও অস্নাতদেহ, অনাবৃত-মস্তক পল্লীবধূগণ কূপ হইতে পানীয় জল আহরণ করিতেছেন; কোথাও কৃষ্ণকান্তি বালকবালিকাগণ দৌড়াইতেছে—ক্রীড়াকৌতুক করিতেছে।

বহুদিন বিস্মৃত সুখ-স্বপ্নের ন্যায় সেই সুরম্য দৃশ্য দ্বাদশ বর্ষ পরে আমার মানস-পটে পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি সেই কৃতজ্ঞ ললনার মুখপানে চাহিয়া আমার সেই ক্ষণস্থায়ী অতীত সুখ-জীবনের পরিচিতা বালিকার হাস্যোজ্জ্বল মুখকান্তির সৌসাদৃশ্য অনুভব করিলাম। সেই স্বজনহীন জীবনের প্রথম প্রবাসে যখন অস্তাচলগমনোন্মুখ সুবর্ণ-গোলকের রক্তিম রাগে সমুদ্র-তীর উদ্ভাসিত হইত—যখন মলয়ানিলস্পর্শে শরীর মন সুশীতল হইয়া যৌবন-প্রারম্ভের অকস্মাৎ অবসাদ আমাকে ব্যথিত করিত, তখন সমুদ্রগর্ভে সলিল-পরিবেষ্টিত দ্বীপবৎ শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার সহিত কথোপকথন করিয়া গৃহস্মৃতি বিস্মৃত হইবার প্রয়াস পাইতাম। আজ সেই চিত্র সুস্পষ্টরূপে মানস-পদে উদিত হইল। জীবন স্বপ্ন—সত্যও স্বপ্ন!

মনে হইল,—প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভৃত্য স্থানীয় জনৈক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকীলের দুইটি বালিকা কন্যা লইয়া বেড়াইতে আসিত। ভৃত্য হিন্দুস্থানী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিল, সুতরাং তাহার সহিত শীঘ্রই আমার পরিচয় হইয়া গেল। আমি তাহার নিকট হইতে দুই একটি তেলেগু বাক্য শিখিয়া বালিকাদ্বয় যখন নিকটে আসিত তখন তাহাদিগকে তাহাদের ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ কৌতুক অনুভব করিতাম। বাঙ্গালীর মুখে মাতৃভাষা শুনিয়া বালিকাদ্বয়ের উজ্জ্বল চক্ষু উজ্জ্বলতর হইত। যত বার আমি "নি পেরু আমি" প্রশ্ন করিতাম, তত বার তাহাদের উচ্চহাস্যে দিগন্ত মুখরিত হইত। সে কি মধুর স্মৃতি!

ভৃত্যের সহিত যখন বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল, তখন মধ্যে মধ্যে সে বালিকাদ্বয়কে আমার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কূপসন্নিধানে সমাগতা পল্লীললনা-গণের সহিত আলাপ করিতে যাইত। একদিন আমার আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল; ইতোমধ্যে ভৃত্যের পরিচিতা কোন ললনা কূপপার্শ্বে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। ভৃত্যের সহিষ্ণুতা আমার আগমন-প্রতীক্ষার অবসর রাখিল না—সে চলিয়া গেল। অসংযতগতি বালিকাদ্বয় ক্রীড়া করিতে করিতে সলিল-সন্নিধানে আসিয়া উপনীতা হইল। বয়োজ্যেষ্ঠা একটি বৃহৎ শিলাখণ্ডের উপর আরোহণ করিয়া কনিষ্ঠার প্রতি ঝিনুক ছুড়িতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে শিলাখণ্ড সলিল পরিবেষ্টিত হইয়া গেল। চকিতা বালিকা ভৃত্যের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কিন্তু ভৃত্য নিকটে নাই। সমুদ্র-বক্ষ ক্রমে স্ফীত হইতে লাগিল, বেলাভূমি ক্রমে নিমজ্জিত হইয়া গেল। কনিষ্ঠা ছুটিয়া ভৃত্যের অনুসন্ধানে গেল—কিন্তু বুঝি সব ফুরাইয়া যায়! উচ্ছ্বসিত সলিলরাশি ক্রমে শিলাখণ্ডকে গ্রাস করিতে লাগিল এবং তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তাহাতে প্রতিহত হইতে লাগিল। বহু সংঘর্ষে শিলামূল শিথিল হইয়া ছিল। একটি উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে মূলচ্যুত করিল। বালিকা আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

সৌভাগ্যক্রমে আমিও ঠিক সেই সন্ধি মুহূর্ত্তে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নিমজ্জিত বালিকার আলুলায়িত কেশ লক্ষ্য করিয়া আমি এক লম্ফে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম; কিন্তু সে উন্মত্ত তরঙ্গের বেগ অতিক্রান্ত করিয়া তীরে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি সেই সংজ্ঞহীনা বালিকার দেহ ধারণ করিয়া ভাসিয়া চলিলাম—মনে হইল, সব ফুরাইল। ক্রমে হস্ত পদ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল।

যখন নিতান্ত হতাশ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতে যাইতেছি, তখন দুই পার্শ্ব হইতে দুইখানি ধীবরের নৌকা আসিয়া আমাদিগকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিল।

তীরে সমাগত জনতার মধ্যে একজনের ভীতিবিহ্বল সজল নেত্র আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল;—সে সেই ভৃত্য। নিমজ্জিতা বালিকার কনিষ্ঠাকে ক্রোড়ে লইয়া সে তাহার কাতর দৃষ্টিতে আমার অভিনন্দন করিল। আমি তাহার চিত্তভাব অনুভব করিয়া তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে অভয় দিলাম। জনকোলাহল ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং বালিকাদ্বয়ের জনকজননীর নিকট সংবাদ যাইতে বিলম্ব হইল না। অবিলম্বে তাঁহারা তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইতোমধ্যে বালিকা সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। জননীকে দেখিয়াই সে মাতৃ-বক্ষে আশ্রয় লইল। বালিকার পিতা আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলেন। তিনি ধীবরগণকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে সেই উকীল-পরিবারের সহিত আমার বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল। কতদিন তাঁহারা আমাকে বাসা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সুরম্য সৌধে আশ্রয় লইতে আগ্রহাতিশয্য জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদিগের কৃতজ্ঞতা আতিথ্যাপেক্ষা অধিক আদরের সহিত গ্রহণ

করিয়াছিলাম। তাহার পর একদিন তাঁহাদের মায়া কাটাইয়া—যাহাদের মায়ায় আমি চির-শৃঙ্খলিত তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম।

আমার বিপদে এই "নেক্‌লেস্" সেই কৃতজ্ঞতার পুরস্কার!

(৩)

ওয়ালটেয়ার হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমার প্রথম সন্তান—কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া সেই কন্যা অ জ দ্বাদশ বর্ষের। আমি তাহার বিবাহের জন্য ব্যাকুল। শৈশবে আমার এক বন্ধু ছিল। বাল্যে এবং যৌবনে আমরা উভয়ে একত্র পাঠাভ্যাস করিতাম। তাহার পর যখন আমি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম—সারদাচরণ তখনও পড়া শেষ করে নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যে সে উকীল হইয়া আলিপুরে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। সৌভাগ্য-সূর্য্য কেবল উদিত হইয়াছে, এইরূপ সময়ে একদিন কাল বৈশাখী রাত্রিতে সারদাচরণ পরিজনবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেল।

সারদার বয়স আমার বয়স অপেক্ষা কিছু অধিক ছিল। তাহার পিতা-মাতার অবস্থা ভাল ছিল; বিদ্যাভ্যাসেও তাহার যত্ন ছিল; সুতরাং একটা পাশ দিতে না দিতেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। আর একটি পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বে সারদার প্রথম পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। একদিন কথায় কথায় উভয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, আমার যদি বিবাহ হয় এবং কন্যা সন্তান জন্মে তাহা হইলে সারদার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। আমাদিগের উভয়ের বড় আশা ছিল যে ভবিষ্যৎ জীবনে আমরা বন্ধুত্ব কুটুম্বত্বে পরিণত করিব—তাহা হইলে বন্ধন দৃঢ় হইবে, বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকিবে না। বিধাতাও আমাকে প্রথম কন্যা সন্তান দিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিবাহ-যোগ্যা হইবার পূর্ব্বেই সারদা চিরশান্তিলাভ করিয়াছিল।

তাহার পর সারদার পুত্র হিমাংশু যখন বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল এবং আমার কন্যা একাদশ অতিক্রান্ত করিয়া দ্বাদশে পদার্পণ করিল তখন সারদার পত্নী গরিবের ঘরে পুত্রের বিবাহ দিতে কিছুতেই স্বীকৃতা হইলেন না। সারদার কনিষ্ঠ বরদাচরণ হাইকোর্টের উকীল। তিনিই হিমাংশুর অভিভাবক। আমি তাঁহার শরণ লইলাম। একদিন তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে সারদার স্ত্রী আমার কন্যাকে দেখিয়া গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মেয়ে পছন্দ হইল। কিন্তু "হরিতকী দক্ষিণা" লইয়া দরিদ্রের ঘরে পুত্রের বিবাহ—যে পুত্র তিনটি "পাশ দিয়াছে" - কখনও সম্ভাব্য নহে।

হিমাংশুর বিবাহের জন্য অন্যত্র কন্যা দেখা হইতে লাগিল। যে স্থানে অর্থ পাওয়া যায় সে স্থানে কন্যা সুরূপা হয় না; আবার যে স্থানে কন্যা সুরূপা সেস্থানে কিছুমাত্র প্রাপ্তির আশা নাই। সারদার স্ত্রী এক বিষম সমস্যায় পড়িলেন। একদিন তিনি এ বিষয়ে হিমাংশুর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। হিমাংশু তাঁহাকে কোন উত্তর না দিয়া খুল্লতাতকে বলিয়াছিল, "যদি গরিবের মেয়ে বিবাহ করিতে হয় তাহা হইলে পিতৃ-সত্য প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" অগত্যা সারদার স্ত্রী সম্মতা হইলেন, কিন্তু তিনি যে "ফর্দ্দ" পাঠাইলেন তাহাতে আমাকে নিরাশ হইতে হইল। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর হিমাংশুর মাতা ফর্দ্দ কিছু কমাইলেন,—যাহা রহিল তাহাও আমার সাধ্যাতীত। হিমাংশু অতি সুপাত্র, আর সারদার নিকট আমার অঙ্গীকার এই উভয় বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি সারদার স্ত্রীর সকল অভিলাষ পূরণ করিতে স্বীকৃত হইলাম, কেবল একটি নেক্‌লেসের অভাব তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়া লইতে অনুরোধ করিলাম।

পুত্র-গৌরবে গৌরবান্বিতা জননীর হৃদয় তাহাতে দ্রব হইল না। কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যাকুল হৃদয়ে আবার আমি বরদা বাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধও বিফল হইল। তাই কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার বাটী হইতে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম। কি করিয়া উৎকণ্ঠিতা জননীকে নিরাশার নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিব,—তাহাই ভাবিতে ভাবিতে রাজপথের জনকোলাহলে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম এমন সময়ে মান্দ্রাজী ভদ্র লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।

* * * *

বিস্ময়ের বিহ্বলতা অপসৃত হইলে আমি সেই ভদ্র মহিলাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। আমার সকল কথা বলিয়া বলিলাম—"এই 'নেকলেসের' মূল্য আমার নিকট কত তাহা আমি ভাষায় বর্ণনা করিয়া জানাইতে পারি না।" তাঁহাদের "অকিঞ্চিৎকর উপহারে" আমার এমন মহৎ উপকার হইবে শুনিয়া তাঁহারা আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিলেন। আমি ভাবিলাম, ইহা কৃতজ্ঞতার বিনিময়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদ কি?

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার উত্তরে আমাদিগের প্রাচীন দার্শনিকগণ বলেন যে বেদ অপৌরুষেয়—স্বতঃ-প্রমাণ। যেমন জড় ঘট পটাদির স্বপ্রকাশত্ব না থাকিলেও চন্দ্র সূর্য্যাদির স্বপ্রকাশকতা অবিরুদ্ধ, সেইরূপ মনুষ্যাদির স্বীয় স্কন্ধারোহণ অসম্ভব হইলেও অকুণ্ঠিতশক্তি বেদের ইতর বস্তু প্রতিপাদকত্বের ন্যায় স্বপ্রতিপাদকত্ব হইতে পারে। অর্থাৎ বেদ অকুণ্ঠিতশক্তি তাহার যেমন ইতর বস্তু প্রতিপাদনের যোগ্যতা আছে সেইরূপ আপনাকে আপনি প্রতিপাদিত করিবার ক্ষমতাও আছে। এই অভিপ্রায়ে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন :—

"চোদনাহি ভূতং ভবন্তং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং
বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং জাতীয়মর্থং শক্নোত্যবগময়িতুং"

বেদ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট বস্তু অবগত করাইতে সক্ষম। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বেদে প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, বেদ আপনিই আপনার প্রমাণ।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া থাকেন। অপৌরুষেয় কি তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। পুরুষ হইতে যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাকে পৌরুষেয় বলা যায়। উহার অভাব (অর্থাৎ যাহা পুরুষসাপেক্ষ নহে) তাহাই আমরা অপৌরুষেয় বলিয়া বুঝি।

কিন্তু বেদে সেই অপৌরুষেয়ত্বের সম্ভাবনা কোথায়? বেদ ঈশ্বর-সৃষ্ট। কোন একটি বস্তু রচনা বা নির্ম্মাণ করিতে যে শরীরের প্রয়োজন তাহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। হস্ত-পদ-বিশিষ্ট স্বর্ণকার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে. হস্ত-পদ-বিশিষ্ট কবি কবিতা রচনা করিতেছেন। বেদ বলিতেছেন, "নরূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে" ইহার কোন রূপ আমাদিগের উপলব্ধি হয় না অর্থাৎ ইনি নিরূপ।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চয়ৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে"

অর্থাৎ যাহাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ব্যয় প্রভৃতি কিছুই নাই, সেই পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারা

যায়। তবে রূপবিহীন পরমেশ্বর কি করিয়া বেদ রচনা বা নির্ম্মাণ করিতে পারেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কপিল বলিয়াছেন—

"যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎ
পৌরুষেয়ম্" সাংখ্যদর্শন ।৫।৫০

দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অদৃষ্ট যে পদার্থে কৃতবুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাহাকেই পৌরুষেয় বলা যায়। অর্থাৎ পুরুষের উচ্চারণমাত্রেই যে পৌরুষেয়ত্ব তাহা নহে, কেন না সুষুপ্তিকালীন শ্বাসপ্রশ্বাসেও পৌরুষেয়ত্ব ব্যবহৃত হয় না। তবেই বুদ্ধিপূর্ব্বকত্ব পর্য্যন্ত অনুধাবন করিতে হয়। বেদ নিঃশ্বাসের ন্যায়ই স্বয়ম্ভূ হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিল। অতএব বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

"তস্যৈতস্য মহতো ভূতস্য
নিঃশ্বসিত মেতদৃগ্‌বেদ সামবেদ যজুর্ব্বেদাথর্ব্ববেদাঃ"

এই যে ঋক সাম যজুঃ এবং অথর্ব্ববেদ, ইহা সেই পরমেশ্বরের নিঃশ্বসিত অর্থাৎ নিশ্বাসতুল্য।

অতএব বেদ বুদ্ধিপূর্ব্বক লিখিত বা রচিত হয় নাই; এজন্য উহা অপৌরুষেয়। কিন্তু যে বস্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছে তাহাতে অনুমাত্রও রচনা-কৌশল নাই। যাহা যথার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক নহে, তাহার প্রামাণ্য কি করিয়া স্বীকার করা যায়? এই সংশয় অপনোদন করিতে কপিল বলিয়াছেন—

"নিজশক্ত্যাভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যং" সাংখ্যদর্শন ৫।৫১

বেদের যে স্বাভাবিক যথার্থ জ্ঞানজননী শক্তি আছে, এই শক্তির অভিব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদে উপলব্ধি হইয়া থাকে; অতএব বেদ স্বতঃ-প্রমাণ। বেদ যদি স্বতঃ-প্রমাণ হইল, তবে তদ্‌মূলক ও তদ্‌সংগ্রাহক স্মৃতি ও ইতিহাসাদির প্রামাণ্য ও অক্ষুণ্ণ।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়েই বেদ নামধেয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উপনিষৎ ব্রাহ্মণেরই অন্তভাগ তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু কেহ কেহ ব্রাহ্মণ-ভাগের বেদত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণে যখন আখ্যায়িকা প্রভৃতি দেখা যায়, তখন ব্রাহ্মণভাগ পুরাণ বা ইতিহাসের মধ্যেই পরিগণিত। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণও উপনিষদে বহু আখ্যায়িকা আছে। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে জনক, অজাতশত্রু, শ্বেতকেতু প্রভৃতির বহু

আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কি ব্রাহ্মণ ভাগের বেদত্ব নাই? সায়ণাচার্য্য এই আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ভাগের পুরাণ বা ইতিহাস সংজ্ঞার কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কম্বু ও গ্রীবাযুক্ত পদার্থ বিশেষের কলস, কুম্ভ ইত্যাদি সংজ্ঞা থাকিলেও উহার ঘট নাম হইবে না, কে বলিল? আমরা যাহাকে "খা" বলি, কেহ তাহাকে "ডগ্" বলিলে, কি বস্তুর অন্যরূপতা প্রতিপাদন করা হইল? "ডগ্" বা "খা" আখ্যায় আখ্যাত পদার্থ উভয় অবস্থাতেই একরূপই থাকিবে। সেই রূপ দুরূহ বেদের ব্যাখ্যান-ভাগ বলিয়া তাহার বেদত্ব অপনীত বা নষ্ট হইবে না। অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ দেখা যায়। মহামতি পতঞ্জলি পাণিনির ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্য মহাভাষ্য নামে আখ্যাত। মহাভাষ্যের সর্ব্ব প্রথমেই পতঞ্জলি বলিয়াছেন,

"অথ শব্দানুশাসনম্"—অথেত্যয়ং অধিকারার্থঃ
শব্দানুশাসনং শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যং।'

অথ শব্দানুশাসনম্ এই কথা স্বয়ং বলিয়া অথেত্যয়ং ইত্যাদি দ্বারা স্বয়ংই তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থানে অথেত্যয়ং ইত্যাদি ব্যাখ্যাংশেরও মহাভাষ্যত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। এবং কাব্যপ্রকাশে কাব্যং যশসে ইত্যাদি বলিয়া নিজেই আবার তাহার বৃত্তি করিয়াছেন; এই বৃত্তিগুলিও কাব্যপ্রকাশ নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ ব্রাহ্মণ ভাগ মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইলেও তাহার বেদত্ব দূরীভূত হইল না। সূত্র প্রভৃতি রচনা করিয়া তাহার প্রতীক গ্রহণ করতঃ ব্যাখ্যা করা গ্রন্থকারদিগের প্রাচীন রীতি। বেদেও এই রীতির যথার্থ সমাবেশ দেখা যায়। ঋষি-প্রোক্তত্ব মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়াংশেই সমান। বেদেও যেমন মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি ঋষি আছেন, ব্রাহ্মণেও সেই ঋষি থাকিলে ইহাতে কিছুমাত্র আপত্তির কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদের ঋষিগণ বেদের কর্ত্তা নহেন, দ্রষ্টা মাত্র। তাঁহারা যেরূপ মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন সেইরূপ ব্রাহ্মণ-রূপ মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্র-ভাগের ব্যাখা, ইহা বলিলেও বেদত্ব দূরীভূত হয় না। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন মন্ত্র ভাগে ঋষি আছেন বলিয়া যে মন্ত্র ভাগই বেদ, ব্রাহ্মণ ভাগ বেদ নহে, এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। কারণ "ঋষি দর্শনাৎ নতু কর্ত্তৃত্বাৎ" দর্শন করিয়াছেন, বলিয়া ঋষি হইয়াছেন; কর্ত্তা বলিয়া নহে, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা ঋষিত্ব সাধিত হইয়াছে। সুতরাং সেই দর্শন যেমন মন্ত্রভাগে আছে

সেইরূপ ব্রাহ্মণভাগেও আছে, ইহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতেছে। মনু উদিতাদি হোমের বেদ-প্রোক্ততা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই উদিত হোম কেবল ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই উক্ত হইয়াছে। মন্ত্রভাগে এই হোম দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ব্রাহ্মণ ভাগের বেদত্ব তাঁহারও ইষ্ট। তাঁহার সেই উক্তিটি এই :—

উদিতে নুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতয়ীং বৈদিকী শ্রুতিঃ।

মনুসংহিতা।

মহর্ষি জৈমিনিও তদীয় মীমাংসা দর্শনে বলিয়াছেন "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ" এস্থানে শেষে এই কথাটি দ্বারা স্পষ্টই ব্রাহ্মণের বেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন। জৈমিনির আরও একটি সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই :—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্য—মতদর্থানাম্" এই সূত্রেও ব্রাহ্মণভাগের আম্নায়ত্ব অর্থাৎ বেদত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে "বাক্যবিভাগস্যচার্থ গ্রহণাৎ" ।২।১।৬১। "বিধ্যর্থবাদানুবাদবচন বিনিয়োগাৎ"। ৬২ সূ। "বিধি বিধায়কঃ।" ৬৩ সূ। "স্তুতি নিন্দা পরকৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যথ বাদঃ" ।৬৪। "বিধি বিহিতস্যানুবচনমর্থবাদঃ।" ৬৫ সূ। এই পাঁচটি সূত্রে শব্দ অর্থাৎ বেদপ্রমাণ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বোধ হয়, তিনিও ঐ ব্রাহ্মণভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বাৎস্যায়ণ ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা, ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। বাৎস্যায়ণ পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় "প্রমাণং শব্দো যথালোকে, বিভাগশ্চ ব্রাহ্মণ বাক্যানাং ত্রিবিধঃ" এইরূপ উপক্রম করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"যথা লৌকিকে বাক্যে বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং ভবিতুমর্হতি এবং বেদবাক্যানামপি বিভাগেনার্থগ্রহণাৎ প্রমাণত্বং।"

যেমন বিভক্তরূপে অর্থ গৃহীত হইলেও লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্যতা আছে, সেইরূপ বেদবাক্যেরও প্রামাণ্যতা হইতে পারে। কেন না বিভাগে অর্থগ্রহণ বেদেও আছে। সুতরাং ঋষিপুঙ্গব ব্যাৎসায়ণ যে ব্রাহ্মণের বেদত্ব স্বীকারের পক্ষপাতী, তাহা তাঁহার স্বীয় উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। মন্ত্র ভাগের ন্যায় ব্রাহ্মণভাগেরও প্রামাণ্য আছে।

আমাদ্গিগের প্রাচীন দার্শনিকগণ বেদের নিত্যতা স্বীকার করেন, ইঁহা-দিগের মতে সংসার অনাদি, কিন্তু অন্তবান। ফলতঃ সংসার আদি কি

অনাদি, এই বিচার পূর্ব্বে বহুস্থানে হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন দার্শনিকগণ বহু গবেষণা, বহু চিন্তা ও বিস্তর আলোচনা করিয়া, পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে সংসার অনাদি। সংসারের সাদিতা গৃহীত হইলে প্রভূত দোষের অধীন হইয়া পড়িতে হয়; এই অনাদি সংসারে বেদ চির-কালই তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। বেদব্যাস বেদান্ত দর্শনে বলিয়াছেন "অতএব নিত্যত্বং" বেদান্তদর্শন ১।৩।২৯। যেহেতু নিয়তাকৃতি দেবাদিবিশিষ্ট জগৎ বেদশব্দ পূর্ব্বক সৃষ্ট হইয়াছে অতএব বেদও নিত্য। মন্ত্রে আছে:—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ংস্তামন্ববিন্দন্নৃষিষুপ্রবিষ্টাং।"

যাজ্ঞিকগণ পূর্ব্বসুকৃতিবলে বেদের যোগ্যতালাভ করিয়া ঋষিগণের মধ্যে স্থিত বেদকে পাইয়াছিলেন। "ঋষিগণের মধ্যেস্থিত" বলায় বেদের নিত্যতা সমর্থিত হইল। স্মৃতিতেও দেখা যায়।

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥"

যুগান্তকালে বেদরাশি অন্তর্হিত হইয়াছিল কিন্তু মহর্ষিগণ তপস্যাদ্বারা স্বয়ম্ভুর অনুজ্ঞায় ইতিহাস সহিত সেই সমগ্র বেদ লাভ করিয়াছিলেন।

জগৎ বেদ শব্দ পূর্ব্বক সৃষ্ট হইয়াছে শ্রুতি এবং স্মৃতিতে এ কথার ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এত ইতি বৈ প্রজাপতি দেবানসৃজত অসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৄন্ তিরঃ পবিত্রমিতি গ্রহান্ আসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতিশাস্ত্রং অভি সৌভগা ইতি অন্যাঃ প্রজাঃ" ইত্যাদি।

ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মা এই মন্ত্রমধ্যস্থ এতেঃ অসৃগ্রং ইন্দবঃ, তিরঃ পবিত্রং, আসবঃ, বিশ্বানি, অভি-সৌভগা এই পদগুলি স্মরণ করিয়া দেবতা-দিগকে সৃজন করিয়াছেন। "এতে" এই পদটি দেবগণের স্মারক। "অসৃক রুধিরং তৎপ্রধানে দেহে রমন্তে" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা "অসৃকশব্দ মনুষ্যবোধক পিতৃগণ চন্দ্রলোকে থাকেন এজন্য "ইন্দবঃ" এই পদটি পিতৃগণের স্মারক। পবিত্র কোন স্থানকে যে তিরস্কার করে তাহাকেই তিরঃপবিত্র বলা যায়; অতএব "তিরঃ পবিত্র" শব্দ গ্রহগণের স্মারক। "আসবঃ" এই শব্দটি গীতি-রূপ স্তোত্রের স্মারক। এবং "বিশ্বানি" এই শব্দটি বিষয়তাপন্ন শব্দের এবং "অভি-সৌভাগ" শব্দ সৌভাগ্যযুক্তের স্মারক। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে, "ঋচ্যধ্যূঢং সাম" ঋকে সাম গীতি অধ্যূঢ় আছে। বেদে এই সামগীতিরূপ

স্তোত্রের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। স্তোত্রের পর শাস্ত্রের উল্লেখও আছে।

স্মৃতিও বলিয়াছেন :—

অনাদি নিধনানিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যায়তঃ সর্ব্বা প্রবৃত্তয়ঃ॥

স্বয়ম্ভু আদি ও নিধনরহিত নিত্যদিব্য বেদময় বাক্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্যত্রও স্মৃতিতে এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে।—

সামরূপেচ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদ শব্দস্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥
সর্ব্বেষাঞ্চ সনামানি কর্ম্মানিচ পৃথক পৃথক্।
বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংখ্যাশ্চ নির্ম্মমে॥

মহেশ্বর সর্ব্বপ্রথম ভূত ও প্রাণিগণের নামরূপ ও কর্ম্মের প্রবর্ত্তন বেদ শব্দ হইতে করিয়াছিলেন। সমস্ত ভূত ও প্রাণিবৃন্দের নাম ও পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম এবং পৃথক সংস্থান-স্থিতি অথবা অবয়ব-সন্নিবেশ সেই পরমপুরুষ বিধাতা বেদ শব্দ হইতেই সর্ব্বপ্রথম রচনা করিয়াছিলেন। বেদ যেমন যেমন বলিয়াছেন সেই রূপেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সৃষ্টি নূতন নহে ; এইরূপ চলিয়া আসিতেছে ও চলিবে। এই জন্যই মন্ত্র বর্ণ বলিয়াছেন "ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এই কল্পেও জগৎ কল্পনা করিয়াছেন।

বেদের মন্ত্র অর্থাৎ সংহিতা-ভাগ ছন্দোনিবদ্ধ। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতি, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী এই কয়টি ছন্দঃ বেদে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। গায়ত্রী ছন্দঃ ২৪টি অক্ষরে নিবদ্ধ থাকে এবং ইহার তিনটি পাদ, অন্যান্য ছন্দের ন্যায় ৪ পাদ নহে। লৌকিক কালিদাসাদির কবিতানিচয় নানাছন্দে নিবদ্ধ থাকিলেও কোথাও কোন কবিতা তিনপাদে পূর্ণ, দেখা যায় না। তাহার কারণ এই যে, লৌকিক কবিগণ বৃত্তরত্নাকর ছন্দো-মঞ্জরী, শ্রুত-বোধ প্রভৃতি ছন্দোগ্রন্থের সবিশেষ আদর করিয়াছেন। তাঁহারা বৈদিক্ ছন্দের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। করিলে তাহা দুষ্টই হইত। লৌকিক প্রয়োগে বৈদিক প্রয়োগ সন্নিবেশিত করা যেমন দুষ্ট ও দুর্ব্বোধ্যতাজনক, সেইরূপ ছন্দঃ প্রভৃতির সন্নিবেশও দোষাবহ। উষ্ণিক্ ছন্দঃ ২৮ অক্ষরে এবং অনুষ্টুপ্ ৩২ অক্ষরে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। বৃহতি ৯, পংক্তি ১০, ত্রিষ্টুপ্ ১১, এবং জগতী ১২ অক্ষরে শ্লোকাকারে পরিণত হইয়া থাকে। এবং মন্ত্রভাগে

প্রত্যেক মন্ত্রই দেবতার স্তবে পরিপূর্ণ। যে যে দেবতা স্তুত হইয়া থাকেন, সেই সেই মন্ত্রের সেই সেই দেবতা। কোন কোন মন্ত্র এমন দুর্ব্বোধ্য, যে তাহার দেবতা নির্দ্দেশ করা কঠিন। নিরুক্তকার যাস্ক তদীয় নিরুক্ত গ্রন্থে দৈবত কাণ্ডে দুরূহ মন্ত্রের দেবতা নিশ্চয় করিবার প্রণালী বিশেষরূপে দেখাইয়াছেন। বেদাধ্যায়িগণের নিরুক্ত একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বৃহৎ, এবং বেদের নানা রহস্যে পরিপূর্ণ। বৈদিক শব্দগুলি কি কি অর্থপ্রকাশনে সমর্থ, তাহা যাস্ক সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। নিরুক্ত পাঠ না করিলে বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকও দুর্লভ। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী এই গ্রন্থ একবার মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এখন আর তাহা মূল্য দিলেও পাওয়া যায় না।

সকল বৈদিক মন্ত্রই কোন না কোন কার্য্যে বিনিযুক্ত আছে, কোন মন্ত্রই নিরর্থক নহে। ইহাকেই বিনিয়োগ বলা যায়, অর্থাৎ মন্ত্রের প্রযোজনীয় স্থানকেই বিনিয়োগ বলা যাইতে পারে। মন্ত্রে যেমন ছন্দঃ, দেবতা, বিনিযোগ তেমনিই ঋষিও আছেন। অর্থাৎ যে মন্ত্র যে ঋষি দেখিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রের সেই ঋষি। বেদভাষ্যকার সায়ণ বলিয়াছেন "ঋষির্দ্দর্শনাৎ", দর্শন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ঋষিপদবাচ্য।

অধ্যাপক ও পুরোহিতগণ প্রত্যেক মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, বিনিয়োগ পরিজ্ঞাত হইয়া তবে অধ্যাপনা ও যজমানের কার্য্য করিতে পারিবেন, অন্যথা তাঁহাদিগকে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে, "যোঽবৈ অজ্ঞাতর্ষি ছন্দোদৈবতে ব্রাহ্মনেন যাজয়ত্যধ্যাপয়তি বা স্থানুচ্ছতি গর্ত্তং বা প্রপদ্যতে" যে ব্যক্তি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ দেবতা প্রভৃতি জানেন না, এমন লোক দ্বারা যাজন বা অধ্যাপনা করাইলে স্থানুত্বং প্রাপ্ত বা গর্ত্তে পতিত হইতে হয়। স্মৃতি বলিয়াছেন :—

অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেবচ
যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়াঞ্জায়তে তু সঃ।

ঋষি, ছন্দ্য দৈবত ও বিনিযোগ না জানিয়া যে ব্যক্তি অধ্যাপনা বা জপ করিবে, সে ব্যক্তি পাপী হইবে। এবং অন্য স্মৃতিতে আছে :—

ঋষিচ্ছন্দো দৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরাদ্যপি।
অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্র কণ্টক উচ্যতে॥

ঋষিছন্দো দৈবত এবং ব্রহ্মণার্থ উদাত্তাদি স্বর না জানিয়া প্রয়োগ করিলে মন্ত্র কণ্টক হয়। বেদে অর্থাৎ মন্ত্রে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিনটি স্বরের সন্নিবেশ আছে। উচ্চ উচ্চারণের নাম উদাত্ত। অনুচ্চ উচ্চারণের নাম অনুদাত্ত। এবং উভয়ের সমাহারকে স্বরিত কহে। কোথায় উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বর হইবে পাণিনি তাহার নির্ণয় করিয়াছেন। স্মৃতি আরও বলিয়াছেন যে—

স্বরো বর্ণোঽক্ষরং মাত্রা বিনিয়োগোর্থ এবচ।
মন্ত্রং জিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যং পদে পদে॥

স্বর বর্ণ অক্ষর মাত্রা বিনিয়োগ এবং অর্থ মন্ত্রজিজ্ঞাসুকে পদে পদে জানিতে হইবে। ইহাই বেদের বিধান।

শ্রীচন্দ্রধর ভট্টাচার্য্য, কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

পূর্ব্বস্মৃতি।

এমনি সময়ে সখি!
প্রণয়-মধুর ভাষে
আদরে ধরিয়ে করে
ব'লেছিল, "ভালবাসে।"

সুনীল আকাশে শশী
হেসেছিল সুধাহাসি
নিশীথ ধরণী কোলে
ছড়ায়ে জ্যোছনারাশি।

সেই ত চাঁদিমা শোভা,
শোভাময় চারিধার
বাড়াতে যাতনা মম
সেই সুধু নাহি আর।

একাসনে তার সনে
দেখেছি যে শোভা চাঁদে
আজিকে হেরিতে তা'রে
কেন এ পরাণ কাঁদে?

আপনা ভুলিয়ে তা'রে
কেন বেসেছিনু ভাল
এ ভালবাসার চেয়ে
না দেখা যে ছিল ভাল।

জীবন যাতনা-ভরা
নয়নে নয়ন-ধার।
আর কি আসিবে ফিরে?
চেয়ে আছি পথ তা'র।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

সমালোচনা।



খাদ্য। *

আমরা এই পুস্তকখানির প্রচারে পরম পুলকিত হইয়াছি। লেখক যথার্থই বলিয়াছেন,—"স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। খাদ্য দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেক ব্যাধিরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। * * * শরীররক্ষা রূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন হয়, সেই খাদ্য সংগ্রহ যে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলিতে পারে, ইহা যিনি মনে করেন, তিনি নিতান্ত অদূরদর্শী। খাদ্যের সহিত সাধারণের স্বাস্থ্য বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। যথাপরিমাণ খাদ্যের অভাবে জাতিগত দৌর্ব্বল্যের আধিক্য হয়। * * জাতিগত দৌর্ব্বল্যের দ্বারা সাধারণের মধ্যে নানাবিধ রোগের বিস্তার প্রবলভাবে লক্ষিত হয়। * * কোন জাতির মধ্যে রোগের প্রাবল্য হইলে ঐ জাতি শীঘ্র দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া পড়ে। কর্ম্মক্ষম লোক রোগগ্রস্ত হইলে সমগ্র জাতির আয়ের হ্রাস হইয়া থাকে, সুতরাং দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এবং ইহা পুনরায় রোগবৃদ্ধির ও অকাল মৃত্যুর সহায়তা করে।" লেখক মহাশয় অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ; তিনি আলোচ্য পুস্তকে খাদ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী গৃহস্থ ও গৃহিণীমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। পুস্তকখানি কেবল বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পূর্ণ নহে; পরন্তু অত্যাবশ্যক বিষয়ের সরল আলোচনা। লেখক মহাশয় ইহাতে আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্য ও পানীয়— উভয়েরই গুণাগুণ বিচার করিয়াছেন।

এই পুস্তক পাঠে পাঠক আর একটি বিষয় জানিতে পারিবেন। আজকাল ভেজালের বাহুল্যে বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সর্ষপ তৈলে খনিজ "ব্লুমলেস অয়েল," ঘৃতে পচা চর্ব্বি,—এ সকলের সংমিশ্রণে সাধারণের স্বাস্থ্যনাশ হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিখ্যাত 'ল্যান্‌সেট' পত্রে লিখিত হইয়াছিল, লণ্ডনে বিক্রীত দুগ্ধের দশভাগের নয় ভাগ বিশুদ্ধ নহে। কেহ দুগ্ধে জল মিশাইয়া, কেহ দুগ্ধের মাখম তুলিয়া লইয়া, কেহ দুগ্ধে রং দিয়া বিক্রয় করে। দুগ্ধ যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য দুগ্ধে কোন কোন ঔষধ

* খাদ্য—শ্রীচুণীলাল বসু, এম, বি, এফ, সি, এস প্রণীত। সাহিত্য সভার গ্রন্থপ্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

প্রয়োগ অত্যন্ত প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'ম্যাক্‌মিল্যান্‌স ম্যাগাজিনে' দুগ্ধবিষয়ক প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক মিষ্টার পাক্‌স্‌লী লিখিয়াছিলেন, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে মোট মৃত্যুসংখ্যা—৫৪৯৩৯৩। ইহার মধ্যে এক বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুর সংখ্যা—১৩৭৪৯০। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে, এই সকল শিশুর অর্দ্ধাংশ যে সকল ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে—সে সকল ব্যাধির প্রতিরোধ সহজসাধ্য। এক উদরাময়েই ২৮০০০ শিশুর মৃত্যু হয়। পীত দুগ্ধের দোষই যে অধিকাংশস্থলে উদরাময়োৎপত্তির কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

চুণীবাবু আলোচ্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"দুগ্ধ ভারতবাসীর জীবনস্বরূপ। ইহা শিশুদিগের জীবনধারণের একমাত্র উপায় হইলেও পূর্ণবয়স্ক ভারতবাসী প্রত্যেকেই কোন না কোনও আকারে দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকে। * * * * জীবনধারণের পক্ষে এরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কাহারও ভিন্ন মত হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে এদেশে বর্ত্তমান সময়ে সহরে বা পল্লীগ্রামে কোথাও বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা সহরে যে সকল গোয়ালা-বস্তি আছে, তথা হইতে প্রায় ৪০০০ মণ দুগ্ধ প্রত্যহ সহরে সরবরাহ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার বাহির হইতে রেলওয়ে দ্বারা প্রায় ১০০০ মণ দুগ্ধ প্রত্যহ কলিকাতায় আমদানি হইয়া থাকে। দমদমা, কাশীপুর প্রভৃতি কলিকাতার সন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতেও প্রায় ২০০ মণ দুগ্ধ প্রত্যহ ভারে করিয়া বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় আনীত হয়। বলা বাহুল্য যে ইহার কোনটি বিশুদ্ধ দুগ্ধ নহে। এই সকল দুগ্ধে যে শুদ্ধ ভেজাল আছে, তাহা নহে; নানাকারণে এই সকল দুগ্ধের সহিত বহুবিধ সংক্রামক রোগের বীজ মিশ্রিত থাকিবার সম্ভাবনা। কলেরা, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি নানাবিধ সংক্রামক উৎকট রোগ যে অনেক সময়ে দূষিত দুগ্ধ পান করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। সংক্রামক-রোগ-দুষ্ট পুষ্করিণী বা কূপের জল দুগ্ধের সহিত মিলাইয়া দুগ্ধকে এইরূপ বিষাক্ত করা হয়।" ইহা যে অত্যুক্তি নহে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। "পশ্চিম হইতে যে ঘৃতের আমদানি হয়, তাহার সহিত সচরাচর চীনের বাদামের তৈল বা মহুয়ার তৈল বা পোস্ত বীজের তৈল ভেজাল থাকে। ইহার মধ্যে চর্ব্বি ভেজাল বড় বেশী থাকে না। কলিকাতার মধ্যে ও ইহার সন্নিকটস্থ দুই

একটি স্থানে চর্ব্বি চীনের বাদামের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। চর্ব্বিবিক্রয় করিবার জন্য কতকগুলি দোকান আছে। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে চর্ব্বি ও চীনের বাদামের তৈল সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতায় যে ঘৃতের আমদানি হয়, এই সকল স্থানে তাহার সহিত চর্ব্বি ও চীনের বাদামের তৈল মিশ্রিত করিয়া সহরে ও মফঃস্বলে ঘৃত বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। কলিকাতায় বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। ১৯০৫ সালে মিউনিসিপাল পরীক্ষাগারে ৭০০টি ঘৃত পরীক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৭৫টি খাঁটি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, আর বাকী ৫২৫টি ঘৃতে (অর্থাৎ শতকরা ৭৫ ভাগ ঘৃতে) অল্পাধিক পরিমাণে নানাপ্রকারের ভেজাল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল।"

পাঠক উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে বুঝিতে পারিবেন, খাদ্যবিষয়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগদান আবশ্যক হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে বেরিবেরি নামক যে ব্যাধির ব্যাপ্তি হইয়াছিল, অনেকের বিশ্বাস, আহার্য্যে ব্যবহৃত তৈলে ব্রূম্‌লেস্ অয়েল হইতেই তাহার উৎপত্তি।

সুখের বিষয়, দেশের শিক্ষিত যুবকগণ "পেটভাতা" চাকরীর আশায় নিরাশ হইয়া এখন ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টিদান করিতেছেন। লেখক মহাশয় যেরূপ Dairy সংস্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন—কলিকাতার উপকণ্ঠে সেইরূপ গোশালা সংস্থাপিত হইতেছে। তবে সে সকলই ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি। এরূপ অনুষ্ঠান বহুব্যয়সাধ্য ; একের পক্ষে আবশ্যক মুলধন ব্যয় করা অনেক সময় সাধ্যাতীত। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বহুলোকের সমবেত চেষ্টায় বৃহৎ বৃহৎ গোশালা সংস্থাপিত হইবে এবং সেই সকল হইতে বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ হইয়া দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে সহায়তা করিবে।

এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। "বিলাতে মাখমের সহিত মার্গারিণ (Margarine) নামক এক প্রকার চর্ব্বি মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেওয়া হয়, কিন্তু বিলাতী আইন অনুসারে এরূপ ভেজাল মাখমকে কেহ মাখম বলিয়া বিক্রয় করিতে পারে না, ইহা মার্গারিণ বলিয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে।" এদেশেও এইরূপ বিধানের প্রবর্ত্তন আবশ্যক।

পুস্তকের ১৬০-১৬১ পৃষ্ঠায় একটি মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে ;—"গোয়ালারা কঁরিয়া থাকে।" ইহার অর্থ হয় না। ১৬১ পৃষ্ঠায় আছে —"মহিষ গরু

অপেক্ষা বেশী দুগ্ধ দেয়।" ইহা সর্ব্বত্র সত্য নহে। কলিকাতার বাজারে যে সকল মুলতানী, হিসার, নেলোরী প্রভৃতি গাভী পাওয়া যায় যে সকল গাভী সাধারণ মহিষ অপেক্ষা অধিক দুগ্ধ দেয়। তবে "মহিষ-দুগ্ধ গো-দুগ্ধ অপেক্ষা বেশী ঘন এবং উহাতে মাখমের পরিমাণ গো-দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক থাকে।"—তাহাতে অর্দ্ধেক পরিমাণ জল দিলেও গোদুগ্ধ অপেক্ষা পাতলা বোধ হয় না, সেইজন্য অসাধু ব্যবসায়ীরা মহিষের দুগ্ধ ব্যবহার করে।

গ্রন্থমধ্যে একটি মন্তব্যে আমাদের আপত্তি আছে। রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের মত সুপণ্ডিত, সর্ব্বজনপ্রিয়, অমায়িক ও বিনয়ী ব্যক্তির এই মন্তব্যে সত্যসত্যই আমরা বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি। আমিষ ও নিরামিষ আহারের গুণবিচার করিতে যাইয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"কত বকধার্ম্মিক বৈষ্ণবকে হবিষ্য ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণলীলার চূড়ান্ত অভিনয় করিতে দেখা যায়!" এই মন্তব্যে গ্রন্থকার অকারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মনে ব্যথা দিয়াছেন। কৃষ্ণলীলা রূপক—ইহাই অনেকের বিশ্বাস। উইলসন তাঁহার হিন্দু-ধর্ম্মসম্প্রদায় বিষয়ক উপাদেয় পুস্তকে লিখিয়াছেন, ভক্তি পঞ্চরসাত্মিকা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। লেখক যে কৃষ্ণ-লীলার কথা বলিয়াছেন, তাহা এই মাধুর্য্যরসের বিকাশ। যদি প্রচলিত বৈষ্ণব আচার কলুষকল্মম-কলঙ্কিত হইয়া থাকে—তবে তাহার কারণ থাকিতে পারে। হাণ্টার এক-স্থানে বলিয়াছেন Fat maggots and creeping parasites breed in the warm comfort of a national creed" অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "The religion of royalty everywhere becomes,sooner or later, a religion of luxury." বৈষ্ণব ধর্ম্মমতও নৃপতিবৃন্দ ও জনসাধারণ কর্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে। সুতরাং যদি তাহাতে কদাচারের কলুষস্পর্শ হইয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। খৃষ্টান ধর্ম্মেও এককালে আচার-বাহুল্য ধর্ম্মমতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতেই 'প্রোটেষ্টাণ্ট' সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। আচারের দোষে ধর্ম্মমতকে বিদ্রূপ করা সঙ্গত নহে।

'খাদ্যের' প্রচার করিয়া চুণীবাবু বাঙ্গালীর পরম উপকার করিয়াছেন। আমাদের দেশে এরূপ পুস্তকের অত্যন্ত অভাব; সুতরাং প্রচার অত্যাবশ্যক।

আমরা আশা করি, সাহিত্য সভা এইরূপ পুস্তকের প্রচার করিয়া জন-সাধারণের হিতসাধন করিবেন।

———

সংগ্রহ।



সাহিত্য।

ফরাসী উপন্যাস।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'অ্যাকাডেমী' পত্রে কোন লেখক লিখিয়াছিলেন, উপন্যাসই বর্ত্তমান কালের সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত। বাস্তবিক উপন্যাসের আদর এত বাড়িয়া গিয়াছে, যে, উপন্যাসকে অবলম্বন করিয়া অনেক লেখক বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে, সমাজ-সংস্কারে শিক্ষা-সংস্কারে আপনাদের বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতেই উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাসের সৃষ্টি। গ্রাণ্ট অ্যালেন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর পাঠক উদ্দেশ্যহীন উপন্যাসের অস্তিত্ব সহ্য করিয়াছেন; বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞ পাঠক সহ্য করিবেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে পুরুষের সহিত সমান অধিকারপ্রার্থিনী রমণীরাও উপন্যাসে আপনাদের আকাঙ্ক্ষার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ফরাসী উপন্যাস।

সংপ্রতি 'পেলমেল গেজেটে' প্রকাশ, ফ্রান্সে উপন্যাসের আদরের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডেও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ঔপন্যাসিকদিগের তিরোভাব হইয়াছে। এক সময় স্কটের বিস্ময়কর-ঘটনাবহুল-উপন্যাসমুগ্ধ পাঠক সম্প্রদায়কে প্রফুল্ল করিয়া বিদ্রূপে ও রহস্যে সমুজ্জ্বল ডিকেন্সের উপন্যাস ও পরিহাস-রসিক থ্যাকারের উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহাদের স্থানে এখন রাইডার্ড হ্যাগার্ডের ও রাডিয়ার্ড কিপলিংএর প্রাধান্য!—

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল; শল্য হ'ল রথী
চন্দ্র, সূর্য্য অস্ত গেল—জোনাকী জ্বালে বাতি!

ফ্রান্সেও সেই অবস্থা। ফরাসী উপন্যাসের বিশেষত্ব চরিত্র-বিশ্লেষণে—চিত্রের সূক্ষ্ম রেখাপাতে—বর্ণের বাস্তবত্বে। ডুমা, সু, হুগো প্রভৃতি যে সকল লেখক সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়া সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, যাঁহারা চিত্রিত চিত্রে মানব হৃদয়ের প্রবল প্রবৃত্তির লীলা-চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিশ্ববাসীর জন্য অক্ষয় সুধা সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ডডে, গনকুর, জোলা, মোপাঁসা, অনেট—উপন্যাস-ক্ষেত্রে ইঁহাদিগের সমকক্ষ কোথায়? যে দেশে উপন্যাসের এত উন্নতি ও আদর হইয়াছিল, সে দেশে উপন্যাসের অনাদরের কারণ কি?

কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান ব্যস্ততাই উপন্যাসের অনাদরের প্রধান কারণ। এখন পাঠকগণ উপন্যাস ছাড়িয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। সংবাদ-পত্রে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপন্যাস লিখিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক কারণ তাহা নহে। উপন্যাস-বাহুল্যই উপন্যাসের অনাদরের কারণ। এত উপন্যাস রচিত হইয়াছে ও পাঠকগণ এত উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বিশ্বাস মানব চরিত্রের কোন দিক অদৃশ্য বা অদৃষ্ট নাই। এখন পাঠকগণ অবকাশরঞ্জনের জন্য জীবনী, ইতিহাস বা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিতেছেন। ফ্রান্সে এখন জীবনীর আদর হইয়াছে। যে ঔপন্যাসিক সময়োপযোগী উপন্যাস রচিত করিতে পারিবেন, তিনি সফলকাম হইবেন। জুল ভার্ণে যে সকল বৈজ্ঞানিক ব্যাপার লইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন—এখন সে সকল ব্যাপার অসম্ভবের রাজ্য হইতে সম্ভবের রাজ্যে নীত হইয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে। কাযেই ভার্ণের উপন্যাসের আদর কমিয়াছে। এখন যে সকল ঔপন্যাসিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বিষয় বুঝিয়া—আবিষ্কারের সম্ভাবনার ভিত্তির উপর উপন্যাস গঠিত করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে যশোলাভ অনিবার্য্য।

কারণ।

ফ্রান্সে উপন্যাসের অনাদরের আরও দুইটি কারণ আছে। ফরাসী সংবাদপত্রে সমালোচনা প্রকাশিত হয় না। সুতরাং উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইলে পাঠকদিগের পক্ষে তাহা অবগত হওয়া—প্রতিভাবান তরুণ ঔপন্যাসিকের পক্ষে পাঠক-সমাজে পরিচিত হওয়া দুঃসাধ্য। আবার ফরাসী প্রকাশকগণের ব্যবসায়-বুদ্ধির শোচনীয় অভাব। এই দুইটি ত্রুটি সংশোধিত হইলে ফ্রান্সে উপন্যাসের পূর্ব্ব সমাদর পুনর্প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

বিবিধ।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ।

সম্প্রতি বিলাতের বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানাচার্য্য সার রোনাল্ড রস Prevention of Malaria অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ নামক একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। বিলাতের বিখ্যাত 'টাইম্‌স্‌' পত্র সেই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া একটি সারগর্ভ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। এক খণ্ডে ম্যালেরিয়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, নিদান ও প্রতিষেধের উপায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বর্ণিত হইয়াছে। অন্য খণ্ডে লেখকের হৃদয়ে আশার ও নৈরাশ্যের প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি ব্যাপার কবিতার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। এই খণ্ডের মুখবন্ধে লেখক যাহা লিখিয়াছেন,—তাহা অতীব সুন্দর। এই খণ্ডে ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ভারতবাসীর দুঃখ জ্বালার মর্ম্মন্তুদ বেদনার অভিব্যক্তি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখজ্বালায় নিত্য তাড্যমান ভারতবাসী,—বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর—নিকট তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। সেই জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক ভাগের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদান করিয়া নিরস্ত হইলাম।

গ্রন্থ-পরিচয়।

জ্বরের বিভিন্ন রূপ ও পররুহ।

'টাইমস্' পত্র লিখিয়াছেন,—ম্যালেরিয়া জ্বরের তিনটি বিভিন্ন রূপ বা মূর্ত্তি আছে, তাহা এখন সাধারণে জানিতে পারিয়াছেন। প্রথম সাজ্যাতিক জ্বর অর্থাৎ যে জ্বর সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জ্বর নামে অভিহিত। দ্বিতীয় তৃতীয়ক জ্বর,—যে জ্বর একদিন অন্তর হয়; তৃতীয় চতুর্থক জ্বর অর্থাৎ যে জ্বর দুই দিন অন্তর হয়। সাধারণ জ্বরের আবার প্রকার ভেদ আছে; যথা সান্তত (Remittant) জ্বর অর্থাৎ যে জ্বরের কিছুদিন পর্য্যন্ত বিরাম হয় না; অন্যেদ্যুষ্ক, (Quotidian) বা যে জ্বর প্রতিদিন একবার করিয়া আইসে। সতত্তক (Double Quotidion) বা দ্বৌকালীন জ্বর। যাহা হউক এই শ্রেণীর জ্বরের শ্রেণী-বিভাগ লইয়া বিশেষ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। সাধারণতঃ সাধারণ জ্বর, তৃতীয়ক জ্বর ও চতুর্থক জ্বরই আমাদের আলোচ্য বিষয়। অনতিপূর্ব্বকালে এই ত্রিবিধ জ্বরই জলাকীর্ণ ভূমি হইতে উত্থিত দূষিত-বায়ুসম্ভূত বলিয়া সাধারণের ও বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাস ছিল। তাহা ইহার ম্যালেরিয়া নামেই সপ্রকাশ। ইতালীয় ভাষায় mala মন্দ এবং aria বাতাস এই দুই কথার সংযোগে ম্যালেরিয়া শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের ডাক্তার রোনাল্ড রস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, শোণিতে এক জাতীয় পররুহের (Parasite) আবির্ভাব হয়, তাহার ফলে ম্যালেরিয়া নামক জনপদ-বিধ্বংসী ব্যাধি জন্মে। এই পররুহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর পররুহ দুই দিন অন্তর আপনার দেহ হইতে বীজ (Spores) নিসৃত করে। উহারা চতুর্থক বা দুই দিন অন্তর পালা জ্বরের জনক। আর এক শ্রেণীর পররুহ এক দিন অন্তর বীজ (Spores) নিসৃত করে—ইহারা তৃতীয়ক বা এক দিন অন্তর জ্বরের জনক। আর এক শ্রেণীর পররুহ সাজ্যাতিক জ্বরের উৎপত্তি করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পররুহের পার্থক্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। ঐ সকল পররুহ শোণিতের লোহিত কণিকায় আশ্রয় লইয়া ক্রমে উহা ধ্বংস করিয়া ফেলে। এই পররুহ এনোফিলিস্ জাতীয় মশক কর্ত্তৃক রোগীর দেহ হইতে সুস্থ মানবের দেহে বিসর্পিত হইয়া থাকে।* এই পররুহ শোণিতের লোহিত কণিকা ধ্বংস করিতে থাকিলে দেহে এক প্রকার বিষের উদ্ভব হয়, তাহার ফলে দেহে শৈত্য, পরে উত্তাপ ও শেষে ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হইয়া থাকে। এই সকল উপসর্গের দ্বারা পররুহগণের বীজ-নিঃসরণ সূচিত হয়।

অনভিব্যক্ত অবস্থা

শোণিতে দুই দশটি পররুহ জন্মিলে বা আশ্রয় লইলে মানুষ ও অন্যান্য জীব পীড়াক্রান্ত হয় না। দেহকে পীড়িত করিতে হইলে অন্ততঃ শোণিতে লক্ষ পররুহের আবির্ভাব আবশ্যক। এই পররুহের আক্রমণে মানব শমনসদনে নীত হইতে পারে—আবার অনেকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া জীবন ক্ষীণ করিয়া—শেষে কতকটা "সামলাইয়া" উঠে। তখন আর তাহারা সহসা জ্বরাক্রান্ত হয় না। কৃষ্ণকায় জাতির মধ্যে অনেকে বাল্যে রোগাক্রান্ত হইয়া এই

* কার্ত্তিক সংখ্যায় মশক নামক সন্দর্ভ দেখ।

প্রকার জ্বরপ্রতিবেধশক্তি অর্জ্জন করে এবং যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়াও জীবিত থাকে, ইহাদের শোণিতে পররুহের যথাক্রমে উৎপত্তি, পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে,—কিন্তু জ্বরের লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায় না। কেহ কেহ বলেন, প্রকৃতির সংরক্ষিণী-শক্তি-প্রভাবে ইহাদের দেহে এক প্রকার প্রতিবেধক বিষ (Antitoxin) জন্মে। তাহার প্রভাবে ইহারা জ্বরের হস্ত হইতে নিস্তার পায়। কিন্তু ইহাদের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ ও নিস্তেজ এবং অনেক স্থলে প্লীহা ও যকৃত বিকৃত হইয়া থাকে। এই সকল আপাততঃ সুস্থ ব্যক্তিকে যদি কোন এনোফিলিস জাতীয় মশক দংশন করতঃ বিষ-সংগ্রহ করে এবং সেই বিষ নিজ দেহে পরিণত করিয়া অন্য এক সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে—তাহা হইলে সেই সুস্থ ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েন। সেই আক্রমণে শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে কৃষ্ণকায় লোকদিগের রক্ত পরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্য

এনোফিলিস নামক এক জাতীয় মশক দ্বারা ম্যালেরিয়ার বীজাণু মানবদেহে বিসর্পিত হইয়া থাকে। * ডাক্তার রস বলিয়াছেন, মানব জাতির রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়াই সর্ব্বপ্রধান। ইহাতে যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কলেরা প্লেগ ও আমাশয় রোগে একুনে তত লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। অন্যান্য জনপদবিধ্বংসী ব্যাধির ন্যায় ইহা সাময়িক ভাবে আবির্ভূত হয় না। যে অঞ্চলে ইহার প্রাদুর্ভাব, সে অঞ্চলে ইহা চিরস্থায়ী হয়। সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর দেশে, কৃষিকার্য্যের প্রকৃষ্ট সময়ে, ইহা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে। ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশ কখনও সমৃদ্ধি-লাভ করিতে পারে না। ঐ স্থান ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। যাহারা ঐ স্থানে অবস্থিতি করে, তাহারা ক্ষীণ জীবনী লইয়া কঠোর পরিশ্রমে অসমর্থ হইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়া সর্ব্ব শ্রেণীর মানবের বিষম শত্রু। মানবের এমন শত্রু আর নাই। ইহা উষ্ণ কোটিবন্ধের অন্তর্ভূ'ত দেশ-সমূহকে সভ্যতাবিকাশের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে, এবং মানব জাতির ইতিহাসকে বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। স্বাস্থ্যই ব্যস্ত ও সমস্তভাবে মানবের সমৃদ্ধিলাভের কারণ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং ইহার উচ্ছেদসাধন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

কুইনাইন

ম্যালেরিয়া ব্যাধির প্রতিবেধ সম্বন্ধে ডাক্তার রস্ লিখিয়াছেন, বহুদিন যাবৎ কুইনাইন ম্যালেরিয়ার ঔষধ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছে। পররুহ হইতেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়, এই তথ্য আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কুইনাইন দ্বারা ম্যালেরিয়ায় প্রতিকার হইয়া থাকে তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার পররুহ বিনষ্ট করে। বহুদিন ধরিয়া অত্যন্ত অধিক মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ না করিলে রক্ত-কণিকাস্থ সমুদায় পররুহের বিনাশসাধন সম্ভবে না। সুতরাং জ্বর আরোগ্য হইবার পরও বহুদিন ধরিয়া রোগীকে অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবন করান আবশ্যক। শোণিতের একটি লোহিত কণিকায় যদি একটিমাত্র সজীব ম্যালেরিয়া পররুহ বর্ত্তমান থাকে,—তাহা হইলে সেই সজীব পররুহ হইতে ভূপতিত রক্ত

* এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

হইতে উত্থিত রক্তবীজের স্তায় ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে পরস্বহ প্রসূত হইয়া আবার সমস্ত লোহিত কণিকা বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করে। রোগী আবার জ্বরগ্রস্ত হয়। কুইনাইন-প্রয়োগে বিতাড়িত হইলেও ম্যালেরিয়ায় পৌনঃপুনিক আক্রমণের ইহাই একটি প্রধান কারণ। ইহা ভিন্ন উহার অন্য কারণও আছে। কিন্তু যে স্থানে জল-নিকাশের সুব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য-রক্ষাসম্পর্কিত অন্যান্য উপায় অবলম্বিত হয়, সে স্থানে কুইনাইন সহকারী ঔষধ (Adjuvant) রূপে ব্যবহৃত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। জমি হইতে প্রকৃষ্টরূপে জল-নিকাশের ব্যবস্থা, মশক-বিনাশ, জানালা ও দরজায় লৌহ জালৃতির আবরণ নির্ম্মাণ, মশারীর ব্যবহার, বন-জঙ্গল-নাশ প্রভৃতি কার্য্যকেই ডাক্তার রস ম্যালেরিয়াপ্রতিষেধের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

অন্যান্য প্রতিষেধ ব্যবস্থা।

কুইনাইনের রীতিমত প্রয়োগে ম্যালেরিয়া দমিত হইতে পারে ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনেও মানবদেহে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহাতেও স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটে। পুনশ্চ কুইনাইন সেবনে যে রোগী একবার আরোগ্য হইল, সে যদি আবার ম্যালেরিয়াসঙ্কুল স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে তাঁহার পুনরায় ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইবার আশঙ্কা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান, একথা নিতান্ত নির্ব্বোধের নিকটও দুর্ব্বোধ নহে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে দেশের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত অবস্থার উন্নতিবিধানে সকলেরই যত্নশীল হওয়া উচিত।

ইতিহাস।

বারীচ।

পশ্চিম ভারতে ঐতিহাসিক ঘটনাস্মৃতিসমাকুল স্থান বিদ্যমান। এখন স্থানগুলি যেমন সমৃদ্ধিশ্রীহীন—তাহাদের ইতিহাসও তেমনই বিস্মৃতপ্রায়। বারীচ ইহাদিগের অন্যতম। সম্প্রতি বারীচের একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের অবলম্বন।

অবস্থান।

নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে বারীচ অবস্থিত। নদীকূলে শিলানির্ম্মিত প্রাচীর—যেন পরিখার পর দুর্গ প্রাচীর। প্রাচীর জলকূলে দণ্ডায়মান। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আমেদাবাদের সুলতান বাহাদুরের শাসন-সময়ে পুররক্ষার ব্যবস্থা হয়। পুরপ্রাচীরে পাঁচটি দ্বার। ইহা এককালে বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে ইংরাজ বণিকের কুঠী সংস্থাপিত হয়। তৎপূর্ব্বে বারীচ দুইবার পর্ত্তুগীজ-গণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভাজীর মারহাট্টা সেনাদল তাপ্তী ও নর্ম্মদা পার হইয়া বারীচ আক্রমণ করে। শাসনকর্ত্তা নিহত হইলে পুরবাসীরা অস্ত্রত্যাগ করিয়া অধীনতা স্বীকার করে। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটের নবাবের ১০০ সৈনিককে সঙ্গে লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাদল বারীচ আক্রমণ ও অধিকার করে। পর বৎসর বোম্বাই হইতে জেনারল ওয়েডারবর্ণ একদল সৈন্য লইয়া বারীচ আক্রমণ করেন। পুরপ্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত গোলায় তাঁহার মৃত্যু হইলে কর্ণেল গর্ডন সেনাদলের কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন ও জয়ী হয়েন। ইহার পর ১৮০৩খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বারীচের পুরপ্রাচীরতলে ইংরাজের রণভেরীনাদ শ্রুত হয়। সেবারও যুদ্ধে একজন ইংরাজ সেনাপতি নিহত হয়েন। এইবার জলপথে ও স্থলপথে আক্রমণের আয়োজন হয়। এই বারের যুদ্ধের তুলনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের যুদ্ধ অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হয়। বলা বাহুল্য, তখনও ইংরাজ বণিক।

যুদ্ধ।

এখন ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বারীচ শান্তিসুপ্ত। তাহার ভগ্ন পুরপ্রাচীর হইতে শোণিতচিহ্ন ধৌত হইয়া গিয়াছে, তদুপরি তৃণগুল্ম জন্মাইতেছে। কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার প্রাচীন কাহিনী লিপিবদ্ধ।

আশীর্ব্বাদ।

কৈশোর স্বপন ভঙ্গে নব লাজে অবনতা,
অয়ি পিতৃ-গৃহশোভা সুকুমারী বনলতা!
আজি এ সোণার সাঁঝে, সাজিয়া সোণার সাজে,
সংসার উদ্যান মাঝে এস, বালা, এস ধীরে,
বরষিছে শুভগ্রহ কল্যাণ-কিরণ শিরে!
সুকোমল কম করে, বেষ্টি নব নিরভরে,
মঙ্গলের মহোৎসবে হও আজি অগ্রসর
নবীন জীবন পথে, সাথে চির-সহচর!
সব সাধ সব মতি রাখিও পতির প্রতি
পতিরূপে নারায়ণ নারী-নেত্রে দেন দেখা।
ডুবে গেলে পতি-প্রেমে তাঁর প্রেম হয় শেখা॥
রমণীর কর্ম্মব্রত, হোক্ না কঠিন যত,
পতিহিত মনে রাখি' পালন করিও সুখে,
ফলিবে সকল আশা পতির প্রফুল্ল মুখে!
স্নিগ্ধ প্রেমলতাপ্রায়, প্রীতি-পুষ্প সুষমায়
ছাইয়া পতির বক্ষ, লভ তুমি অনুদিন
চির সুখ বসন্তের শ্রীসম্পদ অমলিন!

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

বর কুমার ব্রত।



এই ব্রত শনিবারে করিতে হয়। সন্তান-কামনায় রমণীগণ এই ব্রত করিয়া থাকেন। অপুত্রবতী পুত্র-কামনায় ও পুত্রবতী সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রাঙ্গণে একটা স্থান বেশ পরিষ্কৃত করিয়া তাহাতে সাদা গুঁড়া দিয়া 'বরকুমারের' মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হয়। একখানি কদলীর "আগপাতে" চিড়া, কলা, সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি নানা উপচারে বরকুমারের ভোগ ও আতপ চাউলের নৈবেদ্য দিতে হয়। পুরোহিত আসিয়া পূজা সমাপন করিলে ব্রত কথা বলিয়া ব্রত শেষ করিতে হয়। ব্রতিনীকে সেদিন ভোগের প্রসাদ খাইয়া দিন কাটাইতে হয়।

ব্রত কথা।

এক মস্ত বড় রাজা। তাহার সম্পত্তির বেশ দুপয়সা আয় ছিল; রাজার আজলা ধন দৌলৎ, উজীর নাজীর পাত্র মিত্র সব ছিল। ঘরে দাস দাসী ছিল, গোলাভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, হাতিশালে হাতী ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল—ধনে মানে গুণে রাজার রাজপাট অটুট ছিল। তবে রাজা ও রাণী মরিলে বংশে বাতি দিতে তাঁহাদের কেউ ছিল না। রাজা ও রাণী ব্যতীত পরিবারে আর আপনার বলিতে একটি প্রাণীও ছিল না, এই ছিল তাঁদের দুঃখ। রাজা ও রাণী সেই জন্য বড়ই বিমর্ষ ছিলেন। কাহারো সঙ্গে বড় একটা আলাপ পরিচয় করিতেন না। লোকে তাঁহাদিগকে আঁটকুড়ো বলিয়া ডাকিত। এইরূপ দিন যায়; আসে, থাকে, যায়। একদিন ভোর বেলা বাড়ীর মালী আসিয়া বাড়ী ঝাড়ু দিতেছে এমন সময় রাজা দুয়ার খুলে ঘর হ'তে বাহির হলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মালী বলিতে লাগিল "হায় অদৃষ্ট, আজ না জানি কপালে কি আছে। এই আঁট্‌কুড়ো রাজার মুখ সকাল বেলায় দেখ্‌লাম।" কথাটা রাজার কাণে গেল। রাজা ক্ষোভে জলে গেলেন। রাজা তখনই রাণীকে সব জানাইলেন। রাণী ক্ষোভে দুঃখে রাজাকে বলিলেন—"আর সংসারে থেকে কায নাই, চল আমরা বনে যাই; ছোট লোক ভুঁইমালী সেও বলে আঁটকুড়ো রাজা! এ পোড়া মুখ আর লোক-সমাজে দেখাব না।" যেই কথা

সেই কায। রাজা ও রাণী বনে যেতে—যেতে—লাগ্‌লেন; এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে আর এক রাজার দেশে গেলেন; প্রখর রৌদ্রের তাপে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এক কদম্ব গাছের তলায় শীতল ছায়ায় বস্‌লেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। ঝির ঝির করে বাতাস বইতেছে। পথশ্রমে রাণী বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি রাজার ক্রোড়ে হেলে পড়্‌লেন—তাঁহার ঘুমের আবেশ হইল। তিনি দেখ্‌লেন কদম গাছের উপর একটি সুন্দর যুবক—কি কমনীয় তার রং যেন স্বর্গীয় ভাবে ঢল ঢল করিতেছে—বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। রাণীকে দেখিয়া সে যুবকটির প্রাণে যেন বড় কষ্ট হ'ল। সে অমনি নেমে এসে বল্‌লে—"মা! তুমি বড় ঘরের মেয়ে, এমন বিমর্ষ কেন? তোমার যে অভাব আমি দূর করিয়া দেব। তুমি গৃহে যাও। গৃহে গিয়া ভক্তিভরে বরকুমার ব্রত কর, তোমার আঁটকুড়ো নাম ঘুচে যাবে।" সহসা রাণীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, তিনি চকিতে চেয়ে দেখ্‌লেন। তিনি গাছের নীচে পতি-ক্রোড়ে মাথা রেখে ঘুমাইতেছিলেন। কিন্তু সেই সুকুমার কে—যে তাঁকে এই অযাচিত ভাবে উপদেশ দিল? রাণী রাজাকে আনুপূর্ব্বিক সব বল্‌লেন। রাজাও একটু বিস্মিত হলেন। তখন উভয়ে গৃহাভিমুখে রওনা হ'লেন। বাড়ী আসিয়া রাণী ব্রাহ্মণ ডাকাইলেন এবং যথারীতি ভক্তিভরে ব্রতের অনুষ্ঠান কর্‌লেন। এইরূপে প্রতি মাসে ব্রত কর্‌তে লাগিলেন। দিন যেতে লাগিল। কতদিন পরে রাণী গর্ভবতী হলেন—দেখ্‌তে দেখ্‌তে দশ মাস পূর্ণ হল। রাণী একটি সুন্দর ছেলে প্রসব কর্‌লেন। রাজা পুত্র মুখ দর্শনে একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেলেন। রাজ্যময় হুলুস্থুল পড়ে গেল। বাদ্যকরের বাদ্যরোলে রাজবাড়ী মাতিয়ে তুলিল। চতুর্দ্দিকে আমোদ আহ্লাদের ঘটা পড়ে গেল। ভগবানের কি ইচ্ছা—এই আমোদ আহ্লাদের মধ্যে রাণী আর বরকুমারের ব্রত করিবার অবকাশ পাইলেন না, সুতরাং ভুলিয়া গেলেন। ছেলে বাড়িতে লাগিল—ক্রমে ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন আসিল। আমোদ চলিতে লাগিল। আজ এটা—কাল সেটা লেগেই আছে—আমোদের বিরাম নেই।

আজ অন্নপ্রাশনের দিন। সহসা রাজবাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। রাজকুমার ঢলিয়া পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিকে আমোদ প্রমোদ থামিয়া গেল। কোথায় বাদ্যভাণ্ড—সব বিদায়! লোকজন সব পলাইল। রাজপুরী নীরব! রাজা অন্দরে; রাণী মূর্চ্ছিতা!

রাজা ছেলে হাঁড়িতে পুরিয়া কোদাল কাঁধে করিয়া ছেলেটিকে পুতিবার জন্ম বাহির হইলেন। রাণীও কাঁদিতে কাঁদিতে পিছু পিছু ছুটিলেন। রাজা শ্মশানে আসিয়া গর্ত্ত করিতে লাগিলেন। এমন সময় রাণী দেখেন, সেই সুন্দর যুবক আবার তাহার নিকট দাঁড়াইয়াছে। কোনও কথা কহিতেছে না। রাণী সাহসে ভর করিয়া ঐ যুবার পায় পড়িলেন। তখন সকলে অবাক্! একি, এই সুন্দর যুবক কে?

রাজা আনুপূর্ব্বিক যুবককে সমস্ত কথা বলিলে তখন যুবক বলিল—"তোমরা ছেলে পেয়ে আহ্লাদে বিভোর ছিলে এবং তোমার স্ত্রী বরকুমার ব্রত ছেড়ে দিয়েছেন। তিন মাস ব্রতের ধান ভিজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে বিড়ালে মাছের কাঁটা ফেলিয়া রাখিয়াছে। সেই পাপে ছেলে মারা গিয়াছে। যদি ছেলে বাঁচাইতে ইচ্ছা থাকে তবে বাড়ী গিয়া সত্বর ধানগুলি গঙ্গাজলে ধুইয়া চিড়া তৈয়ার করিয়া বরকুমার ব্রত করিতে আপনার স্ত্রীকে বলুন।" এই বলিয়া যুবক অদৃশ্য হইল। রাজা শিহরিয়া উঠিলেন। তখন রাণীর চৈতন্য হইল। তিনি যে ধান ভিজাইয়াছেন তাহাও স্মরণ হইল। তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী গিয়া তিনি ষোড়শ উপচারে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন এবং ব্রতের তুলসী দূর্ব্বা লইয়া সেই মৃত ছেলের গায়ে দিয়া সাতবার "জীয়ঃ, জীয়ঃ" বলিয়া ডাক দিলেন। অমনই ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। রাণী জীবনে আর ব্রত ভুলিলেন না।

এই ব্রত করিলে অপুত্রের পুত্র হয়; ছেলে মেয়ে সুস্থ হয়। ইহাই পুরনারীগণের ধারণা। ময়মনসিংহ জিলায় এই ব্রত প্রচলিত আছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

অবহেলন।

সাগর বলিছে—"ওরে ক্ষুদ্র জলকণা,
তোর চেয়ে বড় মোর ছোট ছোট ফেনা।"
জলবিন্দু বলে,—"শুন যা' বলিছ তাই,
আমারি সমষ্টি কিন্তু জেনো তুমি, ভাই।"

শ্রীহরিপ্রসাদ মজুমদার।

গ্রন্থ-পরিচয়।

সারস্বত কুঞ্জ। *

কেদার বাবুর ঐতিহাসিক খ্যাতিই বাঙ্গালী পাঠকের পরিচিত। তিনি যে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও কৃতিত্বের পরিচয় দয়া যশস্বী হইবার উপযুক্ত তাহা অনেকে অবগত ছিলেন না। তাঁহার 'সারস্বত কুঞ্জ' পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে সেই সাহিত্যের, বিস্তৃত না হউক, মনোজ্ঞ বিবরণ উপহার দিতে পারেন। দিনেশ বাবুর পুস্তক বৃহৎ। বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন ইতিহাস—সাহিত্যের প্রধান প্রধান স্তরের সাধারণ বিবরণ আদৃত হইবার সম্ভাবনা। দীনেশবাবু স্তরনির্ম্মাণ ক্রিয়ার সকল ভাগ দেখাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন; তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহার রসাস্বাদনের ক্ষমতা সকলের নাও থাকিতে পারে। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, সুখের বিষয়। আমাদের আশা আছে, কেদার বাবুও অদূর ভবিষ্যতে আমাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি ইতিহাস উপহার দিবেন। তাঁহার 'সারস্বত কুঞ্জ' বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহাতে তিনি পুরাতন বাঙ্গালার যে সকল নমুনা দিয়াছেন, সেগুলি সাহিত্যের উন্নতির পথে চিহ্নরূপে পরিগণিত হইবে। সেইগুলিতে পুস্তকখানির গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মরণ-রহস্য। *

এক কার্য্যে জীবনের অধিকাংশ কাল কাটাইয়া—অবকাশকালে অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত সাহিত্যক্ষেত্রে বিরল নহে। ঔপন্যাসিক স্কট স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাস ও ঔপন্যাসিক ডিকেন্স ইংলণ্ডের ইতিহাস রচিত করিয়া

---

* সারস্বত কুঞ্জ—শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। ময়মনসিংহ। মূল্য ।৷৹ আনা মাত্র।

[illegible]; উভয় পুস্তকই উপাদেয়। উভয় পুস্তকই প্রতিভায় সমুজ্জ্বল [illegible]কথাতে মনোরম। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মূল্য [illegible] কি তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রাদি গ্রন্থের মূল্য অধিক, ভবিষ্যতে ঐতিহাসিককে [illegible] বিচার করিতে হইবে। নিখিলবাবু বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। এবার তিনি মরণ-রহস্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

তিনি এই পুস্তকে মৃত্যুর মঙ্গলময় মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিয়াছেন—মরিতে ভয় হয় না, আনন্দ হয়। কারণ, মরণ আমাদের উন্নতির দ্বার রুদ্ধ করে না—মুক্ত করে।

ভারতবাসী মরিতে ভয় পায়—এই প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করিয়া নিখিলবাবু বলিয়াছেন,—"একদিন ভারতবর্ষে সকলেই এই মরণ-রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, তাই ভারতে মরণের ভয় ছিল না।" বাস্তবিক ভারতবাসী মৃত্যুকে যেরূপ অবহেলা করিতে শিখিয়াছিল, এমন আর কেহই শিখে নাই। স্বামীর শবের সহিত পত্নীর চিতারোহণ আর কোন দেশে সম্ভব হইত কি? ভারতে গৃহী মৃত্যুর আগমন উপলব্ধি করিলে সজ্ঞানে দেবতার নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে "গঙ্গা-যাত্রা" করিত। গীতায় উক্ত হইয়াছে:—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"

[illegible] দার্শনিক আত্মদর্শনের ফলে—যে তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনহেতু ভারতবাসী বুঝিয়াছিল—

"Thine are these orbs of light and shade ;
Thou madest Life in man and brute ;
Thou madest Death ; and lo, thy foot
Is on the skull which thou hast made"

—এই গ্রন্থে নিখিলবাবু সেই আত্মদর্শন সেই তত্ত্বজ্ঞান বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

---

*মরণ-রহস্য—শ্রীনিখিলনাথ রায় প্রণীত। কলিকাতা, ২৮।১, কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীট [illegible] কোম্পানী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।• আনা।



স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সরকার।

L. P. Works, Calcutta.

প্রিয়দর্শী সম্বন্ধে পুনরালোচনা।

বহুদিন হইল 'বঙ্গদর্শনে' ও বিশ্বকোষ অভিধানে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকবর্দ্ধন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহাতেও আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে কএকটি জিজ্ঞাস্য বিষয় থাকায়, তাঁহাদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের বৈশ্যকাণ্ডে তৎসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে তাহারই সারসংগ্রহ প্রদত্ত হইল।*

গ্রীক ঐতিহাসিকগণ আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক যে প্রাচ্যভূপতি চন্দ্রমসের Xandrames পরিচয় দিয়াছেন, কেহ কেহ তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে ৯ জন নন্দ রাজত্ব করেন। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে যেরূপ আখ্যায়িকা পাওয়া যায়, তাহার কোথাও শেষ নন্দকে নাপিতপুত্র বলা হয় নাই। বরং 'মুদ্রারাক্ষসের' টীকাকার ঢুণ্ঢিরাজ শেষ নন্দকে শেষ ক্ষত্রিয়নৃপতি বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং Xandrames নামদ্বারা চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দরাজকে বুঝাইতে পারে না। এদিকে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ Sandrocottus (চন্দ্রগুপ্ত)এর যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থবর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের নানা আখ্যায়িকার মধ্যে কাহারও সহিত তাহার মিল নাই। এমন কি চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের প্রধান সহায় চাণক্যের নাম বা তাঁহার আভাস পর্য্যন্ত কেহ দিয়া যান নাই, এরূপস্থলেও গ্রীকবর্ণিত সান্দ্রোকোত্তস্‌কে আমরা প্রথম মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

তবে আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক উক্ত সান্দ্রোকোত্তস্ কে?

সুপ্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ অশোকাবদানে বিবৃত হইয়াছে,—

"চম্পা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের একটি পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে। এক দৈবজ্ঞ সেই কন্যাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই কুমারী রাজরাণী ও রাজমাতা হইবে। ধনের লোভ বড় লোভ। ব্রাহ্মণ লোভে পড়িলেন, কন্যাকে বয়স্থা দেখিয়া পাটলিপুত্রে আসিলেন এবং রাজা বিন্দুসারকে প্রদান করিলেন। বিন্দুসার ব্রাহ্মণকন্যাকে রাজান্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। পুরমহিলাগণ সেই রূপসীকে

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্য কাণ্ড ১ম ভাগ যন্ত্রস্থ ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

দেখিয়া ভাবিলেন, এরূপ সুন্দরীকে পাইলে আর কি রাজা আমাদিগকে চাহিবেন? সকলে পরামর্শ করিয়া সেই ব্রাহ্মণবালাকে নাপিতানী করিয়া রাখিলেন ও তাঁহাকে ক্ষৌরকর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিছুদিন যায়, সেই ব্রাহ্মণকন্যা রাজা বিন্দুসারের দাড়ি চুল কামাইতে থাকেন। এক দিন রাজা অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি তোমার বড় উপর প্রীত হইয়াছি, তুমি কি চাহ, বল। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।' তখন ব্রাহ্মণবালা মুখ হেঁট করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, 'আমি আপনাকে চাই।' রাজা কহিলেন, 'সে কি, আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, আর তুমি নাপিতানী, তোমাকে আমি কিরূপে গ্রহণ করিব?' ব্রাহ্মণকুমারী কহিলেন, 'আমি নাপিতানী নহি। আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আপনার পত্নী হইবার জন্যই পিতা দিয়া গিয়াছেন। পুরমহিলারাই আমাকে এ কায শিখাইয়াছে।' তখন রাজা ব্রাহ্মণকন্যার কামনা পূর্ণ করিলেন। এখন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যাই পাটেশ্বরী হইলেন। তাঁহার গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মিল—১ম অশোক, ২য় বিগতশোক বা বীতশোক।

"অশোকের পূর্ব্বে পট্টমহিষীর গর্ভে বিন্দুসারের সুসীম নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। অশোকের আচরণে বিন্দুসার তাহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তক্ষশিলানগরবাসীরা বিন্দুসারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, বিন্দুসার সেইস্থানেই অশোককে বিসর্জ্জন করেন। পথে অশোক বহু দলবল সংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলায় আসিলেন। নগরবাসিগণ তাঁহার সাজসজ্জা দেখিয়া বিনাযুদ্ধে তাঁহাকে তক্ষশিলা ছাড়িয়া দিল ও তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিল।

"এদিকে বিন্দুসারের প্রধান মন্ত্রী খল্লাটক জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুসীমের আচরণে কিছু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকেই তক্ষশিলায় পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন এবং অশোককে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকেই রাজধানীতে আনাইয়া রাখিলেন।

"বিন্দুসারের আয়ু শেষ হইয়া আসিল। অমাত্যগণ অশোককে ভাল করিয়া সাজাইয়া রাজার সম্মুখে আনিল এবং যে পর্য্যন্ত সুসীম ফিরিয়া না আসে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিল। বিন্দুসার বড়ই রুষ্ট হইলেন। অশোক বলিলেন, যদি ধর্ম্ম থাকে, তবে আমিই রাজা হইব। অনতিবিলম্বে অশোকের পট্টবন্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে বিন্দুসারের মুখ দিয়া উষ্ণ শোণিত বাহির হইয়া প্রাণবায়ু চলিয়া গেল।

"এখন অশোক সম্রাট্‌রূপে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসিলেন। রাধগুপ্ত

তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তক্ষশিলায় সংবাদ গেল। সুসীম শুনিলেন, পিতা মরিয়াছেন এবং অশোক পিতৃসিংহাসন অধিকৃত করিয়াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি সসৈন্যে পাটলিপুত্র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অশোকও প্রস্তুত ছিলেন। নগরের প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারে এক একজন নগ্ন, তৃতীয় দ্বারে রাধগুপ্ত, চতুর্থ দ্বারে স্বয়ং অশোক উপস্থিত রহিলেন। দ্বারের সম্মুখে পরিখা খনন করিয়া খদির ও অঙ্গার পূরিয়া তদুপরি এক অশোকমূর্ত্তি রক্ষিত হইল।

"সুসীম অশোকের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বদ্বারে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রই অঙ্গারপূর্ণ পরিখায় পতিত হইলেন। এই সঙ্গে সুসীমের লীলাখেলা শেষ হইল।"

মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের বাল্যজীবন পাঠ করিলে সহজেই মনে হইবে যে, তিনি যৌবনারম্ভে উদ্ধত-স্বভাবহেতু সুদূর পঞ্জাবসীমান্ত তক্ষশিলায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে যে, তিনিই সেই সময়ে আলেক্‌সান্দরের শিবিরে সাহায্যলাভার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং আলেক্‌সান্দর সেই উদ্ধত যুবকের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ৩২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আলেক্‌সান্দর ভারত পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে অশোক পঞ্জাবের কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া রাজা হইয়া বসেন। ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেক্‌সান্দরের মৃত্যুসংবাদ ভারতে পৌঁছিবামাত্র দেশীয় সামন্তরাজগণ গ্রীকদিগকে ভারত হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে তক্ষশিলারাজের মৃত্যু হয় এবং অশোক বহু দলবলসংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলা অধিকৃত করেন। অল্পকাল মধ্যেই সম্রাট্ বিন্দুসারের পীড়ার সংবাদ পঞ্চনদে পৌঁছিল। অশোক পিতৃসিংহাসন অধিকৃত করিবার জন্য সসৈন্যে পাটলিপুত্রে উপনীত হইলেন। রাজমন্ত্রী তাঁহার প্রভাবের ও শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র সুসীমকে রাজধানী হইতে বহুদূরে সরাইয়া রাখিলেন, তাই বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক সহজে পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকৃত করিয়াছিলেন। এই অশোকই নানা শিলানুশাসনে প্রিয়দর্শী নামে ও গ্রীকদিগের গ্রন্থে Sandrocottus (চন্দ্রগুপ্ত) নামে পরিচিত হইয়াছেন। ৩১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ভারত ছাড়িয়া গ্রীক বীরগণ যখন গবিনি-রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, সেই সুযোগে তিনি দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ভারতপ্রান্ত হইতে গ্রীকদিগকে বিতাড়িত ও সমগ্র পঞ্জাব অধিকৃত করেন। অল্পদিন মধ্যেই নিজ শৌর্য্যবীর্য্য ও সহায়সম্পত্তিতে

তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইলেন। ইহার অনতিকাল পরেই সেলিউকস্ পুনরায় যবন (গ্রীক্)-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পঞ্জাবে আসেন। কিন্তু তিনি মহাবল অশোকের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। উভয়ে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। এই সময়ে সম্ভবতঃ অশোক যবনরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং যবনরাজের মর্য্যাদাস্বরূপ ৫০০ হস্তী উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সেলিউকস্ পাটলিপুত্রের সভায় মেগেস্থেনিস্‌কে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন। সেই যবনদূত পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের কিছু কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণীতে প্রকাশ যে মৌর্য্যসম্রাটের বিরুদ বা উপনাম 'পাটলিপুত্রক' ও একটি নাম 'চন্দ্রগুপ্তক।' * কেবল অশোক বলিয়া নহে, যিনি মগধের পরবর্ত্তী গুপ্তসম্রাট্‌গণের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, পিতামহের নাম চন্দ্রগুপ্ত এবং পৌত্রের নাম বা বিরুদ চন্দ্রগুপ্ত এরূপ বহু প্রমাণ বিদ্যমান। মৌর্য্যসম্রাট্ ১ম

---

* "The king, in addition to his family name, must adopt the surname of Palibothros. Sandrokottos, for instance, did, to whom Megasthenes was sent upon embassy."

Mc Crindle's Ancient India as described by Megasthenes, p. 67.

যেমন অশোক-চন্দ্রগুপ্ত নিজ রাজধানী 'পাটলিপুত্র' নামেও অভিহিত হইতেন, সেইরূপ আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক বহু নৃপতিকে গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব রাজধানীর নামানুসারেই প্রথিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে তক্ষশিলা (Taxilus) ও পুরুষ (Porus) নাম প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ উক্ত উভয়কেই মূল নাম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত দুইটি নামই স্থানবাচক ও সেই স্থানের রাজার বিরুদ বা উপনাম তাহাতে সন্দেহ নাই। তক্ষশিলা রাজধানীর বর্ত্তমান অবস্থান শাহদেবী। (Cunningham's Ancient Geography of India, pp. 104.) চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও যুঅন্-চুঅঙ্গ্ এস্থানে প্রভুত বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া গিয়াছেন। (Watters On Yuan-Chuang, Vol. 1. p. 241-248)। উক্ত উভয় চীনপরিব্রাজকই পুরুষরাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই স্থান পুরুষক বা পরুষক নামে বিবৃত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক যুঅন্-চুঅঙ্গ্ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দিতে এই পুরুষ রাজ্যের রাজটানী "পুরুষপুরে" আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে মুসলমান ঐতিহাসিক অল-বেরুণি "পুরুষাবর" ও পরবর্ত্তী মুসলমান লেখকগণ "পরুষাবর" নামে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থানই এক্ষণে 'পেশাবর বা পেশোয়ার নামে প্রসিদ্ধ। আশ্চর্য্যের বিষয়, আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক পুরুষ (Porus) রাজাকে ভ্রমক্রমে সাধারণে 'পুরুরাজ' বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন।

চন্দ্রগুপ্ত বৈশ্যকন্যারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; অগ্নিসম তেজস্বী চাণক্যপালিত চন্দ্রগুপ্ত যবনকন্যা বিবাহ করিয়াছেন, হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধগ্রন্থে এরূপ কোন আভাস নাই, তাঁহার সহিত যবন সম্বন্ধ থাকিলে কোন না কোন ভারতীয় প্রাচীন লেখক অবশ্যই তাহা প্রকাশিত করিতেন। কিন্তু সম্রাট্ অশোক যে যবনরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। যে সুপ্রাচীন শিলাফলকে মৌর্য্যচন্দ্রগুপ্তের বৈশ্যশ্যালক পুষ্যগুপ্তের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে, সেই লিপি-মধ্যেই সম্রাট্ অশোকের শ্যালক যবনরাজ তুষাস্পের নামোল্লেখও রহিয়াছে।† হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে অশোক নাম থাকিলেও যেমন ভারতের সকল প্রধান জনপদ হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার প্রসিদ্ধ অনুশাসনসমূহে তাঁহার 'অশোক' নাম পর্য্যন্ত আদৌ প্রকাশ নাই, ঐ সকল শিলালিপিতে সর্ব্বত্রই তাঁহার একমাত্র 'প্রিয়দর্শী' নামে তিনি নিজে পরিচিত হইয়াছেন, অথচ অধিকাংশ প্রাচীনগ্রন্থে তাঁহার এই প্রিয়দর্শী নামটি পাওয়া যাইতেছে না, সেইরূপ এদেশের কোন প্রাচীন লিপি বা গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার বিরুদ বা নাম 'চন্দ্রগুপ্ত' বা 'পাটলিপুত্রক' অধুনা দৃষ্ট না হইলেও তাঁহার সভাস্থ যবনদূত মৌর্য্যবংশের সর্ব্বজনপ্রিয় 'চন্দ্রগুপ্ত' নামটিই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন এবং পরবর্ত্তী গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। অধিক সম্ভব, অশোক রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'চন্দ্রগুপ্ত' নামও ব্যবহার করিতেন। তাঁহার প্রথম জীবনের ঘটনাবলী বহুপরবর্ত্তী লেখক বিশাখদত্ত ১ম চন্দ্রগুপ্তের স্কন্ধে আরোপিত করিয়া থাকিবেন, তাহাও কিছু বিচিত্র নহে। অশোক সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না, তিনি নাপিতানী-কার্য্যনিপুণা (দাসীর, পরে) রাণীর গর্ভজাত, প্রতিলোমক্রমে উৎপন্ন,—সুতরাং হিন্দু গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে তিনি অবৈধ-সন্তান 'বৃষল' বলিয়া অভিহিত! তাই মুদ্রারাক্ষসকার এই অশোকরূপী চন্দ্রগুপ্তকে দাসীপুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মৌর্য্যবংশের সহিত নন্দবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল না। নন্দবংশ আদিতে ক্ষত্রিয়, * কিন্তু মৌর্য্যবংশ আদিতে বৈশ্য।

অশোক-চন্দ্রগুপ্ত যখন পঞ্চনদ অধিকৃত করিয়া শক-যবন-কাম্বোজাদি সীমান্ত

---

† "মৌর্যস্য রাষ্ট্রীয়েণ বৈশ্যেন পুষ্যগুপ্তেন কারিতং অশোকস্য মৌর্য্যস্য তেন যবনরাজেন তুষাস্পেনাধিষ্ঠায় প্রণালীভিরলঙ্কৃতং"। Indian Antiquary, (Vol. VII. p. 260.)

* "নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলমিতি পৌরাণশাসনাৎ"। ঢুণ্ঢিরাজকৃত মুদ্রারাক্ষসটীকা।

প্রদেশবাসী † বীরগণকে সঙ্গে লইয়া পিতার জীবদ্দশায় পাটলিপুত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন, সেই সময়ে মৌর্য্যমন্ত্রী খল্লাটক তাঁহাকে সাহায্য করিয়া সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন এবং মনে হয় যে, উভয়ের কূট নীতিবলে বিন্দুসার 'রক্ত বমন করিয়া' ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। সেই ঘটনাই পরবর্ত্তীকালে রূপান্তরিত হইয়া মুদ্রারাক্ষসনাটকে চাণক্য ও ১ম চন্দ্রগুপ্তের উপর ন্যস্ত হইয়া থাকিবে। পরে যখন বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীম প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধার করিবার জন্য কুলূত, কাশ্মীর ও পারসিক প্রভৃতি সীমান্ত রাজন্যবর্গে পরিবৃত হইয়া কুসুমপুরে উপনীত হইয়াছিলেন, তৎকালে অশোক-চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া কূটনীতি-অবলম্বন করেন। ‡ অশোকাবদান হইতে তাহার আভাস দিয়াছি। অশোকের অনুশাসন ও মহাবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, রাজ্যলাভের পর চারি বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। অধিক সম্ভব, এ কয় বর্ষ তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল, মুদ্রারাক্ষসকার সেই দূরশ্রুত রাজনৈতিক বিপ্লবের কথঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন। গৃহশত্রু ও বাহ্যশত্রু সকল সমূলে বিনষ্ট ও সিংহাসন নিরাপদ করিয়া ৫ম বর্ষে অশোক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং সেই অভিষেক বর্ষ হইতে তাঁহার রাজ্যাঙ্ক গণিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সুপ্রাচীন বহু জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সবিস্তার পরিচয় থাকিলেও কোথাও তিনি 'বৃষল' বা 'শূদ্র' বলিয়া পরিচিত হন নাই। এমন কি তাঁহার জন্য চাণক্য যে 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেন, তাহাতে চন্দ্রগুপ্তের বৃষলত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় না, বরং চাণক্য তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কখনই 'বৃষল' বলিয়া গণ্য করা যায় না। অশোকের প্রতিলোমক্রমে নাপিতানীরূপিণী

---

† "অস্তি তাবচ্ছকযবনকিরাতকাম্বোজপারসীকবাহ্লীকপ্রভৃতিভিশ্চাণক্যমতিপরিগৃহীতৈশ্চন্দ্রগুপ্তপর্ব্বতেশ্বরবলৈরুদধিভিরিব প্রলয়োচ্চলিতসলিলৈঃ সমন্তাদুপরুদ্ধং কুসুমপুরম্"।

মুদ্রারাক্ষস ২য় অঙ্ক।

‡ "কৌলূতশ্চিত্রবর্ম্মা মলয়নরপতিঃ সিংহনাদো নৃসিংহঃ
কাশ্মীরঃ পুষ্করাক্ষঃ ক্ষতরিপুমহিমা সৈন্ধবঃ সিন্ধুষেণঃ।
মেঘাখ্যঃ পঞ্চমোঽস্মিন্ পৃথুতুরগবলঃ পারসীকাধিরাজো
নামান্যেষাং লিখামি ধ্রুবমহমধুনা চিত্রগুপ্তঃ প্রমাষ্টু॥ ২০॥

(মুদ্রারাক্ষস ১ম অঙ্ক)

দাসী গর্ভে জন্ম, পিতৃবৈরিতা ও তাঁহার যবনসম্বন্ধহেতু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে 'বৃষল' বলিয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিবেন তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তিনি নাপিতানীর গর্ভজাত এই প্রচলিত কিম্বদন্তী গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার পিতার স্কন্ধে আরোপিত করিয়া Chandromesকে নাপিতপুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এখানে আর এক আপত্তি উঠিতে পারে, সম্রাট্ অশোকের অনুশাসনে অন্তিওক, অন্তিকিনি, মক, তুরময় ও অলিকসুদর এই কয় জন গ্রীক নরপতির নামোল্লেখ আছে। অধ্যাপক লাসেন গ্রীক ইতিহাস হইতে উক্ত পঞ্চ নৃপতির এইরূপ সম্বন্ধ ও কাল নিরূপণ করিয়াছেন—

অন্তিওক = Antiochus Theos, সিরীয়রাজ Antiochus Soter এর পুত্র রাজ্যকাল ২৬১-২৪৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ।

তুরময় = Ptolemy Philadelphus ইজিপ্টের রাজা (ঐ ২৮৫-২৪৭ ঐ)

অন্তিকিনি = Antigonus Gonatus, মকিদনের রাজা (২৭৮-২৪২ঐ)

মগ = Magas of Cyrene, তলেমি ফিল্‌দেল্‌ফাসের বৈমাত্রেয়ভ্রাতা, ২৫৮ খৃঃ পূঃ মৃত্যু।

অলিকসুদর = Alexander, এপিরাস্‌রাজ, রাজ্যকাল ২৬২-২৫৮ খৃঃ পূঃ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—পাঁচজন নৃপতি ২৬০ হইতে ২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। অধ্যাপক সেনার্ট প্রকাশ করিয়াছেন, "প্রিয়দর্শীর রাজত্বের ১৩শ অঙ্কে* যে লিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে যখন ঐ পাঁচজনের নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ লিপিখানিও ২৬০-৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে প্রচারিত হইয়াছিল। এরূপস্থলে ২৬৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার অভিষেক এবং তাহার চারিবর্ষ পূর্ব্বে ২৭৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজ্যলাভ ঘটে।" এই মতটি সকল পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলি চরিতের প্রমাণ অনুসারে ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ১ম মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক, কিন্তু পরবর্ত্তী মত স্বীকার করিলে চন্দ্রগুপ্তের এক শত বর্ষ পরে অশোকের রাজ্যলাভ ধরিতে হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভের ১০০ বর্ষ পরে তৎপৌত্র অশোকের রাজ্যলাভ সম্ভবপর বলিয়া কেহই স্বীকার করিবেন না। মহাবংশে লিখিত আছে বুদ্ধনির্ব্বাণের (৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের) ২১৮ বর্ষ পরে অশোকের রাজ্যলাভ ঘটে। এদিকে ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণমতে চন্দ্রগুপ্ত

* কিন্তু মূল অনুশাসনে এরূপ অঙ্কনির্দ্দেশ নাই।

২৪ বর্ষ ও বিন্দুসার ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া উভয়ের রাজ্যকাল মোটামুটি ৪৮ বর্ষ এবং ৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের সময় অশোকের রাজ্যারম্ভ ধরিতে হয়। এখন দেখিতে হইবে যে, ঐ সময়ের পরে অর্থাৎ অশোকের রাজ্য সময়ে উক্ত নামধেয় পঞ্চ যবন নৃপতি বিদ্যমান ছিলেন কি না ?

দিগ্বিজয়ী মকিদোনবীর আলেক্‌সান্দরের সমকালীন ও তাঁহার দেহাত্যয়ের পরবর্ত্তী কালের গ্রীক্ ইতিহাসের আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, অশোকের অনুশাসনে যে পঞ্চ যবন নাম গৃহীত হইয়াছে, মকিদোন, ইজিপ্ট সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে সেই সেই নামে একাধিক ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করিতেন। এখন দেখিতে হইবে, উক্ত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতের উপর নির্ভর না করিয়া ঠিক সেই সময়ে তত্তৎ নামে পরিচিত পঞ্চ যবনরাজের অস্তিত্ব পাইতে পারি কি না ?

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তৎকালে সাধারণতঃ রাজন্যবর্গ স্ব স্ব জনপদ বা রাজধানীর নামেই পরিচিত ছিলেন, তক্ষশিলারাজ ও পুরুষরাজ নামদ্বয় দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হইতে পারে। মগধাধিপ (অশোক) চন্দ্রগুপ্ত নিজ রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে 'পাটলিপুত্রক' নামেও পরিচিত ছিলেন, সে কথাও মেগেস্থেনিসের বিবরণী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। সম্রাট্ অশোকের (শাহবাজগড়ীর) ১৩শ শিলানুশাসনেও ভারতীয় বিভিন্ন রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গে তাঁহাদের স্ব স্ব জনপদ-নামই উক্ত হইয়াছে, এ অবস্থায় তাঁহার উক্ত ১৩শ অনুশাসনে যে পঞ্চ যোন বা যবনরাজের উল্লেখ আছে, তাঁহারা স্ব স্ব রাজধানী নামেই মৌর্য্যসম্রাটের নিকট পরিচিত হইয়াছেন, বলিয়া মনে করি। এখন দেখা যাউক, উক্ত পঞ্চ রাজধানী কোথায় ?

আলেক্‌সান্দরের মৃত্যু ও তাঁহার উপার্জ্জিত সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইলে ৩০৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার সেনাপতিগণ যেস্থানে যেস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহারা রাজোপাধিগ্রহণ করেন। এই সময়ে অন্তিগোনস্ (Antigonus) এসিয়া-মাইনরে নিজনামে 'অন্তিগোনীয়' (Antigonia), তলেমি (Ptolemy) মধ্যইজিপ্টে 'তোলময় হর্ম্ম' (Ptolemais Hermii) এবং তাহার কএকবর্ষ পরে সেলিউকস্ সিরীয়ায় নিজ পিতৃনামে 'অন্তিওক' (Antioch) রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে মকিদোন (Makedon) নামক গ্রীসের প্রাচীন নগরীতে কাসন্দর (Cassander) ও আলেক্‌সান্দরের প্রতিষ্ঠিত মিসরের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র আলেক্‌সান্দরীয় (Alexandria)

নামক স্থানে তলেমি আধিপত্য করিতেছিলেন। বাস্তবিক ৩১৭ হইতে ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত গ্রীক (যবন)-সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হইবে, তৎকালে ইজিপ্ট, গ্রীস ও এসিয়াস্থ গ্রীক্ অধিকারে আলেক্সান্দরের সেনাপতিগণের মধ্যে পরস্পর প্রাধান্য লইয়া ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ সকল স্থানের নিকট উক্ত সময়মধ্যে কোন যবনপতি স্থায়ী বা নিরাপদভাবে আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বিশেষতঃ কোন দূরদেশে সংবাদ পাঠাইতে হইলে সাধারণতঃ "অমুক দেশের রাজার কাছে" বা কেবল অমুক দেশে লোক পাঠান হইল, এইরূপ ভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। সম্রাট্ অশোকও তাঁহার উক্ত অনুশাসনে সেইরূপ চোল, পাণ্ড্য, তাম্রপর্ণী প্রভৃতি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমাদের বিশ্বাস, অনুশাসনে যে অন্তিওক (Antioch), অন্তিকিনি (Antigonia), তুরময় (Ptolemais), মক (Makedon), ও অলিকসুদর (Alexandria) এই পঞ্চ নামের উল্লেখ আছে, এ গুলি গ্রীক ঐতিহাসিকবর্ণিত তক্ষশিলা

* অন্তিওক, অন্তিকিনি, তুরময়, মক ও অলিকসুদর এই পাঁচটিকে যদি প্রকৃত ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়াই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আমাদের উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত হয় না। কারণ, আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থানুসারে অশোকের যে কাল পাইতেছি, অর্থাৎ ৩২৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ মধ্যেই উক্ত নামে পঞ্চ যবনরাজের নাম পাইতেছি। যথা—

১ম—অন্তিওক (Antiochus) সেলিউকসের পিতা, ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৃত্যু। তাঁহারই নামানুসারে তৎপুত্র সেলিউকস্ অন্তিওক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই অন্তিওকের সমৃদ্ধির সহিত অন্তিকিনির গৌরব নষ্ট হয়। (Encyclo. Britannica, Vol. II. p. 131.)

২য়—অন্তিকিনি (Antigonus) সেলিউকস্ ইহাঁকে পরাজয় করিয়া ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বেই তাঁহার রাজধানী অন্তিগোনীর অধিকার করেন।

৩য়—তুরময় (Ptolemy Soter) আলেকসান্দরের একজন প্রধান সেনাপতি, আলেক্সান্দরের মৃত্যুর পর ইহারই অংশে ইজিপ্ট, লিবিয় ও আরবের কতকাংশ পড়িয়াছিল। ইজিপ্টের দক্ষিণ ও আরবশাসনের সুবিধার জন্য ইনি থেবইস্ প্রদেশে তুরময় (Ptolemais) নামে রাজধানী স্থাপিত করেন। এ সময়ে উত্তর ইজিপ্টে আলেক্সান্দ্রিয়াও সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া গণ্য ছিল।

৪র্থ—মক (Magus of Cyrene) রাজ্যকাল ৩০৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত।

৫ম—অলিকসুদর (Alexander of Epirus) ওলিম্পিয়ার ভ্রাতা, আলেক্সান্দরের মাতুল। রাজ্যকাল ৩৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ৩১৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ।

(Taxilus) ও পুরুষ (Porus) প্রভৃতি শব্দের স্থায় জনপদ ও তজ্জনপদের অধিপতি-জ্ঞাপক।

অশোকের অনুশাসনে যে অন্তিওকরাজের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আছে, তাঁহা-কেই আমরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অন্তিওক-পতি সেলিউক্স নিকেটর বলিয়া মনে করি। তিনি আপনাকে সমস্ত এসিয়ার সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সিরীয়াস্থ অন্তিওক নগরেই তাঁহার এসিয়া-সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল। তিনি অশোকের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া অশোকের অনুশাসনে যবনরাজগণের মধ্যে তাঁহারই নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

গিরনারের গিরিলিপিতে অশোকমৌর্য্যের শ্যালকের 'তুষাস্প' নাম দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে পারসিক বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু তখনকার গ্রীক-গণের পরিচয় আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, আলেক্সান্দরের স্থায় তাঁহার সেনানীবৃন্দও পারসিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যবনসেনাপতির ঔরসে ঐরূপ কোন পারসিক মহিলার গর্ভে যবনরাজ তুষাস্পের জন্ম। সেলিউক্সের উপার্জ্জিত এসিয়াস্থ গ্রীকসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে কোন কোন গ্রীক রাজকুমার ভারতে আসিয়া সম্রাট্ অশোকের আশ্রয় গ্রহণ করেন, যবনরাজ তুষাস্প তন্মধ্যে একজন। অশোকের অনুগ্রহে তিনি সুরাষ্ট্রের ক্ষত্রপ-পদ লাভ করিয়া-ছিলেন।

যাহা হউক, মৌর্য্যাধিপ ১ম চন্দ্রগুপ্ত, এবং তৎপৌত্র অশোক বা ২য় চন্দ্র-গুপ্তের সমসাময়িক ঘটনাবলি আলোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারিতেছি যে, জৈনশাস্ত্রমতে ৩৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ১ম চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক এবং সিংহলের পালি-মহাবংশ-মতে বুদ্ধনির্ব্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে* অর্থাৎ ৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে। অধিক সম্ভব, আলেক্সান্দরের ভারত পরিত্যাগ করিবার পরই অশোক পঞ্জাবের কোন পার্ব্বত্যজনপদ অধিকার করিয়া রাজা হইয়া বসেন। তৎপরবর্ষে পঞ্জাবে মকিদোনবীরের মৃত্যুসংবাদ পেঁাছিবামাত্র যখন গ্রীকসেনাপতিগণ স্ব স্ব স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, সেই সুযোগে অশোক জাতীয় বিজয়কেতন উড়াইয়া দেশীয় সামন্তবর্গের সাহায্যে সমগ্র পঞ্চনদ অধি-কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিপুল শক্তির সাহায্যেই তিনি পাটলীপুত্রের

* Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, or 1909, p. 27

সিংহাসন অধিকারে সফলতালাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অশোকের ৩৭ বর্ষ মাত্র রাজ্যকাল অবধারণ করিয়াছেন। এরূপস্থলে ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার রাজ্যাবসান স্বীকার করিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, অশোকের বানপ্রস্থ অবস্থায় সুবর্ণগিরি হইতে বৃদ্ধ বৌদ্ধরূপে তাঁহার যে অনুশাসন লিপি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে ২৫৬ অঙ্ক দৃষ্ট হয়। এই অঙ্ককে বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ † ও তাঁহার রাজ্যত্যাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ধরিয়া লইলেও তাঁহার রাজ্যকাল ৩৭ বর্ষই হয়। এস্থানেও আমরা ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার 'বিবাস' বা সংসারত্যাগেরই আভাস পাইতেছি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

† প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিটও সম্প্রতি ২৫৬ অঙ্ককে বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ ও উক্ত লিপিকে অশোকের রাজ্যত্যাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী লিপি বলিয়াই প্রমাণ করিতে যত্নবান হইয়াছেন। (Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, p. 130) সিংহল ও শ্যামের প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ এবং ব্রহ্মদেশ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন শিলালিপি অনুসারে ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধনির্ব্বাণ-অব্দ আরব্ধ। মোক্ষমূলরপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহা হইতে আরও ৮৬ বর্ষ বাদ দিয়া ৪৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধনির্ব্বাণ স্থির করিয়াছেন। এদিকে সকলেই বলিতেছেন যে, শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধ সমসাময়িক, সুপ্রাচীন বহু বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় জৈন সম্প্রদায় বহুকাল হইতে যখন একবাক্যে ৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মহাবীরের মোক্ষাব্দ ধরিয়া আসিতেছেন, সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্ম এই তিনটি প্রধান বৌদ্ধ জনপদে বহুকাল হইতেই (উক্ত বর্ষের ১৬ বর্ষ পরে অর্থাৎ) ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধনির্ব্বাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তখন ৪৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দকে আমরা নির্ব্বাণাব্দ বলা সমীচীন মনে করি না। নির্ব্বাণাব্দকে ৮৬ বর্ষ পরবর্ত্তী স্বীকার করিয়া লইলে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজ্যকাল সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে যে অব্দ ধরা হইয়াছে, তাহার সহিত কিছুই সামঞ্জস্য থাকে না এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক সম্বন্ধে যে অভিনব কালনির্ণয় করিতেছেন, তাহার সহিত অসামাঞ্জস্য ঘটিয়া পড়ে। এ কারণ সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনমতই গৃহীত হইল।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

—:০:—

(৩)

পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে আজ প্রথমেই বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলাম, "দেখুন তাঁহার বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইতেছে, সমস্তই তাঁহার হৃদয়ের উদারতা দেখাইবার জন্য। বিদ্যাসাগর ত দয়ার সাগর বটেই; কিন্তু তাঁহার intellect এর দিক হইতে তিনি আপনার নিকট কিরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, আজ সেই কথা আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন। তাঁহার সাধারণ কথা-বার্ত্তা কিরূপ ছিল?"

তিনি বলিলেন—"কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডাক্তার জন্‌সনের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মেকলে ডাঃ জন্‌সন্ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, বোধ হয় তোমার মনে আছে; যিনি লিখিবার সময় গম্‌গমে Johnsonese ও Latinisms ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথা-বার্ত্তায় একটিও ল্যাটিন কথার ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; কিন্তু লোকের সঙ্গে মজ্‌লিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাঙ্গালা Slang শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—; 'ফ্যাপাতুড়ো খাওয়া' (to be confounded) 'দহরম মহরম,' 'বনিবনাও' 'বিদ্‌ঘুটে' 'বাহবা লওয়া'—এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত,—যাহাকে সাধু ভাষা বলে তিনি সে দিকেই যাইতেন না। 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয়ই শক্ত শক্ত সংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার রচনাও সেই প্রকার শব্দেই গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপরে আপনার Style গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে; সেই সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সাধারণ কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ। একটা উদাহরণ দিয়া আমি এই বিষয়টা ভাল করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। 'মহাসমারোহে' এই কথাটা সাধারণে যে অর্থে ব্যবহার করে, তিনিও

সেই অর্থে সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন ; অথচ সংস্কৃত ভাষায় কুত্রাপি 'সমারোহ' ও অর্থে ব্যবহৃত হয় না,—ও কথায় ও অর্থ হইতেই পারে না ; উহা একেবারে ভুল।

"একটিবার আমার স্মরণ হয় যে, সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি একটি বড় গোছের সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন,—কথাটি 'স্বরূপ যোগ্যতা।' এই শব্দটি ন্যায়-শাস্ত্রের ভয়ানক কঠিন একটি পরিভাষিক শব্দ ; ইংরাজীতে ইহার অর্থ এইরূপ করা যায়—Fitness *per se*। যে উপলক্ষে তিনি এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন সেটি এই ;—একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতে ছিলাম, এমন সময় দ্বারবান আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখ, আমরা এক দেশের লোক, এক জাত, এই সহরের ভিতরেই আছি, তিনি ডেকে না পাঠিয়ে একবার এসে দেখা কর্‌লেই পার্‌তেন। সাহেবরা যদি এই রকম চিঠি দিয়ে আমাদের ডেকে পাঠায় ত যাওয়া উচিত মনে করি ; স্বদেশীর সঙ্গে আসা যাওয়ার স্বরূপযোগ্যতা আছে, সাহেবদের সঙ্গে সেটা নেই।'—অবশ্যই তিনি দেখা করিতে যায়েন নাই।

"আজ কাল একটু আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াই কেহ কেহ সংস্কৃতে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি একেবারেই তাহা পছন্দ করিতেন না। একদিন এক এক হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দিতে জবাব দিতে লাগিলেন। আমি কাছে বসিয়া ছিলাম। আগন্তুকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণদুষ্ট। বিদ্যাসাগর কথা কহিতে কহিতে aside আমাকে বলিলেন—'এ দিকে কথায় কথায় কোষ্ঠশুদ্ধি হোচ্চে, তবুও হিন্দি বলা হবে না!' এই ঘটনার অনেক বৎসর পরে নীলাম্বরের বাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই হিন্দুস্থানী পণ্ডিতটির কথা আমি স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

"তিনি বলিতেন যে, একালে প্রকৃত সংস্কৃত লিখা অসম্ভব, যাহা লিখা যায় সবই গোঁজামিল। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইদানীং যত লোক সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগরের রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—; তিনি 'উত্তরচরিত,' 'শকুন্তলা-ও 'ঋজুপাঠ' তৃতীয় ভাগের টীকায় স্থলে স্থলে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত লিখিয়াছেন। তাহা অতি সুন্দর, এমন কি প্রাচীন সংস্কৃতের ন্যায় বোধ হয়।

"একদিন কালিদাস ও সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলাম। বিদ্যাসাগর কালিদাসের এমন একান্ত ভক্ত ছিলেন যে, কালিদাস যে কাহারও

অপেক্ষা হীন এ কথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহিতেন না। আমি হেম বাবুর 'ভারতের কালীদাস জগতের তুমি' এই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি রাগিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, 'হেম বাবুর এ কথা বলিবার অধিকার নাই। সে ত সংস্কৃত জানে না।' আমি তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিলাম যে, হেম বাবুর অভিপ্রায় বোধ হয় এই কথা প্রকাশ করা যে, ইংরাজ সর্ব্ববিষয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনই শাস্ত্রচর্চ্চায়ও উহাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব আছে।—কথাটা তাঁর মনে লাগিল। তিনি আগ্রহের সহিত ইংরাজের নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—'বটেই ত, খেতে, বস্‌তে, শুতে, বেড়াতে, সব বিষয়েই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ।'

"বিদ্যাসাগরের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বাঙ্গালা-সাহিত্য-গঠনে কিপ্রকার বিকাশ পাইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু এই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার রাজতক্তের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, একথা কল্পনা করিতেও পারিতেন না। তাঁহার এই literary jealousy সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেখ, আমার মনে হয় যে, যেমন জগৎসংসারে তেমনই ভাষার মধ্যেও একটা natural selection আছে; নহিলে শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ শর্ম্মা—যাঁহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের,—আমাদের যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল সেই সাহিত্যের, এক একটি দিক্‌পালরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত, তাঁহারা কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন; একা বিদ্যাসাগরের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল!

"শ্যামাচরণ সরকার ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; ল্যাটিন ও গ্রীক্ জানিতেন। পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন; সংস্কৃত 'সাহিত্যদর্পণ' কারের ভাষায় ভরতশিরোমণি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—'অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনী-ভুজঙ্গঃ' (the fancyman of eighteen courtezans of languages)। শ্যামাচরণ বাবু যখন সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন, তখন ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসিক লাল সেন। শ্যামাচরণ বাবু খাঁটি—বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় এক খানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল; কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম।

শ্যামাচরণ বাবু মাথা তুলিতে পারিলেন না। ইহার পরে Hindu Law সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির জন্য হাইকোর্টের জজরাও তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাকে চিরদিনের জন্য হারাইল।

"কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Encyclopaedia Bengalensis ও মহাভারতের ইংরাজী তর্জ্জমা লিখিয়া আপনার কৃতিত্ব দেখাইলেন। Encyclopaediaতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাশাপাশি লিখিয়া যাইতেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁহাকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না; কেবল বলিতেন—'লোকটার রকম দেখেছ? কথায় কথায় ভট্টি Quote করে'

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলিতেন—'ও ইংরাজী বেশ লেখে। কিন্তু সাহেবদের কাছে ইংরাজী লেখার সুখ্যাতি শুনে ও তাদের বলে—ইংরাজী আমি কিছুই জানি না, আমি সংস্কৃতই খুব ভাল জানি।' রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থসংগ্রহ' কোথায় ভাসিয়া গেল!

"ইহার একটা কারণ বেশ বুঝা যাইত। বিদ্যাসাগর ইংরাজী লেখাপড়া জানা লোককে পণ্ডিত বলিয়া মোটেই স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না। ইঁহারা যে ভাল বাঙ্গালা লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য গঠনে সহায়তা করিতে পারেন এ ধারণা তাঁহার ছিল না। একজন লোককে তিনি সুখ্যাতি করিতেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত; কিন্তু তাঁহার সুখ্যাতির মধ্যেও যেন damning with faint praise ছিল। তিনি বলিতেন—'অক্ষয় লিখ্‌তে টিখ্‌তে বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে—সংশোধন করে দিতে হয়।' কিন্তু আমার মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দু'জনের Style, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

"মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্য আমার বড় আপশোষ হয়। স্কুলে যত দিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চা করিলেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পর আর সে দিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্য-দান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা-সাহিত্যচর্চ্চাও ছাড়িলেন। যিনি 'বাসবদত্তার' প্রণেতা, তাঁহারই 'শিশুশিক্ষা' এখনও আমাদের ছেলেমেয়েদের উপভোগ্য জিনিষ। তাঁহার 'পাখী সব করে রব' কবিতাটি কোন শিশু

না সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়াছে? তিনি 'সর্ব্বশুভকরী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

"কুক্ষণে মদনমোহন বীটন সাহেবের মেয়ে স্কুলে (Bethune College) নিজের মেয়েকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে মেয়ে এই প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠান হইল দেখিয়া সাহেবরা অত্যন্ত খুসী হইল; মদনমোহন স্কুল ছাড়িয়া 'জজের পণ্ডিত' হইলেন, মাসিক বেতন দেড়শত টাকা। তখনকার এই 'জজের পণ্ডিত' একজন Law officer, জজদিগকে Hindu Law ব্যাখ্যা করিয়া দিবার ভার তাঁহার উপর ছিল। কিছু কাল পরেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে আর তাঁহার অনুরাগ রহিল না।

"বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য অক্ষুণ্ণ রহিল। দুজনে একসঙ্গে ছাপাখানা করিয়াছিলেন; ডেপুটি হইবার পর আর তাঁহাদের সাহিত্যক্ষেত্রে মিলিত হইবার অবসর হয় নাই।

"মদনমোহন প্রবাস হইতে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিলে সংস্কৃত কলেজে বেড়াইতে আসিতেন। বহরমপুর হইতে আসিয়া একদিন তিনি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। তর্কবাগীশ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'ও দেশ কেমন?' মদনমোহন উত্তর করিলেন 'শাঠ্য, কাপট্য, লাম্পট্য ব্যতিরেকে পদবিন্যাসটিমাত্র নাই।'

"বাঙ্গালা সাহিত্য যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট কতটা ঋণী তাহা বোধ হয় তোমরা ঠিক অনুভব করিতে পার না। তিনি রোমের ও গ্রীসের ইতিহাস বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন; কিন্তু তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' বাঙ্গালা ভাষাকে ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল; সুন্দর সরল বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, পলিটিক্স, আলোচিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্ব্বে লোক ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই।

এই সময়ে তারাশঙ্কর 'কাদম্বরীর' বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া, এবং হরিনাথ শর্ম্মা 'মুদ্রারাক্ষসের' ও 'রাসেলসের' বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

বিচিত্র পিতৃকুলানুরাগ।

—:o:—

নারীজাতি স্বভাবতঃ পিতৃকুলের প্রতিই সমধিক আসক্তিসম্পন্না। পতিপুত্রাদির শ্রীবৃদ্ধি-দর্শনে তাঁহাদিগের মনে প্রীতির সঞ্চার হয় সত্য; কিন্তু তাঁহারা পতিকুল অপেক্ষাও পিতৃকুলের অনুরাগিণী—শ্বশুর ও স্বামী প্রভৃতি হইতে পিতা, পিতামহাদির গৌরবেই অধিকতর গরবিণী। পতিকুলের নিন্দার কথা বরং কোনও প্রকারে তাঁহাদিগের সহনীয় হইতে পারে, কিন্তু পিতৃকুলের নিন্দাবাদ একেবারেই অসহ্য। রাজপুত রমণীর নিকট পিতৃকুলনিন্দকের ক্ষমা নাই; শ্বশুর কি স্বামী হইলেও, তাঁহার নিগ্রহ কি দণ্ডভোগ অনিবার্য্য। এই অনন্যসাধারণ পিতৃকুলানুরাগ বশতঃ রাজপুত জাতির মধ্যে কত যে শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? আমরা এই প্রবন্ধে জনৈকা রাজপুত রাজ্ঞীর বিচিত্র পিতৃকুলানুরক্তির ও তাহার ভীষণ পরিণাম-কাহিনীর আলোচনা করিব।

একসময়ে একজন পরমার বংশীয় রাজপুত, মিবার রাণার আশ্রয়ে, ভঁইসরোর প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। তিনি তাঁহার প্রতিবাসী মেঘাবত-বংশসম্ভূত বেইগু সামন্তের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং তদীয় প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে থাকেন। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইল। কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না। সুখের পর দুঃখ, আলোকের পর আঁধারের ন্যায়, বিধাতার অপরিবর্ত্তনীয়, অখণ্ডনীয় বিধান। আজীবন অবিচ্ছিন্ন সুখভোগের অধিকারী থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। পরমার সামন্তের ভাগ্যও সুতরাং অধিক দিন প্রসন্ন রহিল না। অকস্মাৎ তাঁহার সুখের সাগরে দুঃখের তুফান উঠিল—মিলনের অমল আকাশে বিচ্ছেদের কাল মেঘ দেখা দিল।

একদা 'পঁচিশী'-ক্রীড়া উপলক্ষে, রাণীর সহিত সামন্তরাজের তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল এবং সেই তর্ক বিতর্ক ক্রমে বচসায় ও পরিশেষে বিষম বিবাদে পরিণত হইয়া পড়িল। পরমারপতি ক্রোধ-সংবরণে অসমর্থ হইয়া মেঘাবত-নন্দিনীর পিতৃবংশের নিন্দা করিলেন—তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদির উদ্দেশে গ্লানিসূচক বাক্য উচ্চারণ করিলেন। সামন্ত-পত্নী এতক্ষণ স্বামীর কঠোর বাক্য

সহ্য করিতে ছিলেন—যথাসম্ভব তাঁহার তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু পিতৃকুলের নিন্দা শ্রবণে তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইল। সহসা তাঁহার নয়নযুগল ওড়কলিকার ন্যায় লোহিতবর্ণ ধারণ করিল এবং সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি তিনি নারীসুলভ সহিষ্ণুতা পরিহার করিলেন না। বিজাতীয় ক্রোধে ও নিদারুণ প্রতিহিংসানলে দেহ মন প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেও তিনি বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইতে দিলেন না। তিনি বহুকষ্টে উথিত হৃদয়বেগ দমন করিয়া, ত্বরিতপদে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

সামন্তভামিনী স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং স্বামীর তথাবিধ দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিফল দিবার জন্য উপায়-উদ্ভাবনে প্রবৃত্তা হইলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই কর্ত্তব্য অবধারিত হইল। রাজ-মহিষী পত্রের দ্বারা পিতাকে সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহার দ্বারাই কুলনিন্দক স্বামীর শাস্তিবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে মসীপাত্র, লেখনী ও কাগজ আনীত হইল। রমণী পত্রলেখা শেষ করিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইবামাত্রই একজন বিশ্বস্ত দূতের দ্বারা পত্রখানি গোপনে বেইগুরাজ্যে আপনার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে সামন্তপত্নী জ্বলন্ত ভাষায় স্বামীর অসদাচরণের কথা বিবৃত করিয়া পিতার ক্রোধ বৃদ্ধির চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং স্বামীর শাস্তিবিধান-দ্বারা কুলমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে পিতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

বেইগুরাজ দুহিতার পত্রপাঠে ঘৃতস্পৃষ্ঠ অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং জামাতার দণ্ডবিধানজন্য, নিজ কনিষ্ঠ পুত্র ও প্রভূত সেনাসহ তৎক্ষণাৎ ভঁই-সরোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অন্ত্রীপ্রদেশের অভ্যন্তর দিয়া ভঁইসরোর রাজ্যের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, তিনি আপন সেনাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং একভাগের ভার পুত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া ও স্বয়ং অন্যভাগের নেতৃত্ব লইয়া যমুনানদীর তীরপথে ধাবিত হইলেন। সামন্তকুমার পিতৃনির্দ্দেশে সরলপথ অবলম্বন করিলেন এবং তাঁহার বহুপূর্ব্বে ভঁইসরোর দুর্গের সম্মুখীন হইয়া ভগিনীপতির বিরুদ্ধে, যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া দিলেন।

সহসা এতদূর ঘটিবে পরমার-পতি তাহা আশা করেন নাই এবং তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতেও পারেন নাই। অধুনা শ্যালককে সসৈন্যে সমাগত ও শত্রুতা-চরণে সমুদ্যত দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি ভয় পাইলেন না, রাজপূত-সুলভ সাহসে নির্ভর করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিজ সেনাদল

লইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুইদলে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে বহু সেনা হত ও আহত হইয়া পড়িল; শোণিততরঙ্গে রণভূমি প্লাবিত হইয়া গেল। কিন্তু প্রথমতঃ কোনও পক্ষেরই জয়পরাজয় নির্ণীত হইল না। অবশেষে মেঘাবৎবংশের ভাগ্য প্রসন্ন হইল—বিজয়লক্ষ্মী পরমারকুলের প্রতি বিরূপ হইয়া বেইগুসম্প্রদায়ের অঙ্কশায়িনী হইলেন। বেইগুরাজকুমার সম্মুখযুদ্ধে ভগিনীপতির শিরচ্ছেদ করিয়া পিতৃকুলের সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। পরমার সেনাদল প্রভুর মৃত্যুদর্শনে সন্ত্রস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই বেইগু-সামন্ত সদলবলে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রের দ্বারাই স্ববংশের কলঙ্ক বিদূরিত হইয়াছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি সত্বর একজন অনুচরের দ্বারা সেই সুসংবাদ অন্তঃপুরে স্বীয় কন্যার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। মেঘাবৎ-নন্দিনী তাহাতে বিচলিত হইলেন না—তথাবিধ হৃদয়-বিদারক শোক-সংবাদেও অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন না। পরন্তু স্বামীর জীবন-বিনিময়ে পিতৃকুলের মর্য্যাদা রক্ষিত পাইয়াছে শুনিয়া তিনি প্রীতির চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন—সীমান্তে সিন্দূর, ললাটে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ও কণ্ঠে তুলসীমাল্য ধারণ করিয়া সতীবেশে সজ্জিত হইলেন এবং অনুচরী সহচরীদিগের সহিত দ্রুতগতি দুর্গপ্রাঙ্গণে পিতৃ-সমীপে আসিয়া দর্শন দিলেন। বেইগুরাজ, দুহিতার সেই সহমরণের বেশ দর্শন করিয়া বিস্মিত বা দুঃখিত হইলেন না অথবা তাঁহার মুখমণ্ডলে কোনও বিষাদের লক্ষণও প্রকাশ পাইল না। তিনি জানিতেন, রাজপুতরমণীরা যেরূপ পিতৃকুলানুরাগিণী, সেইরূপ পতিপরায়ণা পতিগতপ্রাণা। পিতৃবংশের অপমাননা যেমন তাঁহাদিগের অসহ্য, পতির বিয়োগ-যাতনাও তেমনই অসহনীয়। স্বামীর অবিদ্যমানে কখনও কোনও রাজপুতনারীই জীবনধারণে সমর্থা নহেন। অতএব জামাতার মৃত্যুদর্শনে তাঁহার কন্যাও যে সেই পথাবলম্বিনী হইবেন—পতির শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া জ্বলচ্চিতায় প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সামন্তরাজ দুহিতার সতীবেশে ও ভাবী আত্মত্যাগ-সঙ্কল্পে বিষণ্ণ হইবার কোনও কারণ দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রফুল্লমুখে তাঁহার সেই সহমরণ কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন।

অচিরকাল মধ্যেই সামন্ত-পত্নীর ইচ্ছানুসারে চম্বল ও যমুনা নদীর সঙ্গম-স্থলে প্রভূত চন্দনকাষ্ঠ, কার্পাস, ঘৃত ও ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুলাদি গন্ধদ্রব্য আনীত ও তদ্দ্বারা এক প্রকাণ্ড চিতা রচিত হইল। সতী-শিরোমণি পরমার-মহিষী সহচরী-

দিগের সাহায্যে সহমরণের সমস্ত বিধি কর্ত্তব্যাদি সম্পাদন ও শাস্ত্রীয়-অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালন করিলেন এবং পরম-ভক্তিসহকারে পতিদেহ বক্ষে লইয়া ধীর অচঞ্চল-ভাবে চিতার উপরে উঠিয়া বসিলেন। অমনই শঙ্খঘণ্টাদির মঙ্গলবাদ্যে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, চারিদিক হইতে অজস্রধারে চিতার উপরে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং সমাগত নরনারীর জয়নাদে আকাশ-মেদিনী-প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সামন্তরাজ্ঞী, পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং আপনার শেষ বক্তব্য শেষ করিয়া, ভৃত্য-দিগকে চিতায় অগ্নিসংযোগ করিতে আদেশ দিলেন।

সামন্তপত্নীর আদেশ প্রতিপালিত হইল, অগ্নি, ঘৃতাদি দাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে সহসা প্রচণ্ড মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল এবং সহস্রজ্বলজ্জিহ্বা বিস্তারে, দেখিতে দেখিতে সেই পতিদেহ-ধারিণী রাজপুত-সতীকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই রাজপুত-ললনার পিতৃকুলানুরাগ-ব্রত উদ্‌যাপিত হইল!

শ্রীঅঘোরনাথ বসু-কবিশেখর।

বিকাশ।

—:*:—

সরসীর বক্ষে সুপ্তা নলিনী সুন্দরী,
ফুল্লাননে জাগে যথা প্রভাত কিরণে,
কবিতা মানব হৃদে থাকে ঘুম ঘোরে,
জাগে সে মঙ্গলময় প্রেমের মিলনে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হীরক।

—:*:—

সকল প্রকার রত্নের মধ্যে হীরকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রূপে ও গুণে হীরক সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রত্ন-প্রসূ ভারতমাতার ক্রোড়ে পূর্ব্বে বহুতর রত্নের আকর বিদ্যমান্ ছিল। সেই সকল বহুবিধ বিভিন্ন রত্নের উল্লেখ এখনও আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রে বহুবিধ রত্ন উল্লিখিত হইলেও, ইহাদিগের মধ্যে নয়টি রত্নই সর্ব্বপ্রধান। তন্ত্রসারে এই নবরত্ন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য্যং গোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ।
পুষ্পরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ ॥"

মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, বজ্র বা হীরক, বিদ্রুম, পুষ্পরাগ, মরকত ও নীল এই নয়টি নবরত্ন। আবার নবরত্নের মধ্যে হীরকই সর্ব্বপ্রধান রত্ন। এই শ্রেষ্ঠ রত্নই সৌভাগ্যশালী নৃপতিগণের ধনভাণ্ডার উজ্জ্বল করিতেছে। হৃত-সর্ব্বস্ব ভারত-মাতার ধন-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠরত্ন কোহিনুরের জন্য বহুবিধ নৃপতির ধনাগার লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

অত্যুজ্জ্বল দীপ্তির জন্য হীরক রত্নশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। নক্ষত্রমণ্ডল বিভূষিত চন্দ্রের ন্যায় মণি-মুক্তা-বেষ্টিত হীরকখণ্ড ভূষণে বিরাজ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে। হীরকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রধানতঃ তিনটি গুণের উপর নির্ভর করে ; প্রথম—আয়তন ; দ্বিতীয়—দীপ্তি ; তৃতীয় বর্ণ। হীরক আয়তনে যত বৃহৎ হইবে, ইহার মূল্যও তত অধিক হইবে। কিন্তু আয়তনের সহিত দীপ্তি সমভাবে বর্ত্তমান থাকিলেই হীরক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। হীরকশ্রেষ্ঠ কোহিনুর আয়তনে জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ হীরকের অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও, ঔজ্জ্বল্যে এখনও ইহা অদ্বিতীয়। হীরকের মূল্য ইহার স্বাভাবিক বর্ণের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ হীরকের বর্ণ স্বচ্ছ, তবে লাল, সবুজ ও নীলবর্ণের হীরকও দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নীলবর্ণের হীরক অতীব দুষ্প্রাপ্য।

আমরা সচরাচর যে অবস্থায় হীরকখণ্ড দেখিতে পাই, কর্ত্তন ও সান পাওয়ার পর হীরক সেই আকার প্রাপ্ত হয়। ভূগর্ভমধ্যে অবস্থানকালে ইহা গলিত

লৌহ ও অন্যান্য ধাতু বেষ্টিত অবস্থায় থাকে। স্বাভাবিক উপায়ে বায়ু ও বৃষ্টি দ্বারা চালিত (acted) হইয়া হীরকখণ্ড সেই গলিত জমাট স্তরের উপরিভাগে উত্থিত হয়। অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডগুলি জলে ধৌত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং সময়ে সময়ে সেইগুলি সমুদ্র-গর্ভ পর্য্যন্ত নীত হয়। ধাতু-পিণ্ডের মধ্য হইতে পিণ্ডের উপরে হীরকের আগমন এবং পরে সমুদ্র পর্য্যন্ত আনয়ন—দুইএক বৎসরে সম্পন্ন হয় না, বহু শতাব্দীতে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

হীরক খনিজ পদার্থ। ইহাকে খনি হইতে ধাতবপিণ্ড মিশ্রিত অবস্থায় উত্তোলন করা হয়। হীরকের খনির সহিত অন্যান্য খনির কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। হীরকের খনিগুলি আকারে মোচাগ্রভাগের ন্যায় (conical)। খনির উপরিভাগ বিস্তৃত, কিন্তু ইহার পরিসর ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া তলদেশে আসিয়াছে। সময়ে সময়ে খনির চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার উচ্চ স্তূপ দেখা যায়। কিন্তু অনেক সময় এই খনির পার্শ্বস্থ মাটি এরূপ সমতল দেখা যায় যে, তদ্দর্শনে কেহ অনুমান করিতে পারেন না যে, খনির ভিতর দিয়া কখনও গলিত ধাতু প্রবেশ করিয়াছিল অথবা সেইস্থানে অন্য কোনরূপ ভূস্ফোটন (eruptoin) সংঘটিত হইয়াছিল।

হীরক যে অবস্থায় খনি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে অবস্থায় তাহাতে কোন সমতল স্থান লক্ষ্য হয় না। অধিকাংশ সময়েই সেইগুলি অসমান টুকরাভাবে পাওয়া যায়। কাযেই এইগুলিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া লইতে হয়। এই ছাঁট-কাটের উপর হীরকের মূল্য নির্ভর করে। সময় সময় একই প্রকারের হীরক কর্ত্তনের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন মূল্যে বিক্রীত হয়। ভারতবর্ষের একটি গৌরবের কথা এইস্থলে না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে হীরক-কর্ত্তনের প্রথা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে হীরক স্বাভাবিক অসমান অবস্থায় য়ুরোপে ব্যবহৃত হইত। য়ুরোপবাসীরা হীরক যে মূল্যবান পদার্থ তাহা বুঝিয়াছিলেন কিন্তু যে কারুকার্য্যের উপর ইহার সৌন্দর্য্য নির্ভর করে এবং যদ্ভিন্ন হীরক দীপ্তিহীন হইয়া থাকে, সেই কারুকার্য্যটিই তাঁহাদিগের অজ্ঞাত ছিল। রত্ন-প্রসবিনী ভারতে এই কারুকার্য্য বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। আমাদের গৌরবের কোহিনূরই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হীরককে সাধারণতঃ তিনপ্রকার আকারে কর্ত্তন করা হইয়া থাকে। খনি হইতে প্রাপ্ত হীরকখণ্ডের আকারের উপর ইহার কর্ত্তন নির্ভর করে। এই তিন প্রকার আকারের ইংরাজি নাম,—Brilliant, Rose এবং Table. খনি

হইতে তুলিবার পর কর্ত্তনকারী বিচার করিয়া দেখে যে, কোন্ আকারে কর্ত্তন করিলে হীরকের আয়তনক্ষয় সর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে। বিচার সমাপ্ত হইলে, যে আকারে হীরক কর্ত্তিত হইবে, সেই আকারের একটি সীসাখণ্ড প্রস্তুত করা হয়। তৎপরে এই সীসার আদর্শ গঠনটি সম্মুখে রাখিয়া কর্ত্তনকারী হীরকখণ্ডকে একটি দণ্ডের (dam) উপর আঁটিয়া দেয় এবং তাহার একটি ধার অপর একখণ্ড হীরকদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া মার্জ্জিত করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর দণ্ডসংলগ্ন হীরকখণ্ডের সেই পার্শ্ব, সীসার নমুনার সহিত সমান্তর হইলে, কর্ত্তন-কারী অন্য ধার কর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই ধার সীসাখণ্ডের সমধারের সহিত সমকোণে রাখিতে হইবে; কারণ হীরকের দীপ্তি এই কোণের উপর নির্ভর করে। হীরকের কোন ধার (edge) যদি ঘর্ষণ করিতে করিতে নমুনার সমধারের অপেক্ষা অধিক লম্বা হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। এই কর্ত্তনকার্য্য কেবল সাধারণ অস্ত্র-সাহায্যে সম্পন্ন হয় না। একটি ইস্পাতের তারে হীরক-চূর্ণ মাখাইয়া হীরকের উপর টানিতে হয়; হীরক-চূর্ণ তার হইতে ঝরিয়া পড়িলে পুনরায় মাখাইয়া দেওয়া হয় এবং বহুবার এই-ভাবে টানিলে হীরক কাটিয়া যায়। সময় সময় হীরকের উপরিস্থিত স্বাভাবিক ফাট বা জোড়ের দাগ লক্ষ্য করিয়া হাতুড়ি দিয়া হীরক ভঙ্গ করা হয়। কিন্তু এই প্রণালী সুবিধাজনক নহে, কারণ হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিবামাত্র অনেক উৎকৃষ্ট হীরকখণ্ড একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এইরূপভাবে একখণ্ড হীরক কর্ত্তন করিতে এক মাস এবং বৃহৎ হইলে দুই মাস পর্য্যন্ত সময় লাগে। পিট ডায়েমণ্ড (Pitt diamond) কর্ত্তন করিতে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

এইরূপে হীরক কর্ত্তিত হইলে, ইহাকে পালিস করিতে হয়। হীরক কর্ত্তন করিবার সময় যে টুকরা বা গুঁড়া পড়ে সেইগুলিকে অতিসাবধানে কুড়াইয়া রাখা-হয় এবং পরে এই গুলিকে ইস্পাতের হামানদিস্তায় গুঁড়াইয়া এরূপ সূক্ষ্ম করা-হয় যে, ইহাদিগের কণাপর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সূক্ষ্ম গুঁড়া দিয়াই হীরক পালিস করা হইয়া থাকে।

হীরক অত্যন্ত কঠিন পদার্থ। একখণ্ড লৌহের উপর হীরক রাখিয়া একটি হাতুড়ী দিয়া আঘাত করিলে হাতুড়ী টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, এবং হীরক লৌহখণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে। হীরকদ্বারা সকল প্রকার ধাতু ক্ষোদিত ও কর্ত্তিত হইয়া থাকে, কেবল টেণ্টালাম (Tantalum) ধাতু হীরকদ্বারা

ক্ষোদিত হয় না। টেণ্টালাম ধাতুর উপর হীরক-যন্ত্র (drill) বহুক্ষণ কায করিয়াও কোন ছিদ্র করিতে পারে নাই, অধিকন্তু হীরকের অগ্রভাগ সামান্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল।

হীরক তড়িত ও উত্তাপের অপরিচালক। সুতরাং ইহার একাংশ কোনরূপ উত্তপ্ত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, অপর অংশের কোন অনিষ্ট হয় না। জগদ্বিখ্যাত রাসায়নিক ল্যাভোসিয়র (Lavoisiar) প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে, হীরক পুড়িতে পারে এবং পুড়িয়া গিয়া দ্ব্যম্ল-অঙ্গারক গ্যাসে (Carbonic acid gas) পরিণত হয়। তৎপরে ডেভি (Davy) দেখাইয়াছিলেন যে, হীরক পুড়িলে দ্ব্যম্ল-অঙ্গারক গ্যাস ভিন্ন অপর কোন পদার্থ প্রস্তুত হয় না। সুতরাং হীরক অঙ্গারের (Carbon) প্রাকৃতিক প্রকারভেদমাত্র। ইহাতে কয়লা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই।

অঙ্গাভরণ বা মুকুট-সজ্জায় হীরকের ব্যবহার আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই; নৃপতিগণের উষ্ণীষের উপর মণিমুক্তাবেষ্টিত হীরকখণ্ড বিরাজ করিয়া তাঁহাদিগকে সুশোভিত করে। এইরূপ আভরণে হীরকের ব্যবহার ব্যতীত সমস্ত প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যে গ্রহগণের প্রীতি ও শান্তির নিমিত্ত হীরক-ধারণ প্রচলিত ছিল। হীরক প্রভৃতি নবরত্ন সূর্য্যাদি নবগ্রহের প্রীতির নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, শুক্রগ্রহের প্রীত্যর্থে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া হীরক ধারণ করিতে হয়। হীরকের বহুবিধ গুণ জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সারকত্ব, শীতত্ব, চক্ষুর্হিতত্ব ও শুক্রকারিত্ব গুণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে হীরক ষষ্ঠ বা অষ্ট কোণ বিশিষ্ট, স্বচ্ছ, নির্ম্মল, সমপার্শ্ব, বৃহত্তর অথচ লঘু, স্নিগ্ধ, ও তীক্ষ্ণধার, তাহাই জ্যোতিষ-শাস্ত্রমতে উৎকৃষ্ট ও ধারণে শুভকর।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, হীরক-চূর্ণ পালিসকার্য্যে ব্যবহৃত হয়; তদ্ভিন্ন হীরকদ্বারা নানাবিধ ছিদ্র করিবার যন্ত্র (Boring machine) প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাচ কাটিবার নিমিত্ত এবং ইস্পাতে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিবার জন্য হীরক-যন্ত্র প্রচলিত আছে।

মহামূল্যরত্নশ্রেষ্ঠ হীরকের ক্ষয় নাই। ইহা একবার সৃষ্ট হইলে, গণনাতীত কাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া জগদ্বাসীকে বিমোহিত করে। জগতের অধিকাংশ পদার্থই বায়ু ও বৃষ্টিদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কিন্তু ইহারা হীরককে কোনরূপে বিনষ্ট করিতে পারে না। সাধারণ অগ্নিসংযোগে অনেক বস্তু বিনাশ

প্রাপ্ত হয়, কোনটি পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়, কোনটি বা রূপান্তরিত হইয়া এরূপ অবস্থায় পরিণত হয় যে, পূর্ব্বাবস্থার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই লক্ষিত হয় না। কিন্তু হীরক সাধারণ অগ্নি-প্রয়োগেও অক্ষুণ্ণ থাকে, এমন কি বাঁক নল দিয়া ইহার উপর অগ্নিশিখা প্রয়োগ করিলেও ইহার কোন ক্ষতি হয় না। জগতের অনেক দ্রব্য অম্লজান গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া (Oxidised) নষ্ট হয় এবং কেহ বা ভিন্ন আকার, ভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া নূতন পদার্থে পরিণত হয়, কিন্তু হীরক সম্বন্ধে আমাদের সে আশঙ্কাও নাই ; কারণ, ইহাকে কোনরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অম্লজান গ্যাসের সহিত মিশ্রিত করিতে পারা যায় নাই। এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র-উপকরণ-সংযোগেও এই কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। হীরকের কাঠিন্য ও অক্ষয়ত্ব লক্ষ্য করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রীকেরা ইহাকে এডামাস (Adamas) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। হিন্দুরাও এই কারণে হীরকের বজ্র নাম দিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হীরক অঙ্গার ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্রময় (porous) কয়লা কিরূপে এইরূপ নির্ম্মল উজ্জ্বল দানাবিশিষ্ট স্ফটিকে (crystal) পরিণত হয়, তাহাই এক্ষণে দেখিতে হইবে। প্রকৃতিই এই বহুমূল্য রত্ন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ভূ-গর্ভের উত্তাপ এত অধিক যে, তথায় লৌহ পর্য্যন্ত তরল অবস্থায় থাকে। এইরূপ তরল লৌহের সহিত কয়লা মিশ্রিত হইলে গলিয়া যায়। স্বাভাবিক উপায়ে কয়লামিশ্রিত তরল লৌহের উপর ক্রমাগত অত্যন্ত চাপ পড়িলে, কয়লা হীরকরূপ ধারণ করে। পরে কখন ভূ-গর্ভ হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইলে হীরকখণ্ড লৌহ, অন্যান্য ধাতু ও কর্দ্দম মিশ্রিত হইয়া পৃথিবীর উপরিভাগে উপনীত হয়।

হীরক কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারে কি না, এ বিষয়ে বহুদিন হইতে তর্কবিতর্ক চলিতেছে। অনেক রাসায়নিক এ বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কেবল ফরাসী রসায়নবিদ্ পণ্ডিত মৈসন (Moissan) কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। স্বভাবিক যে উপায়ে হীরক প্রস্তুত হয়, আমরা যদি কৃত্রিম উপায়ে সেই পন্থা অবলম্বন করি, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা ; তবে কৃত্রিম হীরক প্রকৃতিজাত হীরকের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে।

মৈসনের হীরক প্রস্তুত প্রণালী এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিত হইল। তিনি বিশুদ্ধ লৌহকে, যাহাতে বালি (Silica) বা অন্য কোন আবর্জ্জনা (Impurities)

নাই, বৈদ্যুতিক অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর এক প্রকার বৈদ্যুতিক আলোক (Arc of light) প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের উত্তাপ ৪০০০ সেন্টিগ্রেড্ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এইরূপ প্রচণ্ড উত্তাপে লৌহ গলিয়া তরল মোমের আকার ধারণ করিয়াছিল। অতঃপর মৈসন এই তরল লৌহের উপর পরিষ্কার শোধিত কয়লা ছাড়িয়া দেন এবং কয়লাগুলি লৌহের সহিত গুলিয়া যায়। এইরূপে কয়লা ও লৌহ মিশ্রিত হইলে, তিনি অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ কমাইয়া দিয়াছিলেন। লৌহ তরল অবস্থা হইতে কঠিন (Solid) অবস্থায় পরিণত হইবার সময় আকারে বড় হয়। উত্তাপ কমাইয়া লৌহপূর্ণ পাত্রটি জলের উপর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে লৌহ ক্রমে শীতল হইতে থাকিলে, শক্ত হইতে আরম্ভ করে; এবং কিছুক্ষণ পরে উপরের তরল অংশ জমিয়া পাত্রের উপরে কঠিন সরের মত একটি আচ্ছাদন পড়ে। কিন্তু ভিতরে তখনও লৌহ তরল অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় লৌহের উপর অত্যন্ত চাপ দেওয়া হয়। তাহাতে ভিতরের তরল লৌহ হইতে কয়লা দানা বাঁধিয়া স্ফটিকাকার (Crystal) ধারণ করিয়া বাহির হয়। এই স্ফটিক উগ্র লবণদ্রাবক (Con. Hydrochloric Acid) দিয়া পরিষ্কৃত করিয়া মৈসন অনুবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, কয়লাগুলি দানাবিশিষ্ট স্ফটিকে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বাভাবিক হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ ও বর্ণরহিত হয় নাই। এই হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব (sp. gravity) ৩·৩ হইতে ৩·৫ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। স্বাভাবিক হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্বও ৩·৫। এইরূপ উপায়ে কতকগুলি কাল বর্ণের স্ফটিকও পাওয়া গিয়াছিল।

হীরকের উৎপত্তিস্থান কোথায়, এক্ষণে আমরা সেই বিষয়ের আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভূ-গর্ভে হীরক প্রস্তুত হয় এবং অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর উপরিভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা ভিন্ন হীরকের আর একটি জন্মস্থান আছে। "The diamond is a gift from Heaven and it is conveyed to the earth in meteoric showers." উল্কাপাতের সহিত লৌহ ও অন্যান্য ধাতুমিশ্রিত হীরকখণ্ড ভূতলে পতিত হইয়া থাকে—যদি এই কথাই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারি যে, যে স্থানে হীরক পাওয়া যাইবে, সেই স্থানে বিবিধ ধাতুমিশ্রিত একটি উল্কাপিণ্ডও পাওয়া যাইবে এবং এই পিণ্ডের মধ্যে স্থানে স্থানে হীরকাংশও দেখিতে পাইব। যদি আকাশই হীরকের জন্মস্থান হয় এবং উল্কাবৃষ্টিই পৃথিবীতে ইহার প্রেরণকর্ত্রী হয়, তাহা

হইলে পৃথিবীর উপরিভাগেই হীরক পাইবার সম্ভাবনা অধিক এবং হীরকের খনি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মেডেনডানার (Maydendaner) এই তর্কের মীমাংসা নিম্নলিখিত ভাবে করিয়াছেন। তিনি বলেন, হীরকের উৎপত্তি স্বর্গে (Cosmic origin)। পৃথিবী সৃষ্ট হইবার পর উল্কার সহিত হীরক পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে। যে স্থলে হীরক দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় আমরা যে উল্কাপিণ্ড দেখিতে পাই না, তাহার কারণ এই যে, বহুকাল-পূর্ব্বে, এমন কি ঐতিহাসিক যুগের বহুপূর্ব্বে, এইসকল উল্কা পৃথিবীর উপরে পড়িয়াছিল এবং কালক্রমে মাটিতে প্রোথিত হইয়াছিল। তাহার পর বায়ু ও বৃষ্টির দ্বারা চালিত (acted) হইয়া লৌহ ও অন্যান্য ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং হীরক জলে ধৌত হইয়া সমুদ্রগর্ভ পর্য্যন্ত নীত হইয়াছে। আমরা যে সকল হীরকের খনি দেখিতে পাই, তাহা বড় বড় উল্কাপতনে সম্পন্ন হইয়াছিল। উল্কাপিণ্ডগুলি অতিশয় বেগে আসিয়া পৃথিবীর উপরে পড়িয়াছিল এবং যে স্থলে নরম মাটি পাইয়াছিল, সেই স্থলে গভীর গর্ত্ত করিয়াছিল এবং অন্য স্থানে শক্ত মাটির উপর পতিত উল্কাপিণ্ডগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

আমেরিকার আরিজোনা নামক স্থানের একটি সমতল ভূখণ্ডের উপর এক সময়ে উল্কাপাত হইয়াছিল। চারিদিকে বড় বড় লৌহখণ্ড পড়িয়া আছে এবং তাহার মধ্যবর্ত্তী স্থানে উচ্চ মৃত্তিকাবেষ্টিত চারিশত হস্ত গভীর গহ্বর (crater) দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই গহ্বরটির উপরিভাগ অতি বৃহৎ; ইহার ব্যাস পৌনে এক মাইল। এই গর্ত্তটি দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত সমতল ভূমি একটি বৃহৎ লৌহস্তূপের আঘাতে এইরূপ বৃহৎ গর্ত্তে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীমান হইতেছে যে, উল্কাপাত হইতে হীরকের খনির উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে।

উল্কার সহিত যে হীরকখণ্ড ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, এই বিষয়ে ডাক্তার ফুটের (Foot) রাসায়নিক অনুসন্ধান সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। একদা তিনি একটি উল্কাপিণ্ড কর্ত্তন করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণপরে সেই পিণ্ডটি আর কাটিতে পারিলেন না এবং দেখিলেন যে, তাঁহার কাটিবার যন্ত্রও খারাপ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি পিণ্ডটি রসায়নবিদ্ মৈসনের নিকট পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন। মৈসন পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, সেই পিণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড হীরক আছে এবং তজ্জন্য ফুট উহা কর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ইহা

হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐ হীরকখণ্ডটি উল্কার সহিত পৃথিবীতে আসিয়াছিল।

হীরকের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাবতীয় কথাই বিবৃত হইল। পূর্ব্বে ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে হীরক পাওয়া যাইত, তাহাই এক্ষণে লিখিত হইবে।

বহুশতাব্দী পূর্ব্বে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কেবল পুণ্যস্থান ভারতবর্ষেই হীরক পাওয়া যাইত। আধুনিক সভ্যজগৎ যখন সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয় নাই, পাশ্চাত্য প্রদেশ যখন বিজ্ঞানদেবীর পূজা করিতে শিখে নাই, বিংশ শতাব্দীর প্রভূত পরাক্রমশালী জাতিদিগের নামও যখন কাহারও কুর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই,—তখন আমাদের ভারতে নৃপতিদিগের উষ্ণীষে হীরকখণ্ড বিরাজ করিত; জনসাধারণের মধ্যেও ইহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু ভারতমাতা এখন দীন-হীনা—তাই বুঝি রত্নপ্রসবিনী মাতা আর রত্নপ্রসব করেন না! পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের পানেয়ার নদী হইতে যুক্তপ্রদেশের শোন নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে হীরক পাওয়া যাইত। কৃষ্ণানদীতীরবর্ত্তী কাদাপা, কার্ণুল ও ইলোর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে হীরক পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন নাগপুর ও সম্বলপুর অঞ্চলেও উৎকৃষ্ট হীরক পাওয়া যাইত। এই সকল স্থানে এখন আর হীরক দেখিতে পাওয়া যায় না, সমস্তই চলিয়া গিয়াছে। ভারতের হীরক এক্ষণে সমগ্র জগৎকে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। রুশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজরাজেশ্বরগণ ভারতের হীরকে সজ্জিত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

পরিশেষে ভারতের আর একটি অতীত গৌরবের কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য জগৎ যখন অসভ্যতার অন্ধকারে নিমগ্ন, বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ যখন তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই,—সেই সুদূরবর্ত্তী কাল হইতে ভারতে হীরকের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ভারতবাসীরা তখন হইতেই হীরককে কাটিতে ও পালিস করিতে পারিতেন। সুতরাং হীরক কাটিবার, পালিস করিবার ও চূর্ণ করিবার যন্ত্রও এদেশে প্রচলিত ছিল। এই হীরক কাটিবার যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে অন্যান্য অনেক প্রকার যন্ত্রের আবশ্যক হয়। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কে অস্বীকার করিবেন যে, সেই সুদূর অতীতে ভারতে যন্ত্রাদির প্রচলন ছিল না, ভারতবাসীরা যন্ত্রের ব্যবহার জানিতেন। যাঁহাদের সূক্ষ্ম-কার্য্যে এরূপ পারদর্শিতাদর্শনে এক্ষণে আধুনিক জগৎ মুগ্ধ, তাঁহারা যে অন্যপ্রকার কারুকার্য্যে নিপুণ ছিলেন না—এ কথা বিশ্বাস করা

দূরে থাকুক, মনোমধ্যে কল্পনা করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। এই কথার সমর্থন প্রসঙ্গে Encyclopoedic Dictionary হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

"Until 1476, when De Bergham of Drughes first discovered this art (the art of cutting diamond) the diamond of Europe was worn uncut ? the four great stones in the mantle of Charlemagne furnishing an example. But the art was practised long before in India, the facing of the Kahinoor dating back into uncertain time."

অধুনা সমগ্র সভ্যজাতিমণ্ডলী মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট হীরকখণ্ড বিদ্যমান্, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে নীত হীরকখণ্ডগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রসিদ্ধ হীরকখণ্ডগুলি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত Encyclopaedic Dictionary হইতে উদ্ধৃত হইল ;—

"Among the celebrated diamonds in this world may be mentioned the following :—

(*i*) Great Moghul—found in 1550 in Golconda and seen by Tavernier ; weighed 134 carats,

(*ii*) Russian—taken from a Brahmanical idol by a French soldier, sold to the Empress Catharine for £ 90,000 and an annuity of £4,000, weighed 194 carats.

(*iii*) Pitt—brought from India by Mr. Pitt, the grand-father of the Earl of Chatham, sold to the regent Duke of Orleans in 1717 for £ 135,000, weighed, when rough, 400 carats. Napoleon placed it on the hilt of his sword.

(*iv*) Kahinoor—seen by Tavernier in 1665 in the possession of the Great Moghul.

কোহিনুর আয়তনে কম হইলেও দীপ্তিতে এখনও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং রুষীয় (Russian) হীরক আয়তনে বৃহত্তম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অভিলাষার্থ-চিন্তামণি।

—:০:—

'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষার্থ-চিন্তামণি' সংস্কৃত ভাষায় রচিত একখানি অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি ইংরাজী 'সাইক্লোপিডিয়া' বা বিশ্বকোষ-জাতীয়। অভিলষিত সমস্ত বিষয়েরই বিবরণ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার অভিলষার্থ-চিন্তামণি এই নামকরণ হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে একমাত্র অগ্নিপুরাণে এইরূপ নানাবিষয়ের একত্র সঙ্কলন পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু মানসোল্লাস বা অভিলাষার্থ-চিন্তামণিতে অগ্নিপুরাণে অমুক্ত বহু বিষয়ের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থকে সংস্কৃত জ্ঞান-ভাণ্ডারের সারসংগ্রহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা মনে করেন, বর্ত্তমানকালের সাইক্লোপিডিয়া-সমূহের ন্যায় গ্রন্থ প্রাচীন সংস্কৃত লেখকদিগের কল্পনার অতীত ছিল, তাঁহাদিগের ভ্রান্তি-অপনোদনের জন্য এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইল।

এই গ্রন্থ ১০৫১ শকাব্দে বা ১১২৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। পুণার ডেক্যান কলেজের প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রহালয়ে এই গ্রন্থের, তালপত্রে লিখিত দুইখানি অনু-লিপি আছে। তন্মধ্যে একখানি সম্পূর্ণ—অপরখানি অসম্পূর্ণ। তাঞ্জোরের সরস্বতী-মহাল নামক পুস্তকাগারেও মানসোল্লাসের কয়েকখানি হস্তলিপি আছে। মহারাষ্ট্রপতি চালুক্যবংশীয় "ভূলোকমল্ল"-উপাধিধারী তৃতীয় সোমেশ্বর মহারাজ এই গ্রন্থের রচয়িতা। সোমেশ্বর ১০৪৮ শকাব্দ হইতে ১০৫৯ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান নিজামরাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণ নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি একাদশ-বর্ষমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ স্বল্পকালের মধ্যে তিনি এক দিকে দক্ষিণে আন্ধ্র, দ্রাবিড় ও উত্তরে মগধ ও নেপাল রাজ্য জয় করিয়া "ভূলোকমল্ল" উপাধি-ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অন্য দিকে অভিলাষার্থ-চিন্তামণির ন্যায় গ্রন্থ-রচনাদ্বারা বিদ্বৎসমাজের নিকট "সর্ব্বজ্ঞ ভূপ"—এই গৌরবকর আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ সোমেশ্বর স্বীয় গ্রন্থখানি সরল অনুষ্টুপ ছন্দে রচনা-পূর্ব্বক উহাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক খণ্ড আবার ২০টি করিয়া অধ্যায়ে বা উপবিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমখণ্ডে, যে সকল গুণে রাজ্যলাভ করা যায়, তাহার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে অনৃত-ত্যাগ, পরপীড়ন-প্রভৃতির

বর্জ্জন, জিতেন্দ্রিয়তা, মহানুভবতা, সৌজন্য, ঈশ্বরে ভক্তি, পরোপকার; অনাথ, পঙ্গু, দুস্থ ব্যক্তিদিগকে ও স্বপক্ষীয়দিগকে অন্ন-দান ও আশ্রয়-দান প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রশংসাপূর্ব্বক রাজ্যলাভ-ব্যাপারে ঐ সকলের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খণ্ডে লব্ধরাজ্যের রক্ষা বা দৃঢ়তাসম্পাদনের উপায়াবলী বর্ণিত হইয়াছে। তৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার নীতিশাস্ত্র-কথিত রাজ্যের সপ্তাঙ্গের বর্ণনা বা আদর্শ নরপতি, তাঁহার মন্ত্রিসমাজ, পুরোহিত, জ্যোতির্ব্বিদ্‌, কোষ, ধনাহরণের উপায়, সৈন্য-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের পর, নরপতিগণ যে সকল সুখোপভোগের অবসর লাভ করিয়া থাকেন, তৃতীয়খণ্ডে তাহার বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। তদুপলক্ষে মনোহর রাজপ্রাসাদ, জলক্রীড়া, অভ্যঞ্জন, বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার-ভূষণাদির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। চতুর্থখণ্ডে চিত্তের প্রফুল্লতাসাধক ও মনের আনন্দ-বিধায়ক নানাপ্রকার ক্রীড়ার বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে সামরিক ব্যূহা-ভ্যাস, অশ্বারোহণ, গজশিক্ষা, মল্লবিদ্যা, কুক্কুটযুদ্ধ, শ্বানশিক্ষা, কবিতা-রচনা, সঙ্গীত-শিক্ষা, বিবিধ নৃত্য-কৌশল ও বহুপ্রকার ললিত কলার বর্ণনা প্রভৃতিই প্রধান। শেষ বা পঞ্চমখণ্ডে উদ্যান-বিহার, প্রান্তর-ক্রীড়া, বনবিহার, পর্ব্বত-ক্রীড়া, পুলিনবিহার, রতিশাস্ত্র ও অন্য নানাপ্রকার ক্রীড়ার বর্ণনা করা হইয়াছে। ফল কথা, রাজনীতি, জ্যোতিষ (সিদ্ধান্ত ও ফলিত), ন্যায়, অলঙ্কার, ছন্দঃ, গান্ধর্ব্ববিদ্যা, চিত্রকলা, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ অশ্বশিক্ষা, গজশিক্ষা, শ্বানশিক্ষা, মৃগয়া, শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে যাহা কিছু আছে, তৎসমূহেরই মূলতত্ত্বগুলি আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। পঞ্জিকা-গণনা-ক্রম-সম্বন্ধে উপদেশ-কালে, ১০৫১ শকাব্দের চৈত্র শুক্লাপ্রতিপৎ শুক্রবার দিবসে গ্রহ-নক্ষত্রাদির যেরূপ সংস্থান ছিল, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কারণে ঐ অব্দকেই আমরা এই গ্রন্থের রচনার কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

রাজনীতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে সকল দেশের ও স্থানের উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহার একটি তালিকা এস্থলে প্রদত্ত হইল :—

১। সিংহল।	৬। বিন্ধ্যপর্ব্বত।
২। বারবাটক।	৭। তাপ্তীতট।
৩। কলিঙ্গ।	৮। যবন দেশ।
৪। কোশল।	৯। কম্বোজ।
৫। হিমালয়।	১০। পোদালপুর।

১১। মতাঙ্গাত্রি।	২৩। চীর পল্লী।
১২। পৌণ্ড্রক।	২৪। নাগপত্তন।
১৩। সুরাষ্ট্র।	২৫। চোলদেশ।
১৪। বেরাগদ।	২৬। অল্লিকাপুর।
১৫। সোপার।	২৭। অনিলাবাড়।
১৬। পারসীক।	২৮। মূলস্থান।
১৭। বর্ব্বর। (*Barbary ?*)	২৯। তোণ্ডীদেশ।
১৮। কালপুর।	৩০। পঙ্কপট্টন।
১৯। আন্ধ্র।	৩১। চীন।
২০। তুম্বরু।	৩২। বেঙ্গীদেশ।
২১। রাবণগঙ্গা।	৩৩। ভাবাপট্টন।
২২। সিন্ধুদেশ।	৩৪। অপরান্ত।

গ্রন্থকার অষ্টপ্রকার দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—১। জলদুর্গ, ২। গিরিদুর্গ, ৩। পাষাণদুর্গ, ৪। ইষ্টকাদুর্গ, ৫। মৃত্তিকাদুর্গ ৬। বনদুর্গ, ৭। মরুদুর্গ, ৮। নরদুর্গ। এই সকল দুর্গের বিস্তৃত বিবরণ অন্যান্য নীতিগ্রন্থেও আমরা দেখিতে পাই। মনুসংহিতায় ষড়্‌বিধ মাত্র দুর্গের উল্লেখ আছে।

সৈন্যদিগেরও অষ্টপ্রকার বিভেদ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—মৌলসেনা (পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ভূমি-বৃত্তি-ভোগকারী সৈন্য) ভূতসেনা (Standing army) মৈত্র সেনা (মিত্ররাজার সৈন্য) শ্রেণসেনা (Garrison) আটবিক সেনা (বন্য নিষাদ ও ম্লেচ্ছজাতীয় সৈন্য) অমিত্র বা দ্বিষৎ সেনা (উৎকোচাদির দ্বারা ও ভেদ-নীতির বলে আনীত শত্রুপক্ষীয় সৈন্য) অর্থাধীন সেনা (ভাড়াটিয়া Mercinary) বন্ধু সেনা (Camp followers)। ইহার মধ্যে শেষোক্ত চারিপ্রকার সৈন্যকে নিকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ-পূর্ব্বক শত্রুমুখে স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে!

অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনায় গ্রন্থকার প্রায় বিংশতি প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—খচর্ম্ম (ঢাল) কুন্ত, (বল্লম) সেল্লচক্র (?), ছুরিকা, যন্ত্রমুক্তায়ুধ, পাষাণপাতি-(ক্ষেপক) যন্ত্র, খড়্গ, ধনুর্ব্বাণ, শক্তি, তোমর, নিঃস্ত্রিংশ, মুদ্গর, প্রাস, পট্টিশ, অগ্নিতৈলসিক্ত বাণ, চক্র, পাশ, পরশু, গদা শূল, লবী। যন্ত্রমুক্তায়ুধ বলিলে যন্ত্র-সাহায্যে মুক্ত বা নিক্ষিপ্ত হয় যে আয়ুধ, তাহাকেই বুঝায়, কিন্তু সে আয়ুধ কি প্রকার? সে যন্ত্রই বা কি প্রকার তাহার বিশদ বর্ণনা গ্রন্থমধ্যে দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, "যন্ত্রমুক্তায়ুধ" বন্দুক হওয়াই সম্ভবপর। পাষাণপাতি

যন্ত্র প্রাচীন রোমানদিগের ক্যাটাপুল্ট যন্ত্রের অনুরূপ হইতে পারে। অগ্নিতৈলের উল্লেখ গ্রীকবীর সেকান্দরের সমকাল ও পরকালবর্ত্তী যুনানী লেখকগণের ভারতবর্ষ বিষয়ক বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

Ctisias, Elian and Philastratus, all speak of an oil manufactured by the Hindus and used by them in warfare in destroying the walls and battlements of towns that no battering rams or other poliostic machines can resist it, and that "It is inextinguishable and nsatiable burning both arms and fighting.—The Hindu superiority p. 363.

এই তৈলই কি অভিলাষার্থ-চিন্তামণির অগ্নি-তৈল? তৎকাল-প্রচলিত বিবিধ বাদ্য যন্ত্রেরও নাম এই গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়; যথা :—

১। ভেরী (ঢোল)।	১১। হুড়ুকা।	২১। অশ্বঘড়স।
২। তূর্য্য।	১২। ঢক্কা।	২২। টেকুলী।
৩। কালহা।	১৩। ঘড়স।	২৩। ঢক্কাঢস।
৪। শঙ্খ।	১৪। করডা।	২৪। নিঃসাণ।
৫। মহাভেরী।	১৫। মর্দ্দলা।	২৫। তবকা।
৬। পটহ।	১৬। ত্রিবলি।	২৬। তাল।
৭। দুন্দুভি (দামামা।)	১৭। ডমরু।	২৭। ঘণ্টা।
৮। ডিম।	১৮। ভুঙ্গা।	২৮। জয়ঘণ্টিকা।
৯। জয়তূর্য্য।	১৯। কুড়কা।	২৯। বীণা।
১০। বহুটকা।	২০। সেকুকা।	৩০। তন্ত্রী।
		৩১। কাংস্যতাল।

রাজ্যব্যবস্থার বর্ণনাপ্রসঙ্গে রাজার আটজন সচিবের উল্লেখ আছে। সামন্তরাজা ও তদধীন মহামণ্ডলেশ্বর, দশগ্রামাধিপতি ও গ্রামাধিপতিগণ প্রাচীনকালেরই মত সেকালেও ছিলেন, দেখা যায়। প্রজার নিকট হইতে রাজা করস্বরূপে আয়ের দশমাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে তাহাদের পালন করিবেন, বলা হইয়াছে। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে আমরা ষষ্ঠাংশ করের উল্লেখ দেখিতে পাই। অভিলাষার্থ-চিন্তামণির নির্দ্দেশানুসারে, মহারাজ সোমেশ্বরের সময়ে অন্ততঃ মহারাষ্ট্র দেশে দশমাংশ-মাত্র কর গৃহীত হইত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

অশ্বের নামাবলীর মধ্যে—"তেজী" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই শব্দটি পারসী

ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, মুসলমানেরা দেশাক্রমণকারিরূপে ভারতে আসিবার পূর্ব্বে অশ্ব-ব্যবসায়িরূপে এদেশের লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কুস্তীর আখড়াকে "আখাড়ক," হাতীর মাহুতকে "মহামাত্রক" বলা হইয়াছে।

রাগরাগিণীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে কানাড়ী, হিন্দী, বাঙ্গালা, মারাঠী, ও লাটী প্রভৃতি বিবিধ দেশীয় ভাষায় রচিত পদাবলীর অংশবিশেষ উদাহরণস্বরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে বঙ্গীয় পদাংশের একটি নমুনা এস্থলে উদ্ধৃত হইল;—

"যে ব্রাহ্মণের কুলে তুপজীব্যা কাত্তবীর্য্যা জেণে—বাহু ফরসে খাণ্ডিয়া পরসরাম্ দেউ তো মহামঙ্গল করউ।

মহারাজ সোমেশ্বরের সময়ে বা খ্রীষ্টীয় ১১২৯ অব্দে বঙ্গভাষায় রচিত পদাবলী মহারাষ্ট্রদেশে কৃষ্ণাতীর পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছিল, এ সংবাদ অনেকের নিকট নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু সেকালে এক্ষনকার মত রেলপথের সদ্ভাব না থাকিলেও ভারতবর্ষের দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, 'অভিলাষার্থ'-চিন্তামণিতে উদ্ধৃত বঙ্গীয় পদ তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ বল্লাল সেন সমিথিল বঙ্গভূমি শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের অন্যূন শতাব্দীকাল পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আরব্ধ হইয়াছিল ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খরবেগে হ্রাস পাইতেছিল। উদ্ধৃত বঙ্গীয় পদাংশে পরশুরামের কীর্ত্তি যেরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, উহা দশাবতার-স্তোত্রের একাংশ হইতে পারে। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, জয়দেব গোস্বামীই দশাবতার-স্তোত্র-রচনার প্রথম পথিপ্রদর্শক নহেন— তাঁহার পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় রচিত দশাবতার-স্তোত্র প্রচলিত ছিল।*

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

* সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর 'প্রণীত-দক্ষিণাপথের প্রাচীন ইতিহাস' (The History of the Deccan down to the Mohomedan Conquest) নামক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে বি এ মহোদয় লিখিত ও মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে এই প্রবন্ধটি রচিত হইল। বোম্বাই-প্রবাসী কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি পুণার ডেক্কান কলেজের পুস্তকাগারে গমন-পূর্ব্বক অভিলাষার্থ-চিন্তামণির হস্তলিপি হইতে উদ্ধৃত অন্যান্য বঙ্গীয় পদাবলী-সমূহ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ তাঁহার নিকট চির ঋণী থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

মৃত্যু-মিলন।

—:*:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কুঞ্জগৃহে।

—:*:—

রাজার ভাবনার উপর আর এক ভাবনা উপস্থিত হইল—তিনি ভ্রাতৃজায়ার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন?

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি এই চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন। সন্ধ্যার পর মন্ত্রী দর্শন-প্রার্থী হইলেন। রাজা যেন সুস্থ বোধ করিলেন; এই চিন্তা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। মন্ত্রী কয়টি আবশ্যক কার্য্যে রাজার পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া আপনার আগমনের কারণ জানাইলেন—মূল কথা বিবৃত করিলেন।

রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকল বিষয়-সংক্রান্ত কাগজপত্র আনিয়াছেন কি?"

মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "অনেক কাগজ দেখিতে হইবে। আপনার কখন দেখিবার সুবিধা হইবে? আমি কি সে সব রাখিয়া যাইব?"

"কায শেষ করাই ভাল। আপনার যদি অসুবিধা না হয়, তবে এখনই কায আরম্ভ করা যায়।"

মন্ত্রী রাজার কার্য্য-নিষ্ঠায় বিস্মিত হইলেন। তিনি যাইয়া আবশ্যক কাগজ-পত্র আনাইলেন।

তাহার পর দুইজনে সেইসকল বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া মন্ত্রী দুই একবার বলিলেন, "আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাইতেছি। যদি অনুমতি হয়, আমি আবার আগামী কল্য আসিব।" উত্তরে রাজা বলিলেন, "না। কায শেষ করা যাউক।" অগত্যা মন্ত্রী আর কিছু বলিলেন না। রাজার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল;—ভৃত্যগণ দুই একবার আসিয়া ফিরিয়া গেল। রাজা নিবিষ্টচিত্তে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

যখন কার্য্য শেষ হইয়া গেল, তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। কার্য্য শেষ করিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "আপনাকে আজ বড় কষ্ট দিলাম। কখন অবসর হয় না হয়—সেই জন্য আজই কায শেষ করিয়া দিলাম।"

মন্ত্রী বিদায় লইলেন।

সে দিন অতিরিক্ত শ্রান্তিপ্রযুক্ত রাজা অল্পক্ষণেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাজা আবার ভাবিতে লাগিলেন,—তিনি যে ব্যবস্থা স্থির করিলেন, তাহারই বা কি করিবেন?

ভাবিতে ভাবিতে তিনি অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। অশ্ব সজ্জিত হইলে তিনি বিরাম-বাটিকা পরিদর্শনে গমন করিলেন।

চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে গেল।

শেষে উপায়ান্তর বিহীন হইয়া তিনি স্থির করিলেন, রাণীকে এ কথা বলিতেই হইবে। সেই কার্য্যেই তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার কোন কার্য্যে, ভাবে বা অভাবে রাণীর কোনরূপ আকর্ষণ ছিল না। তাহা তিনি জানিতেন। সেই জন্যই তিনি দুই দিন ভাবিতেছিলেন, কিরূপে রাণীকে এ বিষয়ের জন্য বিরক্ত না করিয়া কার্য্য শেষ করিতে পারেন। তিনি রাণীর ভাব জানিয়া তাঁহাকে যথাসম্ভব আপনার কার্য্যে নির্লিপ্ত রাখিতে সচেষ্ট হইতেন। এখনও তিনি কেবল ভাবিতেছিলেন—কিরূপে সেই চেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। রাণী কি ভাবিবেন? তিনি হয় ত বিরক্ত হইবেন। এইরূপ নানা চিন্তায় রাজা চিন্তিত ছিলেন।

আশ্রম-গৃহসংলগ্ন ভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজা বহুক্ষণ উপায়-চিন্তা করিলেন। কিন্তু কোনরূপ উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। তখন অগত্যা রাণীকে একবার বলিয়া দেখিবেন, স্থির করিয়া রাজা প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

প্রাসাদে ফিরিতে ফিরিতে আবার ভাবনা হইল,—রাণী প্রকাশ্য অসম্মতি নাও জানাইতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁহার কথায় বা ভাবে অসম্মতির চিহ্ন প্রকাশ পায়, তখন কি করা কর্ত্তব্য হইবে?

ভাবিতে ভাবিতে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

সেই দিন রাজা তাঁহার বিশ্রামগৃহ ও শুদ্ধান্তের মধ্যবর্ত্তী উদ্যান অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দুই দ্বার অতিক্রম করিয়া তিনি বেত্রধারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণী কোথায়?"

বেত্রধারিণী জানাইল, রাণী উপবনে গিয়াছেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, রাণী উদ্যানে—একাকিনী; উমা ভ্রাতৃ-গৃহে—শঙ্করসিংহের অনুপস্থিতিতে উমা প্রায়ই পিত্রালয়ে যায়।

উপবনে প্রবেশ করিয়া রাজা ইতস্ততঃ রাণীর সন্ধান করিলেন তাঁহাকে না পাইয়া তিনি ক্রমে উদ্যান-প্রান্তস্থিত কুঞ্জগৃহে উপনীত হইলেন।

সেই কুঞ্জগৃহের মধ্যস্থলে একটি মর্ম্মর-নির্ম্মিত আধারে একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম প্রস্রবণ স্বচ্ছ সলিল উদ্গীর্ণ করিতেছিল—জল বহুধারায় উঠিয়া আধারে পড়িতেছিল। তাহারই পার্শ্বে দুইজনের উপবেশনজন্য দীর্ঘ মর্ম্মরের আসনে রাণী বসিয়া ছিলেন। আধারের জলে তাঁহার বেষ্টন-সংস্থাপিত—নিতান্তলাক্ষারসরাগ-লোহিত চরণের প্রতিবিম্ব কম্পিত হইতেছিল। চারিপার্শ্বে মন্দানিলাকুলিত-চারুশাখ গুল্ম। কুঞ্জমধ্যে পবন স্নিগ্ধস্পর্শ—সুখদ; রবিকর সযত্নে অপসারিত।

রাজা প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি রাণীর আননে অদৃষ্টপূর্ব্ব স্নিগ্ধলাবণ্যসঞ্চার লক্ষ্য করিলেন। তিনি ভাবিলেন, সে স্নিগ্ধ লাবণ্য কোমল আলোকপাতের ফল। তিনি অগ্রসর হইয়া আসিলেন। সহসা তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া রাণীর নয়নে যে উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল তিনি তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

আজ সহসা অন্তঃপুরে সম্মুখে রাজাকে দেখিয়া রাণী হৃদয়ে যে পুলক-কম্পন অনুভব করিলন—কই প্রথম প্রিয়সমাগমকালের পর আর ত তিনি তাহা অনুভব করেন নাই।

রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "উপবেশন কর। আমি একটু আবশ্যক কার্য্যে আসিয়াছি।"

রাণী বসিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, রাজাও বসিবেন। হায়—আশা কি সামান্য ভিত্তির উপর বিরাট প্রাসাদ রচিত করে! কিন্তু রাণীর হিসাবে ভুল হইয়াছিল।

রাজা দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাণীর একবার ইচ্ছা হইল, রাজাকে বসিতে বলেন। কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটিল না। আজ কত দিন—হায় কত কাল—স্বামী-স্ত্রীর সেরূপ ঘনিষ্ঠভাব গিয়াছে! এত দিনের অভ্যাস এক দিনে যায় না। রাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন—উভয়ের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ, অথচ—! রাজা বলিলেন, "আমি

তোমাকে একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছি। অন্য উপায় থাকিলে আমি তোমাকে বিরক্ত করিতাম না।"

রাণী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজার এই কথায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল।

রাজা বলিলেন, "অজয় বিবাহ করিয়াছে।"

রাণী বিস্মিতভাবে রাজার মুখে চাহিলেন। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইলেই রাণীর দৃষ্টি নত হইয়া পড়িল।

রাজা পুনরায় বলিলেন, "অজয় আমাকে না জানাইয়া বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু আমি এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষী; কারণ, অজয় স্বয়ং দেখিয়া—ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে।"

রাণীর হৃদয়ে যেন বেদনার হিল্লোল বহিয়া গেল। ভালবাসা! ভালবাসার সুখলাভ যাহার ভাগ্যে ঘটে না—দুঃখলাভমাত্র সার হয়; যে কুসুম চয়ন করিতে পারে না—কেবল কণ্টকাঘাত ভোগ করে, তাহার মত দুঃখী কে? যে বহুদিন পরে আপনার সে দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার দুঃখের অন্ত নাই।

রাজা বলিলেন, "বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমি উভয়ের প্রকৃত মনোভাব অবগত হইতে ইচ্ছা করি। সেই জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। আগামী কল্য তোমার কোন আবশ্যক কার্য্য আছে কি?"

রাণী শিরঃ-সঞ্চালনে জানাইলেন,—না। তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, স্বামীর চরণে পতিতা হইয়া বলেন,—তোমার নির্দ্দিষ্ট—তোমার অভিপ্সিত কার্য্য অপেক্ষা আমার আর কোন কার্য্য বড়?

কতকগুলি ভূমিচম্পক-গুল্ম প্রস্রবণাধার বেষ্টিত করিয়া ছিল। তাহাদের একটি অসময়ে কুসুমশীর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—প্রস্ফুটোন্মুখ কোরক কেবল লজ্জারক্ত হইতেছিল। রাজা সেইটিকে নাড়িতে নাড়িতে আপনার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। রাণী নিবিষ্টচিত্তে—মুগ্ধভাবে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

সে কথা শেষ করিয়া রাজা বলিলেন,"বোধ হয় তোমাকে বুঝাইতে পারিয়াছি, এ কার্য্য তোমার সাহায্য ব্যতীত নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব; তাই অনন্যোপায় হইয়া আমি তোমাকে বিরক্ত করিলাম। তোমার সুবিধা হইবে কি?"

রাণী বলিলেন "হাঁ।" তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার মনের ভাব যদি তিনি কথায় প্রকাশ করিতে পারিতেন, তবে তিনি বলিতেন,—

তোমার কার্য্যে আমার অসুবিধা। আমি কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইব, তোমার আদেশপালন করিতে পাইলেই আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি,? হে বাঞ্ছিত—হে ঈপ্সিত—হে প্রিয়,—আমি কোন্ উপায়ে তোমার হৃদয়ে স্থান পাইব? তুমি বলিয়া দাও, কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করিলে আমার পূর্ব্বপাপের ক্ষয় হইবে।

রাজা ফিরিয়া যাইলেন। রাণী এতক্ষণে কেবল একবার একটি ক্ষুদ্র কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা যে কথার পথ রুদ্ধ করিতেছিল, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, রাণীর এই বাক্ কার্পণ্য তাঁহার সেই পরিচিত ভাবের বিকাশমাত্র। তাঁহার কার্য্যে রাণীর ইচ্ছা বা আপত্তি কিছুই নাই—অনুরাগ বা বিরাগ নাই। তবে যে তিনি আজ এ কার্য্য করিতে সম্মতা হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় রূঢ়তা পরিহারের জন্য।

রাজা চলিয়া যাইলেন;—রাণী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ের যাতনা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

রাজা কুঞ্জগৃহের বাহিরে গমন করিলে রাণী রাজার অঙ্গুলিপৃষ্ট উদ্ভেদোন্মুখ ভূমিচম্পক কোরকটি তুলিয়া লইলেন,—অসীম আবেগে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। সে-ও তাঁহার অপেক্ষা ভাগ্যবান; সে রাজার আদর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। আর তিনি—? তাঁহার জীবন বৃথা।

তাহার পর তিনি বিহ্বল ভাবে রাজার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি কেন আমাকে তোমার কার্য্য করিতে আদেশ দিলে না? তোমার আদেশ-পালনে আমার কত সুখ! যেথায় তুমি প্রভু, তুমি স্বামী—সব তোমার সেথায় তুমি কুণ্ঠিতভাবে আসিলে কেন? সে স্থানে তুমি আদেশকর্ত্তা না হইয়া অনু-গ্রহাকাঙ্ক্ষিরূপে দেখা দিলে কেন? কেন আমার কাতর হৃদয়ে এ শেল বিদ্ধ করিলে? আমার এ দুঃখ যে মরিলেও যাইবে না! আমি অপরাধ করিয়াছি; তুমি দয়াময়, তুমি কি ক্ষমা করিবে না? আজ এ রাজ্যের দীন প্রজাও তোমার দয়ায় বঞ্চিত নহে—কেবল কি আমি সে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব না? আমার অপরাধ পদে পদে। সে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা না করিলে আর কে করিবে?"

রাণীর চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বহিল।

সন্ধ্যার সময় উমা ভ্রাতৃগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিল;—আসিয়া শুনিল, রাণী উপবনে। সে কুঞ্জগৃহে আসিয়া দেখিল, গৃহ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে—রাণী নির্ঝরকূলে শিলাসনে উপবিষ্টা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আত্ম-পরিচয়।

—:*:—

রাজার নিকট হইতে অজয় সিংহ ভাবিতে ভাবিতে প্রাসাদের তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশে ফিরিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, শক্তসিংহকে কি বলিবেন? রেবার নিকট কিরূপে আত্ম-পরিচয় দিবেন? রাজা কি জন্য রেবাকে আনিতে বলিলেন?

এইরূপ বিবিধ চিন্তায় অজয় সিংহের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। অজয় সিংহ কখনও এরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েন নাই। তিনি চিন্তা-সাগরে কূল পাইতেছিলেন না।

পরদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; অপরাহ্নে অশ্ব সজ্জিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে শক্ত সিংহের গৃহে চলিলেন। পথ হইতে দূরে সমীরান্দোলিত, পরিচিত দ্রুমশীর্ষ দেখিয়া সে ভাবনা দূর হইয়া গেল—হৃদয় প্রিয়দর্শনলালসায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রেম অন্ধকারকেও উজ্জ্বল করিয়া তুলে; নিরসকে সরস করে, চিন্তার যাতনা দূর করে; বিষাদের বিষদন্ত উৎপাটিত করে। তিনি যতই সেই গৃহের নিকটে আসিতে লাগিলেন, ততই হৃদয় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি শক্ত সিংহকে বলিলেন, রাজধানীতে তাঁহার কোন আত্মীয়গৃহে কর্ম্মোপলক্ষে পরদিন রেবার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। পরদিন সেই গৃহ হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন। তিনি সেই কথা বলিতে আসিয়াছেন।

শক্ত সিংহ কন্যাকে প্রেরণপক্ষে কোন আপত্তি করিলেন না। অজয় সিংহ নিশ্চিন্ত হইলেন।

অজয় সিংহ সেই দিনই প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, মনে করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু শক্ত সিংহের গৃহের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারিলেন না। সে রাত্রিও তিনি প্রসাদে অনুপস্থিত রহিলেন।

সেই রাত্রিতে রেবা তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল। কোথায় যাইতে হইবে? যাঁহাদিগের গৃহে যাইতে হইবে, তাঁহারা কে? সে গৃহে কে কে

আছেন? তাঁহারা না জানি কি বলিবেন? রেবা স্থির করিয়াছিল, তাঁহারা অতি উত্তম লোক; কেন না, তাঁহারা তাহার স্বামীর আত্মীয়। তাঁহাদিগের দর্শনাশায় রেবা উৎফুল্লা হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রেবার সেই নিশ্চিন্ত প্রফুল্লতা তাহার স্বামীর হৃদয়ে সংক্রমিত হইল। তাঁহার হৃদয় হইতে অনিশ্চিত আশঙ্কার ছায়া দূর হইয়া গেল।

তাহার পর দুইজনে কত কথা হইতে লাগিল! প্রেমিকপ্রেমিকার কথা;—সে কথা কি ফুরায়! দেখিতে দেখিতে রাত্রি শেষ হইয়া উঠিল। এ উহার অনিদ্রায় শঙ্কিত; এ উহাকে ঘুমাইতে অনুরোধ করে। কিন্তু আবার কথা আসিতে লাগিল, ফলে কাহারও নিদ্রা হইল না; কিন্তু কাহারও নিদ্রার প্রয়োজন অনুভূত হইল না!

প্রভাতে অজয় সিংহ বিদায় লইলেন।

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "নিমন্ত্রণগৃহে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ত?"

"হইবে"—বলিয়া অজয় সিংহ পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া যাত্রা করিলেন। তিনি সে গৃহ হইতে যত দূরে যাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে আবার আশঙ্কার ছায়াপাত হইতে লাগিল।

সেই দিন মধ্যাহ্নে প্রাসাদ হইতে দুইখানি শিবিকা শক্ত সিংহের গৃহে আসিল। উমা রেবাকে লইতে আসিল, উপদেশানুসারে উমা অজয় সিংহের প্রকৃত পরিচয় দিল না। রাণী এ বিষয়ে তাহার সহিত বিশেষরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন। তিনি একার্য্যে যেরূপ উৎসাহ দেখাইতেছিলেন, উমা বহুদিন কোন কার্য্যে তাঁহার সেরূপ উৎসাহ লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু সে ইহার কারণ জানিত না। রাজা তাঁহাকে যে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, সে কার্য্য করিতে রাণী এখন পরম আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন।

অন্তঃপুরের যে পথে আমরা একদিন ছদ্মবেশধারী রাজাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম, সেই পথে অপরাহ্নে দুইখানি শিবিকা শুদ্ধান্তের উপবনে প্রবেশ করিল। রেবা পতিগৃহে আসিল। পাছে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করে, সেইজন্য সাধারণ শিবিকা ব্যবহৃত হইয়াছিল; বাহকগণও অতি সাধারণ বেশে সজ্জিত ছিল। বাহকগণ চলিয়া যাইলে উমা বাহির হইয়া দ্বার বন্ধ করিল, তাহার পর রেবাকে বাহির হইতে বলিল।

রেবা বাহির হইয়া দেখিল, সে অতি রমণীয় উপবনে উপস্থিত; উপবন মধ্যে অট্টালিকা—অতি উচ্চ—নয়নারাম। রাজার পিতা অন্তঃপুরের একাংশে আবশ্যক

কক্ষাদি নির্ম্মিত করাইয়া সেই অংশ কনিষ্ঠপুত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সে অংশও সুসজ্জিত ছিল, কিন্তু সে অংশ ব্যবহৃত হয় নাই। অকৃতদার অজয় সিংহের অন্তঃপুরে কি প্রয়োজন? রাণী সেই সকল বদ্ধ কক্ষের দ্বার মুক্ত করাইয়া গৃহসজ্জা পরিস্কৃত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। উমা রেবাকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদের সেই অংশে গমন করিল।

অজয় সিংহ জীবনে এই প্রথম অন্তঃপুরে কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া রেবা গৃহ-সজ্জা দেখিয়া বিস্মিতা হইল—সকল দ্রব্যই কারুকার্য্যবহুল—সকল দ্রব্যই বহুমূল্য। কিন্তু গৃহ যেন জনশূন্য! কই কেহই ত তাহার অভ্যর্থনা করিল না! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রেবা উমার অনুসরণ করিয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উঠিল। তথায় অজয় সিংহ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

উমা চলিয়া গেল।

রেবা মৃদুস্বরে অজয় সিংহকে জিজ্ঞাসা করিল, "গৃহের সকলে কোথায়?

অজয় সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "এই স্থানে।"

রেবা বিস্ময়বিহ্বল ভাবে পতির দিকে চাহিল।

অজয় সিংহ হাসিতে লাগিলেন।

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে যাঁহাদিগের গৃহে আনিলে, তাঁহাদিগকে ত দেখিতেছি না! তাঁহারা কোথায়?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "তাঁহারা পার্শ্বস্থ গৃহে আছেন।"

রেবা মুগ্ধনেত্রে গৃহসজ্জা দেখিতে দেখিতে বলিল, "এ গৃহের সবই বহুমূল্য দেখিতেছি। এ গৃহ কাহার?

অজয় সিংহ বলিলেন, "তোমার।"

এবার রেবা হাসিল—সে হাসি অবিশ্বাসের। সে ভাবিল, তাহার স্বামী তাহার সহিত রহস্য করিতেছেন;

রেবা হাসিতে হাসিতে বলিল, "সত্য বল,—এ গৃহ কাহার?"

অজয় সিংহ আবার বলিলেন, "সত্য বলিতেছি,—তোমার।"

রেবা তখনও ভাবিল, তাহার স্বামী রহস্য করিতেছেন। সে আবার বলিল, "রহস্য রাখ। সত্য বল, এ গৃহ কাহার?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "আমার গৃহ কি তোমার গৃহ নহে?"

রেবা বহুমূল্য গৃহসজ্জার দিকে চাহিল, বাহিরে মনোরম উদ্যান দেখিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন কোন মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে। একি স্বপ্ন! সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার পর সে বলিল, "এ গৃহ কি তোমার?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "হাঁ।"

"এযে প্রাসাদ! এই তোমার গৃহ?"

অজয় সিংহ হাসিতে লাগিলেন।

রেবা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি সৈনিক নহ?"

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন, "আমি সৈনিক।"

"তবে এ প্রাসাদ কাহার?"

"আমার।"

রেবা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে ক্রমেই অধিক বিস্মিতা হইতে লাগিল। তাহার নয়ন-যুগল জলে ভরিয়া আসিল। সে বলিল, "তুমি কি আমাকে সত্য কথা বলিবে না?"

সৈনিক তাহার সেই অশ্রুসজল নয়ন দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, "প্রাসাদের এই অংশ আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট। আমি রাজার ভ্রাতা—অজয় সিংহ।"

অজয় সিংহ! যিনি প্রেমলাভ ঘটিবে কি না, সন্দেহ করিয়া বহু রাজকুমারীর সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সেই আদর্শ-পুরুষ—সেই বীর—সেই কবি অজয়সিংহ তাহার জীবন সার্থক—ধন্য করিয়াছেন! মুহূর্ত্তের জন্য রেবা চেতনাহীন মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর অপ্রত্যাশিত আনন্দের আতিশয্যে পতির বক্ষে মুখ লুকাইয়া আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

অজয় সিংহ সেই কোমলা কনকলতাকে বক্ষে ধরিয়া ধরায় অমরার সুখ অনুভব করিলেন।

তাহার পর—আনন্দের প্রথম প্লাবন প্রশমিত হইলে অজয় সিংহ পত্নীকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। তিনি যে রাজাকে না জানাইয়া বিবাহ করিয়াছেন; রাজা যে এ কথা জানিতে পারিয়াছেন, দুই ভ্রাতার যে কথোপকথন হইয়াছে; রাজা যে আদেশ করিয়াছেন, অজয় সিংহ একে একে রেবাকে সে সকল কথা বলিলেন।

অজয় সিংহ বলিলেন, "রাজা আজ কি জন্য তোমাকে আনিতে বলিয়াছেন, তাহা আমি অবগত নহি। সম্ভবতঃ তিনি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন।"

রেবা বলিল, "কি জিজ্ঞাসা করিবেন?"

"তাহা ত আমি জানি না। সেই কথাই ভাবিতেছি।"

"সে জন্য ভাবনা কেন? তিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহাই বলিব।" —যিনি স্বামীর ভ্রাতা—যাঁহার যশ আজ রাজ্যের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত—যাঁহার দয়ার কথা আজ লোকপ্রসিদ্ধ—তাঁহার প্রশ্নে ভয় কি? তিনি কি কঠোর হইতে পারেন? রেবা সরলা—প্রেমবিহ্বলা—সে কথা কল্পনাও করিতে পারিল না।

অজয় সিংহ ভাবিলেন, সত্য সত্যই ভাবনা কেন? ভাবিয়া যখন কিছু স্থির জানা অসম্ভব, তখন ভাবনা অনাবশ্যক। বিশেষ রেবাকে তিনি কি শিখাইবেন? রেবার বুদ্ধির ও বিবেচনার পরিচয়ে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, রাজা যাহাই জিজ্ঞাসা করুন, রেবাকে তাহার উত্তর শিখাইতে হইবে না। এইরূপে বিশ্বাসই প্রেমের ফল—প্রেম প্রেমিকজনকে পরস্পরের সম্বন্ধে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসবশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে শিখায়।

কাযেই সে কথা আর আবশ্যক বোধ হইল না।

তখন রেবা বলিল, "তুমি এত দিন আত্মপরিচয় দাও নাই কেন?"

অজয় সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে কি তুমি আমাকে অধিক ভালবাসিতে?"

রেবা উত্তর করিতে পারিল না। অজয় সিংহকে সামান্য সৈনিক জানিয়া সে তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসিয়াছে, তিনি রাজাধিরাজ জানিলে কি সে তাঁহাকে তাহার অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে পারিত? সে যে হৃদয়ের পূর্ণ প্রেম সেই সৈনিককে দিয়াছে—আর ত কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই! সে তাঁহাকে তাহার হৃদয়েশ্বরের আসনে বসাইয়াছে—কোন্ রাজরাজেশ্বরের আসন তদপেক্ষা আদরণীয়; আজ অজয় সিংহ তাহার সমগ্র হৃদয় ব্যাপিয়া বিদ্যমান—তাহা তিনি সৈনিক বলিয়া নহেন—রাজভ্রাতা বলিয়া নহেন; তাহার পতি—তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া। রেবা তাহা বুঝিতে পারিল। সে আর কি উত্তর দিবে?

পাষাণের কথা।

—:০:—

(৬)

পরদিন প্রভাতে অধিকাংশ নগরবাসী অর্চ্চনা করিবার জন্য স্তূপে আসিল। হিমকণ-ধৌত হেমন্ত প্রভাতে নবজাতসূর্য্যকরস্নাত হইয়া দলে দলে কৌষেয়বস্ত্র পরিহিত নগরবাসী স্তূপ দর্শন, প্রদক্ষিণ ও অর্চ্চন করিয়া গেল। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, নবনির্ম্মিত স্তূপের সৌন্দর্য্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল ; নানা দেশ হইতে জনসঙ্ঘ স্তূপদর্শন করিতে আসিল। এইরূপে নবাগতের কোলাহলে কিছুকাল কাটিয়া গেল। কাল-নিরূপণ করিবার ক্ষমতা আমার যদি থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত স্তূপের ইতিবৃত্ত বলিয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে ক্ষমতা আমার নাই। আমার জন্মের প্রথম দিবস হইতে চিত্রশালায় আগমন পর্য্যন্ত সমস্ত কথা বলিতে পারি, কিন্তু কোনও ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কিছুকাল গত হইলে যখন স্তূপ পুরাতন হইল, তখন দর্শকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। প্রতিদিন প্রাতে নিয়মিত সংখ্যক স্থবির ও স্থবিরা স্তূপদর্শন করিতে আসিতেন। ক্বচিৎ কখনও দূরদেশাগত তীর্থযাত্রী তথাগতের শরীর-দর্শন-মানসে নগরে আসিতেন ; সেই দিন বৃদ্ধ মহাস্থবির মহোল্লাসে গর্ভগৃহের দ্বারোন্মোচন করিতে আসিতেন। তিনি স্তূপবেষ্টনীর বহির্ভাগে কাষ্ঠনির্ম্মিত সঙ্ঘারামে বাস করিতেন। একদিন দেখিলাম, পুষ্পচন্দনশোভিত মহাবৃদ্ধ মহাস্থবিরের শবদেহ ভিক্ষুসঙ্ঘ নগরাভিমুখে লইয়া গেল। নগরে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। প্রান্তরমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র নদীতীরে প্রাচীন মহাস্থবিরের দেহ ভস্মীভূত হইল। একদিন শুনিলাম, সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুকগণ রাজপ্রাসাদে আহূত হইয়াছেন, রাজা অগরাজুর অন্তিমকাল উপস্থিত। অগরাজুর মৃত্যু হইল। তাঁহার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল, তক্ষশিলা হইতে সিংহদত্তের নির্ব্বাণ লাভের সংবাদ আসিল। তাহার পরই প্রলয় ঝটিকা উত্থিত হইল।

পতনোন্মুখ যবনজাতিকে, বোধ হয়, সিংহদত্তই দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, স্বভাষাচ্যুত যবনজাতির মধ্যে একতার অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল।

সিংহদত্তই বন্ধনরজ্জুর ন্যায় কাষ্ঠ খণ্ডগুলি একত্র রাখিয়া ছিলেন। সেই রজ্জুর প্রভাবেই যবনগণ শকজাতির প্রথম আক্রমণ রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শকদ্বীপ ত্যাগ করিয়া পঙ্গপালের ন্যায় শকজাতি দলে দলে মহানদী পার হইতেছে, মহানদী আর শকযবনাধিকারের সীমা নাই। কপিশায় শকরাজ্য প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। গান্ধার, উদ্যান, উরস ও টক্কদেশে যবনরাজগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও সিংহদত্তের জন্য—সিংহদত্তের প্রভাবে। সিংহদত্তের অবর্ত্তমানে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে, সে চিন্তা মধ্যদেশের রাজগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। প্রাচীন পৌরবরাজ্যের অধঃপতনে তাঁহারা আনন্দিত হইয়াছিলেন, স্বধর্ম্মত্যাগী সিংহদত্তের প্রভাববৃদ্ধিতে তাঁহারা ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সিংহদত্ত তাঁহাদিগের জন্য কি করিতেছেন, সিংহদত্তের অভাবে তাঁহাদিগের কি উপায় হইবে, কুরুক্ষেত্র হইতে পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত কোন রাজাই সে বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই। সিংহদত্তের অভাব হইলে মথুরার অধিকার বঞ্চিত হইয়া রামদত্ত সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, আজ বর্ষীয়ান পৌরব মহাস্থবীর জীবিত থাকিলে শকগণকে সুবস্তু নদী পার করিয়া রাখিয়া আসিতাম।

প্রতিদিন পূর্ব্ব তোরণের নিম্নে বসিয়া স্তূপসংলগ্ন সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুগণ আর্য্যাবর্ত্তের বর্ত্তমান অবস্থার কথার আলোচনা করিতেন। তাঁহাদিগের নিকটই শুনিতাম যে, মহাসমুদ্রের উর্ম্মিরাশির ন্যায় শক জাতি আর্য্যাবর্ত্ত আচ্ছন্ন করিতে আসিতেছে; সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে আর আর্য্যাধিকার নাই। বাহ্লীকের যবনরাজ্য ধ্বংস হইলে পারদরাজগণ শকপ্লাবনস্রোত রোধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুদূর যোনদ্বীপে ও মিস্রাইমে আন্তীয়ক ও তুরময় বংশীয় রাজগণ শকজাতির আক্রমণভয়ে কম্পিত হইতেছেন, শকজাতির গতিরোধের চেষ্টায় চারিজন পারদরাজ জীবন-বিসর্জ্জন করিয়াছেন, পঞ্চমের জীবন শঙ্কটাপন্ন। শকস্রোত ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল। উপনগরবাসী জনৈক ব্যক্তি জালন্ধরে শকসৈন্য দেখিয়া আসিয়াছে। তাহার নিকট হইতে শকজাতির বিবরণ শুনিবার জন্য কৌশাম্বি হইতে রাজদূত আসিয়াছে। ক্রমশঃ শ্রুত হইল, মথুরায় রামদত্ত ও ত্রিগর্ত্তে উত্তমদত্তের অধঃপতন হইয়াছে; অতি প্রাচীন চেদীরাজবংশ মৎস্যদেশের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। একদিন সংবাদ আসিল যে, শকসৈন্য নগর অধিকার করিতে আসিতেছে। নগরের কথা বলি নাই! অগরাজুর শিশু পুত্র যথাসময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত, জরাগ্রস্ত ও কালকবলিত হইয়াছেন। তাঁহার পর তদ্বংশের

অপর রাজদ্বয় সিংহাসন অধিরোহণ করিয়াছিলেন। শক আক্রমণ কালে যিনি নগরাধিপতি ছিলেন, তাঁহার সদ্ধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। তখন আর্য্যাবর্ত্তে দাক্ষিণাত্যবাসী অন্ধ্র জাতির অধিকার। সদ্ধর্ম্মদ্বেষী সুঙ্গবংশের অধঃপতন হইয়াছে। তৎপদানুবর্ত্তী অহিচ্ছত্রবাসী বিশ্বাসঘাতক কাণ্ববংশীয় ব্রাহ্মণগণও নির্ম্মূল হইয়াছে; আর্য্যাবর্ত্তের রাজচক্রে শিথিলতা প্রবেশ করিয়াছে। পাটলীপুত্রে অন্ধ্র রাজের জনৈক কর্ম্মচারী বাস করেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা মগধের বহির্দ্দেশে লক্ষিত হয় না। যে দিন সংবাদ আসিল, শকরাজের বিপুলবাহিনী নগর হইতে পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে শিবিরস্থাপন করিয়াছে, সে দিন নগরাধিপতির সত্য সত্যই ঘোর দুর্দ্দিন। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর সুঙ্গরাজগণ কিয়ৎ পরিমানে করদরাজগণকে সম্রাটের প্রভাব অনুভব করাইতে পারিতেন; কিন্তু পরবর্ত্তী রাজগণ এককালীন ক্ষমতাহীন ছিলেন, নামে মাত্র আর্য্যাবর্ত্ত অন্ধ্র সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। অধিকাংশ আর্য্যাবর্ত্তবাসী অন্ধ্র কি তাহা জানিত না; কেহ কেহ বলিত তাহারা ক্ষত্রিয়জাতীয়, কেহ বা বলিত, তাহারা দস্যু। দাক্ষিণাত্যের কোন নিভৃত উপত্যকায় অন্ধ্র রাজের রাজধানী অবস্থিত ছিল, আর্য্যাবর্ত্তে, বিশেষতঃ নগরে, তাহা অনেকেই অবগত ছিলেন না। যে দিন শ্রুত হইল যে, পঞ্চাশৎসহস্র শক অশ্বারোহী নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়াছে, সে দিন নগরাধিপতিকে সাহায্য করে এমন ব্যক্তি কেহই ছিল না। আসন্ন বিপদশঙ্কায় ব্যাকুল নরনারী দলে দলে নগর পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন করিল, সঙ্ঘারাম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুগণ উজ্জয়িনীর পথে প্রস্থান করিলেন, নগরে এমন লোক রহিল না যে, নগর-প্রাকার রক্ষা করে। শক সৈন্যের আগমন সংবাদ শুনিয়া শুক্লবসন পরিহিতা রাজমাতা বুদ্ধের শরীরনিধান সম্মুখে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন; মুষ্টিমেয় শরীররক্ষী লইয়া তরুণ রাজা শক সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যাহারা নগর ত্যাগ করিয়া যায় নাই তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই সুশিক্ষিত রণদক্ষ সৈন্য, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা এত সামান্য যে, পঞ্চাশৎসহস্র অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে তাহারা একপদ তিষ্ঠিতে পারিত কি না সন্দেহ।

পর দিন প্রভাতে নগর নিস্তব্ধ, জনশূন্য। প্রান্তরে কৃষক হলকর্ষণ করিতে বা মেষপাল চারণ করিতে আসে নাই। প্রতিদিন প্রত্যুষে সঙ্ঘারামবাসী ভিক্ষুগণ তথাগতের শরীর অর্চ্চনা করিতে আসিতেন, কিন্তু সে দিন বেষ্টনী, স্তূপ, গর্ভগৃহ জনশূন্য, গর্ভগৃহ মধ্যে মৃতপ্রায়া রাজমাতা শরীর-নিধানের সম্মুখে ধূলিতে লুটাইতেছেন। বহুদূরে বহু অশ্বপদ শব্দ শ্রুত হইল, ক্রমে উত্তরে ঘন কৃষ্ণবর্ণ

মেঘের ন্যায় শকসৈন্যের পুরোভাগ দৃষ্ট হইল, দেখিতে দেখিতে তাহারা প্রান্তরস্থিত নদীতীরে আসিয়া উপনীত হইল। তখন নবোদিত সূর্য্যের কিরণমালা আসিয়া স্তূপের উচ্চ চূড়া কেবল স্পর্শ করিয়াছে। রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত সুগঠিত স্তূপ ও বেষ্টনী দেখিয়া একবার যেন তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর সুশিক্ষিত বলবান অশ্বগণ এক এক লম্ফে ক্ষীণকায়া নদী পার হইয়া আসিল। তাহাদিগের উজ্জ্বল লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ প্রভাত সূর্য্যের কিরণে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সেই কৃষ্ণবর্ণ মেষচর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ, অদৃষ্টপূর্ব্ব আয়ুধসমূহ ও ঘোর রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল অত্যন্ত ভয়াবহ। সমান্তরালে পংক্তির পর পংক্তি অশ্বারোহী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া গেল, দ্বিলক্ষ অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিতে প্রান্তর অন্ধকার হইয়া গেল, সর্ব্বশেষ পংক্তি শক্রর সন্ধানে স্তূপবেষ্টনী অভিমুখে আসিল। বেষ্টনী ও সঙ্ঘারাম তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া কয়েকজন অশ্বারোহী তোরণপথে প্রদক্ষিণের মধ্যে প্রবেশ করিল, অশ্বপদশব্দে ত্রস্তা রাজমাতা যেমন গর্ভগৃহ হইতে বহির্গতা হইতে যাইবেন, অমনই জনৈক অশ্বারোহীনিক্ষিপ্ত অষ্টহস্ত পরিমিত শূল তাঁহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিল। তাঁহার মৃতদেহ গর্ভগৃহ মধ্যে পতিত হইল। স্তূপ খননকালে সুবর্ণখচিত বহুমূল্য কৌশেয় বস্ত্রজড়িত রাজমাতার অস্থিনিচয় তোমরা পাইয়াছিলে; অবজ্ঞা করিয়া তাহা সংগ্রহশালায় উঠাইয়া আন নাই, পলিতকেশ শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতের উপদেশ অবহেলা করিয়াছিলে। তখন যদি উহার কাহিনী জানিতে তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা সাদরে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিতে। শকসৈনিক নিক্ষিপ্ত শূল রাজ্ঞীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মেরুদণ্ডে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, শূলের ফলক ও তৎসংলগ্ন অস্থিখণ্ড এখন বর্ব্বরগ্রামে উপাসনার সামগ্রী হইয়াছে, অবশিষ্ট অস্থিখণ্ড ও বহুমূল্য বস্ত্রের অবশেষ ধূলায় মিশাইয়া গিয়াছে। নগরধ্বংসের পরদিন সঙ্ঘারামের জনৈক প্রাচীন পরিচারক অতি সন্তর্পণে আসিয়া স্তূপ, বেষ্টনী ও সঙ্ঘারাম সন্ধান করিতে লাগিল; গর্ভগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল যে, শূলের কাষ্ঠদণ্ডের অর্দ্ধভাগ দ্বারের বাহিরে রহিয়াছে, দ্বারদেশে ধূল্যবলুণ্ঠিত প্রাণশূন্য দেহ পতিত রহিয়াছে। বহু যত্নেও সে দেহ হইতে শূল মোচন করিতে পারিল না; তাহার জীর্ণ দেহে, ক্ষীণ হস্তে এমন বল ছিল না যে, মেরুদণ্ডে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত বৃহৎ শূল টানিয়া বাহির করে। সে ধীরে ধীরে মৃতদেহ উঠাইয়া গর্ভগৃহের এক কোণে স্থাপিত করিল ও সঙ্ঘারাম হইতে কয়েকখণ্ড কাষ্ঠ আনিয়া মৃতদেহের জন্য আধার নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। আধার প্রায় নির্ম্মিত হইয়াছে, এমন সময় দূরে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল; কাষ্ঠ ও

অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পরিচারক পলায়নোন্মুখ হইল, স্তূপের বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, একজনমাত্র অশ্বারোহী স্তূপাভিমুখে আসিতেছে ও তাহার উষ্ণীষ ভারতবাসীর ন্যায়। তখন সে আশ্বস্ত হইয়া প্রতীক্ষায় তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান হইল; অশ্বারোহী নিকটে আসিলে পরিচারক তাহাকে চিনিতে পারিল, সে নগররক্ষী জনৈক সৈনিক, তাহার সহিত নগরের পতন সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। অবশেষে তাহার সাহায্যে রাজ্ঞীর দেহ বৃহৎ কাষ্ঠাধারে আবৃত করিয়া উভয়ে কাষ্ঠাধার গর্ভগৃহের এক কোণে স্থাপিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। গর্ভগৃহের দ্বার কিয়ৎকালের জন্য রুদ্ধ হইল। সৈনিক কহিয়াছিল, ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় শকসৈন্য নগর প্রাচীরের উপর পতিত হইয়াছিল, অবলীলাক্রমে পরিখা ও প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ও এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সব শেষ হইয়া গিয়াছিল। নগররক্ষীরা কেহই জীবিত নাই, একজন চলচ্ছক্তি বিহীন বৃদ্ধ ভিক্ষু দক্ষিণ নগর তোরণের আকাশকক্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া সমস্ত ঘটনা দেখিয়াছেন। কয়েকজন নগরবাসী নগরধ্বংশের পর আসিয়া মৃতদেহের সৎকার করিয়া গিয়াছে। তাহারা সকলেই পার্ব্বত্য-ভূমিতে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। শকগণের অত্যাচারের আশঙ্কায় কেহই সমতল ভূমিতে আসিতে চাহে না।

দিনের পর দিন যায়, আমাদিগের নিকটে আর মানবসমাগম হয় না। ক্রমে প্রদক্ষিণের পথ তৃণসঙ্কুল হইয়া উঠিল, বেষ্টণীর মধ্যে ও প্রান্তরে নির্ভয়ে মৃগযুথ বিচরণ করিতে আসিত, কিছুকাল পরে দৃষ্ট হইল, নগরে ও নগর-প্রাকারে মহাকায় বৃক্ষসকল জন্মিয়াছে, পাষাণ নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত নগর দেখিলে বোধ হইত যেন উহা কোন শ্রেষ্ঠির সুরক্ষিত উদ্যান। ক্রমে প্রান্তরেও বৃক্ষ জন্মিতে লাগিল। কিয়ৎকালপরে নগর আর নয়নগোচর হইত না। আমার পার্শ্বে একটি লতা জন্মিয়াছিল, দারুণ নিদাঘ উত্তাপেও আমার ছায়া পাইয়া সে জীবিতা ছিল, সে অনেক কথা কহিত; কিন্তু তাহার ক্ষীণস্বর আমার কর্ণ পর্য্যন্ত আসিত না। সেই জন্যই বোধ হয় সে বেষ্টনীর স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া আমার নিকটে উঠিয়া আসিল। সে আসিয়া আমার পরুষ দেহ বেষ্টিত করিয়া রহিল। সে যতদিন ছিল ততদিন তাহাকে অতীতের কথা বলিতাম, সে শুনিয়া বিস্মিতা হইত। তাহার জীবনে সে কখন মনুষ্য দেখে নাই, সুতরাং শ্বেত, কৃষ্ণ, ও মিশ্রবর্ণের কথা শুনিয়া সে বড়ই বিস্মিত হইত। একটি ক্ষুদ্র অশ্বত্থবৃক্ষ স্তূপশীর্ষস্থ ছত্রের উপরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষ মহাকায় মহীরুহে পরিণত হইল। তাহার ভারে এক বর্ষা রজনীতে সশব্দে সপ্তছত্র সমন্বিত

স্তূপশীর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল। একদিন মৃগযূথ আসিয়া আমার সঙ্গিনী লতিকার অধোদেশ ভক্ষণ করিয়া গেল, সে দারুণ মৃত্যু-যাতনায় কাঁদিয়া উঠিল। মৃগযূথ নিঃশব্দে তৃণবংশধ্বংস করিয়া যাইতে লাগিল, তাহার ভাষা কেহই বুঝিতে পারিল না। ধরাশায়ী অশ্বত্থের শাখাপ্রশাখাগুলি কম্পিত হইয়া সমবেদনা জানাইল ও কহিল, আমরাও অনুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। দুই তিন দিন সূর্য্যতাপে লতিকাও শুকাইয়া গেল, পরে সংস্কারকালে মহারাজাধিরাজ কণিষ্কের পরিচারক আসিয়া তাহার অবশেষ দূরে নিক্ষিপ্ত করিল।

একদিন মধ্যাহ্নে বহুদূরে হস্তিপদশব্দ শ্রুত হইল। অতীতকালে যে দিকে নগরোপকণ্ঠ ছিল সেই দিক হইতে ক্রমাগত মহাবৃক্ষসমূহের পতন শব্দ, শুষ্ক পত্রসমূহের মর্ম্মরধ্বনি ও বেতস-লতার উৎপাটন শব্দ আসিতে লাগিল। ভয়ে বনবাসী জীবজন্তু-সমূহ স্তূপসান্নিধ্য পরিত্যাগ করিল। বেলা তৃতীয়প্রহরে বনমধ্য হইতে চারিটি হস্তী কতিপয় মনুষ্যকে বহন করিয়া লইয়া আসিল। ক্রমে হস্তিচতুষ্টয় আসিয়া তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলে সকলে অবতরণ করিলেন, দেখা গেল তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজন মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত, দুইজন মলিনকাষায় পরিহিত ভিক্ষু ও একজন উজ্জ্বল বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা, এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক হস্তীর স্কন্ধদেশে এক একজন হস্তিপক উপবিষ্ট ছিল। বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা অধিকদূর আসিতে পারিলেন না, কারণ পদে পদে বেতস-লতা তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। ইহার মধ্যে তাঁহাদিগের কথোপকথনে বুঝিলাম, মেষচর্ম্মপরিহিত ব্যক্তিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ নগরে বাস করিতেন, শক আক্রমণে তাঁহারা পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাঁহাদিগের বংশধরেরা কেহই উপত্যকাভূমি পরিত্যাগ করিতে সাহসী হয়েন নাই। শকজাতি আর ভ্রমণশীল নাই। তাহারা আর্য্যাবর্ত্তে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, নবাগত কুষণ বা গুষণ বংশ সমস্ত শকজাতিকে একত্র করিয়া অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে। কণিষ্ক কুরুবর্ষ হইতে দাক্ষিণাত্যের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডের অধিকারী। আরও বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ শকজাতি সদ্ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছে। দেবতাদিগের প্রিয় মহারাজ অশোক প্রিয়দর্শীর ন্যায় কণিষ্ক সদ্ধর্ম্মের পোষণকর্ত্তা হইয়াছেন। আবার জম্বুদ্বীপ হইতে চীন, কিরাত, মরু, ঐরাণ প্রভৃতি দেশে ভিক্ষুগণ সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছেন। সদ্ধর্ম্মের প্রাচীন তীর্থগুলির উদ্ধার করিবার চেষ্টা হইতেছে। কপিলবস্তুতে, মহা-

বোধিতে, বারাণসীতে, কুশীনারে, শ্রাবস্তীতে, বৈশালিতে, কৌশাম্বীতে, সঙ্কাশ্যে, বিদিশায়, মথুরায়, জালন্ধরে, তক্ষশিলায়, নগরহারে, পুরুষপুরে, কপিশায় ও বাহ্লীকে সদ্ধর্ম্মের সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে! কত পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল! উৎসবের দিন কপিলবস্তু হইতে লুম্বিনি গ্রামের মৃত্তিকা লইয়া একজন ভিক্ষু আসিয়াছিলেন, পাটলিপুত্রবাসী কোন মহাপুরুষ স্তূপ নির্ম্মাণকালে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, মহাবোধী হইতে একজন বর্ষীয়ান ভিক্ষু বোধীদ্রুম বংশজ ক্ষুদ্র অশ্বত্থবৃক্ষ আনিয়া স্তূপবেষ্টনীর বহির্ভাগে রোপিত করিয়াছিলেন। বিদিশা-নগর হইতে বহুদূরে নহে, যাঁহারা বিদিশায় সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের শরীর নির্ব্বাণ-বিহারে রক্ষা করিতেছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন উৎসবের দিন আসিয়াছিলেন। মথুরায় অগরাজুর পিতা স্তূপবেষ্টনীর স্তম্ভ ও সূচীদানে নিজের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছিলেন। তক্ষশিলা হইতে সিংহদত্ত আসিয়াছিলেন। সিংহদত্ত ও মহাস্থবিরের কথা মনে পড়িয়া গেল। তক্ষশিলার মহাবিহারের তখন কি অবস্থা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। আমার ভাষা বুঝিবার শক্তি থাকিলে তাহারা নিশ্চয়ই উত্তর দিত, কারণ আমি এখন যে ভাবে কথা বলিতেছি চিরকালই সে ভাবে বলিয়া আসিয়াছি, আমায় কথা কখনও ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর হয় নাই।

শুনিলাম স্তূপের ও বেষ্টনীর সংস্কার হইবে, তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার জন্য মহাবনের মধ্যে পথ প্রস্তুত হইবে, সেইপথে রাজাধিরাজ দেবপুত্র ষাহিকণিষ্ক স্তূপ দর্শনে আসিবেন। ক্রমে দিবাবসান সময় আগত দেখিয়া আগন্তুকগণ প্রস্থান করিলেন। মলিন কাষায় পরিহিত ভিক্ষুকগণ এখন উপত্যকাবাসী জনপদের পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন, মেষচর্ম্মপরিহিত ব্যক্তিদ্বয় নগরবাসিগণের বংশজাত, কিন্তু বর্ম্মাবৃত পুরুষ বিদেশীয়; তিনি শকসাম্রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত রাজ-পুরুষ, রাজাদেশে ও তথাগতের শরীর স্তূপের অন্বেষণে আসিয়াছিলেন। পর-দিবস প্রাতে বনের মধ্যে মহাকায় প্রাচীন বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত হইতে লাগিল. সে পথ তোমরা দেখিয়াছ। বর্ব্বর রমণীগণ এখনও শুষ্ক করিবার জন্য সেই সকল পাষাণে গোময় লেপন করিয়া থাকে। পথ নির্ম্মিত হইলে স্তূপ ও বেষ্টনী পরি-ষ্কৃত হইল, ক্রমে বনের একাংশে শ্রমজীবিগণের একটি গ্রাম বসিয়া গেল; স্তূপ-সংস্কার আরম্ভ হইল। অশ্মাচ্ছাদিত নবনির্ম্মিত পথে একদিন মধ্যাহ্নে চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি শ্রুত হইল। আমরা শকটের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম; ভাবিলাম, বোধ হয় রাজা আসিতেছেন। কিন্তু দুই প্রহরকাল অতীত হইলে দূ

হইল বৃহদাকার শকটে স্থাপিত রক্তবর্ণ প্রস্তর স্তূপাভিমুখে আসিতেছে; হস্তিদ্বয় প্রত্যেক শকট লইয়া আসিতেছে। দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম, দূর হইতে তাহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারিলাম; তাহারাও আমাদিগের ন্যায় রক্তবর্ণ পাষাণ। সমুদ্রগর্ভে একদিনে একসময়ে উৎপন্ন, বহুকাল একত্র পর্ব্বতের সানুদেশে বাস করিয়াছি, তাহারা আমাদিগেরই, নূতন নহে। তাহারা বলিল যে, আমরা চলিয়া আসিবার পর বিদীর্ণবক্ষ অল্পসময়ের মধ্যেই বনরাজীতে আচ্ছাদিত হইয়া-গিয়াছিল, বহুকাল আর কেহ তাহাদিগের অঙ্গে আঘাত করে নাই। কথনও কথনও দুই চারিজন মনুষ্য আসিয়া তাহাদিগের অঙ্গভেদ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা অধিক আঘাত করে নাই। কেহ কেহ আঘাত করিয়া পাষাণলাভে সফল-কাম হইত, কেহ বা হতাশমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। অল্পদিন পূর্ব্বে মেষ-চর্ম্মাবৃত কয়েকজন মনুষ্য পর্ব্বতশিখর হইতে অবরোহণ করিয়া পাষাণের অবস্থা নির্ণয় করিয়া গিয়াছিল, ইহার কয়েকদিবস পরে মনুষ্যগণ আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিয়াছে। মনুষ্যগণ আমাদিগকে যে ভাবে ছেদন করিয়াছিল, যে নগরে আনয়ন করিয়াছিল ও যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিল, ইহাদিগকেও তদ্রূপ করিয়াছিল, তবে ইহারা ব্রাহ্মণগণ বা সদ্ধর্ম্মের অপর কোনও শত্রুর নিকট হইতে কোনরূপে বাধাপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই। আমরা অনুমান করিলাম, সদ্ধর্ম্মের চিরশত্রু ব্রাহ্মণগণ মহাকোশল হইতে দূরীভূত হইয়াছে। নূতন পাষাণে স্তূপের ও বেষ্টনীর সংস্কার আরব্ধ হইল, সপ্তচ্ছত্র-মণ্ডিত স্তূপশীর্ষ আবার গগন স্পর্শ করিল, ভগ্ন বা বিদীর্ণ প্রস্তর খণ্ডের পরিবর্ত্তে নূতন প্রস্তর যোজিত হইল, স্বস্থান-চ্যুত পাষাণ যথাস্থানে প্রতিস্থাপিত হইল, স্তূপের ও বেষ্টনীর শোভা আবার যেন ফিরিয়া আসিল। জীর্ণ সংস্কারকার্য্য কত দূর অগ্রসর হইল তাহা জানিবার জন্য সুদূর মথুরা হইতে শকসম্রাট চর প্রেরণ করিতেন, উজ্জ্বল বর্ম্মাবৃত সকোণ শির-স্ত্রাণ পরিহিত শ্বশ্রুশ্মশ্রু শকজাতীয় অশ্বারোহিগণ ক্ষুদ্রকায় পার্ব্বত্য অশ্বে আরো-হণ করিয়া সংস্কার কার্য্য দেখিতে আসিত। অশ্বপদশব্দ শ্রবণমাত্রই আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, শকরাজার দূত আসিতেছে।

স্তূপ, বেষ্টনী, প্রদক্ষিণের পথ ও সঙ্ঘারাম সংস্কৃত হইল। ক্রমে সঙ্ঘারামে ভিক্ষুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, নানাদেশ হইতে ভিক্ষুগণ রাজানুগ্রহলাভেচ্ছায় বনমধ্যে সঙ্ঘারামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বনমধ্যস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম ক্রমে বৃহৎ গ্রামে পরিণত হইল। অপরাহ্নে ভিক্ষুগণ আসিয়া স্তূপের ছায়ায় বসিয়া কথোপকথন করিতেন, তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তায় পৃথিবীর সংবাদ পাইতাম।

শুনিলাম, হুবিষ্ক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, কারণ সম্রাট চীন দেশে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। সম্রাট চীনরাজের কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন, বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী চীনরাজ অবজ্ঞাভরে তাঁহার দূতের অবমাননা করিয়াছেন। প্রতিশোধগ্রহণমানসে কণিষ্ক চীনসাম্রাজ্য আক্রমণ করিবেন, আর্য্যাবর্ত্তে হুবিষ্ক পিতার জীবিতকালে রাজোপাধি ধারণ করিবেন।

বহু অর্থ ব্যয়ে স্তূপ ও বেষ্টনী সংস্কৃত হইয়াছে; কিন্তু শরীরগর্ভ স্তূপে তথাগতের শরীর আবিষ্কৃত হয় নাই, গর্ভগৃহের দ্বার কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা কেহই অবগত নহে। যক্ষগণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে যে, রাজা না আসিলে গর্ভগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না ও তথাগতের শরীর মনুষ্যের নয়নগোচর হইবে না। যক্ষগণের কথা সম্রাট শুনিয়াছেন, চীনযুদ্ধের আয়োজনে বিশেষ ব্যস্ত থাকিলেও তিনি আসিবেন। তিনি তথাগতের শরীর দর্শন করিয়া চীনযুদ্ধে যাত্রা করিবেন. ক্ষুদ্র ভিক্ষুসঙ্ঘে এই কথাই বার বার আলোচিত হইত।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্তিমে।

—:*:—

ভিন্ন ভিন্ন শত পথ ধরি' নদীমালা
সিন্ধুর উদ্দেশে ধায় লভিতে বিরাম;
বিভিন্ন জীবন পথে চলিয়াছে নর
অন্তিমে মৃত্যুর ক্রোড়ে লভিতে বিশ্রাম

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য।

—:*:—

বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার অতীতের বিষয়ে একটু মনোযোগ না দিলে সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না; কারণ বুঝিতে হইবে, কোন্ শক্তির প্রভাবে ও কোন্ মন্ত্রগুণে সেই সুদূর বিস্মৃত অতীতের গভীর অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া পূরাতন কবিগণের গীতি-সমুচ্ছ্বাস আজিও অবিরত আমাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। সে গীতি শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে বদ্ধ নহে। বুঝিতে হইবে, কেন বর্ত্তমান্ যুগের রূপকসমাস-অলঙ্কারসমলঙ্কৃতা ও নবভাবে অনুপ্রাণিতা শুদ্ধ সংস্কৃত বাগ্বিবদ্ধা "কোমল মধুর কান্ত" ভাবপটীয়সী কাব্যকবিতা অথবা অঘটনসংঘটনপটীয়সী কুহকজাল-সমাকীর্ণ লোমহর্ষবিধায়িনী নাটক উপন্যাসাবলী ঐরূপ মর্ম্মতল পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না। তাহার উত্তর এক কথায়, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য শব্দ-ভাব-রূপক-অলঙ্কার গৌরবে যতই গৌরবান্বিত হউক না কেন, তাহার মূলভিত্তি নাই; ও যদিও কোন কাব্যে থাকে তবে সে কাব্য প্রসাদের তুলনায় অতি সামান্য। কলিকাতার চৌতল পঞ্চতল মহতী অট্টালিকাশ্রেণী দেখিয়াছ, বহিঃসৌন্দর্য্য-মনোমুগ্ধকর, কিন্তু তাহার ভিত্তি অতি স্বল্প, তাহাদের পতন যেন একটি ভূকম্পনের আশায় অপেক্ষিত—আমাদের সাহিত্যের অবস্থাও যেন সেইরূপ হইয়াছে! সুতরাং এ সাহিত্য স্থায়ী হইবে অথবা এই বর্ত্তমান সাহিত্য বঙ্গভাষায় স্থায়ী সম্পৎরূপে পরিগণিত হইবে কি না সন্দেহ।

সনাতন ধর্ম্মই জাতীয় সাহিত্যের মেরুদণ্ড। জাতীয় ধর্ম্ম নীতি ও বিশ্বাসের সনাতন সাক্ষী জাতীয় সাহিত্য। যে জাতির যে ধর্ম্ম, যে বিশ্বাস ও যে নীতি, সেই ধর্ম্মবিশ্বাস ও নীতির প্রসারকল্পে সাহিত্য কল্পিত ও ব্যবহৃত, সাহিত্যের ইহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইলেই সাহিত্য নগণ্য হইয়া পড়ে। সাহিত শুধু এই ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াই সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি শিক্ষা দেয়। সাহিত্য লোক-শিক্ষক; প্রেম-ভক্তি ও ন্যায়ান্যায়ের বিশ্লেষণ করে বলিয়া সে অমৃতময়। সাহিত্য জাতীয় মনের ও ধারণার পরিপোষ্টা। সেই হেতুই সাহিত্যে ধর্ম্মের প্রয়োজন—এই ধর্ম্মই সাহিতের ভিত্তি। যে ভিত্তি দেশকাল পাত্রভেদে চিরদিন নিত্য সত্য-বস্তু, তাহাই ভিত্তিরূপে গঠিত হওয়া উচিত। স্বদেশীয় সমাজ বা অন্য কোন নীতির

উপর যদি কোন সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে সাহিত্যও স্বল্পবিস্তারী এবং যুগ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল। এ যুগে যাহা সুনীতি বলিয়া গণ্য হইতেছে অন্যযুগে তাহা গভীর দুর্নীতিদুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং সে যুগে এই পূর্ব্বকালের সাহিত্য অপাঠ্য হইয়া পড়িবে—সঙ্গে সঙ্গে কবির যশঃ-সৌরভেরও পর্য্যাবসান হইবে।

ভারতের ধর্ম্মই প্রাণ—ভারত ধর্ম্মের জন্য সব দিয়াছে, দিতেও পারে। তখন সাহিত্যের ভিত্তি ধর্ম্ম হওয়াই উচিত। এই ধর্ম্ম যেন আবার সাম্প্রদায়িক না হয়। কারণ সাহিত্য সম্প্রদায়-বিশেষের নহে। এ ধর্ম্ম বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্ম। যে সাহিত্যের এই ধর্ম্মই ভিত্তি সে সাহিত্যের বিনাশ নাই। কারণ, ধর্ম্মের বিনাশ, বা পরিবর্ত্তন তত্তদূর সম্ভব নহে। যদি সম্ভব হইত তবে দ্বিসহস্র বৎসর অজস্র অত্যাচরের ঝঞ্ঝা শির পাতিয়া সহ্য করিয়া আজও হিন্দু-ধর্ম্ম মেঘোন্মুক্ত শারদশশধরের মত পূর্ণভাববিশিষ্ট হইয়া বিরাজিত থাকিতে পারিত না। অনার্য্যের সহিত সংঘাতে বৌদ্ধের সহিত সংঘাতে, মসলমানের সহিত সংঘাতে সমস্ত সংঘাতেই হিন্দুধর্ম্ম বিজয়ী। স্থিতিস্থাপক হিন্দুধর্ম্ম আজও অক্ষুণ্ণ।

আমরা ভারতের নর নারী। ভারতের জল, বায়ু, বিশ্বাস, ধর্ম্ম আমাদের মেদ-মজ্জায় সংগ্রহিত। অন্য ভাব বা নীতি আমাদের সহ্য হইবে না। আজ যে আমরা য়ুরোপীয় আদর্শে কাব্য নাটকাদি রচনা করিতেছি, ইহা আমাদের আজকালই ভাল লাগিতেছে। কিন্তু পরে এই প্রণালী কি আমাদের বংশধরদের ভাল লগিবে? মুসলমান্ আদর্শে রচিত বাঙ্গালা রচনাগুলি কি এখন আমাদের ভাল লাগে? তাই বলিতেছি, সাহিত্য শাশ্বত, ক্ষণিক নহে। সাহিত্যের যে ধাতু, তাহাও একটি শাশ্বত বস্তুতে সংবদ্ধ থাকাই প্রয়োজনীয়। এই জন্যই আজও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস, গোবিন্দদাস, ও সুরদাস প্রভৃতি বাঙ্গালী কবির গীত গাথা, কালীদাস, ভারবী, জয়দেব প্রভৃতি সংস্কৃত কবির কাব্য গাথা, হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিয়া আপামরসাধারণকে আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। সাহিত্যের এই ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে কবি ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' কেও ধর্ম্মের মেরুদণ্ড দিয়াছেন।

ধর্ম্মে ও সাহিত্যে যে কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সামান্য আলোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হয়। ধর্ম্মের বিপ্লবেই ভাষার বিপ্লব সাধিত হয়। হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশের দিনে সংস্কৃত ভাষারই বহুল প্রচলন ছিল; ও সেই সময়েই সংস্কৃত ভাষার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে পালি ভাষার দিন

পড়িল। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীকে আদেশ করিলেন, কেহ যেন তাঁহার উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় না অনুবাদ করে; করিলে সে অপরাধী হইবে। মুসলমান্ শাসনের দিনে উর্দ্দু ও ফারশী ভাষার দিন হইল। আবার ইংরাজের আমলে ইংরাজীরই প্রচলন। মুসলমানের ভাষা ইংরাজের ভাষা ও পূর্ব্বের সংস্কৃত আসিয়া বাঙ্গালা ভাষার পররুহ হইল। যুরোপেও দেখা যায়, রোমান ধর্ম্মযাজকদিগের প্রভুত্বকালে ল্যাটিন ভাষার প্রচলন ছিল। রোমান যাজকদের আধিপত্য শেষ হইল, ল্যাটিন ভাষাও বিলুপ্ত হইল। এখন আমাদের ধর্ম্মেও যেরূপ স্বেচ্ছাচার, ভাষাতেও সেইরূপ স্বেচ্ছাচার পরিদৃষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তাই সমস্ত প্রাচীন কবিদিগের কাব্যের আখ্যান বস্তু ছিল পৌরাণিক। তাঁহাদের স্বীয় অসাধারণ মনস্বিতার ও কৌশল-কলাময়ী উদ্ভাবনশক্তির বৈচিত্র্যগুণে স্ব স্ব কাব্যকে তাঁহারা অভিনব-সুন্দর করিয়াছেন। এই অভিনবতা ও সৌন্দর্য্যকেই কবির মৌলিকতা বলে। এই মৌলিকতার জন্য কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ঘনরাম, কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র যেন অদ্যাপি জীবিত;—কিন্তু সে দিনের রঙ্গলাল ও বিহারীলাল আজ সান্দ্র বিস্মৃতিতে অন্তর্হিত।

এই ধর্ম্মবিহীন, ধাতুবিহীন ও ভক্তিবিহীন সাহিত্যই এখন আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য। পূর্ব্বের মত কবি ও লেখক এখন আর কয়েকজনমাত্রে সীমাবদ্ধ নহে। সকলেই এখন ন্যূনাধিক সাহিত্যিক। সকলেই ইংরাজী শিক্ষার বিচিত্র কুহকে মন্ত্রমুগ্ধ। ইংরাজী ধরণে লেখা না হইলে কেহ পড়িবেন না। এই জন্য লেখকগণও রচনা কাটাইতে ও যশোলাভ্ করিতে—স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক—ইংরাজী ধরণেরই পক্ষপাতী। কাযেই এতদিনের সে সনাতন ধাতু ও সাহিত্যের মর্ম্মস্পর্শিনী ক্ষমতা তিরোহিত হইয়াছে। যাহা হইয়াছে ও হই-তেছে, তাহা যে শুধু বর্ত্তমানের জন্যই লিখিত, এ সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায়। বাঙ্গালার কোন কাব্য বা রচনা নূতন প্রকাশিত হইলেই আমরা তাহাকে সেই শ্রেণীর ইংরাজী লেখার সঙ্গে এমন কি বাঙ্গালা কবিকেও ইংরাজ কবির সহিত তুলিত করি। এই অতুলন তুলনাশক্তির বিচিত্র উর্ব্বরতার ফলেই আমরা মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রে স্কটকে পাইয়াছি; নবীনচন্দ্রে বায়রণকে পাইয়াছি; হেমচন্দ্রে টেনি-সনের ও ডান্টের আভাস পাইয়াছি; মধুসূদনে মিল্‌টন পাইয়াছি; ও রবীন্দ্র-নাথে শেলীকে পাইয়াছি। আমরা মেঘনাদ বধে 'প্যারাডাইস' লষ্টের গন্ধ পাই, দুর্গেশনন্দিনীতে 'আইভানহোর' ছায়া পাই—বৃত্রসংহারে 'ইন্‌ফার্ণোর নমুনা পাই।

সম্পূর্ণ না পাইলেও জোর করিয়া যেন কতকটা পাইতেই হইবে। এই "ভ্রান্তি"ই যেন আমাদের চরমোৎকর্ষের পরিচায়ক। বিলাতের ওকবৃক্ষ ও ভারতের বটবৃক্ষ যথাক্রমে বিলাতে ও ভারতেই সম্ভব। ভারতের পারিজাত ও বিলাতের লিলি কখনই এক নহে, হইতেও পারে না। তবুও বিলাতী বিদ্যা-বিপুলতায় আমরা এমনই "সমদর্শী" ও বিলাতী সভ্যতার উদ্দাম বিদ্যুৎস্ফুরণের তেজে এমনই অন্ধ যে আমরা সোণার পাথরবাটী গড়িয়া বসিয়া আছি। হায় অনুচিকীর্ষা! এই অনুচিকীর্ষাই ভারতের কাল। যতদিন সাহিত্যে এইরূপ "যেচে মান" লইতে হইবে, ততদিন এ মুকপঙ্গু সাহিত্যের ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে।

বঙ্গদেশের বরেণ্য সন্তান স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন:—

"আমি ইংরাজী বহি পড়িতাম ও ইংরাজীতে অনেক সময় বাধ্য হইয়া পত্রাদি লিখিতাম বটে, কিন্তু ইংরাজ ভিন্ন কাহারও সহিত ইংরাজীতে কথা কহিতাম না। আর ইংরাজীতে চিন্তা করিবার নিমিত্ত ত' কখনই চেষ্টা করি নাই। প্রত্যুতঃ যদি কখনও চিন্তাকালীন পাঁপড়ি ভাঙ্গা ইংরাজী গৎ মনে হইতেছে বুঝিতে পারিতাম, তৎক্ষণাৎ তাহা মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝিতাম ভাবগুলি যথার্থ কি না?" —পারিবারিক প্রবন্ধ, ৪৩ পৃষ্ঠা।

বঙ্গভাষার স্রোত এক্ষণে অন্যদিকে প্রবাহিত। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে একটি কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি নাই। যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ গড়িয়া লইতেছেন। এ ভাষা রাজভাষা নহে, সুতরাং রাজদরবারে ও আইন আদালতে এ ভাষা চলে না; শিক্ষিত সমাজ এ ভাষায় কথা বার্ত্তা চিঠিপত্রাদি লিখিতে সঙ্কুচিত হয়েন; দোকানদার ব্যবসায়ীরা এ ভাষার অন্যরূপ সংস্করণ করিয়া লইয়াছেন, ভদ্রের সমাজে অন্য একরূপ, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা এ ভাষার অন্যবিধ রূপের উপাসনা করেন। সুতরাং ইহা যে শ্লথ-শাসন দুরন্ত বালকের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? আধুনিক শিক্ষিত সমাজ কাব্যামোদের জন্য মিল্টন, বায়রণ, সেক্‌স্‌পিয়র, শেলীর কাব্য গ্রন্থের শরণাগত হয়েন; শিশুদিগকেও 'বর্ণবোধের' পূর্ব্বে First Book পড়ান; রচনায় বিদেশীয় কবিগণের প্রবচন প্রচুর পরিমাণে তুলিতে পারিবেন, কিন্তু আমাদিগের বঙ্গ বা সংস্কৃত সাহিত্যরূপ-রত্নাকর হইতে তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র বালুকণা ও তুলিতে পারিবেন না। এমন কি একদিন বঙ্গের উজ্জ্বলতম রত্ন মধুসূদনই বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালাভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।" কিন্তু তিনিই শেষে খেদোক্তি করিয়াছিলেন "হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।" এ খেদোক্তিটি আমাদের অনুশীলনের যোগ্য। তাই

বলিতেছি, বাঙ্গালা ভাষার কে আদর করে? নব্য শিক্ষিতের দল ইহা পড়েন না; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সংস্কৃতের চর্চ্চা করেন; বাঙ্গালী মুসলমান্‌গণ সাদী হাফেজ লইয়া থাকেন। বঙ্গভাষা এক্ষণে একটি নব্য শিক্ষিত দলেরই একমাত্র ক্রীড়নক। ভাষারও সঙ্করত্ব আছে। বঙ্গভাষাতেও সঙ্করত্ব পৌছিয়াছে। "সঙ্করোনরকায়ৈব।" ভাষা জননীর এখন ফার্সী-হিন্দি-ইংরাজী-সংস্কৃত বিমিশ্রিত এক অভিনব মূর্ত্তি।

বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি গৌড়ীয় যুগেই হইয়াছিল। হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। তখন স্বাধীন নৃপতিগণ ও দেশের ধনিগণ সাহিত্যের মর্ম্ম বুঝিতেন। এক একজন মহাত্মা এক বা ততোধিক কবির পৃষ্ঠপোষক থাকিতেন। যেমন কৃত্তিবাসের তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ণ, কবীন্দ্রের নস্‌রৎ খাঁ, বিদ্যাপতির শিবসিংহ, বিজয়গুপ্তের হোসেন শাহ, ষষ্ঠীবরের জগদানন্দ, মুকুন্দরামের রঘুনাথ দেব, রামেশ্বরের যশোমন্ত সিংহ, অনন্তরামের বিশারদ, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের কৃষ্ণচন্দ্র, কবি আলোয়ালের মাগন ঠাকুর, ভবানীদাসের জয়চন্দ্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। আর সে দিন নাই, সাহিত্যের সে উন্নতিও নাই।

সাহিত্যের বিকাশ দুই দিকে,—এক গদ্যে ও অন্য পদ্যে। পূর্ব্বে গদ্য একরূপ ছিল না বলিলেও হয়। যাহা রচিত হইত, তৎসমুদায় পদ্যেই হইত। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার-প্রমুখ জনকয়েক মহাত্মার যত্নেই প্রথম সুমার্জ্জিত গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হয়। সেই গদ্য আজও পঠিত এবং পাঠিত হইতেছে। সেই গদ্যই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃকও গ্রাহ্য হইয়াছিল।

কিন্তু আজ কাল আর সে দিন নাই। আজ কাল বিজ্ঞানের দিন, প্রত্নতত্ত্বের দিন, মৌলিক অনুসন্ধানের দিন। এক্ষণে বিশুদ্ধ সাহিত্যিকের অভাব হইতেছে। মৌলিক ভাষা নাই, ভাষার রীতিও নাই। মৌলিক অনুসন্ধান ও মেধাবী পণ্ডিতগণের অপূর্ব্ব ধীশক্তি বলে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বেশ শিখিয়াছি :—পলাসীযুদ্ধের পর জন কয়েক নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণ কূটরাজনীতি চরিতার্থ করিতে এই সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল (Dugald Stewart); ঋগ্বেদ চাষার গান; "গোড়ীয় ভাষাগুলি কোন অনার্য্য ভাষা হইতে নিঃসৃত হইয়া সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে; বুদ্ধ কোন লোক বিশেষের নাম নহে; কাশ্মীরাধিপ মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি।"—('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে

উদ্ধৃত কোন লোক বিশেষের মত।) ইত্যাদি। প্রত্নতত্ত্ব এইরূপ। বঙ্কিমচন্দ্রের "স্পেশালের পত্র" ও "রামায়ণের সমালোচনা" তবে কল্পনা-সম্ভূত বলি কি রূপে? আমার বিবেচনায় প্রত্নতত্ত্বে যে তথ্য বাহির হয় হউক কিন্তু তৎসঙ্গে লিখিত ভাষার একটি শৃঙ্খলা ও নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। কথিত ভাষা দেশকালভেদে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ও হয়ও; কিন্তু কথিত ভাষাকে সাহিত্যে স্থায়ী স্থান দান করা কি যুক্তিসঙ্গত?

কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে চিরন্তন প্রভেদ সকল দেশেই আছে। সাহিত্যের ভাষাই ভাষা শিক্ষার একটা উপায়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে ও চিরকালই থাকিবে।" শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "এক শ্রেণীর লেখক কেবলমাত্র প্রচলিত কথায় রচনার পক্ষপাতী; সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের সহিত বঙ্গভাষার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে তাহার উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা প্রয়াসী। সত্যকে সত্যি, এবং মিথ্যাকে মিথ্যে, সূর্য্যকে সুজ্জি এবং রৌদ্রকে রদ্দূর লেখা তাঁহাদের অভিপ্রায়! লিখিত ভাষায় এরূপ পরিবর্ত্তনের কোনই আবশ্যক আমরা বুঝিতে পারি না। কথোপকথনের ভাষার সহিত লিখিত ভাষার পার্থক্য থাকা আবশ্যক। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য জনপদের ভাষাতেও এইরূপ পার্থক্য সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।" —প্রবাহ, মাঘ, ১৩১১।

এ কথা নিশ্চিত সত্য, কারণ দেখা যাইতেছে, কালিদাস লিখিবার সময় লিখিয়াছেন, "বালেন্দুবক্র পলাশপর্ণ" কিন্তু কথিত ভাষাতেও কি ঐরূপ প্রয়োগ করিতেন? জয়দেব কেশর ফুলকে কেশর ফুলই বলিতেন; কিন্তু লিখিয়াছেন, "মদন মহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশর কুসুম।" মধুসূদন মর্ত্ত্যকে মর্ত্ত্যই বলিতেন; কিন্তু লিখিয়াছেন, "উর্ব্বীধাম।" ইহা সম্পূর্ণ রুচিসঙ্গত। তাই বলিয়া Beamosএর মতে কথনের ভাষা সাহিত্যের অঙ্গে শোভা পায়, ইহা কি সঙ্গত? যদি তাহা হয়, তবে শুধু রাজধানীর কথাই চলিবে কেন? আমাদের উভয় বঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন জিলায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষার প্রচলন আছে; সেগুলিও চলিতে পারে। যদি নব্য মতে "কোনো," "মতো," "যাচ্ছি," "গেলুম" চলে, তবে ঢাকার "ক্যান্" শ্রীহট্টের "গ্যাছলাম," "যাইবাম্" যশোহরের "খাতি পাল্লাম না," বর্দ্ধমানের "ক্যানে গেইচি," নদীয়ার "ইন্‌ছিল" বীরভূম, মানভূম অঞ্চলের চন্দ্রবিন্দু বহুল ভাষা না চলিবে কেন? তবেই বঙ্গভাষা বহুরূপিণী হইবেন; ও যে প্রদেশীয় লোকের রচনা, সে রচনা শুধু সেই প্রদেশেই বিচরণ করিবে। অন্য প্রদেশের

লোক যে অন্য প্রদেশের চলিত কথাই বুঝিবেন, তাহা মনে করাও অযৌক্তিক। সুতরাং তখন সাহিত্যও প্রত্যেক জিলায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। এই জন্য দেশের নানা অংশের বিভিন্ন কথিত ভাষার প্রণালীর একীকরণ ও সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহিত্যের এই স্বাতন্ত্রটুকু অতীব প্রয়োজনীয়। এই সাতন্ত্র্য আভিধানিক বিশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগেই সম্ভব।

এ বিশুদ্ধি রক্ষা দূরের কথা, 'শব্দতত্ত্বে' প্রতিপন্ন হইয়াছে—"কাঁকুড়" হইতে "কাঁকরোল" শব্দ উৎপন্ন! ঠাকুর মহাশয়কে বলিয়া দিই—"কাঁকুড়" ও "কাক্‌রোল" দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। ইহাদের স্বাদ, আকার, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক গঠনও সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাকৃত ভাষায় "পাঁচন" ও "উনান" "অন্" ও "আন" প্রত্যয়ে সিদ্ধ! "আতর দান্," "কলম দান্" প্রভৃতি "দান্" প্রত্যয়ে সিদ্ধ। ইহারা যে ফার্সী কথা, এ কথা বোধ হয় তাঁহার জানা নাই। আরও আছে যথা—"আক্কেলমন্ত" হইল "চালাকীমন্ত" হইল না কেন? "থাতাঞ্চি" "চি" প্রত্যয়ে সিদ্ধ। ফার্সী কথাগুলিকে এরূপ ভাবে সিদ্ধ করিতে গিয়া দগ্ধ না করিলেই ভাল হইত। কথাটি "আক্কেলমন্ত" নহে, আসল কথা "আক্কেল মন্দ" যেমন "দৌলৎ মন্দ" "দানেশ মন্দ।" এ গুলি ফার্সী কথা। যাহাই হউক, এরূপ ব্যাকরণে ভাষার কি উন্নতি সাধিত হইতে পারে? আমি বুঝিতেছি, এরূপ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত হইলে প্রভূত অনিষ্টই সাধিত হইবে। কারণ এইরূপ এক একটি বৈদেশিক কথা আসিয়া বঙ্গভাষা হইতে এক একটি কথা চুরি করিয়া লইলে ক্রমে ক্রমে বঙ্গভাষার মধ্যে আর বাঙ্গলা শব্দই থাকিবে না। অতএব এখন হইতেই এ প্রথার যাহাতে প্রসাররোধ হয় সেই চেষ্টা করা উচিত। 'শব্দতত্ত্ব' ভাষার কোনই উপকার করিবে না; বরং ভবিষ্যতে ছাত্রদিগকে আর সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র, সন্ধি, তদ্ধিত বা ধাতুরূপ মুখস্থ হয় নাই বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে পলাইতে হইবে না। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দুঃখ করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ লালিক (Parody) লিখেন নাই। কিন্তু তিনি ব্যাকরণের কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সেই জন্য এইবার আর্য্য ব্যাকরণ প্রণীত হইল। ক্রমশঃ

——:*:——

সমালোচনা।

—:০:—

ছড়া ও গল্প।*

—:*:—

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এই ছেলে-ভুলান বহি লিখিতে দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও আশান্বিত হইয়াছি। ললিত বাবুর পরিহাস-রসিকতায় সাহিত্যের সমুচ্চ প্রাঙ্গণ মুখরিত। সাহিত্য-সম্মিলনে, পূর্ণিমা-মিলনে এবং অন্যান্য সাহিত্য-মজলিশে ললিত বাবুর বিশুদ্ধ উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ কৌতুকের তুফানে সভাস্থল কত সময়ে উদ্বেল ও বিপ্লুত হইয়াছে। শুনিয়াছি, ছাত্রসমাজও তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ চাপল্যবিবর্জ্জিত হাস্যরসে বঞ্চিত নহে। তিনি যে এই সকল উচ্চ আসর ছাড়িয়া শিশুদিগের নিম্ন সমতলে অবতরণ করিবেন, ইহাতে আমরা ভূমিকালেখক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত বিস্ময়প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশে ললিত বাবুর মত কৃতবিদ্য ব্যক্তি যে শিশুদিগের মনোরঞ্জনের জন্য লেখনীগ্রহণ করিবেন, ইহা বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই। যে দেশে হাক্স্‌লির মত বৈজ্ঞানিকও বালকশিক্ষার জন্য পুস্তক রচনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, সে দেশের কথা স্বতন্ত্র। সে দেশে শিশু-দিগের শিক্ষাই জটিল শিক্ষাসমস্যার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কাযেই শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিভাবান ব্যক্তিও বালকবালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় ভাবিতে বাধ্য হয়েন। সরল ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়া সরলমতি শিশু-দিগের শিক্ষার ভিত্তি প্রোথিত করা তাঁহাদিগেরই সাজে।

আমাদের দেশে শিশুশিক্ষা প্রথমতঃ ঠা'নদিদির হাল্‌কা রূপকথা ও গুরু-মহাশয়ের কঠোর বেত্র মাহাত্ম্যের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত। তাহার পর বিদ্যা-সাগর মহাশয় "বর্ণপরিচয়"চ্ছলে যখন বানানের দুর্ভর চাপ বঙ্গীয় শিশুগণের কোমল স্কন্ধে অনেকস্থলে ন্যস্ত করিলেন, তখন সে গুরু ভারে যে তাহাদের দুর্ব্বল কুসুম-পেলব স্কন্ধ অনেকস্থলে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, তাহা কে বলিবে? প্রতি বানানের সঙ্গে যখন শিক্ষার্থীর দেহ বেত্রব্রণাঙ্কিত হইয়া উঠিত, তখন কত ছাত্র

* ছড়া ও গল্প—শ্রীললিতচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্‌ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।

যে বর্ণপরিচয়মাত্রের সঙ্গে পাঠশালার পরিচয় শেষ করিয়াছে এবং কত ভরষার পাত্র যে পাঠশালাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া পরশুরামের ন্যায় কুঠার বা হলধরের ন্যায় লাঙ্গল গ্রহণ করিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া শিশুশিক্ষার সম্বন্ধে সমাজের যে গুরুতর দায়িত্ব আছে, তাহার প্রতি লোকের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিলেন। শিশুদিগের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এখন অনেক নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কাযেই নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে। পূর্ব্বে যে স্থানে শিশুদিগকে শুধু বানান শিখাইয়া এবং বানান শিক্ষান্তে গম্ভীররসাত্মক উপদেশ গলাধঃকরণ করাইয়া শিক্ষাকার্য্যের পরিসমাপ্তি হইত, এক্ষণে সে স্থানে সমঞ্জসীভূত, সমগ্র একটি মানসিক পরিণতি লাভ করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখা দিয়াছে। যে সকল বিচিত্র উপাদানে শিশুর মন গঠিত, সে গুলির সম্যক্ অনুশীলনে যাহাতে মনের স্বাভাবিক এবং সুস্থ অভিব্যক্তি হইতে পারে, সেইরূপ, নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। মনস্তত্ত্বের আলোচনার ফলে এই নূতন দায়িত্বের উপলব্ধি শিশুশিক্ষা জগতে এক নূতন যুগের উদ্বোধন করিয়াছে। পূর্ণ মানব প্রস্তুত করিতে হইলে পূর্ণ শিশু প্রস্তুত করিতে হয়। যে শিক্ষাপ্রণালীতে বালকের মন সমগ্রভাবে ও স্বচ্ছন্দে স্ফূর্ত্তিলাভ করে, তাহাই আদর্শ শিক্ষাপ্রণালী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ধারণার ফলে বালকদিগের প্রবৃত্তিগুলিকে সর্ব্বতোভাবে নিরোধ করিয়া তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বিনষ্ট করা হইত, এখন সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিরোধের স্থলে পোষণ, বিরোধের স্থলে মিলন, শাসনের স্থলে স্নেহ, কঠোরতার স্থলে আমোদ—শিশুশিক্ষার মূল নীতিকে আশ্রয় করিয়াছে।

যদিও এখন সুদূর গণ্ডগ্রামে গুরুমহাশয়কে তাঁহার বেত্রের মহিমাপ্রচারে এখনও বিশেষ আলস্য করিতে দেখা যায় না, তাহা হইলেও সহরে ও সহরোপান্তে সুসংস্কৃত উপায়গুলি ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

উপদেশাত্মক গল্পই যে শিশুশিক্ষার একমাত্র প্রথম সোপান, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। নীতিকথা শিখাইয়া বালকের চরিত্রগঠনের ভিত্তিপত্তন করা অনেকের নিকট প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু মন যখন স্বভাবতঃই পাপস্পর্শকলুষিত নহে, তখন কেবলই পাপ ও তাহার শাস্তিসম্বন্ধীয় উপাখ্যানগুলি বালকদিগের সমক্ষে ধারণ করিলেই যে ভবিষ্যতে পাপের সম্ভাবনা কমিয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ

আছে। শিশুপাঠ্য পুস্তক হইতে নীতিকথাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, এমন কথা বলিতেছি না। নীতিকথার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তাহাকে অস্বাভাবিক রূপে বাড়াইয়া তুলিবার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বয়স্কেরা যখন শিশুদিগের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন সে কথোপকথন নীতিগর্ভ বক্তৃতার মতই হইয়া যায়। আমরা ইহা কদাচ ভুলিতে পারি না যে, শিশুগণ সকল সময়েই উপদেশ্য। শিশুগণের সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদাই উপদেষ্টার আসন লইয়া বসিয়া আছি। কবে কোন্ রাজপুত্রের জন্য কাক-শৃগাল-মূষিকের কথাচ্ছলে 'হিতোপদেশ' রচিত হইয়াছিল, তাহার সাহায্যে আজিও নরশিশুর চরিত্রনীতির বর্ণপরিচয় হইতেছে। বস্তুর সহিত যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আজীবন মানবজ্ঞানের সহচর, সে বস্তুজ্ঞান-লাভ করিবার সম্যক্ সুযোগ শিশুগণকে প্রদান করা হয় না! যে সকল অনুভূতি ও প্রবৃত্তি পরিণামে চরিত্রসম্পূর্ণতার মুখ্য সাধন হয় সে সকল অনুভূতিরও প্রবৃত্তির পরিপুষ্টি সম্পাদনের জন্য সবিশেষ যত্ন করা হয় না। শিশুশিক্ষা, প্রণালীতে এই ত্রুটিগুলি নিরাকরণের প্রয়োজনীয়তা এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার শিশু-সাহিত্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। ইতোমধ্যেই ছেলে-ভুলান ভাষায় অনেক ছেলে-ভুলান কথা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাঞ্জল সংস্করণ প্রকাশে শিশু-সাহিত্যের সমৃদ্ধি অশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ললিত বাবুর পুস্তকখানি শিশুসাহিত্যের মধ্যে যে, একটি উচ্চস্থান অধিকার করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সরল ও তরল ভাষায় যাহাদের হস্তে দিবার জন্য ললিত বাবু এই সুন্দর সুদৃশ্য পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারা যে ইহা দেখিয়া ভুলিবে, তাহা স্বাভাবিক; তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠেরাও যে পুস্তকখানি প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিবেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই বিচিত্র ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের উপকরণগুলি সম্পূর্ণ স্বদেশজাত; ইহাই আলোচ্য পুস্তকের প্রধান বিশেষত্ব। যে সকল রূপকথা চিরকাল আমাদের নিতান্ত ঘরের সামগ্রীর মত বাল্যজীবনকে সোহাগে আদরে বর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছে চিরকাল যাহা আমাদের সুকুমার শিশুগণের কোমল অধরে হাসির অমল শুভ্রজ্যোতিঃ ফুটাইয়া আমাদের চিরপ্রিয় গৃহপ্রাঙ্গণকে আলোক-পুলকে ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই ভাণ্ডার হইতে বাছিয়া কয়েকটি ছড়া ও গল্প এই পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত করিয়া ললিত বাবু শিশু ও বয়োবৃদ্ধদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পুস্তকখানির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উপদেশাত্মক গল্পগুলিকে হাস্যরসে অভিষিক্ত করিয়া শিশুদিগকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। হাস্যরস শিশুদিগের উপভোগযোগ্য করিয়া উপস্থিত করা অতি কঠিন ব্যাপার। কেহ কেহ চেষ্টা করিয়া থাকিলেও এ বিষয় অতি অল্পলেখককেই কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়াছি। ললিতবাবু এ বিষয়ে যশস্বী। তাঁহার কৃতকার্য্যতা শিশু-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার হাস্যরসের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, হাস্যরস শুভ্র। শারদ কৌমুদীর ন্যায় নিষ্কলঙ্ক শুভ্র শৈশবে শুভ্র হাস্যরসের জ্যোতি অতি রমণীয় ও স্নিগ্ধ। গম্ভীরভাবে উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু হাস্যরসের সহিত মিশাইয়া সে উপদেশ গুলিকে মনে চিরস্থায়িভাবে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া বড়ই কঠিন। এ বিষয়ে ললিত বাবুকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। পরিহাস-রসিকতা ললিত কলার (Fine Arts) স্বাধীন অভিব্যক্তি। সুস্থ সরল হাস্যকৌতুকে বানান-বাহুল্য-নিপীড়িত ও অতি সাধারণ উপদেশাবলি-কণ্টকিত শিশুজীবনে সহজে প্রফুল্ল স্ফুরণ অনুভব করিতে পারা শিশু শিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। সে হিসাবে ললিত বাবুর পুস্তকখানি শিশু-সাহিত্যের একটি অভাব পূর্ণ করিবে।

—:•:—

সন্ধ্যা।

—:*:—

এল সন্ধ্যা শান্তিময়ী, ধূসর অঞ্চল
ছড়াইয়া নীলাকাশে জুড়া'য়ে ধরায়
ডুবাইয়া ধরণীর কল কোলাহল
দিবসের রেখা মুছি' আকাশের গায়।

কি পবিত্র কি মহান্ কি স্নিগ্ধ পরশ!
এমনি প্রশান্ত পদে মরণের তীরে
মুছাইয়া পরাণের দুখের হুতাশ;
জীবনের শ্যাম সন্ধ্যা নেমে আসে ধীরে।

শ্রীলাবণ্যময়ী বসু।

———

সংগ্রহ।

সাহিত্য।

উপন্যাসের ভবিষ্যত।

গত পৌষমাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' ফরাসী উপন্যাসের আলোচনায় দেখা যায়, লেখক এই মত প্রচারিত করিয়াছেন যে, উপন্যাসের অবনতিই তাহার স্বাভাবিক পরিণতি। সংপ্রতি হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে উপন্যাসের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আর্য্যাবর্ত্ত সম্পাদকের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উপন্যাসের বিলোপসম্ভাবনা যে সুদূর-পরিহিত ইহাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখক প্রবন্ধারম্ভে জুল ভার্ণের বিরুদ্ধ মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।—ভার্ণে বলিয়াছিলেন, পঞ্চাশ বা শত বৎসর পরে উপন্যাস থাকিবে না। সংবাদপত্র সে স্থান অধিকৃত করিবে। এখনই উপন্যাসের অনাদর আরব্ধ হইয়াছে। পাঠকসমাজ সংবাদপত্রই পাঠ করিবেন। সংবাদ-পত্র-লেখকগণ দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত করিয়া পাঠক সমাজে উপস্থিত করিবেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক গিদে মোপাঁসা ইহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ছোট গল্প-গুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন।

ভ্রম। লেখকের মতে ভার্ণের ভুল এই যে, তিনি উপন্যাসে ও ছোট গল্পে প্রভেদ বুঝেন নাই। এই দুইটির স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট ও সমুজ্জল। ছোট গল্প আর যাহাই হউক না কেন, উপন্যাস নহে। সুসম্বদ্ধ আখ্যানবস্তু ব্যতীত উপন্যাস হয় না; ছোট গল্পে আখ্যানবস্তু থাকে ভাল, না থাকিলেও কিছু আইসে যায় না। ঔপন্যাসিক অভিনেতা ও অভিনেত্রী সুশোভিত রঙ্গমঞ্চ চিত্রিত করেন। ছোটগল্প-লেখক একটিমাত্র ঘটনার উপর আলোকপাত করিয়া তাহারই প্রাধান্য প্রতিপন্ন করেন। যে ঘটনায় ছোট গল্পের মেরুদণ্ড রচিত হয়, উপন্যাসের হিসাবে তাহা হয় ত অকিঞ্চিৎকর। মহাকাব্য ও গীতি কবিতা এক নহে; এক হইতে পারে না।

ছোট গল্প। ছোট গল্পে মৌলিকতার প্রয়োজন; সংক্ষিপ্ততা তাহার সর্ব্ব প্রধান গুণ। ছোট গল্পে বাহুল্য বর্জ্জনীয়; সেই জন্যই বহু প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ছোট গল্প রচনায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সাহিত্যে সৌন্দর্য্যই স্থায়িত্বের উপাদান। উপন্যাসে মানব চরিত্রের যথার্থ বর্ণনায় সেই সৌন্দর্য্য। কেবল উপমায় ভাষা যেমন কবিতা হয় না, কেবল বর্ণনায় বা ঘটনায় তেমনই উপন্যাস হয় না। মানবচরিত্রচিত্রণে সাফল্যই উপন্যাসিকের রচনায় স্থায়িত্বের কারণ। যত দিন মানুষ সৌন্দর্য্যের আদর করিবে তত দিন উপন্যাসের

বিলোপ-সম্ভাবনা নাই। যেরূপ এক কালে বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কবিতার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। সে ভবিষ্যদ্বাণী ফলে নাই। বরং দেখা গিয়াছে, টেনিসন প্রভৃতি প্রতিভবান কবিরা বৈজ্ঞানিক সত্যে কবিতার প্রসাধন করিয়াছেন।

অসার যুক্তি। যাঁহারা বলেন, ভবিষ্যতে পাঠকগণ উপন্যাস ছাড়িয়া সংবাদপত্র পাঠ করিবেন, তাঁহারা বলেন, ভবিষ্যতে লোকের আর অধিক অবসর থাকিবে না। বরং দেখা যাইতেছে বিজ্ঞানের কৃপায় দুঃসাধ্য কার্য্য সুসাধ্য হইতেছে—মানবের অবসর বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে আর তাঁহাদের যুক্তির সার্থকতা কোথায়? উপন্যাস শিল্পকীর্ত্তি। তাহা

নিত্য সত্য। মানব চরিত্রের নিত্য সত্য বস্তু লইয়া ব্যাপৃত। ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপন্যাস স্থায়ী হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট উপন্যাসে মানব চরিত্রের কোন না কোন নিত্য সত্য সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়। প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিকগণ মানব জীবনের বিস্তৃতপ্রবাহের চিত্রই চিত্রিত করেন—অন্যান্য বিষয় তাঁহাদিগের নিকট উপেক্ষণীয়।

মতামত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সমালোচক ফ্রেডরিক হ্যারিসনও বলিয়াছিলেন, উপন্যাসের বিলোপ অনিবার্য্য। মানব জীবন দিন দিন রহস্যহীন, বর্ণ-বৈচিত্র্যবর্জ্জিত হইতেছে। আমাদের মনে হয়, সমাজের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবন দিন দিন অধিকতর রহস্যময় ও বিচিত্রবর্ণবহুল হইতেছে। বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, টেলিগ্রাফ, গ্রামোফোন—এ সকলের আবির্ভাবে ঔপন্যাসিকের পক্ষে অনেক অপূর্ব্ব নূতন ঘটনার সমাবেশ-সম্ভাবনা ঘটিতেছে। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ক্রকোর্ড বলিয়াছিলেন, প্রেমই উপন্যাসের মেরুদণ্ড। প্রেমের মত সর্ব্বজয়ী সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বপ্রিয় বৃত্তি আর নাই। এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু প্রেম ব্যতীতও যে গল্প চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, বলজাক তাঁহার Atheist's Massএ তাহা দেখাইয়াছেন। প্রকৃত ক্ষমতাশালী লেখকের হস্তে উপন্যাস শাণিত অস্ত্রের মত প্রতীয়মান হয়। ডিকেন্স উপন্যাসের সাহায্যে বহু অনাচারের সংস্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। মেরী করেলীর চেষ্টাও সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয় নাই। মিষ্টার গার্ডণের মত আমরাও বলি,কোন সংবাদ-পত্রের প্রচার-বাহুল্যে উপন্যাসের অনাদর হওয়া দূরে থাকুক, বরং, বোধ হয় উপন্যাসের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। হয় ত কোন কোন দেশে বর্ত্তমান সময়ে উপন্যাসের অবনতি লক্ষিত হইতেছে· কিন্তু তাহাতে উপন্যাসের বিলোপ সূচিত হয় না। এক কালে গ্রীসে নাট্যসাহিত্যে অবনতি লক্ষিত হইয়াছেন। এক কালে ইটালীতে ইতিহাসের ও ফ্রান্সে সুখান্তক নাটকের অবনতি লক্ষিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে বহুবার উপন্যাসের অবনতি লক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই অবনতি স্থায়ী হয় নাই। সুতরাং উপন্যাসের বিলোপ-সম্ভাবনা নাই।

বিবিধ।

সংক্রামক কলেরা।

গত ৩রা জানুয়ারী তারিখে বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক অধিবেশনে মেজর লিওনার্ড রজার্স "সংক্রামক কলেরা" সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-টিতে সাধারণের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আলোচিত হইয়াছিল, সেই জন্য আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটি আবশ্যক কথার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ।

ইদানীং কলেরা রোগ বার বার য়ুরোপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; সেই জন্য ইহার ইতি-হাস জানিবার জন্য অনেকের কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইতেছে। খ্রীষ্ট জন্মি-বার চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থে এবং হিপেক্রিটেসের গ্রন্থে এই রোগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫০৩ এবং ১৮১৭-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই রোগ ভারতে আবির্ভূত হইয়াছে;—ইহা ম্যাক্‌ফার্সনের লিখিত বিবরণে সপ্রকাশ। কিন্তু ঐ সময়ের শেষ ২৩ বৎসর ঐ রোগের বিশেষ কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নাই। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর কালমধ্যে এই রোগ সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এবার দক্ষিণ বঙ্গেই (জিলা যশোহরে) এই রোগ প্রথম দেখা দেয়। তখন উহা নুতন রোগ বলিয়াই অনুমিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে এই রোগ সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান আরব্ধ হইয়াছে। বায়ুমণ্ডলের তাড়িত অবস্থার বিপর্য্যয় ফলে এই রোগ আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং উহা বায়ু কর্ত্তৃক বাহিত হয়, তখনকার লোকের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল। ডাক্তার রজার্স প্রাচীন বৈদ্যক শাস্ত্রে উল্লিখিত "বিসূচিকা" রোগকেই কলেরা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া-ছেন। আর রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রসিদ্ধ 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানেও বিসূচিকা শব্দের অর্থ ওলাউঠাই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কলেরা বাস্তবিকই বিসূচিকা কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমরা অনাবশ্যক বোধে এ স্থলে তাহার আলোচনা করিব না।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আর একবার ওলাউঠা রোগ বিধ্বংসিনী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আফ্‌গান রাজ্যে, পারস্যে এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব রুসিয়ায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইবারকার ওলাউঠার সংক্রামক প্রবাহ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ে য়ুরোপের গ্রেটবৃটেন পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্কটলণ্ডের এডিনবরা সহরে ভীষণা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। ঐ সময় তথায় শিরার মধ্যে "স্যালাইন সলি-উসন" প্রবিষ্ট করণের উপকারিতা পরীক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা বিশেষ ফলোপধায়ী হয় নাই। ১৮৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে এই দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণে আমেরিকার কানেডা ও মার্কিণ রাজ্য প্রপীড়িত

বঙ্গে আবির্ভাব।

হইয়াছিল। য়ুরোপের এই সংক্রামক ব্যাধির বিসর্পণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-গণ অনেক বিশেষ তথ্য অবগত হইয়াছিলেন। অশীতিবর্ষপূর্ব্বে যাতা-য়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল না। সেই জন্য এই ব্যাধি ক্ষিপ্রতায় সহিত অগ্রসর হইতে পারে নাই। এবার এই ব্যাধির নিদান সম্বন্ধে কোনও নুতন তথ্যই আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ওলাউঠা রোগ দ্বিতীয়বার ধ্বংসিনী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার ইহার বিসর্পণে বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছিল। কলিকাতা হইতে কতকগুলি সিপাহী সিঙ্গাপুরে ও চীনে প্রেরিত হয়। ইহারাই ঐ স্থানে ঐ রোগ বিসর্পিত করে। চীন হইতে ঐ ব্যাধি ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে সংক্রমণ করিয়া চাইনিজ তুর্কিস্থান, আফগানিস্থান, পারস্ত, য়ুরোপ এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা পর্য্যন্ত বিসর্পিত হয়। আবার পথে বক্র গতিতে ব্রহ্ম হইতে ভারতে এবং আফগান রাজ্য হইতে পঞ্চনদে প্রবেশ করে। সেবার এই সাংঘাতিক ব্যাধিতে কেবলমাত্র রুস রাজ্যেই দশ লক্ষ লোক, ইংলণ্ডে ৫৩ হাজার ২ শত ৯৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময় স্নো এবং বাড্ নামক দুইজন চিকিৎসক বহু গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে, বারি কর্ত্তৃকই এই বিষম ব্যাধি জনসমাজে বিসর্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ প্রামাণ্য চিকিৎসক তখন এই সিদ্ধান্ত আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই; তাঁহারা এই রোগকে বারিবাহিত মনে না করিয়া বায়ুবাহিত মনে করিতেন। লোকের মনে একবার একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইলে তাহা সহজে উৎপাটিত হইতে চাহে না।

দ্বিতীয় মহামারীর বৈচিত্র্য।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সংক্রামক ওলাউঠা বোম্বাই হইতে পারস্য উপসাগরে বিসর্পিত হয়। পর বৎসর উহা পারস্যেই লোকসংহার করিয়া তৎপর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রুসিয়ায় প্রবেশ করে। ঐ বৎসরই ঐ রোগ আমেরিকা পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়। কলেরা রোগীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিবার ও কলেরা প্রপীড়িত স্থান হইতে যানাদির গতায়াত রুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা এই সময়েই অনুভূত হইয়াছিল। ডাক্তার সিম্‌সন্ এই সময় লণ্ডনে "কোয়ারান্টাইন" * বিধি প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রড ষ্ট্রীটস্থ কলের জলাধার সম্পর্কিত ব্যাপারের অনুসন্ধানে কলেরা যে বারিবাহিত, তাহা স্পষ্টই সপ্রমাণ হয়। এই জলাধারের সান্নিধ্যে ময়লা আবর্জ্জনাময় জলপূর্ণ একটি গহ্বর ছিল। উহা হইতে দুষিত জল কলজলাধারের জলে মিশ্রিত ও সাধারণের পানীয় জলকে দুষিত করিত। সেই জলাধারসংশ্লিষ্ট নলের জল যাহারা পান করিত, তাহাদের মধ্যে এই রোগ বিকট মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া পড়ে। কিন্তু কুসংস্কারের এমনই প্রভাব যে, এই সম্বন্ধে যাঁহারা অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তখনও উহা বায়ুবাহিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এইবার লণ্ডনে ও নিউকাসেলে প্রাপ্ত অনেক তথ্যের দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, এই রোগ বারিদ্বারা বিসর্পিত হয়। এই উপলক্ষে সহরের জল সরবরাহ সম্পর্কে নূতন বিধি প্রণীত হয় এবং তাহার ফলে লণ্ডন সহরের স্বাস্থ্য বিশেষরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে।

নিদানানুসন্ধান ও প্রতিষেধ ব্যবস্থা।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপ আবার এই রোগ জনপদ বিধ্বংসী রূপে দেখা দিয়াছিল। এইবার এই রোগ বোম্বাই হইতে মক্কায় যায়। এ আক্রমণে ৯০ হাজার মক্কা যাত্রীর মধ্যে ৩০ হাজার

---

* রোগাক্রান্ত স্থান হইতে জাহাজাদি বন্দরে উপস্থিত হইলে উহা কিছু দিন আবদ্ধ রাখা হইত। যাত্রীরাও ঐ সঙ্গে সঙ্গে আটক থাকিত।

নিদান নির্ণয়।

এই রোগে মরে। সে বার এই রোগ আরব হইতে মিশরে এবং মিশর হইতে ভূমধ্যসাগরের উভয়কুল উৎসন্ন করিয়া আমেরিকায় পঁহুছে। প্রয়াগ ও মক্কা যাত্রিগণ কর্ত্তৃক এই রোগ দ্রুতভাবে বিসর্পিত হইয়া থাকে। লণ্ডন সহরে এইবার একটি বিষয় বিশেষরূপ লক্ষিত হইয়াছিল। লী নদী হইতে যাহাদিগকে অপরিষ্কৃত জল সরবরাহ করা হইত, তাহাদিগের মধ্যে হাজার করা ১২ জন এই রোগে মরিয়াছিল। কিন্তু অন্যস্থান হইতে যাহাদের জল সরবরাহ হইত, তাহাদের মধ্যে হাজার করা ৩ হইতে ৮ জনের অধিক লোক এই রোগে মরে নাই। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার এই সাজ্বাতিক রোগ আফ্‌গানিস্থান ও পারস্য হইয়া রুসিয়ায় প্রবেশ করে এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোকসংহার করিতে থাকে। তাহার পর কিছুদিন এই রোগ কতকটা শান্ত ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই অঞ্চল হইতে ইহা আবার মক্কায় ও মিশরে বিসর্পিত হয়। এইবার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ক এই রোগের বর্ত্তমান নিদান নির্ণীত করেন। তিনিই সিদ্ধান্ত করেন যে, কমার (,) মত আকৃতি বিশিষ্ট একপ্রকার জীবানুই কলেরা রোগের উৎপাদক। ইহার ফলে এই রোগের চিকিৎসা ও প্রতিষেধের উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতার ডাক্তার কে. সি. ম্যাক্‌নামারা রোগবীজানুসম্পর্কে এই রোগের নিদানানুসন্ধান করিতে বলেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনায় তখন কেহই কর্ণপাত করে নাই। সুতরাং অন্য দেশীয় লোক এই আবিষ্কারের খ্যাতিলাভ করিল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বার হইতে আফ্‌গানিস্থানে ও পারস্যে লোক ক্ষয় করিয়া এই রোগ আবার রুসিয়া ও জর্ম্মানীর হাম্বার্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে। পাঁচমাসকালমধ্যে এই রোগ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে।

এই বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। যাতায়াতের সুবিধাই এই রোগ বিসর্পণের ক্ষিপ্রতার কারণ। এই বৎসর ইংলণ্ডের কয়েকটি সহরেও কয়েকটি কলেরা রোগ আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু তথায় তত্ত্বাবধানগুণে ঐ রোগ কোথাও বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে নাই।

বিংশ শতাব্দীর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত য়ুরোপে কলেরার প্রকোপ হয় নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ রুসিয়ায় আবার এই রোগ আবির্ভূত হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে এই রোগ প্রবল-

বিংশ শতাব্দীতে।

মূর্ত্তি ধরে এবং শরৎকালেই রুসরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করে। ঐ সময় এক সেণ্টপিটার্সবর্গ সহরেই ৬ হাজার লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দেও রুসিয়ায় এই রোগ ভীষণ আকার ধারণ করে। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসের মধ্যেই তথায় ৬ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ বৎসর হলণ্ডেও ঐ রোগ দেখা দিয়াছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এই রোগ আবার রুসিয়ায় সংহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া লোক ক্ষয় করিতে থাকে। এবার তথায় ২ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত ও ৯০ হাজার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মেজর লিওনার্ড রজার্স বলিয়াছেন, এ বৎসর তথায় যত লোক যমালয়ে গিয়াছে, ভারতে কয়েক বৎসরে তত লোক শমনসদনে নীত হয় না। এ হিসাব কিরূপ তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য কমিশনারের রিপোর্টেই প্রকাশ যে, অর্দ্ধ বঙ্গেই প্রতিবৎসর প্রায় দুই লক্ষ লোক কলেরায় মরিয়া থাকে। ঐ বৎসর ইটালীতেও এই রোগ সংক্রামক মূর্ত্তিও

আত্মপ্রকাশ করে এবং বিগত সেপ্টেম্বর মাসেই নেপল্‌স জিলার সহস্র লোকের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।

ইহার পর হইতেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, পর্ত্তুগালের ও মেদিরা দ্বীপপুঞ্জে এই রোগের প্রকোপ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন জর্ম্মাণীর পূর্ব্বখণ্ডে ও অন্যান্য স্থানে এই রোগ দেখা দিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই বৎসরও য়ুরোপ এই ভীষণ রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। এই রোগ সংক্রমণের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় বুঝিতে পারা যায়, শীতের কয়েক মাস এই ব্যাধির প্রকোপ অপ্রকাশিত থাকে; সম্ভবতঃ দারুণ শীতে ইহার সংক্রমণ শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে—বিশেষতঃ দক্ষিণ য়ুরোপে—এই ব্যাধি ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া লোক ক্ষয় করিবে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মিশরে ও দক্ষিণ য়ুরোপে কলেরার যেরূপ প্রকোপ হইয়াছিল, তদপেক্ষাও এবারকার আক্রমণ গুরুতর হইবার সম্ভাবনা। তবে এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই। বিলাতের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। তথাকার সহরে জল সরবরাহের সুবন্দোবস্তগুণে এই ব্যাধির প্রধান বিষাণ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্স ও জর্ম্মাণীর সম্বন্ধে অনেকটা ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে; কিন্তু দক্ষিণ য়ুরোপের নগরে নগরে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হয় নাই, সেই জন্য তথায়ই গুরুতর আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান।

ভীষণা ভবিষ্যদ্বাণী।

ডাক্তার রজার্স এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে অধিক কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে যদি ভাল ভাবে চিকিৎসাকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহা হইলে এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হয়। কলিকাতার মেডিকেল কলেজে পূর্ব্বে কয়েক বৎসর শতকরা ৫৯ জন কলেরা রোগীর প্রাণাবসান হইত। গত বৎসর কলেরা রোগীর মধ্যে শতকরা ২৩ জনের জীবনান্ত হইয়াছে। আর গত তিন বৎসরে গড়ে শত করা ৩০ জনেরও কম রোগীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। যে সময় কলেরা রোগ প্রকাশ পায়, সে সময় সকল জিনিসই সুসিদ্ধ করিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ জল ভাল করিয়া না ফুটাইয়া পান করা কর্ত্তব্য নহে। জেলি খাওয়া পরিত্যাগ করা বিধেয়। সোডা ওয়াটার এক সপ্তাহকাল নির্দ্দোষ থাকে; কিন্তু যাহারা জলকে শোধন করিয়া উহা বীজাণু শূন্য করিয়া (Sterilized water) উহাতে সোডা প্রস্তুত করে, তাহাদের কারখানার সোডা ব্যবহার বিধেয়।

পুরাতন।

—:*:—

(১)

যাই—তবে যাই!
দিনান্তে এ শ্রান্ত পান্থ সাথী কারে পাই!
তুমি আসিয়াছ আজি
বিচিত্র শোভায় সাজি'
আমি চলিয়াছি ত্যজি' যা' পেয়েছি তাই!
আজ সান্ধ্য সমীরণে
এ বিশুষ্ক উপবনে
কি ফুলে তুষিব তোমা? ফুল আর নাই।
তোমারি ও পথ চাহি,'
এ জীবন গেছে বাহি',
আজ আসিয়াছ; নাই বসাবার ঠাঁই।
ভাঙ্গিয়া চলেছি সব;—যাই—আমি যাই।

(২)

কেন এলে আজ;
সঙ্গে যবে তোমা ছাড়া জীবনের কায?
সে অর্চ্চনা, উপহার,
ব্যাকুলতা, আঁখিধার
তোমা তরে সেই নিত্য অভিনব সাজ;
নিত্য ডাকা নিরবধি,—
তখন আসনি যদি
কেন এলে আজ? এ যে সীমাহীন লাজ।
বিদায়-আহ্বান স্বর
ভরিছে এ ভাঙ্গাঘর;
আহ্বান কোথায় দিব বিদায়ের মাঝ?
এতদিন আস নাই; কেন এলে আজ?

(৩)

মিছে কেন আর ?
বিদায়ে দাঁড়ান মিছে জুড়ি' ভাঙ্গাদ্বার।
আজ নব সুখ আশ
অদৃষ্টের উপহাস ;
যাতনে সুখের হাসি শুধু হাহাকার।
যে জীবন গেছে কেঁদে
ভাঙ্গাবুকে বল বেঁধে
তা'রে রাখা দুটো দিন আলোকে আঁধার।
ঘাটে নৌকা, ডাকে নেয়ে,
অন্ধকার আসে ছেয়ে ;
গোধূলি আঁধারে ফুটে আলো তারকার,
আমি চলিয়াছি—মোরে ফিরায়ো না আর।

(৪)

সাঙ্গ মোর সব ;
উঠিছে নবীন রবি নব কলরব।
মোর সুখ, মোর আশা,
মোর তৃষা, ভালবাসা,
সে সব মলিন আজ—বিচ্যুত গৌরব।
হেথা ভগ্ন জীর্ণ প্রাণে
র'ব কি আশার টানে ?
পরিচিত পুরাতন কোথা সেই সব !
মোর জীর্ণ ভাঙ্গা ঘর
ভেঙ্গে পড়ে ধূলী'পর ;
মোর কি লাগিবে ভাল নবীন উৎসব !
আমি যাই—আমি যাই ; সাঙ্গ মোর সব।

——:*:——

Printed by B. B. Basack at the Shree Madhab Press
14, Shambazar Street, Calcutta.

পুরাতন প্রসঙ্গ।



(৪)

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩১৭

পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "৺দ্বারকা নাথ মিত্রের কথা আমার নিকট হইতে শুনিতে চাহ; সে ত এক আধ ঘণ্টার কর্ম্ম নহে। এতাবৎ আমার যত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৺দ্বারকা নাথ মিত্রের মত সমুজ্জল ধীশক্তিসম্পন্ন লোক, এমন brilliant intellect আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। বাইশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন; বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতেই তিনি হাইকোর্টের জজ হয়েন। অন্ততঃ দশ বৎসর ওকালতী না করিলে হাইকোর্টের জজ হওয়া যায় না, এই নিয়ম না থাকিলে তিনি যে আরও পূর্ব্বে জজ হইতেন না, এমন কথা বলা যায় না। গ্রে সাহেব তখন বাঙ্গালার ছোটলাট; সার বার্ণ্‌স্ পীকক্ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। যখন সকলেই মনে করিয়াছিল যে, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ হইবেন, তখন হঠাৎ এক দিন লাট সাহেব দ্বারি বাবুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'আপনার হাইকোর্টের জজ হইতে আপত্তি আছে কি?' দ্বারি বাবু উত্তর করিলেন, 'না।' লাট সাহেব বলিলেন 'Did you apply for the post?' উত্তর হইল 'No, I thought that these appointments did not go by application.' কয়েক দিবস পরেই তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হইলেন। রাসবিহারীর ভাষায় বলিতে গেলে এত দিন পরে দ্বারি বাবু The Great Unwashed এর দল হইতে বাহির হইলেন।

"তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়, আমার বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়ী। প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগেন্দ্র আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। দ্বারি বাবু শুনিয়াছিলেন যে, আমি কিছু কিছু কোম্‌ৎ পড়িতাম; তাই আমার সহিত আলাপ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়; দ্বারি বাবু তৎকালে কোম্‌তের পাকা শিষ্য হইয়াছিলেন। আন্দাজ ১৮৬৫ সালে তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপপরিচয় হয়। ওকালতীতে তখন দ্বারি বাবুর খুব প্রতিপত্তি

রাইয়তদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে বিরাট মোকর্দ্দমা তিনি চালাইয়াছিলেন, সেটা The Great Rent Case নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রধান বিচারপতি পীকক্ তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিলেন। দ্বারি বাবু দশ বৎসর ওকালতী করিলেন; কিন্তু একদিনের জন্যও কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। প্রত্যহ রাত্রি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমার কার্য্য করিতেন, তাহার পরে কোম্‌তের এক Chapter না পড়িলে তিনি কিছুতেই ঘুমাইতে পারিতেন না। বেলা আটটা নয়টার সময় তিনি শয্যা হইতে উঠিতেন। বেড়ান কি অন্য কোন রূপ ব্যায়াম তাঁহার ছিল না; আদালতে যাওয়াআসা গাড়ীতেই হইত। তিনি পাশা খেলিতে খুব ভাল বাসিতেন, দাবাও খুব ভাল খেলিতে পারিতেন, কিন্তু পাশাই খুব বেশী খেলিতেন।

"জজ হইয়া প্রথম প্রথম তিনি প্রধান বিচারপতির সহিত বসিতেন। তিনি বলিতেন, 'দেখুন, আমি চিফ্ এর সঙ্গে বোসে অনেক শিখ্‌চি।' সার বার্ণ্‌স্ ও প্রত্যহ রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত আইন অধ্যয়ন করিতেন। দ্বারি বাবুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। যে দিন একটা ইংরাজী পত্রে জনৈক শ্বেতাঙ্গ দ্বারি বাবুর, তথা হাইকোর্টের প্রতি, বিদ্রূপ করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল, সেই রাত্রিতে সার বার্ণ্‌স্ দ্বারি বাবুকে ডাকাইয়া সেই অপরাধীর নামে এক পরোয়ানা জারি করিলেন। সাহেবকে ধরিয়া আনা হইলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

"সার বার্ণ্‌স্ কার্য্য হইতে অবসর লইলে একবার হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদিগের সহিত দ্বারি বাবুর মনোবাদ হয়; তিনি আমায় বলিতেন, 'দেখুন, Resignation (পদত্যাগপত্র) আমার পকেটে রেখে দিয়েছি, যখন ইচ্ছে দোবো।' আদালতের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিচারপতিগণ একত্র মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; একবার তর্কস্থলে সার লুইস্ জ্যাক্‌সন 'But my dear fellow' বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'I protest against being addressed in that way.' জ্যাক্‌সন্ সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দ্বারি বাবুর মৃত্যুতে যখন হাইকোর্ট শোক প্রকাশ করেন, এই জ্যাক্‌সন্ সাহেব জজদিগের তরফ হইতে তাঁহার যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেরূপ প্রশংসাবাদ আর কখনও হাইকোর্টে শুনা যায় নাই। প্রধান বিচারপতি সার রিজার্ড কুচ আইন সম্পর্কীয় ছাড়া অন্য বিষয়ে বড় একটা বেশী কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন না; তাই শোক-

প্রকাশ করিবার ভার জ্যাক্‌সন্ সাহেবের উপর পড়িয়া ছিল। আমি সে সময় আদালতে উপস্থিত ছিলাম। এখনও জ্যাক্‌সন সাহেবের কথাগুলি আমার বেশ মনে পড়ে।

"ইংরাজী সাহিত্যে ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তখনকার দিনে লাইব্রেরী পরীক্ষা দিতে পারা বড় সম্মানের বিষয় ছিল। তিনি হুগলি কলেজ হইতে লাইব্রেরী পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি Alison's Europe এর আট ভলুম আট দিনে পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিতেন যে, অঙ্কেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিতেন; অন্যায় করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্রকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইল। তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন যে, হলে একজন পরীক্ষক উক্ত ছাত্রের খাতায় অঙ্ক কসিয়া দিলেন। এখন তাঁহাদের কেহই জীবিত নাই। তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া এ কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই।

"কোম্‌তের দর্শন শাস্ত্র যে দ্বারি বাবুর জীবনে কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাস্তবিক কোম্‌ৎ দ্বারি বাবুর ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কেবলই বলিতেন যে, হয় আমরা কোম্‌ৎকে সমগ্র মানব-সমাজের গুরু বলিয়া গ্রহণ করিব, নহে ত মানব-সমাজ উৎসন্ন হইয়া যাইবে। ষ্টুয়ার্ট মিলও এক দিন এ কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, সমগ্র মানবসমষ্টির পূজা একটি অত্যন্ত সুন্দর ideal। দ্বারি বাবুকে মিল্ এর মত নাস্তিক না বলিয়া আমি তাঁহাকে অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) বলিতে চাহি। তিনি ঈশ্বর, পরকাল, স্বর্গ নরক ইত্যাদি কিছুই মানিতেন না।

"কোম্‌তের পুস্তক যখন তিনি পড়েন নাই, তখন প্রথম নেপোলিয়ানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; কিন্তু কোম্‌ৎ পড়িয়াই তাঁহার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। কোম্‌ৎ নেপোলিয়ানকে যেরূপ গালি দিয়াছেন. বোধ হয় আর কেহই সেরূপ দেয় নাই। দ্বারি বাবুও শেষাশেষি নেপোলিয়ানকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন। Franco-Prusisan War এর সময় যে দিন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে, সেডান্ ক্ষেত্রে ফরাসী সম্রাট্ দেড়লক্ষ ফৌজের সহিত বিপক্ষহস্তে আত্মসমর্পণ ক'রয়াছেন, সে দিন দ্বারি বাবুর প্রাণে যেন একটা ছট্‌ফটানির মত দেখিলাম; তিনি ঘৃণায় কর্সি কায় ও

কর্ণিকার গোষ্ঠীর নামোল্লেখ করিয়া চৌদ্দ পুরুষান্ত করিলেন। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সেই মূর্ত্তি আমার স্মৃতিপথে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং তাঁহার ক্রোধের তীক্ষ্ণতা মনে করিলে এখনও আমার হাসি আসে।

"কোম্‌ৎ তিন প্রকার বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন :—প্রথমতঃ Civil marriage,এ স্থলে বিবাহ একটা চুক্তিমাত্র, দম্পতীর অমিল হইলে এ বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ Religious marriage, এ সম্বন্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ, ইহা চিরদিনের জন্য অবিচ্ছিন্ন, বিপত্নীক কিম্বা বিধবা কেহই দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারিবেন না। আর একপ্রকার বিবাহকে তিনি Chaste marriage আখ্যা দিয়াছিলেন, এ বিবাহে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ হইয়াও কোন কারণ বশতঃ সহবাস করিবে না ;—হয় ত শারীরিক বা মানসিক ব্যাধি এমন কিছু আছে. যাহা সন্তানের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।

"কোম্‌তের ভক্তশিষ্য দ্বারি বাবু স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশ্যতঃ কোম্‌তের আজ্ঞা এক প্রকার উল্লঙ্ঘন করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু সে কার্য্য অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহা কর্ত্তৃক করা হইয়া-ছিল। সে সম্বন্ধে তিনি কেবল এইমাত্র দোষপ্রক্ষালন স্বরূপ বলিতেন, 'কি করি'; প্রতিদিন আহারের সময় মা নিকটে আসিয়া চোখের জল ফেলেন ; আর কত দিন মা'র এই ভাব দেখিতে পারি ? কিন্তু আমার দোষ হইয়াছে বলিয়া আমার গুরুদেবের উপর দোষ স্পর্শ হওয়া ত উচিত নয়।' তদুত্তরে আমি কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলাম, 'লোকে বোলবে কি জানেন ? যে doctrine লোকের conduct inspire কোরতে না পারে তা'র value কি ?'

"প্যাট্রিয়টের" সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কিছু কিছু পান-দোষ ছিল ; সেই দেখাদেখি go-ahead যুবকের দলের অনেকে মদ খাইতে শিখিয়াছিলেন ; বোধ হয় দ্বারিবাবু ও প্রথম তাঁহাদেরই দলের একজন হইয়া-ছিলেন। কিন্তু কোম্‌তের পুস্তক পাঠ করার পর তিনি মদ একেবারে ত্যাগ করিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি মদ স্পর্শ করেন নাই ; কিন্তু শেষাশেষি তিনি পুনরায় মদ ধরিয়াছিলেন। কোম্‌তের নিষেধ যে তিনি এতদিন মানিয়া চলিতে পারিয়া ছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

"Distinction of function অর্থাৎ অধিকারভেদ—কোম্‌তের একটি প্রধান কথা। Temporal Power ও Spiritual Power স্বতন্ত্র হওয়া চাহি

ইহা তাঁহার দর্শনের Cardinal Poimt। দ্বারিবাবুও বোধ হয় সকল বিষয়েই এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, Legislator এবং Judge দুইজনের কায সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে একজন অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। একবার লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভা হইতে একটা আইন সম্বন্ধে হাইকোর্টের মত জানিতে চাওয়া হয়। দ্বারিবাবু মত দেন নাই। তিনি লিখিলেন, 'It is not my function. My function is to interpret the law; not to make the law.' সকলেই বুঝিলেন যে, তিনি কেমন করিয়া Jus dicere হইতে Jus facere পৃথক রাখিতেন।

"দ্বারি বাবু সংস্কৃত জানিতেন না; কিন্তু Hindu Law সম্বন্ধে যে কয়টি নজির রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও সারগ্রাহিতার পরিচায়ক। দায়ভাগসম্মত উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা Law of Inheritance and Succession—তিনি যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, আমার বোধ হয় যে, আমাদিগের কোনও অধ্যাপকের দ্বারা তাদৃশ অতি পরিষ্কার ব্যাখ্যা সম্পাদিত হইতে পারিত না। তাঁহার একটা বিশেষ চেষ্টা ছিল যে, হিন্দু বিধবা যদি স্বামীর বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া ভ্রষ্টা হয়, তাহা হইলে সে সেই বিষয় ভোগ করিতে পারিবে না, এই রকম কিছু করা যায় কি না। ফুলবেঞ্চে চৌদ্দজন জজের মধ্যে এই বিষয় মীমাংসিত হয়; —দ্বারিবাবুর পক্ষে মাত্র দুইজন জজ—Juctices Kemp and Glover মত দিয়াছিলেন।

"পিতার মৃত্যুর পর দ্বারিবাবু পিতৃশ্রাদ্ধ করেন নাই। তিনি বলিতেন, 'আমার যখন কিছুতেই বিশ্বাস নাই; আত্মা, ভগবান, পরকাল কিছুতেই বিশ্বাস নাই, তখন আমি লোক-দেখানো কেনই বা পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে যাই?' কিন্তু আমার বোধ হয় যে, তৎকালে যদি তাঁহার কোম্‌তের সহিত বিশেষ পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে তিনি সামাজিক নিয়মে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। কারণ, কোম্‌তের আর এক প্রধান কথা এই—To destroy, you must replace, অর্থাৎ যতক্ষণ সাবেকের বদলে নূতন কিছু জুটাইতে পারিতেছ না, ততক্ষণ সাবেক বাজায় রাখাই কর্ত্তব্য। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মত কোম্‌ৎ নূতন ধর্ম্মপ্রচারকালে প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালী-গুলির প্রতি কিছুমাত্র দোষারোপ বা কটাক্ষপাত করেন নাই। তিনি

অনেক বার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে চাঁদাস্বরূপ টাকা দিয়াছেন। তিনি বলিতেন 'কেন দিব না? ক্যাথলিক ধর্ম্ম এক সময়ে জগতের অনেক উপকার করিয়াছে, এখনও করিতেছে, আমি সেই জন্য তাহাকে শ্রদ্ধা করি।' তিনি তাঁহার দর্শন শাস্ত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন—Positivism regards all the past creeds as so many preparations for the demonstrated faith। কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করা যায় না। তবে হিন্দুসমাজকে এরূপ ভাবে আঘাত করা কি উচিত?

"আর একটি কথা। শ্রাদ্ধের উৎসবের অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান কোম্তের পঞ্জিকাতেও রহিয়াছে; তফাতের মধ্যে এই যে, শুধু আমার পিতৃপুরুষের * শ্রাদ্ধের একটি দিন তাঁহাদের উদ্দেশেই উৎসর্গীকৃত না করিয়া সমস্ত মানবসমাজের পক্ষ হইতে যাবতীয় পূর্ব্বতন মৃতব্যক্তিদিগের নামকীর্ত্তনস্বরূপ একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছেন। একটু পরিষ্কার করিয়া কথাটা বলি। অন্ধসংস্কারবশতঃ মাসের নামকরণ দেবতাদের নামে করা হইয়াছে; তাই তিনি সমগ্র মানবসমাজের মধ্য হইতে তেরজন লোকের নামে তেরটি মাসের নাম করিয়াছেন; তাঁহার বৎসরে তের মাস; যথা Moses, Homer, Aristotle, Archimedes, Cæsar, St. Paul, Charlemagne, Dante, Guttenbug, Descartes, Shakespeare, Frederick the Great, Bichat। প্রত্যেক মাসে ২৮ দিন; সেই দিনগুলির নামকরণও এক একজন মহাপুরুষের নামে হইয়াছে; যথা মনু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নিউটন্, কলম্বস্, বেকন ইত্যাদি। এই হিসাবে ৩৬৪ দিন পাওয়া গেল। বাকি এক দিন যাহা রহিল, সেইটাই শ্রাদ্ধের দিন, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে, Feast of all the dead। চারি বৎসর অন্তর আর একটা শ্রাদ্ধের দিন ধার্য্য করা হইয়াছে—Festival of Virtuous Women

"কোমৎ এই ব্যবস্থার নাম Positivist Calendar দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, এই পঞ্জিকাতে পরস্পরবিরুদ্ধ বিভিন্নমতাবলম্বী এমন ব্যক্তিদিগের নাম একত্র সংযোজিত করা হইয়াছে, যাঁহারা জীবিতাবস্থায় পরস্পর একত্র দেখা হইলে গলা কাটাকাটি করিতে প্রস্তুত হইতেন।

* তবে গয়ার শ্রাদ্ধে সম্পর্কীয় ব্যতীত জ্ঞাত অজ্ঞাত মৃত ব্যক্তিমাত্রেরই নাম উল্লেখ করা হয় বটে।

ফলতঃ মিল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাতে বিশেষ গুণপনা ও অপক্ষপাতিতা ও সর্ব্বসংগ্রাহিতা (catholicity) প্রদর্শিত হইয়াছে।

কোম্‌ৎ যেমন একটি পঞ্জিকা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ তিনি একটি লাইব্রেরী স্থির করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, শরীরের সুস্থতা রক্ষার্থে আহারীয় দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সাবধান হওয়া উচিত, যাহা তাহা না খাইয়া বিশেষ পরীক্ষা পূর্ব্বক আহার্য্য দ্রব্য বাছিয়া লওয়া যেমন কর্ত্তব্য, মস্তিষ্কের সুস্থতা রক্ষা করিবার জন্য তদনুরূপ একটি নিয়ম পালন করা আবশ্যক, যাহাতাহা পড়া অভ্যাস থাকিলে মস্তিষ্ক কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না। এই নিমিত্ত তিনি প্রাচীন গ্রীক্, ল্যাটিন, এবং আধুনিক ইংরাজী, ফরাসী স্পেনীয়, ইটালিয়, ও জর্ম্মান এই সপ্ত ভাষার মধ্য হইতে যত সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ আছে, তাহা বাছিয়া লইয়া Positive Library বলিয়া একটি পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। পুস্তকের সংখ্যা আন্দাজ আড়াই শত হইবে। সেগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত,—যথা, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং Synthesis। অত্যুৎকৃষ্ট পদ্যগ্রন্থগুলিও কাব্যশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে দেখা যায় যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষায় কাব্য কথাটি ইংরাজি poetry শব্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট-তর; কারণ ছন্দ ব্যতীত poetry হয় না, কিন্তু কাব্য বলিলে রঘুবংশও বুঝায় কাদম্বরীও বুঝায়। এই লাইব্রেরীর কতকগুলি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিলে ইহা যে কতদূর সর্ব্বসংগ্রাহিতাসহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে,—Homer, Virgil, Shakespeare, Dante, স্কটের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা, গোল্ডস্মিথের ভিকার, ফিল্ডিঙ্গের টম্ জোন্‌স্, বায়রণের বাছা বাছা কাব্য, পলবার্জিনিয়া, ইত্যাদি কি ছোট, কি বড়, বোধ হয় কোনও ভাল গ্রন্থ তিনি ভুলিয়া যায়েন নাই। সেই লাইব্রেরীর সংগ্রহ করিবার জন্য দ্বারি বাবুর কতকটা চেষ্টা ছিল; কতক সংগ্রহও করিয়াছিলেন।

"এই লাইব্রেরী সম্বন্ধে মিল কিন্তু বিলক্ষণ বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থ পাঠ করা হইবে না, এই কথা তিনি Alexandriaর লাইব্রেরী দগ্ধ করার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা একপ্রকার sweeping holocaust of books. কিন্তু আমার বোধ হয় এস্থলে কোম্‌তের অভিপ্রায়ের মিল বিকৃত বর্ণনা করিয়াছেন। কোম্‌তের উদ্দেশ্য আর কিছুই ছিল না, তিনি জানিতেন যে, সাধারণ লোকে বড় একটা বোঝে না কোন বহি পড়া ভাল আর কোন্ বহি পড়া ভাল

নহে, সেই জন্ত যখন যাহা পায় তাহা পড়ে। সেই কুঅভ্যাসধারণের নিমিত্ত যেরূপ পুস্তক পাঠ করা আবশ্যক তাহারই একটি পরামর্শমাত্র তিনি দিয়া গিয়াছে।

"কোম্‌ৎ ভালরূপে পড়িবার নিমিত্ত শেষাশেষি দ্বারিবাবু ফরাসী ভাষা কতকটা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অল্পকালমধ্যে ঐ ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার এমন পরিপাট্য জন্মিয়াছিল যে, আমি স্বয়ং দেখিয়াছি যে, ফরাসী ভাষায় লিখিত Positive Philosophy বহি খানি হাতে লইয়া তিনি এরূপ অনুবাদ করিয়া যাইতে পারিতেন যে, লোকে মনে করিত যে, তিনি একখানি ইংরাজী বহি পড়িয়া যাইতেছেন; কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তিনি ফরাসী হইতে ইংরাজী অনুবাদ করিতেছেন। কিছু দিন পরে তিনি কোম্‌ৎ প্রণীত Analytical Geometry খানি ফরাসী ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

"কোম্‌তের দর্শণশাস্ত্র সমালোচনা করিয়া মিল একখানি পুস্তক লিখিলেন। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি কতকটা 'থ' হইয়া গিয়াছিলাম। আমার সেই ভাব দেখিয়া দ্বারি বাবু একদিন বলিলেন, 'আপনি অত চঞ্চল হইবেন না। আমি মিলের বহি খুলিয়া প্রত্যেক ছত্র ধরিয়া দেখাইয়া দিব যে, তাঁহার গ্রন্থের ভিতর কতকটা আইনের চালাকির মত বদমায়েসি আছে।' কিন্তু দেখাইয়া দেওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না; ইহার পরেই তিনি জীবনান্তকারী ব্যাধিতে পড়িলেন। তাঁহার যে Cancer ব্যায়রাম হইয়াছিল, ইহা, বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথম সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাত্মা চন্দ্রকুমার দে—যিনি দ্বারি বাবুর খুল্লতাত স্বরূপ ছিলেন,—তিনিই বুঝিতে পারেন। এই ডাক্তার একজন বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী ডাক্তারি বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি জর্ম্মান্ ভাষা হইতে ডাক্তারি গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন; ফরাসী ভাষাও বেশ জানিতেন। ডাক্তারির পেশাদারি চালচলন তিনি বড় একটা জানিতেন না।

"Cancer এর কথা শুনিয়া দ্বারি বাবু একপ্রকার হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন, কারণ অ্যালোপ্যাথি মতে Cancer সম্বন্ধে ডাক্তাররা একপ্রকার কবুল জবাব দিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই বলেন যে, এ রোগের ঔষধ নাই। দ্বারিবাবুর চিকিৎসা নানা মতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে প্রণালী-সঙ্গত রূপে হয় নাই। আমার মনে হয় যে হোমওপ্যাথি

বা কবিরাজি ধারাবাহিকরূপে ক্রমাগত চালান হইলে, রোগমুক্ত না হউন, তিনি এতাবৎকাল এক প্রকার জীবিতাবস্থায় থাকিতে পারিতেন। উক্ত পীড়ায় তাঁহার মুখাকৃতির কিঞ্চিৎ বক্রতা আসিয়াছিল; সেইটি উপলক্ষ্য করিয়া আমার একজন পরমাত্মীয় গোঁড়া ব্রাহ্ম বন্ধু সময়ে সময়ে একটা কথা বলিতেন যাহা আমি silly না বলিয়া থাকিতে পারি না। তিনি বলিতেন, "দেখেছো, কৃষ্ণকমল, আমি এইটি লক্ষ্য করেছি যে, দ্বারি বাবু ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি দৈব বিষয় সম্বন্ধে যে রকম মুখভঙ্গী করে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কথাবার্ত্তা উচ্চারণ করেন, রোগে ওঁর ঠিক সেই বিকৃত মুখভঙ্গী করে দিয়েছে, এতে আমার মনে লাগে যে, সাক্ষাৎ ভগবান তাঁর এই শাস্তি দিয়েছেন।" তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি ত অবাক হইয়া যাইতাম. এবং বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কোনও এক ব্যক্তির মুখ হইতে এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ কখনও নির্গত হইতে পারে তাহা ধারণা করিতে পারিতাম না। ইহা আমি কেবল তাঁহার গোঁড়ামির উপহাস ব্যতীত আর কিছুই মনে করি নাই।

"দ্বারি বাবুর সহিত শেষ সাক্ষাৎ আমার স্মৃতিপথে এক প্রকার অঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি তাঁহার নিজ জন্মভূমি আমৃতার নিকটবর্ত্তী আগুনসি নামক গ্রামে প্রাণত্যাগ করিতে যাইবার কালে হাইকোর্টের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণের জন্য ফেটিন গাড়ীতে শয়ান অবস্থায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত গাড়ীর নিকটে গেলাম। আমাকে দেখিয়া ব্যগ্রতা সহকারে ঘাড় একটু তুলিয়া তিনি নমস্কারসূচক হস্ত-সঞ্চালন করিলেন। সেই আমার তাঁহার সহিত শেষ দেখা।

"সে প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল। কিন্তু দ্বারি বাবুর personality আমার চিত্তক্ষেত্রকে এরূপ প্রগাঢ়রূপে অধিকার করিয়া আছে যে, এখনও বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই। কেবল আর একটি ব্যক্তি আমাকে বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার স্বপ্নে দেখা দিয়া থাকেন,—তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

কৃষিতত্ত্বের আলোচনা।

(১)

অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন মুনিঋষিগণ সকল বিদ্যারই সম্যক আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃষিবিদ্যা বিষয়ে তাঁহারা এত উদাসীন ছিলেন কেন? কৃষিবিষয়ে তাঁহারা ত বিশেষ কোন কথাই লিখেন নাই। দুর্ব্বোধ্য জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, জনসাধারণের বিশেষ আবশ্যক চিকিৎসাশাস্ত্র পর্য্যন্ত তাঁহারা বিস্তৃতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃষিজীবী ভারতবাসীর পক্ষে যে বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, যে বিদ্যায় অবহেলা করিলে ভারতবাসীর খাইতে পরিতে সকল দিকেই মহা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কি আশ্চর্য্য প্রাচীনেরা সেই বিষয়ের কোন ধারাবাহিক আলোচনা করেন নাই; এমন কি এই সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই নির্ব্বাক,—যেন এ একটা কোন কাযের বিষয়ই নহে। বাস্তবিক এইরূপ আক্ষেপোক্তি যে ভিত্তিশূন্য,—আমরাও এমন কথা বলিতেছি না। তবে কেন তাঁহারা কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন উপদেশাদি প্রদান করেন নাই, একটু অনুধাবন করিলেই তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্বকালে আমাদের জন্মভূমি প্রকৃতই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা ছিল। আধুনিক কবি বর্ত্তমান সময়েও ইহাকে "সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্যশ্যামলাং" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেটা জোর করিয়া। সত্যই কি আমাদের দেশ এখনও ঐ সকল বিশেষণে বিভূষিত হইতে পারে? না,—এখন আর দেশের সে শস্যশ্যামলা অবস্থা নাই, কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। এখনকার মত সেকালের লোক "হা অন্ন হা অন্ন" করিয়া দিন যাপন করিত না. "অন্নচিন্তা ভয়ঙ্করী"—তখনও তাহাদের মনে শেল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করে নাই, এখনকার মত তখন তাহারা নিত্য দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হইয়া অকালে শমন-সদনে গমন করিত না। তখন প্রকৃতই ভূমি সুজলা ছিল;—নদনদী, খালবিল, পুকুরডোবা জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত, দুই এক বৎসর অল্পপরিমাণে বৃষ্টি হইলেও কৃষকরা ছেচ দিয়া শস্য রক্ষা করিতে পারিত, কখন্ এক বিন্দু বারিপাত হইবে তবে শস্য-রক্ষা হইবে, এই ভাব-

নায় অস্থির হইয়া তৃষিত চাতকের ন্যায় সুনীল গগনে অনিমেষ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত না। তখন প্রকৃতই ভূমি সুফলা ছিল;—মাটির উর্ব্বরতা শক্তি তখনও প্রায় সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, সামান্যরূপে ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিলেই ষোল আনা ফসলে মাঠ ভরিয়া যাইত,—ক্ষেত্রে এখনকার মত অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করিতে হইত না। আর ভূমি সুজলা, সুফলা বলিয়া শস্য-শ্যামলা হইয়া কৃষকের মনে সুখের হাট বসাইয়া অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করিত। তখন বাস্তবিকই "মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর"—ক্ষেত্রের এইরূপ ভাব ছিল। তখন জন্মভূমি স্বীয় ঐশ্বর্য্যভারে উৎফুল্লা হইয়া স্ফীতবক্ষে বিরাজ করিতেন। এক কথায় সেকালে জমীতে এরূপ তেজ ছিল, জমীর উর্ব্বরতা শক্তি এত অধিক ছিল যে, সামান্যমাত্র পরিশ্রমে জমী একটু আঁচড়াইয়া (কর্ষণ করিয়াও নহে) বীজ ছড়াইয়া দিলেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। তাহার উপর অধিকাংশ জমীই ভালরূপে জলসম্পোষ্য ছিল,—'শুকো' হইলেও শস্যের অনিষ্ট হইত না। সুতরাং মাথার ঘাম পায়ে না ফেলিয়াও কৃষকরা অক্লেশে অন্নের সংস্থান করিতে পারিত, অনায়াসে পরিবার প্রতিপালন করিত। তখন তাহাদের গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, গালভরা হাসি।

তৎকালে কৃষিজাত দ্রব্য এইরূপ অনায়াসলব্ধ ছিল বলিয়া, প্রাচীন মনীষিগণ কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট ছিলেন না, তাই তাঁহারা এই বিষয়ে উপদেশাদি প্রদান করিয়া যায়েন নাই এবং সেই জন্যই আমাদের কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থাদির বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

এখন দেখা যাউক, আমাদের কৃষিকার্য্যের এইরূপ অধঃপতনের কারণ কি। কৃষিকার্য্যের এইরূপ অবনতির কতিপয় প্রধান কারণ আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে পরিমাণে বৃষ্টি হইত, এখন আর সেরূপ হয় না; বৃষ্টির পরিমাণ এখন অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য চলিতে পারে না।

২। জমীর উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস। জমীর উর্ব্বরতাশক্তি ক্রমাগত কমিয়া গিয়া, এখন জমী প্রায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। একই জমীতে ক্রমাগত ফসল উৎপাদন করিলে, সেই জমীর উর্ব্বরতাশক্তি কমিয়া যায়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। জমীর উর্ব্বরতাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, উহাতে

উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিতে হয়। শস্যোৎপাদনের জন্য জমী হইতে যে পরিমাণে শস্যের খাদ্য নিঃশেষিত হইতেছে, সার প্রয়োগ করিয়া সেই পরিমাণে শস্যের খাদ্য জমীতে পুনঃ সংস্থাপন করিলে, তবে জমীর উর্ব্বরতাশক্তি বা তেজ অক্ষুণ্ণ থাকে। অথবা কোন জমীতে উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর চাষ আবাদ করিয়া, পরে ২।৩ বৎসর আবাদ না করিয়া সেই জমী ফেলিয়া রাখিলে প্রাকৃতিক নিয়মে জমী প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিয়া অথবা উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর জমী আবাদ না করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া, জমীর তেজ বজায় রাখিবার চেষ্টা কয়জন কৃষক করিয়া থাকে? তাহাদের সেরূপ সামর্থ্য নাই। অধিকাংশ কৃষকেরই সার কিনিয়া ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নাই। নিজের হালের গরু হইতে যে টুকু সার পায়, জমিতে সেই সার দিয়াই, তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, এই যৎকিঞ্চিৎ সার জমীর উর্ব্বরতাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাহার পর, অকর্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতেই বা তাহারা পারে কৈ? তাহা হইলে তাহাদের 'পেট চলে' কিরূপে? কাযেই এইরূপে আমাদের দেশের জমীর সারাংশ ক্রমেই শোষিত হইয়া এক্ষণে জমী এত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে যে, পূর্ব্বে যে জমীতে যে পরিমাণে ফসল পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহার অর্দ্ধেকও পাওয়া যায় না।

৩। দেশে বন্যার অভাব। পূর্ব্বে অধিকপরিমাণে বৃষ্টি হইত বলিয়া ২।১ বৎসর অন্তর নদনদী ভরিয়া গিয়া দেশে বন্যা হইত। যে বৎসর বন্যা হইত, সে বৎসর 'হাজা' হইয়া শস্যের অনিষ্ট হইত—সন্দেহ নাই; কিন্তু এইরূপ বন্যায় জমীর উপর পলি পড়িত, ফলে জমীর উর্ব্বরতাশক্তি বর্দ্ধিত হইত। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থলে এইরূপ বন্যা হয় বলিয়া, সেই সকল স্থানের কৃষকরা ক্ষেত্রে সার না দিয়াই শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

৪। সারের অপচয়। আমাদের দেশে সারের অন্যায়রূপ অপচয় হইতেছে। দেশ হইতে ক্রমাগত অস্থি সকল বিদেশে চালান হইতেছে। এমনই ব্যাপার যে, ক্ষেত্রে দুই দশখানা হাড় পড়িয়া যে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাশক্তির বৃদ্ধি করিবে পোড়া দেশে সে উপায়ও নাই। অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, দেশের সকল "ভাগাড়"ই মহাজনরা জমা লইয়াছে এবং লোক নিযুক্ত করিয়া হাড় সংগ্রহ করিতেছে। এই সকল হাড় সংগৃহীত হইয়া বিদেশে

রপ্তানী হইয়া থাকে। সোরা একটা প্রধান সার। বিহার, পঞ্জাব, বোম্বাই মাদ্রাজ; ত্রিহুত প্রভৃতি নানাস্থানের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে সোরা মিশ্রিত আছে। নূনিয়া নামক নিম্ন শ্রেণীর লোক মাটি হইতে সোরা প্রস্তুত করে। এই অপরিস্কৃত সোরা ২।২৷৷০ টাকা মন দরে বহুপরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। বিদেশে অপরিস্কৃত সোরা সারের জন্য এবং পরিস্কৃত সোরা বারুদ তৈয়ার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অথচ সারের জন্য সোরা ব্যবহার করিতে হইলে আমাদিগকে ৭।৮ টাকা মন দরে বাজার হইতে সোরা ক্রয় করিতে হয়। কি বিড়ম্বনা! অধিকাংশ গোময়ই কৃষকগণ পোড়াইয়া থাকে। অতি অল্প পরিমাণ সারের জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ঘুঁটের ছাই জমীতে প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু গোময় অপেক্ষা ছাইএর সারাংশ অনেক পরিমাণে কম।

৫। দেশের শস্য দেশে না থাকা। দেশের উৎপন্ন শস্য দেশে থাকিলেই, জমীর তেজ অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকে। সেই উৎপন্ন শস্যগুলিই পুনরায় অন্য প্রকারে (যথা—জীব জন্তুর বিষ্ঠা, শস্যের আবর্জ্জনা, খড়, খইল প্রভৃতি) মাটিতে পড়িলে তবে মাটির শোষিত সারাংশ বর্দ্ধিত হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ৮ কোটি টন খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় এবং তন্মধ্যে ২৫ লক্ষ টন, প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে; অর্থাৎ উৎপন্ন খাদ্যশস্যের শতকরা ৩ ভাগ বিদেশে চলিয়া যায়! তদ্ভিন্ন তৈলপ্রদ বীজ—রেড়ি তিসি, চীনার বাদাম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হয়। এইরূপেও প্রতি বৎসর আমাদের দেশের জমী সারশূন্য হইতেছে।

৬। কৃষি যন্ত্রাদির পরিবর্ত্তন না হওয়া। দেশের জমীর অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু কৃষি যন্ত্রাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। বারিপাত কমিয়া যাওয়াতে, জলের অল্পতাপ্রযুক্ত জমী ক্রমশঃ কঠিন হইতেছে, কিন্তু জমী কর্ষণ করিতে আমরা যে লাঙ্গল ব্যবহার করি, সেই লাঙ্গল পূর্ব্বের ন্যায় আছে, উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। যখন মাটি ক্রমেই কঠিন হইতেছে এবং উহার উপরিভাগের সারাংশ শস্যোৎপাদনে দিন দিন নিঃশেষিত হইতেছে, তখন জমী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর করিয়া কর্ষণ করিলে, জমীর উর্ব্বরতা শক্তি অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে; কারণ, এইরূপ ভাবে অপেক্ষাকৃত গভীর করিয়া কর্ষণ করিলে, মাটির ভিতর হইতে

অনেক শস্য-খাদ্য ক্রমে ক্রমে পুনরায় মাটির উপরি ভাগে আসিয়া জমা হইবে। দ্বিতীয় কথা, নদনদী, খালবিল প্রভৃতি যে সকল জলাশয় হইতে পূর্ব্বে জলোত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রে জল-সেচন করা হইত, সেই সকল জলাশয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা জল কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে সেগুলি পরিপূর্ণ থাকায় যে সকল যন্ত্রের (সিউনি, ডোল প্রভৃতি) সাহায্যে ক্ষেত্রে জল-সেচন করা হইত, এখন সেগুলি দ্বারা সুচারু রূপে জল-সেচন হইতেছে না। সুতরাং, জমীর পরিবর্ত্তনের সহিত কৃষি যন্ত্রাদির পরিবর্ত্তন অথবা নূতন যন্ত্রাদির প্রবর্ত্তন না হওয়ায়, কৃষিকার্য্যের অবনতি হইতেছে।

৭। গোবংশের অবনতি। আমাদের দেশে গোবংশের উত্তরোত্তর অবনতি হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় বলিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট, কর্ম্মঠ বৃষ এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। গোবংশ ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য হইতেছে। যে সকল বৃষের দ্বারা একণে কৃষকগণ হলচালনা করে, সেগুলির শোচনীয় অবস্থা দেখিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। কৃষকরা অযথা গালি বর্ষণ করিয়া ক্রমাগত প্রহার করিলেও ইহাদিগকে প্রকৃত কর্ম্মক্ষম করিতে পারে না। অনেকের বিশ্বাস গোবংশের এইরূপ অবনতির প্রধান কারণ দেশে গোচারণ ভূমির অভাব। তাঁহারা বলেন,—“পূর্ব্বে প্রতি গ্রামে গোচারণ ভূমি যথেষ্ট ছিল। গবাদি পশুগণ উক্ত মাঠে দিবাভাগে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করিতে পারিত; সম্প্রতি জমীদারগণের অর্থ-পিপাসায় ঐ সমস্ত গোচারণ ভূমি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কৃষকগণ যে সমস্ত স্থানে গবাদি পশু রক্ষা করে, তাহা নিতান্ত কদর্য্য। তাহারা ঐ সকল পশুকে যথেষ্ট যত্ন করে না ও উপযুক্ত আহার দেয় না। ঐরূপ নানা কারণে উক্ত পশুগণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে ও উহারা হীনবীর্য্য হইতেছে।” গোচারণ ভূমির অভাব যে একটা কারণ, সে কথা আমরাও স্বীকার করি; তবে ইহাই প্রধান কারণ নহে। সুতরাং কেবল জমীদারের অর্থ-পিপাসায় যে গোবংশের দিন দিন অবনতি হইতেছে,—এ কথা আমরা স্বীকার করি না। আমাদের বিশ্বাস, এই অবনতির প্রধান কারণ,—বলবীর্য্যশালী বৎসোৎপাদনকরণার্থ দেশে সুস্থ ও বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দের অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। আজকাল যে সকল বৃষ গোবংশ রক্ষা করিতেছে, সেগুলি এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এইরূপ সুস্থ ও সবল বৃষের অভাব প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া গোবংশ এত দ্রুত অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অভাব মোচন করিবার জন্য পূর্ব্বে আমাদের

সমাজে অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। তখন হিন্দু ক্রিয়াকর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন, শ্রাদ্ধাদিতে বৃষ উৎসর্গ করিতেন। সেই বৃষ ইচ্ছামত পল্লীমধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, গৃহস্থের দ্বারে গেলে অধিবাসীরা সযত্নে, ভক্তিভরে তাহাকে আহার প্রদান করিত। সে এই ভাবে পল্লীবাসীর আদর-যত্নে লালিত পালিত হইয়া পল্লী-জীবন যাপন করিত। হিন্দুদিগের উৎসর্গীকৃত বৃষ এবং মুসলমানদিগের উৎসর্গীকৃত খাসী এইরূপ আদর-যত্নে প্রতিপালিত হইয়া, মনের আনন্দে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিত বলিয়া, আমাদের দেশে "ধর্ম্মের ষাঁড়" ও "খোদার খাসী" প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। যে ব্যক্তি কোন কাযকর্ম্ম না করিয়া, কেবল খাইয়া, খেলাইয়া, নধর কান্তি লইয়া বেড়াইয়া বেড়ায়, তাহাকে লোকে এখনও "খোদার খাসী" বা "ধর্ম্মের ষাঁড়" নামে অভিহিত করে। তখন এই সকল নধর কান্তি, হৃষ্টপুষ্ট বৃষ গ্রামে দুই চারিটি থাকিত বলিয়া, গোবংশের অবনতি হইত না। গোজাতি ক্রমশঃ হীনবীর্য্য ও খর্ব্বাকৃতি হইতেছে বলিয়া, কৃষিক্ষেত্রে ভালরূপ হল-চালনা হইতেছে না। ইহাও কৃষিকার্য্যের অবনতির অন্যতম কারণ।

৮। অস্বাস্থ্যতা। দেশের জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের জন্য দেশের স্বাস্থ্য অযস্থ হওয়ায়, কৃষকরা ক্রমেই দুর্ব্বল হইতেছে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে পীড়িত হইয়া তাহারা ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিতেছে। অল্প পরিশ্রমে তাহারা কাতর হইয়া পড়ে, এখন আর পূর্ব্বের মত অষ্টপ্রহর পরিশ্রম করিতে পারে না।

৯। বিলাসিতা। কৃষকরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিলাসপ্রিয় হইয়াছে। এই বিলাসিতায় তাহাদের অধঃপতনের সূত্রপাত। তাহারা বিলাসী হইয়া ক্রমেই অলস হইতেছে বলিয়া, আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। বিলাসের দ্রব্য সঙ্কুলানের জন্য সময়ে সময়ে তাহারা বীজ শস্য পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। স্বীয় পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনই তাহারা সকলে যোগাইতে পারে না, তাহার উপর আবার বিলাসিতার আশ্রয় লইলে, তাহারা ত শ্রীভ্রষ্ট হইবেই। বিলাসিতাই দরিদ্রের লক্ষ্মীশ্রী নষ্ট করিবার প্রধান সামগ্রী। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, সামান্য কৌপীনধারী কৃষক শারদীয়া পূজার সময় স্বীয় প্রণয়িনীর জন্য ১২৲ টাকা মূল্যের পার্সী সাড়ী এবং ২৲ টাকা দামের সেমিজ ক্রয় করিতেছে। এইরূপে কৃষকরা বিলাসিতায় হাবুডুবু খাইয়া ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইতেছে। সকলেই জানেন, আজকাল কাবুলীরা

পল্লীতে পল্লীতে বেশী সুদে টাকা ধার দিয়া বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতেছে। এই শীতকালে তাহারা কৃষকদিগকে ধারে র‍্যাপার বিক্রয় করিবে, তাহার পর সেই র‍্যাপারের মূল্য সুদে আসলে বেশ ফাঁপিয়া উঠিলে, তাহারা জোর করিয়া কৃষকগণের কুটীর হইতে তৈজস পত্রাদি এবং খোলা হইতে শস্যাদি লইবে। তাহাদের লাঠির ভয়ে তখন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার উপায় নাই। স্বর্গীয় মাননীয় নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"Poor as the Indian raiyat has always been, his poverty is not as intense now as it used to be, and he can afford to spend money on little luxuries which his forefathers never dreamt of enjoying." হইতে পারে কৃষকগণের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে, কিন্তু বিলাসিতাই যে তাহাদের অধঃপতনের মূল—ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। আমাদের কৃষকগণের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও, তাহারা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণগ্রস্ত—সে সম্বন্ধে কণামাত্র সন্দেহ নাই। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, যাহারা বিলাসিতায় মজিয়াছে, তাহারাই আপাদমস্তক ঋণগ্রস্ত। ঋণ করিয়া বাবুগিরি করা অপেক্ষা পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ভাল নহে কি?

১০। কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া তেজারতি ব্যবসায় অবলম্বন। যে সকল কৃষক কৃষিকার্য্যে দুই টাকা জমাইতে পারিয়াছে, তাহারা আর কৃষিকার্য্য করিতে চাহে না। তাহারা সেই অর্থ লইয়া নিজগ্রামে তেজারতি ব্যবসায় করিতেছে, সুদে টাকা খাটাইতেছে। এইরূপে অনেকে বেশ উপার্জ্জন করিতেছে বটে, কিন্তু ইহাতেও কৃষিকার্য্যের উত্তরোত্তর অবনতি হইতেছে।

১১। কৃষক বালকদিগের প্রাথমিক শিক্ষার ফল। এতদিন যাবৎ যে সকল কৃষক পুরুষানুক্রমে স্বহস্তে চাষ আবাদ করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের পুত্রগণ পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, দুই পাতা ছাপার বহি পড়িয়া, ম্যাক্‌মিলনের বিজ্ঞানবিভার কণ্ঠস্থ করিয়া, আর কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছে না, আর নিজের হাতে লাঙ্গল চালাইতে চাহে না। তাহারা নিজের জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া—চাষবাসে মন না দিয়া বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। ইহাও এক মহা সমস্যা। কোন গ্রামে গিয়া, প্রবীণ কৃষকগণের সহিত দুই দণ্ড কথাবার্ত্তা

কহিলেই শুনিতে পাইবেন, তাহারা আপনাদের "শিক্ষিত" সন্তানগণের জন্ত আক্ষেপ করিতেছে। "শিক্ষার" এইরূপ বিসদৃশ ফল হাতে হাতে ভোগ করিয়া, গ্রামের প্রবীণ কৃষকগণ তাহাদের অন্যান্য সন্তানদিগকে আর পাঠশালায় পাঠাইতে সম্মত নহে। পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়াই, আধুনিক কৃষক-সন্তান লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয় এবং নিজের জাতীয় ব্যবসায়ে মন না দিয়া কিরূপে পাঁচ জন নিরীহ প্রতিবেশীকে ঠকাইয়া ২৲৫৲ টাকা হস্তগত করিতে পারে, সেই চেষ্টায় সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের মধ্যে যাহারা আবার অধিক মাত্রায় চতুর, তাহারা নিকটস্থ সহরে আসিয়া উকীলের দালালি করে। কিরূপে গ্রামের মধ্যে অনর্থক বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া, দুই দশটা মামলা-মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হয়, তাহারা সেই চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। এই সকল দালালদিগের পরামর্শে. যে সকল কৃষক পূর্ব্বে কখনও আদালতে উপস্থিত হয় নাই, তাহারাও মামলা-মোকর্দ্দমা করিয়া ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী"র কি অনিষ্টকর বিষয় ফল!

ওমরের পথে।

মেল নিদ্রা-নিমীলিত নীলাব্জ নয়ন;
প্রাচীমূলে ফুটে, হের, তরুণ তপন;—
আপনার ছায়াত্রস্তা কুরঙ্গিণী সম
অন্ধকার ধরা ত্যজি' করে পলায়ন।

সুপ্তি'পরে চেতনার প্রথম আভাস—
বিহগ-বিরাবে তা'র স্বাগত সম্ভাষ;
গলিত-কাঞ্চন-আভা পূর্ব্বমেঘজালে—
রঞ্জিত বিচিত্র বর্ণে উষার আকাশ।

গেছে কাল—লয়ে তা'র সুখ, দুঃখ, ভয়;
আজি এ নূতন ধরা—নব আলোময়;
সঞ্চিত আশঙ্কা, আশা কাল ছিল যত
অতীত অতলে কোথা পেয়েছে বিলয়।

অনিশ্চিত ভবিষ্যত সুখের আশায়
কে ত্যজিবে বর্ত্তমান—এ মর ধরায়?
আজ আমি আছি, আছে বিচিত্র এ ধরা
কে জানে নিয়তি কাল লইবে কোথায়?

মুহূর্ত্তের ভূল।

বন্দী; আমি,—চির-নির্ব্বাসিত!

দিন যায়, সন্ধ্যা হয়; আবার দিন আসে,—আমার দিন ফুরায় না! ঐ যে "রাঙ্গা রবি ছবিখানি" ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে মিলাইয়া যাইতেছে, উহার পশ্চাতে অন্ধকার। ততোঽধিক অন্ধকার আমার হৃদয়ে।

সন্ধ্যার অন্ধকার চন্দ্রালোকে অপনীত হয়; অমানিশার অন্ধকার উষার অরুণ রাগে তিরোহিত হয়;—আমার মনের অন্ধকার কিছুতেই দূর হয় না। সে অন্ধকার অনন্ত, অব্যয়, অবিচ্ছিন্ন!

দিবসে পাথর ভাঙ্গি; রাত্রিতে দিন গণি। পাথর ভাঙ্গা নির্দ্দিষ্ট কায; দিন গণা তাহা নহে, তবু গণি। গণিয়া লাভ নাই, তথাপি গণি। ভ্রান্ত মন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না, তাই গণি! গণিতে গণিতে এক এক দিন রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়; অবসন্ন দেহে পাথর ভাঙ্গিতে ফিরিয়া আসি;—তবু গণি!

দীর্ঘ, বিনিদ্র নিশাবসানে মনে হয়, অতীত স্বপ্ন; বর্ত্তমান চিরসত্য।

পাঁচ বৎসর; দীর্ঘ—বড় দীর্ঘ! যে মুক্ত, স্বাধীন তাহার নিকট সে মুহূর্ত্ত। আমার নিকট সে এক যুগ—এক কল্প; তদপেক্ষাও দীর্ঘ।

যখন চিন্তাক্লিষ্ট-হৃদয়-ভারে কর্ম্মক্লান্ত হস্ত শিথিল হইয়া আইসে, তখন অনিমেষ নয়নে ঐ বাত্যাবিতাড়িত বীচিবিক্ষুব্ধ বিশাল বারিধি-বক্ষের বিচিত্র লীলা অবলোকন করি।

উহার বক্ষে যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তৎপশ্চাতে তরঙ্গ—দীর্ঘ, ঋজু, বক্র, বিলম্বিত; আমার ক্ষুদ্র হৃদয়েও তেমনই ঘাত-প্রতিঘাত, তরঙ্গ-সংঘর্ষ। সমুদ্রের বিশ্রাম নাই, আমার হৃদয়-সংগ্রামেরও বিরাম নাই। ক্ষুদ্র বিশালের তুল্য তুলনা!

যখন অতর্কিত অশ্রুবিন্দু গণ্ড গড়াইয়া হস্তস্থিত শিলাখণ্ড সিক্ত করে, তখন মনে করি, পাষাণের প্রাণ আছে; ব্যথিতের বেদনায় তাহারও হৃদয় বিগলিত হয়।

বৈজ্ঞানিকরা স্থির করিয়াছেন, পাষাণের পীড়া আছে। যাহার পীড়া আছে, নিশ্চিতই তাহার প্রাণ আছে। যখন মনে হয়, পাষাণ সপ্রাণ; আমার

দুঃখে তাহার অশ্রু ঝরে, তখন মনে কেমন এক অপূর্ব্ব শান্তি আইসে। কর্কশ হস্তে অশ্রু মুছিয়া, কর্ত্তব্যের অবসরে কারাগৃহের শীতল ভূমি-শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করি। হায়, উদ্‌ভ্রান্ত মন!

কিন্তু নিদ্রা হয় না। সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার আরাধনায় নয়ন নিমীলিত করি—আর অবাধ্য মন পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক শূন্য পথে প্রয়াণ করে।

নদ, নদী, পর্ব্বত, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মন এক ক্ষুদ্র পল্লীর গ্রাম্য পথে উপস্থিত হয়; তথায় এক ক্ষুদ্র গৃহের অনুসন্ধান করে। একদিন সেই গৃহ আমার ছিল।

আমি সেই গৃহের একচ্ছত্র নৃপতি ছিলাম। তথায় এক পল্লীরাণী সর্ব্বদা আমার সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত উৎসুক থাকিতেন। সে দিন এখন আর নাই। অতীতের অনন্ত গর্ভে—বিস্মৃতির অন্ধ বিবরে তাহা বিলীন হইয়াছে।

সেই গৃহ,—বিদায়ের দিন তাহাকে যেমন দেখিয়া আসিয়াছিলাম, মন তাহাকে কল্পনায় আঁকিয়া তেমনই দেখিতে পায়। হয় ত তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; হয়ত সে স্থানে সে গৃহ আর নাই! কিন্তু মন তাহা ভাবিতে পারে না। সে কথা মনে করিতেও ব্যথা বড় গুরু বাজে।

সে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয় ত সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মন তাহা কল্পনায়ও আনিতে চাহে না। সে বিশ্বাস করিয়া সুখী হয়—বিপদ-বিষণ্ণ, বিরহ-ক্লিষ্ট পল্লীরাণী তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি, ভালবাসা এবং নির্ভরতা লইয়া দিনের পর দিন, এই স্নেহবিচ্যুতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দুর্ব্বল মন সেই অন্ধ বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া সেই গৃহ-সন্নিধানে থাকিতে চেষ্টা করে; যদি দর্শনলাভ ঘটে!

শ্বেত দ্বীপের এক মহাকবি গাহিয়াছেন,—যেমন নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে আলোক-তরঙ্গ প্রকম্পিত হয়, তেমনই আত্মা হইতে আত্মান্তরে ভাব-তরঙ্গ বিকম্পিত হয়। যদি তাহা সত্য হয়, তবে মন কেন কিছুই অনুভব করিতে পারে না; সেস্থানে যাহা ছিল তাহা আছে কি না, মন তাহা বুঝিতে পারে না কেন?

এ যে কি কষ্ট,—এ যে কি নিদারুণ নিরাশার ব্যথা, তাহা কে অনুভব করিবে?

মৃত্যুর পর আত্মা যখন দেহ-বিচ্যুত হইয়া প্রেতলোকে প্রয়াণ

করে, তখন তাহার দেহ থাকে না, কিন্তু অস্তিত্ব থাকে; লালসা থাকে, কিন্তু ভোগের উপায় থাকে না; বাসনা থাকে, কিন্তু প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি করিবার ক্ষমতা থাকে না।

আত্মা তখন তাহার পরিত্যক্ত গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে যেমন গৃহের সকলকেই দেখিতে পায়, অথচ আপনার উপস্থিতি বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না, অথবা পূর্ব্বের মত তাহাদিগকে আপনার ইচ্ছায় পরিচালিত করিতে পারে না; আমার মনও তেমনই সেই গৃহের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ গৃহের সকলই আছে মনে করে, কিন্তু যথার্থ অনুভব করিতে পারে না।

কেমন করিয়া বুঝাইব, মনের কি কষ্ট! তীব্র বেদনায় হৃদয় ক্রমে অবসন্ন হইয়া আইসে। মনে হয়, কেহ হৃৎপিণ্ড টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া, নিঙড়াইয়া রক্তশূন্য করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে!

আবার দিন গণি, কিন্তু ঐ অফুরন্ত সমূদ্র তরঙ্গের মত অফুরন্ত দিন। দিনের পর দিন,—তাহার পর দিন, আবার দিন। মৃত্যু নাই—মুক্তি নাই; আছে কেবল বেদনা!

অশ্রু! তুমি ও কি অফুরন্ত! পাঁচ বৎসর দরবিগলিত ধারে গণ্ড গড়াইয়াও কি তোমার উৎস শুষ্ক হইবে না?

এই যে পাথর ভাঙ্গিতেছি; প্রতি শিলাখণ্ড অশ্রুসিক্ত করিয়া পর্ব্বত-প্রমাণ শিলাস্তূপ রচনা করিয়াছি, ইহারা কি তোমার প্রস্রবণ বিশুষ্ক করিতে পারিবে না? দিন নাই রাত্রি নাই; তুমি বিশীর্ণ গণ্ড মসৃণ করিয়া আছ। উপাধান নাই সিক্ত করিবে; শয্যা নাই তোমাকে লুকাইয়া রাখিবে; কোমল করপল্লব নাই—স্নেহ, ভক্তি অথবা ভালবাসার সহানুভূতিতে মুছিয়া লইবে। তবে কোন্ লুব্ধ আশায় টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিতেছ? গণ্ড ভিজাইয়া, বক্ষ ভাসাইয়া শুধু শিলাখণ্ড সিক্ত করিয়া কি লাভ?

শুধু হৃদয়ের দুর্ব্বলতা! মনে করিয়াছ, পাষাণে প্রাণ আসিবে! হায়! হতভাগ্য চিরনির্ব্বাসিত!

কিন্তু পাপ ত করি নাই? জ্ঞানতঃ ধর্ম্মতঃ কোন অপরাধ করি নাই; তবে এ কঠোর শাস্তি কেন, প্রভো? মুহূর্ত্তের ভুল—সে ত মুহূর্ত্তের প্রায়শ্চিত্তে অপনীত হইতে পারিত?

মনে পড়ে, কেমন করিয়া মুক্ত হস্ত যুক্ত হইয়াছিল; স্বাধীন চরণ শৃঙ্খল পরিয়াছিল। মনে হয়, তাই ত এত ব্যথা, নতুবা বিস্মৃতির বেদনা কোথায়?

তখন কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি। পিতা মাতা ছিলেন - হয় ত এখনও আছেন; ভ্রাতা ভগিনী ছিলেন, হয় ত এখনও আছেন।ঐশ্বর্য্য ছিল না; অভাব ছিল সত্য, কিন্তু পাপ করিবার প্রয়োজন ছিল না। একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যাইত।

অপকার করি নাই, অপহরণ করি নাই,—তবু শত্রু ছিল। সে জ্ঞাতি শত্রু। শত্রুর শত্রুতা যতদিন সে জীবিত; মৃত্যুতে সে যে আমার জীবন-মৃত্যুর ব্যবস্থা করিবে, তাহা কেহ কল্পনা করিলেও তাহাকে বাতুল মনে করিতাম।

কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। ইহা অদৃষ্ট, অথবা প্রাক্তন কর্ম্মফল;—মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অন্যায় অবিচারের পরাকাষ্ঠা।

পল্লীগ্রামের অধিবাসী। গ্রামে হাট বসিত না; গ্রামান্তরে হাট করিতে যাইতে হইত। প্রতি হাটে বাজার করিতে যাওয়া আমার একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল।

একদিন—সে কি ভয়ানক দিন! যদি সে দিন না আসিত; যদি জীবন-পট হইতে সেই দিনটিমাত্র মুছিয়া ফেলিতে পারিতাম; হায় মূঢ় কল্পনা!

সে দিন একাদশী! সমস্ত দিন জল গ্রহণ করি নাই। হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া জলযোগ করিব, তাই সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

সে দিন বাজারে বারোয়ারী উপলক্ষে ভাল যাত্রা হইতেছিল। গ্রামের সকলেই যাত্রা শুনিতে বসিয়া গিয়াছিল; সুতরাং সঙ্গী জুটিল না। একাকী পথ চলিতে লাগিলাম।

কৃষ্ণপক্ষ। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম।

গৃহ হইতে অনতিদূরে, রাস্তার ধারে, নর্দ্দমার মধ্য হইতে যেন আহতের অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম! চমকিয়া দাঁড়াইলাম। একটু পরে শব্দ হইল—"জ—ল"!

মুমূর্ষুর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

দুই হস্তে ভূমি স্পর্শ করিতে করিতে শব্দাভিমুখে চলিলাম। হস্তে একটি ভগ্ন লণ্ঠন ঠেকিল। তাহার পর কোন শীতল পদার্থে হাত ঠেকিল। বোধ

রহিল যেন জমাটবাঁধা রক্ত। একটু পরে একখানি অস্ত্র হস্তে ঠেকিল। আহতের নিকটে এক খানি দা; বোধ হইল, রক্ত মাখা। শরীর শিহরিয়া উঠিল

বহু কষ্টে আহত ব্যক্তিকে পথের উপরে আনিলাম। অঙ্গের যে কোন অংশে হস্তার্পণ করি, ক্ষত! পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন, শোণিতসিক্ত। মুমূর্ষু পুনরায় যাচ্ঞা করিল—"জ—ল"! সেই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু অনন্তে মিশিয়া গেল!

পরমুহূর্ত্তেই মৃতের মস্তক আমার ক্রোড়বিচ্যুত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। প্রাণে সহসা বড় আতঙ্ক জন্মিল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, দূরে একজন লোক আলোক হস্তে অগ্রসর হইতেছে। কেমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, বিপদাশঙ্কায় গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিলাম।

হায়! মুহূর্ত্তের ভূল!

অদূরে সাত আট জন লোক লণ্ঠন হস্তে ছুটিয়া আসিতেছিল। আমাকে রক্তাক্ত কলেবরে ছুটিতে দেখিয়া ধরিয়া ফেলিল। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাহারা বলিয়া উঠিল "খুন করিয়া পলাও কোথায়?" আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল।

আমি বজ্রাহত পথিকের ন্যায় নীরব হইয়া দাড়াইয়া রহিলাম। আমি যে নির্দ্দোষ—আমি যে আহতের সাহায্য করিতে গিয়াছিলাম, সে কথা আর মুখ হইতে বাহির হইল না।

যখন আকস্মিক বিপজ্জনিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল এবং দেখিলাম, লোকগুলি সকলেই আমার শত্রুর আশ্রিত, প্রতিপালিত এবং অনুগৃহীত, তখন যেন আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আমি নির্দ্দোষ আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

কেহ সে কথায় কর্ণপাত করিল না।

ক্রমে আরও লোক জমিল। সকলেরই ধারণা হইল, আমি খুন করিয়া পলাইতেছিলাম; কারণ, যে ব্যক্তি খুন হইয়াছে সে আমার প্রধান জ্ঞাতিশত্রু—সর্ব্বস্বাপহারী!

তাহার পর পুলিশ আসিল। অনায়াসলব্ধ শীকারের চতুর্দ্দিকে প্রমাণের ব্যূহ রচিত হইল। জ্ঞাতিবহুল পরিবার,—সুতরাং শৃঙ্খলিত ঘটনাপরম্পরা আমাদের উভয়ের মধ্যে বহুদিন ধূমায়িত শত্রুতার পরিচয় প্রদান করিল; দুরভিসন্ধিও প্রমাণিত হইল।

সুতরাং একাদশীর উপবাসী—দ্বাদশীর উষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে কারাগৃহের কুক্ষিভুক্ত হইলাম। কারাদ্বার আমার জন্য চিরতরে রুদ্ধ হইল।

তার পর বিচার। বিচারকের বিচক্ষণতার অভাব ছিল না,—বিচারেও ত্রুটি ঘটে নাই; তথাপি বিচারফলে আমার চিরনির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইল।

হায় মানবের ক্ষুদ্র বিচার!

আমার অনুকূল যুক্তির মধ্যে একটি কথা বিচারকের মনে, বোধ হয়, সন্দেহের জাল সৃজন করিয়াছিল। তিনি পুনঃ পুনঃ জুরীদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, অসম্ভব না হইলেও দোষী ব্যক্তির পক্ষে প্রকাশ্য রাজপথ অবলম্বন করিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন সচরাচর, এবং সাধারণ আসামীর পক্ষে সম্ভব নহে।

প্রতিকূল যুক্তির অবতারণা করিয়া বিপক্ষ পক্ষ দর্শনশাস্ত্রের অনেক সূক্ষ্ম এবং জটিল রহস্য-তথ্য উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; ফলে নিয়তির নির্দ্দেশে আমার দণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।

বিচারক বলিয়াছিলেন,—"আইনের বিচারে তোমার চিরনির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইল। মানবের বিচার-শক্তি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পর্য্যবসিত; যদি তাহাতে ভ্রম প্রমাদ ঘটে, বিচারকের বিচারক তাহার সংশোধন করিবেন।"

বিচারকের বিচারক! কোথায় তুমি অনাথ-শরণ, দীনবন্ধু, আর্ত্তের আশ্রয়। তুমি ত জান আমি নির্দ্দোষ। তবে এ কঠোর শাস্তি কেন, প্রভো? পাঁচ বৎসর প্রতিপল তোমাকে ডাকিতেছি। পাঁচ বৎসর পাথর ভাঙ্গাতেও কি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, প্রভো, মৃত্যু দাও। মুক্তি চাহি না; মুক্তি বন্ধন, মৃত্যু মোক্ষ। মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু! এস বাঞ্ছিত, এস অমৃত, এস চিরমুক্তি—আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে আলিঙ্গন করিব।

* * * *

তাহার পর আরও চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যে হতভাগ্য বন্দী হৃদয়ের রক্ত দিয়া প্রাণের ভাষায় তাহার অশ্রু-অঞ্জলি রচনা করিয়াছিল—আজ সে মুক্ত; বিমান-বিহারী বিহঙ্গম সদৃশ স্বাধীন।

নূতন রাজার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তাহার চরণের শৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ ব্রহ্ম দস্যুর উন্মুক্ত কৃপাণ হইতে, নিজের বক্ষ পাতিয়া, সে পরিদর্শকের শির রক্ষা করিয়াছিল। সে স্বেচ্ছায় মৃত্যু আহ্বান করিয়াছিল,—মুক্তি মিলিয়াছে!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যর্থ প্রভাত।

উষার কিরণ পশিল কাননে,
সে আসি' দিল না দেখা;
শিশিরসিক্ত তৃণ'পরে রাখি'
চরণালক্ত-রেখা।

আজি হেথা ফুল কে করে চয়ন,
রয়েছে শূন্য ডালা;
হেথা তরুতলে রয়েছে পড়িয়া,
মলিন পুষ্পমালা।

গাহিতে গাহিতে থামিল কোকিল,
ভ্রমর ভুলিল তান;
সযতনে বীণা কোলে তুলে লয়ে
কে আজি গাহিবে গান

প্রভাত-পবন খেলিবে আজিকে
মুক্ত অলকে কা'র!
কোন্ দূর হতে ভেসে আসে যেন
দেহ-সৌরভ তা'র।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য।

(২)

আমার বক্তব্যগুলি আরও বিশদ ভাবে বলিতেছি!—

প্রথমতঃ, যে সমস্ত প্রক্ষিপ্ত বৈদেশিক শব্দ এই বঙ্গভাষায় আসিয়া পড়িয়াছে, সেগুলি যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের স্থানে সুমার্জ্জিত সংস্কৃত শব্দ লইলে ক্ষতি কি?

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের স্বীয় ভাব প্রকাশ করিতে পরের দ্বারে ভাষা ভিক্ষা করা কি বাঞ্ছনীয়? এই ভাষা ভিক্ষাতেই বঙ্গসাহিত্যের আজিও পূর্ণ উন্নতি হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, ঐ ধার করা শব্দগুলিকে মাজিয়া ঘসিয়া সাহিত্যে চালাইবার পন্থা করিয়া দেওয়াই কি সাহিত্য-সেবা?

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কথায় বলিতে গেলে "মড়াদাহ" "শব-পোড়া" ভাষাই এই আধুনিক বঙ্গভাষা। যদি আমাদের সাহিত্যিকগণ মনস্বিতার পরিচয় দিয়া এই সকল বৈদেশিক বাক্যগুলি বাহির করিয়া তাহাদের সমার্থবাচক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ প্রকাশ করিতেন, তবে তাহাতে ভাষার প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। বাঙ্গালা অক্ষরে কাব্য লিখিলেই বাঙ্গালা হয় না। এই সব বৈদেশিক শব্দের সম্মিলনে যে বঙ্গভাষা সৃষ্ট হইয়াছে, সে ভাষার কোনই নিয়ম বা শৃঙ্খলা নাই, ব্যাকরণ নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই। যদি বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি বঙ্গভাষা শিখিতে চাহেন, তিনি কিছুই শিখিতে পারিবেন না। বরং তিনি দেখিবেন যে, বঙ্গভাষা সকল ভাষার সংমিশ্রণে একটি অদ্ভুত ভাষা-শঙ্কর। কিছুদিন পরেই হয় ত কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিবেন, বঙ্গদেশে মুসলমান্ ও ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে কোন ভাষাই ছিল না। কিম্বা তিনি Bishop Caldwell, Anderson, Latham, Kay প্রভৃতির সহিত এক মতাবলম্বী হইয়া বলিবেন যে, ইহা একটি অনার্য্য জাতির দুর্ব্বোধ্য ভাষা।

এই স্বেচ্ছাকৃত বিশুদ্ধিহানির বলে সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়াছে

এবং এই স্বেচ্ছাচারের ফলে বিশৃঙ্খলা এবং অনুকরণের উদ্দাম তরঙ্গ ছুটিয়াছে।

ভাষার এইরূপ স্বেচ্ছাচারের যুগে ব্যাকরণ কখনও থাকিতে পারে না; আর বাস্তবিক নাইও। কারণ, দেশে যখন রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন যেমন কেহ আইন মানে না, সকলেই আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়; তেমনই আজ ভাষা-বিপ্লবের দিনে সকলে স্ব স্ব রচনা রক্ষা করিতে সচেষ্ট। অনেকে বলেন, ভাষায় ব্যাকরণ একটি প্রতিবন্ধক—অন্তরায়। ব্যাকরণ ভাষার অনুসরণকারী। ব্যাকরণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভাষা চলিবে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। বন্ধন সকলের জন্যই আছে। দেশের বন্ধন আইন, মনুষ্যের বন্ধন সমাজ, ভাষার বন্ধন ব্যাকরণ। ব্যাকরণ লেখকের স্বাধীনতাপহারী নহে, ব্যাকরণ ভাষায় স্বেচ্ছাচারজনিত যে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে তাহারই নিবারণ করে। ব্যাকরণ ভাষার তুলাদণ্ড, ভবিষ্যত যুগে পাঠকদিগের শিক্ষক ও বোধয়িতা। অপরিমিত স্বাধীনতায় উচ্ছৃঙ্খলতা আইসে. সুতরাং এই সামান্য অধীনতাটুকু সুখের। স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য নহে, স্বাধীনতা সাম্য ও সামঞ্জস্যের জন্য। সেই হেতু স্বাধীনতারও সীমা আছে।

ব্যাকরণের উপকারিতা, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয়। সংস্কৃত ভাষা আমরা অতি কঠোর মনে করি। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহার্য্য লইলে আমরা তাহা সহজে বুঝিতে পারি। যদি এই সংস্কৃত সাহিত্য বৰ্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের মত বিপথগামী হইত, তাহা হইলে আজ, বোধ হয়, আমরা এ রসজলধি হইতে একবিন্দু রসও তুলিতে পারিতাম না। এই আমার দুঃখ যে, তথাকথিত "কঠোর" সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারি, বৈদেশিক ভাষা বুঝিতে পারি; কিন্তু আমার জাতীয় বঙ্গভাষার আধুনিক সাহিত্যগুলি সম্যক্ বুঝিতে পারি না। তবে কি বলিব যে, সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণ মানিয়া চলে বলিয়া উহাতে স্বাধীন কবিত্ব বা কল্পনার উন্মাদিনী ক্ষমতা নাই; আর বঙ্গভাষা ব্যাকরণ মানে না বলিয়া উহার স্বাধীন কবিত্ব আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই? তাহা নহে। সংস্কৃত ভাষা অনুচ্ছৃঙ্খল স্বাধীন, আর বাঙ্গালা ভাষা উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীন।

ব্যাকরণ অবহেলায় যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে তাহার উদাহরণ আমি কয়েকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ১৩১৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভাণ্ডারে' শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়

লিখিয়াছেন "তৎকালে বাংলাভাষা অতি হেয় ও নগণ্য অবস্থায় কৃষকের মেঠোসুরে ও প্রবাদ বচনে কথঞ্চিত আত্ম-রক্ষা করিয়া পল্লীকুটীরের একান্তে লুকাইত ছিল।" দীনেশবাবুরই রচনায় হইতে দ্বিতীয় উদাহরণ "উন্মাদিনী কেশরী।" ১৩১২ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের একখানি পুস্তকের সমালোচনায় দেখিয়াছি যে, লেখক "শ্বশুর" বুঝাইতে "শ্বশ্রূদেব" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। রবি বাবুর 'চোখের বালিতে' আছে, "মা তাহাকে ষ্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মত মহেন্দ্রের একটি আবশ্যক ভারবহ আসবাবের মত দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন।" এখন পাঠক বলুন, এ সকল রচনার ভাষা কি? এরূপ ভাষা, যদি চলিতে পারে, তবে 'হুতোম প্যাঁচার' ভাষা বা 'আলালের ঘরের দুলালের' ভাষা কোন্ দোষে নির্ব্বাসিত হইয়াছে? ব্যাকরণ-নির্ব্বাসন ও ইংরাজীর অনুকরণের ফলে সাহিত্যে যে নব হাস্যরসের অবতারণা হয় তাহাই দেখাইবার জন্য আমি ঐ কয়টি রচনা উদ্ধৃত করিলাম। জিজ্ঞাসা করি, ইঁহারা কি "ভবিষ্যৎ যুগের দূত" যে এখন ইহাঁদের রচনা আমাদের বোধ-শক্তির অতীত? (শ্রীযদুনাথ সরকার, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩১৪) না Languge is given to a man to conceal his thoughts ভাবগোপনের জন্যই ভাষার প্রয়োজন, ইহাঁরা এই বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

যাহা হউক শাসনের শৃঙ্খলা যেমন আইন রাখে, ভাষার শৃঙ্খলাও সেইরূপ ব্যাকরণ রাখে। অতএব ভাষার শৃঙ্খলা ও রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে ব্যাকরণের প্রয়োজন, এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? Grammar is the art of speaking and writing correctly "ব্যাক্রিয়ন্তে অনেন ইতি ব্যাকরণম্"। ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগকল্পে ব্যাকরণের প্রয়োজন। ইহার উপরেও যদি কেহ বলেন, মাতৃভাষা শিখিতে ব্যাকরণ অনাবশ্যক, তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ অনিবার্য্য। মাতৃভাষার দুইটি স্তর আছে, এক লিখিত ভাষা, অন্য কথিত ভাষা। কথিত ভাষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন না হইতে পারে; কারণ, কথিত ভাষা কখন এক থাকে না; কিন্তু লিখিত ভাষা একই থাকে, তাহার জন্যই ব্যাকরণ। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কোন দেশের মাতৃভাষার জন্যই ব্যাকরণ প্রণীত হইত না।

কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের এখনও ব্যাকরণ-প্রণয়নের সময় হয়

নাই। একথা ও ভুল। কারণ, এমন কোন্ অবস্থা আছে, যে অবস্থায় শুদ্ধ তাহার প্রয়োগ প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য নহে। যে ভাবে যে প্রণালীতে শব্দ প্রযুক্ত হইলে শ্রুতিমাত্রই তাহার অর্থ বোধ হয়, তাহাকে বৈয়াকরণগণ শুদ্ধ প্রয়োগ বলেন। বৈয়াকরণগণ সেইরূপ প্রচলিত শুদ্ধ প্রয়োগগুলিকেই লিপিবদ্ধ করেন ও তাহাই ব্যাকরণ বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই ব্যাকরণ-প্রণয়নে যতই বিলম্ব হইবে ততই আরও ব্যতিক্রম আসিয়া জুটিবে। কিন্তু একবার বৈয়াকরণিক নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইলে, আর তাহা লঙ্ঘন করা বড়ই দুরূহ হইয়া পড়ে। আমার বোধ হয়, বাঙ্গালার ব্যাকরণ সূত্রে যে এত ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় শুধু ব্যাকরণ-প্রণয়নে বিলম্বই তাহার একমাত্র কারণ। যত অধিক বিলম্ব হইবে ততই সূত্র ও ব্যতিক্রমভার অধিক হইয়া পড়িবে।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্যাকরণ দিয়া বন্ধন দিলে ভাষার স্বাধীনতা বদ্ধ হয়; অতএব ব্যাকরণ হওয়া উচিত নহে। এ যুক্তিও সম্পূর্ণ অসার। আমরা মনে করি, উচ্ছৃঙ্খলতাই স্বাধীনতা। তাহা নহে। সকল দেশই ব্যাকরণ মানিয়া চলিতেছে, তবে কি সকল দেশেই ভাষার অবাধ প্রবাহ রুদ্ধ ? ভাষার স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতেই ব্যাকরণ। মানুষকে সংযত করিতে এতাবৎ অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, শাসনশাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু সকল মানুষই কি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ? অনেকে হইয়াছে ও অনেকে হয় নাই; যাহারা হয় নাই তাহারাও হইবে; তবে কিছু পরে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি বলিতে হইবে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির কোন প্রয়োজন নাই ? যদি তাহা না থাকে তবে ব্যাকরণেরও নাই।

শিশুকে প্রথম চলিতে শিক্ষা দিবার সময় যেমন তাহাকে হাত ধরিয়া চালাইতে হয় তাহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী; সেইরূপ শিশু বঙ্গভাষাকে এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। এতদিন বঙ্গভাষা সংস্কৃতের নিকটে থাকিয়া সংস্কৃত ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছে; কাযেই সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে আমাদের ব্যাকরণ রচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইচ্ছা, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা ব্যাকরণকে সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করেন; তিনটি স

(শ স ষ) দুইটি ন (ণ ন) দুইটি জ (য জ) উঠাইয়া দেন। ইহাতে বঙ্গভাষার কি উপকার হইবে? আর সংস্কৃতের সহিত বঙ্গভাষার সম্বন্ধ থাকিলেই বা বঙ্গভাষার কি অনিষ্ট হইতেছে?

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃতের কন্যা অতএব প্রাকৃত ব্যাকরণমতে বাঙ্গালা ভাষা গঠিত হউক। ইহাতেই বা কি লাভ? সতীশ বাবু চলিত কথিত ও প্রাদেশিক ভাষার এক শত পৃষ্ঠা ব্যাপী এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহার দ্বারা প্রচলিত শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থ কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—রেলের-গাড়ী = রেলগাড়ী; গোরাদের জন্য বাজার = গোরাবাজার; ঠাকুর অর্থাৎ পূজনীয় দাদা = ঠাকুর দাদা; বাবাই অর্থাৎ পুত্রাদিই জীবণ = বাবাজীবন, জলের অর্থাৎ মাছের ন্যায় জীবন্ত = জলজীবন্ত ইত্যাদি। যাহা হউক গোরাবাজার যেরূপ সমাস হইল (তৎপুরুষ) বৌবাজার, শ্যামবাজার, ফিরিঙ্গি বাজার, কক্স্ বাজারও কি সেইরূপ তৎপুরুষ সমাস? সাহিত্যের ভাষার জন্য ব্যাকরণ সৃষ্ট হয়; প্রচলিত কথোপকথনের ভাষার জন্য নহে। ঐরূপ চলিত কথা সাহিত্যে কখনও স্থান পায় নাই, পাওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে।

এদিকে আবার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গালার যুক্তাক্ষর উঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তবেই দেখা যাইতেছে,—যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ সাহিত্যে প্রচলিত কথার প্রবেশাধিকার দিয়া, যুক্তাক্ষর উঠাইয়া দিয়া, ও ভাষাকে ব্যাকরণবন্ধমুক্ত করিয়া, বৈদেশিক ভাষাকে সাহিত্যে আসতে দিয়া,—বঙ্গসাহিত্যে ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়াছে। পণ্ডিতগণ ইহার শাস্তি বিধান করুন।

উপসংহারে আর একটি কথা বলিয়া আজ বিদায় হইব। আমাদের সাহিত্য দিন দিন ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে; সাহিত্যে ধর্ম্মভাব প্রচলিত করিলে লেখকের ও পাঠকের উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হইবে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মৃত্যু-মিলন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজসমীপে।

—:*:—

স্বামী তাঁহাকে সে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন বলিয়া রাণী সোৎসাহে অজয় সিংহের পত্নীর সম্বন্ধে রাজনির্দ্দিষ্ট কার্য্যে রত হইয়াছিলেন। তিনি উমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিয়া রেবাকে আনিতে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময় রাণী আপনার কথা ভাবিতেছিলেন। রাজা বলিয়াছেন, অজয় তাঁহাকে না জানাইয়া বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু তিনি বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষী; কারণ, অজয় ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছে। তবে ত রাজা ভালবাসার সম্মান করিতে ভালবাসেন। কিন্তু হায়—তাঁহার ভাগ্যে কি স্বামীর সেই ঈপ্সিত ভালবাসালাভ ঘটিবে? রাণীর এখন কেবল সেই চিন্তা। উমাকে পাঠাইয়াও রাণী সেই কথা ভাবিতেছিলেন।

তিনি কতক্ষণ এইরূপ চিন্তাবিষ্টা ছিলেন তাহা তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারেন নাই। উমা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি চিন্তালোক হইতে ফিরিলেন। উমা রেবার আগমনবার্ত্তা জানাইল।

রাজার অভিপ্রায় অনুসারে রাণী তাঁহাকে সে সংবাদ দিলেন।

রাজা আসিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে উপবেশন করিলেন। তখন রাণী রেবাকে আনিবার জন্য উমাকে উপদেশ দিলেন।

উমা যখন রেবাকে আনিতে আসিল তখন প্রথম-পরিচয়-বিস্মিতা রেবা স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া উমা সরিয়া আসিল এবং কিছুক্ষণ পরে যাইয়া রেবাকে জানাইল, রাণী তাহাকে ডাকিতেছেন।

রেবা কক্ষের পর কক্ষ, অলিন্দের পর অলিন্দ অতিক্রম করিয়া উমার সহিত রাণীর সম্মুখে উপনীতা হইল। আসিয়াই সে হতাশ হইল—তাহার

স্বপ্ন-রচনা চূর্ণ হইয়া গেল। কক্ষ বহুমূল্য গৃহসজ্জায় সজ্জিত—স্বর্ণসূত্র খচিত আস্তরণে আস্তৃত—গৃহে কুসুমের বাহুল্য, নানাজাতীয় কুসুমের ঘন সৌরভ কোমল দিবালোকে আলোকিত কক্ষ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। রাণী রত্নরাজিকিরণকর্ব্বুর আসনে উপবিষ্টা। তাঁহার অঙ্গে, বেশে ও কেশে নানা রত্ন দীপ্তি পাইতেছে। তিনি গম্ভীরভাবাবিষ্টা।

রেবা রাণীকে প্রণাম করিল। তিনি ত উঠিয়া আসিয়া তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন না! তিনি কেবল তাহাকে সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

রেবা ভাবিল, এ কি? রাণীর পদগর্ব্ব যদি তাঁহাকে আত্মীয়স্বজনগণের সহিত এইরূপ ব্যবহার করায়, তবে রাজা বা রাণী সুখী কিসে?

তাহার পর রাণী তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

রেবা উত্তর করিল। কিন্তু তাহার মনে হইল, রাণীর জিজ্ঞাসা কেবল লৌকিক আচার রক্ষা মাত্র। তাহাতে আন্তরিকতার পরিচয়মাত্র নাই।

তাহার পর রাণী রেবার পিতার নাম ও তাহার বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

রেবা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল; কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উত্তরে তাঁহার কোন আগ্রহ নাই। সে যখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল—তিনি যেন তখন অন্যমনস্কা। রেবা ভাবিল,—এ কি? যদি উত্তর শুনিতে ইচ্ছা না থাকে, তবে প্রশ্ন করিবার সার্থকতা কি?

বাস্তবিক রাণী অন্য কথা ভাবিতেছিলেন। রাজা যেরূপভাবে যে প্রশ্ন করিতে বলিয়াছিলেন, প্রশ্ন হইতে প্রশ্নান্তরে গমনের যে প্রণালী-নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—রাণী সেই সব ভাবিতেছিলেন। রাজার উপদেশের বা অভি-প্রায়ের তিলমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটে, রাণী সেই জন্যই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাই রেবা তাঁহার অন্যমনস্কভাব লক্ষ্য করিয়া বিস্মিতা হইতেছিল।

রাণী বলিলেন, "তুমি, বোধ হয়, জান না, অজয়সিংহ রাজার অনুমতি না লইয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন।"

রেবা বলিল, "তিনি আমাকে সে কথা বলিয়াছেন।"

"সেই জন্য তাঁহার এ বিবাহ অসিদ্ধ।"

রেবা বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—"ধর্ম্ম সাক্ষী তিনি আমাকে বিবাহ করিয়াছেন।"

রাণী বলিলেন, "সত্য। কিন্তু তুমি রাজভ্রাতার পত্নী বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিবে না।"

রেবার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছিল। সে বলিল, "আমাকে এ আদেশ করিবার ক্ষমতা আমার স্বামী ব্যতীত আর কাহারও নাই। তিনি স্বয়ং আমাকে না বলিলে আমি বিশ্বাস করিব না যে, এ আদেশ তাঁহার।"

রাণী পুনরায় বলিলেন, "তোমার ভরণপোষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে; কিন্তু রাজভ্রাতার পত্নীর সম্মান ও সমাদর তুমি পাইবে না,—তুমি সে পরিচয়ে পরিচিতা হইতে পারিবে না।"

রেবার মনে হইল, যেন তাহার হৃদয়-মন্দিরের দেব-প্রতিমাকে কে ধূলি-বিলুণ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে—বিষম বেদনায় তাহার ভক্ত-হৃদয় অবসন্ন। সে উন্মত্তার মত বলিল, "ভরণ-পোষণ! হায়—আপনি নারী হইয়া—পত্নী হইয়া নারীকে—পত্নীকে এই অপমানের কথা বলিলেন? তিনি আমাকে চরণে স্থান না দেন, আমি দরিদ্র পিতার দুঃখিনী কন্যা পিতার কুটীরে ফিরিয়া যাইব—তথায় আমার আশ্রয় মিলিবে—তথায় কেহ আমাকে এমনভাবে অপমানিত করিতে পারিবে না। কিন্তু আমি একবার আমার স্বামীর মুখে তাঁহার আদেশ শুনিব।"

রেবার চক্ষুর সম্মুখে যেন দিবালোক নিবিয়া গেল। সে অবসন্নভাবে আসনে বসিয়া পড়িল।

রাজা পার্শ্বস্থিত কক্ষে—দ্বারান্তরাল হইতে সব লক্ষ্য করিতেছিলেন—সব শুনিতেছিলেন। তিনি আজ নারী-চরিত্রের এক নূতন রূপ দেখিলেন। তিনি রাণীকে দেখিয়াছেন—ঔদাস্যপ্রতিমা,—স্নেহপ্রেমাদিভাবলেশবর্জ্জিতা,—আবেগবিহীনা; তিনি পার্ব্বতীকে দেখিয়াছেন,—আত্মস্থা,—সংযম-সাধন-সিদ্ধা,—কর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিতা; তিনি রেবাকে দেখিলেন,—ভাবাবেশবিহ্বলা—প্রেমপ্রদীপ্তা,—প্রণয়সর্ব্বস্বা।

রাণী সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা বলিলেন, "তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এ বিবাহে সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।"

রাজা উঠিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন; অজয় সিংহকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন।

রাজার ক্ষুদ্র কথায় রাণী হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।" রাণী পুনঃ পুনঃ সেই কথা মনে করিতে লাগিলেন। তবে রাজা তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়াছেন! এই চিন্তায় রাণীর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এদিকে যথায় অজয় সিংহ একাকী নানা দুশ্চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলেন, তথায় সংবাদ আসিল,—রাজা তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তিনি ব্যস্তভাবে ভ্রাতৃদর্শনে চলিলেন। তাঁহার মনে কত আশঙ্কা!

তিনি সম্মুখীন হইলে রাজা বলিলেন, "অজয় সিংহ, তুমি আমার বিনানুমতিতে বিবাহ করিয়াছ।" রাজার কণ্ঠস্বর স্থির—গম্ভীর।

অজয় সিংহ কোন উত্তর করিলেন না।

রাজা পুনরায় বলিলেন, "তুমি ইচ্ছা করিলে, রাজদুহিতা বিবাহ করিতে পারিতে।"

অজয় সিংহ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি আমার সেরূপ বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তখন আমি আমার অনিচ্ছার কারণ নিবেদন করিয়াছি।"

রাজা বলিলেন, "এ বিবাহ তোমার যোগ্য নহে। তোমাকে এ পত্নী পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

অজয় সিংহ দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি যেন বিষম আঘাতে আহত হইলেন। তিনি ভ্রাতার চরণপ্রান্তে বসিয়া অতি কাতরভাবে বলিলেন, "আমি আপনাকে না জানাইয়া—আপনার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিয়াছি। আমার সে অপরাধের যে শাস্তি হয়, প্রদান করুন। আমি স্বয়ং সে অপরাধের জন্ত অনুতপ্ত; কিন্তু আমাকে এ আদেশ করিবেন না।"

রাজা বলিলেন, "আমার অন্য আদেশ নাই।"

অজয় সিংহ বলিলেন, "আমাকে দূর হইয়া যাইতে বলেন, আমি চলিয়া যাইব। কিন্তু যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহাকে ত্যাগ করিবার আদেশ দিবেন না।" দৃঢ়কায় বলবান অজয়সিংহ পবনহিল্লোলে অশ্বত্থ-পত্রের মত কম্পিত হইতেছিলেন।

রাজার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য দূর হইয়া গেল। তিনি সস্নেহে ভ্রাতার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "অজয়, ভাই—উঠ। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম। আমি তোমার এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিব।"

অজয় সিংহ ভ্রাতার চরণধূলি মস্তকে দিলেন।

রাজা বলিলেন, "যাও, তোমার পত্নীকে লইয়া আইস। আমি আমার ভ্রাতৃজায়াকে আশীর্ব্বাদ করিব।"

অজয় সিংহ সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া কল্পিত নন্দন বিদলিত দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া রেবা তথায় বসিয়া ছিল তথায় আসিলেন।

পতিকে দেখিয়া রেবার অভিমান ও দুঃখ উথলিয়া উঠিল।

অজয়সিংহ বলিলেন, "রেবা চল, রাজা ডাকিতেছেন।"

রেবার ব্যথিত অভিমান এইবার আত্ম-প্রকাশ করিল। সে বলিল, "আমাকে যে অপমান করিতে হয়—তুমি কর। তোমার কাছে আমার মান অপমান নাই। কিন্তু—"রেবা কাঁদিয়া ফেলিল, আর কিছু বলিতে পারিল না।

অজয় সিংহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিস্মিত হইলেন; রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, রেবা? কি হইয়াছে।

রেবা অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিল, "তোমার জন্য রাজোদ্যানের কত ফুল ফুটিয়াছিল; তুমি প্রাসাদের ধূলির উপর পদদলিত করিবার জন্য কেন কানন-কুসুম চয়ন করিয়াছিলে?"

অজয় সিংহ বলিলেন, "সে কি রেবা! তোমাকে কি আমি অপমান বা অবহেলা করিয়াছি?"

এই প্রশ্নে রেবার অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমিও সেই বিশ্বাসে তোমাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলাম। হায়- তখন যদি জানিতাম, প্রাসাদপাষাণপ্রাচীরে কেবল নিষ্ঠুর কঠোরতা আবদ্ধ! তোমার পক্ষে যাহা ক্ষণিক আনন্দ, আমার পক্ষে যে তাহা জীবনের সব!"

অজয় সিংহ বুঝিলেন, যখন এ অঘটন ঘটিয়াছে, তখন ইহার কোন বিশেষ কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু রাজা অপেক্ষা করিতেছেন; আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তিনি স্নেহস্নিগ্ধ ভাবে রেবাকে বলিলেন, "তুমি ভুল বুঝিয়াছ। সে কথার আলোচনা দুইজনে পরে করিব। আমি তোমাকে অবহেলা করিব,—এ আশঙ্কাকে মনে স্থান দিও না। রাজা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমার সহিত চল।"

রাজ সমীপে উপনীত হইয়া রেবা রাজাকে প্রণাম করিল।

রাজা বলিলেন, "কল্যাণি, আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা পরস্পরকে ও স্বজনগণকে সুখী কর—আপনারা সুখী হও।"

তাহার পর রাজা বলিলেন, "তুমি যে ভাবে আজ প্রাসাদে আসিয়াছ, তাহা তোমার উপযুক্ত নহে। আমি শুভদিন দেখিয়া আমার ভ্রাতৃজায়াকে সসম্মানে আনিতে পাঠাইব।"

অজয়সিংহের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "অজয় এই লও, তোমার পত্নীর অলঙ্কার। তিনি আধারের আবরণ মোচন করিয়া আধার ভ্রাতাকে দিলেন; অলোক-সম্পাতে অলঙ্কারে বহুরত্নদীপ্তি প্রকাশ পাইল।

রেবা ভাবিল, এ মায়া-পুরীই বটে!

দশম পরিচ্ছেদ।

আশ্রম।

দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ডপ্রভাকরদীপ্ত নিদাঘ শেষ হইয়া গেল। আষাঢ়ের আকাশে জলধরা মেঘ তাহার তপ্ত অঙ্গে স্নিগ্ধতার সঞ্চার করিতে লাগিল। ধরাতল নবোদ্গত তৃণদলে মনোরম। সরসীর স্বচ্ছজলে কোথাও বা নীলৎপলকান্তি, কোথাও বা প্রভিন্নাঞ্জনরাশিবৎ মেঘের প্রতিবিম্ব আপনার বর্ণ-সঞ্চার-রত। সমীরণ প্রস্ফুটিত কদম্বসর্জ্জার্জ্জুনকেতকীবনের সৌরভে সুরভিত, সশীকরাম্ভোধরসঙ্গ শীতল। প্রকৃতির দৃশ্য নূতন।

রাজা অতি শীঘ্র আশ্রমনির্ম্মাণকার্য্য শেষ করাইতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। জলাশয়-খনন প্রথমেই সমাপ্ত হইয়াছিল। বর্ষার আরম্ভ হইতে না হইতে গৃহ-নির্ম্মাণ ও উদ্যান-রচনা কার্য্যও শেষ হইয়া গেল।

রাজা আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিতের আগমন প্রতীক্ষায় পার্ব্বতী বিলম্ব করিতেছিল। তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিলেন।

পুরোহিত শুভ দিন দেখিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতে বলিলেন; বলিলেন, শুভকার্য্যে বিলম্ব করিতে নাই। তিনিও যত সত্বর সম্ভব এ কার্য্য শেষ দেখিয়া পুনরায় যাত্রা করিবেন; এখনও তাঁহার কয়টি তীর্থ দর্শন করিতে অবশিষ্ট আছে।

দিন স্থির হইল। সকল উদ্যোগ শেষ হইল।

পার্ব্বতীর হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। যখন সে এইরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিত, তখন তাহার মনে হইত, সে আকাশ-কুসুমের স্বপ্নে বিভোর। দরিদ্র পুরোহিতের কন্যার পক্ষে বহুব্যয়সাধ্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা একান্তই অসম্ভব। সে পিতাকে তাহার কল্পনার কথা বলিত; পিতাও সেই কথা বলিলেন—"একার্য্য বহুব্যয়সাধ্য; আমাদের ক্ষমতার অতীত।" পার্ব্বতী তখন কেবল ভাবিত, কিছুতেই কি একার্য্য সম্ভব হয় না? সে কত দিন নিশীথে জাগিয়া শুধু এই কথাই ভাবিয়াছে। সে কত দিন দেবমন্দিরে যাইয়া দেবতার নিকট এই কল্পনার কার্য্যে পরিণতি প্রার্থনা করিয়াছে।

এখন সেই সকল কথা পার্ব্বতীর মনে হইতে লাগিল। আজ তাহার আনন্দের মধ্যে দুঃখের এক কারণ বর্ত্তমান। যে তাহার সকল কার্য্যে সহানুভূতি করিত; যে তাহার সহিত কত দিন দেব-মন্দিরে যাইয়া তাহারই প্রার্থনার পুনরুক্তি করিয়াছে; যে তাহার সমস্ত স্নেহ অধিকার করিয়াছিল—আজ আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে পার্ব্বতীর কেবল তাহার কথা মনে হইতে লাগিল। সে আজ কোথায়? সে থাকিলে আজ তাহার কত আনন্দ হইত! সেই কথা মনে করিয়া পার্ব্বতী অশ্রুবর্ষণ করিত। বাস্তবিক এই আশ্রমরচনার কার্য্য আরব্ধ হইলে—এই এক নূতন আকর্ষণ শোকের বেদনাকে সমাচ্ছন্ন না করিয়া দিলে পার্ব্বতীর জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত।

আর আজ পার্ব্বতীর তরুণ হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া তাহার অদৃষ্টাকাশে দয়ার আদর্শ রাজার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পার্ব্বতী তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। তরুণ হৃদয়ের যে,—আকর্ষণ অতি পবিত্র। যাহা মানবকে দেবতার আসনে আসীন করাইয়া তাহার পূজা করে, যাহা মানুষকে আদর্শের সন্নিহিত করিতে সচেষ্ট হয়,—যাহার বিকাশ চিরমধুময়, যাহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে ভক্তের—সাধকের পুণ্যভাবে বিভোর হইতে হয়, সে সেই আকর্ষণে রাজার দিকে আকৃষ্টা হইতেছিল। ঘনিষ্ট পরিচয়ে তাহার সে শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছিল; সে ভক্তি গাঢ়তর ও সে আকর্ষণ প্রবলতর হইতেছিল। পার্ব্বতী তাঁহার দয়াগুণে আকৃষ্টা হইয়া তাঁহার সন্নিহিতা হইয়াছিল। দারুণ দুঃখে উভয়ের পরিচয়। কিন্তু সন্নিহিতা হইয়া সে দেখিল,—তাঁহার গুণের অবধি নাই।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন পার্ব্বতী আপনার পরিচিত গৃহে অসীম চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিতে লাগিল। যে গৃহে তাহার জন্ম,—যে গৃহের সহিত তাহার জীবনের সকল স্মৃতি বিজড়িত,—যে গৃহে তাহার সকল আশা-নিরাশার অভিনয় হইয়াছে পরদিন সে সেই গৃহ ত্যাগ করিবে। পরদিন সে পরিচিত পুরাতনের সকল বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বেচ্ছায় গৃহীত নূতন বন্ধনে আপনাকে বদ্ধ করিবে। সে যে পথের পথিক হইবে, সে পথ তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত; কেবল আশার উত্তেজনায় সে সে পথের পথিক হইতে চলিয়াছে; কেবল কল্পনার আলোকে সে পথ আলোকিত।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার যাতনার কারণও পার্ব্বতী বিস্মৃতা হইতে পারে নাই। যখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়—তখন সে বালিকামাত্র; আর তাহার ভ্রাতা তখন নিতান্ত শিশু। সেই অতর্কিত আঘাত তাহার বাল্যচাপল্য অপহৃত করিয়া তাহাকে কর্ত্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান দান করিয়াছিল; সে বালিকা পুত্তলখেলা ছাড়িয়া ভ্রাতার লালনপালনভার লইয়াছিল। রমণী হৃদয়ে মাতৃত্বের যে ভাব বীজমধ্যে বৃক্ষের জীবনীশক্তির মত নিহিত থাকে তাহা আবশ্যককালে আত্মবিকাশ করে। রোগে, শোকে. বেদনায়, যাতনায় বালিকার যে ধৈর্য্য, যে সেবানিপুণতা সপ্রকাশ হয় তাহা বৃদ্ধের পক্ষেও চেষ্টালভ্য। জননীর মৃত্যুতে যখন পিতা সেই শিশু পুত্রকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন, তখন সে তাহার সকল ভার লইল। পিতা অনিচ্ছায় একজন আত্মীয়াকে তাহার পালনভার দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; শিশুকে তিনি তাঁহার নিকট রাখিবেন, স্থির হইয়াছিল। সে কথা শুনিয়া পার্ব্বতী কাঁদিয়া পিতাকে সে সঙ্কল্প হইতে বিরত করাইয়াছিল। আজ সেই সকল কথা পার্ব্বতীর মনে পড়িতে লাগিল।

আজ তাহার সেই স্নেহভাজন কোথায়? পার্ব্বতীর ব্যথিত হৃদয় হইতে দীর্ঘ শ্বাস উঠিয়া শীকরশীতল পবনে মিলাইয়া গেল। তাহার হৃদয়ও আজ সজলজলদাবৃত আকাশের মত;—তেমনই জলভরা, তেমনই স্বচ্ছান্ধকার।

সমস্ত দিন সে গৃহের দ্রব্যাদি সাজাইল—গুছাইল।

মৃত ভ্রাতার দ্রব্যাদি গুছাইবার সময় তাহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া

সে সকলকে সিক্ত করিল। যেন তাহার শোক আবার নূতন হইয়া উঠিল। শোক কালজয়ী—সে সুযোগ পাইলেই সংযম-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

দ্রব্যাদি সাজাইতে—গুছাইতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল, তখন পার্ব্বতী যাইয়া শয্যায় শয়ন করিল। তখন বর্ষার মেঘে বর্ষণ আরব্ধ হইয়াছে; বারিপাত-শব্দের বিরাম নাই—বৈচিত্র্য নাই—বৈকল্য নাই। মধ্যে মধ্যে গুরুগম্ভীর ঘনগর্জ্জনে গৃহের রুদ্ধ দ্বার ও বাতায়ন কপাট কাঁপিয়া উঠিতেছে।

শয্যায় শয়ন করিয়া সে ঘুমাইতে পারিল না; তখনও তাহার কেবল ভ্রাতার সেই মৃত্যুসুপ্ত মুখ-চ্ছবি মনে পড়িতে লাগিল। পার্ব্বতী কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিল।

তাহার পর সে আপনাকে আপনি বুঝাইয়া শান্ত করিল। মাতৃহীনা পার্ব্বতীর অল্প বয়স হইতেই বুঝাইয়া শান্ত করিবার কেহ ছিল না। সে পিতার উপদেশ—শাস্ত্রের আদেশ স্মরণ করিয়া আপনার উচ্ছ্বসিত শোকাবেশ শান্ত করিল।

কিন্তু সে ঘুমাইতে পারিল না। জাগিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে বিরক্তি বোধ হইল; সে উঠিল। তখনও পার্শ্বের কক্ষে তাহার পিতা সান্তিস্নিগ্ধ সুখনিদ্রায় অভিভূত; সে নিদ্রায় দুশ্চিন্তাদুঃখলেশ বর্জ্জিত-হৃদয় ব্যক্তিরই অধিকার।

প্রত্যুষে উঠিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত দেখিলেন, পার্ব্বতী স্নানের পর সন্ন্যাসীর গৈরিকবাস পরিধান করিয়াছে। সে বসনে তাহার মূর্ত্তি সমধিক পুণ্য-সমুজ্জ্বল দেখিতেছে।

কিন্তু কন্যার সেই বেশ দেখিয়া পিতার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। এ যে সন্ন্যাসীর বেশ! আজ যদি পার্ব্বতীর জননী বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে ঘটনাস্রোত কোন্ পথে প্রবাহিত হইত? পুরোহিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; কিন্তু কন্যাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

সে দিন প্রভাতেই রাজা আশ্রমগৃহে গমন করিয়াছিলেন। সকল ব্যবস্থা উপদেশানুযায়ী হইয়াছে কি না, তিনি স্বয়ং তাহা দেখিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, কোন অনুষ্ঠানে কোনরূপ ত্রুটি না থাকে।

আজ তাঁহার স্বপ্ন-মন্দির কল্পনালোক হইতে বাস্তবের রাজ্যে আসি-

য়াছে। তিনি অত্যন্ত যত্নে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; শেষে তাহাতে সামান্য ক্রটি না রহিয়া যায়। অনুচরবর্গ পূর্ব্বেই সকল আয়োজন শেষ করিয়া রাখিয়াছিল—সুতরাং কোনরূপ অসম্পূর্ণতার জন্য রাজার আনন্দ আজ ক্ষুন্ন হইল না।

আজ যেন প্রকৃতিও সদয়। প্রত্যূষেই বর্ষণের শেষ হইয়া গিয়াছে; সঞ্চিত মেঘমালা প্রভাত-পবনে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া রবিকরবিকাশের সুযোগ দিয়াছে; তরুণ রবির কিরণ বৃষ্টিস্নিগ্ধ প্রকৃতির মুখে আনন্দাশ্রুস্নিগ্ধা যুবতীর অধরপল্লবে মৃদুমধুর হাসির মত দেখাইতেছে; তরু লতা বারিপাতে সতেজ; সম্মুখে সরসীবক্ষ প্রভাতপবনোদ্গত বীচিমালায় আন্দোলিত—যেন বালিকা-হৃদয় প্রথম প্রেমানুভূতিতে অজানা আনন্দে—আশায় ও আশঙ্কায় কেবল চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে; আজ কয়দিন পরে বৃষ্টির বিরামে বিহগকুল দিবালোকপুলকিত হৃদয়ে গান করিতেছে; রাজার হৃদয়ের আনন্দ যেন আজ প্রকৃতিতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আজ আশ্রমপ্রতিষ্ঠাদর্শনাশায় কুতূহলী জনতা নগর হইতে সমাগত হইয়াছে; যত বেলা বাড়িতেছে, তাহাদের সংখ্যা তত বর্দ্ধিত হইতেছে।

দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইতে না হইতে বৃদ্ধ পুরোহিত পার্ব্বতীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। আজ প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মধ্যে—এই আশ্রমগৃহে পুণ্যাম্বরধারিণীকে দেখিয়া সমাগত জনতা আনন্দে ও শ্রদ্ধায় বিহ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে দৃশ্যে রাজার হৃদয়ে যে পুলক-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া গেল তাহা বিদ্যুৎ-প্রবাহেরই মত অতর্কিত—তেমনই প্রবল—তেমনই সর্ব্বত্রসঞ্চারী, তেমনই সমগ্রহৃদয়ব্যাপী।

তাহার পর যথানিয়মে আশ্রমপ্রতিষ্ঠাকার্য্য নিষ্পন্ন হইল। বৃদ্ধ পুরোহিত স্বয়ং পৌরহিত্য করিলেন। রাজা সাগ্রহে ভক্তিপূত হৃদয়ে সে কার্য্য শেষ করিয়া মনে করিলেন, তাঁহার রাজকার্য্যের এই এক অংশ এত দিন অসম্পূর্ণ ছিল—আজ তাহা সম্পূর্ণ হইল।

রাজার প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অপরাহ্ন হইল। আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পর সমাগত দরিদ্রদিগকে আহার্য্য প্রদান করা হইল। রাজা স্বয়ং সে কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিলেন। কর্ম্মচারীরা কেহ কেহ তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি অভুক্ত; প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। আমরা এ কার্য্য শেষ

করিতেছি।" উত্তরে রাজা বলিলেন "এই সকল দরিদ্রপ্রজা বহুকষ্টে উদরান্নের সংস্থান করে। আজ ইহাদিগের আনন্দদর্শনে যে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে পারিব না।"

রাজা যখন প্রাসাদাভিমুখগামী হইলেন, তখন আকাশে আবার মেঘ সমাগম হইতেছে; দিবালোক ম্লান। তিনি প্রাসাদে উপনীত হইতে না হ'তে পুনরায় বর্ষণ আরব্ধ হইল।

রাণী পরিচারিকার নিকট আশ্রম-প্রতিষ্ঠার বিবরণ শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "হায় কেন আমি তথায় যাইতে চাহি নাই?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, কই রাজা ত তাঁহাকে যাইতে বলেন নাই! তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী; পতির পুণ্য কার্য্যে কি তাঁহার অধিকার নাই?

আগরার পথে।

লো স্মৃতি! বহাও প্রাণে কোন্ নির্ঝরিণী?
ঢালিছে মরুভু বুকে শীতলতা মধুর;
চিন্তার যমুনা-সম উজান-বাহিনী
হৃদয় উধাও হ'য়ে ছুটে কত দূর!
অতীত-গৌরব-স্তূপ কীর্ত্তির কাননে,
মধুর স্মৃতির কত চিত্র মনোহর;
প্রণয়ের পারিজাত ফুল্ল শিল্প-বনে,
বিকশিত আজিও কি সৌরভে সুন্দর!
পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে হেরিব আবার,
সৌন্দর্য্য-জড়িত সেই জাগ্রত স্বপন,
ঝলিছে দামিনীসম প্রতিচ্ছায়া তা'র,
উল্লাসে অধীর চিত্ত শিহরে কেমন!
কি তরঙ্গে বিলোড়িত স্মৃতির নলিনী,
আগরার পথে দৃশ্য চির-বিমোহিনী।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

ভাষা-বৈচিত্র্য।



মানব-সমাজ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জগতের পদার্থ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্য বিভিন্ন ভাষা-পদ্ধতির ও বাক্য-রচনা-প্রণালীর উদ্ভব। সর্ব্বত্রই পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা-সাধন ও সংযোগ-বিধান করিয়া পদার্থের গুণ-নির্ণয় ও পরিচয়-প্রদান করা হইয়া থাকে বটে; এবং এজন্য পদের সহিত পদের সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা করিয়া শব্দ-যোজনার দ্বারা বাক্য-রচনা করা হইয়া থাকে বটে; কিন্তু সর্ব্বত্র একই উপায়ে এবং একই নিয়মে পদার্থের ধর্ম্ম প্রকাশোপযোগী পদসমূহের সম্বন্ধ স্থাপিত করা হয় না। যে পদার্থের বিষয়ে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় এবং সেই সম্বন্ধে যাহা বলিবার প্রয়োজন হয় এই দুই এর সংযোগ-সাধন বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভাষার উপাদান ও লক্ষণ স্বরূপ বাক্যসমূহের দুই অংশ সকল সমাজে একই রীতিতে সংযুক্ত হয় না।

এই বাক্যরচনাপ্রণালীর বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনটি শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য ভাষা-পদ্ধতি ত্রিবিধ। বাক্যের অন্তর্গত বিষয়-বাচক এবং বক্তব্য-বাচক শব্দের সম্বন্ধ তিন প্রণালীতে সাধিত হইতে পারে।

প্রথমতঃ, কোন কোন সমাজে বক্তব্য-জ্ঞাপন করিবার জন্য যে যে শব্দ-ব্যবহারের প্রয়োজন, তাহার আকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তন বিধান করিতে হয় না। শব্দগুলির কোনরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয় না; ইহারা কোন ক্রম অনুসারে উচ্চারিত হইয়া বাক্য-সৃষ্টি করে; ভিন্ন ভিন্ন অর্থজ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হয়। শব্দটি ক্রমভগ্ন হইয়া স্থানান্তরিত হইলে সম্পূর্ণ নূতন ভাব-প্রকাশের ও নূতন বাক্য-সৃষ্টির কারণ হয়। এইরূপ ভাষাপদ্ধতিতে সন্নিবেশ-স্থানের দ্বারা শব্দের অর্থ প্রকাশিত হয়, শব্দের কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না; শব্দগুলি উচ্চারণ করিবার ক্রমই বাক্যের মধ্যে ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি ভাষা-পদ্ধতি আছে যাহাতে বিষয়বাচক এবং বক্তব্যবাচক শব্দগুলির মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য শব্দগুলির রূপ পরিবর্ত্তন করিতে হয়। যদ্দ্বারা

এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বাক্য-ব্যবহার করে, তাহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে শব্দ সন্নিবেশিত করিতে হয় না। প্রত্যেক শব্দের অঙ্গেই তাহার সহিত অন্যান্য শব্দগুলির সহিত সম্বন্ধ-প্রকাশক চিহ্ন থাকে। এই কারণে যে কোন স্থানে এবং যে কোন ক্রমে উচ্চারিত হইলেও এই শব্দগুলির কোন অর্থ বৈষম্য ঘটে না। আকৃতিগত পরিবর্ত্তনের চিহ্ন স্বরূপ যে বিভক্তি-সকল শব্দগুলির অঙ্গে সংলগ্ন থাকে, সেই সমুদায়ই শব্দসমূহের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিয়া ভাব-প্রকাশে সহায়তা করে।

তৃতীয়তঃ, আর এক শ্রেণীর ভাষা আছে যাহাতে ভাব প্রকাশ করিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীতে বাক্য-রচনা করিতে হয়। ইহাতে শব্দ-সমূহের রূপ-পরিবর্ত্তন করিতে হয় না; অথচ অপরিবর্ত্তিত শব্দসমূহের সন্নিবেশস্থানের দ্বারাও ইহাতে ভাব প্রকাশিত হয় না। শব্দগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য কতকগুলি সংযোজনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই সংযোজনীসমূহের দ্বারা পদগুলি শৃঙ্খলীকৃত হইয়া বাক্যের সৃষ্টি করে।

সংস্কৃত ভাষা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে বিভক্তিযোগের দ্বারা শব্দের রূপ ভেদ করিয়া পদ সমূহের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন বাক্য সৃষ্ট হয়। রূপান্তরিত না করিয়া কোন শব্দই প্রয়োগ করা হয় না, এবং বিভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পদ-যোজনা করা যায় না। প্রথমতঃ বিষয়বাচক শব্দসমূহ। ইহারা দুই শ্রেণীর অন্তর্গত, বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম। ইহাদের প্রত্যেকেরই শব্দগত লিঙ্গ আছে। সংস্কৃতভাষায় প্রকৃতিগত লিঙ্গের সহিত শব্দের লিঙ্গের কোন সম্বন্ধ নাই। ভাষাগত ব্যাকরণসিদ্ধ এক প্রকার নূতন পদ্ধতির লিঙ্গভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহার ফলে প্রত্যেক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দেরই এক এক প্রকার লিঙ্গ আছে। লিঙ্গ তিন প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন রূপপ্রণালী। সুতরাং শব্দগুলির লিঙ্গ অনুসারে রূপভেদ এবং বিভক্তি-যোগ হয়। প্রত্যেক লিঙ্গ বিশিষ্ট বিশেষ্য শব্দ দুই বিশেষ ভাগে বিভক্ত; স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত; প্রত্যেক ভাগের ভিন্ন ভিন্ন রূপপ্রণালী। সুতরাং শব্দগুলি পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ কেবলমাত্র ইহার উপর রূপ-পরিবর্ত্তন নির্ভর করে না; শব্দগুলি স্বরান্ত কি ব্যঞ্জনান্ত ইহার উপর রূপ-পরিবর্ত্তন নির্ভর করে। ফলতঃ,

লিঙ্গ ও অন্ত্যবর্ণই বিশেষ্যের রূপপরিবর্ত্তন-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেক শব্দের স্বাতন্ত্র্য-বিধান করে। লিঙ্গ ও অন্ত্যবর্ণ নিরীক্ষণ না করিয়া শব্দের বিশেষ অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। এই জন্য বিশেষ্য শব্দগুলি ছয় শ্রেণীর অন্তর্গত—পুংলিঙ্গ (স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত), স্ত্রীলিঙ্গ (স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত) এবং ক্লীবলিঙ্গ (স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত) ; এবং প্রত্যেক শ্রেণীরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ-পরিবর্ত্তন প্রণালী।

এই ছয় শ্রেণীর বিষয়বাচক বিশেষ্য শব্দের প্রত্যেকটির বচন অনুসারে তিন প্রকার রূপ হইয়া থাকে। একটি পদার্থ বিষয়ে বক্তব্যজ্ঞাপন করিবার জন্য বাক্য-রচনা করিতে হইলে শব্দের সহিত যে প্রকার বিভক্তি যোগ করিতে হয়, দুইটি পদার্থ সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন হইলে সেই পদার্থবাচক শব্দের সেইরূপ বিভক্তি যোগ করা হয় না, এবং বহুসংখ্যক বিষয়ে বাক্য-রচনা করিতে হইলে অন্যরূপ বিভক্তিযোগ করিতে হয়। ইহার ফলে বিষয়বাচক শব্দগুলি সংখ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার চিহ্ন ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত সম্বোধন করিয়া কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে হইলেও সংখ্যানুসারে শব্দের তিন প্রকার আকৃতি-পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

বিশেষ্য শব্দগুলির ন্যায় বিষয়বাচক সর্ব্বনাম শব্দেরও তিন প্রকার লিঙ্গ ; এবং লিঙ্গ অনুসারে প্রত্যেকের রূপ-পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু অন্ত্যবর্ণের প্রাধান্যে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। এই জন্য প্রত্যেক সর্ব্বনাম শব্দ লিঙ্গ অনুসারে কেবলমাত্র তিন প্রকার বিভক্তি ধারণ করে।

বিশেষ্য শব্দগুলির ন্যায় ইহাদেরও বচন তিন প্রকার কিন্তু বিশেষ্য শব্দের সম্বোধনে যেমন রূপ-পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ সর্ব্বনাম শব্দের দ্বারা সেইরূপ সম্বোধন অর্থ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় না, এজন্য সম্বোধনের কোন রূপ-পরিবর্ত্তন শব্দের বৈচিত্র্য-সাধন করে না। ফলতঃ প্রত্যেক বিষয়বাচক সর্ব্বনাম শব্দ তিন প্রকার লিঙ্গের এবং তিন প্রকার বচনের ফলে সর্ব্বসমেত নয় প্রকার অর্থবাচক চিহ্ন ধারণ করে।

দ্বিতীয়তঃ, বক্তব্যবাচক শব্দসমূহ। ইহারা ক্রিয়া জাতীয়। সংস্কৃত ভাষায় যতগুলি ক্রিয়াবাচক শব্দ আছে তাহারা প্রধানতঃ দশ গণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া শব্দের কোন লিঙ্গ থাকে না ; সুতরাং কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয়

না। কিন্তু পুরুষানুসারে ক্রিয়াপদে বিভক্তিযোগ হইয়া থাকে। যে বিষয়ে বক্তব্যজ্ঞাপন করিতে হইবে, তাহার যে পুরুষ হইবে, বক্তব্যবাচক শব্দেরও সেই পুরুষ হইবে। এই জন্য প্রত্যেক ক্রিয়ার তিন প্রকার রূপ-পরিবর্ত্তন হয়।

বিষয়বাচক শব্দের ন্যায় ক্রিয়া শব্দের ও সংখ্যানুসারে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, এবং যে বিষয়ে বাক্য-রচনার প্রয়োজন হয়, তাহার যে বচন বক্তব্যবাচক শব্দেরও সেই বচন হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক ক্রিয়া শব্দ তিন প্রকার পুরুষ এবং তিন প্রকার বচনের ফলে নয় প্রকার অর্থ-বাচক নয় প্রকার চিহ্ন ধারণ করে।

আবার কাল প্রকাশ করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন দ্বারা কাল, এবং বক্তার ইচ্ছা, এবং বক্তা বিষয়ের সহিত বক্তব্যের সম্বন্ধ যে ভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন এই সমুদায়ই এক সঙ্গে ব্যক্ত হয়। এই চিহ্নসমূহ দশ ভাগে বিভক্ত। সুতরাং সর্ব্বসমেত প্রত্যেক ক্রিয়াশব্দও নব্বই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া নব্বই প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত, প্রত্যেক ক্রিয়া শব্দের মৌলিক রূপই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। ইচ্ছা, প্রেরণা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য বক্তব্যবাচক শব্দগুলি মূলতঃই পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ নূতন শব্দ চারি প্রকারের। এই নূতন শব্দগুলিরও পুরাতন শব্দের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন বচন, পুরুষ, কাল, প্রথা প্রভৃতি অনুসারে নব্বই প্রকার বিভিন্ন আকৃতিগত পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং, প্রত্যেক ক্রিয়া শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য তিনশত ষাট্ প্রকার রূপ ধারণ করে।

এই সকল রূপ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বাক্য পরিবর্ত্তন করিলে ক্রিয়ার যে রূপ-পরিবর্ত্তন হয়, তাহারও গণনা করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, বিষয়বাচক শব্দের বিশেষক-সমূহ। যে সমুদায় বস্তু বা ব্যক্তি-বাচক শব্দের বিশেষকস্বরূপ এইগুলি ব্যবহৃত হয়, তাহাদের যেরূপ লিঙ্গ, বচন প্রভৃতি নিষ্পন্ন হয়, ইহাদের ও সেইরূপ লিঙ্গাদি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

ইহারা চারিশ্রেণীতে বিভক্ত; বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া। বিশেষ্য শব্দগুলি তিন প্রকারে বিষয়বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের বিশেষক হইতে পারে—প্রথমতঃ, সরল ও অযুক্তভাবে; দ্বিতীয়তঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত ও সমাসবদ্ধ হইয়া; তৃতীয়তঃ, সম্বন্ধ পদের রূপ প্রাপ্ত

হইয়া। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারে এই শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তন বিষয়-বাচক শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তনের অনুরূপ হয়। তৃতীয় প্রকারে সম্বন্ধ-প্রকাশক এক ভিন্ন জাতীয় বিভক্তি যুক্ত হয়।

সর্ব্বনাম শব্দগুলি দুই প্রকারে বিষয় বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের বিশেষক হইতে পারে; প্রথমতঃ সরল ও অযুক্ত ভাবে; দ্বিতীয়তঃ, ষষ্ঠী-বিভক্তির রূপ প্রাপ্ত হইয়া। বিশেষণ শব্দ দুই প্রকারে সিদ্ধ হয়। কতকগুলি শব্দ আছে যাহারা মূলতঃই গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতির বাচক। ইহারা কোন বিষয়-বাচক শব্দের বিশেষক ভাবে ভিন্ন অন্য কোন রূপে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। ইহারা সরল ও অযুক্ত থাকে। অপর কতকগুলি বিশেষণ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া বিষয়বাচক শব্দের বিশেষক হয়।

ক্রিয়া শব্দগুলি বিভিন্ন বাচ্যানুসারে বিভিন্ন বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া বিষয়-বাচক শব্দের বিশেষক হয়।, নিষ্পত্তি, ঔচিত্য প্রভৃতি অর্থে এই সমুদায় বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে, যথা ক্ত, তব্য, অনীয়, শতৃ ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ, বক্তব্যবাচক ক্রিয়া শব্দের বিশেষকসমূহ। ক্রিয়া শব্দের বচন, পুরুষ, কাল প্রভৃতি অনুসারে যে প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ক্রিয়ার বিশেষক গুলির সেই প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। ইহাদের পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে হইয়া থাকে।

ইহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত—বিশেষ্য, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয় ও বিশেষণ বিশেষ্য। শব্দগুলি দুই প্রকারে বক্তব্যবাচক ক্রিয়া শব্দের বিশেষক হইতে পারে। প্রথমতঃ, অন্যশব্দের সহিত যুক্ত ও সমাসপ্রাপ্ত হইয়া; দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া। কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কারকে এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যোগে বিশেষ্য শব্দসমূহ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া বক্তব্যের বিশেষক হয়।

সর্ব্বনাম শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থপ্রকাশ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়ার বিশেষক হয়। ইহার ফলে প্রত্যেক সর্ব্বনাম শব্দ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী এবং সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নসমূহযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

তিন বচন এবং পাঁচ বিভক্তির ফলে প্রত্যেক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দ বক্তব্য-বাচক শব্দের বিভিন্ন বিশেষক হইবার জন্য পঞ্চদশ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

অনন্যাপ্ত ক্রিয়াগুলি বক্তব্যবাচক শব্দের বিশেষক হয়। ইহাদের অঙ্গে চিহ্ন যুক্ত থাকে, অন্ত কোনরূপ আকৃতি-পরিবর্ত্তন হয় না। অব্যয় শব্দগুলিরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

কতকগুলি শব্দের সঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনের চিহ্ন সংযুক্ত থাকিলে তাহারা বক্তব্যবাচক শব্দের বিশেষক হইতে পারে।

উপরে যে সমুদায় বিভক্তি ও শব্দের রূপ পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের বিচিত্র সমাবেশেই সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক বাক্যসমূহ রচিত হয়। এতদ্ব্যতীত শব্দের রূপ পরিবর্ত্তনের অপর কতকগুলি কারণ আছে। ইহাদের ফলে বাক্যের ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, উচ্চারণ ও ধ্বনির পরিবর্ত্তনমাত্র ঘটে। এই পরিবর্ত্তনসমূহ যে নিয়মে সাধিত হয়, তাহাকে সন্ধি বলে। শব্দের সহিত শব্দের ধ্বনিঘটিত যোগ হইলেই ধ্বনি-সন্ধি হইয়া যায়, এবং দুই বা ততোধিক শব্দ মিলিয়া এক অখণ্ড শব্দের সৃষ্টি করে। প্রথম শব্দের অন্ত্যবর্ণ ও দ্বিতীয় শব্দের আদিবর্ণের বৈচিত্র্য অনুসারে সন্ধি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; স্বর সন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধি। ধ্বনির পরস্পর আকর্ষণী শক্তিই ইহার কারণ বলিয়া বাক্যের মধ্যে যে যে স্থলে ধ্বনিদ্বয়ের সামীপ্য ঘটে, সেই সেই স্থানেই সন্ধির সৃষ্টি হয়; এবং যে যে স্থলে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য দুই বা ততোধিক শব্দের সমাস রচনা করা প্রয়োজন হয়, সেই সেই স্থলে ও ধ্বনি-সামীপ্য ঘটিলে সন্ধির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সন্ধিসমূহের দ্বারা কি শব্দগত, কি বাক্যগত কোন রূপই অর্থবৈষম্য ঘটে না বটে, কিন্তু ইহাতে ভাষার বৈচিত্র্য হয়, এবং বাক্যের রূপ যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়। এজন্য অন্যান্য পরিবর্ত্তনসমূহের আলোচনার সঙ্গে ইহাদের ও আলোচনা প্রাসঙ্গিক। সন্ধিসমূহ সংস্কৃত ভাষার বিশেষত্ব সৃষ্টির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

উপরে যে তিন শ্রেণীর ভাষার উল্লেখ করা হইয়াছে ইংরাজী ভাষা সম্পূর্ণ ভাবে তাহার কোন একটিরও অন্তর্গত নহে। ইংরাজী ভাষায় বাক্যে পদ-সমূহের সম্বন্ধ প্রধানতঃ তাহাদের উচ্চারণ-ক্রম ও সন্নিবেশ-স্থানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। শব্দসমূহ অপরিবর্ত্তিত থাকে, একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব-প্রকাশে সহায়তা করে। ইহার ফলে ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা ব্যাকরণঘটিত ভ্রমের সংখ্যা অল্প; কিন্তু বাক্য-গুলি বৃহৎ হইলে জটিল ও অপ্রাঞ্জল হয় এবং অর্থ-প্রকাশে বিঘ্ন উৎপাদন

করে; কারণ, ইহাতে পদের সহিত পদের সম্বন্ধ-নির্ণয় কঠিন হইয়া পড়ে, এবং বক্তা বিষয়ের গুরুত্বানুসারে স্বাধীন ভাবে শব্দ গুলির সমাবেশ করিতে পারেন না; কারণ কোন শব্দের স্থান পরিবর্ত্তিত হইলেই বাক্যটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী ভাষায় বক্তব্যবাচক এবং বিষয়বাচক শব্দের সম্বন্ধ কতকগুলি সংযোজনীর দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

তৃতীয়তঃ কোন কোন স্থলে শব্দগুলি বিভক্তির চিহ্ন ধারণ করিয়া রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই বিভক্তির সংখ্যা অতি অল্প ও নগণ্য, ভাষার প্রধান অবলম্বন নহে। সংস্কৃত ভাষার প্রত্যেক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য যত বিচিত্র রূপ ধারণ করে, ইংরাজী ভাষায় তত বিভক্তির প্রয়োগ নাই।

প্রথমতঃ, বিষয়বাচক শব্দসমূহ। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ইংরাজী ভাষায়ও এই শব্দগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ইংরাজীতে শব্দগত ব্যাকরণ ঘটিত লিঙ্গ প্রথা নাই; ইহাতে প্রকৃতি-গত লিঙ্গ পদ্ধতিই প্রচলিত। সুতরাং প্রত্যেক শব্দেরই এক একটি লিঙ্গ নাই। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক লিঙ্গ অনুসারে শব্দের লিঙ্গ হয়। সুতরাং লিঙ্গ-নির্ণয় শব্দের মূল্য-নির্দ্ধারণের প্রধান উপায় নহে। ইংরাজীতে লিঙ্গের প্রাধান্য নাই। যে কয়েকটি শব্দের লিঙ্গ পরিবর্ত্তনের ফলে রূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে, তাহাদের অতি অল্প সংখ্যক পরিবর্ত্তনই বিভক্তি-যোগের দ্বারা সাধিত হয়। প্রত্যেক শব্দের লিঙ্গ নাই বটে, কিন্তু অধিকাংশ শব্দেরই বচন আছে; এবং রূপ-পরিবর্ত্তন বিভক্তি যোগের দ্বারা সংঘটিত হয়। ইংরাজীতে দুইটিমাত্র বচন। ইহার ফলে বিষয়বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দগুলি সংখ্যানুসারে দুই প্রকার চিহ্ন ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত সম্বোধন করিয়া কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে হইলেও সংখ্যানুসারে শব্দের দুই প্রকার আকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বক্তব্যবাচক শব্দসমূহ। ইহারাও সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ক্রিয়া জাতীয়। সংস্কৃতের ন্যায় ইংরাজীতেও ক্রিয়ার তিন পুরুষ আছে বটে কিন্তু একজন্য শব্দের বিশেষ রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটে না, বিষয়বাচক শব্দের ন্যায় বক্তব্য-বাচক শব্দেরও সংখ্যানুসারে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন অতি সামান্য। ইহার দ্বারা বাক্যের এবং ভাষার বিশেষ কোন বৈচিত্র্য জন্মে না। সুতরাং বচন ও পুরুষের ফলে সংস্কৃত ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যেরূপ

ভিন্ন অর্থ হইয়া থাকে, ইংরাজী ভাষায় সেরূপ হয় না। একই রূপবিশিষ্ট বক্তব্য-বাচক শব্দের দ্বারা বিভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে; একই ক্রিয়া শব্দ বিষয় বাচক বিভিন্ন বিশেষ্য বা সর্ব্বনাম শব্দের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে।

কাল, বক্তার ইচ্ছা এবং বক্তা বিষয়ের সহিত বক্তব্যের সম্বন্ধ যে ভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন এই সমুদায় ব্যক্ত করিবার জন্য সংস্কৃতের ন্যায় ইংরাজীতেও কতকগুলি প্রণালী অবলম্বন করা হয় বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে সংঘটিত হয় না। অতি অল্পসংখ্যক বিভক্তির যোগে অথবা বানানের পরিবর্ত্তনের সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তৃতীয়তঃ, বিষয়-বাচক শব্দের বিশেষকসমূহ। যে সকল বস্তু বা ব্যক্তি-বাচক শব্দের বিশেষক স্বরূপ এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, তাহাদের লিঙ্গ বা বচন প্রভৃতির সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ, গুণ, রূপ, পরিমাণ, সংখ্যা প্রভৃতি বাচক শব্দ। ইহারা কোন বিষয়বাচক শব্দের অবলম্বন ব্যতীত স্বাধীন ভাবে ব্যবহৃত হয় না। ইহাদের কোন বচন নাই। তুলনা বুঝাইবার জন্য কোন কোন শব্দের সহিত বিভক্তি যোগ হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ্য বা সর্ব্বনাম শব্দও বিষয়বাচক বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের বিশেষক হইতে পারে। কোন কোন স্থলে বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দ ইহাদের বিধেয় বিশেষণ হয়; এতদ্ভিন্ন ইহাদের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ এই অর্থ বুঝাইবার জন্য সম্বন্ধ পদের বিভক্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধ বিভক্তি ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সংযোজনী ব্যবহার করিয়াই সাধিত হইতে পারে।

চতুর্থতঃ, বক্তব্যবাচক শব্দের বিশেষকসমূহ। এই শব্দগুলি সাধারণতঃ সংযোজন সাহায্যে অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া বাক্য সৃষ্টি করে। বিভক্তি-যোগের দ্বারা কেবলমাত্র দুই একটি সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার বিশেষত্বগুলি আলোচনার ফলে জানা যায় যে, দুই ভাষা দুই বিভিন্ন প্রণালীতে গঠিত। শব্দের আকৃতি-পরিবর্ত্তনই সংস্কৃতের প্রধান লক্ষণ। ইংরাজীতে এই পরিবর্ত্তন অতি সামান্য। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার বাক্য রচনা করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে হইলে শব্দের রূপ-পরিবর্ত্তনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইংরাজীতে বাক্য রচনা করিতে হইলে রূপ-পরিবর্ত্তনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে হয় না।

—— শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

গয়া।

যে স্থানে মধ্যভারতের মালভূমি বাঙ্গালা ও বিহারের গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমতল ভূখণ্ডে অবতরণ করিয়াছে তথায় যে অনুচ্চ পর্ব্বতমালার সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই কয়েকটি শৃঙ্গ গয়াতীর্থকে মনোরম করিয়াছে। ব্রহ্মযোনি, রামশীলা প্রভৃতি পাহাড়গুলির উপরে অনেকটা স্থান পরিষ্কৃত করিয়া প্রাঙ্গণের ন্যায় করা হইয়াছে; তাহারই মধ্যস্থলে দেবদেবীর মন্দির। পাহাড়ে উঠিবার জন্য সোপানশ্রেণী আছে; তাহার সাহার্য্যে দুর্ব্বল বৃদ্ধাগণও উপরে উঠেন।

আমরা সে দিন যখন ব্রহ্মযোনির উপর উঠিতে আরম্ভ করিলাম, তখন সন্ধ্যা হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। সোপানে না উঠিয়া পাহাড় যে স্থানে অত্যন্ত খাড়াই সেই দিক দিয়া উঠিতে আমাদের ইচ্ছা হইল। গয়াপ্রবাসী দুইজন শিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আমাদিগকে সে দিক দিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন—কেন না, তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা। তাঁহাদের নিষেধ সত্ত্বেও যখন আমরা উঠিতে লাগিলাম, তখন আমাদিগের কি হয়, দেখিবার জন্য তাঁহারা বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে পর্ব্বতপার্শ্বস্থলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমরা নিরাপদে উপরে উঠিলে তাঁহারা হয় ত আমাদিগকে কোন পার্ব্বত্যজাতীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

পর্ব্বতের উপর হইতে অতি সুন্দর দৃশ্য নয়ন-গোচর হইল। নিকটস্থ উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র, অনতিদূরস্থ বালুকাময় ফল্গুতীরবর্ত্তী পাষাণময়ী গয়ানগরী এবং দূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা এক মনোমুগ্ধকর চিত্রের সৃষ্টি করিল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া পাহাড়ের উপর হইতে তীর্থযাত্রিগণ এবং পূজারী ব্রাহ্মণ সকলেই নামিয়া গেলেন। সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে, নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরে আমরা কয়টিমাত্র মানব রহিলাম।

সে সময় আমাদের মনে যে অপরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা উপভোগের বিষয়, বর্ণনার নহে। মনে হইতে লাগিল, এইরূপ একটি স্থানে বুদ্ধদেব কতবৎসর যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন—যোগের উপযুক্ত স্থান বটে। মন স্বভাবতঃই জগৎ হইতে জগৎকারণের দিকে আকৃষ্ট হয়। সে দিন গোস্বামীকৃত দশাবতারস্তোত্র এবং শঙ্করবিরচিত শিবস্তোত্র যেরূপ মধুর শুনাইয়াছিল সেরূপ আর কখনও শুনি নাই। মন হইতে স্বতঃই বাহির হইতেছিল—

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যং।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং
তমীশং ভজে লীয়তে যত্রবিশ্বং॥
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাবকং ভাবকানাং
তুরিয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনম্
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্॥

গয়া হইতে একটি সুন্দর রাস্তা দিয়া সাত মাইল দূরে বুদ্ধগয়ার মন্দির দেখিতে যাইলাম। উত্তর ভারতে ইহার তুল্য প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তি আর কিছুই নাই—বহুকাল ভগ্ন ও মৃত্তিকা-প্রোথিত থাকায় ইহা ধ্বংসের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছে।

যাঁহারা দুই একটি শ্লোক বা স্থানীয় প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া হিন্দুকর্ত্তৃক বৌদ্ধগণের নির্য্যাতনের কাহিনী প্রচার করিয়া বেড়ান, তাঁহারা একবার বুদ্ধগয়ায় আসিয়া দেখিয়া যাউন, প্রকৃত পক্ষে কি উপায়ে উদার হিন্দুধর্ম্ম আপনার বিস্তৃত ক্রোড়ে বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছে। এইস্থানে বুদ্ধদেব নারায়ণের অবতাররূপে পূজিত হইতেছেন—পিতৃশ্রাদ্ধকারী হিন্দু তীর্থযাত্রী বোধীদ্রুমের * তলদেশে ভক্তিভরে পিণ্ডদান করিতেছে। হিন্দুর জাতীয় ইতিহাস অন্য যত কলঙ্কেই কলঙ্কিত হউক না কেন, ইহাতে একটা বড় গৌরবের কথা আছে; পৃথিবীর আর কোনও জাতি হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা দেখাইতে পারে নাই। অন্য জাতির ইতিহাসের ন্যায় এই ইতিহাস ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় বিবাদজনিত রক্তস্রোতে রঞ্জিত নহে। †

* ইহা একটি অনতিবৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ।

† কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায় বৌদ্ধ নির্য্যাতনের কাহিনী মিষ্টার কোলব্রুক বিশ্বাস করায় কয়েকজন ঐতিহাসিক তাহার উপর রঙ ফলাইয়াছেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ রিজ ডেভিডস্ ও বুলার ইহা আদৌ বিশ্বাস করেন না। নিম্নে তাঁহাদের মত উদ্ধৃত হইল—

ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শেষ অবস্থায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মপ্রচারক কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে ভীষণ বৌদ্ধ নির্য্যাতন হইয়াছিল, তাহাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। বিখ্যাত য়ুরোপীয় মনীষী উইলসন ও কোলব্রুক উল্লিখিত মতের পক্ষপাতী হওয়ায় অনেকেই এই মতের

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় সম্প্রতি এই মন্দিরটি লইয়া বুদ্ধ গয়ার হিন্দু মোহন্ত ও সিংহলবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে—অনেক মামলামোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। মন্দিরটি বহুকাল হইতে মোহন্তের অধিকারে আছে—সিংহলীয়গণ এক্ষণে উহা বৌদ্ধগণের তত্ত্বাবধানে রাখিতে চাহেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, তাঁহারা সফলকাম হয়েন নাই। মন্দির-পার্শ্বে একটি আশ্রমে কয়েকজন ভিক্ষু বাস করিতেছেন—তথায় জাপান হইতে আনীত একটি সুন্দর বুদ্ধ মূর্ত্তি সুরক্ষিত আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন জাপানী ভিক্ষু বুদ্ধদেবের সেবায় কালযাপন করিতেন—কিছুদিন হইল তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। সিংহলীয়গণ কাশীর সমীপবর্ত্তী সারনাথেও একটি আশ্রম করিয়াছেন। তথায় ইহাঁদের প্রধান ব্যক্তি ধর্ম্মপালের পরিবার-বর্গের চিত্র দেখিয়া আমি বলিলাম "ইহাঁরা ঠিক বাঙ্গালীর মত দেখিতে।" নিকটস্থ ভিক্ষু উত্তর করিলেন—"And we are Bengalees, Babu"—"বাবু, আমরা ত বাস্তবিকই বাঙ্গালী।" তাঁহার মুখ হইতে বিজয় সিংহের সিংহল জয়ের কথা শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না।

আমরা মোহন্তের প্রাসাদে আতিথ্য লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার অট্টালিকার বহির্দ্দেশে বিশিষ্ট অতিথিগণের বাসের জন্য একটি 'বারদোয়ারী' গৃহ (Guest house) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। রেভারেণ্ড মিষ্টার উইল্কিন্‌স্ লিখিয়াছেন—বৌদ্ধমতাবলম্বিগণকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে নির্য্যাতন করা হইয়াছিল যে, প্রায় সকলেকেই হয় নিহত, নহে ত নির্ব্বাসিত নতুবা স্বধর্ম্মত্যাগী হইতে হইয়াছিল। বৌদ্ধগণকে যেরূপ ভাবে নিপীড়িত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করা হইয়াছিল, এরূপ নির্য্যাতনের বিবরণ জগতের ইতিবৃত্তে কদাচিৎ দৃষ্ট হয় না।

আমি কিন্তু উপরোক্ত বৃত্তান্তের এক বর্ণও বিশ্বাস করি না। পালী টেক্‌ষ্ট সোসাইটীর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের বিবরণীতে আমি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিয়াছি ; এবং স্বর্গীয় অধ্যাপক বুলারের ন্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তিমূলক ধারণা অনিশ্চিত, বৃথাগর্ব্বপূর্ণ, অনির্দ্দিষ্টভাবশালী ও অপ্রামাণিক উক্তিসমূহ হইতে গৃহীত একটি ভ্রান্ত মত হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধেয়। আমার মতে নিম্নলিখিত কারণেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে (১) বৌদ্ধধর্ম্মে যে সকল পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। (২) জন সাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। (Rhys Davids—Buddhist India)

বাসগোয়ারীটি ইংরাজী ধরণে সুসজ্জিত—সময় সময় য়ুরোপীয়গণও এই গৃহে বাস করেন।

মোহন্তের প্রাসাদ চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত—মধ্যে হিন্দুস্থানী ধরণের চৌতলা পাতরের প্রকাণ্ড বাড়ী। উঠানের এক পার্শ্বে হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, বলদ ও অনেক গাভী রহিয়াছে। বাড়ীর নিকটেই তাঁহার খাস জমীতে চাষ হইতেছে। বাড়ীর ভিতরে নিম্নতলে বহুসংখ্যক লোক জমিদারীর হিসাবপত্র করিতেছে। চৌতলায় মোহন্ত মহারাজ বাস করেন।

মোহন্তের অধীনে কয়েক শত সন্ন্যাসী আছেন—তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি তাঁহার গুরুভাই (অর্থাৎ তাঁহার গুরুর শিষ্য) কতকগুলি তাঁহার চেলা বা শিষ্য। এই সন্ন্যাসিগণের মধ্যে সকল প্রকৃতির লোকই আছেন, এবং তাঁহারা সকল রকম কাযই করিতেছেন। কোন গেরুয়াধারী দ্বারবানের কায করিতেছেন, কোন গেরুয়াধারী জমীতে জল সেচন করিতেছেন, কেহ জমীদারীর হিসাব রাখিতেছেন, কেহ নায়েব, কেহ গোমস্তা কেহ পাইকের কার্য্য করিতেছেন। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য।

অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন যোগ্য সন্ন্যাসীও আছেন—তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করেন। এইরূপ একজন সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের আলাপ হয়—তিনি বলিলেন, তিনি উৎকলবাসী, এক্ষণে 'বিদ্যার্থী' (ছাত্র) ভাবে অবস্থান করিতেছেন—একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসীর নিকট শাস্ত্রাভ্যাস করেন। তিনি এমন সুন্দর হিন্দী বলেন যে, তাঁহাকে হিন্দুস্থানী বলিয়াই মনে হয়।

মোহন্ত মহারাজের দরবারে সন্ন্যাস ও জমীদারীর অদ্ভুত সমাবেশ, দেখিতেই এক রকম! মহারাজের গৈরিক বাস ও দীর্ঘ কেশের সহিত গদী, তাকিয়া আলবোলা ও ইজিচেয়ার কেমন খাপ খাইয়াছিল তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তিনি বুদ্ধিমান ও ভদ্র—অন্ততঃ আমাদের যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য শুধু মোহন্তগিরী ও জমিদারী করিয়াই ক্ষান্ত নহেন; ঔষধবিক্রেতার ব্যবসায়ও অবলম্বন করিয়াছেন। এদিকে তাঁহার কিছু কিছু সৎকার্য্যও আছে, তিনি একটি ধর্ম্মশালা ও একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপিত করিয়াছেন।

দরবারে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন স্থানীয় কৃষক আসিয়া একটি টাকা প্রণামী দিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুরঃসর তাহার মোহন্ত জমীদারের

নিকট একটি অভিযোগ জ্ঞাপন করিল। প্রণামী না দিলে কে তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে?

মহারাজের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিবার চেষ্টা করিলাম; সুবিধা হইল না,—তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার বিষয়বুদ্ধির তুল্য নহে। যে সকল যুরোপীয় আমাদিগের দেশে হিন্দু ধর্ম্মের বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তিনি দেখিলাম তাঁহাদের বড় একটা পছন্দ করেন না।

এখন কথা হইতেছে, ভারতের নানা স্থানে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হস্তে যে অগাধ ধনরত্ন রহিয়াছে, তাহা কি দেশের প্রকৃত কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারা যায় না? বিষয়টি যেরূপ প্রয়োজনীয়, সাময়িক পত্রাদিতে তাহার উপযুক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় না। এ বিষয়ে গভর্মেণ্ট আমাদের বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন না—কেন না, তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক। আইন করিয়া যে কিছু হইবে না তাহা স্বনামধন্য আনন্দ চার্লু মহোদয়ের অকৃতকার্য্যতাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তবে, বোধ হয়, যদি দেশের লোকের মনের ভাব কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহারা যদি এই সকল দেবোত্তর সম্পত্তি সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে এবং তাহা সাধারণের হিতার্থ ব্যয়িত হইতে দেখিতে চাহে তাহা হইলে অনেক সুফল আশা করা যায়। এতদর্থে, বাঙ্গালা হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি সাপ্তাহিকগুলিতে রীতিমত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সন্ন্যাসিগণও সংবাদপত্র পড়িয়া থাকেন; তাঁহাদিগকে অর্থের সদ্ব্যবহারের উপায় ও আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলে নিশ্চয়ই উপকার দর্শে। ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিতরণ ও বক্তৃতাদিদ্বারাও এতদ্বিষয়ক আন্দোলনের সহায়তা হইতে পারে।

একটি যুবক মুটিয়া আমাদের মোট লইয়া গয়া হইতে বুদ্ধগয়ায় যাতায়াত করিয়াছিল। লোকটি কষ্টসহিষ্ণু, স্বল্পে সন্তুষ্ট ও সদাই প্রফুল্ল। তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া আসিবার সময় আমার বন্ধু তাহাকে একখানি ভাল কাপড় বখ্‌শিস করিলেন। এ পর্য্যন্ত আমরা তাহাকে যাহা দিয়াছি, সে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছে, কখনও আমাদের কাছে কিছু চাহে নাই। এবার কিন্তু তাহার মনে অসন্তোষের আবির্ভাব হইল। এতদিন তাহার কোনও অভাব উপলব্ধি হয় নাই, কিন্তু এই ভাল কাপড়খানি পাইয়া সে দেখিল, একখানি ভাল চাদর ভিন্ন উহা ব্যবহার করা চলে না। কাযেই সে একখানি চাদরের জন্য প্রার্থনা করিল। বাস্তবিক, একজন দরিদ্র লোককে একটা

মূল্যবান্ দ্রব্য ব্যবহার করিতে দিলে তাহাকে বিপন্ন করা হয়। তাহার-উপযুক্ত চাল সে কেমন করিয়া বজায় রাখিবে। একজন দরিদ্রকে যদি একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি তাহাকে সামান্য বিপদগ্রস্ত করা হয়? সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভাব বহু প্রকারে ও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অনন্ত সত্য।

প্রভাত গগনে হেরি' তরুণ তপন
কি মধু সঙ্গীতে পাখী ঢালে মধু স্বর?
চন্দ্রের মুরতি হৃদে করিয়া ধারণ
কি মহা গম্ভীর গীতে উছলে সাগর?
প্রেম বিশ্বজয়ী—প্রেম অজর-অমর।

দীপ্ত সূর্য্যপানে চাহি' মধ্যাহ্ন সময়
সূর্য্যমুখী কোন্ কথা কহে নিরন্তর?
বিকশিত উপবনে প্রফুল্ল-হৃদয়
ফুলে ফুলে কোন্ কথা গুঞ্জরে ভ্রমর?
জীবনে মরণে প্রেম পবিত্র-সুন্দর।

চন্দ্রের হৃদয়-জ্যোতিঃ হৃদয়ে মাখিয়া
কি অনন্ত সত্য কহে অসীম অম্বর?
উজল দামিনীদীপ্তি হৃদয়ে আঁকিয়া
কি কথা গম্ভীর মন্দ্রে কহে জলধর?
প্রেম শুধু কালজয়ী—জগৎ নশ্বর।

সুদীর্ঘ বিরহ'পরে ঈপ্সিত মিলনে
কি সত্য আপনি বুঝে বিহ্বল অন্তর?
আকুলপ্রণয়দীপ্ত তৃষিত চুম্বনে
কি নীরব কথা কহে প্রিয়ার অধর
কঠোর ধরায় প্রেম অমৃত-নির্ঝর।

সমালোচনা।



শঙ্খ।

অ্যাণ্ড্রু ল্যাং এক স্থানে বলিয়াছেন, বর্ত্তমানকালে অসার ও বিশেষত্ব-বিহীন পদ্য-লেখকের সংখ্যা এত অধিক যে, কবির পক্ষে যশ অর্জ্জন করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের মত বাঙ্গালায়ও পদ্য-লেখকদিগের অত্যাচারে পাঠক সম্প্রদায় সন্ত্রস্ত—সমালোচকগণ ভীত। আজকাল প্রতিদিন যে রাশি রাশি কবিতা প্রকাশিত হয় তাহার অধিকাংশই মৌলিকতালেশবর্জ্জিত—প্রতিভাদীপ্তিহীন। এই সকল লেখকের রচনা গলিতআবর্জ্জনাস্তূপমধ্যবাহী আবিল জলপ্রবাহের সহিত তুলনীয়। এই অবস্থায় যদি গ্রীকবর্ণিত সুবর্ণসিকতাসজ্জিত শৈকতমধ্যবাহী স্ফটিকবারি প্যাকটোলাসের সন্ধান পাওয়া যায় তবে যেমন আনন্দ হয়, আজ বহুদিন পরে বড়াল কবির নূতন পুস্তক লইয়া আমাদের তেমনই আনন্দ হইয়াছে। 'ভুলে'র কবি বঙ্গ-ভারতীর বেদীর উপর যে 'প্রদীপ' জ্বালিয়াছেন—তাহার স্নিগ্ধ আলোকে দেউল আলোকিত; তিনি যে 'কনকাঞ্জলি' দিয়া দেবীর পূজা করিয়াছেন তাহার সৌন্দর্য্য বিস্ময়কর। আজ তিনি 'শঙ্খ' লইয়া ভারতীর দেউলদ্বারে উপস্থিত।

শঙ্খ বঙ্গবাসীর নিকট সমাদৃত। শঙ্খ হিন্দুর মঙ্গল কার্য্যে মাঙ্গল্য-বাদ্যযন্ত্র। শঙ্খ রমণীর সৌভাগ্যসূচক অলঙ্কার। শঙ্খ বীরের প্রিয়। ধর্ম্মক্ষেত্রে যে যুদ্ধে অমঙ্গল-বিনাশে স্বয়ং ভগবান সারথ্য করিয়াছিলেন সে যুদ্ধের বর্ণনায় দেখিতে পাই :—

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥

* শঙ্খ—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। কলিকাতা, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত। মূল্য ৮৹ আনা।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥

সর্ব্বোপরি শঙ্খ হিন্দুর পুণ্যকার্য্যে সহচর। কবি বলিয়াছেন ;—

"হে রমণী, লও—তুলে লও;
তোমাদের মঙ্গল-উৎসবে—
একবার ওই গীতি গানে
বেজে উঠি সুমঙ্গল রবে!

"হে রথী, হে মহারথী, লও,
একবার ফুৎকার' সরোষে—
বলদৃপ্ত, পরস্ব-লোলুপ
মরে' যাক্ এ বজ্রনির্ঘোষে!

"হে যোগী, হে ঋষি, হে পূজক,
তোমরা ফুৎকার' একবার—
আহুতি-প্রণতি-স্তুতি আগে
আনি বহে' আশীর্ব্বাদ-ভার!"

অক্ষয় বাবুর শব্দ-সম্পদ ও ছন্দ-সম্পদ যথেষ্ট। কিন্তু সে দুই সম্পদ পদ্যলেখকমাত্রেরই থাকিতে পারে। 'শঙ্খের' কবির গৌরব—ভাবে—ভাবের গাঢ়তায়—গভীরতায়—উদারতায়। লঘুতা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। 'কনকাঞ্জলি'তে তিনি তাঁহার গুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন ;—

বুঝিয়াছি, গুরো, কত তুচ্ছ যশ,
কিরূপা কবিতা—কত সুধা রস,
প্রেম কত ত্যাগী—কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী!
পূত মত্ততায় মুগ্ধ দিকদশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী।"

'শঙ্খে' তিনি কবির কথায় বলিয়াছেন ;—

"আমরা জীবন গড়ি
মরণে মধুর করি,
নিরাশায় নব আশা ;
শিশুরে হৃদয়ে টানি,
রমণীরে দেবী মানি,
যুবজনে ভালবাসা।

পীড়িতের লাগি যুঝি,
পতিতের ব্যথা বুঝি,
সচেতন রাখি দেশ ;
আমরা দেশের প্রাণ,
প্রীতি, স্মৃতি, ধ্যান, জ্ঞান ;
আমরা আদি ও শেষ।

এক টেনিসন ব্যতীত আর কোন্ কবি কবির কার্য্যের এমন বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন ?

বলিয়াছি, লঘুতা বড়াল কবির প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাই তিনি প্রেমের চটুল চাকচিক্য পরিহার করিয়া তাহার বিশাল ব্যাপকতা—দেব-ভাবে তন্ময়। থিয়ক্রিটসের মত তিনি যুবজনের চিত্তবিনোদনে চেষ্টিত নহেন। তাঁহার নিকট "নারী কত গরীয়সী।"—"সন্ধ্যায়" এই ভাব সপ্রকাশ—

"এস প্রিয়া—প্রাণাধিকা,
জীবন-হোমাগ্নি-শিখা !
দিবসের পাপ-তাপ হোক হতমান !
ওই প্রেমে—প্রেমানন্দে,
ওই স্পর্শে, বাহুবন্ধে,
আবার জাগুক মনে—আমি যে মহান্,
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্য-প্রধান !"

এই ভাবগভীরতায় ও ভাবগাম্ভীর্য্যেই বড়াল কবির গৌরব। তাই যে স্থানেই তিনি লঘু ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন সেই স্থানেই তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন ; ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার দৈন্য ও ছন্দের বিকৃতি সুস্পষ্ট হইয়াছে। সুখের বিষয় তাঁহার রচনায় এরূপ চেষ্টার দৃষ্টান্ত বিরল।

অক্ষয় বাবুর বর্ণনা শক্তি অসাধারণ। সন্ধ্যার—

"গলে নীহারিকা-মালা,
করে সপ্ত ঋষি-বালা,
রাশিচক্র মেখলার কি ক্রীড়া মঙ্গল !

জলদ চরণ-তলে
কাঁদিছে মঞ্জীর ছলে ;
বনানী-বসনপ্রান্তে—চিত্র ঝল্‌মল্‌ !"

তিনি বাঙ্গালী কবি—

"সারাটা দুপুর কাটিয়া কাটে না,
বসিয়া বসিয়া নদীর তীরে—
উড়ে' যায় চিল, ভেসে যায় মেঘ,
ডিঙ্গি বেয়ে' গেয়ে' জেলেরা ফিরে।"

এরূপ বর্ণনা তাঁহার রচনায় অনেক আছে। তাঁহার "বঙ্গভূমির" স্তুতিগীতি আমাদের সাহিত্যে অমূল্যরত্ন। তাঁহার সহিত আমরাও "ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী" জননীকে প্রণাম করিয়া বলি ;—

"এস—চণ্ডীদাসগীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি।
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী !"

বলি,—

"মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা দু'খানি !
ধান্যশীর্ষ স্বর্ণঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি !"

আর কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা না থাকিলেও কেবল এই কবিতার জন্য 'শঙ্খ' পাঠক সমাজে সমাদৃত হইত। কিন্তু ইহাতে উল্লেখযোগ্য কবিতার অভাব নাই ; পরন্তু প্রাচুর্য্যই দৃষ্ট হয়। এরূপ উপাদেয় কবিতাপুস্তক সচরাচর সমালোচকের হস্তগত হয় না।

কিন্তু দুইটি বিষয়ে আমরা গ্রন্থকারকে আমাদের আপত্তি জানাইব। প্রথম, তিনি যে ভাবে 'ভুলের' কবিতাগুলি তাঁহার অন্যান্য পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিতেছেন, তাহাতে আমাদের আশঙ্কা হয়, হয় ত তিনি 'ভুলকে' আর পাঠকসমাজে আনিবেন না। ইহাতে আমাদের আপত্তি আছে। কারণ, 'ভুলের' অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতায় প্রতিভার দীপ্তদামিনীস্ফুরণ আছে, সেগুলির বিলোপ বাঞ্ছনীয় নহে। দ্বিতীয়, তিনি 'প্রদীপ', ও 'কনকাঞ্জলিকে' যে সাজে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, 'শঙ্খকে'ও সেই সাজে সাজাইয়া আনিলে ভাল হইত।

সংগ্রহ।

সাহিত্য।

নাটকে নীতিশিক্ষা।

নাটক দুই প্রকারে লোকহৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। নাটক পঠিত এবং অভিনীত হয়;—পাঠক ও দর্শক দুই দল নাটকের শিক্ষা লাভ করেন। সকল দেশেই এক সময় নাটক দেশের লোকের চিত্তরঞ্জন ও শিক্ষাবিধানে বিশেষ কার্য্য করিয়াছে। গ্রীসে, ভারতে ইংলণ্ডে সর্ব্বত্র এক সময় নাটকের অত্যন্ত আদর ছিল। নাটকও বহুবিধ; পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ইত্যাদি। ঐতিহাসিক নাটক ছাঁকা ইতিহাস না হউক, তাহাতে ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রিত ও ঐতিহাসিক ঘটনা অঙ্কিত হয়। পৌরাণিক নাটক, যথা য়ুরোপে 'প্যাসান প্লে', এখনও সমাদৃত। বাঙ্গালায়ও ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ব্বে পৌরাণিক নাটকই আসর রাখিয়াছিল। 'সীতার বনবাস,' 'নন্দবিদায়' প্রভৃতির প্রতিপত্তির কথা অনেকেই অবগত আছেন। বর্ত্তমান কালে য়ুরোপীয় নাটকে দুর্নীতির দুর্গন্ধ পাইয়া সমালোচকগণ বিরক্ত হইয়াছেন। সংপ্রতি 'আমেরিকান ম্যাগাজিনে' মিষ্টার ওয়াণ্টার প্রিচার্ড ইটন এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

দুর্নীতি।

ইবসেন হইতে বহু নগণ্য নাট্যকার নাটকে পাপের চিত্র চিত্রিত করিয়া সমালোচক-সমাজে নিন্দিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বহু সুনীতিপূর্ণ বলিয়া প্রখ্যাত নাটকেও দুর্নীতির দুর্গন্ধ দুর্ল্লভ নহে! পাঠক-সমাজ অনেক সময় দুর্নীতিদুষ্ট পূতিগন্ধময় নাটককে সুনীতিপূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করে। পাঠকগণ বুঝেন না, এই সকল উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ অস্বাভাবিক।

অস্বাভাবিকতা।

একখানি পুস্তকে দেখা যায়, একজন অনায়াসে পাপীকে পুণ্যবান করিতেছেন। রঙ্গমঞ্চে ইঁহাকে দেখিয়া দর্শকদল শ্রদ্ধায় ও আনন্দে আত্মহারা হয়েন। অথচ প্রকৃত পক্ষে পাপী বহুকষ্টে আপনার পাপকে জয় না করিয়া পুন্যপথের পথিক হয় না। লোককে পুণ্যপথের পথিক করা যদি এমন সহজ হইত তবে ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের কার্য্য সহজ হইত—জগৎ তাঁহাদিকে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিত না। এরূপ চিত্র ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের অপমান।

মাতৃচরিত্র।

একখানি নাটকে মাতৃচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সন্তানগণ মিথ্যাকথা বলে, জাল করে, জননীর অপমান করে। জননী সকল দোষ আত্মকৃত বলিয়া সন্তানদিগকে রক্ষা করেন! এই চরিত্রের অভিনয় দেখিয়া দর্শকদল মুগ্ধ হয়েন—রমণীরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না! মাতৃস্নেহ অতি প্রবল—পবিত্র বৃত্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু যে জননী এরূপ করিতে পারেন তিনি যে মাতৃ-কর্ত্তব্য পালনের অনুপযুক্তা তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়?

জীবন সংগ্রাম; জীবনে মানুষকে পাপকে পরাজিত করিয়া পুণ্যপথের পথিক হইতে হয়—অমঙ্গলকে পরাজিত ও পদদলিত করিয়া মঙ্গলকে অবলম্বন করিতে হয়। এই সংগ্রামেই মানুষের মনুষ্যত্ব। সেই সংগ্রামকে বর্জ্জিত করিয়া মানবের উত্থানের ও উন্নতির অস্বাভাবিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া মানব-সমাজের কোন উপকার সাধিত হইতে পারে না।

মিষ্টার ইটন য়ুরোপে নাটকে যে অস্বাভাবিকতার প্রাবল্যের ও আদরের কথা বলিয়াছেন অন্য দেশেও তাহা বিরল নহে। আমাদের দেশের পুরাণ সাহিত্য অন্য সকল দেশের পুরাণ সাহিত্য অপেক্ষা বিপুল। এই সাহিত্যে পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় বহুস্থানে ঈশ্বরানুগ্রহে অমানুষী উপায়ে সম্পন্ন হইবার কথাই দেখা যায়। আর আমাদের নাটককারগণও সেইরূপ চিত্র বর্ণবৈচিত্রে সুন্দর করিয়া তুলিতে প্রয়াসী। অন্য দেশে সাধুসন্ন্যাসী সম্প্রদায় জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য—এদেশে তাহাদের সংখ্যাধিক্য বিস্ময়কর; এদেশে তাহারা একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী সম্প্রদায়। কিম্বদন্তীবলে তাহারাও বহুবিধ অলৌকিক কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ অবস্থায় নাটককারের পক্ষে সরল ও বিশ্বাসী পাঠক ও দর্শকদিগের জন্য অলৌকিক চিত্র চিত্রিত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করা সর্ব্বত্র সহজ নহে। কিন্তু যে নাটককার সে প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব জীবনের চিত্র চিত্রিত করিয়া মানুষকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী করিতে পারিবেন, তিনিই মানব-সমাজের প্রকৃত উপকার করিবেন।

বিজ্ঞান।

হিন্দু রসায়ন।

ইদানীন্তন অনেক ইংরাজী শিক্ষিত ও শিক্ষিত-ভাবাপন্ন ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, প্রাচীন ভারতে জড় বিজ্ঞানের চর্চ্চা আদৌ হইত না,—প্রাচীন মনীষিগণের বুদ্ধি কেবল "তৈলাধার পাত্র" কি "পাত্রাধার তৈল" প্রভৃতির বিচারেই ব্যাপৃত থাকিত। প্রাচীন ভারতে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আলোচনা অনন্যসাধারণ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু জড় বিজ্ঞানের আলোচনা ও উন্নতি যে হয় নাই, এরূপ অনুমান করিবার কোনও কারণ নাই। বর্ত্তমান যুগের সতর্কতাপূর্ণ অনুসন্ধানের আলোক-সম্পাতে বিস্মৃতির তমোময় বিবরস্থ অনেক লুপ্ত তথ্যের ক্ষীণ রশ্মি ইদানীং লোকলোচনে প্রতিভাত হইতেছে। সম্প্রতি ভারতের সুসন্তান অসামান্য প্রতিভাশালী মনস্বী ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অক্লান্ত অনুসন্ধানের ও অদম্য উৎসাহের ফলে, প্রাচীন ভারতে রসায়ন-শাস্ত্রের উন্নতিসম্পর্কে কতকগুলি তথ্য আবিষ্কৃত ও শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। সম্প্রতি 'ডন' পত্রে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছে।

ইতিহাসে যুগান্তর।

প্রাচীন ভারতে রসায়ন বিদ্যা (Chemistry) যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা ডাক্তার পি, সি, রায় মহাশয় তাঁহার History of Hindu Chemistry নামক গ্রন্থে অবিসংবাদিতরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার এই অমূল্য গ্রন্থ দুই খণ্ডে বিভক্ত। হিন্দুগণ রসায়ন বিদ্যার আলোচনা করিতেন এবং সেই আলোচনার ফলে তাঁহারা ঐ বিদ্যায় অসাধারণ উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন,—প্রফুল্ল বাবু তদীয় গ্রন্থে এই সত্য বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাহার ফলে প্রতীচ্য খণ্ডে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তথাকার মনীষিগণ ভারতকে এতদিন যে দৃষ্টিতে দেখিতেন,—এখন আর সে দৃষ্টিতে দেখিতেছেন না। জর্ম্মানীর বিখ্যাত রসায়নবিদ্যাবিশারদ হার্ম্মাণ সিলুজ (Hermann Schelcuz) প্রফুল্ল বাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। জীবিত রসায়নবেত্তৃগণের মধ্যে ইঁহার মতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া পরিগৃহীত। ভৈষজ্য-রসায়ন সম্বন্ধে ইঁহার সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান কালে অভ্রান্ত বলিয়া সম্মানিত। এই সর্ব্বজন-সম্মানিত রসায়নবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত স্পষ্ট ভাষায় অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে 'রসরত্ন সমুচ্চয়' গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রতীচ্য রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণ উক্ত শাস্ত্রে যেরূপ উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের সমকালীন হিন্দু রসায়নবিদ্‌গণ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডাক্তার রায় মহাশয়ের গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলেই য়ুরোপে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর হইল তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ফলে য়ুরোপখণ্ডে রসায়ন-বিদ্যার ইতিহাস নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে।

স্বাধীন বিকাশ।

গ্রীকদিগের প্রভাবেই ভারতে অনেক বিদ্যার আলোচনা হইয়াছিল,—ইদানীং অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিত এই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ততা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ডাক্তার রায় মহাশয় অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগ ও যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হিন্দুর রসায়ন-বিদ্যা বৈদেশিক প্রভাবে প্রভাবিত হয় নাই। নাগার্জ্জুনপ্রমুখ প্রাচীন মনীষিগণের চেষ্টায় প্রাচীন ভারতে রসায়ন-বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল। নাগার্জ্জুন সম্রাট শালিবাহনের বন্ধু ছিলেন,—ইহা তাঁহার শিষ্য রত্নঘোষের উক্তি এবং প্রাচীন জনশ্রুতি দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। নাগার্জ্জুন বৌদ্ধদিগের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র আদৃত করিয়া যায়েন। ইহার পুর্ব্বে এই বিদ্যা কিছুদিন অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দু রসায়সনবিৎ গোবিন্দাচার্য্য তাঁহার প্রণীত'রসসার'নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি বৌদ্ধদিগের এবং তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। হিন্দুদিগের অনেকগুলি রসায়নতন্ত্র এখনও বিদ্যমান আছে। যথা,—রসেন্দ্রচূড়ামণি, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসরত্ন সমুচ্চয় এবং রসসার। ডাক্তার রায় বলেন বৌদ্ধগণ রসায়ন শাস্ত্রের প্রচুর উন্নতি করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে, হিন্দুদিগের তন্ত্রগ্রন্থ বৌদ্ধগণের রসায়নগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছে।

ডাক্তার রায় ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাসকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

ক্রমিক বিকাশ।

বৌদ্ধযুগ যে সময় আরদ্ধ হইয়াছে—তাহারও পূর্ব্বতন কাল হইতে ইনি হিন্দু রসায়নের ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু রসায়ন বিদ্যার আলোচনার পর্য্যায় পাওয়া যায়। প্রথম আয়ুর্ব্বেদিক কাল; বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্যান্ত ইহা প্রসৃত। দ্বিতীয় পরিবর্ত্তনের কাল; খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই কাল ব্যাপ্ত। তৃতীয় তান্ত্রিক কাল; খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি। চতুর্থ পর্য্যবসান কাল—ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সময়। ডাক্তার রায় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রচারিত করেন। তাহার পর তিনি ষোল খানি তন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার অনেকগুলি গ্রন্থই দাক্ষিণাত্যে নেপালের, বারানসীর ও কাশ্মীরের পুস্তকাগারে অনাদৃত অবস্থায় কীটদষ্ট হইতেছিল। নাগার্জ্জুনের রসরত্নাকর খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রণীত হয়। রসার্ণব তৃতীয় কালের গ্রন্থ। নেপালের দরবারে অনুসন্ধানের ফলে রসায়ন বিদ্যার একখানি অতি প্রাচীন শৈবতন্ত্র ও কুব্জিকা তন্ত্র নামে আর একখানি রসায়ন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত অক্ষরে লিখিত। দাক্ষিণাত্যের পুস্তকালয়ে অনুসন্ধানের ফলে অনেকগুলি বৌদ্ধ রসায়ন তন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিন্দুদিগের প্রাচীন রসায়ন বিদ্যা চরক সংহিতা, শুশ্রুত, বাগভটের অষ্টাঙ্গ-হৃদয়, বৃন্দ ও চক্রপানি দত্তের গ্রন্থে রক্ষিত হইয়াছে।

হিন্দু রসায়নই প্রাচীনতম।

ইহার পূর্ব্বে অধিকাংশ য়ুরোপীয় পণ্ডিতই মনে করিতেন যে, চরক ও শুশ্রুতে যে রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, হিন্দুগণ তাহা আরব ও মুরদিগের নিকট হইতে আনিয়া লইয়াছেন। ফরাসী রসায়নবিৎ বার্থালে'ও এই মতের পক্ষপাতী। ডাক্তার রায় ঐ মত বিশেষরূপে খণ্ডিত করিয়াছেন। শুশ্রুতসংহিতায় প্রদাহক ক্ষারের (Caustic alkali) উল্লেখ আছে। বার্থালে' প্রভৃতি মনীষিগণ তাহা দেখিয়া বলেন—চরকের কোনও কোনও অংশ অত্যন্ত আধুনিক; য়ুরোপীয়গণের সহিত হিন্দুদিগের পরিচয়ের পর উহা প্রণীত হইয়াছে। ডাক্তার রায় এই মত বিশেষরূপে খণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন বাগ্‌ভট ও চক্রপাণি উভয়েই তাঁহাদের গ্রন্থে শুশ্রুতোক্ত উক্ত ক্ষারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ ঐ উভয় গ্রন্থকারই খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। রাজা মিলিন্দার প্রশ্নাবলীতেও দুষ্টক্ষত ক্ষার প্রয়োগে দগ্ধ করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মিলিন্দা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এইরূপ নানা প্রমাণ-প্রয়োগে ডাক্তার রায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হিন্দুগণ মুরনিকট হইতে রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। আরব ও মুর জাতিই হিন্দুদিগের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়া প্রতীচ্যখণ্ডে ঐ বিদ্যার প্রচার করিয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের সময়ে Distillation, Sublimation প্রভৃতি করিবার পদ্ধতি পরিজ্ঞাত ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রে ও বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক রাসায়নিক তত্ত্ব

নিহিত আছে। কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ও প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়ন বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সপ্রমাণ করিয়াছেন। ডাক্তার রায় সেগুলিও তাঁহার গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের আশা।

ডাক্তার রায় মহাশয়ের অনুসন্ধান ফলে পাশ্চাত্যখণ্ডে প্রাচীন হিন্দুদিগের উদ্ভাবিনী প্রতিভার প্রচার হইয়াছে। ইহাতে তিনি তাঁহার স্বদেশবাসী কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আশা করি, অধ্যাপক রায় মহাশয়ের যশোভাতি মাধ্যন্দিন ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর হইয়া অচিরকাল মধ্যে সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

মূষিক ও প্লেগ।

সম্প্রতি বিলাতে প্লেগ দেখা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই এই রোগ বিলাতের অধিবাসী ও সতর্ক পরিদর্শকের দর্শনেন্দ্রিয়ে ধূলি নিক্ষিপ্ত করিয়া ধীরে ধীরে তথাকার লোক ক্ষয় করিতেছিল। প্লেগ বাতশ্লৈষ্মিকরূপে তথায় আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া সহজে তাহার দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। যাহারা এই প্লেগে মরিতেছিল, তাহাদিগের রোগের লক্ষণ দেখিয়া লোক, এমন কি চিকিৎসকগণও,মনে করিতেছিলেন যে,নিউমোনিয়া বা বাতশ্লেষ্মা বিকারই উহাদিগের মরণের কারণ। শেষে দেখা গেল, ঐ নিউমোনিয়ায় প্লেগের সংক্রামকত্ব সপ্রকাশ। ফলে এ বিষয়ে সতর্ক অনুসন্ধান হয়। সেই অনুসন্ধান-ফলে যে সকল তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে,—তাহাতেই গ্রেটব্রিটনে প্লেগের উৎকট মূর্ত্তি লোকলোচনের সম্মুখে বিকট ভাবে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতের টাইম্‌স পত্রের জনৈক লেখক এ সম্বন্ধে একটি নানাতথ্য সম্বলিত সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। স্পেক্টেটর তাহার উপর আর একটি সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা শেষোক্ত সন্দর্ভের সার-সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে কয়েকটি বক্তব্য নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

প্লেগ প্রকোপ।

স্পেক্টেটর লিখিয়াছেন, গত আড়াই শত বৎসর পরে আবার ইংলণ্ডে প্লেগের বীজাণু আবির্ভূত হইয়াছে। ইহার প্রসার-স্থান ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার প্রসার-রোধকল্পে বিরাট প্রতিষেধোপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এখন এই রোগ স্থানবিশেষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু জাতীয় মঙ্গলামঙ্গলের সহিত এই ব্যাপার বিশেষভাবে বিজড়িত। সুতরাং ইহার প্রসার-রোধকল্পে বিশিষ্ট উপায়াবলম্বনই আবশ্যক।

প্রথম প্রকোপের স্থান।

গত ২২শে ডিসেম্বর টাইম্‌স পত্রের জনৈক বিশিষ্ট সংবাদদাতা ইষ্ট এঞ্জেলিয়ায় প্লেগের বিস্তার সম্বন্ধে একটি সুন্দর ও সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। সেই সন্দর্ভে লেখকের ঐ বিষয় আলোচনা করিবার ও ঐ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার দক্ষতা ও যোগ্যতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধ্যে একটি তথ্য এই যে, গত সেপ্টেম্বর মাসেই কেবল ফ্রেষ্টন অঞ্চলে মূষিক ও মানব সমাজে প্লেগ আত্মপ্রকাশ

করে নাই; গত চারি বৎসর বা ততোধিককাল ঐ অঞ্চল নিউমোনিক প্লেগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। শট্‌লি নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের বহিঃস্থ একটি ক্ষুদ্র কুটীরে প্রথমে এই দারুণ রোগ দেখা দিয়াছিল। অরওস নাম্নী ক্ষুদ্রা তটিনীর তটে এই পল্লী অবস্থিত। যে কুটীরে প্রথমে প্লেগ প্রকাশ পায়, তাহার চারিশত হস্ত দূরে আর একটি ক্ষুদ্র কুটীর বর্ত্তমান। এই দুই কুটীরের অর্দ্ধ মাইল মধ্যে আর কোনও মানবের বসতি নাই। এই অঞ্চলটি যে বিরল-বসতি এবং উক্ত কুটীরদ্বয় যে লোকালয় হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাহা এই তথ্যেই সপ্রকাশ।

সন্দেহ।

গত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে প্রথমোক্ত কুটীরে জনৈক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। সকলে মনে করে যে, বৃদ্ধা নিউমোনিয়া বা বাতশ্লেষ্মা বিকারে মরে। তাহার পর মৃতার দুই কন্যা ঐ রোগে আক্রান্তা হয়। একজন আরোগ্য হয়, আর একজন ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে প্রাণত্যাগ করে। নিকটস্থ কুটীরের জনৈক মহিলা পূর্ব্বোক্ত পীড়িতাদিগের সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। লোকে মনে করে, তিনিও ঐ রোগে মরিয়াছেন। ইহার কয়েকদিন পরে ঐ রোগে তাঁহার স্বামী এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী তাঁহার মাতা ঠিক ঐ রোগেই মরেন। শেষোক্ত রমণীর দুইটি সন্তান ঐ রোগে আক্রান্ত ও তন্মধ্যে একটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ক্ষেত্রেই প্রথম সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়, কিন্তু তাহা সন্দেহমাত্র। ইহার কিছুকাল পরে অরওয়েস নদীর অপর তীরে ত্রিমলি গ্রামে দুইটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন সন্দেহ হয়, যে তাহারা হয় ত প্লেগে মরিয়াছে।

নিশ্চয়তা।

গত বৎসর সেপ্‌টেম্বর মাসে শটলি হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী ফ্রেষ্টন নামক পল্লীতে ঐ রোগের আবির্ভাব হয়। যে কুটীরে এই রোগ প্রথম দেখা দেয়, সেই কুটীর নামতঃ ফ্রেষ্টনের অন্তর্গত হইলেও গ্রাম হইতে উহা বহু দূরে অবস্থিত। সে কুটীর হইতে কোনও জনবাসই নয়নগোচর হয় না। ১১ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে উল্লিখিত কুটীরে একটি বিড়াল মরে। সেই দিন সেই বাটীর একটি নয় বৎসর বয়স্কা বালিকা পীড়িতা হয়। বালিকা বিড়ালটি লইয়া খেলা করিত। ১৬ই তারিখে মেয়েটিও মরিয়া যায়। ক্রমে ২৩শে মেয়ের জননী, ২৯শে মেয়ের জনক, যমালয়ে গমন করেন। আর একটি মহিলা মেয়েটির জনকের সহিত পীড়িতদিগের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনিও ঠিক ঐ দিন শমনসদনে নীত হয়েন। ইতঃপূর্ব্বেই লোকের সন্দেহ অত্যন্ত গভীর হইয়াছিল। উপযুক্ত চিকিৎসকগণ তখন ইহার মধ্যে দুইজন রোগীর রক্ত পরীক্ষা ও তাহা হইতে রোগ জীবাণুর পরিণতি করিয়া দেখিলেন—সর্ব্বনাশ! তাহাদের রক্তে প্লেগ বীজাণু বর্ত্তমান! তখন সকলে বুঝিল, উহারা কেহই নিউমোনিয়ায় মরে নাই,—নিউমোনিক প্লেগই উহাদিগের মৃত্যুর কারণ। তাহার পর আর ঐ অঞ্চলে কেহ ঐ রোগে মরে নাই।

মূষিক ও প্লেগ।

ফ্রেষ্টনে প্লেগের এই অপ্রতর্কিত আবিষ্কারে ঐ অঞ্চলে সতর্ক অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, তথায় বহুদিন হইতে ইন্দুর মরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ অঞ্চলে দলে দলে মূষিক

মরিতেছে। কৃষক ও মজুরদিগের মধ্যে যাহারা এই অনুসন্ধান-ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল যে,সে একদিন প্রাতেই তিন শত মৃত ইন্দুর দেখিয়াছিল। তাহার পর ইপ্সউইচ অঞ্চলের জীবিত ইন্দুর ধরিয়া তাহার রক্তাদি পরীক্ষা করা হয়। তাহাতে জানা গিয়াছে যে, তথায় শতকরা পাঁচটা ইন্দুর প্লেগে আক্রান্ত। মৃত মূষিক পরীক্ষা-দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তাহারা প্লেগেই মরিয়াছে। বোম্বাই অঞ্চলে যখন প্লেগ প্রকট মূর্ত্তি ধরিয়াছিল, সে সময় তথায় জীবিত মূষিকদিগের মধ্যে শতকরা ৬টির অধিক প্লেগাক্রান্ত হয় নাই।

টাইমসের পত্রলেখক এ সম্বন্ধে একটি অতি আবশ্যক তথ্য প্রকাশিত করিয়াছেন।

নিদান সম্বন্ধে নূতন মত।

বহুদিন হইতে জানা ছিল যে,"পিউলেক্স চিওপিস্" (pulex cheopis) নামক ইন্দুরের উৎকুণের দংশনে মানব-দেহে প্লেগ রোগ বিসর্পিত হয়। ভারতেই এই জাতীয় উৎকুণ যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিলাতে উহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূষিকের বিলাতী উৎকুণের নাম ceratophyllus fasciatus। এই বিলাতী উৎকুণ নিজদেহে প্লেগ বীজাণুদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে আশ্রয় দেয় বটে, কিন্তু এতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল, উহা মানুষকে একেবারেই দংশন করে না। টাইম্সের লেখক লিখিয়াছেন যে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়ায় পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বিলাতী উৎকুণ না খাইতে পাইলেই অনন্যোপায় হইয়া মানুষকে দংশন করে। সম্ভবতঃ নিরীহ বলিয়া বিবেচিত এই বিলাতী উৎকুণের দংশন-ফলেই ক্রেইনে প্লেগের অবির্ভাব হইয়াছে। এই ব্যাপারে দুইটি নূতন তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ, প্লেগাক্রান্ত মূষিক ceratophyllus fasciatus নামক উৎকুণের দ্বারাও মানবদেহে প্লেগ রোগ বিসর্পিত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বিলাতে প্লেগাক্রান্ত মূষিকাধ্যুষিত অঞ্চলের পরিধি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও জানিয়া রাখা আবশ্যক। প্লেগের বাতশ্লৈষ্মিক রূপ অতিশয় সংক্রামক ও সাংঘাতিক। ইহা নিশ্বাসের দ্বারা এক মানবের দেহ হইতে অন্য মানবের দেহে বিসর্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার গ্রন্থি-স্ফীতি রূপ মূষিকের উৎকুণের দংশন ব্যতীত বিসর্পিত হয় না। সুতরাং ইহার বাতশ্লৈষ্মিক মূর্ত্তি যদি কোনও ঘনবসতি অঞ্চলে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া লোক-সংহার করিতে থাকিবে। লণ্ডনে যদি ইহা একবার দেখা দেয়, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না। ইহাতে যে কেবল বহুলোকের প্রাণহানি হইবে, তাহা নহে,—ইহাতে বিলাতের বাণিজ্যেরও প্রভূত ক্ষতি হইবে।

তাহার পর আর একটি কথা,—শীতে বা বর্ষায় এই রোগ দ্রুত বিসর্পিত হয় না,

অন্যান্য কথা।

কারণ ঐ সময় ইন্দুরের উৎকুণ দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। গ্রীষ্মের সময় ও শরৎ কালে এই রোগ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিবে, অনেকের ইহাই বিশ্বাস। সেই জন্য ইহার বিস্তার-রোধ-কল্পে বিলাতে বিস্তর টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

ডাক।

ডাক মহাপুরুষ ছিলেন। এই মহাপুরুষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু সে ইচ্ছার তৃপ্তি-সাধনের উপায় কোথায়? শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' লিখিয়াছেন, "তাহাদের (ডাকের ও খনার) জীবনের উদয় অস্ত পর্ব্বতপ্রমাণ কুসংস্কারের দ্বারা আবৃত; আমরা সেগুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে পারিলাম না। * * * হয়ত প্রাচীন কালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের (বচনরাশির) রচনার সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা এ সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।" তাঁহার ন্যায় প্রাচীন সাহিত্যসেবী পণ্ডিতই যখন ডাকের অস্তিত্বে সন্দিহান, তখন আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার আশা কোথায়? যাহা হউক, সুদূর ব্রহ্মপুত্রোপত্যাকায় ডাকের বিষয় কিছু জানা যায় কি না তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহাই নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

"লেহি ডঙ্গরা ডাকর গাঁও।
তিনি-শ পখুরির তিনি-শ নাওঁ॥"

প্রসিদ্ধ মহাপুরুষীয় তীর্থ বরপেটা হইতে সাত মাইল দূরে বর্ত্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট পল্লী যনদিয়ার সন্নিকট লেহি ডঙ্গরা গ্রাম ছিল। এই গ্রামটি সমৃদ্ধ ছিল। এই গ্রামেই ডাকের জন্ম। প্রবাদ আছে, ডাকের পিতারা ছয় সহোদর ছিলেন। এই সহোদরদিগের প্রত্যেকেরই সন্তানাদি হইয়াছিল; কেবল ডাকের পিতার কোন সন্তানাদি না হওয়ায় ডাকের পিতামহী বড়ই দুঃখ করিতেন। সহসা একদিন সন্ধ্যার সময় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলে ডাকের পিতামহী ডাকের জননীকে সন্ন্যাসীর সেবা করিতে নিয়োগ করেন এবং বলেন, "মা, তোমার সন্তানাদি নাই, তুমি সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া পুত্রবর লাভ কর।" সন্ন্যাসী ডাকের জননীর সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্রবর দিয়া গমন করেন। এই পুত্রই ডাক।

"এক দিন ডাক জন্ম লভিলা।
ভূমিতে পরিয়া মনে গুনিলা॥
দেখে অন্ধকার প্রদীপ নাই।
চক্ষু টের করি মারুক চাই॥
* *

হেন দেখি পাছে মাতিলা ডাক।
পোয়াতী রাখিয়া চা পুতাক ॥"

ডাক জন্মমাত্রই অমর বচনে সকলকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষ ভিন্ন জন্মমাত্র কাহারও কথা নির্গত হয় না। পুরুষ-প্রধান কৃষ্ণ জন্মমাত্রই বলিয়াছিলেন, "আমাকে যশোদার অঙ্কে রাখিয়া আইস।" ডাক ও জন্মমাত্র বলিয়াছেন, "পো এড়িয়া পোয়াতী রাখ।" ডাকের মৃত্যুও অকস্মাৎ ঘটিয়াছিল।

"ডাক মরে আপোন বুদ্ধি।
অপঘাত মৃত্যু তে-রাত্রি শুদ্ধি ॥"

ডাক জীবিত থাকিলে ব্রাহ্মণ ও গণকদিগের জীবিকা অর্জ্জনের অন্তরায় হইবে এই চিন্তা করিয়া সকলে একত্র হইয়া ডাককে ব্রহ্মপুত্রে ডুবাইয়া মারিয়াছিল।

"জী থাকে যদি ডাক ভাবিল মনত।
আমার জীবিকা সবে অন্তছিব ভাবত ॥
ডাকক মারোহো সবে স্নান সময়ত।
সকলো শিশুক সাতি আনিলা গণক।
রাখিব গোয়ারি ডাক আসিলা মনক ॥
ব্রহ্ম পুত্রতীরে আহি বান্ধিলন্ত আরি।
সকলো শিশুর লগে দিলে জাপ মারি ॥

*　　　*　　　*

উত্তম ব্রাহ্মণ ঘরে জনম ধরিলা। *
এ দিন এক দুপরতে শাস্ত্রক কহিলা ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য কোন আসিআছে দের।
কিবা তাহারে সে মায়া না জানিলে ফের ॥
সকল প্রাণীয়ে সিতো অদ্ভুত মানিয়া।
অহিংসক ডাক শিশু পেলাইলা মারিয়া ॥

ডাকের জীবন ঘোর অন্ধকারাবৃত হইলেও উক্ত মহাপুরুষের অস্তিত্বে সন্দিহান হইবার আমাদের শক্তি নাই। পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বর্ণনা একবারে কল্পনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত বলিতেও প্রবৃত্তি হয় না। যখন দেখি, ডাক পুরুষের

* ডাক গোয়ালাকে কোন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্বে বরণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।

বচনে, ডাক চরিত্রে ও ডাক ভণিতায় ডাক গোয়াল ভণিতা দিতেছে তখন কেমন করিয়া বলিব, ডাক গোয়ালের অস্তিত্ব ছিল না। *

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ।

ডাকের কথা।

নেপাল হইতে যে ডাকার্ণব তন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলা ডাকের বচনের মত অনেকগুলি বচন পাওয়া গিয়াছে। ডাকার্ণব তন্ত্র, ডাকতন্ত্র, ডাকিনী তন্ত্র,—এ সকল তন্ত্রের নাম তান্ত্রিকগণ অবগত আছেন। ডাক, ডাকিনী,—এই দুইটি শব্দও সকলেই জানেন। এই তন্ত্রগুলিতে যখন ডাকের বচনের মত বচন প্রাকৃত ভাষায় পাওয়া যাইতেছে, তখন বাঙ্গালা ডাকের বচন যে সেই সকল বচনের ছায়া অবলম্বনে রচিত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ কি? নেপালের ডাকার্ণব তন্ত্রের বচনের সঙ্গে বাঙ্গলা ডাকের বচনের ভাষাগত বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

এ দেশে অনেক হেঁয়ালীতে কবি কালিদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। উজ্জয়িনীর বরাহমিহিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ খনা বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস্য নহে; অথচ এদেশে প্রচলিত খনার জীবন চরিতে বাঙ্গলা বচনের রচয়িত্রী স্বরূপ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। "ডাক গয়লা"—এই প্রবন্ধের উদ্ধৃত একটি পদে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। "জন্ম মাত্র বলে ডাক। পো এড়িয়া পোয়াতি দেখ" এই পদটির অর্থে প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন, ডাক জন্মিয়াই জ্ঞানগর্ভ কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই চরণের অর্থ অন্যরূপ; ডাক বলিতেছেন, (সন্তানের) জন্মমাত্র তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া পোয়াতিকে যত্ন করিতে হইবে। প্রবন্ধকার ভাবিয়াছেন ডাক জন্মিয়াই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ইত্যাদি। সুতরাং তাহার জীবন চরিতের একটি অধ্যায় অমনিই আবিষ্কৃত হইয়া গেল, ডাক সুতিকা গৃহ হইতেই জগতের হিতার্থ উপদেশ দান করিয়াছিলেন। ডাকের জীবন-চরিত সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ সম্বলিত প্রবাদেরও এই রূপে সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

* বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, এই কয় পংক্তি লিখিতে Major P. R. T. Gordon's Some Assamese Proverbs ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নোটের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

কুনালের পিতৃভক্তি।



আমরা অশোক-অবদান ও দিব্য-অবদান হইতে অশোক ও তাঁহার আত্মীয়গণ সম্পর্কীয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হই। যে লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাবে ভারতে এক সুবিশাল সম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং যিনি বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও, আপনার কর্ম্মময় জীবনকে একদিনের জন্যও বিলাসিতার সুকোমল অঙ্কে স্থাপন করিয়া বিশ্রামের অবকাশ পায়েন নাই, তাহার কর্ম্ম-বহুল জীবন-ইতিহাস রচনা করিবার পক্ষে অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে অশোক-অবদান একখানি উৎকৃষ্ট ও উপযোগী গ্রন্থ সন্দেহ নাই। আমরা বিদেশীর জীবন-কাহিনী রচনা করিবার জন্য যে পরিমাণ ব্যস্ততা দেখাইয়া থাকি, আমাদের মধ্যে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যদি সেই পরিমাণে স্বদেশীয় মহাত্মগণের চরিত-সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন, তবে যে সকল মহাত্মার আবির্ভাবে ভারতে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের জীবনচরিতের জন্য আমাদিগকে অপরের দ্বারের দিকে দীন নয়নে চাহিয়া থাকিতে হইত না। অশোক এই জাতীয় পুরুষসিংহ, তাহার কর্ম্মময় জীবনের সহস্র উপাদান নানা-ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার পুত্র কুনালের পিতৃভক্তি-জ্ঞাপক এক আখ্যায়িকা হইতে, মহাবীর প্রিয়দর্শীর কর্ম্ম-বহুল জীবন-নাটকের কতিপয় অঙ্কের বিবরণ প্রদান করিব।

প্রিয়দর্শন কুনাল কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়া-ছেন। যৌবন সুলভ রূপের দীপ্তি তাঁহার সমস্ত দেহে সপ্রকাশ। কুনাল, অশোক-নির্দ্দিষ্ট রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন। এই রাজপ্রাসাদে তাঁহার বিমাতা তিস্যরক্ষিতাও বাস করিতেন। বিমাতাও যুবতী; বর্ষার নদীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে উদ্দাম চাঞ্চল্য ক্রীড়া করিতেছিল। কথিত আছে যে, অশোক মহিষীর মৃত্যু হইলে, বৃদ্ধবয়সে ইহাঁকে বিবাহ করেন। বার্দ্ধক্য-প্রপীড়িত অশোককে লইয়া যুবতীর মনস্তুষ্টি হইত না, সপত্নীপুত্র যুবক কুনালের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত। তিনি কুনালকে স্বীয় অভি-প্রায় জানাইলে কুনাল বিমাতার ঘৃণিত প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। লালসার নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া মন্দবুদ্ধি নারী

সেই দিন মনে মনে কুনালের সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। কিছুদিন মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিয়া, এক দিন তিনি অশোককে সুমিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া কুনালকে সুদূর তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তা রূপে প্রেরণ করিলেন। সুদূর তক্ষশিলায় কুনালকে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কোনরূপে তাঁহাকে গৃহ হইতে দূর দেশে পাঠাইতে পারিলেই, অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহাকে পিতৃসিংহাসন হইতে বঞ্চিত করা সহজ হইবে; অধিকন্তু অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করাও দুষ্কর হইবে না। এই পিতৃ আজ্ঞার পশ্চাতে কুনাল বিমাতার প্রচ্ছন্ন অভিসম্পাত স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু পিতৃ-আজ্ঞার বিপরীতাচরণ করা তাঁহার অভ্যাসবিরুদ্ধ; সুতরাং, তিনি পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ও চিরপরিচিত স্বর্গাদপী গরীয়সী জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় লইয়া, চিরপোষিত পরিম্লান আশা বক্ষে ধারণ করতঃ, ভবিষ্যজীবনের নূতন অঙ্ক কিরূপে রচনা করিবেন তাহা চিন্তা করিতে করিতে সুদূর প্রবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কুনাল নূতন স্থানে আসিয়া নূতন করিয়া "ঘর কন্না" পাতিয়াছেন। আবার কুহকিনী আশা তাঁহার মনোরাজ্যে কল্পিত ভবিষ্য সুখরাজ্যের কল্পনার সৃষ্টি করিয়া সেই তাপদগ্ধ জীবনের স্মৃতি ধীরে ধীরে মুছিতেছিল। কিন্তু নিয়তি কোন অজানিত রাজ্যে বসিয়া অন্যরূপে তাঁহার জীবন-নাটক গঠিত করিয়া তুলিতেছিল। একদিন রাজকার্য্য শেষ হইলে, অশোক মহিষীর কক্ষে বিশ্রামার্থ নিদ্রিত ছিলেন। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, অশোকপত্নী তক্ষশিলার মন্ত্রিবর্গকে এই পত্র লিখিলেন, তোমারা আদেশ-লিপি প্রাপ্ত হইবামাত্র কুমার কুনালের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে। তিস্যরক্ষিতা নিদ্রিত অশোকের চিহ্ন উক্ত পত্রের উপর অঙ্কিত করিয়া ঐ আদেশ-লিপি অবিলম্বে তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন।

আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রিগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাহাদিগের হতবুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া কুমার পত্রের মর্ম্মার্থ তাঁহাকে জ্ঞাত করিতে আদেশ করিলেন। অমাত্যগণ সেই কুলীশ-কঠোর আদেশ ব্যক্ত করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু এই কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া কুনালের কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল না। তিনি রাজাদেশ অবিলম্বে

পালন করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অমাত্যগণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু উৎপাটিত হইল; তিনি সস্ত্রীক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন।

পিতৃ-আদেশ পালন করিবার জন্য, জীবনের জ্যোতি-স্বরূপ চক্ষুর্দ্বয় হারাইয়া কুনাল নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে পাটালিপুত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি একদিন কোন সুযোগে রাজপ্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার জীবন-নাটকের করুণ অঙ্কটি তালমান সংযোগে সুমিষ্ট কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোক পুরীমধ্যে অবস্থান করিতে ছিলেন। কুনালের কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি সত্বর বহিরে আসিলেন। পুত্রের এবম্বিধ অবস্থার বিষয় তিনি অবগত ছিলেন না। পিতাপুত্রের মিলনের পর অশোক সমুদায় বিষয় জানিতে পারিলেন।

কথিত আছে যে, ঐ সময় গোসা নামক এক জন দিব্যশক্তিসম্পন্ন ভিক্ষু পাটালিপুত্রের সন্নিহিত স্থানে বাস করিতেন। পুত্রের দৃষ্টিশক্তি পুনর্লাভের জন্য অশোক তাঁহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হয়েন। ঐ মহাত্মার আদেশে পরদিন প্রাতে একটি বৃহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। গোসার উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য দলে দলে নরনারী সমবেত হইলে, তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতার ফলে সমবেত জনমণ্ডলীর নয়নে সংক্ষুব্ধ অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। কারুণোচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা প্রত্যেকের হস্তস্থিত পাত্রে রক্ষিত হয়। ধর্ম্মোপদেশ শেষ হইলে গোসা উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি যদি চিরজীবন বুদ্ধের পবিত্র ধর্ম্মের যথার্থ ব্যাখা করিয়া থাকি, তবে কুনাল দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরাইয়া পাইবেন।" এই বলিয়া তিনি পাত্রস্থিত নয়নাসার যুবকের নয়নে লিপ্ত করিলেন। ইহাতেই কুনাল আবার দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

কথিত আছে যে, যুবক পিতৃ-আদেশ পালন করিবার জন্য যে স্থানে আপনার চক্ষু উৎপাটিত করেন, তক্ষশিলার সান্নিধ্যে সেই স্থানে অশোক কুনালের পিতৃআজ্ঞানুবর্ত্তিতা স্মরণার্থ একটি স্তূপ নির্ম্মিত করান। এই স্তূপই তাঁহার কীর্ত্তি ইতিহাসে জাগরূক রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

ভারতের এক রাজপুত্র একদিন পিতৃআদেশ পালনের জন্য শাসনদণ্ড ফেলিয়া বনাশ্রয় করিয়াছিলেন। আর একজন "পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম"

[illegible] অপমানিত কায়ক্লেশে [illegible] বোধ করেন, [illegible] একজনের জীবনকথা আদি কবির লেখনীমুখে অমরতা লাভ করিয়াছে—সমস্ত জগতবাসী তাঁহাকে দেবতার পদে উন্নীত করিয়া ভক্তি পুষ্প পূজা করিতেছে,—আর একজনের কাহিনী আলোচনার ও সহানুভূতির অভাবে কোনরূপে আপনাকে বহুশতাব্দী ধরিয়া বিস্মৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

পুরাতন প্রসঙ্গের কথা।

গতবারের প্রবন্ধে যে হরিনাথ শর্ম্মার নাম উল্লিখিত হইয়াছে তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছিলেন :—রামের অরণ্যযাত্রা বিরাটপর্ব্ব, মুদ্রারাক্ষস ও রচনাবলি। রাসেলাসের অনুবাদক ৺ তারাশঙ্কর ; ৺হরিনাথ শর্ম্মা নহেন। উভয়েরই নিবাস নদীয়া জেলায় কাঁচকুলি গ্রামে। ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নিবাস নদীয়া জেলায় বিল্বগ্রাম নামক গ্রামে। কাঁচকুলি ও বিল্বগ্রাম পরস্পর নিকটবর্ত্তী। তিনজনেরই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। ৺ হরিনাথ ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজে পণ্ডিত ছিলেন এবং শিবপুরে বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন।

৺ হরিনাথ ন্যায়রত্নের সাত পুত্র বর্ত্তমান। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর জ্যেষ্ঠ, তিনি সম্প্রতি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসনস্ জজের কার্য্য করিয়া পেন্‌সন লইয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র দার্জ্জিলিঙ্গের বিখ্যাত উকীল Mr M. N. Banerjee (শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) এই ক্ষুদ্র লেখক হরিনাথ ন্যায়রত্নের ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
(বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক)



৺ দ্বারিকানাথ মিত্র।

Printed by K. V. Seyne & Bros.



অন্ধাবস্থায় ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ছবির জন্য মানসীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঋণী।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(৫)

১৫ই পৌষ, ১৩১৭।

পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বঙ্কিম বাবু কি কখনও আপনার Law lectures শুনিতে আসিতেন?" তিনি বলিলেন—"আমার Law lectures? বঙ্কিম বাবু?" আমি বলিলাম—"আজ্ঞা হাঁ; আপনার।" তিনি বলিলেন—"না। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বল দেখি?" আমি বলিলাম—"একজন প্রবীন সাহিত্য-সেবী স্বীয় জীবনের পুরাতন ঘটনাবলির আলোচনাপ্রসঙ্গে এইরূপ একটি কথা লিখিয়াছেন; ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পোষাক পরিয়া বঙ্কিম বাবু আপনার ক্লাসে আসিয়া ছাত্রদিগের সহিত বেঞ্চে বসিয়া আপনার লেকচার শুনিতেন।" তিনি বলিলেন—"দেখ, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমি Law lecturer হই নাই। কখনও যে তিনি আমার ক্লাসে আসিয়াছিলেন এমন আমার মনে হয় না। তবে আন্দাজ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম বাবু ও আমি একত্র Law classএ লেকচার শুনিতে যাইতাম। সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। একটা analogous ঘটনা আমি বলিতে পারি। তারাপ্রসন্ন বাবু বঙ্কিম বাবুর সমসাময়িক লোক। তিনি যখন বহরমপুরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, গুরুদাস বাবু তখন তথায় ওকালতী করেন ও কলেজে Law lecturer। তারাপ্রসন্ন বাবু গুরুদাস বাবুর Law classএ উপস্থিত হইয়া লেকচার শুনিতেন। এ কথা আমি গুরুদাস বাবুর মুখে শুনিয়াছি।"

আমি বলিলাম—"আপনার বঙ্কিম বাবুর সহিত intercourse বরাবর ছিল কি?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"ছিল বৈ কি? তিনি যখন আলিপুরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, তখন হাওড়ায় প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসিতেন। যখন হাওড়ায় ছিলেন, তখন আমি তাঁহার এজলাসে প্রায়ই যাইতাম। এখনও বেশ মনে পড়ে, একদিন হাওড়া হইতে এক গাড়িতেই আমরা দু'জনে যোগেন্দ্র বাবুর বাড়িতে গেলাম। পথে কোম্‌ৎ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলাম। আমি

বলিলাম,—'দেখুন, আমার মনে হয়, কোম্‌তের দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের দেশে আলোচনা হইবার সময় বোধ হয় এখনও আইসে নাই, the time is not ripe for it.' বঙ্কিম বাবু বলিলেন,—'কেন ? যেটা Truth তা'র আবার সময় অসময় কি ?' অবশ্যই বঙ্কিম বাবু যে কোম্‌ৎ ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমার মনে হয় না, কিন্তু তখন যেন তিনি বেশ মন খুলিয়াই কথাটি বলিলেন, এ ধারণা আমার হইল।

"হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার আলাপ বোধ হয় ইংরাজী ১৮৬০ সাল হইতে। আমার বাল্যবন্ধু যোগেন্দ্রের বাড়ী খিদিরপুরে; হেমচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ বোধ হয় সেই স্থানেই হইয়াছিল। যখন তিনি ৺রমাপ্রসাদ রায়ের ছেলে দু'টির শিক্ষকতা করেন, তখন বুঝিতে পারা যায় নাই যে, তিনি একজন বড় দরের কবি হইতে পারিবেন। বালককাল হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতেন; কিন্তু তখন ভবিষ্যতের সূচনা পাওয়া যায় নাই। তিনি মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষকতা করিলেন। বৎসর খানেক মুন্সিফি করিলেন। সেই সময়ে গভর্মেণ্ট তাঁহাকে টাকা দিয়া Norton's Law of Evidence বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইয়া লয়েন। ওকালতী করিবার ইচ্ছা হইল, কলিকাতায় নহে, বরিশালে। যখন বরিশালে যাইবার জন্য তিনি একপ্রকার সব স্থির করিলেন, হঠাৎ একটা ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে মিষ্টার অ্যালেন নামক একজন উকিলের জুনিয়রি করিতেন। একটা মোকদ্দমায় একদিন ঘটনাচক্রে 'সাহেব' নিজে উপস্থিত হইতে পারিলেন না, সুতরাং হেম বাবুকেই argue করিতে হইল। মোকদ্দমা জিতিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে পসারের বৃদ্ধি হইল। বরিশাল যাওয়া হইল না। অজস্র পয়সা রোজগার করিতে লাগিলেন; আয় মাসে দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন্ সময়ে, কি কারণে তাঁহার কাব্য রচনার দিকে ঝোঁক গেল তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না; বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনের সহিত ভাল রূপ আলাপ হওয়াতে,—তিনি মেঘনাদবধের preface লিখিয়া দেন,—তাঁহারও খণ্ডকাব্য রচনা করিবার প্রবৃত্তি হইল।

"কিন্তু হেম বাবুর 'চিন্তাতরঙ্গিনী' ইহার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এটা তাঁহারই পাড়ার কোনও গৃহস্থ বাড়ীর একটা ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ঘটনাটা কি? কবে ঘটিয়াছিল?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"আত্মহত্যা। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। আমার দাদার মৃত্যুর ঠিক মাস খানেকের ভিতর এই ঘটনাটি ঘটে। বোধ হয় তাঁহার দেখাদেখি। দাদার মত intellect সে সময় ছিল না। কিন্তু তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল যে, তিনি বোধ হয় অন্ধ হইতে বসিয়াছেন। অন্ধ হইয়া আজীবন পরাধীনতার কষ্ট হইতে মুক্তির বাসনায় তিনি বোধ হয় ঐ tragic ব্যাপারের সংঘটন করিয়া বসিলেন। গ্রীক দর্শন শাস্ত্র তাঁহার যথেষ্ট পড়া ছিল; নিশ্চয়ই তিনি Epictetus এর কথায় নিজের পন্থা ঠিক করিয়া লইলেন। Epictetus বলিতেন—বাঁচিয়া থাকা যখন কষ্টকর, তখন মনে রাখিও যে, there is a door always open; রোমান বীরের ন্যায় বোধ হয় তিনি Epictetus এর কথা মানিয়া লইয়াছিলেন।

"আত্মহত্যাও সংক্রামক। দ্বিতীয় ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া হেম বাবু কবিতাটি লিখিলেন। আমিই প্রথম উহার সমালোচনা করি। দেখাইয়া দিই যে, হেমবাবুর 'কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান' ইত্যাদি, বায়রণের

"Man's love, of man's life is a thing apart" (Don Juan, Canto I) ইত্যাদির অনুবাদ। অনুবাদ হিসাবেও বটে, আর কবিতা হিসাবেও বটে, মোটের উপর ভালই বলিয়াছিলাম।

"মাসিক পত্রিকায় হেম বাবুর ছোট ছোট কবিতা প্রকাশিত হইত। বোধ হয়, 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় তিনি লিখিতেন। 'বৃত্রসংহার' সুরু হইলে তাঁহার ওকালতীতে শৈথিল্য পড়িয়া গেল। আমি জানি, তাঁহাকে তিন শত টাকা ফী দিয়া আলিপুরে লইয়া যাইবার জন্য মক্কেল আসিয়া তাঁহাকে আদালতে লইয়া যাইতে পারিল না; হেম বাবু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কবিতা রচনায় তন্ময় হইয়া রহিলেন। দেবী সরস্বতীর মন্দিরে অনেকে অর্ঘ্য আনিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন সত্য, কিন্তু এমন একাগ্র উপাসনা আর দেখিয়াছ কি? তাঁহার মাসিক আয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

"হেম বাবু অত্যন্ত sensitive ছিলেন। কেহ পরিহাস করিয়া তাঁহার কবিতার সমালোচনা করিলে বড়ই তাঁহার মনে লাগিত। সরকারি উকিল অন্নদা বাবু অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, 'হেম বাবু বলেন কি জান? Other people's poetry survives them; but I shall survive my poetry.' হেমবাবুকে শুনাইয়া এইরূপ আলাপ হইত; হেম বাবু অস্থির

হইয়া উঠিতেন। Dryden's Alexander's Feast হেম বাবু বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন, আমাদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত করা হয়, বোধ হয় পদ্যপাঠ তৃতীয়ভাগে আছে। ঐ যে Third Number Poetical Readerএ কবিতাটি আছে, এই উপলক্ষ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (তিনি নিজে একজন সুকবি) বলেন, 'হেম বাবুর poetry ত কেবল third number poetry দেখ্‌তে পাই।' আমি সেই কথা হেমবাবুকে বলাতে, হেমবাবু আমার সহিত বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন।

"আজকালকার ছেলেরা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' গ্রন্থখানির সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। কিন্তু অত originality, অমন রচনা-সৌষ্ঠব আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই; ভাব সকল যেন luscious যদি কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে শেলীর আস্বাদ পাইতে চায় তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি হইতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, Somehow or other it never came to the surface.

"হেম বাবুকে আমি 'স্বপ্নপ্রয়াণের' কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন, 'আমার ভাল লাগে না।' কিন্তু এ বিষয়ে সারদাচরণ মিত্রের মতও ঠিক আমার অনুরূপ। আমি সারদাকে ভাল মন্দ পূর্ব্বে কিছুই বলি নাই; এমন কথা তুমি বলিতে পারিবে না যে, আমায় কথায় তিনি সায় দিয়া গেলেম। দেখিলাম সারদা গ্রন্থখানিকে বিশেষরূপে admire করেন।

"যখন রব উঠিল যে, জগদানন্দ বাবু হেম বাবুর নামে নালিশ করিবেন, এবং গভর্মেণ্ট জগদানন্দ বাবুকে সাহায্য করিবেন, তখন হেম বাবু অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। কথাটা নেহাৎ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে; কারণ সকলেই মনে করিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই কথাটার কোনও ভিত্তি আছে।

"মাইকেল হেমবাবুর উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; মাইকেলের প্রতিভায় আমরা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। যাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলিয়াছিল, তিনি যে কেমন করিয়া সংস্কৃত ভাষার শব্দসিন্ধু মন্থন করিয়া কাব্যরত্ন বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিতে পারিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কিন্তু আমি একটি বিষয় বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, বাঙ্গালীর flexibility of intellect অসাধারণ। অত্যন্ত সাধারণ কথাবার্ত্তায় মাইকেল মহাভারত রামায়ণ হইতে এমন সুন্দর উপমা হঠাৎ আনিয়া ফেলিতেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ অবাক হইয়া যাইত।

"বিদ্যাসাগর মাইকেলের লেখা পছন্দ করিতেন না। Blank Verse তাঁহার একেবারে অসহ্য। তিনি Caricature করিতেন,—

'তিলোত্তমা বলে ওহে শুন দেবরাজ
তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব।'

তিনি বঙ্কিমকেও পছন্দ করিতেন না। Matter সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিতেন না ; কিন্তু manner সম্বন্ধে, style সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। আমার মতে Bankim brought about a revolution in Bengali literature similar to that brought about by Crabbe and Cowper in English literature, যে revolutionএর চূড়ান্ত হইল Wordsworthএ। Edinburgh Review Wordsworthকে গোড়াতেই জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল,—'This will never do'—কিন্তু কবি অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইলেন ও Port Laureate হইলেন। বঙ্কিমও বিচলিত হইলেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'কে বলিতেন, 'কান্নার জোলাপ'।

"বিদ্যাসাগর ঈশ্বর গুপ্তকেও দেখিতে পারিতেন না ; আমার দাদার বেকনও তিনি পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহাতে সংস্কৃত কথার সহিত ছোট ছোট সাধারণ বাঙ্গালা কথা ছিল। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগরের ঐ একটা প্রধান দোষ ছিল, তাঁহার narrowness, তাঁর bigotry, তাঁহার একান্ত 'বামুন পণ্ডিতি' ভাব। এক হিসাবে catholicity তাঁহার ছিল না। যে তাঁহার প্রদর্শিত পথ না লইল, তিনি তাহাকে নগণ্য মনে করিলেন ; যে তাঁহার অনবরতবিগলিতবাষ্পাকুলিতলোচনের মত ভাষার প্রয়োগ না করিল, তাহার উপর তিনি খড়্গ-হস্ত।

পরগুণপরমাণূন্ পর্ব্বতীকৃত্য নিত্যং
নিজহৃদিবিকশন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ।

এই দুই ছত্রে 'ভামিনীবিলাসে'র কবি জগন্নাথ পণ্ডিত যে উদারতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, বিদ্যাসাগরে সে উদারতা কোথায়? পরগুণের পরমাণুগুলিকে পর্ব্বতপ্রমান করিয়া তুলা ত দূরের কথা, তিনি ইংরাজী শিক্ষিত লেখকদিগের গুণ দেখিতেই পাইতেন না।

"বঙ্কিমের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন রূপ ধারণ করিল। একদিন বঙ্কিম আমাকে বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ কোরে বাঙ্গালা

ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে দিয়ে গেছেন।' আমারও অনেকটা ঐ রকম মত।

"কিন্তু আমিই সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসাগরের ভাষাকে সাধারণো সমর্থন করি। এ কথা আমায় জোর করিয়া বলার কারণ আছে। যখন আমি রিপণ কলেজে কায করি, একদিন আমার একটি পুরাতন ছাত্র—শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্ট আমার সহিত কলেজে দেখা করিতে আসিলেন। তখন আমি বিদ্যাসাগরের ভাষার একটু তীব্র সমালোচনা করিতেছিলাম। কার্ত্তিকচন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন 'সে কি মশাই? আমরা যখন আপনার কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গালা পড়িতাম, তখন ত আপনিই আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের ভাষার মহৎ গুণ এই যে, উহা বাঙ্গালা প্রদেশের সকল অঞ্চলের লোকই বুঝিতে পারিবে। কলিকাতায় চলিত কথায় লিখিলে রাঢ়ের বাহিরে লোকে বুঝিতে পারিবে না।' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'বটে? তা সে কথাও ত ঠিক।'

* * * *

পণ্ডিত মহাশয় উঠিলেন। তখন বেলা ৩টা শীতকালে এই সময়ে তিনি একটু বেড়াইতে বাহির হয়েন। তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়া আমিও উঠিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার দাদার কোনও প্রতিকৃতি আছে কি?"

তিনি বলিলেন—"না। তবে বহুদিন পূর্ব্বে আমি একদিন মেট্কাফ হলে Moor's Life of Lord Byron পড়িতেছিলাম। তাহাতে বায়রণের যে চেহারা অঙ্কিত ছিল, তাহা অবিকল আমার দাদার। এমন আশ্চর্য্য similarity of features দেখা যায় না;—ললাট, নাসিকা, চক্ষু, ওষ্ঠাধরের ভঙ্গি, কেশবিন্যাস, এমন কি বসিবার ভঙ্গিটুকু পর্য্যন্ত, সমস্তই মিলিয়া গেল।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

কৃষিতত্ত্বের আলোচনা।

(২)

কৃষিকার্য্যের অবনতির অনেকগুলি কারণ আমরা একে একে উল্লেখ করিলাম। এখন আমাদের উপায় কি? আমাদের কৃষিকার্য্যে কি এইরূপ ভাবে ক্রমেই অধিকতর অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইবে? ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? অনেকে বলেন,—"মা ভৈঃ"—ভয়ের কোন কারণ নাই। স্বয়ং সরকার বাহাদুর বদ্ধপরিকর হইয়া আমাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে যত্নবান হইয়াছেন। গভর্মেণ্ট কোমর বাঁধিয়া যখন এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তখন আর চিন্তা কি? আমরা কিন্তু এইরূপ উক্তির পক্ষপাতী নহি: এই বিষয়ে গভর্মেণ্টের কার্য্য দেখিয়া, আমরা হতাশ হইয়াছি। গভর্মেণ্টের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, আমরা তাহার প্রতি বিশেষ আস্থাবান নাহ। গভর্মেণ্ট কৃষির উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহা "বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো।" গভর্মেণ্টের কার্য্যে আস্থাস্থাপন না করিবার প্রধান কারণগুলি আমরা এইবার আলোচনা করিব।

১৮৭১ খ্রীঃ অব্দ হইতে আমাদের কৃষিকার্য্যের প্রতি গভর্মেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দ হইতে তাঁহারা প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই বৎসরে সরকারী কৃষি-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে গভর্মেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষিত ছাত্রকে বাৎসরিক বৃত্তি দিয়া বিলাতের সরকারী কৃষি-কলেজ সিসেসটারে শিক্ষা লাভ করিতে পাঠাইলেন। তাঁহারা তথা হইতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গভর্মেণ্টের নিকট স্ব স্ব শিক্ষানুযায়ী কার্য্য প্রার্থনা করিলেন। গভর্মেণ্ট তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই ডেপুটী ম্যাজিষ্টার পদে নিযুক্ত করিলেন; যাঁহারা ডেপুটীগিরি গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারা কেহ বা ব্যারিষ্টার, কেহ বা কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া জীবিকা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক কৃষিকার্য্যের উন্নতির এইরূপে সূত্রপাত হইল! ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে বিলাতের সিসেস্টার কলেজের প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্ ডাক্তার Voelcker, ভারতের

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্ত এবং কিরূপে ইহার উন্নতি হইতে পারে তাহা স্থির করিবার জন্ত বিলাত হইতে প্রেরিত হইলেন। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে তিনি তাঁহার মন্তব্যপূর্ণ বিস্তৃত বিবরণী গভর্মেণ্টের নিকট দাখিল করিলেন। তিনি ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটু হতাশভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, ভারতের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু এই কার্য্য বহু-সময়-সাপেক্ষ। তিনি তাঁহার রিপোর্ট মধ্যে কৃষির উন্নতি বিষয়ে বহুতর উপদেশ এবং নব পদ্ধতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার যুক্তিপূর্ণ উপদেশাদি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সেই সুবৃহৎ রিপোর্টের মধ্য দিয়াই আমাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইল!

ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ৮।১০টি কৃষি-পরীক্ষা (Experimental) অথবা কৃষি-প্রদর্শনী (Demonstration) ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষের অধীনে এইগুলি ন্যস্ত হইয়াছে। অধ্যক্ষগণ প্রায়ই সিবিলিয়ন। সিবিলিয়নগণ এ বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বিশেষ এই সকল সরকারী কৃষিক্ষেত্র হইতে এ পর্য্যন্ত এক পয়সাও লাভ হয় নাই। এই সকল ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই মনে হয় যেন, সেইগুলির কার্য্য—

"কোম্পানিকা মাল,
দরিয়ামে ঢাল"

এই নীতিদ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ফলে কিছুই হইতেছে না—কেবল টাকার অপব্যয়। এই সকল কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আমাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতি করা। সরকারী কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়া যাহাতে কৃষকেরা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিয়া কৃষির উন্নতি করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী ক্ষেত্রগুলি স্থাপিত হইয়াছে।

কিন্তু যখন এ পর্য্যন্ত কোন সরকারী ক্ষেত্র হইতে এক পয়সাও লাভ হয় নাই, কেবল ক্ষতি হইতেছে, তখন কৃষকগণ তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত প্রথা কেন অবলম্বন করিবে? কৃষকদিগের চক্ষুর সম্মুখে যদি দেখান যায় যে, তথা-কথিত বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা দুই টাকা অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে, তবে তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। একটা পুরাতন কথা মনে পড়িল।—তখন বিপ্রদাস বাবুর 'পাকপ্রণালী' সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে; কয়েকজন ভদ্রসন্তান সেই

পুস্তক অবলম্বনে কোন খাদ্য পাক করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর পুস্তকের প্রণালী অনুসারে বেগুন পোড়া প্রস্তুত হইল, বেগুন পোড়া তৈয়ার করিতে তাঁহাদের ১॥০ টাকা খরচ হইল। অবশ্য উপাদেয় বেগুন পোড়া হইল; কিন্তু খরচ পড়িল ১॥০ টাকা। সখের উপর এক আধদিন মাত্র এইরূপ ১॥০ টাকা খরচ করিয়া বেগুন পোড়া খাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের কৃষকগণের কৃষিকার্য্য ত সখের উপর নহে; ইহাই তাহাদের উপজীবিকা। সুতরাং ১॥০ টাকা খরচ করিয়া বেগুন পোড়া খাওয়ার মত, বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত কৃষিকার্য্য করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে তাহারা একেবারেই অসম্মত।

কৃষিবিভাগের সুযোগ্য য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ দুঃখ করিতেছেন যে, ভারতবর্ষের কৃষকগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে একেবারেই অসম্মত; তাহারা বলে যে, এতদিন যে ভাবে তাহাদের বাপ-পিতামহ কৃষিকার্য্য চালাইয়া আসিয়াছে, তাহাই ভাল; তাহাদের নূতন পদ্ধতি শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। সুযোগ্য কর্ম্মচারিগণের মতে আমাদের চাষারা ভারি বোকা, বড়ই conservative। শুধু য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ নহেন, কৃষিতত্ত্ববিৎ মাননীয় রায় ভূপালচন্দ্র বসু বাহাদুর পর্য্যন্ত এই মতের পক্ষপাতী। তিনি লিখিয়াছেন,—"To my mind the Indian cultivator is a living emblem of inertia and those whose duty it is to inculcate doctrines of improvement upon his mind cannot help feeling at times that his task promises a scarcely more hopeful issue than the proverbial labour of the mountain." কিন্তু আমরা কৃষকগণের কোন দোষ দেখিতেছি না। যেদিন তাহাদের চক্ষুর সমক্ষে কার্য্যে, (কাগজ-কলমে নহে) দেখাইয়া দিবেন যে, কোন একটি বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহাদের দুই টাকা অর্থাগমের সুবিধা আছে, সেই দিনই তাহারা সাগ্রহে সেই প্রথা অবলম্বন করিবে। কিন্তু যতদিন তাহারা দেখিবে যে, সরকারী প্রণালী কেবল "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"—কেবল টাকার শ্রাদ্ধ, ততদিন তাহারা উপদেষ্টার—সংস্কারকের যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, কেবল হাস্য-পরিহাস করিবে এবং কাযেই সংস্কারকগণের চক্ষুতে মূর্খ ও conservative বলিয়া বিবেচিত হইবে। বাস্তবিক তাহারা যে মূর্খ বা conservative নহে, তাহা আমরা বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

২

অনন্তর বেঙ্গল গভর্মেণ্ট কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সহিত একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। নিয়ম করিলেন, সকলকেই বি, এ, পাশ করিয়া এই কলেজে প্রবেশ করিতে হইবে; তবে যে সকল ছাত্রের নিজের ভূসম্পত্তি আছে অথবা যাহারা ভূস্বামী কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হইবে, তাহারা বি, এ, পাস না করিলেও শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু এই কলেজের শিক্ষনীয় বিষয় এবং পাঠ্য পুস্তক সকল এতাদৃশ কঠিন ছিল যে, বি, এ, পাস করিয়া না গেলে ছাত্রগণ পাঠ্য বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। তদ্ভিন্ন এই বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পারদর্শী কৃতি ছাত্র লাভ করিবার আশায়, গভর্মেণ্ট একটি প্রলোভন দেখাইলেন; নিয়ম করিলেন, এই কলেজ হইতে যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা ডেপুটি ও সাবডেপুটির পদ প্রাপ্ত হইবে। ডেপুটিগিরি বাঙ্গালীর জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া, অনেক ছাত্র কলেজে শিক্ষা-লাভ করিতে লাগিল, যাহারা উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিল, তাহারা ডেপুটি হইল, যাহারা না পারিল তাহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া কৃষিবিভাগে সামান্য চাকরী লইয়া জীবন কাটাইতে লাগিল। আর যাহারা বি, এ, পাস না করিয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া কেবল কয়েক বৎসর বৃথা সময় নষ্ট করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই ভাবে ১০ বৎসর শিবপুরের কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাহারা তথা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইল, তাহাদের মধ্যে একজনও কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিল না, সকলেই চাকরী করিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গভর্মেণ্টের চক্ষু ফুটিল, এই কলেজ হইতে কৃষি কার্য্যের কোনরূপ উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া তাঁহারা কলেজ উঠাইয়া দিলেন।

তাহার সম্প্রতি শীঘ্রই ভাগলপুরের সন্নিকটে সাবৌরে এক বৃহৎ প্রাদেশিক কৃষিকলেজ খুলিয়াছে। যদিও এই কলেজের শিক্ষনীয় বিষয়ের গুরুত্ব শিবপুর কলেজ অপেক্ষা অনেকাংশে কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত লোকে যে তথা হইতে কোন কিছু শিক্ষা করিতে পারিবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিলাত হইতে আগত বড় বড় কৃষিতত্ত্ববিদ্ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের উপর এই কলেজের শিক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। হইতে পারে, তাঁহারা বিলাতের কৃষিকার্য্য সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, কিন্তু বিলাতের কৃষিকার্য্যের সহিত আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যের আকাশ-পাতাল

প্রভেদ। তাঁহারা ত এ দেশের কৃষিকার্য্যের কোন তত্ত্বই জানেন না; সুতরাং এই কলেজের ফলও যে আশানুরূপ হইবে, তাহাও বোধ হইতেছে না। তাহার পর পুষায় এক বৃহৎ ব্যাপার হইতেছে,—তথায় একটি প্রকাণ্ড কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহার নাম Imperial Agricultural Research Institute; এই স্থানে কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিষয়ে নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে। বিলাতী অধ্যাপক, তত্ত্ববিদ্, বিশেষজ্ঞ, রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি মোটা মোটা মাহিনায় পুষা কলেজ পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। পুষা কলেজ এতই বৃহৎ ব্যাপার যে, ইহার ভাল-মন্দ ফলাফল আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই; তবে "ফলেন পরিচীয়তে"— আরও ২।৫ বৎসর অপেক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে।

গভর্মেণ্টের উদ্দেশ্য যে সাধু সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; তবে দুঃখের বিষয় তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সেই সাধু উদ্দেশ্য সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। আর এই জন্যই আমাদের কৃষকগণ গভর্মেণ্টের কার্য্যে বিশ্বাসবান হইয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থানুসারে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিতে সাহস করিতেছে না। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারিগণ রিপোর্টে অনবরত দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন যে, যাহাকে বুঝাইলে বুঝে না, তাহাকে কিরূপে শিক্ষিত করিব—যে চোখ চাহিয়া ঘুমাইতেছে, তাহাকে কেমন করিয়া জাগাইব—যে এতদূর নির্ব্বোধ, এতদৃশ conservative, তাহার অবস্থা কিরূপে উন্নত হইবে?

বাস্তবিকই কি আমাদের কৃষকরা এতই নির্ব্বোধ যে, কৃষিকার্য্যে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে, অথবা যে পুরাতন প্রথা পরিবর্ত্তিত করিলে তাহাদের উপকার আছে, যাহাতে তাহাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে,—তাহারাও ২।৪ টাকা অধিক উপার্জ্জন করিয়া স্বীয় দুরবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি করিতে পারিবে,—সেই প্রথার উপকারিতা আপনাদের চক্ষুর সমক্ষে দর্শন করিয়াও, আগ্রহ সহকারে উক্ত প্রথা অবলম্বন না করিয়া তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইতেছে? তাহা কখনই হইতে পারে না—আমাদের চাষারা এরূপ গণ্ডমূর্খ নহে। পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসিয়া কৃষির উন্নতিকল্পে তাহারা অনেক নূতন তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে যত্নবান হইয়াছে। দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

(১) নূতন ফসলের চাষ। পূর্ব্বে যে সকল ফসল আমাদের দেশে উৎপন্ন

হইত না, এক্ষণে পাশ্চাত্য কৃষিবিদ্‌গণের সংস্পর্শে আসিয়া কৃষকরা সেই সকল ফসলের আবাদ করিতেছে। এই সকল ফসল আমাদের দেশের নহে। সকলগুলিরই বীজ বিদেশ হইতে আনীত হইয়া প্রথমে আমাদের দেশে রোপিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল ফসল আমাদের দেশের জলবায়ু সহ্য করিয়া আমাদের দেশের ফসলমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভুট্টা, গোল আলু, চীনা বাদাম, তামাক, বাঁধাকপি, বিটপালং, পেঁপে, নানাবিধ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধান্য, ইক্ষু, কদলী প্রভৃতি বিদেশ হইতে আনীত ফসল। এই সকল ফসল এক্ষণে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতেছে এবং কৃষকরাও এই সকল ফসল উৎপন্ন করিয়া বেশ লাভ করিতেছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আলু না খাইয়া কিরূপে যে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা এখন আমরা ধারণাই করিতে পারি না। আলু আজকাল আমাদের প্রধান তরকারী। এখনও পুরীধাম প্রভৃতি স্থানে দেবসেবায় আলু ব্যবহৃত হয় না, নৈবেদ্যাদিতে মর্ত্তমান কলা দেওয়া হয় না। এ সকল ম্লেচ্ছদেশসম্ভূত সামগ্রী। সুতরাং লাভজনক নূতন ফসলের আবাদ করিতে আমাদের কৃষকরা অসম্মত নহে এবং জনসাধারণও সেগুলি তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত।

(২) নূতন সারের ব্যবহার। পূর্ব্বে যে সকল সার কৃষকরা ব্যবহার করিত না, এক্ষণে তাহারা সেই সকল সার ব্যবহার করিতেছে। খইল পূর্ব্বে সাররূপে ব্যবহৃত হইত না, এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইরূপ অনেক জিলার নীচজাতীয় কৃষক অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করিতেছে। তবে অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করা হিন্দু আচারের অনুমোদিত নহে, তাই সকল কৃষক এখনও ইহা ব্যবহার করে না। সুতরাং যদি তাহাদের ধর্ম্মে না বাধে এবং যদি তাহারা দেখে যে, মূল্যবান সার প্রয়োগ করিয়াও তাহারা ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য হইতে অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা বিনা আপত্তিতে সেই সকল সারের ব্যবহার করিবে। সবজী সার (Green manuring) পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। ধঞ্চে, শোন, নীল, চীনাবাদাম প্রভৃতি শস্য আবাদ করিলে যে, জমির তেজ কমিয়া না গিয়া বর্দ্ধিত হয়, একথা পূর্ব্বে কৃষকগণ জানিত না। এক্ষণে অনেক কৃষক সবজী সার ব্যবহার করিতেছে। পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি নানাস্থানের কৃষকরা জমীতে শোনের চাষ করার পর পাটের আবাদ করিয়া, অত্যন্ত উর্ব্বরা জমীতে যে

পরিমাণ পাট জন্মায়, সেই পরিমাণ ফসল লাভ করিতেছে। হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে ধঞ্চের চাষ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে।

(৩) কৃষিপর্য্যায়। (Rotation of crops) পূর্ব্বে যেরূপ কৃষিপর্য্যায় অবলম্বিত হইত এক্ষণে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক জমীতে কোন্ শস্যের পর কোন্ শস্যের আবাদ করা উচিত, এই বিষয়ে কৃষকগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া উপকার পাইতেছে। একখণ্ড জমিতে অল্প সার দিয়া উপর্য্যুপরি ৪।৫ বৎসর চাষ করিয়া, পরে সেই জমি ২।১ বৎসর ফেলিয়া রাখিলে যে, উহার উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি হয়, এ জ্ঞানও কৃষকরা বৈজ্ঞানিক কৃষিতত্ত্ববিদ্ গণের নিকট শিক্ষা করিয়াছে।

(৪) কৃষিযন্ত্রের পরিবর্ত্তন। আমাদের কয়েকটি কৃষিযন্ত্রেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাঠের আক মাড়াই কল এখন আর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না; সকল কৃষকই লোহার আকমাড়া বিহিয়া মিল ব্যবহার করিতেছে। কাঠের কল অপেক্ষা লোহার কলের মূল্য অনেক বেশী হইলেও, লোহার কল হইতে অধিক পরিমাণে রস বাহির হয় বলিয়া প্রায় সকল কৃষকই লোহার কল ব্যবহার করিতেছে। পূর্ব্বে ক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য কাঠের ডোন্ ব্যবহৃত হইত এখন অনেকেই লোহার ডোন্ ব্যবহার করে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি, যে যন্ত্রটির ব্যবহার করিলে কৃষকের লাভ ভিন্ন লোকসান হয় না, সেই যন্ত্রই তাহারা আগ্রহের সহিত ব্যবহার করিতেছে।

উপরে লিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ যাহাই বলুন না কেন, আমাদের কৃষক কিন্তু অজবোকা বা "যা আছে তাই ভাল—উন্নতি চাই না" প্রকৃতির লোক নহে। তাহারা পেটের দায়ে ভাল করিয়া লাভ-লোকসান আলোচনা করিয়া নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করে বলিয়া যদি তাহারা conservative হয়, তাহা হইলে চিরদিন এইরূপ conservative থাকিলেই তাহাদের মঙ্গল এবং দেশের কল্যাণ হইবে।

যখন কৃষকের উন্নতি করা গভর্মেণ্টের প্রকৃত অভিপ্রায়, তখন কৃষককে মহামূর্খ ও conservative ভাবিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, অহঙ্কারে বুক ফুলাইয়া তাহার নিকট হইতে দূরে থকিলে চলিবে না; অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, তাহার সহিত মিলিয়া, মিশিয়া কৃষিকার্য্যে তাহার অভাবগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিয়া সেই গুলির বিমোচন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষুর সমক্ষে পরীক্ষাদ্বারা নব নব বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপকারিতা প্রদর্শন করিতে হইবে, তবে

সে গভর্মেণ্ট-প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিবে। আর পাশ্চাত্য উপদেশকবৃন্দকে সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিও তাঁহাদের কৃষিকার্য্য বিজ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়াছে, তথাপি ভারতবর্ষের কৃষকগণের সহিত তুলনা করিলে কৃষিবিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যৎসামান্য। ভারতবাসী অতি প্রাচীন জাতি। কত যুগযুগান্তর হইতে পুরুষানুক্রমে তাহারা কৃষিকার্য্য পরিচালন করিয়া আসিতেছে; ভারতবর্ষের বর্ত্তমান কৃষিকার্য্য যুগযুগান্তরব্যাপী পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। আর পাশ্চাত্য উপদেশকগণ—তাঁহারা ত ভারতবাসীর তুলনায় সে দিনের লোক; কৃষিবিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যৎকিঞ্চিৎ—নগণ্য। এই কথাটা মনে রাখিয়া আমাদের কৃষিকার্য্যের দোষগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া, বিচার করিয়া, যেন পাশ্চাত্য উপদেশকগণ আমাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে যত্নবান হয়েন। আমাদের প্রকরণ পদ্ধতিগুলি ভালরূপে না বুঝিয়া সেগুলির পরিবর্ত্তন বা সংস্কার করিতে গেলে "শিব গড়িতে বানর হইবে,"—হিতে বিপরীত হইবে।

আমাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে—আমাদের দেশের মঙ্গলকামনায় যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া গভর্মেণ্ট বিবেচনা করেন, তাহা তাঁহারা সম্পন্ন করুন,—কিন্তু দেশের লোকেরও এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকা উচিত নহে। যদি দেশের জমীদারগণ এই বিষয়ে সচেষ্ট হয়েন তবেই কৃষিকার্য্যের সম্যক্ উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া পালঙ্কের উপরে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায়, আলবোলার নল হস্তে করিয়া সুষুপ্ত। জমীদারগণকে এই সুষুপ্তি অবস্থা কাটাইয়া দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে যত্নবান হইতে হইবে। এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইলে, অবশ্য প্রথমে তাঁহাদিগকে অর্থব্যয় করিতে হইবে, কিন্তু ভবিষ্যতে কৃষিকার্য্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হইলে তাঁহাদের প্রচুর লাভ ভিন্ন যে ক্ষতি হইবে না, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রজার উন্নতি হইলে জমীদারের যে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আর অবস্থার উন্নতি হইলে কৃষকরা অধিক পরিমাণে কর দিতেও দ্বিরুক্তি করিবে না। ইতোমধ্যে বঙ্গদেশের দুই চারিজন জমীদার এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহাদের পন্থা অবলম্বন করিয়া অন্যান্য জমীদারগণকেও আমরা এই কার্য্যে যত্নবান হইবার জন্য একান্ত অনুরোধ করিতেছি। প্রজার শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও যদি জমীদার তাহাকে রক্ষা করিতে যত্নবান না হয়েন, তাহা হইলে প্রজার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের

জমীদারগণ যদি এখনও তাঁহাদের সুষুপ্তি অবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েন, তবেই দেশের মঙ্গল, নতুবা—"তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ব্যর্থ সন্ধ্যা।

—:*:—

বেলা বহে যায়, স্নিগ্ধ ছায়ায়
আবৃত ধরণীতল,
আসি ফুল বনে প্রতি আলবালে
কে আজি সেচিবে জল!

কে দিবে তরুণী মাধবী লতায়
স’পি’ সহকার বরে!
নব মল্লিকা ফুটিয়া শোভিবে
কাহার কবরী ‘পরে!

হরিণ শিশুটি ছুটিয়া আসিয়া
লুকাবে কাহার বুকে!
কাহারে ঘিরিয়া কপোতকপোতী
নৃত্ত করিবে সুখে।

সন্ধ্যা তিমির আসিছে ঘনা’য়ে,
শূন্য কানন মাঝে
তাহারি চরণ মঞ্জীর যেন
নীরবে হৃদয়ে বাজে!

শ্রীরমনীমোহন ঘোষ।

পাষাণের কথা।

—:*:—

(৭)

সম্রাট আসিতেছেন। আবার উৎসব আসিতেছে, কিন্তু জীবনের প্রথমে মানবজাতির যে উৎসব দেখিয়াছিলাম, তেমন উৎসব আর কখনও দেখিব না। বলিয়াছি, পরে কত শত উৎসব দেখিয়াছি, কিন্তু সেরূপ আনন্দ আর কখনও অনুভব করি নাই। প্রত্যেক উৎসবেই কিছু না কিছু নূতনত্ব ছিল, নূতনত্ব দেখিয়া আনন্দ হইত বটে, কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী; আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ ভোগ আর কখনও করি নাই। কারণ বুঝিয়াছ কি? প্রথম উৎসবে মানবজাতি নূতন ছিল। এখন মানবের নূতনত্ব কাটিয়া গিয়াছে, মানবসংশ্লিষ্ট সমস্ত নূতনত্বের জ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম উৎসব যেন পুষ্পোৎসব, আটবিক রাজ্যের সমস্ত পুষ্পভাণ্ডার বহিয়া আনিয়া আটবিক নগরবাসী আমাদিগের চরণপ্রান্তে উপস্থিত করিয়াছিল। দ্বিতীয় উৎসব সাজ-সজ্জা ও বাহ্যাড়ম্বরের উৎসব, সে উৎসব আমাদিগের জন্য বটে, কিন্তু তথাপি যেন আমাদিগের নহে। তখনও মনে হইত, অতীত কালের পরপারে বসিয়া এখনও মনে হয় সে উৎসব আমাদিগের নহে, সে উৎসব কণিষ্কের। তথাগতের শরীর গর্ভস্তূপের সম্মাননার জন্য উৎসব আরব্ধ হয় নাই, সেই উৎসব কুরুবর্ষ হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সে উৎসব বিশাল শক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর কণিষ্কের। মহারাজরাজাধিরাজ দেবপুত্রসাহী কণিষ্ক তীর্থযাত্রায় আসিতেছেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উৎসবের আয়োজন। মেষচর্ম্মপরিহিত পর্ব্বতবাসীর পক্ষে সেরূপ উৎসবের আয়োজন করা অসম্ভব। সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের নিমিত্ত সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিয়া উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। ইহা আটবিকজাতির উৎসব নহে, পর্ব্বতের সানুদেশবাসী বর্ব্বরজাতির উৎসব নহে, সপ্তদ্বীপবাসী প্রাচীন সভ্যজগতের সমগ্র মানবজাতির সমবেত চেষ্টার ফল। ইহাতে নগরবাসিগণ বন হইতে পত্রপুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনে নাই, পর্ব্বতবাসী বর্ব্বরজাতি সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্যানজাত অনায়াসলভ্য পুষ্পরাশি ভারে ভারে আনিতে পারে নাই। প্রাচীন আটবিকনগরবাসিগণের বংশধরেরা দূরে পর্ব্বতশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া উৎসব দর্শন করিয়াছিল। তাহারা উৎসব ক্ষেত্রের যোজনের মধ্যেও আসিতে সাহসী হয় নাই। এমন কি

মেষচর্ম্মপরিহিত যে পথপ্রদর্শক গভীর বন ভেদ করিয়া শকরাজপুরুষকে আমাদের সমীপে আনয়ন করিয়াছিল, তাহাকে পর্য্যন্ত আসিতে দেওয়া হয় নাই। ক্ষুদ্র ভিক্ষুসঙ্ঘে শুনিতাম যে, চীনযুদ্ধের জন্য সমবেত বিশাল বাহিনী লইয়া সম্রাট তীর্থযাত্রায় আসিতেছেন, পঞ্চ লক্ষ পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে তিনি মথুরা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। এই পঞ্চ লক্ষের সহিত সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আসিতেছেন, তাঁহাদিগের যাত্রার ব্যবস্থা ও শুশ্রূষার জন্য সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আয়োজন হইয়াছে। সেই পঞ্চ লক্ষের মধ্যে শকদ্বীপ, বাহ্লীক, কপিশা, গান্ধার উরস, কাশ্মীর, টক্ক, ত্রিগর্ত্ত, উদ্যান, মরু, জালন্ধর, মায়াপুর, সুরসেন, মৎস্য, অহিচ্ছত্র, কান্যকুব্জ, বারাণসী, করুষ, কীকট, তীরভুক্তি, এমন কি রাঢ় পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশবাসী সৈনিক আছে। এতদ্ব্যতীত সকোন শিরস্ত্রাণধারী দুর্দ্ধর্ষ শকসৈন্য আছে; কুষাণবংশের অভ্যুত্থানের সহিত দলে দলে আর্য্যাবর্ত্তবাসী যবন আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া শকসম্রাটের বেতন-ভোগী হইয়াছে, চর্ম্মপরিহিত শক অশ্বারোহিগণের আক্রমণের তীব্রবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কাশ্মীরের উত্তর সীমান্তবাসী তুষারধবল দরদজাতি শকসম্রাটের বশীভূত হইয়াছে, দলে দলে তাহারাও সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। দরদগণের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু জাতি আর নাই, সারমেয়ের ন্যায় তাহাদিগের দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল, তাহারা ঘ্রাণে অনুভব করিতে পারে, নিকটে শত্রু আছে কি না; তৃণমণ্ডিত পথে মনুষ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহারা বহুদূরে চলিয়া যাইতে পারে। শকসৈন্যের মধ্যে দরদজাতি ব্যতীত অপর কোনও জাতি চরের কার্য্য করিতে পারে না। ক্ষুদ্র ভিক্ষুসঙ্ঘে এইরূপ কত কথাই হইত, আমরা শুনিয়া যাইতাম ও প্রথম উৎসবের কথা ভাবিতাম।

পঙ্গপালের ন্যায় শ্রমজীবিগণ আসিয়া বিশাল অরণ্যের বৃক্ষসমূহ নির্ম্মূল করিল। একদিন দূরে উচ্চ মৃৎপিণ্ড দৃষ্ট হইল, কে যেন আমাদিগকে বলিয়া দিল, সেই নগর—যে নগরের অধিবাসী আমাদিগকে পর্ব্বতের সানুদেশের শয্যা হইতে উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। যে নগরবাসীরা তথাগতের শরীর স্তূপগর্ভে স্থাপিত করিয়াছিল তাহাদিগের বহু যত্নের, বহু শ্রমের নগর মৃৎপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে! যে ভীষণদর্শন বিশালতোরণপথে আমরা নগরমধ্য হইতে প্রান্তরে আনীত হইয়াছিলাম সে তোরণের চিহ্নমাত্র নাই, বৃহৎ মৃৎপিণ্ডের উপরে কে যেন দুইটি ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ড স্থাপন করিয়াছে, কে যেন

আমাদিগকে বলিয়া দিল, উহাই বিশাল তোরণের ধ্বংসাবশেষ। ভুলি নাই, বিশাল আয়োজনের কলরবের মধ্যেও দেখিতে পাইলাম, তোরণ হইতে যেন দেবযাত্রা নির্গত হইতেছে; মনে পড়িল, কালভারাবনতদেহ মহাস্থবির, চিরস্মরণীয় পৌরববংশজ সিংহদত্ত, আর অগরাজু। সিংহদত্তের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে, বর্ষাগমে সিন্ধু নদের প্লাবনে তৃণমুষ্টির ন্যায় আর্য্যাবর্ত্তের দেশীয় ও বিদেশীয় রাজগণ শকজাতির সম্মুখে ভাসিয়া গিয়াছেন, আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমান্তে জলপথাবৃত সমতটেও শকসম্রাটের শক্তি অনুভূত হইয়াছে। সুদীর্ঘ হস্তে কণিক রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন। চিরতুষারাবৃত কুরুবর্ষের উত্তর মরু হইতে বাহ্লিক ও মিস্রাইমের পণ্যবাহী ভৃগুকচ্ছ পর্য্যন্ত রাজার অঙ্গুলী হেলনে কম্পিত হইতেছে। দূরদর্শী পৌরব সত্য বলিয়াছিলেন, সদ্ধর্ম্মেরও দিন ফিরিয়াছে, নতুবা এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ভেদ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে পথ-প্রদর্শক আনিয়া শকরাজপুরুষ তথাগতের শরীর গর্ভের অনুসন্ধানে আসিবে কেন?

যাহারা সম্রাটের অভ্যর্থনার উদ্যোগ করিতেছিল, তাহারা অরণ্যের বৃক্ষ-রাজি নির্ম্মূল করিয়া সেই কাষ্ঠে নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিল; সেই দারু নির্ম্মিত নগরের কয়েক খণ্ড পাইয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছ যে, প্রাচীনকালে প্রস্তর শিল্প ছিল না, সকলেই চিরক্ষুণ্ণমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছ; জানিয়া রাখিয়াছ, এ-ই একমাত্র পথ। পথিপার্শ্বে বনান্তরালে যে উদ্দিষ্ট শত্রু লুক্কায়িত থাকিতে পারে, তাহা ভাব নাই। স্তূপের পার্শ্বে কারুকার্য্যশোভিত কাষ্ঠখণ্ড পাইয়া স্থির করিয়াছ, পাষাণ নির্ম্মিত স্তূপের পূর্ব্বে এইস্থানে দারু নির্ম্মিত স্তূপ ছিল, কিন্তু এ কথা কেহ কখনও কোথাও স্বপ্নেও ভাব নাই যে, স্তূপে আগত তীর্থযাত্রীর জন্য দারু নির্ম্মিত প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে, তোমাদিগের জন্য অতীত কাল স্তরে স্তরে ধ্বংসাবশেষ সাজাইয়া রাখে নাই, প্রকৃতির আলোড়নে ঊর্দ্ধের স্তর নিম্নে গিয়াছে, নিম্নের স্তর ঊর্দ্ধে আসিয়াছে, মধ্যের স্তরগুলি অপর দেশে চলিয়া গিয়াছে। অতীতের গতি নিরূপণ করিবার জন্য যে বিশ্লেষণ শক্তির আবশ্যক তাহা সকলের থাকে না, তাহা বহুশিক্ষার ফল, বহুকালব্যাপী শিক্ষার ফল, এক দিনে তাহার লাভ হয় না। শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ স্তূপের দক্ষিণ তোরণের সান্নিধ্যে কূপ খননকালে কারুকার্য্য-শোভিত যে কাষ্ঠ খণ্ড পাইয়াছিলেন, তাহা প্রস্তর শিল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নহে, তাহা শকাধিকার কালের। শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইও না। আমি অতীত যুগের সাক্ষী, আমার কথা মানিয়া লইও। আমার যদি সময় নিরূপণ করিবার ক্ষমতা থাকিত

থাকিত তাহা হইলে আমি তোমাদিগের ন্যায় বর্ষ, মাস, দিবস সম্বলিত কাল গণনা করিয়া দিতাম। তোমরা প্রত্যক্ষবাদী, প্রত্যক্ষ প্রমাণ না দেখিয়া কোন কথা বিশ্বাস করিতে চাহ না; আমার যদি চক্ষু থাকিত তাহা হইলে আমি বলিতাম, আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তোমাদিগের ভাষায় কি বলিব জানি না ইন্দ্রিয়-বিহীন পাষাণের কি অনুভব শক্তি আছে, সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ তাহার কণামাত্র তোমরা জানিয়াছ, সৃষ্টিকর্ত্তার শিল্পকলার আভাস-মাত্র পাইয়াছ, সেই আভাস প্রত্যক্ষ জানিয়া আমার কথা বিশ্বাস করিয়া লও। শকাধিকার কালে—কণিষ্কের রাজত্বকালে স্তূপসন্নিধানে যে দারুময় নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তোমাদিগের আবিষ্কৃত কাষ্ঠখণ্ডগুলি সেই দারুময় নগরের অংশমাত্র, মানবজাতির সভ্যতার প্রারম্ভের নহে।

নগর নির্ম্মিত হইল, বিশাল শক সাম্রাজ্যে যাহা কিছু দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল রাজপুরুষগণ তাহাই আনিয়া দারুময় নগর শোভিত করিল। প্রাচীন আটবিক নগরবাসীরা কেহ কখনও এত দ্রব্যসম্ভার একত্র হইতে দেখে নাই, তাহারা বহু যত্নে—বহু পরিশ্রমে অশ্মরাশি সঞ্চিত করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অর্থসাহায্যে শরীরগর্ভস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; রাজপুরুষগণের আদেশে আমাদিগের প্রাচীন বাসস্থান সেই পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে রাশি রাশি পাষাণ দারুময়নগরের পথ-নির্ম্মাণের জন্য আনীত হইল। পথের আচ্ছাদনের পাষাণে সিন্দুর লেপন করিয়া বর্ব্বর গ্রামবাসিগণ তাহার সম্মুখে শূকর কুক্কুট বলি দিয়া থাকে। পথ আলোকিত করিবার জন্য যে দীপস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দেখিলে তোমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতে; ভূমিশয্যায় শয়ান বর্ত্তুলোদরগণের বক্ষে দাঁড়াইয়া বনদেবী চম্পক বৃক্ষ হইতে পুষ্প আহরণ করিতেছেন, দেবীর মস্তকোপরি চম্পক বৃক্ষের শাখায় দোদুল্যমান কাচমণ্ডিত দীপাধার, তোমরা মথুরার স্তূপ বেষ্টনীর স্তম্ভে এইরূপ মূর্ত্তি নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে, দারুময় নগরে প্রতি রাত্রিতে এইরূপ লক্ষ লক্ষ দীপাধার ব্যবহৃত হইয়াছিল, কল্পনা করিয়া রাখ কত অর্থব্যয়ে কত পরিশ্রমে তীর্থযাত্রিগণের আবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে। আমি এখন যেরূপ ভাবিতেছি, নগর তোরণের ধ্বংসাবশিষ্ট পাষাণগুলিও বোধ হয় সেইরূপই ভাবিয়াছিল।

সম্রাট আসিতেছেন। উত্তরে উপত্যকার প্রান্তে মেঘের ন্যায় অশ্বারোহীর শ্রেণী দেখা দিয়াছে, মেঘের পর মেঘ উত্তরপ্রান্তে দৃষ্ট হইয়াছে, ক্রমে নিকটে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহী সৈন্যে পরিণত হইয়াছে। সূর্য্যালোকে প্রতিভাসিত

হইয়া তাহাদিগের উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণগুলি দূরে তারকামালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল কিন্তু নিকটে আসিয়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় দেখাইতেছে। ইহারা শকজাতীয় অশ্বারোহী। যে অনুন্নতনাসা মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত অশ্বারোহিগণ নগর ধ্বংস করিয়াছিল ইহারা সেরূপ নহে। ইহাদিগের বর্ণ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও অবয়বসমূহ সুগঠিত। সমস্ত অশ্বারোহীই রজতশুভ্রবর্ম্মাচ্ছাদিত। তাহাদিগের এক হস্তে তল্ল ও অপরহস্তে বল্গা, কটিদেশে ক্ষুদ্র অসি, এতদ্ব্যতীত কাহারও কোনরূপ অস্ত্র ছিল না। শুনিয়াছি, সুদূর প্রতীচ্যে রোমক সৈনিকগণ এইরূপে সজ্জিত হইত। সর্পের ন্যায় অশ্বারোহিশ্রেণী আসিয়া স্তূপ বেষ্টন করিল। প্রভাত হইতে অনুমান দ্বিপ্রহরকাল পর্য্যন্ত কেবল অশ্বারোহী সৈন্যই আসিয়াছিল, তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্রের বা বেশভূষার কোনই পার্থক্য ছিল না। অশ্বারোহিশ্রেণীর পর বন্যার স্রোতের ন্যায় পদাতিক সৈন্য আসিতে আরম্ভ করিল। নানা দেশ হইতে নানারূপ পরিচ্ছদধারী সৈনিক, পদাতিক সৈন্যের মধ্যে দৃষ্ট হইল। স্বল্পপরিচ্ছদপ্রিয় মগধবাসী, উষ্ণীষধারী কান্যকুব্জবাসী, নানাবর্ণে রঞ্জিত পরিচ্ছদপ্রিয় সৌরসেন, উষ্ণীষে লৌহচক্রধারী জালন্ধরবাসী, দীর্ঘকায় বস্ত্রমণ্ডিত টক, মলিনবেশধারী শ্বেতবর্ণ কাশ্মীর ও গান্ধারবাসী ও অল্পসংখ্যক চর্ম্মাবৃত শক সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হইল। যতক্ষণ সূর্য্যালোক ছিল ততক্ষণ পদাতিক সৈন্যই দেখিতে পাইয়াছিলাম, সন্ধ্যাসমাগমে স্তূপের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগ সহস্র সহস্র উল্কার আলোকে দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন দূর হইতে শকটচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি শ্রুত হইল, বহুসংখ্যক দ্বিচক্র ও চতুশ্চক্র অশ্ববাহিত রথ আসিতে আরম্ভ হইল; শক সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্যগণ এই সকল রথারোহণে আসিলেন; সেই শব্দই শ্রুত হইল। শ্বেতবর্ণ ষোড়শ অশ্ব যোজিত রথে কান্যকুব্জের মহাক্ষত্রপ বনস্পর আসিলেন, তাঁহার সহিত শতাধিক রথে তাঁহার পরিজনমণ্ডলী আসিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উষ্ট্র-চতুষ্টয় যোজিত রথে মগধ-বিজয়ী মহাক্ষত্রপ খরপল্লান আসিলেন। অশ্বারোহণে স্ত্রীমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া তক্ষশিলার মহাক্ষত্রপ মহাদণ্ডনায়ক লল্ল আসিলেন, সমবেত জনসঙ্ঘ বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে কোমলাঙ্গী কাশ্মীর গান্ধার ললনাগণের নিপুণ অশ্বচালনা দেখিতে লাগিল; কারণ ইহার পূর্ব্বে মহাকোশলে অশ্বপৃষ্ঠে স্ত্রীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় নাই। হস্তিপৃষ্ঠস্থাপিত দারুনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট কপিশার মহাক্ষত্রপ বেস্পশি আসিলেন, তাঁহার সহিত মহাকায় গজসমূহের পৃষ্ঠে স্থাপিত বৃহৎ সিংহাসনে মহিষীকা পরিবৃত

কপিশ্যা ও বাহ্লিক-মহিলা-মণ্ডলী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে রজনী দ্বিপ্রহর কাল পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত হইতে সমুপস্থিত অমাত্য ও সভাসদ্‌মণ্ডলী উপস্থিত হইলেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে বোধ হইল, যেন দূরে পর্ব্বতের সানুদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে; ক্ষণেকের মধ্যেই বোধ হইল, প্রজ্বলিত অগ্নি দ্রুতবেগে স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দুই দণ্ড পরে স্তূপের চতুষ্পার্শ্বে ও কাষ্ঠনির্ম্মিত নগরে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে, সম্রাট আসিতেছেন—কেবল এই শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। অগ্নি নিকটবর্ত্তী হইলে দৃষ্ট হইল, পাষাণাচ্ছাদিত পথের পার্শ্বে উল্কা হস্তে সহস্রাধিক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে স্তূপাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহাদিগের বাহন ক্ষীণ দীর্ঘকায় সিন্ধুদেশীয় অশ্ব, পরিচ্ছদ শ্বেতবর্ণ ও দক্ষিণ হস্তে সপ্তহস্ত পরিমিত উল্কা, দ্বিসহস্র উল্কার আলোকে যে পথ আলোকিত হইতেছিল সেই পথে দুইজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে স্তূপাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, একজন মহারাজ রাজাধিরাজ দেবপুত্র কণিষ্ক ও অপর জন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ হুবিষ্ক। সম্রাটের আকার দীর্ঘ, মুখ শ্মশ্রুমণ্ডিত, নাসিকায় ও দক্ষিণ গণ্ডে দীর্ঘ আঘাত চিহ্ন; দেখিলেই বোধ হয়, তাঁহার জীবনের অধিকাংশই যুদ্ধযাত্রায় অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার কটিদেশে সার্দ্ধদ্বিহস্ত পরিমিত খড়্গ। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুবিষ্ক—দীর্ঘকায়, কোমলাঙ্গ, শ্মশ্রুবিরহিত, নবীন যুবক; আজীবন সুখানুসন্ধানের চিহ্ন যেন তাঁহার মুখে অঙ্কিত রহিয়াছে। অশ্বারোহিশ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে বিংশতি বা ততোঽধিক পরিচারক দ্রুতগামী অশ্বারোহণে আসিতেছিল।

সম্রাট আসিতেছেন, শুনিয়া কাষ্ঠ-নির্ম্মিত-নগরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পাষাণাচ্ছাদিত পথাভিমুখে ধাবিত হইল। জনতার পেষণে বনস্পরের রত্নখচিত উষ্ণীষ ধূলিতে লুণ্ঠিত হইল; দণ্ডনায়ক লল্লের শিরস্ত্রাণ পাদপেষণে চূর্ণ হইয়া গেল। বেস্পশির মহাদেবী জনতার তাড়নায় স্তূপের অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আর সম্রাটের আগমন দর্শন ঘটিল না। অত্যন্ত পীড়িত হইয়া খরপল্লান খড়্গে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখেন, তাহা নিষ্কাশনের উপায় নাই। প্রধান অমাত্য, সভাসদ্ ও পরিচারক, দৌবারিক ও ভিক্ষু, অশ্বারোহী ও পদাতিক, স্ত্রী ও পুরুষ সেই বিশাল জনসঙ্ঘে একত্র মিলিত হইয়া গেল, পদমর্য্যাদা অন্তর্হিত হইল। সম্রাট উপস্থিত হইলে তাঁহার বাহিনীর জন্য পথ মুক্ত হইল বটে; কিন্তু জয়ধ্বনি ব্যতীত তাঁহার আর কোনও অভ্যর্থনা

হইল না। তিনি আসিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত নগর হইতে দূরে পটমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রমশঃ যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে পূর্ব্বদিকের অন্ধকার দূর হইতে লাগিল, শিশিরসিক্ত প্রভাতে উৎসবের দিনে দৌবারিক ও প্রহরী ব্যতীত সমস্ত নগর সুষুপ্তিমগ্ন অবস্থায় দৃষ্ট হইল। প্রভাতে উৎসব আরব্ধ হইল; সাম্রাজ্যের উৎসব আটবিকনগরের উৎসবের ন্যায় নহে, তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা বিশৃঙ্খলতার লেশমাত্র দেখা যায় নাই। ধীরে ধীরে কাষ্ঠনির্ম্মিত নগরের চতুষ্পার্শ্ব হইতে সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলী স্তূপ-বেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া সমাগত হইলেন। প্রাচীন স্তূপ নবসংস্কারের জন্য নূতন বলিয়া বোধ হইতেছিল, মহাস্থবির শর্ব্ব স্তূপের আর কোনও সাজসজ্জার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তবে রাজপুরুষগণ বেষ্টনীর বাহিরে ও পরিক্রমণের পথে যথাযোগ্য সজ্জা প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরেই উৎসব আরব্ধ হইল। রাজস্কন্ধাবার হইতে বেষ্টনীর পূর্ব্ব তোরণ পর্য্যন্ত পাষাণ নির্ম্মিত পথ বহুমূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইল, সমান্তরালে প্রোথিত হৈমদণ্ডশ্রেণীর উপরে মণিমুক্তা-খচিত বহুমূল্য পট্টবাস স্থাপিত হইল, বিবিধ সুদৃশ্য বর্ণরঞ্জিত কৌষেয় বস্ত্রে সুবর্ণদণ্ডগুলি মণ্ডিত হইল, পথের আচ্ছাদনে বহু দূরদেশ হইতে আনীত বহুযত্নে সংগৃহীত পুষ্পরাশি বিক্ষিপ্ত হইল, পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে গন্ধবারির কৃত্রিম প্রস্রবণ নির্ম্মিত হইল। সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরে পথের উভয় পার্শ্বে একশ্রেণী পদাতিক ও একশ্রেণী অশ্বারোহী সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল, ইহারা শোভাবর্দ্ধন করিল বটে কিন্তু ভীত দর্শকগণের দৃষ্টি ও গতি উভয়ই রোধ করিল। অল্পক্ষণ পরে নানাদিগ্দেশ হইতে সমাগত ভিক্ষুগণ স্তূপাভিমুখে আসিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহারা বহু কষ্টে যোদ্ধৃগণের পংক্তি চতুষ্টয় ভেদ করিয়া ভীতিচকিত পাদক্ষেপে মহার্ঘবস্ত্রদলনহেতু স্খলিতচরণে বহুকষ্টে বেষ্টনীর তোরণদ্বার প্রাপ্ত হইলেন। সৈনিকগণ ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া যেন অনিচ্ছাপূর্ব্বক সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, কাষায় বা গৈরিকধারী সম্প্রদায় যেন তাহাদিগের অনুগ্রহের পাত্র, তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিবার কোনই কারণ নাই। তখন মনে হইল যে, আর্য্যাবর্ত্তে নূতন বিপ্লবে শাসকের ও শাসিতের স্থানবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, পাশবিক বলে বলীয়ান শকজাতি সঙ্ঘের চূড়ামাত্র স্পর্শ করিয়াছে বটে; কিন্তু সঙ্ঘের প্রকৃত মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই। সম্রাট ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন সেই জন্যই সাধারণে সঙ্ঘের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ সম্মান দেখাইয়া থাকে;

অতিরিক্ত নহে। সম্রাট বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, বাবিরুশ বা ইরাণীয় ধর্ম্মের প্রতিও তদনুরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং সৈনিকগণের সদ্ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইবার কোনই কারণ ছিল না। কিয়ৎকাল পরে সম্রাট স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের মহাক্ষত্রপগণ পরিবৃত হইয়া স্তূপের সান্নিধ্যে আসিলেন। তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে পরিচারকগণ আতপত্র ও ব্যজনী লইয়া আসিতেছিল, পশ্চাতে মহারাজ হুবিষ্ক ও শকজাতীয় ক্ষত্রপগণ আসিতেছিলেন। তিনি প্রথম তোরণে উপস্থিত হইলে ভিক্ষুগণ ও দ্বিতীয় তোরণে উপস্থিত হইলে মহাস্থবিরগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন ও মহাস্থবির পার্শ্বকে অগ্রণী করিয়া অপরাপরসঙ্ঘ স্থবিরগণ তাঁহাকে স্তূপ অর্চ্চন ও প্রদক্ষিণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সুবর্ণগৌরকান্তি নবীন যুবক হুবিষ্ককে পার্শ্বে লইয়া সম্রাট ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুগমন করিয়া স্তূপ প্রদক্ষিণ করিলেন ও অর্চ্চনার জন্য পূর্ব্ব তোরণের সম্মুখীন হইলেন। ফিরিবার সময় সম্রাটের কটিবদ্ধ অসি অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার স্তূপগাত্রে লাগিয়া গভীর শব্দ উৎপাদন করিল। সম্রাট শব্দ শুনিয়া চিন্তান্বিত হইলেন ও অর্চ্চনার সময় অন্যমনস্ক ছিলেন। অর্চ্চনান্তে কোষনিবদ্ধ অসি কটিবন্ধ হইতে মুক্ত করিয়া সম্রাট ধীরে ধীরে স্তূপগাত্রে আঘাত করিতে লাগিলেন। বিস্মিত হইয়া প্রধান অমাত্যগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আঘাত করিবার পর বিশাল প্রস্তর খণ্ডে খড়্গের অগ্রভাগ লাগিয়া ধাতু পাত্রদ্বয়ের সংঘর্ষণের ন্যায় শব্দ হইল। শব্দ শুনিয়া সম্রাট কণিষ্ক ও মহাস্থবির পার্শ্ব চমকিত হইলেন, সম্রাটের আদেশে দীর্ঘকায় কপিশাবাসী সৈনিক চতুষ্টয় স্কন্ধপ্রয়োগে গুরুভার পাষাণ স্থানচ্যুত করিয়া স্তূপের পার্শ্বে প্রবিষ্ট করাইল। শতাব্দীদ্বয় পরিমিত কালের পর গর্ভগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল, সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সম্রাট আসিয়াছেন, যক্ষগণের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে; কনিষ্কের স্পর্শমাত্রে গর্ভগৃহের লুক্কায়িত দ্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে এইরূপ শব্দই ঘোষিত হইতে লাগিল। পার্শ্ব শরীর নিধানের অনুসন্ধানে গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন কিন্তু সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিলেন, ইতোমধ্যে গর্ভগৃহের দ্বারের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বালিত হইল ও কয়েকখণ্ড প্রজ্বলিত কাষ্ঠ গর্ভগৃহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল; পরে কতিপয় পদাতিকগণ প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড লইয়া গর্ভগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল ও সমস্ত গৃহটি পর্য্যটন করিয়া আসিল। মহাস্থবিরগণের পশ্চাতে সম্রাট্ ও হুবিষ্ক

গর্ভগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাষাণনির্ম্মিত আধারের অর্চ্চনা করিলেন, কম্পিত হস্তে বর্ষীয়ান স্থবিরগণ গুরুভার আধার উন্মোচন করিয়া প্রথমে সুবর্ণ-নির্ম্মিত ও পরে তন্মধ্যস্থ স্ফাটিক শরীর-নিধান উত্তোলন করিলেন। সেই সময় কে যেন আসিয়া শত শত বিগ্রহের রক্ত-পিপাসু সম্রাটের জানুদ্বয় ভগ্ন করিল, স্ফাটিকাধার উন্মুক্ত হইবামাত্র ভীষণদর্শন নিষ্ঠুর শকসম্রাট ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইলেন। কে জানে সুদূর অতীতে শাক্যরাজকুমারের কি প্রতিভা ছিল, কি মোহিনী শক্তি ছিল, যাহার বলে নির্ম্মম—কঠোর নরঘাতকের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। সম্রাটের সহিত গর্ভগৃহস্থ ব্যক্তিমাত্রেই শরীর নিধানের সম্মুখে নতশীর্ষ হইলেন, সংক্রামকতা ক্রমে গর্ভগৃহের বহির্দ্দেশে ও পরে বেষ্টনীর বহির্দ্দেশে ব্যপ্ত হইল; আনন্দে ও গর্ব্বে পার্শ্বের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি তখনও অগরাজুর প্রস্তুত স্ফাটিকাধার হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তখন বুঝিলাম, শরীর-নিধান রক্ষা কালে বর্ষীয়ান মহাস্থবির কি বলিয়াছিলেন। শকপ্লাবন আসিয়াছে, কপিশা হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ শকজাতির হস্তগত হইয়াছে, প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা প্রায় ভাসিয়া গিয়াছিল কিন্তু যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহারই ফলে আর্য্যাবর্ত্তের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। সত্য সত্যই প্রাচীন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া মরুবাসী বর্ব্বর শকজাতির মহৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। শকজাতির শকত্ব প্রায় লুপ্ত হইয়াছে,। বিশাল শকসাম্রাজ্যের অধীশ্বর সেই জন্যই অঙ্গুলি পরিমিত স্ফাটিকাধারে নিবদ্ধ অস্থিখণ্ডের সম্মুখে নতশির হইয়াছেন। বর্ষীয়ান মহাস্থবিরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, শকজাতি ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সদ্ধর্ম্মের উন্নতির দিন আসিয়াছে, নবীন গৌরব মৌর্য্যাধিকার কালের অতীত গৌরবের স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছে। শরীর-নিধান হস্তে লইয়া পার্শ্ব ও অপরাপর সকলে গর্ভগৃহের বাহিরে আসিলেন। সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্য ও তাঁহাদিগের মহিলা-গণ অস্থিখণ্ড স্পর্শ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। সম্রাটের আদেশে স্ফাটিক সুবর্ণ ও পাষাণনির্ম্মিত আধার যথাস্থানে স্থাপিত হইল, সশব্দে গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল; যাহারা দ্বার রুদ্ধ করিল তাহারা জানিত না যে, তাহারা চিরকালের নিমিত্ত তথাগতের শরীর-নিধান মানবের দৃষ্টির বহির্ভূত করিতেছে। সম্রাটের যাত্রা সফল হইয়াছে, গর্ভগৃহের দ্বারের সম্মুখে গান্ধার হইতে আনীত নবোৎকর্ষ প্রাপ্ত ভাস্করশিল্পের নিদর্শন কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইল, যেন গর্ভগৃহের দ্বার আর কেহ স্পর্শ না করিতে পারে। ইহার পূর্ব্বে কখনও মূর্ত্তি দেখি নাই। আমাদিগের পাত্রে চিত্র আছে বটে কিন্তু মূর্ত্তি নাই; সদ্ধর্ম্মে মূর্ত্তি

পূজা এই সময়ে আরব্ধ হয়। ইহার পূর্ব্বে চিত্রে চরণদ্বয় তথাগতের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিত। সম্রাটের আদেশে স্থাপিত মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর, অত্যন্ত প্রিয়দর্শন; তখন ভাবিতাম ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই নাই, হইতে পারে না, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মূর্ত্তিনির্ম্মাণের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। যবন শিল্পী কর্ত্তৃক শিক্ষিত ভারতবাসী মূর্ত্তি-তক্ষণে অপেক্ষাকৃত পারদর্শিতা-লাভ করিয়াছিল। সে সমস্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইত, গান্ধারের মূর্ত্তিগুলি যবনের মূর্ত্তি ও মধ্যদেশের মূর্ত্তিগুলি আর্য্যাবর্ত্তবাসীর মূর্ত্তি। সন্ধ্যাসমাগমে পূর্ব্বের ন্যায় উল্কাবাহী অশ্বারোহী পরিবৃত হইয়া সম্রাট্ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন; দেখিতে দেখিতে স্বপ্নের ন্যায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত শিবির ভাঙ্গিয়া গেল। অরণি সংগ্রহ করিতে আসিয়া পার্ব্বত্য উপত্যকাবাসিগণ মহাবনের কাষ্ঠ মহাবনে লইয়া গেল। আমাদিগের পূর্ব্বসহচর ভিক্ষুগণ অতি সন্তর্পণে আসিয়া ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম অধিকার করিলেন।

কণিষ্কের বিশাল বাহিনী সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় চীনপ্রান্ত আক্রমণ করিল শিলাসঙ্কুল তটবিক্ষিপ্ত ঊর্ম্মিরাশির ন্যায় পরাজিত সৈন্য কাশ্মীরে আশ্রয়-লাভ করিল। কুরুবর্ষ চীনসৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল, পারদগণ কপিশা অধিকার করিল, বিংশতিবর্ষব্যাপী চেষ্টায় বর্ষীয়ান সম্রাট সসৈন্যে মরুপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তখন চীনসৈন্যের অধিনায়ক পাঞ্চাত্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন, জিঘাংসাবৃত্তি সফলা হইল, কিন্তু কণিষ্ক আর আর্য্যাবর্ত্তে ফিরিয়া আইসেন নাই। বাহ্লীকে তাঁহার সমাধি বহুদিন পর্য্যন্ত হূনগণের অর্চ্চনার স্থান ছিল। ক্ষুদ্র সঙ্ঘের ভিক্ষুগণের কথোপকথনে যাহা জানিয়াছি তাহাই বলিলাম।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোকে আঁধারে।

আলোকিত স্থান বলে,—"আমি বড় ভবে।"
অন্ধকার উঠি' বলে,—"আলো আছে যবে।"

শ্রীহরিপদ মজুমদার।

মৃত্যু-মিলন।

তৃতীয় খণ্ড।

—:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:◌:—

দূত।

বর্ষার শেষ সময় এক দিন মধ্যাহ্নে রাজা সংবাদ পাইলেন, অতিরিক্ত বর্ষণে বিপুলবারিপ্রবাহচঞ্চলা তরঙ্গিণীর কূল ছাপাইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। কূল ছাপাইলে জলরাশি নগরোপকণ্ঠ প্লাবিত করিবে। সর্ব্বাগ্রে আশ্রমগৃহপ্রাঙ্গণ জলমগ্ন হইবে। রাজা সংবাদ পাইবাই কর্ম্মচারীদিগকে যাহাতে জল সহজে কূল ছাপাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং সে কার্য্যের পরিদর্শনকল্পে যাত্রা করিলেন।

রাজা নদীতীরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দূর হইতে জল-কল্লোল শুনিতে পাইলেন। তিনি আশ্রম-সন্নিহিত হইয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা যেমন স্মরণীয় তেমনই ভীষণ। যে জলবেণীরম্যা স্রোতস্বতী অন্য সময় নগর-নিতম্বে কাঞ্চীবৎ শোভা পায়—যাহার মধুর কলগান অলঙ্কার সিঞ্জিতেরই মত প্রতীয়মান হয়—আজ তাহার এ কি মূর্ত্তি? নদীগর্ভস্থ শিলারাশি আজ জলমগ্ন—বিপুল বারিপ্রবাহ ভীষণ বেগে উন্মত্তের মত বহিয়া যাইতেছে—তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে, যেন ভৈরবী তাণ্ডব নৃত্যে উন্মত্তা হইয়াছে। দূরে কোথায় কূল প্লাবিত হইয়াছে। মৃত ও জীবিত জীব জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; উদ্ধারের উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে, বর্ষণসিক্তপক্ষ বিহঙ্গম কোনরূপে জলে পড়িয়া আর উঠিতে পারিতেছে না। রাজধানীর নিম্নে দারুময় সেতু জলপ্রবাহবেগে কম্পিত হইতেছে—বুঝি এখনই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

রাজা স্বয়ং কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। শ্রমজীবীরা মৃত্তিকা বা বালুকাপূর্ণ বস্ত্রনির্ম্মিত আধার আনিয়া কূলে সজ্জিত করিতে লাগিল। আত্মরক্ষাতৎপর নগরবাসীরা আসিয়া সে কার্য্যে যোগ দিল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেইরূপ কার্য্য চলিল। সন্ধ্যার সময় সকলেই স্বীকার করিলেন, জল আর বাড়িতেছে না; সম্ভবতঃ অতিরিক্ত বারি প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। রাজা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি কূলে প্রহরীর ব্যবস্থা করিয়া প্রাসাদে ফিরিবেন, স্থির করিলেন। প্রহরীরা নদীর অবস্থা লক্ষ্য করিবে, যদি জলরাশি আবার বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে, বা বারিবেগ বর্দ্ধিত হয়, তবে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে ও তত্ত্বাবধায়ককে সংবাদ দিবে। তিনি শ্রমজীবিগণকে প্রস্তুত রাখিবার জন্য কর্ম্মচারীকে উপদেশ দিলেন।

তাহার পর তিনি প্রত্যাবর্ত্তনপর হইলেন। তখন তিনি বারিপাতে সিক্ত-বেশ; শ্রমজীবিগণের সহিত কার্য্য করায় তাঁহার করতল মলিন।

আশ্রমদ্বার হইতে রাজা দেখিলেন, আশ্রমবাসিনীর গৃহের অলিন্দে আলোক জ্বলিতেছে; আর সেই অলিন্দে আশ্রমবাসিনীর গৈরিক অঞ্চল পবনে বিকম্পিত হইতেছে। পার্ব্বতী তাঁহার কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিল।

রাজার ইচ্ছা হইল, আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আশ্রমের সংবাদ লইয়া যাইবেন। তিনি কিছু কাল আশ্রমে আইসেন নাই। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর তিনি অন্য নানাকার্য্যে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। তিনি আপনার হৃদয়দুর্গে—একপার্শ্বে যে ক্ষুদ্র-ছিদ্র-সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার নিবারণ চেষ্টায় চেষ্টিত ছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, যেমন করিয়াই হউক, এ দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইবে। তাই তিনি আর আশ্রমে আইসেন নাই। আজও তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন না।

গৃহে আসিয়া রাজা সংবাদ পাইলেন, শঙ্কর সিংহ ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শঙ্কর সিংহ প্রাসাদে রাজাকে না পাইয়া গৃহে গিয়াছিলেন; সংবাদ রাখিয়া গিয়াছিলেন,—তিনি অল্পক্ষণ পরেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

রাজা ভাবিতে ভাবিতে সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিলেন। অজ্ঞাত আশায় ও আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় জলকল্লোল-মুখরিত—তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ স্রোতস্বতীর মত অস্থির হইয়া উঠিল। না জানি শঙ্কর সিংহ কি সংবাদ আনিয়াছেন! তিনি দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন;—তাহার ফল—হয় রাজপুত-গৌরবের উদ্ধার, নহে ত তাঁহার সর্ব্বনাশ। কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজ তাহার ফল জানা যাইবে। আজ হয় আশার উৎস উৎসারিত হইবে, নহে ত ধ্বংসের প্রলয় ঝটিকা গর্জ্জিয়া আসিবে। দুই পথেই বিপদ বিদ্যমান।

ক্রমে ক্রমে রাজা সভাগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলেন ; বিশ্রামগৃহে চিন্তাচঞ্চলচিত্তে শঙ্কর সিংহের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন কত বিলম্ব হইতেছে ; প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন প্রহরের মত দীর্ঘ হইয়াছে। প্রতীক্ষায় ও আশঙ্কায় সময়ের গতি অত্যন্ত মন্থর বোধ হয়।

কোথাও সামান্য শব্দ হইলে রাজা চমকিয়া চাহেন, বুঝি শঙ্কর সিংহ আসিতেছেন। কেহ কথা কহিলে তিনি মনে করেন, শঙ্কর সিংহ প্রহরীর সহিত কথা কহিতেছেন।

সকলেরই শেষ আছে ; রাজার প্রতীক্ষার ও শেষ হইল—শঙ্কর সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। শঙ্কর সিংহ উপবেশন করিলেন।

উভয়েই নীরব।

রাজা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন,—না জানি কি সংবাদ পাইবেন ! তিনি তাঁহার হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। শঙ্কর সিংহ ভাবিতেছিলেন, কিরূপে সংবাদ দিবেন—কিরূপে কথার আরম্ভ করিবেন ? তিনি জানিতেন, তিনি যে কার্য্যের জন্য দূতরূপে গিয়াছিলেন, সে কার্য্য রাজার অতি প্রিয়—সে কার্য্য সিদ্ধ না হইলে তিনি অত্যন্ত মনোবেদনা পাইবেন। তাই তিনি ভাবিতেছিলেন—বিষদন্ত উৎপাটিত করিয়া কিরূপে বিষধরকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিবেন ?

শেষে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শঙ্কর সিংহ সংবাদ কি ?" শঙ্কর সিংহের ভাব দেখিয়া তিনি মনে করিতেছিলেন, আশার অবসর অল্প।

শঙ্কর সিংহ ধীরে ধীরে আপনার কার্য্য-বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। রাজধানী ত্যাগ করিয়া তিনি কোন্ পথে কোথায় গমন করিয়াছিলেন, কোন্ রাজার পর কোন্ রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কি কি উপায়ে কাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, কাহার সহিত কিরূপ কথা হইয়াছিল—শঙ্কর সিংহ ক্রমে ক্রমে সেই বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন।

রাজার তীক্ষ্ণদৃষ্টি শঙ্কর সিংহের মুখে সংস্থাপিত। তিনি স্থির হইয়া সেই বিবরণ শুনিতে লাগিলেন।

শঙ্কর সিংহের সে বিবরণ শেষ করিতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বৃদ্ধ পুরোহিত সত্যই বলিয়াছেন,

—ভীতির স্পর্শ বিষবৎ কার্য্য করে; তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। রাজপুতের তাহাই হইয়াছে।

রাজপুত রাজাদিগের মধ্যে কয়জনমাত্র এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সম্মত হইয়াছেন। আর সকলেই অসম্মত। কেহ আশঙ্কায় শঙ্কিত। কেহ মোগলের প্রসাদভিক্ষারত। কেহ বা অভিমানহেতু একজন ক্ষুদ্ররাজ্য-শাসকের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনিচ্ছুক।

রাজা শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, "তোমার সহিত অনেক কথা আছে।"

উভয়ে একত্র আহার করিলেন।

আহারের পর আবার উভয়ের কথোপকথন আরব্ধ হইল। শঙ্কর সিংহের বিবরণ-বিবৃতি-কালে রাজা স্থির হইয়া সব শুনিয়াছিলেন; কোন প্রশ্ন করেন নাই। এক্ষণে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিয়া সকল বিষয় বিশদ করিয়া লইতে লাগিলেন। শঙ্কর সিংহ একে একে সে সকল প্রশ্নের উত্তর করিতে লাগিলেন।

যাঁহারা শক্তি-সঙ্ঘে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের বল কিরূপ,—তাঁহাদিগের নিকট কার্য্যকালে কিরূপ সাহায্যের আশা করা যাইতে পারে; যাঁহারা এখনও দোলাচলচিত্ত—সঙ্ঘে যোগদান করিবেন কি না স্থির করিতে পারেন নাই—তাঁহাদিগের শক্তির পরিমাণ কিরূপ, তাঁহাদিগকে পক্ষভুক্ত করা সম্ভব কি না; যাঁহারা সঙ্ঘে যোগ দিবেন না, তাঁহাদিগের অভিমত—রাজা এই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর সিংহের উত্তরে রাজা স্পষ্ট বুঝিলেন—স্বার্থের বিষে রাজপুত রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ,—স্বার্থসহচর আশঙ্কা রাজপুতদিগকে কাপুরুষ করিয়াছে,—স্বার্থসম্ভাত চিন্তা তাঁহাদিগের হৃদয়ে ভাবাবেশের স্থান রাখে নাই। এ রোগের ঔষধ কি? ব্যাধি বিষম—ভেষজ স্বার্থত্যাগ। তিনি জানিতেন,—যত দিন যাইবে তত ব্যধির বিস্তারে সমস্ত সমাজ শক্তিহীন হইবে—তত ভাবের প্রাধান্য দূর হইবে—তত স্বার্থসহচর হীনতা বীর্য্যে ও সাহসে দীনতা আনয়ন করিবে। যত বিলম্ব হইবে, তত তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধির পথ বিঘ্নবিষম হইবে; রাজপুত তত আদর্শভ্রষ্ট—হীন হইবে; তাহার উদ্ধার-সাধন তত দুষ্কর হইয়া উঠিবে; আবার মোগল ততই তাহার শক্তি দৃঢ় করিবে—ততই ছলে, বলে, কৌশলে রাজপুত রাজশক্তিকে তাহার সিংহাসনে শৃঙ্খলিত করিয়া প্রসাদে তুষ্ট রাখিবে। লোক ততই মোগল-প্রাধান্যে অভ্যস্ত হইবে।

তোষণ-প্রয়োগে কিরূপে বিলাস বাড়িবে, একথা রাজা বুঝিয়াছিলেন। রাজপুত হৃদয়ের মধ্যে এত দূর অধঃপতিত—জড়ত্বজর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রতাপ সিংহের আদর্শেও তাহার রাজপুত-গৌরব-সংরক্ষণ-চেষ্টা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে নাই। তাহাকে উৎসাহিত করিতে আরও আদর্শের প্রয়োজন।

রাজা যখন রাজপুতের ভবিষ্যৎ চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন, শঙ্কর সিংহ তখন আরও একটি কথা ভাবিতেছিলেন। সে কথা তিনি পর্য্যটন-কালেও ভাবিয়াছেন,—ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন।

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "যদি এ কথা মোগল রাজসভায় প্রকাশ পায়, তবে আমাদের বিপদ অনিবার্য্য।"

রাজা বলিলেন, "এ কথা প্রকাশ পাইবে। তুমি রাজপুতকে যেরূপ অধঃপতিত দেখিয়া আসিয়াছ, তাহা রাজপুতের হৃদয়ে হীনতাবিকাশের ফল। সে হীনতা রাজপুতকে, দেশের জন্য নহে, আপনার হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য, মোগলের আশ্রয় লইতে প্ররোচিত করিয়াছে। অধঃপতিত রাজপুত এ কথা প্রকাশ করিয়া সে আশ্রয় স্থির রাখিতে ব্যাগ্র হইবে। একজন নহে, দশজন রাজপুত মোগলকে এ সংবাদ দিবে।"

রাজার কথা শুনিয়া শঙ্কর সিংহ বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে আমাদের উপায়?"

রাজা কোন উত্তর করিলেন না; কেবল তাঁহার চিন্তাগম্ভীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

উপবনে বিহগ-বিরাব শ্রুত হইল। উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, অলিন্দে মুক্তবাতায়নপথে দিবালোক প্রবেশ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

একি!

রাজা দ্বার মুক্ত করিয়া ভৃত্যকে অশ্ব সজ্জিত করিয়া আনিতে উপদেশ দিলেন।

শঙ্কর সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রমণে বাহির হইবেন?"

রাজা উত্তর করিলেন, "নদীতীরে কার্য্য-পরিদর্শনে যাইব।"

রাজা মুখপ্রক্ষালনের জন্য পার্শ্ববর্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শঙ্কর সিংহ ভাবিলেন, এ কি মানুষ না দেবতা? সঙ্গে সঙ্গে রাজার ভবিষ্যৎ বিপদের কথা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

রাজা ফিরিয়া আসিয়া জানিলেন, অশ্ব প্রস্তুত। তিনি শঙ্কর সিংহকে বলিলেন, "সমস্ত দিন পথশ্রমের পর নিশাজাগরণে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইল। কথা কহিতে কহিতে আমি সে বিষয় বিবেচনা করি নাই। যাইয়া বিশ্রাম কর।"

শঙ্কর সিংহ বলিলেন, "আপনি সমস্ত দিন গুরু শ্রম করিয়া আবার সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছেন; এখনই আবার যাইতেছেন! বিশ্রাম করিলে ভাল হইত না?"

রাজা হাসিলেন, বলিলেন, "আমার বিশ্রাম চিতায় বা রণক্ষেত্রে।"

"এত শ্রম শরীরে সহিবে না। অনভ্যস্ত শ্রমে শীঘ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে।"

"শঙ্কর সিংহ, আপনার সুখের জন্য বহুদিন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট ছিলাম। এখন কি আবার স্বাস্থ্যের জন্য কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব?"

"একবার সংবাদ লইলে হইত।"

"স্বয়ং না দেখিলে তৃপ্ত হইতে পারিব না। বন্যায় হয় ত কোথাও কাহারও কোন ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।"

"কর্ম্মচারীরা সংবাদ দিবে।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "রাজকর্ম্মচারীরা দুঃখী প্রজার ক্ষতির কথা রাজার শ্রবণযোগ্য মনে করে না। ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি।"

রাজা শঙ্কর সিংহের নিকট বিদায় লইয়া কক্ষত্যাগ করিলেন।

শঙ্কর সিংহ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তিনি রাজার প্রকৃতি নখদর্পণে দেখিতে পারিতেন। বলিতে গেলে রাজার কোন কথাই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি শৈশব হইতে রাজার সঙ্গী। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন, রাজা সত্য সত্যই রাজগুণে বিভূষিত। কিন্তু তাহার পর রাজার ব্যবহারে সে বিশ্বাস—সে ধারণা সন্দেহ-সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর এখন আবার সেই বিশ্বাস মেঘমুক্ত মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন সন্দেহ আসিয়াছে। শঙ্কর সিংহ দৌত্যকার্য্যব্যপদেশে রাজপুতানায় বহু রাজসভায় উপনীত হইয়াছেন—বহু রাজচরিত্র অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহাদের রাজসজ্জা কেবল অসারতার আবরণমাত্র—সৈন্যসজ্জা কেবল কাপুরুষতাকে আবৃত রাখিয়াছে—বাহুল্য কেবল

নীচতাকে লুক্কায়িত করিয়াছে! তাই—সেই অভিজ্ঞতার ফলে রাজার রাজগুণ সকল তাঁহার নিকট প্রদীপ্ততর প্রতীয়মান হইয়াছে—তাঁহার রাজার প্রতি তাঁহার ভালবাসা ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

তাই আজ শঙ্কর সিংহের মনে হইতে লাগিল, একাধারে এতগুণ আর কোন্ রাজার আছে? কোন্ মানবে এত দেবোচিত গুণ বিদ্যমান? কে তাঁহার রাজার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ।

এদিকে রাজা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। রাজপথ আশ্রম গৃহের প্রাঙ্গণ-প্রাচীরসন্নিকটে সেতুমূলে সংলগ্ন হইয়াছে। রাজা সেই স্থানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন।

সম্মুখে নদী। জল নামিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু দীর্ঘরজনীব্যাপী প্রবাহেও অতিরিক্ত বারিরাশি শেষ হইয়া যায় নাই—প্রবাহ প্রবল। এখনও খর-স্রোতে উন্মূলিত তরু-লতা-গুল্ম ভাসিয়া যাইতেছে; এখনও প্রবাহ কোন্ দূর পথ হইতে গতপ্রাণ জীব-দেহ ভাসাইয়া আনিতেছে; এখনও দুই একটি জন্তু জলে পড়িয়া উদ্ধারের জন্য নিস্ফল চেষ্টায় চেষ্টিত হইতেছে। কূলে স্থানে স্থানে মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শ্রমজীবীরা—কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ মতে সেই সকল স্থানে সংস্কার-কার্য্যে নিযুক্ত—কূলে কোথাও একবার মৃত্তিকা ধসিয়া পড়িলে ভাঙ্গন বাড়িতেই থাকে—জলতাড়নে শিথিলমূল মৃত্তিকা স্তূপে স্তূপে জলগর্ভে নিপতিত হয়। তাই ভাঙ্গন ধরিতেই সংস্কারের প্রয়োজন। কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতুও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া রাজা দেখিলেন, আশ্রমসীমার মধ্যে একস্থানে নদীকূলে কতকগুলি শ্রমজীবী কার্য্য করিতেছে। কারণ সন্ধান করিয়া তিনি জানিলেন, সে স্থানে মৃত্তিকা ধসিয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য স্থান পর্য্যবেক্ষণের পর রাজা সেই স্থানের কার্য্যপরিদর্শনাভিপ্রায়ে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

আশ্রমদ্বারে তিনি যেন সামান্য চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিলেন—যেন মন্দানিল-স্পর্শে সরসী-সলিল সামান্য কম্পন অনুভব করিল। রাজা ভাবিলেন,—অদৃষ্টের এ কি গতি? আমি যাহা পরিহার করিতে চাহি,—আমার নিয়তি আমাকে তাহারই সন্নিকটে নীত করিতেছে! যাহাই হউক, চিত্ত জয় করিতেই হইবে,—বাসনাবহ্নির লেশমাত্র প্রকাশিত হইতে না হইতে তাহাকে চরণচাপে নির্ব্বাপিত করিতে হইবে, হৃদয় দগ্ধ হয়,—হইবে। এইরূপ মনে করিতে করিতে রাজা আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

রাজা প্রাঙ্গণ-সীমায় যে স্থানে শ্রমজীবীরা কার্য্য করিতেছিল, সেই স্থানে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে উপনীত হইয়া তাঁহার মনে পড়িল, কিছুদিন পূর্ব্বে—আশ্রমগৃহ নির্ম্মাণকালে এক দিন প্রভাতালোকে সেই স্থানে শিলাসনে বসিয়া তাঁহার জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি সহসা হৃদয়ে নূতন ভাব লক্ষ্য করিয়া ভীতিতাড়িত জনের মত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সেই কথা মনে করিয়া তিনি কেমন অন্যমনস্ক হইলেন। তিনি সত্বর পর্য্যবেক্ষণ শেষ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপরায়ণ হইলেন।

রাজা আসিয়াছেন, জানিয়া পার্ব্বতী তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল; পথে রাজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। রাজা মুখ তুলিয়া চাহিলেন? কিন্তু চক্ষু আপনি নত হইয়া আসিল। তিনি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, পার্ব্বতীর নয়নে অপূর্ব্ব দীপ্তি দীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি দেখিতে পাইলেন না—পার্ব্বতীর দৃষ্টি ক্ষিতিতললগ্ন হইল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে বল্গাকর্ষণে অস্থির অশ্বের মত চঞ্চল চিত্ত সংযত করিয়া পার্ব্বতীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

পার্ব্বতীর উত্তর শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না—তাহার কণ্ঠস্বর কেন কম্পিত।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "অনাথদিগকে দেখিবেন কি?"

রাজার ইচ্ছা হইল বলেন, সময় নাই আর একদিন আসিয়া দেখিবেন। কিন্তু তিনি যতই ফিরিতে চাহিতেছিলেন—অলক্ষিত আকর্ষণ তাঁহাকে ততই আকৃষ্ট করিতেছিল। তিনি পার্ব্বতীর সঙ্গে অনাথদিগকে দেখিতে চলিলেন। তখন আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ মধ্যে মধ্যে রবিকর মলিন করিতেছে। আশ্রম-গৃহের দীর্ঘ দীঘিকায় রাজহংসের শুভ্র দেহ বারিপাতে তুষারধবল দেখাইতেছে; আশ্রমগৃহের উদ্যানের শ্যাম শোভায় স্নিগ্ধতা সঞ্চারিত হইয়াছে।

রাজা একে একে অনাথদিগের সংবাদ লইতে লইতে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে চলিলেন।

তখনও অনাথাশ্রমের অধিবাসীর সংখ্যা অধিক হয় নাই। লোক এরূপ অনুষ্ঠানে অনভ্যস্ততাহেতু আশ্রমে আশ্রয় হইতে সংশয় ও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। ক্রমে দুই একটি করিয়া লোক আসিতেছিল। আর পার্ব্বতী মাতার মত দরিদ্র শিশুকে পালন করিতেছিল।

রাজাকে সমাগত দেখিয়া অনাথদিগের মুখ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজা তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়া শিশুদিগকে দেখিতে আসিলেন। তাহাদের মুখে—চক্ষুতে আনন্দ-দীপ্তি—পার্ব্বতীকে দেখিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। যেন তরুণ অরুণ-কিরণে কমল কলি বিকশিত হইয়া উঠিল। সকলে আসিয়া পার্ব্বতীকে বেড়িয়া ধরিল, পার্ব্বতী একে একে তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিল।

রাজা মুগ্ধ নেত্রে সেই দৃশ্য দেখিলেন। বুঝি তাঁহারও অজ্ঞাতে তাঁহার হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রান্ত হইতে একটি দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

রাজা যখন গমনোদ্যোগ করিলেন তখন বর্ষার মেঘে আবার বর্ষণ আরব্ধ হইয়াছে। অগত্যা রাজাকে আরও বিলম্ব করিতে হইল।

কিন্তু ক্রমেই মেঘের সমাগম হইতে লাগিল—স্বচ্ছ জলদজাল ঘনীভূত হইয়া গগন হইতে দিবালোক মুছিয়া দিবার উপক্রম করিল। রাজা বুঝিলেন, শীঘ্র বর্ষণ শেষ হইবে না। তিনি সত্বর আশ্রম ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিলেন। তিনি আপনি আপনাকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। শেষে সেই বৃষ্টির মধ্যেই তিনি প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন। তেজস্বী অশ্ব কশাস্পর্শ-ত্রাস্ত্র বেগে প্রাসাদাভিমুখগামী হইল।

রাজা ফিরিয়া দেখিলেন, মন্ত্রী নানা কার্য্যের উপদেশ লইতে উপস্থিত। সমস্তদিনব্যাপী পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠা—তাহার পর দীর্ঘ নিশায় জাগরণ ও চিন্তা; রাজা শ্রান্তি বোধ করিতেছিলেন। তাঁহার একবার মনে হইল, মন্ত্রীকে সময়ান্তরে আসিতে বলেন। কিন্তু তিনি আপনাকে কর্ত্তব্য-মন্দিরে বলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি কার্য্য লইয়া ব্যস্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় শঙ্কর সিংহ আসিয়া দেখিলেন, রাজার মুখে শ্রান্তির প্রগাঢ় ছায়া সুস্পষ্ট। তিনি রাজাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া অল্পক্ষণমধ্যেই বিদায় লইলেন।

রাজা কার্য্যব্যপদেশে প্রায় মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে শয়ন করিতে যাইতে পারিতেন না। আজ তিনি সে সময়ের পূর্ব্বেই কার্য্য ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম-লাভপ্রয়াসী হইলেন।

অন্তঃপুরে [illegible] কক্ষের দক্ষিণে শয্যাগৃহ। উত্তরে একটি বিশ্রাম গৃহ—সেই কক্ষে কার্য্য করিতে করিতে রাজা নিদ্রিত হইতেন। আজও তিনি সেই

কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

নিশাবসানের কিছু পূর্ব্বে চরণে কোন বস্তুর স্পর্শ বোধে রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, রাণী তাঁহার চরণ-প্রান্তে উপবিষ্টা ছিলেন—তাঁহাকে জাগিতে দেখিয়া উঠিলেন।

রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণী, কি আবশ্যক?"

অতি দ্রুত "কিছু নহে" বলিয়া রাণী কক্ষ ত্যাগ করিলেন। কোমলজ্যোতিঃ আলোকে রাজা তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে হইল, রাণীর কণ্ঠস্বর যেন বিকৃত। রাজা আবার ডাকিলেন, "রাণী"! কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে পড়িল, পূর্ব্বেও একদিন জাগিয়া মনে হইয়াছিল, যেন কে কক্ষ ত্যাগ করিল।

রাজা শয্যাত্যাগ করিয়া যাইয়া দেখিলেন, রাণী শয়ন-মন্দিরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শয্যায় উপবেশন করিয়া সহসা তাঁহার বোধ হইল—যে স্থানে তাহার চরণ ছিল, সে স্থানে শয্যা সিক্ত। রাণী কি কাঁদিয়াছেন?

রাজা ভাবিলেন, একি? সব যেন প্রহেলিকার মত বোধ হইতে লাগিল।

মাঘ-মণ্ডল।

—:*:—

পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রায় সমস্ত পল্লীতে মাঘ মাসের প্রবল শীতে কুমারীরা এই ব্রত করিয়া থাকেন। যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু সমাজের অবিশাল গণ্ডি হইতে দিন দিন এই সকল ব্রতনিয়ম স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, তথাপি অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে প্রত্যুষে শয্যা হইতে খেলার ভাণে বা ব্রতের নামে গাত্রোত্থান করাইয়া গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত করিবার এমন দ্বিতীয় উপায় আর নাই। ইহাতে খেলার ছলে ধর্ম্মোপদেশ, ইন্দ্রিয়-সংযম, পাপে ভয়, ভগবানে আস্থা প্রভৃতি নানা সৎশিক্ষাদান হয়। এই সকল ব্রতে অর্থব্যয় প্রায় নাই; কেবল শৈশব হইতে চরিত্রকে গঠিত করিয়া সামাজিক, পারিবারিক

ও দৈনিক কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য অশেষ প্রকার মধুর উপদেশ শুনিতে হয় এবং না বুঝিয়া তাহাই কণ্ঠস্থ করিতে হয়। পরে তাহাই ধারণার বিষয়ীভূত হইয়া যায়।

পৌষ মাস যায়, মাঘ মাস আইসে—পৌষের এই সংক্রান্তিই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হইতেই মাঘ-মণ্ডল আরব্ধ। বাস্তবিক আশ্বিনের সংক্রান্তি হইতে মাঘ-মণ্ডলের সূচনা হয়। যমপুকুর, আগন-তোয়া, পৌষ-তোয়াও মাঘ-মণ্ডলের অঙ্গীয়। অনায়াসলব্ধ ফুল, দুর্ব্বা, তুলসীপত্র, ইষ্টকচূর্ণ ও তূষের ভস্ম এ ব্রতের সর্ব্বপ্রধান উপাদান। ব্রতের পূর্ব্বদিবস কয়গাছি দীর্ঘ দুর্ব্বা তুলিয়া তাহার সহিত ফুল-তুলসী একত্র করিয়া বাঁধিতে হয়। সংক্রান্তির দিন প্রাতঃস্নান করিয়া উক্ত দুর্ব্বা লইয়া পুষ্করিণীর ঘাটে যাইয়া "কাক ও বককে" জল দিতে হয়। মন্ত্র এই :—

কাকে না ছুঁতে বকে না ছুঁতে।
ছুঁইলাম ছুঁইলাম দুর্ব্বার আগে॥
দুর্ব্বা সরস্বতী কি বর মাগে।
আই-বর ভাই-বর বিয়ার বর মাগে॥

এই মন্ত্র বলিতে বলিতে জল নাড়িতে হয় এবং পরে দুর্ব্বা জলে ফেলিয়া দিতে হয়। নিত্য নব দুর্ব্বা বাঁধিতে হয়। "কাক ও বক"কে জল দিয়া পরে ফল ভাসাইতে হয়। সাত দিনে সাত প্রকার ফল। ফল ভাসাইবার মন্ত্র এইরূপ :— "সুশীলা আইতে সুশীলা যাইতে, কইও চিত্রগুপ্তের মায়েরে বার বছর পরে ফলটা পাঠাইয়া দেয়"। প্রথম সাত দিন ব্রতচারিণীকে নিরামিষ আহার করিতে হয়। অষ্টম দিনে "ভেরুয়া" ভাসাইতে হয়, ও পরে মৎস্য আহার করিতে পারা যায়। ফল ভাসাইয়া আসিয়া বাড়ীর উঠানে অঙ্কিত মণ্ডল পূজা করিতে হয়। বাড়ীর প্রাঙ্গণে পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দিয়া মণ্ডল আঁকিতে হয়। মধ্যে গোলাকার মণ্ডল আঁকিয়া তাহার পূর্ব্বদিকে সূর্য্য, পশ্চিমে চন্দ্র অঙ্কিত করিতে হয় ও তাহার বামে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে উদয় আঁকিয়া তাহার পূর্ব্বে সূর্য্য ও পশ্চিমে চন্দ্র দিতে হইবে। তাহার পার্শ্বে একটি পুষ্করিণী—পাড়ে একটি পাখী জল পান করিতেছে, একখানি খাট, দোলা, ত্রিকোণা পৃথিবী, এক জোড়া খড়ম, পান, [illegible] গাছ, পানের বাটা, শাটী, হস্তী, অশ্ব, ছত্র, পঞ্জিকা, পুঁথি, দর্পণ প্রভৃতি [illegible] প্রয়োজনীয় দ্রব্য অঙ্কিত করিয়া একটি তুলসীপত্র দ্বারা স্পর্শ করিয়া পূজা করিতে হয়। কথা এইরূপ :—

প্রথম মণ্ডলকে স্পর্শ করিয়া—

মাঘ-মণ্ডল সোণার কুণ্ডল বাপ রাজা ভাই প্রজা
মা পাটেশ্বরী আপনি বিদ্যাধরী
থালে ভাত ভৃঙ্গারে পাণি—জন্মে জন্মে এয়ো রাণী।

(চাঁদে হাত দিয়া)—চান্দ পুজি চন্দনে (সূর্য্যে হাত দিয়া) সুরুজ পুজি বন্দনে।
চাঁদ পূজিয়া ঘরে যাই, সুরুজ পূজিয়া ঘি ভাত খাই

(উদয়ে হাত দিয়া)—উঠ উঠ ললিতা সোহাগের ঝলিতা
ঘৃত ভাত কর্পূর হাত
মুই পূজি উদয় হাত

(ঘাটে হাত দিয়া)—ঘাটে আইলাম ঘাটে গেলাম বাপের বাড়ী গিয়া দুধ ভাত খাইলাম।

পুষ্করিণী— মামায় দিল পুষ্করিণী ভাগিনায় দিল পার,
সোয়া পাখী পাণি খায় দেখরে সংসার।

পান— পান গঙ্গাজল গুয়া ঋষি ফল তারে খাই বর্ত্তী বইনে বর্ত্ত কর।

শাড়ী — আমি পূজি গুঁড়ির শাড়ী আমার লাগিয়া আইব পাটের শাড়ী।

আয়না— ,, ,, আয়না ,, ,, আভের আয়না।

কটুয়া— ,, ,, কটুয়া ,, ,, কাঠের কটুয়া।

কাঁকই— ,, ,, কাঁকই ,, ,, হাড়ের কাঁকই।

মচকা— ,, ,, মচকা ,, ,, কাঠের মচকা।

শাঁখা— ,, ,, শাঁখা ,, ,, শঙ্খের শাঁখা।

খড়ম— পুষ্খড়মে দিয়া পাও সুস্বামীর ঘরে চলিয়া যাও।

পাঁজি— পাঁজি-পুঁথি পাঞ্জীশ্বর
বাপ ভাই লক্ষেশ্বর।

ত্রিকোণা— তিন কোণা পৃথিবী যায় ভাসিয়া
মুই বর্ত্তী বর্ত্ত করি সিংহাসনে বসিয়া।

কোয়াল— ওরে ওরে কোয়াল ডাল তোর বাসা থাল তোর আশা
মুই বর্ত্তী বর্ত্ত করি, গুঁড়ি খাইতে তোর বড় আশা।

তালগাছ— তাল পূজি তালেশ্বর
বাপ ভাই লক্ষেশ্বর।

ঘোড়া— উত্তম ঘোড়া নকল ঘোড়া
যোল ভাইয়ের যোল ঘোড়া
তেল কলসী হাতে ঘি কলসী মাথে
প্রথম পুতে করে কাজ
প্রথম বউ ভোগে রাজ
অনন্তকাল শ্রীকৈলাস।

মণ্ডল পুজিয়া গুঁড়িগুলি একত্র করিয়া রাখিতে হয়। ইহারপর সূর্য্যোদয় হইলে আবার পুকুর-ঘাটে যাইয়া সূর্য্য প্রণাম করিয়া সূর্য্যকে অন্য এক গুচ্ছ দূর্ব্বাদ্বারা জল দিতে হয়। মন্ত্র এইরূপ :—

লও সূর্য্যাই লও তোমার পাণি
লেখিয়া জুখিয়া ছয় কুড়ি পাণি।
ছয় কুড়ি পাণির মধ্যে এক কুড়ি উনা
উনা দোনা ভরিয়া দিলাম মেঘের কাণের সোণা।
মেঘের কাণের সোণা নাড়ে নাড়িয়া পিতল
ধাক্কা দিয়া ঢালাইয়াদিলাম বাড়ীর ভিতর?
বাড়ীর ভিতর নাড়ে আড়ু গাড়ু পাণি
তাভেকা দিয়া আইলাম সূর্য্যেরে পাণি।
সুরুহ ঠাকুর সুরুহ ঠাকুর দিয়া যাও বর
বাপ ভাই হউক লক্ষেশ্বর।

সাত দিন অন্তর ভেরুয়া ভাসাইবার রীতি। ভেরুয়ার সঙ্গে মণ্ডলের সঞ্চিত চূর্ণগুলি ও প্রতি দিনের ৭ গুচ্ছ দূর্ব্বা দিতে হয়। ভেরুয়া ভাসাইয়া স্নান করিতে হয়। যে দিন ভেরুয়া ভাসাইতে হয় সে দিন নিরামিষ আহার ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে আহার করিতে হইবে। প্রাতঃকালে আহারের পূর্ব্বেই মণ্ডল প্রভৃতির পূজা করিতে হয়। ৮ম দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে খাইয়া উদয়ের ও নক্ষত্রের পূজা করিতে হয়। সাত দিনের সাত নক্ষত্র ও সাত উদয় পশ্চিম দিকে আঁকিয়া পূজিতে হইবে।

মন্ত্র এইরূপ :—

উদয় পূজি অর্থ না জানি
সন্ধ্যা হইলে ভাত না খাই
গোয়ালে গাই গরু বাধি

ঘৃত ভাত কর্পূর হাত
মুই পূজি উদয় হাত।*

(চাঁদে হাত দিয়া)—চাঁদ পূজি চন্দনে (সূর্য্যে হাত) সূরুষ পূজি বন্দনে
চাঁদ পূজি ইত্যাদি

নক্ষত্রে হাত দিয়া—

ওরে ওরে তারা তুই আমার সাক্ষী ঘৃত মাথি পঞ্চ গ্রাসী
এই ঘরে কে জাগে তারা বালি দুই বইন জাগে
জাগে বালি মাগে বর খুঁজিয়া লইলাম বিয়ার বর
শাস্তাশান্তি বাড় ভাতন্তি মাইল পূতন্তি
তারা পূজিয়া ঘরে যাই যে বর মাগি সেই বর পাই।

এই দিন রাত্রিতে আহার নিষেধ, এমন কি রাত্রিতে ঘরের বাহির হওয়া নিষেধ—পাছে নক্ষত্র দেখিতে হয়।

কুমারীকে প্রতি দিন প্রাতে স্নান করিতে হয়। মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন বৃহৎ মণ্ডল আঁকিয়া তাহার মধ্যে অন্যান্য দ্রব্য আঁকিতে হয়। ব্রাহ্মণ আসিয়া সূর্য্যের পূজা করিয়া থাকে। পূজার পর ভেরুয়া ভাসাইতে হয়। ভেরুয়া ভাসান হইয়া গেলে, ব্রতচারিণী মণ্ডলের মধ্যে গইলের উপর উপবেশন করিয়া একটা ছাতি ঘুরাইতে থাকে ও তাহার ভ্রাতা তাহাতে খৈ ও দুধের লাড়ু ঢালিয়া দেয়। তাহারপর মণ্ডলে বসিয়া সমবয়স্ক ছেলেমেয়ে একত্র বসিয়া দধি-চিড়া ভক্ষণ করে। চারি বৎসর এ ব্রত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এক বৎসর করিয়াও প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

এই সকল ব্রত-কথাগুলি প্রাদেশিকতায় পূর্ণ। কিন্তু ইহার ভিতর পাশ্চাত্য বিলাসিতার কোন হাবভাব নাই। ইহাতে আপনাদের পারিবারিক জীবন কি ভাবে গঠিত করিয়া লইতে হইবে তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। বাল্যকাল হইতে জীবনের প্রতি কার্য্যে ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল ব্রতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

---

* উদয় গিরি অস্ত যায়।
গোয়ালে গাই বাছুর বাঁধা।
ঘৃত হাত কর্পূর ভাত।
মুই পূজি উদয় হাত।

ফাল্গুন দোলা ও ব্রত-বগুলের মধ্যে। ফাল্গুন মাসে প্রতিদিন বাড়ীর প্রাঙ্গণে দোলা আঁকিয়া পূজা করিতে হয়। প্রথম বৎসর বাড়ীর বাহিরে, দ্বিতীয় বৎসর প্রাঙ্গণে, তৃতীয় বৎসর ঘরের দ্বারে ও চতুর্থ বৎসর ঘরের ভিতর এই দোলা আঁকিয়া পূজা করিতে হয়। মন্ত্র এইরূপ :—

ফাল্গুন দোলা গুণ-প্রতিষ্ঠা
গুণে তিতা গুণে মিঠা।
পিন্দন পাঠ ভোজন পাট।
পাট কাপড়ে রাত্রবাস।
অন্তকালে শ্রীকৈলাস।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

করমেতি বাই।

—:*:—

খাজন গ্রাম দক্ষিণাপথের একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এক সময়ে একজন বৈষ্ণব রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। পরশুরাম পণ্ডিত নামা জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌরহিত্যে ব্রতী ছিলেন। রাজার ন্যায় তিনিও বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৈষ্ণবোচিত আচারঅনুষ্ঠানাদি বিশেষ যত্নসহকারে প্রতিপালন করিতেন। এই একধর্ম্মতা বশতঃ রাজর সহিত পুরোহিত মহাশয়ের সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। তিনি প্রায় সকল সময়েই রাজ-ভবনে অবস্থিতি করিতেন এবং সতত কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে রাজার আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেন। অদ্য আমরা যে মহীয়সী মহিলার পবিত্র জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি, তিনি এই খাজন গ্রামবাসী রাজপুরোহিত পরশুরাম পণ্ডিতের দুহিতা।

করমেতি শিশুকাল হইতেই পিতৃগুণগ্রামের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। পিতার যত্নে তিনি যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, পিতার আচরিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিও তদনুরূপ অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। কিন্তু পিতার অপেক্ষা কন্যার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। করমেতি সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়াছিলেন এবং পারমার্থিক

সুখের নিকট, ঐহিক সুখ যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। তিনি কোনও কার্য্যেই আসক্তি প্রকাশ করিতেন না, পরন্তু সাংসারিক ভোগ-বিলাসকে, ভক্তিপথের প্রধান পরিপন্থী বোধে, তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিতেন। তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমের তুলনা ছিল না। তিনি দশদিক কৃষ্ণময় দেখিতেন এবং কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বিভোর হইয়া পাগলিনীর ন্যায় কখনও হাসিতেন কখনও কাঁদিতেন এবং কখনও বা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। করমেতি শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। পরশুরাম, কন্যার বিবাহ-সময় সমাগত দর্শনে উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সত্বর তাঁহাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। করমেতি বিবাহে অভিলাষিণী ছিলেন না—চিরকৌমার্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক, কেবল কৃষ্ণসেবায় নিরতা থাকিবেন—ইহাই তাঁহার একমাত্র বাসনা ছিল। অতএব পিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তিনি বিষণ্ণ হইলেন কিন্তু বিবাহে অমত করিলেন না; শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহারই উপর সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া পিত্রাদেশ পালনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। যথাসময়ে পরশুরামের চেষ্টা সফল হইল—করমেতি পিতৃ-নিদেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া জনৈক বিভবশালী ব্রাহ্মণ যুবাকে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং মহাসমারোহে স্বামিসদনে নীতা হইলেন।

পরিণয় প্রীতিকর না হইলেও, করমেতি আশা করেন নাই যে, তাহাতে তাঁহার কৃষ্ণভজনের ব্যাঘাত ঘটিবে; কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দর্শনে—স্বামীকে বিষ্ণুভক্তিহীন ও ঘোর বিষয়াসক্ত দেখিয়া, তাঁহার বিষাদের পরিসীমা রহিল না। তিনি, সেরূপ স্বামীর দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধির বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—জীবন থাকিতে আর কখনও পতি-গৃহে আগমন করিবেন না, বিষয়ী স্বামীর মুখদর্শনও করিবেন না, পিতৃগৃহে থাকিয়া কেবল কৃষ্ণার্চ্চনেই দেহপাত করিবেন। করমেতি তাহাই করিলেন—পিতৃভবনে প্রত্যাগতা হইয়াই, তিনি সমস্ত সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিলেন, গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং নির্জ্জনবাস আশ্রয় পূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ নিষ্ঠার সহিত কৃষ্ণ-পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছু দিন এই ভাবে কাটিল। শ্রীকৃষ্ণের অভয় পদে আত্মোৎসর্গ করিয়া

—কৃষ্ণপ্রেমামৃতপানে মাতোয়ারা হইয়া, করমেতি কয়েক মাস পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার সেই আনন্দময় জীবনে নিরানন্দের ছায়া পড়িল। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য, তাঁহার শ্বশুর-গৃহ হইতে লোক আসিল। করমেতি অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন—কৃষ্ণবিমুখ বিষয়ী স্বামীর ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন করিলেন না, কিছুতেই স্বামী গৃহগমনে সম্মতা হইলেন না। যিনি একবার ভগবৎ প্রেমের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন, তিনি কি আর নশ্বর সংসার-সুখে আকৃষ্ট হইতে পারেন? পরশুরাম কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা কত বুঝাইলেন, হিত উপদেশ দিলেন কিন্তু করমেতি কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুতা হইলেন না, কোনও মতেই পতিগৃহবাসে স্বীকৃতা হইলেন না। কেবল অধোমুখে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে ভাব দর্শনে, কাহারও হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল না; কেহই তাঁহার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিল না; বরঞ্চ কেহ কেহ আবার বলপ্রয়োগে তাঁহাকে স্বামিগৃহে পাঠাইবার জন্য, পরশুরামকে পরামর্শ দিতে লাগিল।

করমেতি যখন বুঝিলেন,--কিছুতেই তাঁহার স্বামিগৃহ-গমন রহিত হইবার নহে, যেরূপেই হউক, তাঁহার পিতা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন, তখন তিনি দুঃখের পাথারে ভাসিলেন। নিদারুণ মনস্তাপে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইল। করমেতি গোপনে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবন-গমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। গভীর নিশীথে তিনি ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিলেন এবং বাটীর বহির্ভূত হইবার জন্য বহির্দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না—প্রাচীরদ্বার লৌহ অর্গলে দৃঢ় নিরুদ্ধ থাকায় তিনি বহির্গমনে সমর্থা হইলেন না। তখন মুহূর্ত্তকাল স্থির ভাবে কি চিন্তা করিয়া তিনি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে গৃহের উপরিতলে গমন করিলেন এবং একবার ভক্তিভাবে ভগবানের নামোচ্চারণ করিয়া তথা হইতে বেগে লম্ফ দিয়া বাটীর বহির্দ্দেশে ভূতলে পতিতা হইলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিপদ ঘটিল না—সেই উচ্চ গৃহচূড়া হইতে ভূপতিতা হইয়াও তিনি কোনওরূপ আঘাত পাইলেন না, তাঁহার পদে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইল না। তিনি অনায়াসেই উপস্থিত সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এবং উন্মাদিনীর ন্যায় দ্রুতপদে বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিতা হইলেন।

রাত্রি প্রভাতা হইলে, পরশুরাম কন্যার পলায়ন-সংবাদ অবগত হইলেন। করমেতি যে এরূপভাবে গৃহত্যাগ করিবেন—কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকিনী একদিকে চলিয়া যাইবেন, ঘুণাক্ষরেও তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য সাবধানতা অবলম্বনেও সমর্থ হয়েন নাই। অধুনা সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠার—মনঃপীড়ার অবধি রহিল না। একে এই বিপদ, তাহাতে আবার লোক-নিন্দার ভয় বিষম ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিল। নিদারুণ দুঃখে, দুশ্চিন্তায় তাঁহার বোধশক্তি বিলুপ্ত হইল। পরশুরাম কাঁদিতে কাঁদিতে রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার নিকটে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রিয় সুহৃদের তথাবিধ বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বিষণ্ণ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ করমেতির সন্ধানজন্য প্রহরিপ্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরশুরাম কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

করমেতি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও গৃহের বহির্ভূত হয়েন নাই। বৃন্দাবন যে কোন্ দিকে, কত দূর, এবং কোন পথেই বা সেস্থানে যাইতে হয়, তাহাও তাঁহার সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি গমনে ক্ষান্ত হইলেন না; কৃষ্ণ-বিরহে অধীরা ও বিষয়ী স্বামীর সঙ্গভয়ে ভীতা হইয়া যে দিকে নয়ন চলিল সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিয়া দিবাভাগে তিনি এক প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে সহসা পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি দেখিলেন,—কয়েকজন সশস্ত্র রাজ-প্রহরী দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। করমেতি তাহাদিগের গতি-বিধি পর্য্যালোচনা করিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, এবং তাহাদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আত্মগোপনে অভিলাষিণী হইলেন। কিন্তু সেস্থানে সে অভিলাষ পূর্ণ করা কোনমতেই সম্ভবপর ছিল না। বহুদূর-প্রসারিত বিরাট প্রান্তর সর্ব্ববিধ তরুগুল্মাদি অন্তরাল পরিশূন্য। যত দূর দৃষ্টি চলে, কেবল ধূ ধূ করিতেছে। তথায় লুক্কায়িত থাকা কি প্রহরীদিগের উপস্থিতির পূর্ব্বে সে প্রান্তর অতিবাহন করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এ অবস্থায় করমেতি নিতান্ত ব্যাকুলভাবে ভগবানকে—সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়কে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি কুরুসভামধ্যে অসহায়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন তিনি কি আজ এই বিষম বিপদপাৎ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন? করমেতি তাঁহারই একমাত্র আশ্রিতা—একান্ত শরণাগতা সেবিকা

যেন তাঁহাকে প্রহরিগণের বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে? করমেতি অকস্মাৎ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অতি নিকটে এক প্রকাণ্ড উষ্ট্র-দেহ পতিত রহিয়াছে। উহার সমস্ত মাংস নিঃশেষিত, শৃগালকুক্কুরাদি মাংসাশী জীবের উদরস্থ হইয়াছিল, কেবল শুষ্ক চর্ম্মাবৃত শূন্যগর্ত্ত অস্থির আবরণটিমাত্র অবশিষ্ট ছিল। সেই আবরণ হইতে আবার এরূপ ন্যক্কারজনক পূতিগন্ধ নিঃসৃত হইতেছিল যে, নিকটস্থ হয় কাহার সাধ্য? কিন্তু করমেতি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না; সে দুর্গন্ধকে দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ করিলেন না, কর্পূরাদির সুগন্ধ বলিয়াই ধারণা করিলেন এবং ভগবদ্দত্ত দান, আত্মগোপনের একমাত্র উপায়বোধে, প্রফুল্লচিত্তে সেই কঙ্কালাবরণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল—সেই বৃহদাকার উষ্ট্রদেহে তাহার ক্ষুদ্র শরীর সহজেই প্রচ্ছন্ন হইল। অনুসরণকারী রাজভৃত্যগণ অবিলম্বে উষ্ট্র দেহের নিকটে আসিল কিন্তু অত্যন্ত দুর্গন্ধ বশতঃ সেস্থলে তিষ্ঠিতে না পারিয়া সেদিকে ভালরূপে দৃষ্টিপাত না করিয়াই দ্রুতপদে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

রাজপ্রহরিগণ প্রস্থান করিলেও করমেতি উষ্ট্রদেহ পরিত্যাগ করিলেন না। ধৃত হইবার ভয়ে একক্রমে তিন দিবারাত্র তন্মধ্যে লুকায়িতা রহিলেন, অনাহারে, অনিদ্রায়, কেবল শ্রীহরিরচরণ ধ্যান করিয়াই সেই দুঃসহ দুর্গন্ধ-ক্লেশ সহ্য করিলেন। চতুর্থ দিন, অপেক্ষাকৃত নিঃশঙ্ক হইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন এবং গঙ্গাস্নানান্তে শুচি হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত ছুটিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমাগত ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে তাহার আশা পূর্ণ হইল, বহুদিন বহু ক্লেশভোগের পর তাহার প্রাণের পিপাসা উপশমিত, শ্রীধামদর্শনলালসা চরিতার্থ হইল। করমেতি বৃন্দাবনে পঁহুছিলেন এবং ভক্তিসহকারে বৃন্দাবনে সমস্ত পবিত্র স্থল দর্শন করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকটস্থ বনাংশে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ কামনায় সমাধিস্থা হইলেন।

রাজানুচরগণ বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রত্যাগমন করিলে পরশুরাম হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং রাজাকে কিছু না বলিয়া, চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। তিনি নানা দেশ, নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করিলেন কিন্তু কোথাও তাঁহার উদ্দেশ পাইলেন না। অবশেষে মনের আবেগে অস্থির হইয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিলেন, বৃন্দাবনের প্রত্যেক বন, প্রতি দেবমন্দির ও সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রমাদি তন্নতন্ন করিয়া সন্ধান করিলেন, কোনও স্থলেই কন্যার সাক্ষাৎকার ঘটিল না। পরশুরাম তথাপি নিবৃত্ত হইলেন না।

বৃন্দাবনের প্রতি উচ্চবৃক্ষে আরোহণ ও তথা হইতে দূর দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তাঁহার সন্ধান লইতে আরম্ভ করিলেন,—এইবার ভগবান তাঁহার বাসনা সফল করিলেন; একদা উল্লিখিতরূপে সন্ধান করিতে করিতে তিনি ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে এক নিভৃতস্থানে বৃক্ষমূলে ধ্যাননিমগ্না করমেতির দর্শন পাইলেন; পরশুরাম হৃষ্টচিত্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুতপদে দুহিতার নিকটস্থ হইলেন।

করমেতির সেই পুণ্যপ্রভামণ্ডিত মুখমণ্ডল ও অভিনব ভাবভঙ্গি অবলোকন করিয়া পরশুরামের বিস্ময় জন্মিল। তাঁহার হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব নবীন ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি যে তাঁহার কন্যা—তাঁহার সেই স্নেহলালিতা দুহিতা করমেতি বাই, তাহা আর তাঁহার মনে রহিল না। তিনি তাঁহাকে দিব্যজ্যোতির্মণ্ডিতা বনদেবী বলিয়াই ধারণা করিলেন এবং এক অভিনব পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শিষ্য যেমন গুরুকে প্রণাম করে, সেইভাবে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। বাস্তবিকই করমেতি তখন আর সে করমেতি ছিলেন না। কৃষ্ণভক্তিপ্রভাবে তাঁহার শরীর-মনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তিনি এক দিব্য পবিত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে স্নিগ্ধ লাবণ্যপ্রভা নিঃসৃত হইতেছিল, ভক্তি-প্রভা-দীপ্ত প্রফুল্ল মুখকমল হইতে ভগবৎ প্রেমের সুধাধারা ক্ষরিত হইতেছিল। পৃথিবীর সে সঙ্কীর্ণতা—সে পাপতাপ চিরদিনের মত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি নিমীলিত নেত্রে নিশ্চলদেহে উপবিষ্টা থাকিয়া হৃদয়মন্দিরে শ্রীহরির সেই যোগিজনদুর্ল্লভ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন; আর তাঁহার উভয় অপাঙ্গ বহিয়া প্রেমের পূত সলিল-ধারা বিগলিত হইতেছিল। করমেতির অবস্থা দর্শনে পরশুরামের বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইল। তিনি প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে করমেতির চৈতন্য হইল। তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন; কিন্তু কথা কহিলেন না। পিতাকে ইঙ্গিতে প্রণিপাত করিয়া তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরশুরাম ভাবিয়াছিলেন,—ধ্যানভাব অপনীত হইলে করমেতি কথা কহিবেন, তাঁহাকে সংসারের কত কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। "করমেতি",—নিতান্ত বিনীতভাবে রুদ্ধকণ্ঠে পরশুরাম ডাকিলেন,—"করমেতি, মা আমার"। করমেতি উত্তর করিলেন না। পরশুরাম

তাহাকে বলিলেন,—"মা! কেন তুমি গৃহ ছাড়িয়া বনে আসিয়াছ? তুমি আমার গৃহের লক্ষ্মী, কুলের প্রদীপ, তোমার কি, মা, এ কায করা ভাল হইয়াছে? তুমি গৃহে চল। গৃহে থাকিয়াই কৃষ্ণভজন করিবে, আর তোমার কৃষ্ণপূজার ব্যাঘাত ঘটিবে না।" করমেতি সমস্ত কথা শুনিলেন, এবং কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"পিতঃ! কেন আমাকে এরূপ অনুনয় করিতেছেন,—কেন আমাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য এত আগ্রহ দেখাইতেছেন? আমার প্রাণ শ্যামসিন্ধুনীরে নিমজ্জিত হইয়াছে, আর তাহার তল হইতে উঠিবার সামর্থ্য নাই। অতএব আমার প্রাণহীন দেহটিমাত্র লইয়া গিয়া আপনার কি লাভ হইবে? আপনি আমার আশা ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাউন, যে মরিয়া গিয়াছে,—সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃতের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে, তাহার দ্বারা সংসারের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আপনি গৃহে গিয়া কৃষ্ণভজনে নিরত থাকুন, কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদ গ্রহণ করুন; আপনার সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হইবে, হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের সঞ্চার হইবে এবং দিন দিন সেই আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। তখন সাংসারিক কোনরূপ যন্ত্রণাই আর আপনাকে বিহ্বল করিতে পারিবে না।" এইরূপ ভাবে কৃষ্ণকথার আলোচনা করিতে করিতে করমেতির চক্ষু অশ্রুসিক্ত ও সংজ্ঞা তিরোহিত হইল। তিনি কিয়ৎকাল নিঃশব্দে নিস্পন্দভাবে উপবিষ্টা রহিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁহার চৈতন্য সঞ্চারিত হইল। আবার তিনি পূর্ব্ববৎ কথা কহিতে লাগিলেন।

করমেতির ঈদৃশ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ও অসাধারণ কৃষ্ণপ্রেম দর্শনে পরশুরামের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি আর করমেতিকে গৃহে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকটে বিদায় লইলেন এবং নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে খাজল গ্রামে স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুরোহিতের মুখে করমেতির কৃষ্ণভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া খাজল গ্রামাধিপতি বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য সদলবলে ত্বরিৎগতিতে বৃন্দাবনে আসিয়া পঁহুছিলেন। করমেতির নিকটে তত্ত্বকথা শুনিয়া পরশুরামের ন্যায় তাঁহারও তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইল; বিষয়বাসনা দূরীভূত হইয়া গেল। তিনি করমেতিকে আশ্রয়হীনা—শীতাতপে উন্মুক্ত স্থানে ক্লেশভোগ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাহার জন্য একটি আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। করমেতি তাহাতে বহুল প্রাণিহত্যার সম্ভা-

বনা বুঝিয়া অসম্মত করিলেন; কিন্তু রাজা তাহা শুনিলেন না। অচিরকাল মধ্যে খাজুলরাজের যত্নে ও অর্থানুকূল্যে ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে করমেতি এক ইষ্টকময় সাধন-কুটীর নির্ম্মিত হইল। করমেতি রাজানুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেই কুটীরে আসিয়া বাস করিলেন; তাঁহার সাধনভজনপ্রভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সেই আশ্রম যাত্রীদিগের এক প্রধান দর্শনীয় স্থলরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিল। কত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, করমেতি নশ্বর মনুষ্যশরীর পরিহারপূর্ব্বক স্বীয় সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সেই পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন—পুণ্যপূত আশ্রম, "করমেতি বাইর কুটরী" নামে অভিহিত হইয়া অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। বৃন্দাবনগামী সাধু ভক্ত মাত্রই ভক্তির সহিত উহা দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

সহানুভূতি।

—:*:—

(১)

জল-ভরা অভ্রগুলি গগনের তলে
নীল নভে যেতে যেতে ভাসি',
তুহিন-মণ্ডিত গিরি পরশে যখনি,
দেয় ঢালি স্নিগ্ধ বারিরাশি।

(২)

দয়াবান্ যেই, সেও ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
দু'খরাশি পূর্ণ এ ধরায়,
যখনি নেহারে কোন মুরতি করুন,
দ্রব হয় সমবেদনায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

পূর্ব্ব স্মৃতি।

—:○:—

বসন্ত কাল। কোকিল কেবল ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। দক্ষিণ পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া কুসুমের কোমল হৃদয়ে মৃদু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীহীন বৃক্ষলতাদি নবপত্রপুষ্পমঞ্জরীভূষিত হইয়া নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। চ্যুতশাখার পল্লবান্তরালে কোকিলা কাকনীড়ের প্রতি তীব্র লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকে,—যেমন তাহার সঙ্গীর কুহকে ভুলিয়া কাক নীড় পরিত্যাগ করিবে অমনই সে স্বপ্রসূত ডিম্বগুলি বায়সের আশ্রয়ে রক্ষা করিয়া পলায়ন করিবে।

সন্ধ্যার সময় ঘোষালদের বৈঠকখানার সম্মুখস্থ প্রশস্ত চত্বরে বসিয়া চা পান করিতেছিলাম। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় কতিপয় বন্ধু মিলিয়া এইখানে চা, লবঙ্গ এবং পরচর্চ্চার যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়।

সেদিনও বেশ আসর জমিয়াছিল। বিপিন মেদিনীপুরে থাকে; বড় একটা আসিয়া জুটিতে পারে না। সে দিন সেও আসিয়াছিল।

মনে নাই,—কি সূত্রে জননায়কগণের পরিবর্ত্তে সে দিন প্রসঙ্গক্রমে ভূতের গল্প হইতেছিল। ক্রমে সাপের গল্প, তাহার পর বাঘের গল্প হইতেছিল।

পল্লীনিবাসী একজন বর্ষীয়ান ভদ্রলোক এক অদ্ভুত অসম্ভব গল্পের অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ গল্পই স্বকপোলকল্পিত। আবার উপক্রমণিকার সহিত উপসংহারের সামঞ্জস্য তিনি কখনও রক্ষা করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। অনেকে এমনও বলিত যে, সেটা তাঁহার আপনার অপেক্ষা তাঁহার আফিঙ্গের মাত্রার দোষেই অধিক সময় ঘটিত।

বিপিন তাহার প্রতি তত শ্রদ্ধাবান ছিল না। সে বলিল,—"আপনার ও ত আজগুবি গল্প। আমি আপনাকে একটি সত্য গল্প বলিতেছি শুনুন। এটি আমার নিজ জীবনের ঘটনা। আপনি যেরূপ বাঘের সহিত মল্লযুদ্ধে বিক্রম দেখাইয়াছিলেন, বলিতেছেন, তাহাতে আমার মত বিপদে পড়িলে হয় ত ভাল্লুকের সহিত যুদ্ধে আপনাকে ভূশয্যায় চিরশান্তি লাভ করিতে হইত।"

ভদ্রলোকটি অবশ্য বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন, আমরা কিন্তু বিপিনকে ছাড়িলাম না; তাহার গল্পটি শুনিবার জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রদর্শন করিতে

লগ্নগিলাকা বিপিন প্রথমে যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল, তাহার পর বলিতে লাগিল :—

"তখন আমার একবৎসরমাত্র বিবাহ হইয়াছে; বিবাহের পর বিন্দুকে লইয়া মেদিনীপুরে গিয়াছি। মেদিনীপুরে দুই এক দিন থাকিবার পর একটি দুঃসংবাদ শুনিয়া কলিকাতায় আসিতে হইল।

"জান'ত সেস্থানে আমার কেহ ছিল না কেবল আমি, আমার সেই উড়িয়া চাকর—আর নবাধিষ্ঠিতা গৃহিণী বিন্দুবাসিনী। তথায় এত দস্যুতস্করের ভয় যে, রাত্রিতে বিন্দুকে রাখিয়া কলিকাতায় থাকিতে ভরসা হইল না। বিশেষতঃ বিন্দুকে বলিয়া আসিয়াছিলাম, যেমন করিয়া হউক, রাত্রিতেই ফিরিয়া যাইব।"

জনৈক বন্ধু এইস্থানে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। বিপিন খুব চতুর; সে তাহা লক্ষ্য করিয়াও গ্রাহ্য করিল না। সুতরাং বন্ধুর রসিকতা স্ফূর্ত্তি পাইল না।

বিপিন হস্তস্থিত চায়ের পেয়ালা ধীরে ধীরে ভূমিতে নামাইয়া রাখিল এবং সৌরভরম্য রুমালে মুখ মুছিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল :—

"শ্বশুর-বাড়ীতে আহারাদি করিয়া মান্দ্রাজ-মেলে রওনা হইলাম।

"বর্ষাকাল। মধ্যে মধ্যে বেশ দুই এক পশলা বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতার রাজপথ কর্দ্দমাক্ত। স্থানে স্থানে জল জমিয়া রহিয়াছে। আকাশ মেঘযুক্ত—অন্ধকার।

"শ্যালিকারা বলিলেন,—এ দুর্য্যোগে আজ না গেলেই হইত ভাল। কিন্তু বিন্দু একা থাকিবে শুনিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিলেন না। সুতরাং ঈষৎ সিক্ত পরিচ্ছদে রেলগাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম।

"আমাকে নামিতে হইবে নারায়ণগড় ষ্টেসনে, কিন্তু নারায়ণগড়ে মেল থামে না। সুতরাং পরবর্ত্তী ষ্টেসনে নামিয়া অন্য ট্রেনে আমাকে নারায়নগড়ে আসিতে হইল।

"ইতোমধ্যে আরও দুই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। রাজধানী হইতে যত দূরে যাইতে লাগিলাম বৃষ্টির প্রকোপ তত অধিক অনুভূত হইতে লাগিল। রেলের রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রান্তরসকল জলে পরিপূর্ণ।

"যখন নারায়ণগড়ে পঁহুছিলাম, তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিভূত হইয়া যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

"ষ্টেসন-মাষ্টার আমার বন্ধু। তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন,

তাঁহার আগ্রহেই রাত্রিবাস করি। কিন্তু প্রকৃতি যত আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন, আমার গৃহে ফিরিবার সঙ্কল্প ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার বর্ষাতিটুপি, ছাতা এবং একটি লণ্ঠন সংগ্রহ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

"ষ্টেসন হইতে আমার বাড়ী তিন মাইল দূরে অবস্থিত। মেটে রাস্তা জানু পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত। বিদ্যুদালোকে উভয় পার্শ্বে ধান্য-ক্ষেত্র সকল অনন্ত-বিস্তৃত সমুদ্রবৎ দিকচক্রবাল স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইল। আমি সেই সমুদ্র ভেদ করিয়া যেন অনন্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তীরা-বেগে ছুটিতে লাগিলাম।

"রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত ধান্য-ক্ষেত্র, কোথাও লোকের বসতি নাই। দূরে—বহুদূরে কৃষকগণের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গৃহালোক শূন্যবিহারী ক্ষুদ্রাকৃতি পক্ষীর মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যে দুই একটি খর্জ্জুর বৃক্ষ দেখা যাইতেছিল তাহারা অন্ধকারে আকাশের গাত্রে দীর্ঘাকৃতি দৈত্য বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল। দস্যুভয়ে হৃদয় শঙ্কিত।

"রাস্তায় আমি ব্যতীত আর দ্বিতীয় মানব আছে বলিয়া অনুমিত হইল না। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, এমন সময় মনে হইল, যেন আমার সহিত তালে তালে ঝপ্ ঝপ্ করিয়া পা ফেলিয়া কেহ আমার অনুসরণ করিতেছে।

"প্রথমে সিদ্ধান্ত করিলাম, ইহা আমার শঙ্কাবিহ্বল চিত্তের অবশ্যম্ভাবী কল্পনামাত্র। কিন্তু আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে মনে হইল, পশ্চাদ্ধাবমান শব্দ ক্রমশঃ আমার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তখন মনে শঙ্কা হইল, বুঝি বা কোন দস্যু আমার অনুসরণ করিতেছে। সাহসে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইলাম এবং লণ্ঠনের এক-মুখ-খোলা আলোকটি ফিরাইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার অন্তরাত্মা দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল—আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।"

আমার সেই অর্ব্বাচীন বন্ধু পুনরায় বাধাপ্রদান পূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন—"তখন তোমার বিন্দুর মুখ মনে পড়িল?"

বিপিন তাহার প্রতি ভ্রূকুটী করিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে গল্প করিতেছে একথা ভুলিয়া গিয়াছে এবং সেই বিপদের দিনে আপনাকে যেরূপ বিপন্ন মনে করিয়াছিল তখন সেইরূপ ভাবে অভিভূত হইয়াছে।

কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিলাম। তারপর বিপিন পুনরায় আরম্ভ করিল :—

"পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি একটি দীর্ঘাকৃতি ভালুক আমার প্রতি অগ্রসর হইতেছে।

"পর মুহূর্ত্তেই আমার হস্তস্থিত লণ্ঠন জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল এবং ছাতাটি ভালুকের নখে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। তন্মুহূর্ত্তে যেন আমার মনে নূতন বলসঞ্চার হইল। আমি সেই ছাতা দ্বারা ভালুককে এমন ধাক্কা দিলাম যে, সে পড়িয়া গেল এবং আমি ছুটিতে লাগিলাম। কিন্তু দীর্ঘ পথ। পালাইবার উপায় নাই।

"সৌভাগ্যক্রমে মনে হইল যে, ভালুক যেমন দুর্দ্ধর্ষ তেমনি স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। শীকারান্বেষণে ধাবিত হইয়া প্রথমে যাহা পায় তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট হয়। তৎক্ষণাৎ মাথা হইতে টুপিটি খুলিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলাম।

"বাড়ী পৌঁছিয়া এক পদাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম।

"আমার প্রভুপরায়ণ ভৃত্য—"চোর আসুচি" বলিতে বলিতে যষ্টি-হস্তে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল।

"আমি তাহাকে শীঘ্র দ্বারের সম্মুখে একটা বৃহৎ কাষ্ঠ আনিয়া দিতে বলিলাম। ভৃত্য বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি তাহাকে অর্গল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বুঝাইয়া দিলাম। তাহারপর উভয়ে ধরাধরি করিয়া একখণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ দ্বারা দ্বার আটক করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত মনে অন্দরে প্রবেশ করিলাম।

"কিন্তু একি? আমি যাহার জন্য এরূপ বিপন্ন অবস্থায় গৃহে ফিরিলাম, সে নিতান্ত নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে!

"গৃহে প্রবেশ করিয়া কাপড় ছাড়িয়া যখন বসিয়া পড়িলাম, তখন বিন্দু আমার মুখ দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। একটা কিছু বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা সে সহজেই অনুমান করিয়া লইল এবং সে যে ঘুমাইয়া পড়িয়া নিতান্ত অপরাধিনী হইয়াছে, তাহার কাতর দৃষ্টি দ্বারা তাহাই আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল।"

আমার সেই নির্লজ্জ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহার পর।"

এবার বিপিন তাহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিল—"তাহার পর?—তাহার পর 'দেহি মুখকমলমধুপানং'।" আমার বন্ধু নীরব হইলেন, কিন্তু বিপিনের মুখ মলিন ভাব ধারণ করিল এবং তাহার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

বুঝিলাম, বিপিনের বেদনা কোথায়। বন্ধু জানিতেন না, বিপিনের স্ত্রী নাই।

বিপিন বলিল—"তাহার পরদিন ভাঙ্গা ছাতা এবং ছেঁড়া টুপি ষ্টেসন-মাষ্টারকে ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আমার হাত হইতে যে লণ্ঠন পড়িয়া গিয়াছিল সেটা আমার দুর্ব্বলতার পরিচায়ক হইলেও আমার পক্ষে শুভ হইয়াছিল। নতুবা বিন্দুর সহিত সে রাত্রিতে সাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু বিন্দু—আজ কোথায়?"

আমাদের হৃদয়ে সমবেদনার ব্যথা বাজিয়া উঠিল। একবার ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিয়া বিপিন পুনরায় বলিতে লাগিল—"প্রথম প্রণয়ই যথার্থ প্রণয়। সে প্রণয়ে পরস্পরের হৃদয়ের অবিকুণ্ঠিত বিনিময় সংঘটিত হয়। তাহার পর মোহ—মোহ হইতে মায়া জন্মে। কিন্তু সে ভালবাসা নহে—ভালবাসার অনাচার অথবা ব্যভিচার। প্রথম প্রণয় যেমন মধুর, তাহার স্মৃতি তেমনি প্রবল।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিধ্বনি।

(সুরের অনুকরণে।)

নিশীথ মুরলী বোলে
কেমন ললিত রোলে
প্রতিধ্বনি কেঁপে উঠে আকুল সুস্বরে,—
জাগিয়া বীণার তারে
প্রান্তর সরসীপারে
চকিতে মিলায় যবে দূরদূরান্তরে।

জোছনা পুলকে ভুলে
বাঁশরী যে তান তুলে,—
তরল উদাস সুর সুষুপ্ত নিশায়,—
তারো চেয়ে মাতোয়ারা
বাঁধা সুর সুধাধারা
প্রেমের কারণে বাজে পরাণ-বীণায়।

প্রেমিক বঁধুর বুকে
বেদনা ভরিলে দুঃখে
—হিল্লোল উপজে তার' বঁধুর পরাণে,
সে ব্যথা যখন ধীরে
বঁধুর মরম ঘিরে'
গুমরি কাঁদিয়া উঠে মরমের টানে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

মহারাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ-প্রথা।*

ভারতবর্ষের মত জাতিবহুল দেশ জগতে আর কোথাও নাই। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতির আচারব্যবহার, বেশভূষা, ভাষা, সমস্তই পরস্পর বিভিন্ন। পাশাপাশি এমন ঘর বাঁধিয়া থাকিয়াও যে আমরা কেহ কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত নহি, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। যে মহারাষ্ট্রীয় গাথা, মহারাষ্ট্রীয় বীরত্ব আজ আমাদের কাব্য, নাটক, উপন্যাসের মূলীভূত বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোন পুস্তকে সেই মহারাষ্ট্রীয় জাতির এমন কোনও বর্ণনা নাই যাহার দ্বারা আমরা এই বিরাট জাতির একদিকও জানিতে পারি।

একটি জাতির সহিত পরিচিত হইতে গেলে নানা দিক্ দিয়া তাহাকে দেখিতে হয়। ব্যক্তিগত পরিচয়ে সম্যক্ বুঝিতে নাও পারা যাইতে পারে; কিন্তু কোনও একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে, অথবা সমাজের অধিবেশনে জাতির যেরূপ কৌলিক ও অবিমিশ্র ভাব দেখা যায় এমন আর কোনও সময়েই লক্ষিত হইবার সুবিধা হয় না।

আমি যে নিমন্ত্রণের কথা বলিতেছি, ইহাও একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। এইরূপ প্রথাই যে তাহাদের কৌলিক, তাহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিমন্ত্রণ বা যে কোনও কাযকর্ম্মে পুরনারীগণই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা বাজারের বা দোকানের খাদ্য যতদূর পারেন বর্জ্জন করেন; এমন কি মিঠাই পর্য্যন্ত ঘরে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। ঘরে প্রস্তুত করান অর্থে ঘরে ময়রা আনাইয়া প্রস্তুত করান নহে, বাটীর মহিলারা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এস্থানে সন্দেশরসগোল্লার তাদৃশ ধুমধাম নাই, শুধু লাড্ডু। ইহার উপর যদি কেহ ক্ষীরের বা ছানার কোনও সামগ্রী প্রস্তুত করিতে চাহেন তবে করিয়া লইতে পারেন। অধিকন্তু ন দোষায়; কিন্তু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করন বিষয়ে স্ত্রীলোকের একাধিপত্য।

একটি নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে সেই সময় সকলে আসিয়া সমবেত হয়েন। ভোজনের পূর্ব্বে বসিয়া থাকার প্রথা ইঁহাদিগের নাই। যদিই অপেক্ষা করিতে হয় তবে খুব সামান্য সময়ই অপেক্ষা করিতে হয়। কারণ, নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত

* 'চুঁচুড়া হিন্দু-সমিতি'র সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্তই ব্যয়। ভোজনাদিও যথাসম্ভব সত্বর শেষ হয়। বেলা ১টা হইতে ২টার মধ্যেই প্রায় সমস্ত শেষ হয়।

আমাদের দেশে যেমন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাটী ফিরিতেই সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হয়েন, এবং দিবসের নিমন্ত্রণ শুনিলেই সে দিন রাত্রিতেও গৃহে আহার বন্ধ করিতে হয়, এস্থানে সেরূপ আশঙ্কার কারণ হয় না।

আমাদের দেশে (অধিকাংশ স্থলেই) ভূম্যাসনে বসিয়াই—মহাসমারোহ ব্যাপারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হয়; এবং অগ্রে বসিয়া—"পাতা নিয়ে এস" "এ দিকে পাতা পড়ে নাই" ইত্যাদি রূপে কোলাহল করিতে হয়, কিন্তু এস্থানে ব্যবস্থা তাহার একবারে বিপরীত। প্রথমতঃ চা' খড়ির গুঁড়া এবং গুলাল্ (আবীর) দিয়া বর্গ দুইহস্ত পরিমিত এক একটি রাঙ্গোড়ী (ঘর) কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে এক এক খানি (১) পাঠ (পিঁড়ি), গ্লাস (জলপূর্ণ), থালা বা পাতা পূর্ব্ব হইতেই সাজাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে কর্ম্মকর্ত্তা এক এক করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের নাম ধরিয়া ডাকিবেন, ইহার উদ্দেশ্য সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন কি না জানা। তখন সকলে বিনা কোলাহলে এক এক জন এক একটি চৌকা অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত আসন পাতা ঘর অধিকার করিয়া বসিবেন। সকলে যখন স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিলেন তখন পুরাঙ্গণাগণ উচ্চৈঃস্বরে একবার হুলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন; এবং ভোজন-পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। আমাদের দেশের মত পুরুষরা এস্থানে আহার্য্য বিতরণ করেন না। বাটীস্থ পুরুষরাও এই সঙ্গে আহারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতে তাঁহাদিগকে নিন্দিত হইতে হয় না।

প্রথমে লবণ ও চাটনি দেওয়া হয়। চাটনি প্রায় ৪।৫ প্রকারের। আমড়ার, দধির, আচার, কাসুন্দী, এবং "পঞ্চামৃত"। পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে প্রথমতঃ এইগুলি দেওয়া হয়। "পঞ্চামৃত" অর্থাৎ আদা, মরিচ, তেঁতুল, চিনি এবং ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গা চীনা বাদাম। এই অমৃত পঞ্চের মধ্যে দ্বিতীয় অমৃতটির প্রাবল্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট।

যেমন লবণ ও চাটনি প্রদত্ত হইল অমনই প্রত্যেক ভোক্তার পার্শ্বে এক একটি উদবাত্তি (ধূপশলাকা) জ্বালিয়া দেওয়া হইল। অগ্রে ধূপ দীপ দুই-ই

(১) মহারাষ্ট্রীয় ভোক্তারা আসনে বসিয়া অন্ন গ্রহণ করেন না। কারণ, যদি সূতার আসন হয় তবে অশুচি, পশমের হইলেও তাঁহারা অশুচি বলিয়া জ্ঞান করেন। কাজেই তাঁহারা আসনে বসিয়া ভোজন করিলে নিষ্ঠাহানি হয়, বিবেচনা করেন। কিন্তু আমাদের মত ইহাদিগের উচ্চজ্ঞান নাই।

ছিল এখন সে প্রথা "বাস্ত" হইয়া শুধু ধূপে দাঁড়াইয়াছে। সুগন্ধে মন প্রফুল্লিত হয়, এবং আহারে রুচি বৃদ্ধি হয় বলিয়া এরূপ ধূপ দীপ দেওয়া হয়। এই সময় ভোক্তৃগণ সকলে তারস্বরে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন—

"হরির্দাতা হরির্ভোক্তা হরিরন্নং প্রজাপতিঃ।
সোহি সর্ব্বাত্মা ভোক্তাচ ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে হরিঃ।"

এই শ্লোকটি সকলে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে গান করিলে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রথম চাট্‌নি দেওয়ার পর যত প্রকার তরকারী থাকিবে, সমস্ত দেওয়া হইবে; তাহার পর পাঁপর ভাজা, কুড়ডাই ও সমস্ত প্রকার ভাজা পরিবেশিত হয়। কুড়ডাই—ময়দা (জিলাপির আকার করিয়া) ঘৃতে ভর্জ্জিত হয়, জিলাপী শেষে রসে ফেলিয়া মিষ্ট করা হয়। কুড়ডাই রসে ফেলা হয় না। তাহার পর পুরী। যেমন পুরী পর্য্যন্ত দেওয়া হইল, অমনি সকলে ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েন। তার পর লাড্ডু, কাঢ়ি (ঘোলের তরকারী) ও শ্রীখণ্ড। শ্রীখণ্ড বস্তুটি অতিশয় তৃপ্তিদায়ক; দধি ও চিনি একত্র মিলাইয়া জাফ্‌রান মিশ্রিত করিয়া একটি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। এই গেল ভোজন পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়।

এগুলি যেমন খাওয়া শেষ হইল, অমনই দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইল। প্রথমে আবার কাঢ়ি আসিল, তার পর বাঙ্গালীর জীবন ভাত;—কিন্তু অতি সামান্ত পরিমাণে; এক হাতা কি দেড় হাতা। মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট ইহাই যথেষ্ট হইতে পারে কিন্তু ইহা আমাদের "শত অন্ন" মাত্র। তাহার পর ডাল ও ঘৃত। ঘৃতও একহাতা পরিমাণ।

এই ত গেল ভোজ্য দ্রব্যের নাম ও প্রকার। ইহার মধ্যে কিছু বেশী বা কিছু কমও হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ এই গুলিই হইয়া থাকে। এইস্থলে এ কথাটি বলিয়া রাখি, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা সকলেই নিরামিষাসী, এমন কি, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যেও অনেকগুলি শাখায় মৎস্য মাংস ব্যবহৃত হয় না।

আমাদের দেশের প্রথা যেমন পরিবেশকগণ যথেচ্ছ পরিবেশন করিয়া কার্য সারিয়া যায়েন, কোনও পাতে কোনও দ্রব্য অতিশয় কম পড়িল, কিম্বা কোনও পাতে পড়িয়া নষ্ট হইল, এস্থানে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। পৌরাঙ্গনাগণ প্রথমতঃ অল্প পরিমাণে পরিবেশন করেন, তাহার পর যাঁহার যত ইচ্ছা, তাঁহাকে তত দেওয়া হয়। একবারে উপর্য্যুপরি ভাতের পর ডাল, ডালের পর তরকারি দিয়া ভোক্তাদের বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া ধীরে ধীরে এক একটি করিয়া আহার্য্য

বিতরণ করা হয়। অনেকে লাজুক থাকিতে পারেন, তাঁহারা একবারে অধিক পরিমাণে কোনও জিনিষ পাতে রাখিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং অনেক সময় আহারেও অসুবিধা হইতে পারে। কিম্বা পাতে পড়িয়া বৃথা নষ্ট হইবে বলিয়া এস্থানে সকল দ্রব্যই অল্প পরিমাণে বিতরিত হয়। পরিবেশিকা পৌরাঙ্গনাগণ নির্ব্বিরোধে আহূত ভদ্রমণ্ডলীকে অন্নপূর্ণারূপে খাদ্য বিলাইবেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলিবেন না। বাটীস্থ ব্যক্তিবর্গ মধ্যস্থ হইয়া নিমন্ত্রিতগণের অভাব জ্ঞাপন ও মোচন করেন।

আমাদের দেশে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ একে একে নিমন্ত্রক মহাশয়ের বাটীতে চরণরেণু প্রদান করতঃ চন্দ্রাতপনিম্নে বসিয়া ভোজনের পূর্ব্বে তামাক সেবন করেন; কিন্তু ভোজনান্তে সকলেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া (এমন কি মুক্তকচ্ছ হইয়া) গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে ব্যস্ত হয়েন। মহারাষ্ট্রীয় প্রথা ইহার ঠিক বিপরীত। ভোজনান্তে সমস্ত আমন্ত্রিত ব্যক্তি একত্র উপবেশন করিবেন। সেস্থানে থালা ভরা পান ও অন্য পাত্রে কাটা সুপারি, ধনের চাল, লবঙ্গ, এলাচি ইত্যাদি প্রস্তুত থাকে। এইস্থানে আমার ধূমপায়ী পাঠক ভাবিতেছেন যে, এক ছিলিম তামাক হইলে বড় ভাল হয়, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা ধূমপানকে অতিশয় ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। তবে ধূমপায়ীও আছেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আহারান্তে তাম্বুলচর্ব্বণে যে সময়টুকু ব্যয়িত হয়, ইহাতে বেশ বিশ্রামের কায হয়। তাহার পর নিমন্ত্রিকগণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে যথাযোগ্য প্রণাম, সম্মান ও আশীর্ব্বাদ করিয়া অঙ্গে সুগন্ধি লেপনপূর্ব্বক বিদায় দিয়া থাকেন।

ভোজনান্তে এরূপভাবে বিশ্রাম করার কারণ, আমার বোধ হয় নিমন্ত্রকের বাটীস্থ পুরুষরাও এক সঙ্গে ভোজন সমাপন করেন, কাযেই সকলে মিশিয়া বেশ বিশ্রম্ভালাপ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশে নিমন্ত্রিতগণ যদি আহারের পরও মজ্‌লিশ্‌ করেন, তবে হয় ত নিমন্ত্রকদের ভোজনেও অনেক বিলম্ব হয়, কারণ সকলকে না খাওয়াইয়া তাঁহারা খান না—প্রথা নাই;—এই জন্যই বোধ হয় সকলে সত্বর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আমাদের দেশেও যেমন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির পৃথক্ পৃথক্ ভোজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, মহারাষ্ট্রীয় দেশেও সেইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

—:*:—

বাজে কথা।*

বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্প অল্প দিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে গল্প পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতীচ্য আদর্শে সেই গল্পকে নূতন সাজে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন—তিনি বাঙ্গালা উপন্যাসকে নূতন সৌন্দর্য্যে সুন্দর করিয়া কেবল বাঙ্গালার নহে, পরন্তু সমগ্র সভ্য জগতের নিকট সমাদৃত করিয়াছেন, তিনিই বঙ্গসাহিত্যে ছোট গল্পের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু ছোট গল্প ও উপন্যাস স্বতন্ত্র। যে আখ্যান বস্তু উপন্যাসের মেরুদণ্ড, সে আখ্যান বস্তু ছোট গল্পের অত্যাবশ্যক উপাদান নহে। ছোট গল্প একটিমাত্র ঘটনাকে তাহার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে প্রাধান্য দান করিয়া তাহাকেই সম্পূর্ণ ও সমুজ্জ্বল করিয়া দেখায়; তাই সাহিত্যরথ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-রচনায় যেরূপ অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন,—ছোট গল্প-রচনায় সেরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার উপন্যাসের তুলনায় তাঁহার ছোট গল্প ম্লান। বোধ হয়, তিনি স্বয়ং ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই 'রাধারাণী', 'যুগলাঙ্গুরী' ও 'ইন্দিরা' এই তিনটি ছোট গল্পের মধ্যে 'ইন্দিরা'কে শেষে উপন্যাসে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাবান ভ্রাতা—সূক্ষ্মদর্শী—নিপুণ শিল্পী সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' উল্লেখযোগ্য রচনা। সঞ্জীব বাবু যেরূপে খুঁটিনাটি দেখিতেন, সেরূপ দেখা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই খুঁটিনাটি দেখিবার ক্ষমতা ও প্রয়াস ছোট গল্পে শোভা পায় না—তাহাতে ছোট গল্পের স্বাভাবিক লঘু ও দ্রুত গতি নষ্ট হয়।

ইহার পর 'ভারতীতে' শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর অনেকগুলি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। তাহার পর 'সাহিত্য' ও 'সাধনা'—বহু উৎকৃষ্ট ছোট গল্পে

---

* বাজে কথা—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দাসী প্রণীত। কলিকাতা, ১৬ নং প্যারী দাসের লেন হইতে এ, সি, রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

সজ্জিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বহু ছোট গল্প 'হিতবাদীতে' ও "সাধনায়' প্রকাশিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যে বহু ছোট গল্প-লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই।

ছোট গল্প রচনায় ফরাসী লেখকগণ যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন, ইংরাজ লেখকগণ সেরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা গল্পের আদর্শও ফরাসী।

আমাদের আলোচ্য পুস্তকে চারিটি ছোট গল্প আছে :—

করুণা
৺চন্দ্রনাথ দর্শন
প্রকৃত মানুষ
নির্ম্মলার অদৃষ্ট

পুস্তকখানিতে দুইটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—সরল রচনাভঙ্গী ও ভাষার দোষ।

রচনাভঙ্গীর সরলতাহেতু লেখিকা গল্পগুলিতে সাধারণ মানুষই চিত্রিত করিয়াছেন। লেখকগণ—বিশেষতঃ লেখিকারা, অনেক স্থানেই আতিশয্য বর্জ্জন করিতে পারেন না; চিত্র চিত্রিত করিবার সময় হয় দেবতার, নহে ত পিশাচের চিত্র চিত্রিত করিয়া থাকেন। অথচ সংসারে মানুষ দেবতাও নহে, পিশাচও নহে—মানুষ।

'করুণা' গল্পের নায়ক ভগিনীর প্রতি পত্নীর দুর্ব্বব্যহারে মর্ম্মাহত হইয়া পত্নীর মনোভাব পরিবর্ত্তনের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিল, তাহা নীতিশাস্ত্রে প্রশংসিত নহে।—সে মিথ্যা বলিল, কিন্তু যে দ্রব্যগুলি বন্ধুপত্নীর জন্য আনিয়া পত্নীর নিকট কোন চরিত্রহীনার জন্য আনিয়াছে বলিল, সে দ্রব্যগুলি বন্ধু-পত্নীকে দিতে পারিল না।—"আমি সাবান গন্ধ বাহিরে আনিয়া বৈঠকখানায় তাকে তুলিয়া রাখিলাম। সেগুলি আর বন্ধুর স্ত্রীকে দেওয়া হইল না। নিভার কাছে যখন সেগুলিকে অন্য নামে বলিয়াছি, তখন সেগুলি কি বিবেচনায় দিই?"

এক দিকে সদুদ্দেশ্যসাধনচেষ্টায় মিথ্যা আচরণ ও অপর দিকে এই সঙ্কোচ—সংসারে মানুষের ব্যবহারে অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়। এই চিত্রে লেখিকার মানবচরিত্রজ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে।

রমেশকে বাইজির কুহকমুক্ত করিবার জন্য এই গল্পের নায়ক যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তাহার সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"লীলার বিবাহে তিন হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলাম। রমেশকে কুহকিনীর হাত হইতে উদ্ধার করিতে আর এক হাজার ছয় শত টাকা খরচ করিলাম। অবশ্য সে বাগদত্ত দশ হাজার টাকা দিই নাই। দুটা ধমকেই দালালকে তাড়াইয়াছিলাম।"—উভয় স্থলেই তিনি উদ্দেশ্য বিবেচনায় অবলম্বিত পথের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই; যাহাতে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টাই করিয়াছেন।

'৺চন্দ্রনাথ দর্শন' গল্পের নায়িকা ভ্রাতার সহিত চন্দ্রনাথ দর্শনে যাইবেন; কিন্তু তাঁহার জ্বরের জন্য তাঁহার স্বামী তাহাতে অসম্মত। তিনি বলিলেন,—জ্বর হয় নাই। স্বামী দেখিলেন,—স্ত্রীর ললাট তপ্ত; তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, থার্ম্মোমিটার দিয়া দেখি।"—নায়িকা লিখিতেছেন, "তখন আমার ভয় হইল। এ মিথ্যা কথা এখুনি ধরা পড়িবে। যাহা হউক, তখন আর একটা ফন্দি আমার মাথায় আসিল। জোর করিয়া বলিলাম,—'দেখ না, আজ জ্বর হয় নাই। বিছানায় সমস্তক্ষণ শুইয়া আছি, তাই কপালটা গরম বোধ হইতেছে, এখুনি যদি বারান্দায় হাওয়ায় গিয়া বসি, দেখিবে ঠাণ্ডা হইবে।' উনি বলিলেন,—'বেশ তো থার্ম্মোমেটারেই জানা যাবে।' আমার গায়ে একখানি চাদর ছিল। উনি থার্ম্মোমিটার দিয়া বসিলেন। আমি এক মিনিট সেটি রাখিয়া ধীরে ধীরে খুলিয়া হাতে করিয়া ধরিয়া রহিলাম। অবশ্য সে কৌশল আমার খুব সাবধান হইয়া করিতে হইয়াছিল, যাহাতে উনি বুঝিতে না পারেন যে, আমি হাতে করিয়া উপর দিক ধরিয়া আছি। আবার মোটেই না দিলে কিছু না উঠিলে সন্দেহ করিতে পারেন, সেই জন্য ঘড়ির দিকে নজর রাখিয়া এক মিনিট রাখিলাম।"

মহিলা শিল্পীর অঙ্কিত স্ত্রী চরিত্রের এই অনায়াসলভ্য চাতুরীর চিত্র আমরা অত্যন্ত উপভোগ করিয়াছি। উপভোগ করিবার বিশেষ কারণ এই যে, ইহাতে আমাদের "ঢেরা সহি" থাকিলেও এ চিত্র অঙ্কিত করিতে আমাদের সাহসে কুলায় না।

লেখিকা বঙ্গাঙ্গনা। গৃহের বাহিরে বিশ্বাস জড়জগতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে না। তাই তিনি বাহিরে জগতের রূপ দেখিয়া সহজেই মুগ্ধা হয়েন। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে নূতনত্বের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য আর তেমন

সুস্পষ্ট বোধ হয় না; সংসার-সংঘাতে হৃদয় বিকৃত হইতে আর তেমন করিয়া সৌন্দর্য্য দেখিবার ও অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে না। লেখিকার নিকট বাহিরের বিশাল বিশ্ব "নূতন দেশ।" তাঁহার অনাবিল হৃদয়ে সেই নূতন দেশ দর্শনে যে আনন্দ অনুভূত হইয়াছে, তিনি তাঁহার রচনায় তাহাই প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"বালিকা কাল হইতে আমি দেশ-বিদেশের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতাম। যে কেউ বিদেশভ্রমণের কাহিনী বলিত, আমি আগ্রহ করিয়া শুনিতাম। আমার সেজ্‌ দাদা কুমিল্লা হইতে আসিয়া আমার কাছে সে দেশের গল্প করিলেন। তার ভিতর এমন কোন আশ্চর্য্য কথা ছিল না। কিন্তু আমার নাকি ঐ বিষয়ে নেশা ছিল, তাই আমি উৎসুক নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতাম। তিনি যখন বলিতেন,—'পদ্মার এক একটি তরঙ্গে পাড়গুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে, বেশ দেখিতে। আমি জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া দেখিতাম, তাহাতে বড়ই আনন্দ পাইতাম।' সেজ দাদা তো দু' চারিটি কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত; আমি কিন্তু কবির মত ধ্যানমগ্ন হইয়া মানসনেত্রে সেই পদ্মা তীর তরঙ্গ ও কুমিল্লা দেশের রাস্তা দেখিতাম। যখন কল্পনা ছুটিয়া যাইত, তখন গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতাম ও ভাবিতাম সেই কল্পনাই সার, কখন তো কোথাও যাইতে পাইব না।"

পুস্তকে বর্ণনগুলি স্নিগ্ধ ও সুন্দর।

প্রথমে যে ভাষাগত দোষের উল্লেখ করিয়াছি, উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। এই দোষে পুস্তকখানির অত্যন্ত সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। সূচীপত্রে তিনটি গল্পের উল্লেখ আছে; কিন্তু পুস্তকে চারিটি গল্প আছে। বিরামচিহ্ন সংস্থাপনে কোনরূপ নিয়ম অনুসৃত হয় নাই। একান্ত দুঃখের বিষয়, লেখিকা এ সকল বিষয়ে অতিরিক্ত অমনোযোগের পরিচয় দিয়াছেন এবং আর কেহও এগুলি দেখিয়া দেন নাই।

উপসংহারের আর একটি কথা বলিবার আছে, লেখিকা সকল গল্পেই যে ভাবে গল্পের মধ্যে গল্পের অবতারণা করিয়াছেন,—অনেকগুলি চিত্রে একটি চিত্রপট শোভিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, তিনি চেষ্টা করিলে উপন্যাস-রচনায় সফলকাম হইতে পারেন। আমরা আশা করি, তিনি সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

লেখিকা যে বিনয়বশে পুস্তকের 'বাজে কথা' নামকরণ করিয়াছেন, পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বলিতে পারি, তাঁহার সে বিনয়ের কোন কারণ নাই।

সংগ্রহ।

—:•:—

ইতিহাস।

প্রাচীন ভারত।

(খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী।)

মহাবীর আলেকজান্দরের আক্রমণের পর হইতে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। যদিও ঐতিহাসিকগণ তদ্‌পূর্ব্বের ইতিহাস সঙ্কলনে সচেষ্ট আছেন, তথাপি তাঁহারা উক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাই খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর অন্ধকারগর্ভ ভারতেতিহাসবক্ষে কোন ঐতিহাসিককে আলোক পাত করিতে দেখিলে আমাদের মনে স্বতঃই আনন্দের উদয় হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সেই আলোচনার সারমর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পারস্য সম্রাট দীরায়াসের (৫২১—৪৮৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ) কতিপয় ক্ষোদিত লিপিতে ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যকে পারস্য ছত্রপ (Satrapies) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে সমগ্র সিন্ধুদেশ এবং সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী পঞ্জাবপ্রদেশ পারস্য সম্রাটের অধিকারভুক্ত ছিল। পার্সেপোলিস অনুশাসনে পারস্যপতি দীরায়াসের ত্রয়োবিংশ ছত্রপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে বিংশস্থানে ভারতবর্ষের নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেইরূপ নক্সিরস্তম শিলালিপিতে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের যে সকল অংশ মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, সেই সকল প্রদেশ ব্যতীত দীরায়াসের সাম্রাজ্যভুক্তরূপে ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পঞ্চম শতাব্দীতেও পারস্যের সহিত ভারতের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে ও শিল্পকলায় পারস্যপ্রভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

তৎকালে ভারতবর্ষের সহিত যে বৈদেশিক রাজগণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, সে বিষয়ে হেরোডাটাসের পুস্তকও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, একদল ভারতীয় প্রবল পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধা সম্রাট Xerxesএর সৈন্যভুক্ত ছিল। হেরোডোটাস আরও লিখিয়াছেন যে, দীরায়াস স্বীয় ভারতবর্ষীয় ছত্রপ হইতে প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণরেণু কর স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার অধিকৃত অন্য কোন প্রদেশের অধিবাসিগণ এত অধিক কর প্রদান করিতে পারিত না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহারা এত স্বর্ণ কোথা হইতে পাইত? এই প্রশ্নের উত্তরে হেরোডোটাস লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যাইত; ইহার মধ্যে কতক খনিজ, কতক নদীস্রোতে আনীত এবং কতক বা পিপীলিকা-

সংগৃহীত। স্বর্ণ সংগ্রহের শেষোক্ত উপায় সম্বন্ধে তিনি একটি হাস্যোদ্দীপক গল্প লিখিয়াছেন। তিনি বলেন,—পূর্ব্বে ভারতের মরুভূমি প্রদেশে শৃগাল অপেক্ষা বৃহৎ এবং দ্রুতগামী একপ্রকার পিপীলিকা বাস করিত। এই পিপীলিকাগণ মৃত্তিকা হইতে যে সকল বালুকাপুঞ্জ উত্থিত করিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করিত, তাহার সহিত স্বর্ণরজঃ মিশ্রিত থাকিত। ভারতবাসিগণ পূর্ব্বাহ্নে যখন পিপীলিকাগণ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রখর সূর্য্যতাপ নিবারণ করিত,—সেই সময়ে দ্রুতগামী উষ্ট্রের সাহায্যে পিপীলিকার আবাসে গমন করিয়া তাহাদের সঞ্চিত স্বর্ণমিশ্রিত বালুকা অপহরণ করিত এবং সন্ধ্যা-সমাগমের পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। কারণ, গ্রীষ্ম-তাপ অপনীত হইলে, পিপীলিকাগণ মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া অপহরণকারীদিগকে দেখিতে পাইলেই তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিত। প্লিনি, এলিয়ন এবং এমন কি মেগাস্থিনিস প্রভৃতি পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণও উক্ত গল্পের পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার উইলসন প্রথমে এই গল্পের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে, পিপীলিকার ন্যায় আকার ও বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া স্বর্ণকণাকে সংস্কৃত ভাষায় "পৈপীলক" বলে। গ্রীকগণ এই শব্দের তাৎপর্য্য যথাযথ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পিপীলিকাগণ মৃত্তিকা হইতে সুবর্ণ আহরণ করে, ইত্যাদি ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছিলেন। তবে তৎকালে উত্তর পশ্চিম ভারতে সিন্ধু ও ইহার শাখানদীগুলি যে স্বর্ণগর্ভ ছিল, সে বিষয় প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, হেরোডোটাসের সময়ে—সেই সুদূর কালেও, ভারতবর্ষ ধনশালী দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

বুদ্ধের জাতক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষীয় বণিকগণ সমুদ্রপথে বাবিলনে সর্ব্বপ্রথমে ময়ূর বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বুলার ইহা হইতে অনুমান করেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম এবং সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতের বণিকগণ পারস্য উপকূলে বণিজ্যযাত্রা করিত।

সুত্তপিটকের দিঘনিকয়ে (রিস্ ডেভিডসের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত) ভারতীয় পোতের দূর সমুদ্র যাত্রার কথার উল্লেখ আছে।

তদ্ভিন্ন উক্ত খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত নেপাল সীমান্ত প্রদেশস্থিত পিপ্রব স্তূপের আবিষ্কার হওয়ায়, প্রাচীন ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেন যে, এই স্তূপের নির্ম্মাণপদ্ধতি এবং ইহার মধ্য হইতে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি দৃষ্টে নিশ্চিত অবধারণ করিতে পারা যায় যে, ৪৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ভারতে সুদক্ষ গৃহনির্ম্মাতা, কুশল ভাস্কর এবং নিপুণ রত্নব্যবসায়ী ছিল। স্তূপমধ্যস্থিত স্ফাটিক পানপাত্র ও প্রস্তরময় পুষ্পপাত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহা কুঁদের সাহায্যে গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং ৪৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের শিল্পিগণ যে কুঁদের ব্যবহার বিশেষভাবে অবগত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎকালের রত্নব্যবসায়িগণ যে অতিশয় কঠিন রত্নখণ্ড কাটিয়া বিভিন্ন গঠনে পরিণত করিতে, মসৃণ করিতে এবং ছিদ্র করিতে সিদ্ধহস্ত ছিল এবং তৎকালে যে প্রচুর পরিমাণে রত্নাদি ব্যবহৃত হইত, ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

বিবিধ।

—(০)—

পারিপার্শ্বিক প্রভাব।

কথায় বলে, "অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি"—জড়জগতে যেমন জীবজগতেও তেমনই পুরুষানুক্রমিক স্বাভাবিক বিশেষত্ব বাকি কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় না। য়ুরোপে এই বিষয়ের বিশেষ পরীক্ষা হইয়াছে ও হইতেছে। সংপ্রতি 'মেণ্ডেল জর্ণালে' এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হইয়াছে।

মতামত। এক ব্যক্তি তদীয় চেষ্টায় যে সকল বিশেষত্ব লাভ করে, সে সকল কি তাহার সন্তানে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে? বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ বাইসম্যান বলিয়াছেন—তাহা হয় না। মিষ্টার মাজ ও বলেন, তাহা হয় না। এক জনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বীয় চেষ্টার সংগৃহীত গুণের শেষ হয়। আজকাল যে পারিপার্শ্বিক প্রভাবে অক্ষমকে সক্ষম ও অযোগ্যকে যোগ্য করিবার চেষ্টা হইতেছে সে চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে না। ডাক্তার কবেট বলেন, যদি দুর্ব্বৃত্ত পিতামাতার সন্তানদিগকে উৎকৃষ্ট পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবিত করা যায়, তবে তাহারা পৈত্রিক দোষের উত্তরাধিকারী হইলেও সেই সকল দোষ পরিস্ফুট হইতে পারে না।

চেষ্টা। উত্তরে মিষ্টার মাজ বলেন, দেখা গিয়াছে, এ চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবার নহে। স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম কূলে প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোজ্ঞ—সে প্রদেশের অধিবাসীরাও তেমনই সরল। গ্লাসগো সহরে অন্য সকল সহরের মত বহু দুর্ব্বৃত্তের বাস। ইহাদিগের বংশবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া গ্লাসগো সহরের কর্ত্তারা স্থির করিলেন, ইহাদিগের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থির হইল, এই সকল দুর্ব্বৃত্তদিগের সংশোধনের উপায় করা অসম্ভব, কিন্তু তাহাদিগের সন্তানদিগকে সুসংস্কৃত নাগরিকে পরিণত করা অসম্ভব নহে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহারা সহরের বস্তি হইতে শিশু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সকল শিশুকে স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমভাগে কোন দ্বীপে পাঠান হইল। তথায় তাহাদিগের লালনপালনের ও শিক্ষার আবশ্যক ব্যবস্থা করা হইল। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষাবসানে কার্য্যের জন্য অন্য স্থানে গমন করে; কেহ কেহ সেই দ্বীপেই অবস্থান করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে।

ফল। কোন কোন স্থলে এই সকল শিশু শিষ্ট শান্ত যুবকে পরিণত হইয়াছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই সাধু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। প্রবাদ আছে—যাহা অস্থিতে থাকে, তাহা মাংসে বিকশিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। এত চেষ্টা, শিক্ষার ব্যবস্থা, পারিপার্শ্বিক প্রভাব সবই নিষ্ফল হইয়াছে।

এই রম্য দ্বীপে স্বভাবতঃ সরল, শিষ্ট ও শান্ত অধিবাসীদিগের মধ্যে [illegible] আসিয়া দুর্বৃত্তের আবির্ভাব হইয়াছে। এই সকল দুর্বৃত্ত শিক্ষার ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবিত হয় নাই; পরন্তু সর্ব্ববিষয়ে পিতামাতার দোষভাগের উত্তরাধিকারী হইয়াছে। তাহাদিগের ব্যবহারে দ্বীপবাসীরা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা অশ্লীল সঙ্গীতে নিশীথের শান্তি ভঙ্গ করে। ইহারা রাজপথে ধাবিত হইয়া পথিকদিগকে বিরক্ত করে; নারীদিগের সন্নিহিত হইয়া অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে। ইহারা প্রস্তর ছুড়িয়া লোকের গবাক্ষ-কবাট ভাঙ্গিয়া দেয়, লোকের গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহারা জীবজন্তুর প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করে। মিথ্যাবাদে ও মিথ্যাচরণে ইহাদিগের অশিক্ষিতপটুত্ব; চৌর্য্যবিদ্যায় ইহারা বিশারদ।

এই দ্বীপের পারিপার্শ্বিক অবস্থা শান্তিস্নিগ্ধ; কিন্তু গ্ল্যাসগোর দুর্বৃত্ত সন্তানদিগের উপর প্রভাব। পারিপার্শ্বিক প্রভাব নিষ্ফল হইয়াছে; তাহাদের চরিত্রে, কুলক্রমাগত দোষ সকলই বিকাশ পাইয়াছে। এখন কথা এই—দেখাগেল,—

"ইল্লত যায় ধুলে
স্বভাব যায় মলে।"

তবে কি এখনও গ্লাসগোর কর্ত্তারা তাঁহাদিগের নগরের আবর্জ্জনা পাঠাইয়া এই দ্বীপের স্নিগ্ধ শান্তিপ্রিয় সরল অধিবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন? সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায়। বিদ্যালয়ে, সংশোধনাগারে, সমাজে সর্ব্বত্র দেখা যায়—কুলক্রমাগত দোষভাগই বিকশিত হয়। আমাদের দেশেও কত পবিত্র পরিবারের শুভ্র যশঃ কুপরিবার হইতে গৃহীত পোষ্যপুত্রের কুব্যবহারে কলঙ্কিত হইয়াছে।

সমাজে অশিষ্টদিগের সংশোধনের উপায়-বিধান করা সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষার ফলে যে-সত্য সপ্রকাশ হইল, সংশোধনের ব্যবস্থা তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক।

